বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ

মণিলাল গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

অপরিচিতা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

অধুনা কোন উপন্যাস বাহির হইলে কিম্বা প্রমোদশালায় নাট্য-রূপ পরিগ্রহ করিলে একশ্রেণীর পাঠককে তাহাদের শিকড় ধরিয়া টানাটানি করিতে দেখা যায়। সোৎসাহে তাঁহারা নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান যে, গ্রন্থখানি সত্যই মৌলিক কিম্বা বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে উপাদান সন্তর্পণে আহরণ করিয়া অজ্ঞ পাঠকমহলে মৌলিক বলিয়া চালাইবার অপচেষ্টা হইয়াছে। ব্যাপারটি একদিক দিয়া যেমন লজ্জা ও বিরক্তিকর, নীতির দিক দিয়া এই শ্রেণীর উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু শিক্ষিত পাঠকদের উদ্যমও তদ্রূপ প্রশংসার্হ। সাহিত্য-রসিক-সমাজ এজন্য ইহাদিগকে সাহিত্যের ব্যাপারে 'কষ্টি-পাথর' বলিয়া যদি অভিহিত করেন, বোধ হয় অশোভন হইবে না।

প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় এই উপন্যাসখানির প্রকৃতির উল্লেখ থাকিলেও প্রসঙ্গক্রমে বলিতে হইতেছে যে, কোন বিশিষ্ট মাসিক পত্রিকায় ইহার অংশ-বিশেষ গল্পাকারে প্রকাশিত হইবার পর কোন বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক পত্রের রবিবাসর-সংখ্যায় ইহা অনূদিত হইয়া We meet to quit নামে বাহির হয়। কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এ-পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিলে সম্পাদক মহাশয় দুঃখপ্রকাশ করিয়া ব্যাপারটি চাপা দেন। পরে কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ গল্পটিকে তাঁহাদের প্রয়োজনানুরূপ আকারে সাজাইয়া দিবার অনুরোধ করিলেও তাহাকে নিজ পরিকল্পনানুযায়ী একখানি সুবৃহৎ উপন্যাসে পরিণত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারি নাই। ঘটনাক্রমে আমার অনুজ 'ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস'এর পরিচালক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'ফাইন আর্ট পাবলিশিং হাউস'এর পরিচালক প্রিয়বর শ্রীযুক্ত রাধারমণ দাসের উৎসাহ ও সময়োপযোগী ব্যবস্থায় সেই পরিকল্পনাটি এতদিনে সার্থক হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে,—এজন্য উভয়কেই আশীর্বাদ করিতেছি। ইতি, আশ্বিন, দেবীপক্ষ; ১৩৫০ সাল।

নাট্য-মন্দির
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অপরিচিতা

প্রথম পর্ব

১

প্রয়াগ তীর্থে ত্রিবেণীর সুবিস্তীর্ণ বেলাভূমি ব্যাপিয়া বহু-বাঞ্ছিত মহাকুম্ভের বিরাট মেলা বসিয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া যে সকল মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যে মাসাধিককাল স্থায়ী ভারতের কুম্ভ মেলাই যে সর্ব্বাগ্রে প্রাধান্য পাইবার যোগ্য, বিদেশী পরিব্রাজকরাও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নানাদিক দিয়া মেলাটির বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যও অসাধারণ।

প্রায় ছয় ক্রোশ-ব্যাপী বালুকাময় বেলাভূমি যেন কোন অদ্ভুত মায়াবীর যাদুদণ্ডস্পর্শে বিশ্বমানবের এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ীদের অসংখ্য বিপণি, যাবতীয় উপাসক সম্প্রদায় তথা গুহাবাসী ও আশ্রমিক সন্ন্যাসীদের আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশ, ভারতীয় ধর্ম্মার্থী ও বিদেশীয় কৌতূহলী পর্য্যটকবৃন্দের সমস্যা একান্ত বিস্ময়াবহ ও চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের অন্তরালে বিভিন্ন প্রকৃতির প্রতিভাশালী সুবিধাবাদীদের প্রাদুর্ভাব এবং তাহাদের গতিবিধি ও কার্য্য-পদ্ধতির বৈচিত্র্য পঁচিশ লক্ষ লোকের মহামিলনীবক্ষে চাঞ্চল্যের যে শিহরণ তুলিয়া থাকে তাহাও রীতিমত রোমাঞ্চকর। গতানুগতিক প্রথায় কর্ত্তৃপক্ষ যদিও ইহাদের সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক হইবার নির্দ্দেশ দিতে অবহেলা করেন না, কিন্তু ইহারাও ততোধিক সতর্কতার সহিত নবতম পরিকল্পনায় এমন কৌশলে কাজ গুছাইয়া থাকে যে, কর্ত্তৃপক্ষকেও অবাক হইতে হয়। তজ্জন্য বর্ত্তমান মেলার সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ ভাবে অবহিত হইতে হইয়াছে এবং সন্দেহ-ভাজনদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য কতিপয় যোগ্যতাসম্পন্ন বিচক্ষণ গোয়েন্দাকে মেলাস্থানে পাঠাইয়াছেন।

কুম্ভমেলায় সাধুসমাবেশই সর্ব্বাধিক বিস্ময়কর ব্যাপার। মেলার যে অংশে সাধুদের পটমণ্ডপ পড়িয়াছে, জনসাধারণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে সেই দিকেই নিবদ্ধ হইয়া থাকে। বিচিত্র বর্ণের ধ্বজা-পতাকায় সজ্জিত ও বিভিন্ন পরিভাষার দ্বারা চিহ্নিত মণ্ডপগুলির রূপশ্রী জনসাধারণকে চমৎকৃত করে। তাহারা স্থির করিতে পারে না যে বাহিরেই যেখানে এত আড়ম্বর, ভিতরে আরও কি অধিকতর ঐশ্বর্য্যের উৎস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অমনি অতীত যুগের তপোবন-বাসী সাধুদের নৃপতিলাঞ্ছিত বিভূতির কাহিনী তাহাদের স্মৃতিপথে ছবির মত ফুটিয়া উঠে, কাজেই সাধু দর্শনের আগ্রহ প্রত্যেককে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে।

কিন্তু এই সুবিস্তীর্ণ সাধু-স্থানের প্রত্যন্ত অংশে ত্রিবেণী যেখানে বিপুল পদ্মের চাপে অপেক্ষাকৃত কৃশকায়া তথায় পুরাকালের এক জরাজীর্ণ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মধ্যে সাধুস্থানের শেষ আশ্রমটি যেন আবর্জ্জনার মতই বিশ্রী ও বিসদৃশরূপে দর্শক-চক্ষুতে পীড়া দিতেছে। হয়ত এই পীড়াদায়ক বাড়ীখানিই এককালে চক্ষু-চমৎকারী হইয়া শোভার সঞ্চার করিত; কিন্তু কালের কঠোর আঘাতে ইহার উর্দ্ধাংশ বিধ্বস্ত হওয়ায় অবশিষ্ট অংশটি যেন এক বিরাট কবন্ধের মত দুই বাহু মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর জীর্ণ দেউড়ীর দুই ধারে দুইটি প্রথিত বংশখণ্ড অবলম্বনে গৈরিকবর্ণের একটুকরা কাপড় সুরঞ্জিত তুলার অক্ষরে সজ্জিত হইয়া সাধু-সংস্থানটির নাম ঘোষণা করিতেছে—আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রম; শ্রীবৃন্দাবনধাম।

অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এবং এই ভীতিপ্রদ স্থানে যদিও আশ্রমটির পটমণ্ডপ উঠিয়াছে, কিন্তু ভিতরে আশ্রমোচিত অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নাই, বরং আধুনিক যুগের যে কোন সুপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমের উপযুক্ত নিয়ম-কানুনগুলি এমনই সুষ্ঠুভাবে চালু আছে যে

আশ্রম-কর্তৃপক্ষের কর্তব্যনিষ্ঠা এবং আশ্রমটির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কটাক্ষ করিবার কোন উপলক্ষই দেখা যায় না। যত বড় বিচক্ষণ পরিদর্শকই হউন না কেন, আশ্রমের কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে পরিশ্রম সহিত সাধ্যমত সহায়তার প্রতিশ্রুতি না দিয়া তাঁহার নিষ্কৃতির উপায় থাকে না। অধিকন্তু সৌম্যমূর্ত্তি মিষ্টভাষী আশ্রম-স্বামীর সংস্পর্শে একবার আসিলে অতবড় কঠোর প্রকৃতি তার্কিকের অন্তর পর্য্যন্ত কি 'নত না হইয়া পারে না', এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা এই আশ্রমটির পরিচালক শ্রীমৎ আনন্দস্বামীর।

সিদ্ধাশ্রমটির বিধি-ব্যবস্থা বাঁধা-ধরা নিয়মাধীন হইলেও কার্য্যপদ্ধতির ধারা কিন্তু স্বতন্ত্র। অন্যান্য সাধু সম্প্রদায়ের ন্যায় এই সিদ্ধাশ্রমের সাধুদিগকে আড়ম্বরপূর্ণ মিছিল করিয়া বাহির হইতে দেখা যায় নাই, সাধুস্বামীটির হাতায় হাতী ঘোড়া উট বা চতুর্দ্দোলার বাহার লোক-চক্ষুকে মুগ্ধ করে না, বরং তিনটি বলীবর্দ্দ এবং কানাৎ-দেরা কয়েকখানি আকাধ গো-যান আশ্রম-স্বামীর পাচক পন্থানুসরণের নিদর্শনরূপে আশ্রমের একাংশে বিরাজ করিয়া থাকে। আশ্রমটির উদ্দেশ্য হইতেছে—আশ্রমিকগণকে সকল বিষয়ে বিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও সিদ্ধ করিয়া তোলা। কিন্তু ইহার সাধনা খুবই কঠোর। মানব মনের যত কিছু সুকোমল বৃত্তি এবং মানব সমাজের যাহা কিছু প্রচলিত মতবাদ প্রত্যেকটির সহিত সুপরিচিত ও প্রতি বিষয়ে শিক্ষিতপটু হইয়াও তাহাকে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাকিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ঐ সকল সুকোমলবৃত্তি এবং প্রচলিত মতবাদ যে নিরর্থক—স্বার্থবাদীদের হাতের পাঁচ মাত্র, প্রয়োগ কৌশল সহ তাহাতেও অভিজ্ঞ হওয়া চাই। আধ্যাত্মিক সুখের সমস্ত কাহিনী শুনিয়া এবং গভীর ভাবে সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়াও চিত্তকে তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। এ সম্বন্ধে এই ধারণাই দাঁড়ান চাই যে, স্বার্থবাদীরাই আধ্যাত্মিক সুখের গল্প রচনা করিয়া আধ্যাত্মিকতার নামে দুনিয়ার নরনারীর অন্তরে বিষ ছড়াইতেছে। গুণ ও দোষ, পাপ ও পুণ্য—ইহাদের প্রকৃতি নির্ণয় করিবার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হইবে। গুণ বলিতে আধ্যাত্মিক মাপকাঠিতে মাপা গতকগুলি কোমল বৃত্তি নয়—সব কিছু দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতাই হইতেছে গুণ, পাপ-পুণ্যের ঊর্দ্ধ হইবে তাহার স্থান। যত কিছু দুর্ব্বলতাই হইতেছে পাপ, আর শক্তির আরাধনাই সত্যকার পুণ্য। স্বামীজীর অভিপ্রেত 'সর্ব্বসিদ্ধ' দলকে এই সকল ব্যাপারে অভিজ্ঞ এবং কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইতে হইবে। কিন্তু স্বামীজীর একাগ্রতা ও তৎপরতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত দল ত দূরের কথা—এমন একটি লোকও উল্লিখিত সাধনা বা পরীক্ষাগুলিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই যাহাকে তিনি 'সর্ব্বসিদ্ধ' বলিয়া 'সার্টি-ফিকেট' দিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্বামীজী হাল ছাড়িয়া দেন নাই বা 'হাতের পাঁচ' ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার এই বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক খেলাটিকে ভাঙ্গিয়া দিবার দুর্ব্বলতাও প্রকাশ করেন নাই, বরং অকৃতকার্য্য শিষ্যদিগকে পরবর্ত্তী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার নির্দ্দেশ দেন। যাহারা বহু দিন ধরিয়া পুনঃপুনঃ অকৃত-কার্য্য হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকেও অপদার্থ বলিয়া বিদায় দেওয়া হয় নাই। এ সম্বন্ধে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত এই যে, চলার পথে অল্প লোকই আছাড় না খাইয়া বা পা পিছলাইয়া না পড়িয়া সরাসরি নির্ব্বিঘ্নে গন্তব্য স্থানটিতে গিয়া পৌঁছাইতে পারে। কিন্তু যাহারা ক্রমাগতই হোঁচট খায়, বা পা পিছলাইয়া পড়ে, তাহারা যদি নিরুৎসাহ না হইয়া লক্ষ্য স্থির রাখে—একদিন তাহারা বুড়ি ছুঁইবেই, আর উঠা-পড়া দুটি ব্যাপারের অভিজ্ঞতাকে তাহাদিগকে আরও পাকাপোক্ত করিয়া তুলিবে। শিষ্যদের অকৃতকার্য্যতা স্বামীজীকে ক্রমশঃই ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিলেও একেবারে নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। নিজের অন্তরকে নিজেই আশ্বাস দিতেন—আছে, সে আছে; এদের মধ্যেই আছে—এদের মাঝখান থেকেই সে বেরুবে।

কিন্তু ঠিক এই সময়ই আশ্রমবাসী শিষ্যগণ এক-যোগে আশ্রম ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় স্বামীজির সংস্কার-শুদ্ধ অন্তরটি মথিত করিয়া সর্ব্বপ্রথম নৈরাশ্যের স্বর সশব্দে বাহির হয়—হবে না, এরা সব অপদার্থের দল; আমি যাকে চাই, খুঁজছি—এদের মাঝখান থেকে সে বেরুবে না, তাকে খুঁজে বার করতে হবে। তার জন্য চাই নূতন স্থান, ভিন্ন আয়োজন।

কর্ম্ম-সচিব লালাজীর যুক্তি এই সময় স্বামীজীর চিত্ত-স্পর্শ করে এবং তদনুসারে সিদ্ধাশ্রম কাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে স্থানান্তরিত হয়। সিদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে আগ্রাবাসী লালা লছমন দাসজীর সংশ্রবও নিবিড় হইয়া আছে। কতকটা এক যোগেই উভয়ে এই পথটি বাছিয়া লন। তবে বয়ঃক্রম, বিদ্যা ও বিজ্ঞতার উৎকর্ষে স্বামী-জীকেই আশ্রমগুরুর পদ গ্রহণ করিতে হয় আর লালা লছমন দাস স্বামীজীর নির্দ্দেশ মতই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং নূতন কোন পরিস্থিতি দেখা দিলে সময়োপযোগী যুক্তিও দিয়া থাকেন। লালা লছমন দাসের যুক্তি অনুসারেই শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহামেলায় সিদ্ধাশ্রমের অধিষ্ঠান হইয়াছে এবং সমাগত নানাদেশীয় বিভিন্ন

বয়সের পঁচিশ লক্ষ নরনারীর ভিতর হইতে সিদ্ধাশ্রমের উপযুক্ত নব নব তরুণ শক্তি বাছিয়া লইবার আয়োজন চলিয়াছে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে স্বামীজীর অন্তর-ভেদী দৃষ্টি, আর লালাজীর অপরাজেয় কূট বুদ্ধি।

২

পুরাকালের জীর্ণ বাড়ীখানিকে আশ্রমোপযোগী করিয়া সাজাইয়া লওয়া হইয়াছে। বাড়ীর মধ্যে এমন একখানি ঘর পাওয়া গিয়াছে যেখানে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাটুকুই আছে, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ করিলে বহির্জগতের সহিত কোন সম্বন্ধই তাহার থাকে না। সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালে অন্তঃপুরিকারাই ঘরখানি ব্যবহার করিতেন। বর্ত্তমানে তাহা লালাজীর খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সিদ্ধাশ্রমের জন্য সংগৃহীত শক্তির নব নব কর্মপন্থা, এই রহস্যময় গৃহেই সংগোপনে সংরক্ষিত হয়। থাক। এ ব্যাপারে লালাজীর উপর স্বামীজী নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অর্পণ করায় তিনি যে সকল পন্থা ও প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সিদ্ধাশ্রমের দিক হইতে সেগুলি পবিত্র ও সিদ্ধ হইলেও আইনের দৃষ্টিতে তেমন নির্দোষ নহে। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংবদ্ধ শক্তি-সঙ্ঘের গঠন-ব্যাপারে লালাজী ও স্বামীজী উভয়কেই অতিরিক্ত সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হয়।

শুধু গৃহটির আকার বৃহৎ, গুদামের মত, দেওয়াল-গুলি পাথরে নির্মিত, শুভ্র বর্ণ, মসৃণ। মেঝের উপর আগাগোড়া একখানি পুরু গালিচা বিছানো। বিভিন্ন বয়সের বারোটি মেয়ে তাহার উপর এলোমেলো ভাবে বসিয়া কাঁদিতেছে, প্রত্যেকের কান্নার ভাষা আর কণ্ঠের ভাষার পার্থক্য এমন একটা অদ্ভুত ঝঙ্কার তুলিয়াছে যাহা রোমাঞ্চকর। বারোটি মেয়ের মধ্যে অনুমান তিনটি পাঁচ-ছয় বছরের, দুটি পাঁচের কম, বয়স আটের মধ্যে, অবশিষ্ট চারিটি অপেক্ষাকৃত আরো বয়স্কা, তবে দশের সীমারেখা অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের মধ্যে খোট্টা আছে, নেপালী আছে, মাদ্রাজী আছে, গুজরাটি আছে, পাঞ্জাবী আছে। প্রত্যেকেই যে ভিন্ন প্রদেশ হইতে মেলা দেখিতে আসিয়াছে এবং অভিভাবকদের সঙ্গচ্যুত হইয়া সিদ্ধাশ্রমের ভাণ্ডার-জাত হইয়াছে, পরিজনদের উদ্দেশে তাহাদের আর্ত্তস্বরই তাহা ব্যক্ত করিতেছিল। মেয়েগুলির বয়সগত পার্থক্য থাকিলেও আকৃতিগত সাদৃশ্য বিস্ময়াবহ। প্রত্যেকেই রূপসী, সুশ্রী ও দীর্ঘাঙ্গী।

লালা লছমন দাস শীস দিতে দিতে রুদ্ধ ঘরখানির ভিতর পায়চারী করিতেছিলেন। রোরুদ্যমানা বালিকাদের আর্ত্তস্বরের তালে তালে তাঁহার এ ভাবে শীস দেওয়াটা ব্যঙ্গের মতই দৃষ্টিকটু ও বিসদৃশ ঠেকিতে-ছিল। কিন্তু লালাজীর সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি নবলব্ধ রত্নগুলির রমণীয় আকৃতি ও মনোরম সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ক্ষমতা যাচাই করিয়া মনে মনে নিয়োজিত সেবকদের নির্ব্বাচন শক্তির প্রশংসা করিতেছিলেন। চেহারা দেখিয়া লালা লছমন দাসকে চিনিতে হইলে মানুষ চেনা ব্যাপারে পাকা জহুরীদেরও ভুল হইবার সম্ভাবনা। কেন না, চেহারা দেখিয়া লালাজীর প্রকৃত বয়স কত তাহা ধরিবার উপায় নাই; চেহারার মালিক যদি জোর দিয়া বলেন যে, বয়স তাঁহার চৌত্রিশ চলিতেছে—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু থাকে না। বিশেষতঃ, যে কোন ভাষার আঁকা-বাঁকা টানা লেখা চশমার সাহায্য না লইয়া লালাজী যখন গড়গড় করিয়া পড়িয়া যান, তখন মানিতেই হইবে যে তাঁহার চোখে এখনো চালশে ধরে নাই, অতএব চল্লিশের কোঠায় তিনি পড়েন নাই নিশ্চয়ই। ইহার উপর শ্মশ্রুগুম্ফহীন প্রশস্ত মুখশ্রী এবং সেই মুখে একটা শিশুসুলভ লাবণ্য, বড় বড় দুটি স্বপ্নালু চোখ, ঘাড় পর্য্যন্ত লতানো ও ঈষৎ কোঁকড়ানো দীর্ঘ চুলের ছটা দেখিলে তাঁহাকে কবি-প্রকৃতির মানুষ বলিয়া মনে হয় এবং বয়স তাঁহার যাহাই হউক না কেন, কবিসুলভ তারুণ্য যে দেহ ও মনকে এখনো কাঁচা রাখিয়াছে—পাকিতে দেয় নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। সুশ্রী অঙ্গসজ্জাও এ বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিয়া থাকে। যোগিয়া রঙের রেশমী ধুতি, পিরাণ ও চাদরের বর্ণ এবং শ্রেণীগত সমতা—বৈরাগী-বাঞ্ছিত গেরুয়ার অভিনব সংস্করণরূপে চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। অবশ্য সিদ্ধাশ্রমের সাধকদের ইহাই সুনির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ। এই শুদ্ধ ও সুশ্রী পরিচ্ছদে দেহসজ্জা করিয়া লালাজী যখন নির্জ্জনে কূটবুদ্ধির চর্চ্চা করেন, তখন কিন্তু তাঁহার প্রকৃত রূপ ও বয়স সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন আয়নার উপর তাঁহার আলেখ্য পড়িতেই লালাজী একেবারে যেন মুষড়াইয়া পড়েন, নিজের মনেই বিড়-বিড় করিয়া সেদিন তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছিল—সর্ব্বনাশ! বিশ বছরের গোঁজামিল লোকের চোখে ধরা পড়ল না, শেষে কি না আয়নার বুকেই ফুটে উঠল! লালাজীর এই মর্ম্মবাণীই আমাদের চোখে আঙুল দিয়া যেন জানাইয়া দিতেছে যে, চেহারা ও সাজসজ্জার

চটকে বয়ঃক্রমকে তিনি কিরূপ রহস্যাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

নানা ভাষায় দখল থাকায় নানাভাষী মানুষকে খুসি করিতেও লালাজীর ক্ষমতা অসাধারণ। মেয়েগুলি ত প্রথমে স্বামীজীকে দেখিয়া ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধাশ্রমের ভাবী সর্ব্বসিদ্ধ দলের কোরকগুলিকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতেই তিনি তাহাদের অন্তরদেশ তলাইয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে যে দৃষ্টিতে তাকান এবং যে সুরে অট্টহাসির একটা ঝঙ্কার তুলেন, তাহাতেই মেয়েগুলির মূর্চ্ছা যাইবার মত অবস্থা হইয়াছে। পরে লালাজী তাহাদিগকে এই কক্ষে আনিয়া এবং প্রয়োজন মত আশ্বাস দিয়া কতকটা শান্ত করিতে পারিয়াছেন। মেয়েগুলিও ক্রমশঃ এই সদাশয় প্রিয়দর্শন ও মিষ্টভাষী সাধুটিকে পরিজনহীন অপরিচিত স্থানে পরমাত্মীয়ের মতই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

নিরবচ্ছিন্ন রোদনে ইহাদের চোখগুলি আরক্ত হওয়ায় মুখের লাবণ্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। পাঁচ-ছয় বছরের পাঞ্জাবী মেয়েটি গায়ের জামিয়ার ওড়নাখানার অঞ্চলে চোখ দুটি মুছিতেছিল। ফলে, চোখের কাজলে মাখানো সুর্মার কালি তাহার সুন্দর মুখখানিতে লাগিয়া চাঁদের কলঙ্কের মত কয়েকটি কালো রেখা আঁকিয়া দিল। ওড়নাখানি নামাইতেই দৃশ্যটি লালাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। ফিক করিয়া হাসিয়া তিনি হিন্দিতে বলিলেন:—তোমার চোখের কালি মুখে লেগেছে খুকি, তোমাকে এসো মুছিয়ে দিই:

মেয়েটি এতক্ষণ বসিয়াছিল, লালাজীর কথাগুলি ভাল না বুঝিলেও 'কালি'র হিন্দী প্রতিশব্দ 'সেহাই' কথাটি শুনিয়াই সে আস্তে আস্তে উঠিল, কিন্তু লালাজীর কাছে না গিয়া পাঞ্জাবী ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল:—মাজা যাবো—আমার মা।

কথা কয়টি বলিয়াই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল। লালাজীও পাঞ্জাবী ভাষায় কথাগুলি টানিয়া টানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: খুকী তোমার বাবা আছে?

ঘাড় নাড়িয়া বালিকা জানাইল: আছে।

লালাজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: কি কাজ তিনি করেন?

বালিকা জানাইল: কারবার করেন, শাল বেচেন।

খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লালাজী বালিকার সম্বন্ধে এইটুকুই জানিলেন যে, তাহার বাবা শাল বিক্রী করিতে মেলায় আসেন। সঙ্গে তাহার মা, এক ভাই ও একটি বোন্ আসিয়াছে। বালিকাই সর্ব্ব-কনিষ্ঠা। মায়ের জন্য, দাদা ও দিদির জন্য তাহার ভারি মন কেমন করিতেছে।

লালাজী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন: তোমার বাবা এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন; তোমার মা, দাদা, দিদি সবাই আসবেন।

নিজের ভাষায় এই ভাবে পরিজনদের প্রসঙ্গ শুনিয়া পাঞ্জাবী মেয়েটি অনেকটা আশ্বস্ত হইল। অন্যান্য বালিকাগুলি কাণ পাতিয়া ইহাদের কথা শুনিতেছিল, কিন্তু তাহারা যে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহাদের মুখ দেখিয়াই বোধ হইতেছিল। এতগুলি মেয়ের মধ্যে এই বালিকাটিই একমাত্র পাঞ্জাবী। কিন্তু ইহার ভাষা লালাজী ভিন্ন অন্যের দুর্ব্বোধ্য ছিল। অন্যান্য বালিকাগুলিকে একে একে বিভিন্ন ভাষায় প্রশ্ন তুলিয়া এবং অতি কষ্টে প্রত্যেক মেয়েটির প্রাদেশিকতা উপলব্ধি করিয়া লালাজী ইহাদের সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন যে, কোন কন্যাই প্রয়াগ বা সন্নিহিত অঞ্চলের বাসিন্দা নহে। ইহাদের অভিভাবকেরা পুণ্যার্থী হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অঞ্চল হইতে এই মহামেলায় আসিয়া মিলিয়াছে এবং ফরমাসী ফুলের তোড়া রচনা করিবার জন্য মালাকর যেভাবে বিভিন্ন গাছ হইতে বাছিয়া বাছিয়া পছন্দমত এক একটি ফুল তুলিয়া তোড়ায় যোজনা করিয়া থাকে, তাঁহার নিয়োজিত কর্ম্মদক্ষ সন্ধানীও রূপোদ্যানের এই কয়টি বক্ষ-বোধক সংকেত-নৈপুণ্যে চয়ন করিয়া সিদ্ধাশ্রমের জীবন্ত পণ্যভাণ্ডারটি ভরাইয়া দিয়াছে।

বিশ্বস্ত ও মূক আশ্রম-সেবক শঙ্কু এই সময় একখানা বৃহৎ থালার উপর পানীয়পূর্ণ বারোটি পিয়ালা সাজাইয়া আস্তে আস্তে ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করিল। লালাজী তাহার পানে তাকাইয়া মৃদু স্বরে বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন: ওষুধ দাগ মত দিয়েছিস ত?

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া শঙ্কু থালাখানি লালাজীর সম্মুখে রাখিল। অম্লান প্রফুল্ল মুখখানিতে স্নেহের একটা পূর্ণ আভা ফুটাইয়া লালাজী এক একটি পিয়ালা স্বহস্তে তুলিয়া প্রত্যেক মেয়েটির দিকে একে একে আগাইয়া দিলেন, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভাষায় দরদ-ভরা স্বরের ধারা ছুটিল: মিষ্টি সরবত, খেয়ে ফেল খুকি, কেঁদে কেঁদে গলা শুকিয়ে গেছে, ভাবনা কিসের, বাবা এলেন বলে—ইত্যাদি। কোন্‌টি কোন্ প্রদেশের মেয়ে, কোন্ প্রাদেশিক ভাষায় কথা বলিলে বুঝিতে পারিবে, ইতিমধ্যে লালাজী তাহা মনে মনে

ছুকিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই প্রচেষ্টা সফলও হইল। রক্তবর্ণের কমনীয় পানীয় বালিকাদের তৃষিত ওষ্ঠগুলিকে এরূপ আকৃষ্ট করিতেছিল যে, অনুরোধের মাত্রা বাড়াইবার আর প্রয়োজন হইল না।

প্রায় প্রত্যেকেই এক নিশ্বাসে স্ব স্ব পাত্র নিঃশেষ করিয়া ফেলিল এবং অনতিবিলম্বেই তাহাদের চোখের পাতাগুলির উপর ধীরে ধীরে ঘুমের ছায়া এমন ভাবে ঘনাইয়া আসিল যে, কাহারও আর বসিয়া থাকিবার সামর্থ্য রহিল না।

লালাজীর ইঙ্গিতে শঙ্কু শূন্য পিয়ালাগুলি থালায় তুলিয়া চলিয়া গেল। মুখখানি এবার গম্ভীর করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া এবং মুখে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পাশাপাশি শায়িতা কন্যাদের নিদ্রাচ্ছন্ন মুখগুলির পূর্ণ অংশ আলোর অভাবে অস্পষ্ট দেখাইতেছে বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পিরাণের পকেট হইতে ক্ষুদ্র একটি টর্চ্চ বাহির করিলেন এবং তাহার আলোক-রশ্মি একে একে প্রত্যেক কন্যাটির মুখে নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে উল্লাসের সুরে নিজ মনেই বলিয়া উঠিলেন :—Splendid! In space comes a grace.

দরজাটি ঠেলিয়া শঙ্কু পুনরায় ঘরে ঢুকিল এবং ইসারায় জানাইল, স্বামীজী তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। শঙ্কু যেন ঠিক কলের পুতুল। কাজটুকু সারিয়াই অদৃশ্য হইল। লালাজীর মুখখানি পুনরায় গম্ভীর হইয়া আসিল। যে বারোটি কন্যারত্নের এরূপ আশ্চর্য্য সমন্বয়ে তিনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতটা আশান্বিত, স্বামীজী এক নজরে তাহাদিগকে দেখিয়াই অনাবশ্যক আবর্জ্জনার সামিল বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আশ্রমের দুই চক্ষুষ্মান্ বিজ্ঞের মধ্যে এরূপ মতভেদ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। স্বামীজীর আহ্বানের অর্থ আর কিছু নয়, অপহৃতা কন্যাগুলির সম্পর্কেই লালাজীর সহিত তিনি আলোচনা করিতে চান। কিন্তু এই কন্যাগুলি আজ লালাজীর দৃষ্টিপথে আসিয়া তাঁহার চোখের সামনে অদূর ভবিষ্যতের যে দৃশ্যপট টাঙ্গাইয়া দিয়াছে তাঁহাকে এখন তাহার উপরেই রঙ-তুলি চালাইতে হইবে। সঙ্কল্পের আভা চোখে-মুখে ফুটাইয়া লালাজী স্বামীজীর উদ্দেশেই চলিলেন।

৩

বৃহৎ একখানি বাঘছালের উপর বসিয়া সিদ্ধাশ্রমের শিরোমণি শ্রীমৎ আনন্দস্বামী নিবিষ্ট মনে একখানি ইংরাজী দর্শনের বই পড়িতেছিলেন। বিচিত্র আসনখানির চারিদিকে বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত দুর্লভ গ্রন্থরাজির সমাবেশ আশ্রমস্বামীর অসাধারণ বিদ্যানুরাগের যেমন সুস্পষ্ট একটা পরিচয় দিতেছিল, তেমনই বিশাল দেহ, দীর্ঘ বাহু, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত ললাট, হস্তি-কর্ণ, নক্ষত্রের মত দীপ্ত চক্ষু, লম্বকৃষ্ণ স্থূল গুম্ফ ও দীর্ঘ শ্মশ্রুর ছটা, আস্কন্ধ-তরঙ্গায়িত কেশপাশ প্রভৃতির দুর্লভ সমন্বয়ে গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত তাঁহার অপরূপ মূর্ত্তিটি দেখিবা মাত্রেই দর্শক-মনে এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া উঠে যে, এক বিরাট পুরুষ সর্ব্বাঙ্গ ব্যক্তিত্বে সবার উর্দ্ধে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব অতিক্রম করা সহজসাধ্য নহে।

লালা ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : ডাকছিলেন দাদাজী?

স্বামীজীকে লালা দাদাজী বলিয়া সম্ভাষণ করেন এবং ইঁহাদের সাধারণ কথাবার্ত্তা বাঙ্গালা ভাষাতেই চলিয়া থাকে। লালার মাতৃভাষা হিন্দী হইলেও পাঠ্যজীবন হইতেই তিনি বাঙ্গালা ও উর্দ্দুর পক্ষপাতী। তৎকালীন যুক্তপ্রদেশবাসী শিক্ষিত-সমাজের আদর্শে তিনি হিন্দীকে উপেক্ষা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং কলিকাতার কলেজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালাকে মাতৃভাষার মত আপন করিতে সমর্থ হন। পরে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ঘটিলেও বাঙ্গালাভাষীর সহিত বাঙ্গালা ভাষাতেই আলাপ করিতে তিনি ভালবাসেন।

হাতের বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া স্বামীজী লালার দিকে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত সমগ্র মুখখানি যেন অকস্মাৎ বদলাইয়া গেল। এ দৃষ্টির সহিত লালাজী সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু আজ তিনিও প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন আদর্শ সম্বন্ধে একটা বোঝা-পড়া করিবার জন্য, সুতরাং স্বামীজীর দৃষ্টিতে অভিভূত না হইয়া অসঙ্কোচে এবং দৃঢ় কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : বুঝতে পেরেছি, আপনি বিরক্ত হয়েছেন আমার উপর, তাই কৈফিয়ৎ চান।

স্বামীজীর দৃষ্টি একবার টর্চ্চের আলোক-রশ্মির মত লালার দুই চক্ষুতে নিবদ্ধ হইল। কিন্তু কণ্ঠ দিয়া যে স্বর বাহির হইল, তাহা অতিশয় স্নিগ্ধ, কোমল, মর্ম্মস্পর্শী। প্রশ্নের সুরেই স্বামীজী বলিলেন : তোমার চোখে বিদ্রোহের শিখা দেখা যাচ্ছে যে লালা, তুমি কি আজ দাদাজীর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য তৈরী হয়ে এসেছ ভাই?

লালার মুখ ও চক্ষুর ভাব সঙ্গে সঙ্গেই বদলাইয়া গেল। কণ্ঠ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না,

বিহ্বলের মতই তিনি এই অদ্ভুত মানুষটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

স্বামীজী এবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন: দাঁড়িয়ে রইলে যে অবাক হ'য়ে, ব'স; কথা আছে। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ—এই তিনটেরই আজ সমাধান করা চাই। ঝড় ওঠবার আগেই আমাদের উচিত যে-যার ঘর সামলে নেওয়া।

খানিকটা তফাতে গেরুয়া রঙের একখানি বনাত বিছানো ছিল, সেইটিই এ-কক্ষে লালার নির্দিষ্ট আসন। ধীরে ধীরে তিনি আসন গ্রহণ করিয়া চাহিতেই স্বামীজী সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। তিনি এ-পর্যন্ত একই ভাবে নিবদ্ধদৃষ্টিতে লালাজীর পানেই চাহিয়াছিলেন। এখন বেশ সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে আন্তরিকতার সহিত প্রশ্ন করিলেন: আচ্ছা লালা, আমাদের পরিচয়টা কত দিনের হল?

মনে মনে হিসাব করিয়া লালাজী বলিলেন: আসছে আষাঢ়ে আট বছর পূর্ণ হবে।

স্বামীজী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন: ঠিক, ঠিক। আঁকের হিসাবে তুমি সাক্ষাৎ শুভঙ্কর; হিসেবের ভুল হবার জো নেই। আগ্রার সেনট্রাল জেলে রথযাত্রার দিনেই আমাদের আলাপ হয়েছিল, সেটা আষাঢ় মাস, মনে পড়েছে। আচ্ছা, তার পরের ঘটনাগুলো এক নিশ্বেসে বলে যাও ত ভাই, মিলিয়ে নিই।

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে তাকাইয়া এবং পরক্ষণে একটা চাপা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া লালাজী বলিলেন: বেরিলির জেল থেকে আপনাকে তখন আগ্রার জেলখানায় আনা হয়েছে। ফিরিঙ্গী জেলারের সঙ্গে তার আগেই আমার খুব মাখামাখি হয়ে গেছে; সেই ত আমার নাম রাখে—মাষ্টার হরবোলা, যেহেতু আমি হরেক ভাষার বুলি কপচাতে পারি। জেলখানায় আমার কাজ ছিল ঘানি-ঘরে তেলের টিনে মার্কা দেওয়া। জেলার সাহেব খুসি হয়ে সেখান থেকে সরিয়ে তাঁর মেয়েকে উর্দ্দু আর বাংলা শেখাবার ঘানিতে জুড়ে দিলেন। তিনিই ত আমাকে হাসতে হাসতে বললেন একদিন—মাষ্টার হরবোলা, তোমারই এক জুড়িদার এসেছে আমার জেলে। ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মাণ, ল্যাটিন—সব ভাষাতেই ওস্তাদ, ওয়াণ্ডারফুল ম্যান।

স্বামীজী এই সময় বলিলেন: ও! মনে পড়েছে—একটা কয়েদীকে নিয়ে জেলার সাহেব তখন হিমসিম খাচ্ছিলেন। তার কথা বুঝতে না পেরে সাহেব ত একবারে আগুন, আমি তখন সত্ত এসেছি, কোন্ কাজে লাগাবে ঠিক হয় নি, সাহেবের কাছে সবেমাত্র হাজির করেছে, এমন সময় ঐ কাণ্ড। আমি তখনি ওপরপড়া হয়ে বললুম—সাহেব, ও লোকটা আবল-তাবল বকছে না, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলছে। সাহেব ত অবাক্। তখন আমাকেই দোভাষী হতে হল, গোল মিটে গেল। আমিও কাজ পেয়ে গেলুম, সাহেব হুকুম দিলেন—আমার কাজ আলাদা, সাহেবকে ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখাতে হবে। সাহেবই ত তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিলে গো! বলল না—Birds of a feather flock together.

লালাজী পুনরায় আরম্ভ করিলেন: তারপর রথ-যাত্রার দিন আপনার মুখের একটা কথা শুনেই আমি আপনাকে চিনে ফেললুম, সেই যে আপনি বললেন—'রথ টানবার জন্যে ছেলে ধরতে বেরিয়েছিলুম, তারই ফলে জেলখানায় এসে ঘানি টানতে হল।'

স্বামীজী বলিলেন: কথায় আছে যে গো, যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তোমারও হয়েছিল তাই। যেই শুনলে আমি ছেলে ধরা, অমনি মেয়ের পিছনে নিজের ঘোরাঘুরির ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল, আর, তখনি মনের দুয়ারটি খুট করে খুলে দিলে।

লালাজী কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যুত্তরের ভঙ্গিতে বলিলেন: শুধু মনের দুয়ার কেন দাদাজী, জেলখানার দুয়ারটি পর্য্যন্ত খুলে দিয়েছিল এই মেয়ে-ধরার ব্যাপারী, নয় কি?

গম্ভীর মুখে স্বামীজী বলিলেন: তোমার এই হিম্মতের কথা মনে হলেই আমি চমকে উঠি। আগ্রা তোমার জন্মভূমি ব'লে তার মাটির সঙ্গে তোমার নাড়ীর যে কতখানি মাখামাখি সংযোগ ছিল—সেদিনই জেনেছিলুম। 'রিলিজ' হতে তখনো আমার দিক দিয়ে আড়াই বছর বাকি ছিল...

লালাজী বলিলেন: ছেলে নিয়ে ছিল আপনার ব্যাপার, তাই তিনটি বছরের বরাদ্দ হয়েছিল। আর মেয়ে ব্যাপারী ব'লে আমাকে দেয় পাঁচ বছরের জন্যে ঘানি-ঘরে ঠেলে। কষ্টে-সৃষ্টে একটি বছরের অভিজ্ঞতা শুধু সঞ্চয় করা হয়েছিল।

স্বামীজীর পরিপুষ্ট গোঁফের ভিতর দিয়া হাসির আভা যেন ফুটিয়া উঠিল, গলার স্বরেও তাহার রেশ লাগিল, কহিলেন: তারপর চলল ভোল বদলাবার পালা। তোমার গোঁফ-দাড়ী সব অদৃশ্য হয়ে গেল, আর যে নাস্তিক মানুষটিকে দেখলে সবাই মাকুন্দ-চোপা বলে মুখ ফিরিয়ে নিত ঘৃণায়, সেই থুথানা চুলের

জ্বলে ভরে উঠলো। নামও পাল্টাল, আশ্রম উঠল, কাজও চলল—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হল বলতে পার?

লালাজীর কণ্ঠ দিয়া তিক্ত স্বর বাহির হইল: কিছুই না। আত্মগোপন 'আর পান-ভোজন ছাড়া ভূতের বেগারই শুধু খাটা হয়েছে। আপনার মাথায় সুরু থেকেই জেদ চাপল যে, ছেলেদের শিখিয়ে পড়িয়ে এমন কিছু করে তুলবেন এ পর্য্যন্ত যা হয় নি,—কোন 'একজ্যাম্পল' পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি! শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু একটা ছেলেও খোপে টেঁকল না, আপনার পণ্ড-শ্রমই সার হ'ল। তখন যদি আমার কথা মত ছেলের বদলে মেয়ে পুষতেন, তাহলে দেখতেন তার ফল কি হ'ত।

শ্লেষের সুরে স্বামীজী বলিলেন: ফল দেখতে হ'ত না, ভোগ করবার জন্যে জেলখানায় আবার সেঁধুতে হ'ত। 'পুনর্মূষিকো ভব' গল্পের কথা মনে আছে ত?

লালাজী হাসিয়া বলিলেন: আপনি যে আজ পথ হারাচ্ছেন দাদাজী, দমিয়ে দেওয়া ত আপনার নীতি নয়। ওর চেয়ে আপনার দেবী চৌধুরাণীর 'একজ্যাম্পল' দিন, কাজে লাগবে। আমি ত জানি—ঐ মেয়েটাই আপনার আদর্শ, কিন্তু মেয়ের সম্পর্কটা অশ্লীল কি না, তাই আপনি ঐ আদর্শে এক দল ছেলে তৈরী করতে দ্রোণাচার্য্যের মতন 'প্র্যাকটিস্' সুরু করলেন।

লালাজীর শেষের কথাগুলি স্বামীজীর অচঞ্চল চিত্তটিও বুঝি ঈষৎ দুলাইয়া দিল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লালার মুখে নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিলেন: কি ভেবে এ কথা বললে? দ্রোণাচার্য্যের মতন 'প্র্যাকটিস্' করছি আমি—এ কথার মানে?

লালাজীর চোখে-মুখে বিদ্যুতের আভার মত তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। কণ্ঠস্বরও ঈষৎ বক্র করিয়া কথাটার উত্তর এই ভাবে দিলেন: হাদিশটা অবশ্য আপনার কাছেই পেয়েছিলুম। কথায় কথায় আপনিই একদিন বলেছিলেন—মহাভারতের দ্রোণাচার্য্য ছিলেন 'ইণ্টেলিজেণ্ট' পুরুষ, কাজ গুছাবার মতলবে তাঁকে রীতিমত 'প্র্যাকটিস' করতে হয়েছিল। নইলে পাড়াগাঁ থেকে হস্তিনা সহরে এসে বেছে বেছে রাজকুমারদের বল-খেলার ময়দানটির এক প্রান্তে, একটা এঁদো কূয়ার পাশে আস্তানা গাড়বেন কেন? 'প্র্যাকটিস্' থেকেই সুরু হ'ল 'পারফরমেন্স'—দিব্যি একটা 'সিন'ই তৈরী ক'রে ফেললেন। কুমারদের বলটি কূয়ার ভিতরে গড়িয়ে পড়ল, জল নেই তা'তে, ভিতরটা অন্ধকার, বলের টিকিও দেখা গেল না। বেচারীরা মুসড়ে পড়ল। এমন সময় কূয়ার কিনারায় নল-খাগড়ার জঙ্গল থেকে মুখখানা তুলে তিনি দিলেন ছেলেগুলোকে ধিক্কার—'আরে ছ্যা, খেলার বলটা কূয়ার ভিতরে পড়ে গেল বলে, না তুলেই তোমরা কিনা হাল ছেড়ে চলে যাচ্ছ?' ছেলেরা চমকে উঠল, শীর্ণকায় রুক্ষমূর্ত্তি রক্তচক্ষু এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখে। ভয়ে ভয়ে তাই বলল—'কূয়ার ভিতরটা যেমন গভীর, তেমনি অন্ধকার, বলটির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না, কি ক'রে তুলব?' আচার্য্য বললেন—'ধিক্ তোমাদের শৌর্য্যে, এটা কি এতই শক্ত কাজ?' বলতে বলতে হাতের আঙুল থেকে খুব সরু একটি আংটি খুলে টুপ করে কূয়ার ভিতরে দিলেন ফেলে। তার পর গলায় জোর দিয়ে বলে উঠলেন—'ঐটেকে পর্য্যন্ত তুলতে পারা যায়।' রাজকুমাররা ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল। কিন্তু পাগল সেখানে বসে বসেই যে খেল্ দেখালেন—তাতে তাদের চোখ গুলো কপালের দিকে ঠেলে উঠল। হাতের কাছ থেকে নল-খাগড়াগুলো পটপট করে ছিঁড়ে গায়ে-গায়ে লাগিয়ে দিলেন কূপের ভিতরে চালিয়ে। তার পরে সাপে যেমন ব্যাঙ ধরে আনে, তেমনি করেই নল-খাগড়ার মুখে উঠে এলো ছেলেদের হারানো বল আর আচার্য্যের হাতের আংটি। 'প্র্যাকটিসে'র ফলে এবার আচার্য্যের 'চান্স' খুলে গেল। যাকে বলে—আঙুল ফুলে কলাগাছ-আর কি!

স্বামীজী নিবিষ্ট চিত্তেই লালাজীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, প্রসঙ্গটি শেষ হইতেই আবেগের সুরে বলিলেন: এ গল্প আমি তোমাকে বলেছিলুম? আমি—আমি?

হাসিতে হাসিতে লালাজী উত্তর দিলেন: আপনি ছাড়া দ্রোণাচার্য্যের সত্যিকার রূপটি এমন করে কে ফোটাতে পারে বলুন? তবে আমি হয়ত জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু শান দিয়ে থাকবো; যেমন—আপনি বলেছিলেন ছেলেরা কন্দুক-ক্রীড়া করছিল, আমি সেটাকে ঘুরিয়ে বলেছি—বল খেলছিল। এই রকম কিছু অদল-বদল করিছি আর কি? তবে এর পিছনে আচার্য্য ঠাকুরের যে আসল অভিসন্ধিটি চাপা ছিল, আপনিও সেটি চেপে গিয়েছিলেন দাদাজী!

সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে স্বামীজী বলিলেন: ছেলেদের সম্পর্কে যেটুকু বলা আবশ্যক ছিল তাই বলেছিলুম। দ্রোণাচার্য্য তখনকার ছেলেদের নিয়ে একটা খুব শক্তিশালী দল তৈরী করেছিলেন, এইটিই ছিল আমার বক্তব্য। আর যদি বল তাঁর আদর্শই আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল, আমি অস্বীকার করব না।

লালাজী অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন: এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে দাদাজী, আদর্শের পিছনে উদ্দেশ্য একটা নিশ্চয়ই ছিল; দ্রোণাচার্য্যেরও, এবং আপনারও। তাছাড়া, সেটি যে নিছক নিরামিষ ব্যাপার, অর্থাৎ অহিংস্র তাও নয়। দ্রোণাচার্য্য ঠাকুরের উদ্দেশ্য ছিল—দলটিকে দিয়ে দ্রুপদ রাজাকে 'জব্দ' ক'রে অপমানের শোধ তুলবেন, আর আপনার মনটিরও তলে তলে এই ধরণের কোন উদ্দেশ্য যদি ছাই চাপা থাকে দাদাজী—

স্বামীজীর মনের অন্তস্তলটি বোধ হয় মোচড় দিয়ে উঠিছেল, কিন্তু, সবলে তাহা দমন করিয়া তিনি ক্ষিপ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন: কথায় কথায় আমরা দূরে গিয়ে পড়েছি লালা, এখন মোড় ফেরাতে হবে। তোমার কি উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তুমি কি করতে চাও সেইটেই এখন স্পষ্ট ক'রে বল। আমি এই জন্যই তোমাকে ডেকেছি। আশ্রমের আদর্শ নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে আজ গোল বাধছে, একটা বোঝা-পড়া হওয়াই ভাল।

লালাজী সপ্রতিভ ভাবেই বলিলেন: আমিও তাই চাই আর সেই কথাই বলছি; আমাদের আদর্শ বদলাতে হবে দাদাজী!

স্বামীজী: বল, কি করতে চাও?

লালাজী: দ্রোণাচার্য্যের যুগ চলে গেছে, ছেলে নিয়ে কিছু হবে না। এ-যুগে মেয়ে ছাড়া আর সবই অচল। মেয়ে নইলে সভা জমে না। ভিক্ষা মেলে না, আশ্রমের জন্যে সব খাটুনিই হয় পণ্ডশ্রম। আট বছর চেষ্টা ক'রে ত দেখলেন, একটা ছেলেও কাজে এল না, সবার তাক মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ চালাবার দিকে। কিন্তু মেয়েদের প্রকৃতি আলাদা।

স্বামীজী: ব'ল না তোমার মেয়েদের প্রকৃতির কথা। গাছে তুলে দিয়ে এরা মই কেড়ে নেয়, তারপর প'ড়ে দেহ চুর হলেও ফিরে তাকায় না।

লালাজী: মেয়েদের সম্বন্ধে এ অভিজ্ঞতা কি হাতে-কলমে সঞ্চয় করেছেন দাদাজী?

স্বামীজী: চোখে দেখেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায়। এক-এক বার ইচ্ছাও হয়েছিল অন্ততঃ একটা মেয়েকে নিজের আদর্শে গ'ড়ে তুলি। কিন্তু গড়বার মত মেয়ে ত চোখেই পড়ল না এ পর্য্যন্ত।

লালাজী: বলেন কি! চোখে পড়ে নি?

স্বামীজী: না। কল্পনায় আঁকা মেয়ের সঙ্গে কেউ মেলেনি। এই ত এক পাল মেয়ে ধরে আনলে, মেয়ের মতন মেয়ে কেউ আছে ওদের মধ্যে? সবাই রাঙা মুলো। কেঁদেই মুখ-চোখ লাল ক'রে ফেললে সব। ওদের নিয়ে দল করতে চাও?

লালাজী: আপনি কি-ধাতের মেয়ে চান, আমি তা বুঝেছি। আর তার ব্যবস্থাও করেছি। কালই আপনাকে সেই মেয়ে দেখাবো। যদি মনে ধরে, তাকেই শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন।

স্বামীজী: আর এগুলোর গতি কি হবে?

লালাজী: যখন এনেছি, কাউকে ছাড়ব না। এগুলোকে নিয়ে আমি একটা আলাদা দল গড়তে চাই। আমারও মাথার মধ্যে একটা মতলব খেলছে।

স্বামীজী: মতলবটা শুনতে পাই না?

লালাজী: এখন নয়। তবে সময় হ'লেই আপনি জানতে পারবেন।

স্বামীজী: সর্ত্ত কিছু করতে চাও?

লালাজী: নিশ্চয়। আপনি যে রকম মেয়ে চান—তেমনি 'ফায়ার-প্রুফ' খুকি একটি আপনাকে এনে দেব, আপনি তাকে গ'ড়ে-পিটে তৈরী করুন নিজের আদর্শে। আর, আমি এই মেয়েগুলিকে আমার পরিকল্পনা মত শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব। কিন্তু এখন থেকে আমাদের আশ্রমে—শম্ভু সহদেব কুবের আর মঙ্গল ছাড়া কোন পুরুষ থাকবে না, কাউকে আশ্রয় দেওয়া হবে না। এই ক'জন হচ্ছে আমাদের আশ্রমের ডালপালা, তিন কুলে কারুর কেউ নেই, এরা প্রাণ দেবে তবু এমন কাজ কিছু করবে না যাতে আপনার আমার অনিষ্ট হয়। এরা সবই জানে, তাই এদের চাই। এখন আপনি যদি এ সর্ত্তে সম্মত না থাকেন, আমাকে তাহলে আলাদা আশ্রম গড়তে হবে।

স্বামীজী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তাহার পর মৃদু স্বরে বলিলেন: তোমার সর্ত্তে সম্মতি না দিয়ে আমার উপায় নেই লালা। মাথা আমি খেলাতে পারি, কিন্তু মাথার রসদ জোগাচ্ছ তুমি। এ-যুগে প্রত্যেক ব্যাপারটির ভিত্তি হচ্ছে টাকা। আটটি বছর ধরে সেটা তুমিই সরবরাহ করে আসছ। কি ক'রে কি ভাবে যে যোগাচ্ছ, তা জানি না, জিজ্ঞাসাও করি না। কাশীর মাঠ-কোটার আশ্রম ভেঙে বৃন্দাবনের পাকা-বাড়ীতে যখন তুলে নিয়ে গেলে আমি ত দেখেই অবাক! লাখ টাকার কমে অত বড় আশ্রম-বাড়ী হতে পারে না, কি ক'রে যে হ'ল, তুমিই জান। আমি কোন দিন জানতেও চাই নি। কাজেই মতান্তর হ'লেও তোমাকে ত্যাগ করবার উপায় আমার নেই। বেশ, তোমার সর্ত্তই আমি মেনে নিলুম। তবে এর

মধ্যে কিন্তু খিঁচ রইল ঐ মেয়েটি। আমার কল্পনার সঙ্গে খাপ খায় এমন একটি মেয়ে তুমি এনে দেবে। তার পর না হয় তাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে লায়েক করে তুলতে আমার বিদ্যে-বুদ্ধির ঝুলিটা খালি করাই যাবে গো! আচ্ছা ভায়া, তুমি এখন উঠতে পার। নতুন ঝঞ্ঝাট যা ঘাড়ে চাপিয়েছ, তার জন্যে এখন দুধ-ঝিনুকের যোগাড় কর গে।—কথাগুলি শেষ করিয়াই স্বামীজী পুনরায় দর্শনের বইখানিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

লালাজী উঠিবার সময় বক্র দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না।

৪

এলাহাবাদ ষ্টেশন হইতে সহরের দিকে যাইতে বড় রাস্তাটির পার্শ্বে বিস্তীর্ণ জমির উপর নবনির্ম্মিত অট্টালিকাখানি পথচারীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। হরপ্রসাদ ঘোষ নামে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর তীর্থবাসের জন্য বহু ব্যয়ে এই নূতন বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মহাকুম্ভ উপলক্ষে গৃহস্বামী সম্প্রতি সপরিবার গৃহপ্রবেশ করিয়াছেন। বাড়ীখানির সর্ব্বাঙ্গে এখন পর্য্যন্ত উৎসবের অনেক নিদর্শন সুস্পষ্ট রহিয়াছে। হরপ্রসাদ বাবুর সুবিস্তৃত ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইতেছে বোম্বাই নগরী। বৎসরের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে সপরিবার সেখানেই অবস্থিতি করিতে হয়। তদ্ভিন্ন দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, এলাহাবাদ, মীরজাপুর, কাশী প্রভৃতি প্রাদেশিক প্রধান প্রধান সহরগুলিতেও তাঁহার বাণিজ্য-শাখা এক একখানি নিজস্ব বাটী অবলম্বন করিয়াই প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। এলাহাবাদে ইহার অভাব থাকায় সম্প্রতি তাহাও পূর্ণ হইয়াছে। গৃহিণী অনুপমার পীড়াপীড়িতে প্রয়াগের বাড়ীখানি মহাকুম্ভ সুরু হইবার পূর্ব্বেই শেষ করিবার জন্য হরপ্রসাদ বাবু হিসাবের উপর অনেকগুলি টাকা বেশী ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন। যেমন—ভাড়া-বাড়ীতে বাস করিতে অভ্যস্ত নহেন বলিয়া, ষ্টেশনের নিকট বাংলো-প্যাটার্ণের ছোটখাটো একখানি বাড়ীও তাঁহাকে তৈয়ারী করাইয়া লইতে হইয়াছে। সেই বাড়ীতে বাসা পাতিয়া নূতন বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। কাজকর্ম্ম চুকিয়া যাইবার পর উক্ত বাংলো বাড়ীখানি ভাড়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহার বারান্দায় এখন নোটিশ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, তদুপলক্ষে দুই বেলাই বিভিন্ন ভাড়াটিয়ার আনাগোনা চলিয়াছে। কিন্তু প্রচুর অর্থশালী হইলেও, সকল বিষয়েই হরপ্রসাদ বাবুর হিসাবটি যেন চুল-চেরার ব্যবস্থার মত, এতটুকু এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। একে মহামেলা, তাহাতে কত লোক কত রকমের ফন্দি লইয়াই ত প্রয়াগে মাথা মুড়াইতে আসিয়া থাকে, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ ভাল করিয়া দেখাশুনার পর সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাকে তাহাকে বাড়ী ভাড়া দিবার পাত্রই তিনি নহেন। তাই এ পর্য্যন্ত ঠিক মনের মত ভাড়াটিয়া না পাইয়া বাড়ীখানি তিনি খালি অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি ভাড়া দেন নাই। অথচ দুই বেলাই তাঁহার নূতন বসতবাটীর বৈঠকখানায় নব নব প্রার্থীদের আনাগোনা চলিতেছে এবং তিনিও ইহা কর্ত্তব্যের সামিল ভাবিয়া যথাবিহিত ব্যবস্থায় অবহিত আছেন। এই অবস্থায় একদা অপরাহ্নে তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় এক অভিনব প্রার্থীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব হইল।

বাহিরের সুপ্রশস্ত ঘরখানির মধ্যে দুই জোড়া তক্তাপোষের উপর পসারিত ফরাসে একটা স্থূল তাকিয়ায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া গৃহস্বামী সে-দিনের 'লিডার' পড়িতেছিলেন।

হরপ্রসাদ বাবু যে সুপুরুষ লোক, তাঁহার সুশ্রী সুন্দর চেহারাখানি দেখিবা মাত্রই তাহার আভাস পাওয়া যায়। গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ ব্যক্তি। মাথার চুলে এখনও পাক ধরে নাই, আগাগোড়া ছোট করিয়া ছাঁটা। মুখের নিম্নাংশ ক্ষৌরিত, ওষ্ঠের উপর সুপুষ্ট গোঁফ-জোড়াটি যেন তাঁহার পৌরুষের নিদর্শন দিতেছে। গায়ে সাদা কাপড়ের হাতকাটা জামা। গৃহখানি বিবিধ আসবাবপত্র ও বিভিন্ন আলেখ্যে সজ্জিত হইলেও গৃহস্বামীর বেশভূষায় বিলাসিতার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। চশমা লইবার বয়ঃক্রম হইলেও বিনা চশমাতেই তিনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন।

ঘরের দেওয়ালে রক্ষিত সেথ-টমাসের সুবৃহৎ ঘড়িটি একটু আগেই পর-পর চারিবার সুমিষ্ট ঝঙ্কার তুলিয়া সময়টা ঘোষণা করিয়াছে। অপরাহ্নের ম্লান রৌদ্রালোকে ঘরের সম্মুখবর্ত্তী বিস্তীর্ণ অঙ্গনটি যেন তন্দ্রাতুর, মধ্যে মধ্যে অনুকূল বায়ু-তরঙ্গে দূরবর্ত্তী মহামেলায় সমবেত অসংখ্য কণ্ঠের কল্লোল ভাসিয়া আসিয়া মেঘগর্জ্জনের মত এই জন-বিরল পল্লীটির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

ভৃত্য কানাই এই সময় যে ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া প্রভুর সম্মুখীন হইল, তাঁহার পাদুকার কর্কশ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া গৃহস্বামী কাগজ হইতে মুখ তুলিয়

চাহিলেন। দেখিলেন, অদ্ভুত আকৃতি অপরিচিত এক ব্যক্তি দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া একান্ত পরিচিতের মতই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছে। চেহারা দেখিলে লোকটির বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসর বলিয়া মনে হয়। মুখশ্রী সুন্দর ও নিখুঁত, ঘন গোঁফ-দাড়ী, দাড়ীর তলার দিকটা চোকা করিয়া ছাঁটা, নাকের গড়নটি এমন চমৎকার এবং খড়্গের মত এমনই তীক্ষ্ণ ও উন্নত যে প্রথমেই তাহা দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। সুন্দর মুখ ও টিকালো নাকটির তুলনায় চোখ দু'টি ক্ষুদ্র হইলেও এত তীক্ষ্ণ যে নীল চশমার পুরু কাচের ভিতর দিয়াও তাহার দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছিল। দেহ দীর্ঘ ও মজবুত। গায়ে কালো রঙের আচকান, মাথায় পারসী প্যাটার্নের উঁচু টুপি। হাতে চামড়ার একটা লম্বা ধরণের 'গ্ল্যাডষ্টোন' ব্যাগ।

প্রভুর সমক্ষে আগন্তুককে পৌঁছাইয়া দিয়া এবং তিনি যে ষ্টেশন সন্নিহিত বাড়ীখানি ভাড়া লইতে আসিয়াছেন সংক্ষেপে সেটি জানাইয়া কানাই চলিয়া গেল। হরপ্রসাদ বাবুর সহিত চোখোচোখি হইবা মাত্র আগন্তুকই প্রথমে পরিষ্কার বাঙ্গালায় বলিয়া উঠিলেন: মিষ্টার এইচ, পি, ঘোষকে দেখেই আমি হরপ্রসাদ ঘোষ বলে চিনতে পেরেছি—এটা কি আশ্চর্য্য হবার মত নয়?

অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষ হইতে এরূপ সম্ভাষণ ধনাঢ্য গৃহস্বামীর পক্ষে প্রীতিকর হইল না। তিক্ত কণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন: নিশ্চয়ই নয়; মিষ্টার এইচ, পি, ঘোষই যে হরপ্রসাদ ঘোষ—এ খবর অনেকেই জানে।

কৌতুকের সুরে আগন্তুক কহিলেন: আমি কিন্তু এ-ঘরে ঢোকবার আগে জানতুম না যে মিঃ এইচ, পি, ঘোষই আমার অতি পরিচিত বন্ধু হরপ্রসাদ ঘোষ ওরফে হরু।

সোজা হইয়া বসিয়া এবং দৃষ্টি উজ্জলতর করিয়া হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনার নাম কি বলুন ত—কোথা থেকে আসছেন?

পরিহাসের ভঙ্গিতে আগন্তুক বলিলেন: আসছেন সোজা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে। কিন্তু উত্তম পুরুষটা নাই বা ব্যবহার করলে! আমি সরু থেকেই মধ্যম পুরুষ চালিয়েছি। তাছাড়া, মুখখানা এক নজরে দেখেই চিনেছিলুম, এ হরু না হয়ে যায় না।—এ পর্য্যন্ত বলিয়াই চট্ করিয়া পিছন ফিরিয়া হাত বাড়াইয়া খোলা দরজার কপাট দু'টি বন্ধ করিয়া দিলেন। পরক্ষণেই ফরাসের প্রান্তদেশে হাতের ব্যাগটি রাখিয়া তাহারই সান্নিধ্যে রক্ষিত কেদারাখানির উপর বসিয়া হাসিমুখে কহিলেন: এ! এখনো আমাকে চিনতে পারলে না হরু? ধরে নিলুম মুখখানা না হয় চুলের জঙ্গলে ভরে গেছে; কিন্তু এটা ত ঠিক খাড়া হয়ে আছে—একে দেখে চিনতে পারছ না এর মালিকটিকে?—কথার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক হাতের মোটা মোটা আঙুলে তাঁহার টিকালো নাকের ডগাটি জোরে টিপিয়া উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন।

শুষ্ক হরপ্রসাদের চোখের পর্দাটিও যেন সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া গেল, ব্যগ্র কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন: তুমি কি তাহলে নাকু?

উচ্চ হাসির সহিত হাতের তালি দিয়া আগন্তুক সুর করিয়া বলিলেন: একেই বলে—সালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! নাকুর বদলে নকুল পেলুম তাক্-ডুমা-ডুম-ডুম!

হরপ্রসাদ বাবুর বুকের ভিতরে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। যে অপরিচিত মানুষটির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে চেনা-অচেনার দ্বন্দ্ব একটা চলিতেছিল, শেষের ব্যাপারে তাহার সমাধান ত হইলই, উপরন্তু পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের এক পরিচিত প্রিয়দর্শন মুখশ্রী তাহার নিবিড় শ্মশ্রু-গুম্ফের মধ্য দিয়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সহর্ষে তিনি বলিলেন: থাম বন্ধু থাম, এখনি লোকজন সব ছুটে আসবে তামাসা দেখতে। আমি চিনেছি। তবে তোমার গলার স্বর পালটালেও নাকটি পালটায় নি, ঐটেই চিনিয়ে দিলে সত্যিই তুমি নাকু। যাক, নাকু ওরফে শম্ভুনাথ বোসের কারবারটা মারা পড়লেও, সে তাহলে মরেনি। জয় জগদীশ!

শম্ভুনাথ: জাহাজ যখন ডুবেছে, ক্যাপ্টেনেরও উচিত ছিল সেই সঙ্গে ডুবে যাওয়া, ডুবেও ছিল, কিন্তু হঠাৎ ঠাঁই জলে পা লাগতে আর তলিয়ে যায়নি—কিনারা পেয়ে গেছে।

হরপ্রসাদ: কিনারায় উঠেই কি প্রয়াগে পাড়ি দেওয়া হয়েছে—মাথা না মুড়োলেও অন্ততঃ গোঁফ-দাড়াগুলো মুড়োবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয়?

শম্ভুনাথ: না বন্ধু, সে ইচ্ছা আপাততঃ নেই। মসৃণ মুখখানার উপরে চুলের এই কেয়ারীর জন্যে অনেক প্রয়াস এবং পরিশ্রম করতে হয়েছে। জাহাজ-ডুবি হবার মত উপলক্ষ কিছুই ঘটেনি, এক ধড়িবাজের পাল্লায় পড়ে এক দিনেই সর্ব্বস্বান্ত হলুম।

হরপ্রসাদ: বল কি হে?

শম্ভুনাথ : সাড়ে সাত লাখ টাকা ক্যাসে মজুত, একটা লাভজনক স্পেকুলেশান ব্যাপারের জন্যে আনিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু রাতারাতি সে টাকা লুঠ হয়ে গেল। আমার স্ত্রীকে নিয়ে তখন যমে-মানুষে টানা-টানি চলেছে। সেও চোখ বুজালো আর আমারও ভরাডুবি হ'ল। মান-মর্য্যাদা প্রভাব-প্রতিপত্তি সহায়-সম্পদ সমস্তই যেন ছায়াবাজীর মতন মিলিয়ে গেল।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হরপ্রসাদ আগন্তুকের শ্মশ্রুল মুখখানির পানে নীরবে চাহিয়া থাকিয়া জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইল। একটু পরে তিনি গাঢ় স্বরে প্রশ্ন করিলেন : ছেলে-পুলে কি ?

শম্ভুনাথ কহিলেন : সবে ধন নীলমণি একটি ছেলে ; স্ত্রীর প্রথম আর শেষ দান। চাঁদের কণার মতন ছ' বছরের ছেলেটিকে রেখে স্ত্রী ত শেষ নিশ্বাস ফেললেন, কিন্তু তার পানে চেয়ে তাকেই অবলম্বন করে দাঁড়াতে আর প্রবৃত্তি হয় নি, বুঝলে! স্ত্রীর সঞ্চিত হাজার কয়েক টাকার সঙ্গে ছেলেটাকে তার মামাদের হাতে সঁপে দিয়ে হারানো সৌভাগ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।

হরপ্রসাদ : বটে ? কিন্তু আত্মীয়রা ধরে রাখলে না তোমাকে ? আর ছেলেটার মায়া কাটিয়ে আলেয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াতে প্রাণও চাইছে ? ছেলের জন্যে মন-কেমনও করে না ?

শম্ভুনাথ : আত্মীয়দের অপরাধ নেই, আর ছেলেটার মায়া যে একেবারে কাটাতে পেরেছি তাও নয়। তবে কি জান হরু, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের চোখের উপর বাপের অক্ষমতা সুস্পষ্ট হয়ে মুখখানা তার নিচু করে দেবে—এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না বলেই অনেক ভেবে-চিন্তে এই পথটা ধরা গেছে। আত্মীয়রা জেনেছে, ধনুর্ভঙ্গ পণ আমার—নিক্ষেপ ভুলে যে ক্ষতি করে ফেলেছি তার পূরণ না করে ফিরছি না। এতে তাঁরা অখুসিও নন ; তাছাড়া ছেলেটাকে মানুষ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে টাকাটা দিয়েছি তাতে তারটা একেবারে দুঃসহ হবার কথাও নয়।

হরপ্রসাদ : বুঝেছি, ওদিকের ঝঞ্ঝাট সব কাটিয়ে এসেছ। এখন এদিককার খবরটা শুনি—যে মতলব নিয়ে ষ্টেশন-রোডের কাছে মিষ্টার এইচ পি ঘোষের পোড়ো বাংলো ভাড়া নিতে আসা হয়েছে ?

শম্ভুনাথ : এর পিছনেও একটা কাহিনী আছে হরু। শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। ভরাডুবিটা আমার কাশীতেই হয়েছিল।

হরপ্রসাদ : কাশীতে ?

শম্ভুনাথ : বছর দুই আগেকার কথা, স্ত্রীর শরীর ভেঙ্গে পড়ায় কাশীতে তাঁকে হাওয়া বদলাতে আনি। আসবার পরই স্বাস্থ্যের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হ'ল। শোনা গেল, এক সাধুর কৃপাতেই এটা সম্ভব হয়েছে। ফলে, সাধুদের 'মচ্ছব' সুরু হল কাশীর বাসায়। স্ত্রীটিও ছিলেন এমনি সাধু-বিশ্বাসী যে, গেরুয়া দেখলেই ভক্তিতে গদ-গদ হয়ে পড়তেন, ভিতরে তার যাই থাক। আর আমারো ছিল মস্ত একটা বাতিক নতুন কোন 'স্পেকু-লেশানে'র পিছনে ধাওয়া করা—চোখ বুজিয়ে টাকা ছাড়া। বরাবর জিতে এসে বুকের পাটাটা শক্ত হয়েই গিয়েছিল বোধ হয়, নতুবা কাশীতে চেঞ্জে এসে ব্যাঙ্কের সমস্ত পুঁজি নিয়ে সাড়ে সাত লাখ টাকার গিনি কিনি!

হরপ্রসাদ : গিনির ব্যাপারে কি স্পেকুলেশানটা মাথায় সেঁধিয়েছিল ?

শম্ভুনাথ : জান বোধ হয়, বছর দুই আগে গিনি একেবারে দুর্লভ হয়ে পড়ে। অথচ আজিমপুরের রাজার চাই দশ লাখ টাকার গিনি, চারিদিকে দালাল ছোটা-ছুটি করছে গিনির সন্ধানে। মুনাফাও আশ্চর্য্য রকমের। সাড়ে সাত লাখ টাকার গিনিতে পুরো আট লাখ টাকা পাবার কথা। এ দাঁও কি কোন ব্যবসাদার ছাড়তে পারে বন্ধু? এই অতি-লাভের লোভই হ'ল কাল। রাতারাতি সব গেল।

হরপ্রসাদ : স্পেকুলেশানের দশাই ত এই! যাক, গেল কি ক'রে, আর এ ব্যাপারে 'হিরো' হলেন কে ?

শম্ভুনাথ : ঐ সাধু। আমার স্ত্রী-বেচারী যার তাকতুক বা বুজরুকিতে ব্যাধির প্রথম ধাকাটা সামলে ছিলেন। আমার ধারণা—সমস্ত ব্যাপারটার কল-কাঠি সে-ই নেড়েছিল। সে সব অনেক কথা ভাই, পরে বলব। এখন শুধু এইটুকুই সংক্ষেপে শুনে রাখ—কিনারা কিছুই হয় নি, আর সেই দুঃসময়ে আমার পক্ষেও কোন তদ্বির করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাই বলে হালটিও একেবারে ছেড়ে দিই নি। ছেলেটার বিলি-ব্যবস্থার পর আবার এই বয়সে নতুন লাইনে কেঁচে গণ্ডুষ করতে হয়েছে। অর্থাৎ কি না, রীতিমত তদ্বির আর শিক্ষানবিশীর পর ইউ, পি, পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে নাম লেখাতে পেরেছি। অদৃষ্টক্রমে ঠিক সেই সময় কুম্ভমেলায় পাঠাবার জন্য সরকার মাথা-ওয়ালা জনকতক গোয়েন্দা খুঁজছিলেন, সুপারিসের জোরে তাদের মধ্যেই 'প্লেস' পাওয়া গিয়েছে। উপর-ওয়ালার নির্দেশ হচ্ছে—সন্দেহভাজন লোকদের উপর

লক্ষ্য রাখা, অপরাধের বীজাণুগুলির সন্ধান নেওয়া। এই সঙ্গে নিজের যে আসল উদ্দেশ্যটি চাপা আছে সেটি হচ্ছে —সাধুর মেলা থেকে কাশীর সেই গিনি মার্কা সাধুটিকে খুঁজে বার করা। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে তোমার বাড়ীখানা দেখেই চট করে মনে লেগে যায়। ঐখানেই নিজে 'ডেরা' পাতব স্থির করে মিষ্টার এইচ পি ঘোষের সন্ধানে আসা। এক নিশ্বাসেই আমার ইতিহাস শুনিয়ে দিলুম তোমাকে। পাল্টা শোনাবার পালা এখন তোমার।

হরপ্রসাদ: ও ত পালাচ্ছে না হে, ধীরে-সুস্থে শুনবে। জলে ত পড় নি, তা'ছাড়া বাড়ী ভাড়া করতে এসেই গোয়েন্দার দৃষ্টিতে বাড়ীর মালিককে যখন চিনে বা'র করেছ—ও সব হাঙ্গামায় যাবার দরকার না হতেও পারে।

শম্ভুনাথ: এ কথা বলবার মানে?

হরপ্রসাদ: মানে করতে হলে আরো পাঁচিশ বছর পিছিয়ে যেতে হয় বন্ধু। মনে পড়ে, আমাদের বন্ধুত্ব আর সম্প্রীতি দেখে তখন কলেজের ছেলেরা বন্ধু-যুগলের কি নাম রেখেছিল?

শম্ভুনাথ: নোজ অ্যাণ্ড রোজ। পাঁচিশ বছরের ঝড়-ঝাপটাতেও ভুলিনি। গোলাপ ফুলের মত তোমার মুখখান সুন্দর ব'লে তুমি হলে—'রোজ', আর এই নাকের দৌলতে আমি হই—'নোজ', নাম দুটো আমাদের খুব পছন্দই হয়েছিল, নয় কি হর?

হরপ্রসাদ: নিশ্চয়। তাই না আমরা সকলকে শুনিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—ছাত্র-জীবনের সম্প্রীতি আমরা কর্ম্ম-জীবনেও সমান ভাবে ধরে রাখবো। দুই বন্ধু মিলে নতুন কর্ম্মক্ষেত্র আমরা গড়ে তুলবো, ছাড়াছাড়ি আমাদের হবে না। এই না?

শম্ভুনাথ: হাঁ, ঠিক; তবে নব যৌবনের প্রতিজ্ঞার জোয়ারটি ভারি বেখাপ্পা; ভাঁটা পড়তে দেখা গেল, দুই বন্ধুর মাঝখান দিয়ে হাজার মাইলের খাদ পড়ে গেছে। একজন বসেছেন বেহারে ডেঁকে, আর একজন আসামের বাঁকে। কমলার পদছায়া পড়েছে দু'জনেরই মুখে। শুনেই দুই বন্ধু সুখী হচ্ছেন, কাজের চাপে চিঠি-পাত্তির ফুরসদও কেউ পেতেন না।

হরপ্রসাদ: কিন্তু দুই বন্ধু অন্তরের সঙ্গেই সে দিন প্রতিজ্ঞা করেছিল বলেই পাঁচিশ বছর পরে হাজার মাইলের খাদ তার ব্যবধান ঘুচিয়ে এ ভাবে যোগসূত্র রচে দিলে। পাঁচিশ বছর পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞাই আজ সত্য আর সার্থক হচ্ছে হে,—এবার দুই বন্ধুতেই একসঙ্গে পাড়ি দেওয়া যাবে। অর্থাৎ তোমাকে আমার এখানকার কারবারের পার্টনার করে নিয়ে আমাদের প্রতিজ্ঞাটিকে সার্থক করব।

শম্ভুনাথ: দেখছি তোমার স্বভাব এখনো বদলায়নি, তেমনি খেয়ালীই আছ হরু।

হরপ্রসাদ: না, খেয়ালী হলে আমি কখনই ব্যবসায়ে এ ভাবে সাফল্য লাভ করতে পারতুম না। তবে আমাকে হিসেবি বলতে পার। কেন না, হিসাব না করে আমি কিছুই করি না।

শম্ভুনাথ: কিন্তু পাঁচিশ বছর পূর্ব্বের একটা প্রতিজ্ঞা-সূত্র ধরে—তুমি যে আমার মতন কর্ম্ম-জীবনে আন্‌সাকসেসফুল এক বন্ধুকে তোমার বিজনেসের পার্টনার করবে বললে, একে খেয়াল ছাড়া কি বলব?

হরপ্রসাদ: তুমি ভাই নিজেই খেয়ালী মানুষ, তাই এরই মধ্যে আমি যে হিসেব করেই কথাটা বলেছি, তুমি সেটা বুঝতে পারনি। কিন্তু বুঝতে বিলম্ব হবে না।

শম্ভুনাথ: ও-সব বোঝা-বুঝির ব্যাপার এখন থাকুক, আগে তোমার সংসারের খবরটি দাও, শুনে আশ্বস্ত হই।

হরপ্রসাদ: তুমি ত জান ভাই, ভগবান সব সুখ কাউকে সমান মেপে দেন না। ঐশ্বর্য্য দিয়েছেন, কিন্তু ভোগ করবার লোক কই? তিনটি মেয়ে নিয়েই সংসার। ছেলে হয়নি ব'লে মেয়ে তিনটিকেই ছেলের মত করে স্বামি-স্ত্রী মানুষ করেছি। বড় আর মেজটির বিয়ে হয়ে গেছে, জামাই দুটিকে কাছে রেখে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছি, তারাই এখন কারবার দেখে। ছোটটি বছর পাঁচেকের। আচ্ছা, তোমার ছেলেটিও এত দিনে আটে পড়েছে নয়?

শম্ভুনাথ: কি করে জানলে?

হরপ্রসাদ: কেন, হিসেব করে। লোকের কথা শোনবার সময় আমি যেমন হিসেব করে শুনি, তেমনি হিসেব করেই কথা বলি। এটা আমার অভ্যাসের মতন হয়ে গেছে! তুমি প্রথমেই বললে না, চাঁদের কণার মত দু'বছরের খোকাটিকে রেখে তোমার স্ত্রী শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তারপর দুটো বছর ধরে নাটা-ঝাপটা খাবার পর ত তুমি গোয়েন্দা হয়ে বেরিয়েছ হে! তাহলে তোমার ছেলের বয়স আটের কম কিছুতেই হতে পারে না।

শম্ভুনাথ: না, তুমি দেখছি সত্যিই হিসেবি লোক, আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম।

হরপ্রসাদ: আমাকে ভুল বুঝলেও, নিজে ত এখন বুঝতে পারছ যে বয়সের দিক দিয়ে দুটিতে মিলবে ভাল?

শম্ভুনাথ : বছর তিনেক আগে হলে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করতুম।

হরপ্রসাদ : তার মানে?

শম্ভুনাথ : এত বড় হিসেবি মানুষ হয়েও মানে বুঝছ না বন্ধু? আমার মত সর্ব্বহারার ছেলের সঙ্গে তোমার মত ধনপতির মেয়ের নামটা এ ভাবে তোলাটাই যে ঠাট্টার মত মনে হচ্ছে!

হরপ্রসাদ : বিলক্ষণ! দুনিয়ায় অর্থ টাই কি সব চেয়ে বড় শম্ভু? তুমি শুনলে অবাক হবে, যে দুটি ছেলে আমার জামাই হয়েছে, তারা কেউ বড়লোকের ছেলে নয়। বেছে-বেছে স্বভাব আর শিক্ষাটুকু যাচাই করে গরীবের ছেলেকেই আমি ধ'রে এনেছি। তাছাড়া, তোমারো এদিন থাকবে না, আমি বলছি—সম্বৎসরের মধ্যেই তুমিও লাল হয়ে যাবে হে! এখন আমার হিসেব মিলিয়ে নাও বন্ধু—শুধু খেয়ালের ঝোঁকে তোমাকে পার্টনার করবার প্রতিশ্রুতি দিই নি। আমার ছোট খুকিটিকে দেখনি ত, দেখলে কিন্তু তোমার চোখে পলক পড়বে না, বলতেই হবে—সব দিক দিয়ে অপূর্ব্ব মেয়ে।

তখনই ভৃত্য কানাইয়ের ডাক পড়িল। কিন্তু তাহার আসিবার পূর্ব্বেই গার্হস্থ্যধর্ম্মের ত্রুটিটুকু প্রচণ্ড আঘাত দিল। অপরাধীর মত বিচলিত ও অনুতপ্ত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন : ছি, ছি, ছি, তোমাকে পেয়ে নানা কথায় আসল ব্যাপারটাই ভুলে গেছি হে, পরের মতন ঠায় বসিয়ে রেখেছি। ট্রেণে এসেছ, হাত-মুখ ধোয়া হল না, আমার নজরই পড়েনি এদিকে—

শম্ভুনাথ বাধা দিয়া বলিলেন : সে সব পরে হবে। আগে ত তোমার মেয়েকে আনাও দেখি। মুখ-হাত ধোয়া, আর মুখে কিছু দেওয়া—সে-সব বাড়ীর ভিতরে গিয়ে একসঙ্গেই সারা হবে।

রুদ্ধ দরজা ঠেলিয়া কুণ্ঠিত ভাবে ভৃত্য কানাই প্রবেশ করিতেই হরপ্রসাদ বলিলেন : ছোট দিদিমণিকে নিয়ে আয় এখনি, আর বাড়ীতে বল যে—রেণুর এক কাকা-বাবু এসেছেন। আমাদের জলখাবার সাজাতে বল ওপরের ঘরে, একসঙ্গেই আমরা খাব!

কানাই চলিয়া গেলে শম্ভুনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন : মেয়ের নাম বুঝি রেণু?

হরপ্রসাদ কহিলেন : ওর মা-ই পছন্দ করে ঐ নামটি রাখেন। এই যে তার ফটো, দিন কয়েক হল তোলা হয়েছে।

একটু ঝুঁকিয়া ফরাসের সন্নিহিত টিপয় হইতে ব্রোমাইড-করা ফটোখানি তুলিয়া হরপ্রসাদ বাবু বন্ধুর দিকে আগাইয়া দিয়া কহিলেন : আসলের আগে নকলটাই দেখ; কেমন পছন্দ হয়? তোমার ছেলের সঙ্গে মানাবে ত?

শম্ভুনাথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফটোখানি দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট স্বরে নির্গত হইল : 'বাঃ!' পরক্ষণে জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গাঢ় স্বরে তিনি বলিয়া ফেলিলেন : আজ যদি আমার স্ত্রী থাকতেন। খোকার রূপ দেখে প্রায়ই তিনি বলতেন—'ছেলে যেমন আমার সোনার চাঁদ, তেমনি চাঁদের কণাই একটি আনবো।' সত্যি, তোমার মেয়ে চাঁদের কণাই বটে!

মুগ্ধ বন্ধুর মুখের পানে চাহিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন : তাহলে তোমার ছেলেও সোনার চাঁদ বল?

মৃদু স্বরে শম্ভুনাথ উত্তর দিলেন : মুখে কি বলব বল? হ্যাঁ, তবে অতীতের পাট সব ছেড়ে এলেও একটি নিদর্শন সঙ্গেই এনেছি, এই ব্যাগেই আছে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বে রক্ষিত চামড়ার ব্যাগটি খুলিয়া শম্ভুনাথ তাহার ভিতর হইতে পূর্ব্ব ফটোখানির অনুরূপ আকৃতির একখানি ফটো বাহির করিয়া বন্ধুর হাতে দিলেন।

পরমাগ্রহে ফটোখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চোখ না তুলিয়াই আশ্চর্য্য হইয়া হরপ্রসাদ কহিলেন : তোমার ছেলের ফটো? হ্যাঁ, এত সুন্দর! বোম্বাই ত রূপের শহর, সেখানেও এ-রকম চেহারার ছেলে কমই নজরে পড়ে। ছেলের নাম কি হে?

শম্ভুনাথ কহিলেন : নরনারায়ণ। নামকরণটি ছেলের মা-ই করেছিলেন।

হরপ্রসাদ বন্ধুর মুখের দিকে একবার কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন : খাসা নাম, নরনারায়ণই বটে! কিন্তু এখানি এখন ফেরৎ পাচ্ছ না বন্ধু, এই টিপয়েই পাশাপাশি আপাতত থাকুক।—বলিয়াই দুইখানি ফটো হস্তগত করিয়া টিপয়টির উপর সাজাইতে বসিলেন।

শম্ভুনাথ সহাস্যে কহিলেন : কিন্তু এর পরে যেন 'রিটার্ণড্ উইথ থ্যাঙ্কস' না হয়।

মুখখানি শক্ত করিয়া অথচ দৃঢ় কণ্ঠে হরপ্রসাদ কথাটার উত্তরে বলিলেন : মুখের কথা আমার কোনদিন পাল্টায় নি শম্ভু, তাহলে আমার কারবারের বনেদটা এমন শক্ত হত না। আমি জোর-গলায় বলছি : এই ছেলেই রেণুর বর।

টিক—টিক—টিক। জানালার সার্সির উপর হইতে একটা টিকটিকি ডাকিয়া উঠিল। হর্ষ-বিস্ময়ে দুই বন্ধু দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। দুইটি অপূর্ব্ব

বালক-বালিকার সম-আয়তনের দুইখানি আলেখ্য টিপয়টির উপর পাশাপাশি রাখিয়া উল্লাসের স্বরে হরপ্রসাদ কহিলেন: তোফা মানিয়েছে দু'টিতে, দেখ শম্ভু—চেয়ে দেখ!

পরক্ষণে কানাই সবেগে কক্ষমধ্যে আসিয়া সরোদনে সংবাদ দিল: সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু, ছোট দিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না: গিন্নীমা কাঁদতে লেগেছেন, আপনি শীগ্‌গির ভেতরে চলুন।

দুই বন্ধুই উদ্বিগ্ন ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু উঠিবা মাত্র শম্ভুনাথের মাথাটি হঠাৎ এমনি ঘুরিয়া গেল যে, টাল সামলাইতে না পারিয়া তিনি কাত হইয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গেলেন। হরপ্রসাদের চীৎকারে তৎক্ষণাৎ লোকজন সব ছুটিয়া আসিল। তাহাদের সাহায্যে শম্ভুনাথের সংজ্ঞাহীন দেহটি তুলিয়া সেই ঘরেই আস্তৃত ফরাসের উপর সন্তর্পণে রাখা হইল। হরপ্রসাদ আর বাহিরে না গিয়া বন্ধুর শিয়রে বসিলেন। কানাইকে ডাকিয়া নির্দ্দেশ দিলেন: গাড়ী নিয়ে মুখুজ্জ্যে সাহেবের বাংলোয় যাও। বাংলোয় না থাকেন হাসপাতালে যাবে। তাঁকে আনা চাই-ই।

দ্বারোয়ান আতরসিং ও রঘুসিংকে হুকুম দিলেন: খুকির সন্ধানে দু'জনে বেরোও, এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে খুঁজে আনা চাই।

বাড়ীর সর্ব্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যের একটা রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল, চারিদিকে লোক ছুটিল। সবার মুখে এক কথা—রেণু, রেণু!

৫

হরপ্রসাদ বাবুর বাড়ীতে যখন এই বিভ্রাট চলিয়াছে, সেই সময় সিদ্ধাশ্রমের সাধুজীর কক্ষে লালাজী অপূর্ব্ব এক বালিকার হাত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন। শম্ভু আসিয়া পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়ায়, স্বামীজী গ্রন্থখানি মুড়িয়া রাখিয়া বোধ হয় প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন। মেয়েটির মুখখানির উপর দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার সমস্ত দেহটি যেন মোচড় দিয়া উঠিল, বালিকার মুখখানির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এই মেয়ে? এরই কথা বলেছিলে তুমি! কিন্তু এ যে···

স্বামীজীর ব্যগ্র কণ্ঠের চঞ্চল স্বর লালার চিত্তেও একটা প্রচণ্ড দোলা দিল। স্বামীজী সম্ভবত নিজের দুর্ব্বলতাটুকু উপলব্ধি করিয়া বাক্য সংযত করিলেন, দেহটিকে আরও সোজা করিয়া প্রতিমার মত দণ্ডায়মান মেয়েটির পানে বদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

লালাজী এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন: এ কি আপনার চেনা?

চমকিয়া স্বামীজী বলিলেন: না-না-না, এ নয়; তবে—এই মুখ, ঐ চোখ, ঐ নাক, ঐ চুল—এখনো আমার চোখের ওপর যেন ভাসছে। কোথা থেকে একে আনলে লালা?

কিন্তু লালাকে কোন উত্তর দিবার অবসর না দিয়া মেয়েটি তাহার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়া বিরক্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল: কই, বাঘ ত দেখালে না?

বালিকার মধুর কণ্ঠস্বরও বুঝি স্বামীজীর কানে পুরাতন কোন পরিচিত কণ্ঠের স্বরের মত মৃদু ঝঙ্কার দিল। কিন্তু এবার তিনি সবলে চিত্তকে সংযত করিয়া লালাজীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাইতেই লালাজী তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন: বাঘ দেখাব বলেই একে···

চোখের ইঙ্গিতে লালাকে এখানেই নিরস্ত করিয়া স্বামীজী মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: বাঘ খুঁজছ খুকী, বাঘ?

বালিকা এই গম্ভীর মূর্ত্তি দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফধারী মানুষটির দিকে মুখখানা ফিরাইয়া বলিল: হ্যাঁ। বাঘ দেখাবে বলেই ত সেই মিন্‌সেটা আমাকে নিয়ে এসেছে এখানে।

লালাজী হাসিয়া কহিলেন: সে ঠিক এনেছে, বাঘের ঘরেই ত তুমি এসেছ।

বালিকা এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল: কেবলি ত বাঘ বাঘ করছ, কিন্তু বাঘ কোথায়?

কথাটা বলিয়াই সে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল: তুমি দেখাবে আমাকে বাঘ?

স্বামীজীর চোখ দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিল, শ্মশ্রুল মুখখানাতেও বুঝি তাহার আলো পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর স্বর বাহির হইল: দেখাবো। কিন্তু তুমি কি সত্যিই এখনো বাঘ দেখতে পাওনি?

দৃঢ় স্বরে বালিকা কহিল: না।

স্বামীজী: দেখতে পাচ্ছ না?

বালিকা: না। বাঘ কোথায়?

স্বামীজী: ভয় পাবে না?

বালিকা: না। তাহলে আসি? বল না বাঘ কোথায়—আমি দেখবো?

নিজের বড় বড় দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি যতদূর সম্ভব দীপ্ত করিয়া স্বামীজী বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন: বাঘ—আমি,—হুম!

শেষের শব্দটি যেন ব্যাঘ্র-গর্জ্জনের মতই ভীষণ শুনাইল। কিন্তু মুখে তাচ্ছিল্যের একটা ভঙ্গি করিয়া বালিকা খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর কহিল: দূর! তুমি ত সাধু। বাঘের ছালের ওপর বসে আছ বলেই বাঘ হয়ে গেলে! যাও, তোমাদের আর বাঘ দেখাতে হবে না, আমি বাড়ী যাব, আমাকে নিয়ে চলো।

স্বামীজী বলিলেন: কি হবে বাড়ী গিয়ে, তুমি এখানেই থাকবে।

অনুপম ভুরু দুটি বাঁকাইয়া বালিকা কহিল: ব'য়ে গেছে আমার এখানে থাকতে। আমি বাড়ী যাবো: কি সুখে এখানে থাকবো?

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন: কেন, আমি কি মন্দ?

মুখখানি বিকৃত করিয়া বালিকা উত্তর দিল: তুমি ত একটা সঙ। আচ্ছা, তোমার ঐ দাড়িটাও ঝুটো ত?

স্বামীজীর বিস্ময় বুঝি ক্রমশঃই সীমা অতিক্রম করিতেছিল। প্রথম দর্শনেই যাহার আকৃতি তাঁহার চিত্ত-পটে অঙ্কিত কোন চিত্রের সাদৃশ্যে চকিত হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার কণ্ঠনিঃসৃত তীক্ষ্ণ-মধুর বাণী দূর অতীতের কোন অপরিচিত সুরের রেশটি নূতন করিয়া শ্রবণ-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়াছিল, যাহার চলনের ভঙ্গি পারিপার্শ্বিক বিসদৃশ অবস্থার মধ্যেও চিত্তগত স্বাভাবিক নির্ভীকতার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া তাঁহার অন্তর্নিবেশিত আলেখ্যটির প্রচ্ছদপট উদ্ঘাটিত করিতে চাহিতেছে, তাহাকে তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, কোন্ পর্য্যায়ে আনিয়া আলাপ করিবেন তাহার সঙ্গে? এই সাদৃশ্যের মূলে কোন্ রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কে জানে!

বালিকা কণ্ঠস্বর আরো তীক্ষ্ণ করিয়া কহিল: চুপ করে রইলে যে। তাহলে তোমার দাড়ীটাও ঝুটো ত?

স্বামীজীকে এবার উত্তর দিতে হইল; কহিলেন: ঝুটো কেন হবে, আসল।

আবার মুখখানা বিকৃত করিয়া বালিকা কহিল: আসল না ছাই!

লালাজী কহিলেন: দাড়ী কখন ছাই হয়?

বালিকা তাহার অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানি তুলিয়া বলিল: পুড়িয়ে দিলেই ত ছাই হয়ে যায়। তা বুঝি জান না, সেদিন একটা সাধু এসেছিল আমাদের বাড়ীতে; দিব্যি ত খেলে-দেলে, তার পরে করলে কি জান—চুপি চুপি দাড়ীটা খুলে আবার মুখে বসিয়ে দিলে: আমি যে ঘরের কোণটিতে বসে আছি তা ত আর জানে না, তখুনি ধরা পড়ে গেল। তারপর যে খোয়ার তার কি আর বলবো। কানাই ত দাড়ীটা কেড়ে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর মাথার জটা ধরে টানাটানি—সেগুলোও ঝুটো। লোকটা'কে মেরেই ফেলতো, মা এসে বাঁচিয়ে দিলে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া স্বামীজী তাহার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। এই সময় সহসা প্রশ্ন করিলেন: তোমার মা আছে?

বালিকা তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া নিজেই প্রশ্ন করিল: তোমার দাড়ীটাও ত সেই লোকটার মতন ঝুটো···আচ্ছা দেখি। কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিদ্যুদ্বেগে স্বামীজীর সম্মুখে গিয়া দুই হাতে তাঁহার দাড়ী ধরিয়া সজোরে টান দিল। স্বামীজী প্রত্যাশা করেন নাই যে মেয়েটি সত্যই এতটা বাড়াবাড়ি করিবে। এই বয়সের বালিকার হাতের টানে তাঁহার দৈহিক শক্তি যে সামান্যটুকু ধরা পড়িল তাহাতে বিমুগ্ধ হইলেও তাঁহার শক্তান্তরালের আর্ত্তস্বর বাহির হইল: উঃ!

লালাজী আচম্বিতে সজোরে বালিকার হাত দুটি চাপিয়া দাড়ি হইতে ছাড়াইয়া দিলেন এবং পরক্ষণে তাহার এই স্পর্দ্ধার জন্য অপ্রত্যাশিত আনন্দযুক্ত কান্তি ধরিতেই বালিকা দুই চোখ পাকাইয়া তর্জনের সুরে কহিল: খবরদার বলছি।

স্বামীজী হাসির সুরে বলিয়া উঠিলেন: থামো লালা, থামো। আমি খুব খুসি হয়েছি, খাসা মেয়ে তুমি এনেছ। যা চেয়েছিলাম, তার চেয়ে অনেক—উঃ, অপরূপ অদ্ভুত।

কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া স্বামীজী স্নেহের সুরে বলিলেন: দেখলে ত খুকী, দাড়ি আমার নকল না, আসল; আর আমি সঙ নই মানুষ।

বালিকা পূর্ব্ববৎ নির্ভীক কণ্ঠেই কহিল: তুমি মানুষ হলেও সঙ। রামলীলায় লোকেরা ত এমনি সঙ সাজে। আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার দাড়ার যা গন্ধ, মা গো!

স্বামীজী পুনরায় চমকাইয়া উঠিলেন। ঠিক এই ভাবে আর এক দিন আর একজন এমনই করিয়াই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে তাঁহার রুচির বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর দুইটি যুগ কাল-সমুদ্রে তলাইয়া গিয়াছে, এত কাল পরে কে আসিল তাঁহার রুচির উপর পুনরায় সংস্কারের আঘাত দিতে? সেদিন গ্রাহ্য করেন নাই, আজ কিন্তু অগ্রাহ্য করিবার কোন শক্তি তাঁহার বিরাট বপুর কোন অংশে কি সচেতন আছে? ভাবার্দ্র কণ্ঠে স্বামীজী কহিলেন:—দাড়ী যদি তোমার পছন্দ না হয়, দাড়ী এর পর রাখবই না!

বালিকা তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অস্থির ভাবে কহিল: ছেড়ে দাও আমাকে, আমি বাড়ী যাব।

লালাজী এই সময় কহিলেন: বাঘ না দেখেই যাবে?

পটলচেরা দুটি অপূর্ব্ব আয়ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া লালাজীর পানে চাহিয়া বালিকা কহিল: তোমরা সবাই মিথ্যুক, বাঘ আছে না ছাই আছে, খালি খালি আমাকে ভুলিয়ে এনেছ, আমি বাঘ দেখতে চাই না।—বলিয়াই সে স্বামীজীর হাত ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিল

কিন্তু স্বামীজী তাহাকে সে সুযোগ না দিয়া অতিশয় কোমল স্বরে কহিলেন: ওরা মিথ্যুক হলেও আমি কিন্তু মিথ্যুক হব না, আমি বাঘ দেখা ত ছোট কথা, তোমাকে বাঘের পিঠে চড়িয়ে তবে ছাড়ব।

বালিকা এবার হাসিয়া ফেলিল, তাহার এই বিচিত্র হাসির ঝলকটিও স্বামীজীকে বিহ্বল করিয়া দিল। বালিকা কহিল: আমি কি জগদ্ধাত্রী ঠাকুর যে বাঘের পিঠে চড়বো?

দৃঢ়স্বরে স্বামীজী কহিলেন: হ্যাঁ, আমি তোমাকে জগদ্ধাত্রী তৈরী করব, দেখো।

বালিকা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বামীজী তাহার বিস্ফারিত চোখ দু'টির উপর নিজের বিচিত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন: তোমার সঙ্গে এত কথা হল, এমন ভাব হয়ে গেল, কিন্তু নামটি ত শোনা হল না। তোমার নামটি বলবে না?

বালিকা কহিল: কেন বার বার নাম? তুমি কি নাম জিজ্ঞাসা করেছিলে? আমার নাম রেণু।

স্বামীজী: রেণু! বাঃ—মিলে যাচ্ছে ত, তার মিল নাম—অনু!

বালিকা: কার কথা বলছ? ও নাম ত আমার মায়ের গো। জান না বুঝি, আমার মায়ের নাম—শ্রীমতী অনুপমা।

স্বামীজী: অনুপমা! তুমি অনুপমার কন্যা? খুকি, খুকি, না না—রেণু-রেণু, হ্যাঁ, আর তোমার বাবার নাম—বল বল, কি তার নাম?

বালিকা: কেন, আমার বাবার নাম শোননি, সবাই ত জানে। তাঁর নাম—শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ ঘোষ।

যে দুটি হাত দিয়া বালিকাকে নিবিড় ভাবে এতক্ষণ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন স্বামীজী, সেই দুইখানি হাত সবলে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গাঢ় স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন: 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' সিদ্ধাশ্রম এবার সিদ্ধপীঠ হবে লালা, আর চিন্তা নেই। সিদ্ধির বীজমন্ত্র আমি পেয়েছি তোমারই কল্যাণে।

পরক্ষণে বালিকাটির উদ্দেশে হাত বাড়াইতেই দেখিলেন, বালিকা ইতিমধ্যে মুক্তি পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং স্বামীজীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথাগুলির অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে।

স্বামীজীকেও অগত্যা উঠিতে হইল এবং উঠিতে উঠিতেই দুই চোখ দিয়া হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝলক তুলিয়া কহিলেন: সঙ দেখছ, নয়? কিন্তু এর পর তোমাকেও সঙ সাজতে হবে, সব যাবে উল্টে। রেণু ব'লে পৃথিবীতে কেউ থাকবে না।

বালিকা মুখ ফিরাইয়া লালাজীর পানে তাকাইয়া কহিল: আমি বাড়ী যাব। যদি ভাল চাও ত, আমাকে বাড়ীতে নিয়ে চল বলছি।

স্বামীজী নিকটে আসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বিচিত্র স্বরে কহিলেন: কিছু ত খাও আগে, তার পরেই ঘুমুবে। ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর বাড়ীর কথা মনে থাকবে না।

বলিতে বলিতেই তিনি সহসা বালিকাকে সবলে ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। কিন্তু বালিকা এজন্য প্রস্তুত ছিল না এবং তাঁহার স্নেহবন্ধনে ধরা দিতেও চাহিল না, হাত-পা নাড়িয়া চীৎকার তুলিল: বাড়ী যাব, আমি বাড়ী যাবো।—ঠিক এই সময় হরপ্রসাদ বাবুর অনুচরবর্গ প্রভুকন্যার অনুসন্ধানে সমগ্র প্রয়াগ সহর তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছিল।

৬

একুশ দিনের পর শম্ভুনাথ সংজ্ঞা পাইলেন, কিন্তু স্মৃতি ও বোধশক্তি হারাইয়া মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি এক অদ্ভুত জন্তুরূপে এই শোকার্ত্ত পরিবারটিকে রীতিমত ভয়ার্ত্ত করিয়া তুলিলেন। দীর্ঘ নিদ্রার পর সহসা জাগ্রত হইয়া তিনি যেন এক অপরিচিত জগতে আসিয়া পড়িয়াছেন। সেখানে সবাই নূতন, পূর্ব্ব-স্মৃতির কোন কিছুরই যেন কিছুমাত্র যোগাযোগ নাই। কাহারও কথা তিনি বুঝিতে পারেন না, নিজেও মুখভঙ্গী করিয়া যাহা বুঝাইতে চান, অন্যের পক্ষে তাহা দুর্ব্বোধ্য। এই দীর্ঘ একুশটি দিন ধরিয়া হরপ্রসাদের শান্তির সংসারে দুর্ভোগের যেন তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। যে মেয়েটির অপূর্ব্ব রূপের আলোকে এবং তাহার অনন্য-সাধারণ প্রতিভার ঝলকে সমগ্র বাড়ীখানি ঝলমল করিত, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। পাঁচ বছর

বয়সেই অতিরিক্ত বাড়ন্ত ও দুরন্ত হইয়া এবং আশঙ্কার গণ্ডি কাটাইয়া যে কিশোরীদের সহিত পাল্লা দিয়া খেলাধূলা করিত, গায়ের জোরে স্পষ্ট কথার তোড়ে প্রত্যেককে নাকাল করিয়া ছাড়িত, আর এইগুলিই প্রধান আকর্ষণরূপে পরিজনদিগকে সর্ব্বদা তটস্থ করিয়া রাখিত, তাহার অভাবে সমস্তই যেন মুসড়াইয়া পড়িয়াছে। আর সে কল-হাসির উচ্ছ্বাস উঠে না, বেণুকে সামলাইবার জন্য তাড়াহুড়াও নাই, বালক-বালিকাদের ভিতর হইতে বেণুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেও আর কেহ ছুটিয়া আসে না, সব নিস্তব্ধ। ছোট একটি বালিকার যে এতখানি প্রতাপ ও প্রভাব বাড়ীখানিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপস্থিতিতে কেহ বুঝি উপলব্ধি করিতে পারে নাই, আজ যেন সব ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

বেণুর মা অনুপমাও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। কোলের এই মেয়েটির আশ্চর্য্য রকমের সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া তাঁহার বুকের ভিতর যেন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিত, মেয়েটির মুখের কথা সবাইকে যখন থ করিয়া দিত, তিনি তখন গালে হাত দিয়া ভাবিতেন—এ মেয়ে কি বাঁচবে ব'লে এসেছে, আমি কি ওকে ধরে রাখতে পারবো?

কাজেই, কিছুক্ষণ মেয়েকে দেখিতে না পাইলে মায়ের মন চঞ্চল হইয়া উঠিত, তখনই চাকর দাসীদের উপর তাড়া দিতেন, কখন বা নিজেই ছুটিতেন—মেয়ে কোথায় গিয়াছে, কি করিতেছে, তাহার খবর লইতে। মায়ের এই সতর্কতা দেখিয়া মেয়ে হাসিয়া বলিত,—মা যেন কি? একটু যদি চোখের আড়াল হয়েছি, আর রক্ষে নেই—অমনি বেণু, বেণু!

মা দুই হাতে মেয়েকে বুকে তুলিয়া আদর করিয়া বলিতেন—আগে বড় হ, তখন বুঝবি এর মর্ম্ম। তুই যখন মা হ'বি, কোলে তোর এমনি মেয়ে হবে, তুইও এমনি করেই হেদোবি।

মেয়ে অমনি মুখখানা মচকাইয়া ভুরু দু'টি নাচাইয়া বলিত—হুঁ, আমি সেই মেয়ে কি না? ও-সব বাজে কথা ব'ল না, বাপু!

এই ভাবে যখন-তখন মায়ের সঙ্গে মেয়ের কত কথাই হইত। মেয়ের কচি মুখের পাকা কথায় মায়ের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠিত, আর সেই সঙ্গে একটা অজানা আশঙ্কাও যেন আস্তে আস্তে উঁকি দিত।

সেই মেয়েকে হারাইয়া অনুপমার অবস্থা যে কি রকম শোচনীয় হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। একুশ দিনেই তাঁহার বয়স যেন একুশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। নিখুঁত রূপ ও অপরূপ সৌন্দর্য্য অবিশ্রান্ত বারিপাতে বিপর্য্যস্ত স্থলপদ্মের মত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। সময়ে আহার নাই, চোখের পাতায় নিদ্রার ছায়া পড়ে না, সমাধানহীন একটা দুশ্চিন্তা তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছে।—কোথায় গেল তাহার চোখের মানিকটি, কে লইয়া গেল, কোথায় গিয়া লুকাইয়া আছে, কি করিতেছে, আর কি তাহাকে চোখেও দেখিতে পাইবেন না, কি পাপে এত বড় শাস্তি তিনি পাইলেন? এমনই কত প্রশ্নই পর পর মনের মধ্যে উঠিতে থাকে, সেই সঙ্গে তীব্র একটা বেদনায় সারা দেহ-মন মোচড় দিয়া উঠে।

গৃহস্বামী হরপ্রসাদ বড় সংযমী পুরুষ, মরণাপন্ন বন্ধুর দিকে চাহিয়া তিনি এ বেদনা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের পরিচিত বন্ধুর জন্য তিনি চিকিৎসার যে আয়োজন করিলেন তাহা পরিচিত ও অপরিচিত সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

শম্ভুনাথ যেদিন প্রথম চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, হরপ্রসাদের মনে হইল তাঁহার বিপুল অর্থব্যয় এবং চিকিৎসকদের প্রচুর প্রয়াস সার্থক হইয়াছে। নিরুদ্দিষ্টা কন্যার সন্ধান পাইলেও তিনি বোধ হয় এতটা তৃপ্তি পাইতেন না। কিন্তু পরে যখন প্রকাশ পাইল যে, বন্ধুর স্বাভাবিক বোধশক্তির সহিত পূর্ব্বস্মৃতি সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া প্রাণশক্তিটুকু শুধু তাঁহার জড়-দেহটিকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং চিকিৎসকগণও যখন এক-বাক্যে জানাইলেন, এই ভাবেই তাঁহাকে জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে, তখন হরপ্রসাদ আর্ত্তস্বরে না বলিয়া পারিলেন না—'তার চেয়ে কেন একে তুলে নিলে না, ভগবান!'

তথাপি তিনি একেবারে হাল ছাড়িয়া না দিয়া বন্ধুর আরোগ্যের আশায় বহুব্যয়সাধ্য বৈদ্যুতিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। অল্পদিনেই তাহাতে আশ্চর্য্য রকম ফলও দেখা গেল। শম্ভুনাথের মুখে বাণী ফুটিল, তবে তাহা সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নহে, একটি মাত্র একাক্ষরযুক্ত শব্দ তাঁহার মুখ দিয়া যেন আর্ত্তনাদের মত বাহির হইল; শব্দটি হইতেছে—রে!

হরপ্রসাদ ভাবিলেন, মুখ দিয়া কিছু যখন বাহির হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থাই ফিরিয়া আসিবে। মুখ ক্রমশঃ মুখর হইল বটে, কিন্তু মুখের ঐ শব্দটির কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, অর্থাৎ রে ভিন্ন যে অন্য কোন শব্দ আছে—সে সম্বন্ধে শম্ভুনাথ যেন একেবারে অজ্ঞ। তাঁহার কণ্ঠের শক্তি যতই বাড়িতে

লাগিল, এই একই শব্দটি সেই অনুপাতে পুষ্ট হইয়া সকলকেই যেন আতঙ্কিত করিয়া তুলিল। প্রায় সর্ব্বক্ষণই তাঁহার কণ্ঠ দিয়া ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল—রে—রে—রে!

ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকৃতিও যেন অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে, তিনি যেন কি একটা হারানো জিনিস খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন—জিনিসটি যেন গৃহমধ্যেই কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এখন এই মানুষটিকে দেখিলেও যেন কষ্ট হয়। পূর্ব্বের সেই সুন্দর কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই হইয়াছে! ক্ষৌরকর্ম স্পর্শে ছাঁটা মুখের সুদৃশ্য দাড়ি উপযুক্ত সাধনের অভাবে বর্দ্ধিত ও বিশ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মাথার ঘন ঘন কোমল চুলগুলি রুক্ষ ও ঝাঁকড়া হইয়া মুখের শোভা নষ্ট করিয়া দিয়াছে, চোখের যে স্নিগ্ধ দৃষ্টি অপরের চক্ষুকেও আকৃষ্ট করিত, এখন তাহা স্বল্প পরিচিতের মুখের প্রতি নিবদ্ধ হইলে তাহাদের যেন শঙ্কিত ও আতঙ্কিত করিয়া তুলে। মনে হয়—অজ্ঞাত তারা দুটি যেন অগ্নি গোলকের মত ছুটিয়া আসিতেছে। চোখে এখন চশমা বড় একটা বালাই নাই!

পরিচারকদের কাহারও এ অস্থির এই অপ্রকৃতিস্থ ভয়াবহ মানুষটির নিকটে ঘেঁসিতে সাহস হয় না। ঘরে কাহাকেও ঢুকিতে দেখিলেই শম্ভুনাথের চাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠে, বিছানার উপর বসিয়া দুই চক্ষু পাকাইয়া আগন্তুকের পানে তাকাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠেন—রে-রে-রে?

মুখের এই শব্দের অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন—কি বলছেন? কাকে চান? অমনই তাঁহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠে, মুখখানাও সেই সঙ্গে এমনই বিকৃত ও বীভৎস হইয়া উঠে যে, প্রশ্নকারী পলাইবার পথ পায় না। কিন্তু হরপ্রসাদ বন্ধুর মুখের এই শব্দটির অর্থ একদিন আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

উত্থানশক্তি পাইলেও প্রকৃতিস্থ না হওয়ায় শম্ভুনাথকে বাহিরের ঘরখানির ভিতরেই আবদ্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। লৌহ খাঁচার ভিতরে এক একটা বাঘকে যে ভাবে অবিশ্রান্ত গতিতে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরা-ফিরা করিতে দেখা যায়, ঠিক সেই ভাবেই শম্ভুনাথ রুদ্ধ বৃহৎ ঘরখানির ভিতর অস্থির ভাবে ক্রমাগত পায়চারী করেন। কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিবার কোন আগ্রহ তাঁহার আচরণে প্রকাশ পাইত না। আহারের সময় হরপ্রসাদ নিজে আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া দিতেন, কাছে আসিয়া বন্ধুর ভোজনে সাহায্য করিতেন। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য নানা প্রসঙ্গ তুলেন, কিন্তু বন্ধুর তরফ হইতে—রে-রে শব্দ ছাড়া কোন উত্তরই পান না।

ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া বন্ধুর ভোজনাদি যাহাতে সম্পন্ন হয় হরপ্রসাদ সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন এবং স্বয়ং নিকটে বসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। বেলা তিনটার সময় জলযোগে বিবিধ ফলের ব্যবস্থা থাকিত।

সেদিন শম্ভুনাথ যথারীতি জলযোগে বসিয়াছেন, হরপ্রসাদ তাঁহার সম্মুখেই বসিয়া সে সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিতেছিলেন। আহারে শম্ভুনাথের কোনরূপ আগ্রহ নাই, নানা ভাবে অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছিলেন, আর হরপ্রসাদ বিপুল ধৈর্য্যের সহিত এই অস্থির ও অপ্রকৃতিস্থ মানুষটির জীবনরক্ষার উপাদানগুলি যোগাইবার ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় অন্দরমহল হইতে গৃহিণীর আর্ত্তস্বর সমস্ত বাড়ীখানাকে কাঁপাইয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল: আর যে স্থির হয়ে থাকতে পারছি না গো—রেণু রে…

হাতের ফলটি ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিলেন শম্ভুনাথ, মুখখানা বিকৃত করিয়া এবং দুই চক্ষুর প্রখর দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া বলিয়া উঠিলেন: রে রে রে?

হরপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং বন্ধুর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন: তবে কি তুমি এমনি করে রেণুরই খোঁজ করছ শম্ভু? তোমার মনের হাহাকারই কি ঐ কথাটার ভিতর দিয়েই ফুটে বেরুচ্ছে ভাই?

শম্ভুনাথ এবার নীরবে বন্ধুর পানে চাহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি এখন শান্ত, স্থির, মর্ম্মস্পর্শী। হরপ্রসাদের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আর্দ্রস্বরে তিনি বলিলেন: রেণু হারিয়ে গেছে। সমস্ত সহর তোলপাড় করেও তাকে পাইনি। দেশের সমস্ত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি—সন্ধান দিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব। কিন্তু কোন খবরই এ পর্য্যন্ত আসেনি। কে জানে, সে আছে কি নেই!

স্থির হইয়া শম্ভুনাথ বন্ধুর পানে এতক্ষণ চাহিয়াছিলেন। এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে এরূপ স্থিরতা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় এই বোধ হয় প্রথম দেখা গেল। হরপ্রসাদ বুঝিলেন যে, সংজ্ঞাশূন্য হইবার পূর্ব্বক্ষণেই শম্ভুনাথ রেণুর নিরুদ্দেশবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন, সংজ্ঞালাভের পর সেই চিন্তাটিই তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্কে একটা আলোড়ন তুলিয়াছিল, তাহার ফলেই রেণুর নামের আদ্যক্ষরটি তাঁহার মর্ম্মদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া মুখ দিয়া ঐ ভাবে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া থাকে।

কিন্তু হরপ্রসাদের কথাগুলি শম্ভুনাথ উপলব্ধি করিলেন কি না তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া তিনি ঘরের প্রান্তভাগে রক্ষিত ক্ষুদ্র টিপয়টি লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া গেলেন! এখন আর মুখে সেই—রে—রে শব্দ নাই। তবে বিস্ফারিত দুটি চক্ষুর ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইল, তিনি যেন শূন্য টিপয়ের উপরে কোন কিছু বাঞ্ছিত বস্তুর অন্বেষণ করিতেছেন।

ঝাঁ করিয়া অমনি হরপ্রসাদের স্মৃতিদ্বার যেন খুলিয়া গেল। এই টিপয়টির উপরেই ত তিনি সেই সাংঘাতিক দিনে তাঁহার কন্যা রেণু ও শম্ভুনাথের পুত্র নরনারায়ণের আলেখ্যদ্বয় পাশাপাশি সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু শম্ভুনাথের অসুখের সময় ঘরের অতিরিক্ত কতকগুলি জিনিসপত্রের সহিত ছবি দুইখানিও স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। সংজ্ঞালাভের পর প্রথম উত্থানশক্তি পাইয়া শম্ভুনাথ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটা ফুলদানি তিনি কক্ষতলে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন, রূপার একটা ডিবা গবাক্ষপথে বাহিরে নিক্ষেপ করেন। অতিকষ্টে হরপ্রসাদ তাঁহাকে শান্ত করেন, পরে ঔষধের সাহায্যে কোনরূপে নিদ্রাচ্ছন্ন করা হয়। খুচরা জিনিসগুলির সহিত ছবি দুইখানি হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার শয়নকক্ষে স্থানান্তরিত করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেগুলি এই কক্ষে যথাস্থানে আনিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ প্রায় একই সময়ে শম্ভুনাথের মুখের বাণী 'রে' শব্দটির অর্থবোধের সঙ্গে টিপয়টির উপর ঝুঁকিয়া তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির রহস্যটুকুও হরপ্রসাদ বাবুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সংজ্ঞালাভের সঙ্গে সঙ্গে শম্ভুনাথের বিশৃঙ্খল মস্তিষ্কের মধ্যে টিপয়ের উপর পাশাপাশি রক্ষিত সেদিনের সেই ছবি দুইখানির চিন্তাই জট পাকাইয়াছে এবং মানস-পটে রূপায়িত ছবির দুইখানি মুখ দৃষ্টির পরিধিমধ্যে পাইবার জন্যই তাঁহার এই চাঞ্চল্য, আকুলি-ব্যাকুলি এবং অস্থিরতা।

এই সঙ্গে সহসা হরপ্রসাদের মনে পড়িয়া গেল যে, শম্ভুনাথ সুদৃশ্য একটি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, সেটিও কক্ষ হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ব্যাগের মধ্যে আবশ্যক কাগজপত্রের মধ্যে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা থাকা সম্ভব এবং এ সময় তাহার প্রয়োজনও যথেষ্ট ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি ভৃত্য কানাইকে ডাকিয়া ব্যাগটি আনিবার আদেশ করিলেন। একটু পরেই কানাই ব্যাগটি আনিয়া বিছানার উপর রাখিয়া চলিয়া গেল।

ব্যাগটির দিকে শম্ভুনাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে হরপ্রসাদ কহিলেন: তোমার ব্যাগ এসেছে শম্ভু! এর চাবিটি কলেই লাগানো ছিল, আমি বন্ধ করে কাছেই রেখেছি।

বলিয়াই তিনি ফতুয়ার পকেট হইতে ছোট চাবিটি বাহির করিয়া ব্যাগের কলে লাগাইয়া দিলেন।

টিপয়টি ধরিয়া শম্ভুনাথ দাঁড়াইয়াছিলেন। হরপ্রসাদের কথাগুলি শুনিয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন, কিন্তু বিছানার উপর রক্ষিত ব্যাগটি যে তাঁহাকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

হরপ্রসাদ প্রশ্ন করিলেন: ব্যাগটি খোলবার দরকার হয়েছে, তোমার ছেলে আর তার মামার ঠিকানা আমি চাই। ব্যাগের মধ্যে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে—কি বল? তুমি কি নিজেই খুলতে চাও, না আমি খুলব হে?

শম্ভুনাথের উদাস দৃষ্টি এবার প্রখর হইয়া উঠিল সঙ্গে সঙ্গে টলিতে টলিতে তিনি প্রসারিত ফরাসের উপর হরপ্রসাদের পার্শ্বেই আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণে ব্যাগটি বন্ধুর হাত হইতে সজোরে ছিনাইয়া লইলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর দীপ্তি অস্বাভাবিক ভাবে যেন জ্বলিয়া উঠিল, বহুক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর পুনরায় সরবে বাহির হইল—রে-রে-রে?

হরপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ ফরাস হইতে উঠিয়া সহাস্যে কহিলেন: বেশ, তুমিই ব্যাগটি খুলে তোমার ছেলের ঠিকানাটি খুঁজে দেখ; আমি তাকে এখানে আনবো স্থির করেছি। শীগগির সেটা বা'র ক'রে ফেল ভাই, আমি আসছি।

ছবি দুইখানির কথা হরপ্রসাদের মনে যেন খোঁচা দিল এই সময়, উপরের ঘর হইতে স্বহস্তে আনিয়া বন্ধুর মুখে হাসি ফুটাইবার অভিপ্রায়ে তিনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেলেন। ঘরের দরজা খোলাই পড়িয়া রহিল।

হরপ্রসাদের প্রস্থানের পরই শম্ভুনাথ এক কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। নিজের ব্যাগটির ভিতর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কোন সন্ধান পাইলেন না তখন তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। সারা দেহটির ভিতর দিয়া চাঞ্চল্যের একটা প্রবাহ বহিল এবং তাহার আবেগে তিনি ক্ষিপ্তের মত লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর অস্বাভাবিক

দৃষ্টি অত্যুগ্র হইয়া যেন উপযুক্ত ইন্ধন খুঁজিতে লাগিল। হাতের কাছে গ্রহণযোগ্য অপর কিছু না পাইয়া ব্যাগটিই শুভ্র আস্তরণ-মণ্ডিত বিছানাটির উপর উপুড় করিয়া দিলেন। কাপড়, জামা, কেতাব, খাতা ও কাগজ-পত্রের একটা ক্ষুদ্র স্তূপ বিছানাটির উপর মাথা তুলিয়া কিঞ্চিৎ উঁচু হইয়া উঠিল। এই সময় পার্শ্বের শ্বেতপাথরের আধা টেবিলের উপর রক্ষিত সিগারেটের সুদৃশ্য টিন এবং দিয়াশলাইয়ের বাক্সটির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। আর যায় কোথায়, এই ক্ষুদ্র বাক্সটির ভিতরে সুরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালোমুখ কাঠিগুলির অগ্ন্যুৎপাদনের শক্তি তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল হইতে ম্যাচ বাক্সটি বুভুক্ষু চিলের মত ছোঁ মারিয়া লইলেন, তাহার পর পরমোল্লাসে কাঠির পর কাঠি জ্বালিয়া বিছানায় স্থাপিত সেই ক্ষুদ্র স্তূপটির উপর ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই অগ্নিশুদ্ধি দাহিকাশক্তির বিকাশ করিয়া ঘরটাকে আলোকিত করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে তাহার চারিপাশ দিয়া আগুনের লেলিহান শিখার সহিত ধূম্ররাশি বিস্তৃত হইয়া সুসজ্জিত ও সুরঞ্জিত ঘরখানিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল। শম্ভুনাথের উল্লাস তখন দেখে কে। লেলিহান শিখার নৃত্যের তালে তালে তিনিও নৃত্যভঙ্গিতে চীৎকার তুলিলেন: রে-রে-রে!

৭

বাড়ীর ভিতরে—দ্বিতলের দরদালানে পুত্রের অপূর্ব্ব ফটোখানা আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনুপমা অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। দুই মেয়ে রাণু ও মায়া শোকাতুরা জননীকে প্রবোধ দিতেছিল।

হরপ্রসাদকে দেখিয়া অনুপমার শোক উথলিয়া উঠিল। আর্ত্তকণ্ঠে তিনি বলিলেন: কি করে তুমি স্থির হয়ে আছ গো রেণুকে হারিয়ে, বন্ধুই কি তোমার এত বড় হ'ল?

হরপ্রসাদের গতি রুদ্ধ হইয়া গেল। রোরুদ্যমানা স্ত্রীর দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি কহিলেন: কি করতে বল আমাকে? এতগুলো ঝি-চাকর, বাইরে সহিস-দরোয়ান, লোকজন বাড়ীতে গিস্‌গিস্ করছে, এর ভেতর থেকে সে হারিয়ে গেল, কেউ খোঁজ রাখেনি মেয়ের; এখন আমার উপর তম্বী ক'রে কি লাভ! আমি খুঁজতে হেলা করেছি মনে কর? বন্ধুকে ঠেস দিয়ে কথাটা বলবার মানে?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অনুপমা কহিলেন: লোকে কুলো-ধুচুনীরও আয়-পয় দেখে। ঐ অপয়া মিনসেটা এসেই ত কাল ঘটালে। কি ক্ষণেই যে রেণুকে দেখতে চাইলে, ডাকলে, খোঁজাখুঁজি করলে, আর এলো না। উঃ! কি সর্ব্বনেশে মানুষ গো, অ-মা, রেণু রে!

হরপ্রসাদ ভ্রূকুটি করিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। বড় মেয়ে রাণু মিনতির সুরে পিতাকে অনুরোধ করিল: মা'র কি এখন মাথার ঠিক আছে বাবা, আপনি ওঁর কথায় কান দেবেন না।

মেজ বলিল: মা স্বপ্নে দেখেছেন, রেণু কোথায় গিয়ে যেন পড়েছে, সেখানে সব অচেনা লোক, রেণু খালি বলছে—'মা কোথায়? বাবা কোথায়? আমাকে এখানে আনলে কেন?' তাই মা'র মনে হচ্ছে—ভালো ক'রে খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে।

হরপ্রসাদ কহিলেন: খোঁজবার কোন ত্রুটিই হয়নি। তার ছবি থেকে ব্লক ক'রে ছেপে খবরের কাগজে ছাপতে দেওয়া হয়েছে। পুলিস থানায় থানায় ইস্তাহার পাঠিয়েছে। কত লোক যে রেণুর সন্ধানে উঠে-পড়ে লেগেছে—তার সংখ্যা নেই। সবাই জেনেছে, এই হারানো মেয়েকে খুঁজে বা'র করতে পারলে কিম্বা তার সন্ধান দিলে অবস্থা ফিরে যাবে। সন্ধান দিলে পঞ্চাশ হাজার, আনতে পারলে লাখ টাকা দেওয়া হবে ব'লে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এর বেশী আমাকে আর কি করতে বল?

অতঃপর ভিতরে গিয়া হরপ্রসাদ বন্ধু-পুত্রের ব্রোমাইড ফটোখানার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কক্ষমধ্যে যে টিপয়টির উপর বালক-বালিকার দুইখানি ফটো পাশা-পাশি সাজানো ছিল, সেখানে শুধু রেণুর ফটোখানিই রহিয়াছে দেখা গেল, অপরখানির কোন চিহ্নই নাই।

হরপ্রসাদের হাঁক-ডাকে দুই কন্যা কক্ষমধ্যে ছুটিয়া আসিল। হরপ্রসাদ তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন: শম্ভুনাথের ছেলের ফটো কোথায় গেল?

কন্যা রেণু জানাইল: ফটোখানা অলুক্ষণে ব'লে মা সেখানা উনুন ধরাবার জন্যে মুক্তাকে দিয়াছেন।

হরপ্রসাদের মাথায় বুঝি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ মুক্তা ওরফে মোক্ষদা নাম্নী পাকশালার পরিচারিকাকে তলব হইল। সে আসিয়া সভয়ে জানাইল: যদিও মা-ঠাকরোণ আমারে 'চিত্তির'খানা উনানে দেবার লেগে কয়েছ্যালো, কিন্তু সোনা-হেন খোকা দেখে মনে ভারি মায়া লাগে, তাই না অগ্নি-দেবতার কোলে না দিয়ে তেনার পেটরার ভেতর থুয়ে রেখেছি।

অবিলম্বে ছবিখানি আনিয়া সে মনিবের হাতে সমর্পণ করিল, তাহার পর চাপা-গলায় কহিল : ভাগ্যিস্ খোকারে আগুনে থো করিনি বাপু !

হরপ্রসাদ কহিলেন : ক'রনি তাই বেঁচে গেলে, নইলে তোমাকেও আগুনে থো করতুম্।

বড় মেয়ে রাণুর দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন : একে পাঁচটি টাকা এর জন্য বখসিস্ করলুম। টাকাটা দিয়ে খাতায় দাতব্য খাতে খরচ লিখিয়ে দিও।

পরক্ষণে ছবি দুইখানি লইয়া তিনি দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে বন্ধুর উদ্দেশে চলিলেন।

৮

ধোঁয়ার একটা বিশ্রী গন্ধ বায়ুর সহিত মিশিয়া বাড়ীর বাহির মহলটাকে তখন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। বাহিরের ঘরের ভিতরকার ব্যাপারটি অনেকটা বিলম্বেই অসতর্ক ভৃত্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। তখন অগ্ন্যুৎপাতে ভয়াবহ কাণ্ডটি তাহাদিগকে এমনই বিহ্বল করিয়া ফেলিল যে, আগুন নিবাইবার কোনরূপ উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহারা সমবেত কণ্ঠে চীৎকার তুলিয়া শুধু লম্ফঝম্ফই সুরু করিয়া দিল। ঠিক এই সময় ফটো দুইখানি লইয়া হরপ্রসাদ বাহিরে আসিতেছিলেন। ভৃত্যদের আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃৎকম্প হইল। কুড়ি মিনিটেরও অধিক হইবে না তিনি বাটীর ভিতরে ছিলেন, ইহার মধ্যেই বাহিরের বসিবার ঘরে আগুন লাগিয়া গেল !

দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুসজ্জিত বৈঠকখানাটির যে অবস্থা তিনি দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। প্রসারিত দুগ্ধ ফেননিভ শয্যার উপর অগ্নির একটি স্তূপ উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, ফরাসের চাদর ও তোষকের তুলাস্তরের ভিতর দিয়া অগ্নির সধূম্র শিখা নির্গত হইতেছে। আর, তাঁহার অদ্ভুত বন্ধুটি সুবৃহৎ ফরাসটিকে পরিবেষ্টন করিয়া উন্মত্ত-আবেগে ঘুরিতেছেন এবং চক্ষুর উপর সহজদাহ্য যাহা কিছু পড়িতেছে, টানিয়া টানিয়া সেগুলি এই বিচিত্র অগ্নিকুণ্ডটির উপর ইন্ধনের মত আহুতি দিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কারের সুরে তাঁহার মুখ দিয়া চীৎকার উঠিতেছে : রে-রে-রে !

এই কাণ্ড দেখিয়া ভৃত্যগণ এমনই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে যে, শুধু আগুন আগুন শব্দ তুলিয়া আর্ত্তনাদ ব্যতীত আগুন নিবাইবার কোন প্রচেষ্টাই করে নাই। হরপ্রসাদ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্থির ও উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্বাগ্রে অগ্নির বিস্তার-পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে আগুন নিবিল, কিন্তু বন্ধু শম্ভুনাথের উৎসাহ বাধা পাইয়া উগ্র হইয়া উঠিল। ধূম্রলিপ্ত ঝলসিত চর্ম্মময় ব্যাগটি হরপ্রসাদের উপর নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি দুই হাতে তুলিতেই হরপ্রসাদ তাঁহার হাতের দুইখানি ফটো হইতে বালক নরনারায়ণের ফটোখানি উন্মত্ত বন্ধুর মুখের সামনে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। অহি-তুণ্ডিকের হস্তোদ্যত বস্তুবিশেষ দেখিবা মাত্র দংশনোদ্যত সাপের ফণা যেমন সঙ্কুচিত হইয়া যায়, হরপ্রসাদের হাতের সেই ফটোখানি শম্ভুনাথের দুই চক্ষুর হিংস্র দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিতেই তাঁহার হাত দুইখানিও তেমনই শিথিল হইয়া পড়িল, মুখ-চক্ষুর ভঙ্গি এক মুহূর্ত্তে যেন একেবারে বদলাইয়া গেল। পরক্ষণেই হাতের ব্যাগটি ফেলিয়া হাত দুইখানি বাড়াইয়া তিনি হরপ্রসাদের দিকে ছুটিলেন ফটোখানি ধরিবার জন্য।

ফটোখানি বন্ধুর হাতে সমর্পণ করিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন : তোমার ছেলের ছবি। এখানি আনবার জন্যেই আমি ভিতরে গিয়েছিলুম, আর তুমি অমনি এরই মধ্যে এই কাণ্ড এখানে বাধিয়ে বসেছ। দেখ দেখি, কি করেছ ! ব্যাগটির ভিতরে যা-কিছু কাগজ-পত্র তোমার ছিল, পুড়িয়ে সমস্ত ছাই করে ফেলেছ ; দরকারি কাগজ-পত্র কিছু যদি থাকে ত সব গোল্লায় গেল।

বন্ধুর কথাগুলি শম্ভুনাথের কানেও ঢুকিল না. তিনি ছবিখানি সমীপবর্ত্তী টেবিলটির উপর রাখিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া সুন্দর মুখখানির দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন।

আস্তে আস্তে বন্ধুর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন হরপ্রসাদ। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার পিঠের দিকে হাতখানি রাখিয়া কহিলেন : ছবির খোকাকে এখানে আনবো ব'লেই ফটোখানি আনতে গিয়েছিলুম —যাতে ছেলের কথা তোমার মনে পড়ে। ঠিকানাটা যদি বল ত আজই আমি সেখানে লোক পাঠাই। কানে ঢুকেছে কথাটা ?—বলিয়াই তিনি বন্ধুর পৃষ্ঠে মৃদু ভাবে একটু চাপ দিলেন।

ফটোখানি দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শম্ভুনাথ তৎক্ষণাৎ হরপ্রসাদের পানে ফিরিয়া তাকাইলেন। তাঁহার মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গি দেখিয়া হরপ্রসাদ বুঝিলেন, যে, ছবিখানি পাছে পুনরায় হাতছাড়া হয়, এই আশঙ্কাই তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

হরপ্রসাদ হাসিয়া কহিলেন : ভয় নেই, ও ছবি আমি নেব না, তোমার কাছেই থাক। কিন্তু আমার কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না শম্ভু, তোমার ছেলেকে

আমি আনতে চাই—সে এখানে এসে তোমার কাছেই থাকবে।

শম্ভুনাথের হিংস্র মুখভঙ্গি তৎক্ষণাৎ একেবারে বদলাইয়া গেল। ছেলের ছবিখানি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া গভীর দৃষ্টিতে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য হরপ্রসাদের মুখের পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টি কি মর্ম্মস্পর্শী! হরপ্রসাদের মনে হইল, তীক্ষোজ্জ্বল দুইটি চক্ষুতারার মধ্য দিয়া সন্তান-স্নেহের একটা স্নিগ্ধ ধারা যেন সবেগে নিঃসৃত হইতেছে। পরক্ষণেই শম্ভুনাথ আলিঙ্গনাবদ্ধ ছবিখানির মুখের উপর নিজের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। বিস্মিত হরপ্রসাদ দেখিলেন—ছবির সর্বাঙ্গ বহিয়া অশ্রুর বন্যা নামিয়াছে।

চকিতে হরপ্রসাদের চোখের উপর একটা ঐতিহাসিক স্মৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল :—

নির্ব্বাসিত নিঃসঙ্গ বিবাদে ভাগ্যহারা সম্রাট নেপোলিয়ন যখন সমুদ্রবেষ্টিত সেণ্টহেলেনা দ্বীপে নির্ব্বাসিত জীবনের নিঃসঙ্গ দিনগুলি কোনক্রমে অতিবাহিত করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁর এক অন্তরঙ্গ চিকিৎসক বন্ধু অনেক কাঠ-খড় পোড়াইয়া নির্ব্বাসিত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগটুকু প্রাপ্ত হন। সম্রাট তাঁহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করেন—আমার জন্য কি এনেছ, ডাক্তার?

এই ডাক্তারটি একদা নেপোলিয়নের নাড়ীর খবর পর্য্যন্ত রাখিতেন। তিনি জানিতেন, একান্ত অবসরকালে পুস্তকই ছিল তাঁহার সাথী। তাই কতকগুলি নূতন প্রকাশিত ভাল ভাল বই তিনি প্যারিস হইতে তাঁহার প্রিয়তম সম্রাটের জন্য লইয়া গিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের প্রশ্ন শুনিয়াই তিনি সেই বইগুলি তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন।

নেপোলিয়নের ওষ্ঠপ্রান্তে ম্লান হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। মুখখানি ঈষৎ বিকৃত করিয়া তিনি কহিলেন—এঃ, ডাক্তার! তোমার বস্তু-নির্ব্বাচনে ভুল হয়েছে! ছেলের বাবা কি এ অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে বইয়ের দিকে হাত বাড়াতে পারে ডাক্তার? তোমার কাছে আমি আরো কিছু বেশী প্রত্যাশা করেছিলুম।—কথাগুলি বলিয়াই তিনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

সম্রাটের শেষের কথাগুলি ডাক্তারের হুঁস ভাঙ্গিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে এই অতিমানুষটির মনের দরজা তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে নেপোলিয়নের বালক পুত্রের আলেখ্যখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলেন।

শিশু যেরূপ আকাঙ্ক্ষিত খেলানাটি পাইয়া বিপুল আনন্দে বুকে চাপিয়া ধরে, ঠিক সেই ভাবে সে-যুগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষটি ছেলের ছবিখানি দুই হাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ছবির মুখে মুখ রাখিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—আঃ, ডাক্তার! ছেলের বাপ এ-অবস্থায় আগে চায় ছেলে! নেপোলিয়নের দুই চক্ষুর প্রান্ত দিয়া তখন অশ্রুর ধারা বহিয়াছে!

ঐতিহাসিক মহামানুষটির সহিত এই অতি সাধারণ বাস্তব মানুষটির তুলনা করিতে বসিয়া হরপ্রসাদ দেখিলেন—মনোরাজ্যে ইঁহাদের কোন পার্থক্য নাই, তারতম্য নাই, স্নেহ-মন্দাকিনী অন্তঃসলিলার মত অন্তরদেশে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

অনুচরগণের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরখানি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইল। বিস্তৃত তক্তপোষের উপর পুনরায় পূর্ব্ববৎ সুদৃশ্য ফরাস পাতা হইল। শম্ভুনাথকে কোন প্রকারে ফরাসের এক প্রান্তে বসানো হইল বটে, কিন্তু তাঁহার বাহুপাশে আবদ্ধ ছবিখানিকে মুক্ত করা হরপ্রসাদের পক্ষে তখন আর সম্ভবপর হইল না। শম্ভুনাথ কিছুতেই ছবিখানি ছাড়িলেন না। সিংহীর ক্রোড় হইতে তাহার শাবকটিকে ধরিবার জন্য অতি পরিচিত পালকও হাত বাড়াইলে সে যেরূপ হিংস্রভাবে গর্জ্জন করিতে থাকে, ছবিখানিকে শম্ভুনাথের আলিঙ্গনমুক্ত করিতে যতবারই হরপ্রসাদ চেষ্টা করিলেন, তিনিও ঠিক সেই ভাবে মুখখানি বিকৃত করিয়া তর্জ্জনের সুরে বাধা দিলেন : যাও!

এই সময় হরপ্রসাদ মাথা খেলাইয়া রেণুর ফটোখানি ফরাস-সন্নিহিত টেবিলটির উপর রাখিতে উদ্যত—শম্ভুনাথের মুখভঙ্গি পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইল। এবার তিনি নিজেই ছেলের ছবিখানিকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া রেণুর ছবির পার্শ্বে অতি সন্তর্পণে রাখিলেন। হরপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন, উন্মত্ত বন্ধুর স্বচ্ছ সরল দৃষ্টি এখন ছবিযুগলে আবদ্ধ, মুখখানি প্রসন্ন। অতঃপর তিনি আস্তে আস্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন; দুই চক্ষুর দৃষ্টি কিন্তু ছবি দুইখানির উপরেই নিবদ্ধ রহিল। হরপ্রসাদ যে নিকটে রহিয়াছেন, অথবা কক্ষদ্বারের সম্মুখে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া অনেকেই যে তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিতেছে, সে সম্বন্ধে শম্ভুনাথকে কিছুমাত্র সচেতন দেখা গেল না।

হরপ্রসাদ স্থির করিলেন, বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার অধিকারীকে আনাইয়া বন্ধুকে দেখাইবেন, তিনি যদি আশ্বাস দেন, তাঁহার চিকিৎসাধীনেই রোগীকে

চেহারা ও চিত্র পোষাক-পরা মানুষটি যখন দিব্য ঘরোয়া বাঙলায় কথা বলেন, আলাপ করেন, তখন সত্যই চমৎকৃত হইতে হয়।

ডাক্তার অধিকারীর পেশাটি সত্য অভিনব। মানব-মনের বিভিন্ন অবস্থা এবং মানবকৃত অপরাধের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া কর্ম্মজীবনের প্রায় অপরাহ্ণে এই পরীক্ষাসিদ্ধ দক্ষতাকে ইনি পেশারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বহু ক্ষেত্রেই মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে ইঁহার সাফল্য স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে যুক্ত-প্রদেশের সরকার ইঁহাকে উচ্চ বেতনে মানসিক ব্যাধি চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ছাড়া, অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধেও ইংরাজী সাময়িক পত্রিকাগুলিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ডাক্তার অধিকারী শাসক-সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ যখন ডাক্তার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া অপ্রীতিকর ঘটনাটির আভাস দিতেছিলেন, তিনি তখন নীরবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ঘরের জিনিস-পত্রগুলি একটি একটি করিয়া দেখিতেছিলেন। গৃহস্বামীর শেষের কথাটি প্রশ্নের মত বোধ হয় তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল; তৎক্ষণাৎ সন্ধানী দৃষ্টি প্রশ্নকারীর মুখে নিবদ্ধ করিয়া তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন: আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কি করতে চান? কিন্তু আমি যা বলব, করতে পারবেন?

হরপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন, ডাক্তার অধিকারীর মুখখানি যেন সহসা বদলাইয়া গিয়াছে, ঘোলাটে দুই চক্ষু মার্জ্জারের চক্ষুর মত জ্বলিতেছে। তিনি উত্তর করিলেন: দেখুন, আমার মেয়েটিকে হারানো আর অতীতের এই বন্ধুটিকে পাওয়া সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আপনাকে বলেছি। আপনার চিকিৎসায় তাকে সারিয়ে তুলব, তার ছেলে-টিকে এনে কাছে রেখে মানুষ করব, আমার মেয়ের জায়গায় বন্ধুর ছেলেকেই বসাবো—এইগুলো ছিল আমার শেষের সাধ। কিন্তু হতভাগা সে পাটও ঘুচিয়ে দিয়ে গেল! এখন আমি নিজেই ভেবে পাচ্ছি না—কি করি? মেয়েটার সন্ধানে সমস্ত সহর তোলপাড় করেছিলুম, এর জন্যেও কি তেমনি ক'রে—

ভৃত্য কানাই এই সময় কক্ষদ্বার হইতে কুণ্ঠিত কণ্ঠে জানাইল: বাবা, তাঁর তল্লাসে চারি দিকে চার-চারটে মানুষ ছুটেছে। মলজী সাইকিলিন চেপে ইষ্টিশানে গেছে, আতর সিং, নিবারণ, গদাই—এরাও বেরিয়েছে।

ডাক্তার অধিকারী বলিলেন: বাস্, তবে ত কাজ চুকে গেছে! আপনার চাকররা গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢালতে খুব ওস্তাদ দেখছি! তাহলে আমাকে কি এখানে অপেক্ষা করতে বলছেন—পলাতক রোগীকে ধরে আনলে তাঁকে দেখে তবে ছুট মিলবে?

ডাক্তারের কথায় অন্তরে আঘাত পাইয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: দেখুন, এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে আপনার এতখানি সময় অনর্থক নষ্ট করে আমি খুবই ব্যথা পাচ্ছি। কিন্তু তাই ব'লে, আপনাকে আটকে রাখবার দুঃসাহস আমার নেই। তবে রোগীর অভাবে পারিশ্রমিক সম্বন্ধে……

হরপ্রসাদের কথায় এইখানে বাধা দিয়া ডাক্তার অধিকারী বলিয়া উঠিলেন: তার মানে? রোগীর অভাবে—আসবার দরুণ মেহনতানা দিয়ে আমাকে খুসি করতে চান নাকি? এঃ—

লজ্জিত ভাবে হরপ্রসাদ কহিলেন: তাহলে আপনিই বলুন, এখন আমি কি করব? যে অবস্থাটা এখন দাঁড়িয়েছে, তাতে ব্যবস্থার ভার আমি আপনার ওপরেই দিতে চাই; অবশ্য দয়া করে যদি গ্রহণ করতে রাজী থাকেন।

গম্ভীর মুখে ডাক্তার অধিকারী কহিলেন: বেশ কথা; আমি তাতে রাজি। কিন্তু যে ব্যবস্থা আমি দেব, পারবেন করতে?

হরপ্রসাদ: অন্ততঃ, আপনাকে খুসি করবার জন্যে আমার পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না, ডাক্তার অধিকারী!

ডাক্তার অধিকারী: আপনার চেষ্টা শুধু আমাকে খুসি করবে না; সম্ভবত, আপনিও খুসি হতে পারবেন। যাক্, কথাটা তাহলে খুলেই বলি শুনুন।…আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এবারকার মেলায় কিডনাপিং সম্পর্কে যে সব অনাচার হয়েছে, তার ওপর গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য প'ড়েছে, আর এর ভিত্তি-স্বরূপ হয়েছে আপনার মেয়ে হারানো ব্যাপারটি। কেন না, অজস্র টাকা খরচ করে আপনিই ব্যাপারটাকে প্রমিনেন্ট করে তুলেছেন!

হরপ্রসাদ: তা হবে। কিন্তু এ-ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের দপ্তরে সাড়া পড়েছে—এমন কোন খবর আমি পাইনি।

ডাক্তার অধিকারী: কিন্তু আমি পেয়েছি। গবর্ণমেন্ট এ সম্বন্ধে যে-সব রিপোর্ট পেয়েছেন, তাতে তাঁদের ধারণা, এর পিছনে একটা সঙ্ঘবদ্ধ 'গ্যাং' আছে, আর কোন একটা লাভজনক উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়েই তারা এ-কাজে নেমেছে। এখন এই অপরাধ-তত্ত্বের রহস্য আমাকেই আবিষ্কার করতে হবে।

আপনি হয়ত শুনে বিস্মিত হবেন যে, ভারটি পুরোপুরি আমার হাতেই এসে পড়েছে।

হরপ্রসাদ: বিস্মিত হবার ত এতে কিছু নেই, ডাক্তার অধিকারী, বরং আমি একে সুসংবাদ বলেই মনে করছি। আর আপনার মত যোগ্য লোকের হাতে যখন এ-ভার পড়েছে তখন যে এর সুরাহা হবে, এ আশা করতে পারি। কেন না, ইউ-পি শুদ্ধ সকলেই জানে, আপনি শুধু মনের ডাক্তার নন, ভূত ধরবারও রোজা।

ডাক্তার অধিকারী: কিন্তু আশ্চর্য্য এইখানেই মিষ্টার ঘোষ, কাজটারও ভার সবে মাত্র পেয়েছি, আর আপনিও গিয়ে হাজির হয়েছেন! অথচ, আমিই তখন ভাবছিলুম, কি সূত্রে আপনার কাছে এসে ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনি।

হরপ্রসাদ: এখন বুঝতে পারছি, আমি যেতেই ঘর থেকে আর সকলকে সরিয়ে দিয়ে আপনি আমার কথাগুলো আগাগোড়া শোনবার জন্যে অতটা সময় কেন দিয়েছিলেন। এখন যদি অনুমতি করেন, একটি কথা বলি।

ডাক্তার অধিকারী: স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে এখন থেকে আর কোন আবরণ থাকা ঠিক নয়।

হরপ্রসাদ নীরবে ক্ষণকাল কি ভাবিয়া তাহার পর মৃদু স্বরে বলিলেন: আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, আমি গবর্মেন্টকে জানিয়েছি যে, আমার মেয়েকে যিনি উদ্ধার করে আনতে পারবেন, আমি তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা 'রিওয়ার্ড' দেব?

ডাক্তার অধিকারীর গম্ভীর মুখে এতক্ষণ পরে হাসির একটু ক্ষীণরেখা পড়িল। মুখখানা তুলিয়া তিনি কহিলেন: খবরের কাগজেও খবরটা বেরিয়েছে, কাজেই সবার জানা বলেই ধরে নেওয়া চলে। গবর্ণমেণ্টও আমাকে খবরটা জানিয়েছেন, আর সরকার থেকেও একটা আলাদা 'রিওয়ার্ড' ঘোষণা করা হয়েছে—মেলায় হারানো প্রত্যেক মেয়েটির সম্পর্কে।

হরপ্রসাদ: এখন এ-সম্পর্কে আমি আর একটা প্রতিশ্রুতি দিতে চাই।

ডাক্তার অধিকারী: কি বলুন ত?

হরপ্রসাদ: আমার বন্ধু শম্ভুনাথ বসুকে যদি খুঁজে পাওয়া যায়, আর আপনি তাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করে তুলতে পারেন, আমি তার জন্য আলাদা পঁচিশ হাজার টাকা আপনাকে দেব।

ডাক্তার অধিকারী: বলেন কি মিষ্টার ঘোষ, ঐ হতভাগা পাগলটার পিছনে এখনো আপনি এত টাকা ঢালতে চান?

গম্ভীর মুখে হরপ্রসাদ কহিলেন: এটা আমার কর্তব্য ডাক্তার অধিকারী। তা ছাড়া, বন্ধুর ছেলেটির জন্যে তাকে ফিরে পাওয়া এবং সারিয়ে তোলা আমি জরুরী প্রয়োজন বলে মনে করি। নতুবা ছেলেটি শেষ পর্য্যন্ত চোখের আড়ালেই থেকে যাবে।

ডাক্তার অধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন: ছেলেটিকে কাছে আনাই যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, বন্ধু এখানে থাকতেই সে চেষ্টা করেন নি কেন?

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরপ্রসাদ কথাটার উত্তর দিলেন: আপসোস ভাই যে ভুল করে এসেছি, এ-কথা ত আগেই আপনাকে বলেছি ডাক্তার অধিকারী। শহরের কাগজপত্রগুলো নষ্ট হবার পর আমার হুঁস হয়—আগেই ছেলেটার সন্ধান নেওয়া উচিত ছিল। তবে আমার মনে হয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে ছেলেটির সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে না।

ডাক্তার অধিকারী দৃঢ় স্বরে প্রশ্ন করিলেন: একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মিষ্টার ঘোষ, ধরুন, বন্ধুকে যদি পাওয়া না যায় কিম্বা পেলেও যদি তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে, তখনও কি ছেলেটির সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ থাকবে?

দৃঢ় স্বরে হরপ্রসাদ উত্তর দিলেন: আমার কথা কোন দিন পাল্টায়নি ডাক্তার অধিকারী। বন্ধুর কাছে যে-কথা বলেছি, বন্ধুর অবর্তমানে বা ঘটনার পরিবর্তনেও তা বদলাবে না। এখন থেকে আমি নিজেকেই বন্ধুপুত্র নরনাথের অভিভাবক মনে করি। তাকে খুঁজে বার করবার ভার আমাকেই নিতে হবে। মেয়েকে যদি ফিরে পাই, কথা আমার ষোল আনাই পূর্ণ হবে। না পাই ত—ও ছেলেই মেয়ের স্থান পূর্ণ ক'রে আমার মুখ রক্ষা করবে।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ এই দৃঢ়চেতা মানুষটির মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া এবং মনে মনে একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া ডাক্তার অধিকারী কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে কহিলেন: ধন্যবাদ, মিষ্টার ঘোষ। অদ্ভুত আপনার বন্ধুপ্রীতি, আপনি দেখছি, এ-যুগের আদর্শ-বন্ধু। বেশ, আমি আপনার 'কেস'টি নিলুম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার কন্যা, বন্ধু আর বন্ধুপুত্র—এদের খুঁজে বা'র করাই হবে আমার শেষ জীবনের একটা স্মরণীয় কার্য্য।

গাঢ় স্বরে গৃহস্বামী কহিলেন: আমিও এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি ডাক্তার অধিকারী! আর

এই সঙ্গে একথাও বলে রাখছি, তদন্ত ব্যাপারে টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে আপনি যেন কুণ্ঠিত না হন, অসঙ্কোচেই জানিয়ে আমাকে ধন্য করেন।

ডাক্তার অধিকারীর গম্ভীর মুখখানিতে আর একবার হাসির রেখা পড়িল এবং একটু গম্ভীর হইয়াই পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ কণ্ঠের স্বর বাহির হইল: বেশ, তাই হবে মিষ্টার ঘোষ!

৯

ডাক্তার অধিকারীর সহিত হরপ্রসাদের যখন পূর্বোক্ত আলোচনা চলিতেছিল, তখন কি তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন যে, মাইল দুই তফাতে ইণ্টার ন্যাশনাল ফিলিম কোম্পানীর কর্ণেলগঞ্জের অস্থায়ী ষ্টুডিও-সংলগ্ন হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন কক্ষমধ্যে তাঁহাদের আলোচ্য মানুষটিকে উপলক্ষ করিয়া তৎকালে নূতন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছিল?

হরপ্রসাদের প্রস্থানের পর শম্ভুনাথ একই ভাবে কিছুক্ষণ বাহিরের রক্ষে ছবি দুইখানির পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর কি ভাবিয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে একটা বালিশের ওয়াড় খুলিয়া তাহার মধ্যে দুইখানি ছবি ভরিয়া ওয়াড়-সংলগ্ন রেশমী ফিতা দিয়া দপ্তরের আকারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ব্যাগটি বিছানার উপরেই পড়িয়াছিল। অতঃপর দপ্তরটি ব্যাগের মধ্যে ভরিয়া চাবিটি বন্ধ করিয়া গায়ে যে ফতুয়াটি ছিল তাহার পকেটে রাখিলেন। সমস্ত বাড়ীখানা তখন নিস্তব্ধ, মধ্যে মধ্যে শুধু বায়ুপ্রবাহে গভীর নিদ্রামগ্ন ভৃত্যদের নাসিকাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। ক্ষণকাল কান পাতিয়া শম্ভুনাথ যেন সেই বিচিত্র শব্দটির রহস্যানুসন্ধানে প্রয়াস পাইয়াই সহসা সচকিত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই বৃহৎ ঘরখানির মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধানী দৃষ্টিতে কোন বাঞ্ছিত বস্তুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দরজার বাহিরে একটা টানা তারের উপর একখানা কালো রঙের রেশমী চাদর ঝুলিতেছে দেখিয়া সবেগে গিয়া সেটি টানিয়া আনিলেন। তাহার পর সেটি গায়ে জড়াইয়া যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। এবার বিছানার দিকে ঝুঁকিয়া ব্যাগটি টানিয়া লইলেন। তাহার পর পা টিপিয়া-টিপিয়া বারান্দার উপর দিয়া ফটকের দিকে চলিলেন। বাহিরের অঙ্গন এবং দেউড়ী তখন জনশূন্য। রাস্তার প্রচুর ধূলা উড়াইয়া পর-পর দুইখানি এক্কা কেবল ছুটিতেছিল; সেই ধূলার মধ্যে গৃহবাসী ও পথচারীদের চক্ষুতে ধূলা দিয়া পাগল তাহার নূতন যাত্রাপথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

আমেরিকার কোন প্রসিদ্ধ চিত্র-প্রতিষ্ঠান বিশ্ব-বিদিত মহাকুম্ভের দৃশ্য ফিলিমে তুলিবার অভিপ্রায়ে কর্ণেলগঞ্জের এক বিস্তীর্ণ উদ্যান-বাটিকায় তাঁহাদের অস্থায়ী চিত্রশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই অভিযাত্রী দলটির সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সুব্যবস্থা এবং ব্যয়-বাহুল্যের ঘটা এদেশবাসীর পক্ষে যেন কল্পনাতীত ব্যাপার! অস্থায়ী চিত্রশালাটির সম্পর্কে যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ও উপাদানের সহিত শিল্পীদের স্বাস্থ্যরক্ষার অনুরোধে চলন্ত একটি হাসপাতাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-পথে এদেশের কর্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছে। ইহাতেই উপলব্ধি হইবে যে, মার্কিণ দেশের এই ভ্রাম্যমান ফিলিম প্রতিষ্ঠানটি কিরূপ সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী। ভারতের এই মহামেলার ছবি ফিলিমে তুলিয়াই কর্তৃপক্ষ নিবস্ত হন নাই, এই মেলাটিকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা একখানি ভারতীয় চিত্রনাট্য তুলিবার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। এই সম্পর্কে অস্থিরচিত্ত বিকৃত-মস্তিষ্ক এক পৌঢ়ের ভূমিকা অভিনয়ের জন্য কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কোন ভারতীয়ের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। শম্ভুনাথ যখন হরপ্রসাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কর্ণেলগঞ্জের জনবিরল ফাঁকা রাস্তাটি ধরিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে টলিতে টলিতে একই ভাবে চলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় বৃহৎ একখানি আধুনিক মোটর গাড়ী নিঃশব্দে বিপরীত দিক হইতে একেবারে শম্ভুনাথের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

ফিলিম প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিষ্টার জিম আর্থার দলের কতিপয় তরুণী চিত্রাভিনেত্রীকে লইয়া এই পথে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। শোফারের আসনে বসিয়া তিনি স্বয়ং মোটর চালাইতেছিলেন, তাঁহার সহকর্মী জ্যাক উইলিয়ম পার্শ্বে বসিয়া ক্ষুদ্র ক্যামেরাটির সাহায্যে বৃক্ষবহুল বিস্তীর্ণ পথটির সায়াহ্নের ছবি তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন।

মিষ্টার আর্থার ক্ষিপ্রহস্তে সহসা মোটরের গতিবেগ কিঞ্চিৎ লঘু করিবার উদ্দেশ্যে ষ্টিয়ারিং ঘুরাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কণ্ঠ দিয়া বিস্ময়ের সুর বাহির হইল: ভারি আশ্চর্য্য ত?

জ্যাক উইলিয়ম সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন: ব্যাপার কি সার?

পকেট হইতে দূরবীণটি বাহির করিয়া এবং চোখে লাগাইয়া মিষ্টার আর্থার কহিলেন: সাত দিন ধরে আমরা যে অদ্ভুত চেহারাটির সন্ধান করে বেড়াচ্ছি, হুবহু

সেই বস্তুটি আমাদের ঠিক সামনে অর্থাৎ এক ফার্লং-এর মধ্যে—এই দেখ ?

বলিয়াই তিনি দূরবীণটি জ্যাক উইলিয়মের হাতে দিলেন এবং উইলিয়ম সেটি চোখে লাগাইয়া উল্লাসের সুরে বলিয়া উঠিলেন : সার ! আপনার অনুমান ঠিক, আমরা যেমনটি খুঁজছিলাম—একমাথা রুক্ষ চুল, মুখময় দাড়ি-গোঁফ, খালি পা, হাতে ব্যাগ, গায়ে একটা কালো রঙের র‍্যাপার, এলোমেলো চলন—ঠিক এমনি একটি লোককেই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের দিকেই আসছে। সত্যিই অদ্ভুত !

ষ্টিয়ারিং ঘুরাইয়া মোটরের বেগ বাড়াইয়া মিষ্টার আর্থার বলিলেন : ঐ লোকটিকে এখনি পথ থেকে কুড়িয়ে একেবারে ষ্টুডিয়োয় নিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে হবে।

উভয়ের সংলাপ গাড়ীর ভিতরে বসিয়া মেয়েগুলিও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল। একটি মেয়ে হাসিয়া মন্তব্য করিল : মিষ্টার ডাইরেক্টরের নজরে যখন বেচারী পড়েছে ওর বরাতও খুলে গেছে !

গাড়ী তখন তীব্র বেগে ছুটিয়াছে এবং সকলের দৃষ্টি সামনের অদ্ভুত মানুষটির দিকে। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই সহসা আর এক বিভ্রাট ঘটিয়া গেল।

পিচঢালা পথে গাড়ীখানি নিঃশব্দে আসিলেও থামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার হর্ণের সুরটি এমনই তীক্ষ্ণ-কর্কশ ঝঙ্কার তুলিল যে, পথচারী মানুষটি চমকিত হইয়া সবেগে মোটরের মডগার্ডের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার আর্থার ও তাঁহার সঙ্গী নীচে নামিয়া লোকটিকে তুলিতে গিয়া দেখিলেন, আকস্মিক আতঙ্ক এবং প্রচণ্ড আঘাতের ফলে তাঁহার চৈতন্য লুপ্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় কালবিলম্ব না করিয়া সময়োচিত তৎপরতায় সহযোগীর সাহায্যে আকাঙ্ক্ষিত অপরিচিত লোকটিকে ভিতরে তুলিয়া মিষ্টার আর্থার ষ্টুডিও অভিমুখে পূর্ণগতিতে মোটর চালাইয়া দিলেন।

ষ্টুডিওর হাসপাতালে চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা সম্বন্ধে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। সুতরাং শম্ভুনাথ শীঘ্রই চৈতন্য লাভ করিয়া সুস্থ হইলেন। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ অবস্থায় রোগীকে অব্যাহতি দিলেন না। তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির নিদর্শন পাইয়া সে সম্বন্ধে সতর্কতার সহিত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া পথে পাওয়া এই মানুষটি তাঁহাদের চিত্রসম্ভারের এক অমূল্য সম্পদে পরিণত হইবার উপযুক্ত। ইহাকে আরোগ্য করিয়া তুলিলে তাঁহাদের অর্থব্যয় এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না।

পরিচ্ছন্ন অঙ্গবস্ত্র, সুকোমল শয্যা, বলকারক পথ্য, গীতবাদ্য এবং সুদর্শনা শুশ্রূষাকারিণীদের সঙ্গ দ্বারা রোগীকে প্রফুল্ল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্নায়ুগত দুর্বলতার চিকিৎসা যখন পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে, সেই সময় বন্ধুবৎসল হরপ্রসাদ তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া ডাক্তার অধিকারীর হস্তে তাহার কন্যা, বন্ধু এবং বন্ধু-পুত্রের অনুসন্ধান সম্পর্কে সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছিলেন।

১০

পূর্বোক্ত দুর্ঘটনার পর স্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়াই হরপ্রসাদকে সপরিবারে বোম্বায়ের কর্মস্থানে ফিরিয়া যাইতে হইল। এলাহাবাদের এই অলুক্ষণে বাড়ীখানি কন্যা-শোকাতুরা অনুপমা যেন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু ডাক্তার অধিকারী যখন জানাইলেন, গৃহস্বামী এলাহাবাদ ছাড়িয়া বাহিরে গেলেও নিরুদ্দিষ্টদের সন্ধান-সম্পর্কে বাড়ীখানি এমন ভাবে রাখা চাই যাহাতে তদন্ত সূত্রে তাঁহার আসা-যাওয়ার ব্যাঘাত না ঘটে, তখন হরপ্রসাদ ডাক্তার অধিকারীর হাতেই কতিপয় সর্তে বাড়ীখানি রক্ষণা-বেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার না দিয়া পারেন নাই।

এই ডাক্তারটির পুরা নাম গঙ্গাধর অধিকারী। জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ধর্মে বা আচার-ব্যবহারে ইনি যে কোন্ পর্য্যায়ভুক্ত তাহা জানিবার উপায় নাই। ইঁহার পিতা এলাহাবাদ হাইকোর্টের সেরেস্তায় চাকুরী করিতেন। এবং তিনিই সহরের প্রায় প্রান্তভাগে সুবিধায় একখানি বাগানবাড়ী ক্রয় করিয়া স্থায়ী বাসিন্দা হন। গঙ্গাধর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি অনেক চেষ্টা-যত্ন করিয়া পুত্রকে রুড়কীর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। পুত্র সেখানে প্রায় এক বৎসর পড়িয়া পিতার অনিচ্ছায় লক্ষ্ণৌর মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে সুরু করেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি মিস সোনা নাম্নী এক বাঙ্গালী খৃষ্টান তরুণীর প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করেন এবং তাহার পর উভয়ে আমেরিকায় 'হনিমুন' করিতে যান। তাঁহার প্রণয়িনীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী নোরা তৎকালে স্বামীর সহিত নিউইয়র্কে বাস করিতেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, নোরার স্বামীর পদবী এবং নামের আদ্যক্ষরের সহিত গঙ্গাধরের নাম ও

পদবীর আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য ছিল। তবে নোরার স্বামী গণপতির পদবী 'অধিকারী' হইলেও জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। পঠদ্দশায় লক্ষ্ণৌর ইংরেজ সিভিল সার্জ্জেনের সুনজরে পড়িয়া তিনি উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান এবং সেই সূত্রে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চতর চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা-কল্পে নিউইয়র্কে গমন করেন। নোরাও তৎকালে আমেরিকান কনসলের পীড়িতা পত্নীর নার্স-রূপে মোটা বেতনে লক্ষ্ণৌ হইতে নিউইয়র্কে উপস্থিত হয়। । মেডিকেল কলেজের সংশ্রবে উভয়ের মধ্যে যে স্বল্প পরিচয় ছিল, নিউইয়র্কে অবস্থান কালে তাহা নিবিড় হইয়া উঠে। নোরার সুপারিসের জোরে গণপতি নিউইয়র্কে মেণ্ট্যাল কলেজের সম্পর্কে একটি চাকরী পাইয়া মানসিক ব্যাধি চিকিৎসা বিদ্যার অনুশীলনের সুযোগ পান। দুই বৎসরের মধ্যেই এই বিদ্যায় তিনি এরূপ কৃতিত্ব লাভ করেন যে, কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উচ্চ বেতনে বিশিষ্ট অধ্যাপকের পদে নিয়োগপত্র লাভ তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া উঠে। অতঃপর নোরাকে বিবাহ করিয়া তিনি নিউইয়র্কেই বসবাস করিতে থাকেন।

নোরা যখন আমেরিকায় চলিয়া যায়, সে সময় সোনা তাহার মায়ের নিকট লক্ষ্ণৌএ থাকিয়া ধাত্রী-বিদ্যা শিখিতেছিল। নিউইয়র্ক হইতে নোরা এই পরিবারটির খরচ পাঠাইত। কালক্রমে যখন সে সংবাদ পাইল যে সোনাও এক কৃতবিদ্য বাঙ্গালীকে বিবাহ করিতেছে এবং তাহার স্বামীর পদবীও অধিকারী, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নোরা নবদম্পতিকে নিউইয়র্কে আমন্ত্রণ করিয়া বসে, এমন কি, উভয়ের কেবিন ভাড়ার টাকা পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেয়। সোনা প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়াছিল, কিন্তু সুবিধাবাদী গঙ্গাধর সস্তায় কিস্তি মারিবার এমন সুযোগ ত্যাগ করা সমীচীন মনে করেন নাই। ফলে নোরার অর্থে তাঁহাদের নিউইয়র্ক যাত্রা সম্ভব হইয়া উঠে।

ডাক্তার গণপতি নিউইয়র্কে রাজার হালে বাস করিতেন। নবদম্পতি তাঁহার আলয়ে সাদরে গৃহীত হন এবং গণপতি কৃতবিদ্য আত্মীয়টিকে নিজের প্রাইভেট সেক্রেটারী করিয়া লন। গঙ্গাধর লক্ষ্য করেন, মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে ডাক্তার গণপতির কৃতিত্ব অসাধারণ এবং তিনি এ-সম্পর্কে বিস্তর গবেষণা-পূর্ব্বক যে সকল অপূর্ব্ব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাদের গুরুত্বও প্রচুর। কিন্তু গণপতি সেগুলো কলেজের শিক্ষার্থীদিগকে শুনাইয়াই নিরস্ত থাকিতেন, ছাপার অক্ষরে রূপায়িত করিবার কোন আগ্রহই তাঁহার ছিল না। সুবিধাবাদী গঙ্গাধরের কূটবুদ্ধি অমনই খুলিয়া যায়। তিনি সেই সকল গবেষণামূলক তথ্যগুলি কপি করিয়া ভারতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া চিকিৎসক-সমাজে এরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন যে, ডাক্তার জি, অধিকারীর খ্যাতি সঙ্গে সঙ্গে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এ সকল ব্যাপারে লক্ষ্য রাখিবার অবসর যেমন ডাক্তার গণপতির ছিল না, নামের খ্যাতিকেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না।

কিন্তু ঘটনাচক্রে একদা এলাহাবাদের মেডিক্যাল জার্ণাল প্রকাশিত মানসিক ব্যাধির বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ অধিকারীর লিখিত একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ডাক্তার গণপতিকে বিস্ময়ান্বিত করিলে গঙ্গাধর দিব্য সপ্রতিভ-ভাবে এইরূপ স্বীকারোক্তি করেন: আপনার এ লেখাটা আমিই জর্ণালে পাঠিয়েছিলুম। তার কারণ, এত-বড় একটা প্রতিভা কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, সেটা আমার অভিপ্রেত নয়। তাই, আপনার অজ্ঞাতেই আপনার লেখাটা আমাকে চুপি-চুপি কপি করে পাঠাতে হয়েছিল।

ডাক্তার গণপতি গঙ্গাধরের এই কৈফিয়ৎ শুনিয়া গম্ভীর মুখে বলেন: আমার অজ্ঞাতেই যখন লেখাটা চুপি-চুপি পাঠিয়েছ, তখন এ-লেখার নিন্দা বা খ্যাতি তোমারই প্রাপ্য। আমি জানবো. এবং যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে স্বচ্ছন্দে জানাবো—প্রবন্ধ-লেখক ডাঃ জি, অধিকারী—তুমিই।

এই ঘটনার কিছু কাল পরেই মোটর-দুর্ঘটনায় ডাক্তার গণপতি এবং তাঁহার পত্নী নোরা শোচনীয়রূপে মৃত্যু বরণ করিলে সুবিধাবাদী গঙ্গাধর তৎকালে বিরলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন: তুমি আমাকে নিষ্কণ্টক করলে, খ্যাতির পথ আমার এত দিনে খুলে দিলে।

নোরা তার তিন বছরের শিশুপুত্রটির ভার ভগিনীর উপর দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। দুর্ঘটনার সময় শিশুটি সোনার কাছেই ছিল। দুঃসংবাদটি শুনিবা মাত্র সোনা প্রথমে শোকের আঘাতে মূর্চ্ছা যাইবার মত হইয়াছিল, কিন্তু চাঁদের কণার মত পিতৃমাতৃহীন শিশুটির মুখের পানে তাকাইয়া তাহাকে বুক বাঁধিতে হয়।

দুর্ঘটনার পর গঙ্গাধরকে স্বার্থগত সুবিধার অনুরোধে আরও কিছু কাল নিউইয়র্কে থাকিতে হয়। এবং এই সময় অপ্রতিহত গতিতে বিভিন্ন ভারতীয় পত্রিকাসমূহে বিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জি, অধিকারী-লিখিত মানসিক ব্যাধি সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। উপরন্তু প্রবন্ধের সহিত গঙ্গাধরের ছবি মুদ্রিত হইয়া

অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে ডাক্তার অধিকারীর আকৃতির সহিত পরিচিত করিয়া দেয়। অবশেষে নিউইয়র্কের পাট তুলিয়া গঙ্গাধর যখন সপরিবারে এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার অধিকারীর নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, বীজ বপন মাত্রই অঙ্কুরিত হইবার কথা। সুতরাং সত্যকার বিজ্ঞান-সাধক এবং প্রতিভাবান কর্ম্মী গণপতির সুপ্রচুর সঞ্চয় সম্বল করিয়া প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা গঙ্গাধরের পক্ষে কঠিন হইল না। অন্যের প্রতিভা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া যে ব্যক্তি কাজে লাগাইবার বুদ্ধি রাখে, তাহাকে 'জিনিয়াস' না বলিলেও অনায়াসে 'ইন্টেলিজেন্ট' বলা চলে।

কিন্তু সুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া বুদ্ধির প্রভাবে স্বার্থসিদ্ধির পথ এ ভাবে মুক্ত করিয়াও ডাক্তার অধিকারী সুখী হইতে পারেন নাই। আর্থিক অভাব তাঁহার এত-বড় খ্যাতির প্রভাকেও যেন সর্ব্বদাই আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। নোরার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গণপতি নিউইয়র্ক হইতে বরাবর তাঁহার মাতাকে প্রচুর সাহায্য পাঠাইতেন। তাঁহাদের শোচনীয় মৃত্যুর পর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গঙ্গাধরকে তাহা চালু রাখিতে হইয়াছে। এবং এই ব্যাপারে সোনার নির্ব্বন্ধের প্রভাবও পর্য্যাপ্ত। গণপতির বিয়োগে গঙ্গাধরের আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যায় এবং তাঁহার এমন কিছু আর্থিক সঞ্চয় ছিল না যে, নিউইয়র্কের ব্যয় বহন করিয়া সাহায্য বজায় রাখা চলে; কিন্তু গঙ্গাধরের এই যুক্তি সোনার নিকট খাটে নাই। মাতা ও কন্যা পত্রযোগে এই পরামর্শ স্থির করেন যে, এলাহাবাদে গঙ্গাধরের পৈতৃক যে বাড়ীখানি খালি পড়িয়া আছে, মাতা তাহার পোষ্যগণকে লইয়া সেখানেই বসবাস করিবেন। ফলে, নিউইয়র্ক হইতেই গঙ্গাধরকে ব্যবস্থাটি পাকা করিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও গঙ্গাধর নিষ্কৃতি পান নাই। সাত-আটটি প্রাণীর মাথা রাখিবার স্থানের যেন ব্যবস্থা হইল, কিন্তু পেটের ব্যবস্থা কে করিবে? অগত্যা গণপতির গুপ্ত তহবিলের অর্থ যাহা গঙ্গাধর অন্যের অজ্ঞাতে অতি সন্তর্পণে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে অংশ-বিশেষ তাঁহাকে প্রতি মাসে যথাস্থানে নিয়মিতরূপে দাখিল করিতে হইয়াছে।

সোনার মাতার নাম সারা। নোরা ও সোনা ভিন্ন তাঁহার অপর সন্তান-সন্ততি না থাকিলেও পোষ্য-সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়। যথা—একটি খঞ্জ ভাই, তাহার তিনটি অসহায় মাতৃহারা সন্তান; এক পতি-পুত্রহীনা বিধবা বোন, দুটি কুকুর, তিনটি বিড়াল, এক জোড়া ছাগল। পোষ্য যেখানে এতগুলি, আয়ের পরিমাণ সে স্থলে মাত্র গুটি পঁয়ত্রিশ টাকা। সারার স্বামী যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করিতেন, সেখানে সিনিয়ার কর্ম্মচারীদের মৃত্যুর পর অপুত্রক বিধবা সম্বন্ধে 'উইডো পেন্‌সনে'র ব্যবস্থা থাকায় সারা মাসিক পঁচিশ টাকা হারে ভাতা পাইতেন। কিন্তু সারা এই টাকার অধিকাংশ গোপনে সঞ্চয় করিয়া কন্যাদের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেন।

ডাক্তার অধিকারী সোনা এবং নোরার পুত্র ওটিনকে লইয়া যখন এলাহাবাদে আসেন, তখন তাঁহার শাশুড়ী সারা উক্ত পোষ্যগুলিকে লইয়া জামাতার পৈতৃক বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতেছিলেন। স্ত্রী সোনা এবং নোরার শিশুপুত্র ওটিনের সহিত পৈতৃক বাড়ীতে উঠিবা মাত্রই পোষ্যগুলির প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য তাঁহাকে ত্রস্ত এবং তাঁহার তীক্ষ্ণ দুটি চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া তোলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পত্নী সোনা তাঁহাকে অন্যের অলক্ষ্যে চাপা-স্বরে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেয়—খবরদার, এ-সব দেখে ভড়কালে চলবে না। এদের নিয়েই আমার মা'র সংসার, আর তোমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তির মূলে আমার মা!

সুতরাং সোনার এই সতর্ক-বাণীকে 'মটো' করিয়া ডাক্তার অধিকারীকে অতি সন্তর্পণে জীবন-তরীটি চালাইতে হইয়াছে। কারণ, তিনি জানেন যে, সোনার অজানা কিছুই নাই। সোনা যদি বিগড়ায়, তাহা হইলে তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির উপরের পালিস চটিয়া যাইবে—ধোঁকার টাটি ফুটা হইবে। কাজেই, মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া নির্ব্বিচারেই তাঁহাকে এই বৃহৎ পোষ্যটির যাবতীয় ভার বহন করিতে হইয়াছে এবং নিজের প্রতিপত্তির সহিত পোষ্যদের তুষ্টি বজায় রাখিতে তাঁহার ঋণের বোঝা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আয়বৃদ্ধির আশায় ইদানীং ডাক্তার অধিকারী যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। মানসিক ব্যাধির সঙ্গে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া তিনি অপরাধ-তত্ত্বানুসন্ধানেও সুপটু—এই মর্ম্মে ফতোয়া দিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিবার সুযোগ না পাওয়ায় তাঁহার এদিককার আয়ের পথ প্রশস্ত হয় নাই। এই পথটি নিরঙ্কুশ করিতে ডাঃ অধিকারী যখন ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়াছেন, সেই সময় ধনকুবের

হরপ্রসাদের কন্যার নিরুদ্দেশ-বার্তা এবং উদ্দেশকারীর সম্বন্ধে বিপুল পুরস্কার ঘোষণা তাঁহাকে সচকিত করিয়া তোলে। সাগ্রহে তিনি যখন এ-সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতে উদ্যত, ঠিক সেই সময় হরপ্রসাদ স্বয়ং তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হন।

ইহার পর হরপ্রসাদ ডাঃ অধিকারীর প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া কি ভাবে তাঁহার উপর কন্যা, বন্ধু এবং বন্ধুপুত্রের অনুসন্ধানের সহিত বাড়ীখানি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পর্য্যন্ত অর্পণ করিয়া সপরিবার বোম্বাই চলিয়া যান, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সংসারবাবু হরপ্রসাদকে এলাহাবাদ ষ্টেশনে বোম্বাই মেলে তুলিয়া দিয়া ডাক্তার অধিকারী যে-দিন বাড়ীতে ফিরিলেন, সোনা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, স্বামীর চির-মেঘাচ্ছন্ন মুখের উপর হঠাৎ যেন জ্যোৎস্নার আভা পড়িয়াছে। কোন্ গগনের চন্দ্রোদয়ে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহার সন্ধানে সে যখন উৎসুক হইয়া উঠিল, তখন অধিকারী নিজেই রহস্যের আবরণটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন। তখন স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যে সংলাপ সুরু হইল, তাহা হইতেই অবস্থাটি উপলব্ধি হইবে।

স্ত্রী : ব্যাপার কি—নতুন শীকার জুটেছে নাকি?

স্বামী : শীকার কি না জানি না, তবে একটা টাকার গাছ যে খুঁজে পেয়েছি তা অস্বীকার করব না।

স্ত্রী : তোমার মুখ দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছি। এমনি হাসি-খুসির ঝিলিক দেখেছি নিউইয়র্কে—আমার ভগিনীপতি যে দিন বিশ্বাস করে সর্ব্বস্ব তোমার হাতে সঁপে দেন।

স্বামী : সর্ব্বস্ব মানে কতকগুলো কাগজপত্রের বাণ্ডিল। সে যাই হোক, তবু আমি তার জন্যে কৃতজ্ঞ। সে ভদ্রলোক তাঁর বাড়ীতে রেখে সেক্রেটারীর কাজের ভার চাপিয়ে দুটি প্রাণীর যে ভার নিয়েছিলেন, আর তার জন্যেই অত দিন নিউইয়র্ক বাস আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, আমি তা কোন দিন অস্বীকার করব না।

স্ত্রী : শুনে কৃতার্থ হলুম, সেটা তাঁরই সৌভাগ্য নিশ্চয়! কিন্তু এটাও স্বীকার করা উচিত বোধ হয় এই সঙ্গে, তখন তিনি হয়েছিলেন তোমার সৌভাগ্যের গাছ; চুপি-চুপি একটি একটি করে গাছটির ফুল-পাতা সব ছিঁড়ে নিজের জন্যে খ্যাতির মালা গেঁথেছিলে। যাক সে কথা, এখন টাকার গাছটি হয়েছেন কে শুনি? ও কি, মুখখানা যে আবার অন্ধকার হয়ে গেল!

স্বামী : তোমার জন্যেই। জোরে একটা ফুঁ দিয়ে আলোটি নিবিয়ে দিলে—অন্ধকার হবেই ত!

স্ত্রী : সে দোষ কার? আমার কাছে নিজের বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না? লোকের চোখে ধোঁকা দিয়ে বাহাদুরী দেখাচ্ছ—দেখাও, তাতে ত আমি কিছু বলিনি। কিন্তু আমি ত সব জানি—আসলে ডাক্তার জি, অধিকারী লোকটা কে? ভাগ্যিস তোমার বাবা নামটা গঙ্গাধর রেখেছিল, তাই না আমার ভগিনীপতি গণপতি ওরফে জি, অধিকারীর নামেই তরে যাচ্ছ। সে বেচারা বিদেশে কবরে ঢুকে তোমাকে স্বদেশের সভ্য-সমাজের অন্তরে ঠাঁই দিয়ে গেছেন, তাঁরই সঞ্চয় তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে—এত বড় সত্য কথা তুমি আমার কাছে চাপতে চাও কেন?

স্বামী : কি জান, নিউইয়র্কের অর্থাৎ তোমার ভগিনীপতির ব্যাপারটাকে চাপা দিয়ে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলেছি বলেই আমার ধারণা। কাজেই কোন ফাঁক দিয়ে সে-প্রসঙ্গ বেরুলেই চমকে উঠি—শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাই। যাক, আমার অনুরোধ—যেটা চাপা পড়ে গেছে, তার ঢাকাটি আর খুলো না, লক্ষ্মীটি!

স্ত্রী : ঢাকায় চাপা জিনিসটিই ত হচ্ছে তোমার বিষের মূল গো। ফোঁস করলেই ঢাকা খুলতে হয়।

স্বামী : ফোঁস করি কি সাধে! তোমার মা'র এক পাল পুষ্যিকে বাজার হালে পুষতে হচ্ছে বাড়ীতে রেখে। তার ওপরে আছে—তোমার ভগিনীপোতের ছেলে। যা উপায় করি, কুলোয় না; দেনায় মাথার চুল পর্য্যন্ত বিকিয়ে যাবার জো হয়েছে।

স্ত্রী : তার জন্যে এখন চুল ছিঁড়ে ত কোন লাভ নেই। আমার ভগিনীপতি বরাবরই এই পোষ্যগুলির ভার বহন করেছেন—নিউইয়র্ক থেকে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে তুমি যখন তাঁর নাম-খ্যাতি প্রতিপত্তির সুযোগ-সুবিধা সব নিয়েছ, এ ভার ত তোমাকে নিতেই হবে। তারপর, ছেলের ব্যাপারে তোমার লাভ বই লোকসান নেই। দিদির ছেলেকে আমিই কোলে করে মানুষ করেছি, সে জানে আমিই তার মা। নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কে তার নামে যে টাকা জমা আছে, সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত তুলতে না পারলেও, যে-সুদ পাচ্ছ মাসে মাসে, তাতে তার সব খরচ চলে যাচ্ছে। বোঝ সব, বোঝা টেনেও যাচ্ছ, তবু মাঝে-মাঝে ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার মতন বেগড়ানো চাই-ই।

স্বামী : তাতেও ত পার নেই—সঙ্গে সঙ্গে অমনি চাবুক হাঁকরে দুরস্ত করবার গাড়োয়ানও ত মোতায়েন আছে। যাক্, এখন থেকে না হয় হুঁসিয়ার হওয়া যাবে।

স্ত্রী : আগে থেকে এ সুবুদ্ধিটুকু উদয় হলে এত কথা উঠত না। এখন, যে কথা থেকে এত কথা উঠল, সেটাই শুনি! টাকার গাছটি বললেন কে?

স্বামী : নাম-করা মার্চেন্টস্ মেসার্স এইচ, পি, ঘোষের নাম শুনেছ ত? তারই মালিক—হরি ঘোষ।

স্ত্রী : মনে পড়েছে। মেয়ে হারাবার পর তার বন্ধুর মাথা বিগড়োয়। তোমাকে কল দিয়েছিল শুনিছি। তাকে বুঝি সারিয়েছ?

স্বামী : না। সেও হারিয়ে গেছে। সন্ধান চলেছে। এখন হারানো মেয়ে, বন্ধু আর তার একটি ছেলে—এদের যদি কিনারা করতে পারা যায়, টাকার ভাবনা চুকে যাবে। তিনি আমার ওপরেই সমস্ত ভার দিয়ে আজ বোম্বাই চলে গেলেন।

স্ত্রী : এ যে সেই গাছে কাঁটাল আর গোঁফে তেল দেবার জো দেখছি! সন্ধান করলে তবে ত ··

স্বামী : আমি এত বোকা নই। সন্ধানের ব্যাপারে দশ হাজার টাকার চেক আগাম পেয়েছি। তা ছাড়া, ওঁর প্যালেসের মত নতুন বাড়ী আমার জিম্মাতেই দিয়ে গেছেন।

স্ত্রী : বল কি?

স্বামী : দরকার পড়লে বা এদের কোন নিশানা বার করতে পারলে আরো টাকা তিনি ঢালবেন।

স্ত্রী : তবে ত সত্যিই টাকার গাছ পেয়েছ গো। তাহলে এখন ভরসা করে কথাটা তোমাকে বলি ··

স্বামী : আবার কি কথা বলবে? সুর ত ভাল মনে হচ্ছে না।

স্ত্রী : ভূমিকা না করেই তাহলে বলি শোন: পুষ্যির আর একটি ভার তোমাকে নিতে হবে।

স্বামী : বল কি?

স্ত্রী : চমকাবার মত কিছু নয়। আট বছরের একটি মেয়ে। আমার ছোট মাসীমা সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন, মেয়েটি তাঁরই দূর-সম্পর্কের ভাসুর-ঝি, তিন কুলে তার কেউ নেই। আর মাসীমার অবস্থা ত জান, কোন রকমে তাঁদের দিন চলে। মেয়েটিকে পোষবার শক্তি তাঁর নেই। তাই বড়মুখ করেই এখানে পাঠিয়েছেন।

স্বামী : চমৎকার!

স্ত্রী : কিন্তু মেয়েটিকে দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না, তখন মুগ্ধ হয়েই বলতে হবে—চমৎকার!

স্বামী : এখন বুঝতে পারছ ত, ঘোড়া সাধ করে বিগড়োয় না?

স্ত্রী : কি দুঃখেই বা বিগড়োবে শুনি? ঐ মেয়ের আয়-পয়েই তুমি টাকার গাছ পেয়েছ তা জান? যদি ভাল চাও, ভারটি খুসিমনেই নাও, হেলা ক'র না তাকে। ঐ দেখ, মেয়েটি এসে ঝাঁকে মিশে গেছে, খেলছে বাগানে; দেখতে দিব্যিটি—নয়?

সোনার কথা খণ্ডন করা কোন দিনই ডাক্তার অম্বিকারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না, এ ক্ষেত্রেও তাহা অগ্রগণ্যীয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। কারণ, গৃহ সংলগ্ন ক্ষুদ্র উদ্যানে ক্রীড়াশীল বালক-বালিকাদের মধ্যে নবাগতা মেয়েটির সুশ্রী সুন্দর আকৃতি তাঁহার চোখে পড়িতেই মস্তিষ্কের মধ্যে বাঁ করিয়া একটা সঙ্কল্প অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। হরপ্রসাদের নিরুদ্দিষ্টা কন্যা রেণুর আলোকচিত্রটি তাঁহার স্মৃতির পাতায় গাঢ় ভাবেই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। নবাগতা এই মেয়েটির দেহভঙ্গি এবং মুখখানি সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁহার স্নায়ুপুঞ্জে এই মর্মে আর একটি নূতন পরিকল্পনা জাগ্রত করিয়া তুলিল···রেণুর চেহারার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে নয় কি···যদি রেণুর সন্ধান না-ই মেলে, বছর কয়েক পরে এই মেয়েকেই শিখিয়ে রেণু বলে চালিয়ে দেওয়া কি সম্ভব নয়?···

মনের ভাব মনেই প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডাক্তার অম্বিকারী স্মিতমুখে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন: মেয়েটির নাম কি?

পত্নী বলিলেন, ঔষধ ধরিয়াছে। হাসিয়া উত্তর দিলেন: ওর ভাল নাম রুক্মিণী। কিন্তু সবাই রিনি বলে ডাকে।

স্বামী : এই সর্ত্তে আমি মেয়েটিকে পুষতে পারি—নিজের ইচ্ছামত আমি ওকে তৈরী করব। বাড়ীর এই যে সেরা আর আলাদা অংশটিতে আমরা থাকি, এই অংশেই রিনি থাকবে। কিন্তু তার থাকা, খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, লেখাপড়া সব কিছুই আমার ব্যবস্থামত হবে।

স্ত্রী : তা যেন হল, কিন্তু আমাদের ঘর-দালান ওকে ছেড়ে দিয়ে আমরা কোথায় যাব? এত টান দেখে ভয় করছে যে!

কণ্ঠস্বর তরল করিয়া ডাক্তার বলিলেন: আট বছরের খুকির ওপর আটচল্লিশ বছরের বুড়োর টান দেখে ভয় পাবার কিছুই নেই। রিনির থাকার ব্যবস্থা করে আমরা অবশ্য রাস্তায় দাঁড়াব না। তবে বাসা আমাদের বদলাতে হবে।

বিস্ময়ের সুরে স্ত্রী প্রশ্ন করিলেন: তার মানে?

স্বামী : মানে হচ্ছে—হরপ্রসাদ ঘোষের বাড়ীখানা খালি পড়ে থাকবে না, আমরা সেখানে থাকবো। তুমি আমি আর ওটিন। এখানে ওঁরা সব যেমন আছেন

থাকবেন, আর আমাদের ঘরে নজরবন্দী থেকে মানুষ হবে রিনি। অবশ্য এ-ব্যাপারে একটা উদ্দেশ্য আছে।

স্ত্রী: সে উদ্দেশ্য আমি বুঝেছি।

স্বামী: বল কি?

স্ত্রী: সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তোমার মুখের কথার সুর ধরেই আমি বলতে পারি, শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গড়াবে। উদ্দেশ্যটি হচ্ছে—যদি হরপ্রসাদের মেয়েকে খুঁজে পাওয়া না যায়, রিনিকেই পরে সেই মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া। তার জন্যে এখন থেকেই চুপি-চুপি শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া চাই—এই ত?

স্বামী: তুমি সত্যিই অদ্ভুত।

স্ত্রী: তোমার চেয়েও? কিন্তু তুমি যে গোড়াতেই গলদ করছ! রিনিকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরী করে নিতে হলে আমার মাকে আড়ালে রাখলে চলবে না। এ-সব ব্যাপারে মা'র আমার মাথা যেমন পাকা, তেমনি খেলে। স্বচ্ছন্দে তুমি মা'র ওপর ভার দিতে পার, অবশ্য মাথার ওপরে তুমি থাকবে।

স্ত্রীর যুক্তিটি ডাক্তার অধিকারীর মনে লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এ কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম। কোন মেয়েকে মনের মত তৈরী করে নিতে হলে কোন বিচক্ষণ মেয়েরই যে আবশ্যক, আমার সায়েন্সও তাই বলে। বেশ, মা'কে ডেকে এখনি কথাটা ঠিক করে ফেলা যাক্। তবে একটা কথা, ফাঁস হলেই মুস্কিল, ত নি্তুসব ভেস্তে যাবে।

মুখখানি শক্ত করিয়া সোনা কহিল: মনের কথা পেটে চেপে রেখে কাজ গুছুতে মা-আমার কি রকম শক্ত, আজও কি সেটা বুঝতে পার নি? তুমি যা-যা চাও, মাকে তার একটু আভাস দিলেই হবে, পরে মা'র কেরামতী দেখে নিজেই চমকে উঠবে!

ডাক্তার অধিকারীর মুখে পুনরায় হাসির ঈষৎ রেখা পড়িল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন: বেশ, তাহলে মাকেই ডাকো, ব্যবস্থা পাকা করা যাক্।

হরপ্রসাদের সুবৃহৎ বাড়ীর যে-অংশটি আত্মীয়-স্বজন বা সম্মানভাজন অতিথি-অভ্যাগতদের সাময়িক অবস্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, ডাক্তার অধিকারী তাহা অধিকার করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারটি পাতিয়াছেন। ধনী গৃহস্বামীর সুসজ্জিত বৈঠকখানাটি এক্ষণে ডাক্তার অধিকারীর মনোবিজ্ঞানাগারে পরিণত হইয়াছে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত নর-নারীর বিভিন্ন অবস্থার বিলাতী চিত্রাবলী ঘরখানির দেওয়ালগুলি আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। চিকিৎসাগ্রন্থপূর্ণ দুইটি বড় বড় বুক-কেস আসিয়া ঘরের গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে। বৈঠকখানায় এখন ঢুকিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ মুকুরটির উপর আমেরিকান ফ্রেমে বাঁধানো ডাক্তার অধিকারীর আলেখ্যখানি প্রথমেই আগন্তুকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে স্ত্রী সোনা এবং ওটিন। বারো-তেরো বছরের সুশ্রী সুন্দর ছেলেটির মুখখানি তাহার লোকান্তরিতা মাতার মুখমণ্ডলের যেন প্রতিচ্ছবি। লোবা ও সোনা দুই ভগিনীর আকৃতিগত সাদৃশ্যও ছিল অদ্ভুত রকমের। সুতরাং সোনার কাছে ওটিনকে দেখিলে সে যে তাহারই গর্ভজাত সন্তান নয়, এ কথা জোর করিয়া বলিয়া না দিলে কাহারও সন্দেহ করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু ডাঃ অধিকারীর চেহারার সহিত ছেলেটির আকৃতির বিশেষ কোন সাদৃশ্য ছিল না। এদিক দিয়া ওটিনের দেহের গঠন ছিল তাহার পিতার মতই ঋজু ও দীর্ঘায়ত। তথাপি সকলেই এমন কি ওটিন পর্য্যন্ত জানে যে, সোনার গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং ডাক্তার অধিকারীর একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী সে। অবশ্য সোনার মা শাশার কাছে উহা প্রচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয় নাই। তিনি ইহা জানিতেন এবং তাঁহার এই পিতৃ-মাতৃহীন দৌহিত্রটিকে নিজের পুত্র বলিয়া পরিচিত করার জন্য কন্যা-জামাতার বুদ্ধির প্রশংসাও করিতেন। কিন্তু বুদ্ধিমান জামাতা ভালো ভাবেই বুঝিতেন যে, এজন্য এই মহিলাটি তাঁহার সৌভাগ্যের ভিত্তির দিকে তাকাইয়া নিজের সুযোগ-সুবিধাগুলি সুচারুরূপে গুছাইয়া লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। কোনরূপে তাঁহার সামান্য ত্রুটিতে যদি কোন দিন পাণ হইতে চুণটুকু খসিয়া পড়ে তাহা হইলে এই ধোঁকার টাটিও এক দিনেই ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া যাইবে।

আর, এ সম্বন্ধে সোনার কি মনোভাব তাহা স্বামি-স্ত্রীর সংলাপে পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। পোষ্যবর্গের সহিত মাতাকে স্বামীর গলগ্রহ জানিয়াও সোনা যেন জোর করিয়া মায়ের মর্য্যাদাটুকু বাঁচাইয়া চলিত এবং স্বামীকে এ-সম্পর্কে অসহিষ্ণু বা বিরক্ত হইতে দেখিলেই ধোঁকার টাটিখানি ধরিয়া নাড়া দিত। এমনই একটি ব্যাপারের মধ্যেই ঘটনার স্রোত যায় অপ্রত্যাশিত-ভাবে অন্য দিকে ঘুরিয়া। সোনাই বুদ্ধি করিয়া নেপথ্য হইতে মাতাকে আনিয়া উপদেষ্টার আসনে বসাইয়া দেয়।

সারা একটু সঙ্কুচিত ভাবেই আত্মীয়স্থানীয়া সর্ব্বহারা

বালিকাটিকে জামাতার সংসারে আনিয়াছিলেন, কিন্তু পরে কথা-প্রসঙ্গে যখন জানিতে পারেন যে, জামাতা বাবাজী এই দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী ও সুদর্শনা মেয়েটিকে হাতেরপাঁচরূপে ধরিয়া রাখিয়া একটা মোটা রকম দাঁও মারিবার ফিকিরে তাঁহারই শরণাপন্ন, তখন তাঁহার অন্তর্নিহিত সঙ্কোচটুকু অন্তরের অন্তস্তলে কোথায় যে তলাইয়া যায়, আর অতিলোভের একটা উদ্দাম লালসা সেই স্থানটি জুড়িয়া বসে, তাহা বোধ হয় সারা নিজেই স্থির করিতে পারে নাই। হরপ্রসাদের কন্যা রেণুর নিরুদ্দেশবার্তা এবং সেই নিরুদ্দিষ্টা কন্যাটির সন্ধানকল্পে ধনী পিতার কোষাগারের দরজাটি অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইবার কথা সারা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এখন তাঁহার জামাতার সদৃষ্টেই সেই সৌভাগ্য দ্বারের পুরোভাগে দাঁড়াইবার সুযোগ ঘটিয়াছে এবং দৈবাৎক্রমে যে চাবিটি তিনি কুড়াইয়া পাইয়াছেন, মাজিয়া-ঘষিয়া সেটিকে কোনক্রমে তালায় লাগাইতে পারিলেই যে ঐ বদ্ধ দরজাটি উন্মুক্ত হইয়া যাইবে—ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি জামাতাকে আশ্বাস দেন—কাজটা যদিও খুব শক্ত, গাধা পিটে ঘোড়া বানানোর মত, কিন্তু হবে না এমন কথা আমি বলব না। তবে বাপু, এ-সব তাড়া-হুড়োর কাজ নয়। অনেক কাঠ-খড় এর পিছনে পোড়াতে হবে। তাহলেও ভরসা তোমাকে দিতে পারি, আমার কথামত যদি চল, বছর কয়েকের ভিতরে এই মেয়েকেই আমি ঐ হারানো মেয়ে বেশ করে তাক লাগিয়ে দেব।

কাজেই অতঃপর শাশুড়ীর সহিত পারাপোক্ত ভাবে ডাক্তার অধিকারীর যে-সব কথাবার্ত্তা হয়, তদনুসারেই পরবর্ত্তী কার্য্যধারা চলিয়াছে। যথা—

পিতৃ ও মাতৃকুল সম্বন্ধে রেণুর বয়সী অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ের পক্ষে যতটুকু সংবাদ রাখা সম্ভব, তাহাদের একটা বৃত্তান্ত।

তাহার বেশ-ভূষা, পড়া-শুনা, খাওয়া-দাওয়া, খেলা-ধূলা, হাসি-খুসি রাগ-অভিমান প্রভৃতির একটা হিসাব। এবং তাহার পক্ষে স্মরণীয় সাংসারিক ঘটনাগুলির ফিরিস্তি।

বোম্বাইয়ের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া হরপ্রসাদের নিকট হইতে উল্লিখিত তথ্যগুলি ডাক্তার অধিকারীকে সংগ্রহ করিয়া শাশুড়ীর সেরেস্তায় দাখিল করিতে হইয়াছে। এই সঙ্গে রেণুর বিভিন্ন বয়স এবং ভঙ্গির আলেখ্যগুলিও আসিয়াছে। এই সমস্ত উপাদানগুলি সাজাইয়া তাহার মধ্যে রিনি নামে নবাগতা বালিকাটিকে বসাইয়া সারার শিক্ষাদান কার্য্য বিচিত্র প্রণালীতে চলিয়াছে।

ডাক্তার অধিকারীও নিশ্চিন্ত নহেন। তাঁহাকেও ইতিমধ্যে কয়েকটি কাজ সন্তর্পণে সমাধা করিতে হইয়াছে। যথা—

হরপ্রসাদের নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু শম্ভুনাথ বসু সম্পর্কে পরিচিত বন্ধু বা আত্মীয়বর্গের উদ্দেশ্যে এই মর্ম্মে একটি বিজ্ঞাপন যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশের পত্রিকা-গুলিতে মুদ্রিত হইয়াছে যে অবিলম্বে শম্ভুনাথ বা তাঁহার পুত্রের ঠিকানা পাঠাইয়া তাঁহারা যেন পিতা-পুত্রের সৌভাগ্যোদয়ে সাহায্য করেন।

হরপ্রসাদের কন্যা রেণুর সম্বন্ধেও এই ভাবে নব পরিকল্পনার বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের কাটিংগুলি বোম্বায়ে হরপ্রসাদের নিকট কেতাদুরস্ত ভাবে পাঠাইয়া ডাক্তার অধিকারী কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। হরপ্রসাদও এই বিচক্ষণ ব্যক্তির সময়োচিত তৎপরতায় বিশেষ প্রীত এবং আশ্বস্ত হইয়াছেন।

কিন্তু পাঁচশ-ত্রিশখানি পত্রিকায় উপর্য্যুপরি কয়েক সপ্তাহ বিজ্ঞাপন প্রকাশের বহুবাঞ্ছিত ফলটি একদা একখানি পোষ্টকার্ডকে বাহন করিয়া বারাণসীর 'প্রবাস-জ্যোতি' পত্রিকার মারফত এলাহাবাদে ডাক্তার অধিকারীর হস্তগত হইল। উক্ত পোষ্টকার্ডখানির ভিতরে বাঙ্গলা অক্ষরে যে কয়টি ছত্র লেখা ছিল তাহা এইরূপ :

> বক্স নং ৫৫৩৫, প্রবাস-জ্যোতি, বেনারস সিটি
>
> মহাশয়, উক্ত বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিয়া সবিনয়ে জ্ঞাপন করিতেছি যে, প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল শম্ভুনাথ বসু তাঁহার সাত বছরের ছেলে নরনারায়ণকে আমাদের আশ্রয়ে রাখিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদই আমরা জ্ঞাত নহি। তবে তৎপুত্র নারায়ণ বাবাজীবন এক্ষণে আমার বাসাতেই থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। যেহেতু, বর্ত্তমানে আমিই উহার মাতুল এবং অভিভাবক। আমার ঠিকানা নিম্নে জানাইতেছি। ইতি—
>
> বিনীত—শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র।
>
> অডিট অফিস, দানাপুর, ই, আই, আর।

চিঠিখানি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়া ডাক্তার অধিকারী ক্ষণকাল স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলেন। পোষ্টকার্ডে লিখিত কালির বিবর্ণ হরফগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন তাঁহার সম্মুখে এমন একটি সুন্দর সুশ্রী শ্রীমান্ বালকের মূর্ত্তি ধরিল—যাহা ঠিক ওটিনের অনুরূপ। হরপ্রসাদের মুখে অন্তত পঞ্চাশ বার তিনি বন্ধুপুত্র নরনারায়ণের নাম

এবং রূপের খ্যাতি শুনিয়াছেন, এবং শ্রুত অভিব্যক্তিটুকু শুধু একখানি চিত্রপট হইতেই উদ্রিক্ত। কল্পিত মূর্তিটির সহিত ওটিনের অভিজাত-সুলভ কমনীয় আকৃতির তুলনা করিয়া ডাক্তার অধিকারী আপন মনেই খুশিয়া উঠিলেন: নরনারায়ণ···বাপ রে, কি লম্বা নাম? নামের মত মেয়েটির রূপটাও সত্যিই বাড়াবাড়ি রকমের নাকি—ওটিনের চেয়েও···

কল্পনার মূর্তি অদৃশ্য হইতেই বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিলেন, ধবধবে সাদা সার্ট-পেন্টলুনে সজ্জিত হইয়া ওটিন ঘরে ঢুকিতেছে, হাতে তাহার সুশ্রী র‍্যাকেট। প্রত্যহ বৈকালে ঠিক এই সময় তাহাকে ডাক্তার অধিকারীর সহিত পুরাতন বসতবাটীতে গিয়া দিদিমাকে দর্শন দিতে হয়। আর রিনিও সেখানে সাগ্রহে তাহার এই খেলার সাথীটির প্রতীক্ষা করে। অন্দর-সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র উদ্যানটিতে একটি ঘণ্টা ধরিয়া ইহাদের ব্যাটমিণ্টন খেলা চলিতে থাকে।

ওটিন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল: বাপু!

ডাক্তার অধিকারীকে নিউইয়র্ক হইতেই সে 'বাপু' এবং সোনাকে 'মাপু' বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

ডাক্তার অধিকারী বলিলেন: তৈরী হয়েই এসেছ একেবারে,—বেশ। তোমার মাপু কোথায়?

ওটিন উত্তর দিল: বাগানে ফুল তুলছেন।

ডাক্তার বলিলেন: আজ তিনিও আমাদের সঙ্গে ও-বাড়িতে যাবেন।

ওটিন: মাপুকে ডাকি তাহলে?

ডাক্তার: না, আমিই ডেকে আনছি। তুমি দেখ, কোচোয়ান গাড়ী জুতেছে কি না।

ডাক্তার অধিকারী চিঠিখানা হাতে করিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার বাসভবনসংলগ্ন উদ্যানটির দিকে চলিয়া গেলেন। ওটিন র‍্যাকেটটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দেউড়ির দিকে ছুটিল।

১১

সহরের শেষ প্রান্তে এমন নিভৃত অংশে ডাক্তার অধিকারীর পৈতৃক উদ্যান-ভবনটি অবস্থিত যে, তাহার আশে-পাশে লোকালয়ের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। ঘনসন্নিবিষ্ট বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষরাজির অনাবশ্যক প্রাচুর্যে বাড়ীখানাকে যেমন বিশ্রী দেখায়, হঠাৎ দেউড়ির নিকট আসিলেও বুঝিবার উপায় থাকে না যে এই বাড়ীতে লোকজন বসবাস করিয়া থাকে। ঘটনাচক্রে বাড়ীখানির এই গাম্ভীর্য্য এবং রীতিমত নির্জ্জনতা বর্ত্তমানে ডাক্তার অধিকারী তথা গৃহকর্ত্রী সারা দেবীর খুব কাজে লাগিয়া গিয়াছে।

বাহিরের অনুচ্চ দেউড়ির পর বাগানের প্রস্তরবদ্ধ সঙ্কীর্ণ পথটি ভিতরের বৃহৎ ফটকে গিয়া মিলিয়াছে। ফটকের সুদৃঢ় ও সুউচ্চ দ্বার দুইটি সর্ব্বক্ষণই রুদ্ধ থাকে। দেউড়ির দুই দিক দিয়া পুরাকালের প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরটি ভিতরের দুই মহল বাড়ী বাগান কূয়া এবং এক পুষ্করিণীকে দুর্গের মত পরিবেষ্টন করিয়াছে। সুতরাং বাহির হইতে ভিতরের অবস্থা এক নজরে দেখিয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ-সুবিধা কোথায়?

বাড়ীর মধ্যে যে সাজানো ঘরখানি ডাক্তার অধিকারী ব্যবহার করিতেন, এখন তাহা রিনির শিক্ষাগারে পরিণত হইয়াছে। সারা কিছু কাল লক্ষ্ণৌর এক মিশনারী বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়াছিলেন। সুতরাং রিনিকে মনের মত করিয়া শিখাইয়া পড়াইয়া লইবার দায়িত্ব তাঁহাকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আসলে কিন্তু এই বিদ্যাশিক্ষা ব্যাপারটি গৌণ, মুখ্য হইতেছে হাতে-কলমে এবং অখণ্ড মনোনিবেশ সহকারে এমন কতকগুলি অবাস্তব বিষয় জোর করিয়া শিক্ষা দেওয়া—যাহা আট-নয় বছরের এই মেয়েটিকে যেমন কৌতূহলাক্রান্ত করিয়া তুলে, তেমনই মধ্যে মধ্যে তাহার নির্ম্মল কোমল অন্তরটি রীতিমত বিক্ষুব্ধ করিয়া ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটি অশ্রুর বন্যায় ভাসাইয়া দেয়।

আজ এই শিক্ষারই পরীক্ষা চলিতেছিল। একখানি সোফায় বসিয়া সারা প্রশ্ন করিতেছিলেন, রিনি তাঁহার সামনেই মুখখানি ভার করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পরনে রক্তবর্ণের একখানি একলাই সাড়ী, লাল রেশমে বাঁধা লম্বা বেণীটি পিঠের উপর দোল খাইতেছে। হাতে চারিগাছি করিয়া কাচের চুড়ি, কানে ছোট ছোট দুটি ইয়ারিং। মুখখানি সুন্দর সুশ্রী চমৎকার, মুখের ভঙ্গি সপ্রতিভ, মর্ম্মস্পর্শী; চোখ দুটি টানা-টানা এবং কালো কালো তারা দুটির মধ্যে দৃষ্টিশক্তির একটা স্বচ্ছ আলো যেন জ্বল-জ্বল করিতেছে।

সারা শিক্ষয়িত্রীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া মেয়েটিকে বলিতেছিলেন: আজ যা জিজ্ঞাসা করব, ভুল যদি হয়, ভারি অন্যায় হবে কিন্তু রিনি!

রিনি একদৃষ্টে তাহার এই নূতন ভাগ্যবিধাত্রীর পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল: আমি ত ভুলব না মনে করি, কিন্তু মিছি-মিছি বলতে গেলেই ভুল করে ফেলি। আচ্ছা, আমি ত রিনি, খালি খালি রেণু হতে যাব কেন?

জোরে একটা ধমক দিয়া সারা বলিলেন: ফের ঐ কথা? হেন দিন নেই—কথাটা তুমি না তুলেছ? কতো বার তোমাকে বলা হয়েছে—এখন থেকে তুমি

রিনি নও, রেণু। তোমার নাম হচ্ছে—কুমারী রেণুবালা ঘোষ। ভুল যাতে না হয়, সেজন্যে নামটা মুখস্থ করতে বলা হয়েছে। আজ কতবার মুখস্থ করেছ শুনি?

রিনি উত্তর দিল: গুণে গুণে কুড়ি বার মুখস্থ করেছি—আমি রেণু, আমি রেণু, আমি রেণু—

সারা: তবু ভুল কর কেন?

রিনি: জিজ্ঞাসা করলেই অমনি খপ করে মনে পড়ে যায়—আমি রিনি, আমার নাম কুমারী রিনি রায়।

সারা: ফের যদি ঐ কথা বল, মুখে কিন্তু গোবর গুঁজে দেব তা বলে রাখছি। তোমার মত ভুলো-মন মেয়ে যদি দুটি দেখেছি!

রিনি: আচ্ছা, আমি আর ভুল করব না, এখন থেকে খালি-খালি মনে মনে মুখস্থ করব—আমি রিনি নই—রেণু; আমি রিনি নই—রেণু।

সারা: হ্যাঁ, তাই করবে। আর মনে রেখ, তোমার ভালর জন্য এটা করা হচ্ছে। রিনি হয়ে ত এত দিন ছিলে, কত কষ্টে মানুষ হয়েছ, জান ত? পেট ভরে দু'বেলা খেতেও পেতে না, এ রকম কাপড় পরেছ কোন দিন এখানে আসবার আগে? যদি ভুল আর না হয়, দেখবে আরও কত কি পাও, কাপড় জামা সেমিজ গয়না, সোনার চুড়ি—

কথাগুলি এমন সুরে সারা বলিলেন যে, লোভে ও আনন্দে রিনির মুখখানা রাঙ্গা হইয়া উঠিল। চোখে-মুখে হাসি ফুটাইয়া সে কহিল: সত্যি? চুড়ি পাব আমি—চুড়ি? সোনার চুড়ি?

সারা কহিলেন: হ্যাঁ, সোনার চুড়ি। কাচের চুড়ি তোমাকে আর পরতে হবে না, দেখবে তখন কি সুন্দর চুড়িই গড়িয়ে দিই।

উল্লাসে করতালি দিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল: বা—বা, কি মজা! আমার চুড়ি হবে—সোনার চুড়ি, আমি সবাইকে দেখাব।

সারা: দেখিও, কিন্তু আগে ত কথাগুলো ঠিকমত মুখস্থ কর, ভুল যাতে না হয়।

রিনি: না, আর আমার ভুল হবে না, আমি আর ভুলেও ভাববো না যে, আমি রেণু নই—রিনি! দেখুন আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আর কেমন ভুলি!

প্রসন্নমুখে এবার সারা প্রশ্ন করিলেন: আচ্ছা, এবার বল ত লক্ষ্মীটি—তুমি কে? তোমার নাম কি?

রিনি মুখস্থ পড়া বলার ভঙ্গিতে উত্তর দিল: আমি রেণু। আমার নাম, কুমারী রেণুবালা ঘোষ।

সারা: তোমার বাবার নাম মনে আছে—ভেবে বল, যা শিখিয়েছি।

রিনি: বলছি; আমার বাবার নাম হচ্ছে—নাম হচ্ছে—শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ ঘোষ।

কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া এই ভাবে রিণির শিক্ষার মহলা চলিতেছে। এই সময় রুদ্ধদ্বারে আঘাত পড়িতেই সারা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন: কে?

বাহির হইতে সোনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল: আমরা এসেছি মা, দরজা খুলুন!

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ডাক্তার অধিকারী বলিলেন: বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা আপনার 'টিচিং' শুনছিলাম। রিনি আপনার হাতে থাকলে আমাদের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হবে তাতে সন্দেহ নেই।

সোনা রিনিকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন: তোমাদের ব্যাডমিণ্টন খেলবার সময় হয়েছে বোধ হয়, ওটিন উঠানে জাল খাটাচ্ছে, তোমাকে ডাকছে—যাও!

রিনির মুখখানি হাসিতে ভরিয়া গেল, সারার দিকে চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল: যাই?

সারা বলিলেন: যাও; কিন্তু হুঁসিয়ার রিনি, নাম পড়ার কথা যদি কাউকে বলেছ শুনতে পাই, তাহলে সোনার চুড়ি ত পাবেই না, কাচের চুড়িগুলো পর্য্যন্ত কেড়ে নেব।

'এ কথা যে বলতে নেই কাউকে আমি জানি'—বলিয়াই রিনি চলিয়া গেল!

সারা বলিলেন: পাখী পড়াবার মত মেয়েকে পড়াতে হচ্ছে। হাতে-খড়ি দিয়ে সবেমাত্র বর্ণপরিচয় সুরু করানো গেছে। আসল রেণু সত্যিই যদি খোয়া গিয়ে থাকে, অন্তত দুটো বছরের মধ্যে না ফেরে এই মেয়েকে কি রকম তৈরী করি দেখে নিও। তখন আসল রেণু এলেও পাত্তা পাবে না, নকল সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ডাক্তার অধিকারী বলিলেন: এদিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। এখন ওদিকে আর একটা ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। শুনেছেন ত মিষ্টার ঘোষের ধনুর্ভঙ্গ পণ, শম্ভুনাথের ছেলেকে যদি পাওয়া যায়, তাকেই মেয়ের জায়গায় বসিয়ে মানুষ করবে। এমন কি রেণু যদি ফিরে আসে তারই সঙ্গে ঐ ছেলেটার বিয়ে দেবে। তাঁর নির্দ্দেশ মতই কাগজে ছেলেটার সন্ধানে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল। ভেবেছিলুম, কেউ সাড়া-শব্দ বুঝি দেবে না। কিন্তু আজ এই পোষ্টকার্ডখানা এসেছে তার সন্ধান নিয়ে, পড়ে দেখুন।

পোষ্টকার্ডখানি শাশুড়ীর হাতে দিয়া ডাক্তার অধিকারী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন: মিঃ ঘোষের হাতে এ চিঠি পড়লে আর রক্ষা থাকবে না, তখনি দাঁজাপুর থেকে ছোঁড়াটাকে আনিয়ে ছাড়

নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু তাহলে আমাদের এদিককার চেষ্টাটাই বৃথা হবে। রিনিকে রেণু বলে চালালেও, আমাদের হাত থেকে সরে যাবে, ঐ বন্ধুপুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে না দিয়ে মিষ্টার ঘোষ জিদ ছাড়বেন না।

মুখখানা বিকৃত করিয়া সারা বলিলেন: বাঁদরের গলায় পরাবার জন্যেই কি আমরা তাহলে মুক্তার মালা গাঁথছি ভেবেছ? এখন এই চিঠির নিবারণ মিত্তির আর তার ভাগ্নে নরনারায়ণের নাম দুটো চাপতে হবে।

বিবর্ণ মুখে ডাক্তার বলিলেন: কিন্তু বিজ্ঞাপন পড়ে চিঠি যখন পাঠিয়েছে, এখন চেপে রাখলেও পরে যদি জানাজানি হয়ে যায়…

জামাতার কথায় বাধা দিয়া তীক্ষ্ণস্বরে সারা বলিলেন: তাহলে তুমি কিসের মনের ডাক্তার শুনি? একটা মেয়ের আগাগোড়া বদলাবার ভার আমি যদি নিতে পারি, দুটো এই তুচ্ছ মানুষের নাম ভুলিয়ে দেওয়া কি এতই শক্ত?

উদ্বেগে চকিত হইয়া ডাক্তার জানিতে চাহিলেন: তাহলে আপনি কি ঐ দুটি প্রাণীকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে বলেন?

এই প্রশ্ন শুনিয়া রুষ্ট কণ্ঠে সারা কহিলেন: সে কাজ ত গুণ্ডার দ্বারা হতে পারে, তাতে বাহাদুরী কিছু নেই। মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে তোমার কারবার; পরকে বুদ্ধি দাও আর নিজেই আজ নির্বোধের মত পথ হাতড়াচ্ছ! মাথা খেলাও, উপায় খুঁজে বার কর।

উৎসাহিত হইয়া ডাক্তার কহিলেন: আপনার এই ইঙ্গিতই আমার বুদ্ধির ওপর আলোকপাত করবে এ ভরসা আমি রাখি। বেশ, মাথাই আমি খেলাব, উপায় খুঁজে বার করব।

১২

এই ঘটনার তিন দিন পরে ডাক্তার অধিকারী স্বয়ং সশরীরে ই, আই রেল কোম্পানীর দানাপুর অডিট আফিসে উপস্থিত হইয়া সিনিয়র ক্লার্ক নিবারণ মিত্রের নামে একখণ্ড চিরকুট পাঠাইলেন।

চাপরাসি সেখানি নিবারণ বাবুর হাতে দিতেই তিনি বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, ক্ষুদ্র চিরকুটখানির উপর ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে—

মিঃ অধিকারী—সরকারী অপরাধতত্ত্ববিদ্

অধ্যাপক নিবারণ বাবু অত্যন্ত ভীতু প্রকৃতির মানুষ, মিঃ অধিকারীর নিয়োগ পাঠ করিয়া তাঁহার বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করিয়া উঠিল। চাপরাসিকে জিজ্ঞাসা করিলেন: বাবু কোথায়?

চাপরাসি সম্ভ্রমের সুরে কহিল: বাবু নয়, ভারি সাহেব, জমাদার তাড়াতাড়ি খুরসী এনে দিয়েছে। বড় হলে বসে আছেন।

নিবারণের হৃৎকম্প আরও প্রবল হইয়া উঠিল। হাতের কাজ রাখিয়া তিনি দ্রুতপদে আগন্তুকের উদ্দেশে ছুটিলেন।

চাপরাসি সঙ্গে ছিল, সাহেবকে দূর হইতে দেখাইয়া দিল। নিবারণকে দেখিয়াই ডাক্তার বুঝিলেন লোকটা গো-বেচারী শ্রেণীর, তাঁহার চিরকুট পাইয়াই ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেই তিনি হাতের একটি অঙ্গুলি কপালের দিকে হেলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনার নাম নিবারণচন্দ্র মিত্র? শম্ভুনাথ বসুর শ্যালক আপনি?

একটা ঢোঁক গিলিয়া নিবারণ উত্তর করিলেন: আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু…

ডাক্তার তাঁহাকে অন্য কিছু বলিবার অবসর না দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: শম্ভুনাথ বসুর পুত্র নরনারায়ণ বসু ত এখন আপনার হেফাজতেই আছে? পুত্র এবং অর্থ—দুই-ই, কি বলেন?

নিবারণ ঘাবড়াইয়া গেলেন। এই পদস্থ ব্যক্তিটি তাঁহাকে এ ভাবে প্রশ্ন করিতেছেন কেন, এবং প্রশ্নের উত্তরটি কি ভাবে দেওয়া উচিত—এই দুইটি সমস্যার চাপে পড়িয়া তিনি যেন হাঁফাইয়া উঠিলেন। ডাক্তার তাঁহার এই বিপন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়া কিঞ্চিৎ সহানুভূতির সুরেই বলিলেন: আপনি যে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, আপনার মুখখানা দেখেই তা বুঝতে পারছি। তাহলে এটাও নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, শম্ভুনাথ বোসের সম্পর্কে এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে, যার জন্যে এই সব প্রশ্ন বাধ্য হয়েই আমাকে তুলতে হচ্ছে! তবে একটা কথা আপনাকে বলি নিবারণ বাবু, আপনার ভগিনীপোতের সম্বন্ধে কোন-কিছু লুকাবার চেষ্টা না করাই ভাল, কেন না, তাঁর সব কিছুই আমরা জানি।

নিবারণের মাথার ভিতরটা যেন ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল। কোন গুরুতর ব্যাপার না ঘটিলে যে এই ধরণের কথা উঠিতে পারে না—এটুকু বুঝিবার মত সাধারণ বোধশক্তি তাঁহার ছিল। গলার স্বর তাঁহার জড়াইয়া গেল, কোনরূপে কম্পিত কণ্ঠকে কাশির গমকে কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন: কিন্তু সার, ব্যাপারটা কি হয়েছে, শম্ভুনাথ

বাবু কি করেছেন, তার ত কিছুই আমি জানি না, তা ছাড়া তাঁর সঙ্গে···

নিবারণের মুখের কথাটা যেন সজোরে ছিনাইয়া লইয়া ডাক্তার কহিলেন: বছর দুই হতে চলল দেখা-সাক্ষাৎ আপনার সঙ্গে নেই—এই ত? হ্যাঁ, আমরা তা জানি। যাক্, এখন ব্যাপারটা যা হয়েছে তা শুনুন; কারবারে লোকসান খেয়ে সুদে-আসলে সেটা উসুল করবার লোভে তিনি শেষকালে এনার্কিষ্টদের দলে ভীড়ে যান।

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই নিবারণের কণ্ঠে যেটুকু রস অবশিষ্ট ছিল, তৎক্ষণাৎ নিঃশেষ হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে একটা মর্ম্মভেদী বিকৃত শব্দ খাসিয়া বাহির হইল: এঁ্যা!

ডাক্তার মনে মনে পুলকিত হইয়া বার্ত্তাটি অধিকতর গাঢ় করিয়া কহিলেন: আমাদের সরকার বাহাদুরের দুর্দ্ধর্ষ মহাশত্রু সীমান্তের ইপির ফকিরের নাম শুনেছেন ত? চোরাই 'য়্যামুনিসান' এই দল থেকে তাঁকে বিক্রী করা হত। এই সম্পর্কে কতকগুলো লোক ধরা পড়ে, তার ভিতরে ছিলেন আপনার পরমাত্মীয় শম্ভুনাথ। কিন্তু ধরা পড়বার পর প্রকাশ পায় লোকটা পাগল। তখন তাকে আমার কাছে পাঠানো হয় পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। কিন্তু কি জানি কেন আমাকে দেখেই হতভাগার ভীষণ আত্মগ্লানি আসে, আর তার ভাগ্য-বিপর্য্যয় থেকে ভাগ্য ফেরাবার জন্যে পাপের পথে ঝাঁপিয়ে পড়া পর্য্যন্ত সমস্তই অকপটে স্বীকার করে। বেচারার আশা ছিল, আমার সুপারিশে সরকার তাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ অপরাধে ক্ষমার কথা উঠতেই পারে না—একথা যখন তাকে বলা হয়, তখন সে আমার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয় যে, এই স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ যেন তার নিষ্পাপ সন্তানকে স্পর্শ না করে। কিন্তু দণ্ড তাকে নিতে হয় নি, বিচারের আগের দিন হাসপাতালেই বেচারী মারা পড়ে।

নিবারণের মনের সমস্ত আতঙ্ক এই নির্ঘাৎ দুঃসংবাদের আঘাতে বুঝি চূর্ণ হইয়া গেল। ডাক্তার লক্ষ্য করিতেছিলেন, অতি বড় ঘনিষ্ঠ প্রিয়জনের বিয়োগ-বেদনার নিদারুণ চিহ্ন শোকার্ত্তের চোখে-মুখে যে ভাবে ফুটিতে দেখা যায়, এই সরল নিরীহ প্রকৃতি লোকটির মুখমণ্ডলে তাহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জানিতেন, শোকের এই আঘাত কাহাকেও একেবারে স্তব্ধ করিয়া দেয়, বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার কাহারও কাহারও বেদনাহত স্বর রোদনের আবেগে সরবে কণ্ঠকে অতিক্রম করিয়া থাকে। নিবারণেরও বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে তাঁহার পানে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে 'বোস মশাই নেই?' এই কয়টি কথা বলিতে দেখিয়াই তাঁহার শেষের ধারণাটি প্রবল হইয়া উঠিল। এখনই নারীর মত উচ্চ কণ্ঠে দুঃসহ বেদনাটি ব্যক্ত করা আশ্চর্য্য নয় বুঝিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি উপস্থিত বুদ্ধির প্রভাবে শোকের স্রোতটা ঘুরাইয়া দিলেন। কহিলেন: ও কি, আপনি কি কেঁদে লোক জড় করতে চান? শক্ত হোন নিবারণ বাবু, আপনার ভালর জন্যেই সাবধান করে দিচ্ছি আপনাকে, কথাটা এখন একেবারে চেপে যেতে হবে—হতভাগা ছেলেটা, অতগুলো টাকা, সবার ওপর আপনার এই চাকরীটার পানে চেয়ে।

নিবারণের শোক বুঝি এবার মাথায় উঠিয়া গেল, ঠোঁট দুটি তাঁহার কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু তাহার ভিতর দিয়া একটি কথাও বাহির হইবার পথ পাইল না। মনস্তত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বেচারীর অবস্থাটি দেখিয়া সমবেদনার সুরে বলিলেন: লোকের ত কথায় আছে—বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। শম্ভু বেচারী হয়ত ভেবেছিল, মরলেই বেঁচে যাবে, সাথে আপনাদেরও বাঁচিয়ে যাবে। কিন্তু তা কি হয় নিবারণ বাবু? যারা ধরেছিল বেচারাকে, তারা কুলুচি খুঁজে বার করবার জন্যে ত হন্যে হয়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কেসটা আসে আমারই হাতে। আবার এমনি কাণ্ড, শম্ভুনাথ আর সব কথাই বলেছিল আমাকে, কিন্তু চেপে গিয়েছিল শুধু আপনার পাত্তাটি। কাজেই বুদ্ধি খেলিয়ে তারি জন্যে আমাকে তখন কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

নিবারণের চোখের উপর এবার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল 'প্রবাস-জ্যোতি' কাগজে ছাপা সেই ক্ষুদ্র বিজ্ঞপ্তিটি। সেটি দেখিবা মাত্র তিনি বিহ্বল হইয়া উঠেন এবং তৎক্ষণাৎ একখানি পোষ্টকার্ডে সবিশেষ লিখিয়া জবাবের আশায় দিন গণিতে থাকেন। হায়, তখন কি কল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন, কাগজের ছাপা ঐ কয়টি ছত্রের পিছনে এত-বড় একটা শোকের ব্যাপার প্রচ্ছন্ন ছিল?

পকেট হইতে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত সেই পোষ্টকার্ডখানি বাহির করিয়া ডাক্তার বলিলেন: বিজ্ঞাপনের কাজ যে হয়েছে, তার প্রমাণ আপনার এই চিঠি। এখানাই আমাকে প্রায় দু'শ মাইল তফাৎ থেকে দানাপুরে টেনে এনেছে। যাক্, এখন কাজের কথা শুনুন, আপনাদের কোন অনিষ্ট হয় এটা আমি চাই না। বুঝতেই ত পারছেন, শম্ভুনাথের ছেলে আপনার কাছে, তার টাকাও আপনার কাছে, আর আপনি হচ্ছেন তার ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়—এ সব জানাজানি হলে টাকাগুলো ত বাজেয়াপ্ত হবেই, শেষ পর্য্যন্ত আপনার চাকরী ধরেও টানাটানি হতে পারে···

নিবারণের গলাটা বুঝি শুকাইয়া মরুভূমির মত উষর হইয়া উঠিতেছিল। ডাক্তারের একটানা কথাগুলি এইখানে আসিয়া মোড় লইবার জন্য একটু থামিতেই তিনি প্রাণপণ শক্তিতে গলাকে সবল ও সরব করিয়া কহিলেন: আপনি আমাদের বাঁচান সার ··

কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই মহানুভব মানুষটির হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন।

পলকের মধ্যে নিবারণের হাত ছাড়াইয়া ডাক্তার ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিলেন: এ-রকম ছেলেমানুষী করবেন না নিবারণ বাবু; মনে রাখবেন, আমরা একটা অফিসের ভিতর দাঁড়িয়ে কথা বলছি। মাথা ঠিক রেখে এখন কাজ করা চাই আমার পরামর্শ শুনুন।

অপ্রতিভের মত সঙ্কুচিত হইয়া নিবারণ কহিলেন: বলুন। আপনি এ অবস্থার যা বলবেন সার আমি তাই মেনে নেব।

ডাক্তার বলিলেন: শম্ভুনাথের ব্যাপারটা একেবারে চেপে যেতে হবে। এখানে কাউকে কিছু বলবেন না। আর একটা কাজ করতে হবে আপনাকে, ছেলেটার ঐ যে পিতৃদত্ত নাম নরনারায়ণ, ওটা পাল্টাতে হবে, পারবেন?

নিবারণ আশ্বস্ত ভাবে বলিলেন: খুব পারবো সার। আর ও-নামে ত আমরা ওকে ডাকিও না, ও ত ছোড়া, এখনো স্কুলে ত ভর্ত্তি করান হয় নি যে নাম পত্তন হবে। আজ থেকেই নাম ওর পাল্টে দেব সার।

ডাক্তার বলিলেন: আর একটা কাজ করতে পারেন? তাহলে কোন ভাবনার কারণ থাকে না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নিবারণ ডাক্তারের অপূর্ব্ব মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন। ডাক্তার বলিলেন: জায়গাটা বদলাতে পারেন? অন্ততঃ মাসখানেকের মত ছুটি নিয়ে···

উৎসাহের সুরে নিবারণকে এবার বলিতে শোনা গেল: খুব ভাল পরামর্শ দিচ্ছেন সার, আজই আমি ছুটির দরখাস্ত করব। ছুটি আমার পাওনাও হয়েছে।

ডাক্তার বলিলেন: বাস্, তাহলে ত সব দিক্ দিয়েই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল নিবারণ বাবু! আমার এত মাথা-ব্যথা কেন, সে ত আগেই বলেছি। লোকটা এমনি তুখড় যে, তার কথার ফেরে কথা না দিয়ে পারিনি। তাছাড়া, আর একটা বড় কথা কি জানেন, ঐ নোংরা কেসটার সঙ্গে জড়িয়েছিল এক মাত্র বাঙ্গালী এই শম্ভুনাথ। তার মৃত্যুতে সত্যিই আমি খুসি হয়েছি নিবারণ বাবু, কিন্তু আমার ইচ্ছা—তার সঙ্গেই সমস্ত আপদ কলঙ্ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। তার পর যেন না আর তেড়ে এসে আপনাদের জীবনযাত্রাটাকেও অতিষ্ঠ করে তোলে। আপনার এই চিঠিখানা আমিই চেপেই যাব।

কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া গদ গদ কণ্ঠে নিবারণ বলিলেন: আপনার দয়াতেই এ যাত্রা বেঁচে গেলুম সার! কিন্তু গরীবের বাসায় একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যদি···

কথাটা সমাপ্ত করিবার অবসরটুকু বক্তাকে না দিয়াই ডাক্তার বলিলেন: আবার আপনি ছেলেমানুষী করছেন নিবারণ বাবু, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—এ-কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? আরে মশাই, আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকাবার চেষ্টা করবেন না, কাটাতে পারলেই মঙ্গল, বেঁচে যাবেন; বুঝলেন? এখন নিজের কাজে যান, আর ছুটির দরখাস্তটা আজই পেশ করে দিন। হ্যাঁ, আর একটা কথা,—ছেলেটাকে শুদ্ধ করে দেবেন, তবে এখানে নয়, ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে—বুঝলেন? আচ্ছা, তাহলে কাজ আমাদের মিটে গেল। এখন—গুডবাই।

একই ভাবে ঠায় সেখানে দাঁড়াইয়া নিবারণ এই অদ্ভুত মানুষটির গমন-গতির দিকে নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অফিস-সন্নিহিত কেরাণী-পল্লীতেই নিবারণের বাসা। আড়াইখানি ঘর, একটু অঙ্গন এবং সামনে এক ফালি তার দিয়া ঘেরা জমি লইয়া তাঁহার এই 'কোয়ার্টার'।

বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরখানির সামনে রোয়াকটির উপর এক বালক চিত্রকর তাহার অপরূপ চিত্রবিদ্যার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ছবি আঁকিতে বসিয়াছে। ছেলেটির বসিবার ভঙ্গি এবং অপূর্ব্ব-সুন্দর চেহারাখানির সহিত স্বাভাবিক পরিবেশগুলি ও চমৎকাররূপে মিশিয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ চাতালটির পাশে তারের বেড়া ঝাঁপাইয়া লবঙ্গলতার গুচ্ছগুলি ভিতরে এমন ভাবে আসিয়া পড়িয়াছে যে, লাল, ফিকা গোলাপী ও সাদা রঙের থোবা-থোবা ফুলগুলি যেন এই কর্ম্মনিষ্ঠ ছেলেটির শির ঘাড় ও পৃষ্ঠে পড়িয়া হুল্লোড় বাধাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ছেলেটির কর্ম্মনিষ্ঠা যেমন গভীর তাহার বিদ্যার উপাদানগুলিও তেমনি বিচিত্র। করবী গাছের একখণ্ড সরু ডাঁটার অগ্রভাগটুকু থেঁতো করিয়া তাহাকে তুলির মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে, কয়লা ঘসিয়া, হলুদগাটা গুলিয়া, গেঁড়িমাটী গুড়াইয়া এবং সিন্দুর

গুলিয়া চারিখানি খুরিতে চারিটি বিভিন্ন রং শোভা পাইতেছে। কোলের উপর পাতা আছে সচিত্র রামায়ণ হইতে সংগৃহীত একখানি সুরঞ্জিত ছবি—দশস্কন্ধ রাবণ রাজার বিরাট মূর্ত্তি সম্মুখে একখানা ইটের গায়ে ঈষৎ হেলাইয়া রাখা হইয়াছে। কোন পুরাতন ক্যালেণ্ডারের একখানা সুশ্রী স্থূল সাদা কার্ডবোর্ড। কোলের উপর রক্ষিত আদর্শটিকে লক্ষ্য করিয়া এই বোর্ডের গায়ে রঙ-তুলির সাহায্যে শিশু চিত্রকর ক্ষিপ্র-হস্তে দশস্কন্ধ রাবণের ছবি আঁকিতে ব্যস্ত। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, পরিশ্রমে ক্লান্তি নাই, অদম্য উৎসাহে চলিয়াছে তাহার এই অপূর্ব্ব অঙ্কনের কাজ। বায়ুর সহিত পাল্লা দিয়া যত বারই ফুলগুচ্ছগুলি শিশু-চিত্রকরের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তত বারই সে বাম হাতখানি দিয়া তাহাদিগকে সরাইয়া যেন তাহার প্রচণ্ড ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেছে।

খুট্ করিয়া ভিতরের দিকের দরজাটি খুলিয়া গেল এবং সাতাশ-আঠাশ বৎসরের এক হৃষ্টপুষ্ট মহিলা বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ের সুরে কহিলেন: অ-মা, আমি চারিদিকে খুঁজে খুঁজে সারা হচ্ছি, আর ছেলের এখানে ঘটা করে বসে ছবি আঁকা হচ্ছে? আ-মরণ তোমার, আর কোন খেলা খুঁজে পাওনি? তোলা খুরিগুলো পেড়ে রং গুলে আমার পিণ্ডি চটকানো হচ্ছে। আচ্ছা, আসুন ত উনি—

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া স্থূলাঙ্গী মহিলাটি হাঁফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার চোখ দুটি ছেলেটির এই ছেলেখেলার মধ্যেই বৈচিত্র্যের একটা নিদর্শন দেখিয়া বুঝি আর ফিরিতে চাহিতেছিল না।

ছেলেটি কিন্তু মহিলাটির অনুযোগপূর্ণ কথাগুলিতে কান না দিয়াই সমান উৎসাহে তাহার তুলি চালাইয়া চলিল।

ছেলেটির কোলের ছবিখানার দিকে সহসা মহিলাটির দৃষ্টি পড়িতেই তিনি পুনরায় তর্জ্জনের সুরে ঝঙ্কার তুলিলেন: আ-আমার পোড়াকপাল! রামায়ণ থেকে ছবিখানা খুলে এনে তোমার খেলাঘরে পাতা হয়েছে? খুঁজে খুঁজে খেলবার জিনিস পাওনি বটে?

ছেলেটি এই সময় ছবির রাবণের চোখে কালির একটা বিন্দু দিতে গিয়া কালি কিঞ্চিৎ বেশীই দিয়া ফেলিল। ইহাতেই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তুলিটা তুলিয়া এবং চোখ দুটো পাকাইয়া মহিলাটির পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল: বেশ আঁকছিলুম, তুমিই এসে সব মাটি করে দিলে মামীমা? তুমি ভারী দুষ্টু।

মহিলাটি এবার রীতিমত চটিয়া গেলেন, গলার স্বর আরও উচ্চগ্রামে তুলিয়া ছেলেটিকে শাসাইলেন: আমি দুষ্টু বৈ কি, নইলে দুটি বেলা খোদানি জোটাবে কে? আদর পেয়ে মুখ তোমার বড্ড বেড়ে গেছে, বড়কে সবা জ্ঞান কর—তা আর জানি না? ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা, এমন ভূতুড়ে খেলা কারুর দেখিনি—

হঠাৎ বহির্দ্বারের কড়া দুইটি সশব্দে বাজিয়া উঠিতে মহিলাটি মুখ বন্ধ করিলেন। ছেলেটিও এই সময় হাতের তুলিটি রাখিয়া এক লাফে উঠানে আসিয়া রুদ্ধ দরজাটি খুলিয়া দিতে ছুটিল।

সদর দরজা নামে পরিচিত কপাট দুইখানি উন্মুক্ত হইবা মাত্র সেই পথে প্রবেশ করিলেন মহিলাটির স্বামী এবং ছেলেটির মাতুল নিবারণচন্দ্র মিত্র মহাশয়। হাতে একটা পোঁটলা, বগলে ছাতা।

তখনও পাঁচটা বাজে নাই। অসময়ে স্বামীকে ফিরিতে দেখিয়া মহিলাটি ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: এত বেলাবেলি যে? ও কি, তোমার ও-রকম দেখছি কেন—অসুখ-বিসুখ করেনি ত?

ভাগিনেয়ের হাতে পুঁটুলিটি দিয়া নিবারণ কহিলেন: ভাবি মাথা ধরেছিল, তাই একটু সকাল সকাল চলে এলুম। কিন্তু, তুমি অত চেঁচাচ্ছিলে কেন? বাইরে থেকেই তোমার গলার চড়া আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলুম····

ঝঙ্কার তুলিয়া গৃহিণী শান্তমণি জবাব দিলেন: চেঁচাচ্ছিলুম কি সাধ করে? তোমার আদুরে ভাগনের কাণ্ড দেখ না—পটের দোকান খুলে বসেছেন! ঘরের ভেতরে যেখানে যা পেয়েছে, টেনে এনে রং গোলা হয়েছে দেখ না! অ-মা—কি সর্ব্বনাশ, সিঁদুরটুকু পর্য্যন্ত ঢেলে এনেছে হতচ্ছাড়া দস্যি ছেলে···

এক নজরে চাতালটির পানে চাহিয়াই নিবারণ অবস্থাটা উপলব্ধি করিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি ছেলেটির এই বিচিত্র খেলার সহিত পরিচিতও ছিলেন। ভাগিনেয়ের আজিকার আয়োজন দেখিয়া তাঁহার বিষণ্ণ মুখখানি প্রসন্নই হইতেছিল; কিন্তু স্ত্রীর শেষের কথাটা পুনরায় তাঁহাকে আঘাত করিল। তাই আহতের মত মুখভঙ্গি করিয়া প্রতিবাদ করিলেন: কিন্তু দেখে ত মনে হচ্ছে না যে ডাকাতির মতন কিছু বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়েছে। এ-রকম সুশ্রী খেলা এই বয়সের কোন ছেলেকে করতে দেখছ কখনো? হডসন সাহেব এখানে ছবির একজিবিসন খুলে লোকের চোখের সামনে রঙ গুলে তুলি এঁকে দেখিয়ে দিয়ে গেল কেমন করে ছবি করে। কত বয়সের কত লোক ত দেখেছে,

কিন্তু এর মতন সাহেবের ছবি আঁকার নকল কেউ করেছে? সাহেব যেন তাঁর 'এলেমটুকু' একে গুলে খাইয়ে দিয়ে গেছে; নৈলে এই বয়সে খেলা-ধুলো ছেড়ে এমন করে কোন ছেলে রঙ-তুলি নিয়ে মাথা ঘামায়—হাত চালায়! বাঃ—বাঃ, খাসা রাবণ হয়েছে!—বলিতে বলিতে তিনি চাতালটির এক প্রান্তে বসিয়া পড়িলেন এবং ভাগিনেয়কে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া তাহার পিঠে স্নেহময় হাতের গুটি দুই মৃদু-মন্দ ঘা দিলেন।

গৃহিণী তথাপি দমিলেন না, বা ছেলেটির খেলার মধ্যে কোনরূপ গুণপনার নিদর্শনও পাইলেন না। পূর্ব্ববৎ রুক্ষ কণ্ঠেই বলিলেন: তোমার আস্কারা পেয়েই ত ও-রকম হয়েছে! বেশ, কিনে এনে দিও কালই এক বাণ্ডিল সিঁদুর; কত সাধ্যি-সাধনা ক'রে নেবু ফলের নন্দাইকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলুম,—দর্জ্জাল ছেলে কৌটো উপুড় করে সবটুকু ঢেলে এনেছ!

নিবারণ বলিলেন: এবার আর তোমার 'নেবু ফুলের' খোসামোদ করতে হবে না, কলকাতায় গিয়ে আগেই তোমাকে এক বাণ্ডিল সিঁদুর কিনে দেব, মনের সাধে যত পার—প'রো।

মুখখানা তুলিয়া স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিয়া শান্তমণি জিজ্ঞাসা করিলেন: তার মানে?

নিবারণ সহজ কণ্ঠেই বলিলেন: এখানকার বাসা আপাততঃ তুলতে হচ্ছে। আসছে বুধবার ভোরের ট্রেণে কলকাতায় রওনা হতে হবে।

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া শান্তমণি বলিয়া উঠিলেন: অ-মা, সে কি! বদলি করলে নাকি তোমাকে?

নিবারণ গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। মাস দুই কলকাতায় থাকতে হবে, তার পরে আবার এদিকেই টেনে আনবে।

শান্তমণি: এইখানেই আসবে ত?

নিবারণ: না, এখানে আর আসা হবে না, বোধ হয় জামালপুর কিম্বা মুঙ্গেরে জয়েন করতে হবে। আজ থেকেই সব গুছাতে আরম্ভ কর।

সংবাদটির অভিনবত্ব গৃহিণীকে আনন্দিত করিল কিম্বা তাঁহার মনের মধ্যে বিক্ষোভ গুমরিয়া উঠিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা গেল না। মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গিমা করিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি বলিলেন: অ-মা, শোন কথা! এখন কি করে কি করব? এ যে সেই—ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ের জো হ'ল দেখছি! নেবু ফুলের ননদের সাধ, আসছে রবিবার নেমন্তন্ন করে খাওয়াব বলে ঠিক করে রেখেছি, ডাক্তার-গিন্নির ছেলের ভাত আবার ঐ বুধবারেই, পনেরো দিন আগে থাকতে বলে রেখেছে; তারপর, একটা সংসার তুলে যাওয়া—ন্যাটা কি কম? কোন্ দিক সামলাই এখন?

নিবারণ বলিলেন: উপায় ত আর নেই, এর মধ্যে সামলে নিতেই হবে।

মাতুলের পাশটিতে বসিয়া এই সংলাপের মধ্যে ছেলেটি বুঝি হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। তাহার মনটি পড়িয়া আছে ছবির দিকে। রাবণ রাজার দশটা বিরাট মাথার অনেকগুলি অংশ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, কাজটি সমাপ্ত না করিলেও তাহার সোয়াস্তি নাই। ইতিমধ্যে এখানকার বাসা তুলিয়া কলিকাতায় যাইবার কথাটা বালকের চিত্তটিও বুঝি দোলাইয়া দিল। মুখখানা তুলিয়া ভাসা-ভাসা অপূর্ব্ব দুই চক্ষু মাতুলের মুখে নিবদ্ধ করিয়া আবদারের স্বরে কহিল: আমি কিন্তু আমার ছবিগুলো সব নিয়ে যাব, আর এই তুলি, রঙ—সমস্ত।

সস্নেহে ভাগিনেয়কে কোলের দিকে টানিয়া কোমল কণ্ঠে মাতুল বলিলেন: কলকাতায় গিয়ে আমি তোমাকে ছবি আঁকবার একটা বাক্স কিনে দেব। তার মধ্যে নানা রকম রঙ, তুলি, রঙ রাখবার বাটি, আরও কত কি থাকে।

বালকের চোখের তারা দুটি আনন্দে চক-চক করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর মুখখানি নির্ম্মল হাসিতে আলো করিয়া কহিয়া উঠিল: সত্যি মামা? বাঃ, কি মজা তাহলে হবে! মামীমার বকুনি তাহলে আর খেতে হবে না আমাকে।

সস্নেহে বালকের চিবুকটি ধরিয়া মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন: মামী তোমাকে কেবলই বকে—ভালবাসে না মোটেই?

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বালক কহিল: ভালবাসলে বুঝি খালি-খালি বকে অমন করে? মামীমা আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।—বলিয়াই সে দুই চোখ মেলিয়া এক নজরে মামীর ভারাক্রান্ত মুখখানি দেখিয়া লইল।

কোন কথা সহ্য করিতে শান্তমণি অভ্যস্ত ছিলেন না, তিনি তৎক্ষণাৎ মুখখানি মচকাইয়া কথাটার জবাব দিলেন: তা ত বলবেই, ওরা যে নেমক-হারামের ঝাড়। বাপ সেই যে মাথায় বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেলেন—একখানা চিঠি লিখে উদ্দেশ নিয়েছেন কোন দিন? সেই ঝাড়ের ত তেউড়, কত আর ভাল হবে!

কথা ত পড়েই রয়েছে—জন জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা।

বিরক্ত হইয়া নিবারণ কহিলেন: কোন্ কথায় কি আনলে টেনে—ছি! তোমার মুখ বড় আলগা। মামীর কথা তুমি গায়ে মেখ না বাবা নরেন্দ্র···

কি—কি—কি? ভাগনের ওপর দরদ আজ এতই উথলে উঠল যে নাম পর্য্যন্ত ঘুরে গেল! কথাগুলি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সুরে বলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শান্তমণি স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পবয়স্ক ভাগিনেয় নরনারায়ণ এই সংসারে 'নোরো' নামেই পরিচিত এবং 'নর' নামটি বিকৃত করিয়া এই ভাবেই তাহাকে সম্বোধন বা আহ্বান করা হইত। কিন্তু আজ হঠাৎ স্বামীর পক্ষ হইতে তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া, অর্থাৎ নোরোকে নরেন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করায় শান্তমণির মত মেয়ের মনে এরূপ বিস্ময়ের উদ্রেক স্বাভাবিক। কিন্তু নিবারণ যেন পূর্ব্ব হইতে মনে মনে রিহার্স্যাল দিয়াই প্রস্তুত-করা শব্দগুলি আজ শুনাইতেছিলেন। তাই পত্নীর কথার পিঠেই মনের কথাগুলি দিব্য গুছাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন: নামটা ওর বাপ খুব লম্বা চওড়া রেখেছিল কি না, তাই কেটে-ছেঁটে ছোটই করে দিলুম আজ থেকে। কলকাতায় গিয়েই ওকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেব, স্কুলের খাতায় এত বড় নামটা থাকলে ক্লাসে নাম ডাকবার সময় মাষ্টাররাই হয় ত বেজার হয়ে উঠবে। কি বল নরেন্দ্র, নামটা ছোট করে ভাল করিনি? পছন্দ হয়েছে ত?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভাগিনেয়ই মামাকে পাল্টা প্রশ্ন করিল: আমাকে সত্যিই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দেবে মামা? সেখানে ছবি আঁকতে পাব? মাষ্টাররা বকবে না ত মামীমার মতন?

নিবারণ কহিলেন: না; মাষ্টাররা যাতে তোমাকে ভাল করে আঁকতে শেখায় আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

শান্তমণি মুখখানা ঘুরাইয়া কহিলেন: আফিস থেকে এসেই ত ভাগনের তোয়াজে আজ একেবারে উন্মত্ত দেখছি! কাপড়-চোপড় ছাড়তে হবে না?

নিবারণ বলিলেন: এই যে উঠছি, তুমি ত এখনো চায়ের জল চড়াও নি, এত তাড়াই বা কেন?

—তা ত বলবেই, সব তা'তে আমার দোষ ধরাই ত তোমার চিরকেলে স্বভাব।—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই শান্তমণি ভিতরে চলিয়া গেলেন। নিবারণ সাদরে ভাগিনেয়ের চিবুকটি ধরিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন: আজ থেকে আমি তোমাকে মুখে মুখে গোটা কয়েক নতুন পড়া শেখাবো, তুমি সেগুলি কণ্ঠস্থ করবে। তাহলেই ছবি আঁকবার সাজ-সরঞ্জাম শুদ্ধ, একটা সুন্দর বাক্স তোমাকে কিনে দেব কলকাতায় গিয়েই। কেমন, রাজী ত?

মামার মুখের পানে চোখ দুটি মেলিয়া বালক কহিল: যেমন করে নামতা মুখস্থ করি ত?

নিবারণ কহিলেন: হ্যাঁ, নামতার মতই বটে। তবে নামতা হচ্ছে···আঁক, আর এটা হচ্ছে—নাম। আচ্ছা, তোমার নাম যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কি বলবে বল ত?

বালক উত্তর করিল: শ্রীনরেন্দ্র বসু।

নিবারণ সহাস্যে কহিলেন: খাসা ছেলে তুমি; নতুন নামটা ঠিক মনে রেখেছ ত! কিন্তু নামের শেষে যে পদবীটা বললে, ওটা ঠিক হয়নি। বলতে হবে—বিশ্বাস।

বালক নরেন্দ্র কোন প্রশ্ন না করিয়া আপন মনেই পুনরায় আবৃত্তি করিল: শ্রীনরেন্দ্র বিশ্বাস।

অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিবারণ কহিলেন: তোমার ঠাকুরদাদার পদবী ছিল বিশ্বাস। নবাবের দেওয়া পদবী। তোমার বাবা বলতেন—নবাবী আমল যখন চলে গেছে তখন আর ও-পদবীর দাম কি? তাই তিনি বিশ্বাস ছেড়ে সাবেক বসু পদবীই নিয়েছিলেন। কিন্তু পদবী পাল্টে ত ভাল হল না, তাই তোমার ভালর জন্যেই পুরানো পদবীটাই নামের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছি।

মাতুলের কথাগুলি স্বল্পভাষী বালক নীরবেই শুধু শুনিল, কোন উত্তর করিল না। নিবারণ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন: তাহলে তোমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে?

বালক উত্তর করিল: শম্ভুনাথ বিশ্বাস।

নিবারণ কহিলেন: বাঃ, তোফা স্মরণশক্তি আর বুদ্ধি তোমার, বাপের পদবী বলতে ভুল করনি। হ্যাঁ, তবে একটা কথা আছে, তোমার ঠাকুরদাদা তোমার বাবাকে যে নামে ডাকতেন, সেই নামই তুমি বলবে। ঠাকুরদা ডাকতেন তাঁকে স্বয়ম্ভু ব'লে। 'নাথ' বলবার কোন দরকারই নেই। নামকে যত ছোট করা যায় ততই ভাল। নামটি আর একবার বল ত বাবা?

বালক বলিল: স্বয়ম্ভু বিশ্বাস।

পরিতুষ্ট হইয়া নিবারণ কহিলেন: বাস্—খাসা বলেছ। নামতার সঙ্গে এই নাম আর পদবী আজ থেকে মুখস্থ করবে। আচ্ছা, তুমি তোমার ছবি আঁক, আমি কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলি, চা হ'লে ডাকব'খন।

নিবারণ ভিতরে চলিয়া গেলেন, বালক এতক্ষণে যেন মুক্তি পাইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল পরিত্যক্ত বিচিত্র তুলিটি লইয়া।

* * *

ঠিক এই সময় দানাপুরের ডাক-বাংলোয় বসিয়া ডাক্তার অধিকারী হরপ্রসাদ ঘোষের বরাবর সেই দিনের বোম্বাই মেলে পাঠাইবার অভিপ্রায়ে যে রিপোর্টটি রচনা করিতেছেন, তার শেষাংশ এইরূপ :

* * * ছেলেটির নাম নবনারায়ণ এবং দেখিতে বেশ প্রিয়দর্শন ছিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার গৃহত্যাগের পরেই মাতার ব্যাধি ছেলেটিকে এমন ভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরে যে মুক্ত করিবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। মিলাইয়া দেখা গেল, যে সময় তাহার দুর্ভাগ্য পিতাকে আপনি মৃত্যুর দরজা হইতে ফিরাইবার জন্ম প্রাণপণ শক্তি প্রয়োগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বেচারীর রোগজীর্ণ শৈশব-জীবনের অবসান হয়। দায়িত্বপূর্ণ যে তিনটি বোঝা আমার উপর অখণ্ড বিশ্বাসে চাপাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার একটি এই ভাবে সরিয়া গিয়াছে, এখন অবশিষ্ট দুইটির সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সচেতন থাকিবে।

১৩

ডাক্তার অধিকারী আট-ঘাট বাঁধিয়া অতি সন্তর্পণে যে-সময় তাঁহার কূটবুদ্ধির সূতায় এই মহাজাল রচনা করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীবৃন্দাবনধামে আনন্দ স্বামীর সিদ্ধাশ্রমে বসিয়া দুই স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ আর একখানি মহাজাল বুনিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধহস্তে যে ভাবে সূতা পাকাইতেছিলেন তাহাও কৌতূহলোদ্দীপক এবং চমকপ্রদ।

বৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশী পরিক্রম-পথের বাহিরে—যমুনার গতি যেখানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই জনবিরল বিস্তীর্ণ সৈকতভূমিটি কেল্লার মত সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাচীর পরিবেষ্টনে আনন্দস্বামীর সিদ্ধাশ্রম নামে অল্প কয়েক বৎসর হইল প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আশ্রমটির বিধি-নিষেধ এমনই কড়া যে, ইচ্ছা মাত্রই বাহিরের কাহারও ইহার ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তাহার কারণ, দেবসেবা অতিথি সৎকার প্রভৃতি প্রচলিত প্রথাগুলিকে সন্তর্পণে বর্জ্জন করিয়া আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ একমাত্র যে লক্ষ্যবস্তুটির জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী—জনসাধারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। আশ্রমের মতে, সকল দেশ, সকল জাতি এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রাণশক্তি হইতেছে নারীজাতি। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে ভারতের নারীজাতি আজ প্রাণহীনা। উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার দ্বারা এই নারীজাতিকে প্রাণময়ীরূপে সর্ব্বসিদ্ধা করিয়া তোলাই এই সিদ্ধাশ্রমের একমাত্র লক্ষ্য। আশ্রমের মতে নারী মাত্রই অপাপ-বিদ্ধা, চিরশুদ্ধা। শিক্ষা ও দীক্ষার প্রভাবে নারী সিদ্ধিলাভ করিলেই আত্মদর্শনের শক্তি পাইবে এবং সমাজের অকল্যাণ নিবারণ করিতে পারিবে।

সিদ্ধাশ্রমের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মোটামুটি এই পর্য্যন্তই জানিতে পারা যায়। কিন্তু কি ভাবে নারীজাতিকে সিদ্ধির পথ প্রদর্শন করা হয় এবং সিদ্ধি পাইলে তাহারা কোন প্রণালীতে সমাজের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে, তাহা এ পর্য্যন্ত রহস্যাচ্ছন্নই আছে। তবে ইহাও সুস্পষ্ট সত্য যে, জনসাধারণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের সাহায্য গ্রহণে আশ্রম বরাবরই বিরত, এবং এই জন্যই সম্ভবতঃ আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের এলাকায় সাধারণের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিতে সমর্থও হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে, অর্থের বেদীতে উপবিষ্ট কমলার বরপুত্রদের স্বর্ণ-মুষ্টির আকর্ষণে সিদ্ধাশ্রমের কোষাগারের দ্বার যেমন খুলিয়া যায়, ঘটনাচক্রে তাঁহাদের আবির্ভাব হইলে ইহার সিংহদ্বারও তখন আর রুদ্ধ রাখা সম্ভব হয় না। তবে পদস্থ রাজপুরুষ এবং বৈদেশিক টুরিষ্টগণের পক্ষে সিদ্ধাশ্রমের পথ সাধারণতঃ নিরঙ্কুশ থাকে বলিয়াই শুনা যায়। আর, জনসাধারণের পক্ষে সারা বৎসরের মধ্যে মাত্র একটি দিন উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য এই সুযোগটি উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষিত দিনটি আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আবেদন করিয়া প্রবেশপত্র সংগ্রহ করিতে হয়। প্রত্যেক পৌষ-সংক্রান্তিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাহির হইতে দেখিলে সিদ্ধাশ্রমটিকে সুরক্ষিত একটি দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। সুউচ্চ দেওয়াল কেল্লা-প্রাচীরের মত সমগ্র আশ্রমটিকে পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। সম্মুখেই বৃহৎ ফটক। ইহার পরেই দীঘির মত বিশাল এক পুষ্করিণী। তাহার চারিটি কিনারাই প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী শোভিত। দীঘির উভয় পার্শ্বে প্রশস্ত অঙ্গন। দুই ধারে অঙ্গনের উপর দিয়া দুইটি পথ ঘুরিয়া দীঘির পিছনে গিয়া মিশিয়াছে। এই সংযোগস্থলটির সম্মুখে আর একটি ফটক সিংহদ্বারের মত দেখা যায়। এই দ্বার অতিক্রম করিয়া যে প্রস্তর-ময় সমচতুষ্কোণ চত্বরটিতে উপনীত হওয়া যায় তাহার প্রায় চারি দিকেই সারিবদ্ধ কক্ষশ্রেণী এবং সম্মুখে বরাবর

টানা দালান। ঘরের ছাদগুলি পাথরে তৈয়ারী, দালানের দিকটায় রক্তবর্ণ টালির ছাদ ঢালু হইয়া সুশ্রী স্তম্ভগুলিকে অবলম্বন করিয়াছে। চত্বরটির বামে ও দক্ষিণে দুইটি অংশে একটি আশ্রমের গদীঘর, অপরটি গ্রন্থাগার। গদীঘরখানি প্রাচীন আদর্শে সজ্জিত। দেওয়ালে বিশ্বের মহীয়সী নারীগণের দুষ্প্রাপ্য আলেখ্য-রাশির সমাবেশ। বসিবার আসনগুলি বিভিন্ন পশুচর্ম্মে আবৃত। দেওয়ালের দিকে জয়পুরী পাথরের আধারে ঐতিহাসিক সুপ্রসিদ্ধা নারীদের ব্যবহৃত বলিয়া অভিহিত দুর্ল্লভ দ্রব্যগুলি সুরক্ষিত। যথাঃ রাণী দুর্গাবতীর তরবারি, চাঁদ সুলতানার কটিবন্ধ, অহল্যা-বাঈএর ভল্ল, রাণী ভবানীর কঙ্কন, দেবী চৌধুরাণীর খেটে—এমনই বহু চমকপ্রদ নিদর্শন। গদীঘর বলিয়া পরিচিত হইলেও ঘরখানি যেন মিউজিয়মের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। সম্মানভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে এই ঘরেই অভ্যর্থনা করিয়া বসানো হইয়া থাকে। ইহারই একাংশে আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহ সংক্রান্ত খাতাপত্রগুলিও পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত থাকে। অপর পার্শ্বের পাঠাগারটি বহু-ভাষায় মুদ্রিত প্রাচীন ও আধুনিক পুস্তকসম্ভারে পরিপূর্ণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হস্তলিখিত পুঁথি হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রিত পুরাণ, ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নৃত্য, সাহিত্য এমন কি রোমাঞ্চকর অপরাধতত্ত্বমূলক গ্রন্থাবলী পর্য্যন্ত যথাযথ ভাবে সংগৃহীত ও শৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত। সুপ্রসিদ্ধ প্রাদেশিক সাময়িক পত্রিকাগুলির ফাইল রাখিবার পদ্ধতি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আশ্রম-কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি-পরিধি শুধু আশ্রমেই সীমাবদ্ধ নহে—নিখিল বিশ্বের গতিবিধির সহিত তাঁহারা যোগসূত্র রক্ষা করিয়া থাকেন। অন্যান্য কক্ষগুলিও আশ্রমের বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত এবং প্রাসঙ্গিক দ্রব্যাদির সংযোগে প্রত্যেকটিই এক-একটি স্বতন্ত্র বিভাগের মত।

এই বৃহৎ অংশটি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই মনে হয়, বুঝি দেখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু ব্যায়ামাগার নামে পরিচিত কক্ষটির বিচিত্র দ্বারটি উন্মুক্ত করিলে দেখা যায় যে, প্রস্তরবদ্ধ সঙ্কীর্ণ একটি পথ ক্রমশঃ ঢালু-ভাবে নিম্নাভিমুখী হইয়াছে। এই পথে কতকটা নিম্নে নামিলেই সিদ্ধাশ্রমের সর্ব্বাধিক বৃহৎ প্রাঙ্গণটি দর্শক-চক্ষুকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে, ইহাই প্রকৃত আশ্রম—পুরাণের পবিত্র ঋষিস্থানের আদর্শেই যেন এই অংশটি সযত্নে রচিত হইয়াছে। বিশাল প্রাঙ্গণ-মধ্যবর্ত্তী পর্ণময় আটচালাটি যজ্ঞস্থলের মতই শোভা পাইতেছে।

অবশ্য বৈদিক যুগের অনুসরণে কোনরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান এই পর্ণমণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয় না সত্য, কিন্তু আশ্রমবাসিনী বিভিন্ন বয়সের কুমারীদিগকে এই স্থানেই জীবনযজ্ঞে ব্রতী হইবার জন্য নানা ভাবে দীক্ষা লইতে হয়। আটচালাটির উভয় পার্শ্বে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ-সমাচ্ছন্ন দুইটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড শেষ প্রান্তে সুউচ্চ প্রাচীর-সংলগ্ন বংশবনের সহিত মিশিয়াছে। আশ্রমের পিছনের দিকে অবস্থিত এই সুবৃহৎ অংশটি শুধু সুউচ্চ প্রাচীর-পরিবেষ্টিত নহে—প্রাচীর-সংলগ্ন কণ্টকাকীর্ণ বেঁউড় বাঁশের দুর্ভেদ্য ঝাড়গুলি কুম্ভীরদেহের মত প্রাচীরটিকে বরাবর আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যবর্ত্তী আটচালাটিকে 'বুড়ি' করিয়া উভয় পার্শ্বের উন্মুক্ত প্রান্তরে আশ্রম-বালিকাদের নানারূপ খেলাধূলা চলে। প্রান্তরের পরেই তপোবনের আদর্শে উদ্যান-সমন্বিত কুটীরগুলির সংস্থান অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রত্যেক কুটীরে স্বতন্ত্র আঙ্গিনা এবং বিভিন্ন বর্ণের অজস্র কুসুমিত বৃক্ষবল্লরীর ঘনসন্নিবিষ্ট আবেষ্টন প্রত্যেকটির স্বাতন্ত্র্য যেন আশ্রমোচিত সুষ্ঠু পরিকল্পনায় রক্ষা করিতেছে। এই কুটীর-অঞ্চলের পরেই অপরূপ এক বৃহৎ পুষ্করিণী। তাহার তীরগুলির খানিকটা অংশ সুপরিচিত জলজ কুসুমদামে সমাবৃত। উপরের বাঁধে বৈদেশিক অনুচ্চ বাহারী ঝাউগাছগুলি গায়ে গায়ে মিশিয়া সবুজবর্ণের বিচিত্র প্রাচীরের মতই যেন দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রমের পরিভাষায় পুষ্করিণীটি কন্যা-সরোবর নামে পরিচিত। কন্যা-সরোবরের পাশ দিয়া যে রাস্তাটি ক্রমশঃ 'চড়াই' ভাবে উঠিয়া যথাক্রমে বৃক্ষবল্লরী ও বংশপ্রাচীর পরিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত আঙ্গিনা-সমন্বিত সুরম্য আশ্রমটির দ্বারদেশে মিশিয়াছে—তাহাই সিদ্ধাশ্রমের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ আনন্দ-স্বামীর আবাসস্থান। এই উদ্যান-অঞ্চলের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমিখণ্ডে সর্ব্বজনমান্য স্বামীজীর এই আস্তানাটি স্বতন্ত্র একটি আশ্রমের মতই মনোহর এবং সম্ভ্রমসূচক। প্রাঙ্গণমধ্যে প্রস্তরবদ্ধ কূয়া এবং তাহার সান্নিধ্যে রক্তবর্ণ বৃহৎ চত্বরটি বৃত্তাকারে অতিকায় এক নিম্ববৃক্ষকে পরিবেষ্টন করিয়া আশ্রমের গাম্ভীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য যেন ব্যক্ত করিতেছে। প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন ঘরগুলিও প্রিয়দর্শন, পরিচ্ছন্ন ও সুরুচির পরিচায়ক। প্রত্যেক গৃহটি প্রয়োজনানুযায়ী বস্তুসম্ভারে সজ্জিত।

সর্ব্বাধ্যক্ষ আনন্দস্বামীর বিভিন্ন কার্য্যাবলী সম্পর্কে প্রত্যেক কক্ষটি সুনির্দ্দিষ্ট। অধ্যয়ন, সাধনা, ভোজন, শয়ন এবং আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন কক্ষেই যথাযথ ভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। স্বামীজীর নির্দ্দেশ মত আর দুইখানি সজ্জিত কক্ষ যাহার জন্য নিয়োজিত

হইয়াছে, এই সুদৃশ্য আশ্রমটিব আনন্দ, উৎসাহ এবং জীবনস্বরূপ বলিয়া তাহাকে অভিহিত করা যায়। এই আনন্দদায়িনী বালিকাটিই—হরপ্রসাদ ঘোষেব কন্যা রেণু। কিন্তু স্বামীজী তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছেন—তনু। নামকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনাব সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিবা তনুর মনটি নিজের মনের মতন কবিষা গড়িয়া তুলিতেছেন।

কুম্ভমেলা হইতে অনেকগুলি বালিকাই সিদ্ধাশ্রমের শোভাবৃদ্ধি কবিয়াছে এবং তাহাদের জন্য যে স্বতন্ত্র কুটীর অঞ্চলটি নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধায়ক হইতেছেন লালা লছমন দাস। লালাজীব নির্দ্দেশ মতই সেখানে অন্যান্য বালিকাদের শিক্ষা-দীক্ষা খেলাধুলা প্রভৃতি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু তনুকে শিখাইয়া পড়াইয়া গড়িয়া তুলিবাব ভার লইযাছেন স্বামীজী স্বয়ং। তাঁহার সাধন-ভজন, যোগ-অধ্যয়ন, চিন্তা-পরিকল্পনা—সব-কিছুই এখন তনুব তন্ময়তাটি ঘিরিয়া ঘুরিয়া থাকে। লালাজীব বহু অনুরোধে, অপরাহ্নের দিকে মাত্র একটি ঘণ্টা তিনি তনুকে ছুটী দিযা থাকেন—লালাজীর আশ্রম-বালিকাদেব সহিত মিশিয়া খেলাধুলা এবং শক্তি-চচ্চার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই সময়টুকুব মধ্যেও অধিকাংশ দিন খেলা দেখিবার অছিলায় স্বামীজীকে তনুব সন্ধানে উপস্থিত দেখা যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বামীজীর সাধনার প্রভাবেই হোক, বা সাধনালব্ধ কোন দিব্য ঔষধের গুণেই হোক, প্রায় সম্বৎসবেব মধ্যেই অন্যান্য মেয়েগুলি আপনাদিগকে এই আশ্রমেরই প্রতিপাল্য কন্যা ভাবিযা বাঁধাধরা জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হইযা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাঞ্জাবী বালিকাটিকে শুধু পোষ মানাইতে কিছু বেগ পাইতে হইযাছিল। কিন্তু তনুকে লইয়া স্বামীজীকে যে ভাবে হিম-সিম খাইতে হয তাহা সত্যই বেদনাদায়ক। বলবান রোগীকে 'ক্লোবোফরম' সাহায্যে অজ্ঞান করিবার চেষ্টা যে-ভাবে উপর্য্যুপরি ব্যর্থ হইযা যায়, স্বামীজীর অব্যর্থ শক্তির প্রভাব অতিক্রম করিয়া এই দুর্জ্জয় মেয়েটি তাঁহাকে তেমনই বিব্রত কবিয়া তোলে। দাড়ী ছিঁড়িয়া পুঁথি-পত্র তছনছ কবিযা, ইংরাজী বাঁধানো কেতাবগুলিকে লোষ্ট্রেব মত ব্যবহার করিযা সে স্বামীজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত কবে। স্বামীজীকে অগত্যা বাধ্য হইয়া বহু দিনের সঞ্চিত দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফেব পাট তুলিয়া দিতে হয়। গভীর রাত্রে এই ভাবে ক্ষৌরকার্য্য চলে। পরদিন প্রত্যুষে স্বামীজীর শ্মশ্রুগুম্ফহীন প্রসন্ন মুখের তরল হাসি, সদ্যঃনিদ্রোত্থিতা বালিকা বুঝি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দেখিযাছিল। ইহার পব বালিকার মনোবৃত্তির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আশ্রমশুদ্ধ সকলকেই চমৎকৃত কবিয়া দেয। কেন না, তনুকে আর কোন দিন কেহ কোন প্রকাব বিদ্রোহ করিতে বা স্বামীজীর উপব শক্তি চালাইতে দেখে নাই। সে যেন স্বামীজীব ইচ্ছাশক্তিব নিকট স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

সেই দিন হইতে তনুব সকল ভার স্বামীজীকেই গ্রহণ করিতে হইযাছে। প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ জ্ঞান, পবিচ্ছদের ধাবা, ভোজনের তালিকা, খেলাধূলার ব্যবস্থা—প্রত্যেকটি সুচিন্তিত পরিকল্পনায় স্বামীজী নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। শিষ্ট বালিকাব মত তনু নির্ব্বিচারেই সেগুলি অধিকাংশ সময় মানিয়া চলে সত্য, কিন্তু এক এক সময় সহসা তাহাব চক্ষুর তারা দুটি যেন জ্বলিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড করিয়া বসে। সে সময় কেহই তনুকে সামলাইতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আশ্চর্য্য, স্বামীজীর উপস্থিতিতেই বহ্নি নির্ব্বাপিত হয়; তনুর উদ্ধত তনুলতা পুনবায নম্র হইযা সকলকে অবাক্ কবিযা দেয।

সে দিন স্বামীজীর খাস-কামবায লালাজীর সহিত তনুব এই আচবণ সম্পর্কেই আলোচনা চলিতেছিল।

স্বামীজী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন: সার্কাসের পোষা বাঘ দেখেছ ত লালা, দিব্যি খায়-দায়, বেড়িয়ে বেড়ায়, হাজার হাজার লোকেব সামনে কত রকম খেলা দেখায়, ছাগল-ছানাকে পিঠে তুলে নাচে। কিন্তু এরই ফাঁকে আগেকার স্বাধীন অবস্থার স্মৃতি কোন রকমে স্পষ্ট হয়ে উঠলেই সে তোলে বিদ্রোহ—বর্ত্তমানের বন্ধন ছেঁড়বার জন্য তখন তাকে মরিযা হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই মেয়েটিরও হয়েছে, তাই।

লালা: তাহলে কি আপনি বলতে চান, আপনার তনুর মনে এখনো পূর্ব্বস্মৃতি জাগে? এখনো কি এলাহাবাদের কথা সব ভুলতে পারেনি?

স্বামীজী: বাঘের উপমা দিয়ে যা বলেছি তাতেই কি তোমার প্রশ্নটির উত্তর পাওনি? সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে খেলবার সময় এমন কিছু ঘটে, যাতে মনটা তার ফুটো হযে যায়, আর তারই ফাঁক দিয়ে পূর্ব্বস্মৃতির আলো অমনি চোখে এসে পড়ে। এই জন্যেই আমি তাকে কারুর সাথে মিশতে দিতে চাইনি।

লালা: কিন্তু কারুর সাথে মিশতে না দিলে তার স্বভাবটিই যে বুনো হয়ে যাবে দাদাজী! দশটা মেয়ের সঙ্গে না মিশলে, দৌড়-ঝাঁপ, ছুটোপাটি, মাপামারি—এ সব না করলে আপনার তনুকে সব দিক দিয়ে আপনি চৌখোস করবেন কি করে? শুধু লেখাপড়া শেখালে,

আর খবরের কাগজ পড়ে বোঝালেই কি তাকে আপনার 'দেবী চৌধুরাণী' করে তুলতে পারবেন ?

স্বামীজী : তোমার এ-যুক্তি ত আমি অস্বীকার করিনি লালা। সেই থেকেই ত তনু ও-পাড়ায় গিয়ে রীতিমত মিশছে, খেলছে, দৌড়ঝাঁপ করছে। কিন্তু তাতে অসুবিধে হচ্ছে কি জান,—ওদিকের আকর্ষণটা এত বেশী যে এখানকার কাজগুলো যেন একপেশে হয়ে পড়ছে।

লালা : ত্রুটিটা কি ওরই ঘাড়ে চাপাতে চান দাদাজী ? বয়সটা দেখে তবে বিচারটা করা উচিত। আরো দু-চারটে বছর যেতে দিন, দেখবেন তখন—এদিকের 'এলেম'টিও কতটা দখল করে বসেছে। এখনই যা শিখেছে, তা কি বয়স হিসাবে অন্যের পক্ষে পর্ব্বত নয় ?

স্বামীজী : সেটা ঠিক। তবে কি জান লালা, আমার যেন আর সবুর সইছে না। নিজের বয়স যত গড়িয়ে চলেছে, ততই দুশ্চিন্তা গভীর হয়ে উঠেছে—জীবনের সাধটা বুঝি অপূর্ণই থেকে যায়। তোমারই চেষ্টা আর উদ্যোগে মেয়েটাকে পেয়ে আমি জীবনের মোড়টা পিছন থেকে ফিরিয়ে জোর করে সামনের দিকে নিয়ে চলেছি ;—তাকে টানছে ঐ মেয়েটা।

লালা : সে ত দেখতেই পাচ্ছি। জীবনটা মরচে ধরে ক্রমশঃই অচল হয়ে পড়ছিল, এখন ঐ মেয়েটা তেজী ঘোড়ার মত তাকে টেনে শুধু যে সচল করেছে তা নয়, শ্রী-ছাঁদ পর্য্যন্ত বদলে দিয়েছে। তার সাক্ষী আপনার চেহারা, খাওয়া-পরনা আর হাল-চাল। প্রয়াগের মেলায় যে লোক আপনাকে দেখেছিল, আজ যদি আপনার সামনে এসে দাঁড়ায়, হলফ করে বললেও বিশ্বাস করবে না যে সেই লোক আপনি। সেফটি ক্ষুরে নিত্য খেউরি হন, স্নো-পাউডারের প্রলেপ দেন। ভাগ্যিস্ মেয়েটার দাড়ীর ওপরে অতটা বিষদৃষ্টি হয়েছিল।

লালার শেষের কথাগুলি, স্বামীজীর সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা শিহরণ তুলিয়া দিল। আত্মবিস্মৃতের মত বিহ্বল ভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : তার ঐ দৃষ্টির মধ্যেই আর একটা মেয়ের মুখ মনের মধ্যে ভেসে উঠত আর আমাকে ঠেলে দিত পিছনে। অমনি সব গোলমাল হয়ে যেত !

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানেই লালা চাহিয়াছিল। মনে মনেই তিনি বুঝি স্বামীজীর অস্পষ্ট কথাগুলির একটা অর্থ স্থির করিয়া সহসা দৃঢ় স্বরে কহিলেন : আজও গোল করে ফেলেছেন দাদাজী, নিজের কথাতেই ধরা পড়ে গেছেন। এখন কবুল না করে আর উপায় নেই।

উভয় চক্ষুর দৃষ্টিতে বিস্ময় এবং প্রশ্ন ভরিয়া স্বামীজী কহিলেন : তার মানে ?

লালাজী গম্ভীর মুখে কহিলেন : আপনিই মনে করুন, বুঝতে পারবেন।

ইহাতেও স্বামীজীর মুখের ভাব অপরিবর্ত্তিত দেখিয়া লালাজী কহিলেন : সাধারণ লোকে যে ভুল ক'রে পস্তায়, আপনার মত লোকের পক্ষে সে-রকম ভুল করা কি ঠিক দাদাজী ? তনুর ব্যাপারে প্রথম দিনই এলাহাবাদে আপনি এমনি একটা ভুল করে ফেলেছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আপনার ঐ ভুলের মধ্যে ঢুকে মনের সন্ধান কিন্তু পাইনি। তবে আমার ব্যগ্রতা দেখে নিজেই তখন বলেছিলেন—মনটাকে যদি আর কোন দিন এ ভাবে নড়তে দেখ লালা, সেদিন চাপা-পড়া মাটিগুলো তুলে গোড়াটা দেখিয়ে দেব। আজ যে কথায়-কথায় মনটি ঠিক সেই ভাবে নড়ে উঠেছে দাদাজী।

স্তব্ধ ভাবে ক্ষণকাল লালাজীর মুখের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া স্বামীজী বলিলেন : তুমি দেখছি আমার চেয়েও সয়তান।

তৎক্ষণাৎ মাথাটি নত এবং হাত দুইখানি স্বামীজীর পাদদেশে প্রসারিত করিয়া লালাজী কহিলেন : এ যে আমার পক্ষে মস্ত একটা 'সার্টিফিকেট' দাদাজী।

স্বামীজী গম্ভীর মুখে বলিলেন : আমি এখন বুঝছি লালা, আমার মনোবিজ্ঞানের খান কয়েক পাতা তোমাকে না পড়িয়ে মস্ত একটা ভুল করেছি। কিন্তু সে পাতাগুলো খোলবার আগে তার ভূমিকাটা তোমাকে সংক্ষেপে না শোনালে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে না। বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে, বিশ বছর আগেকার মনে-লাগা কোনো একটা গানের সুর হঠাৎ যদি কানে লাগে, অমনি সমস্ত গানটি মনে প'ড়ে যায়। এটা হচ্ছে মনের কাজ, এরই নাম মনস্তত্ত্ব। এমনি আমাদের অতীত জীবনে বড় রকমের ব্যাপার যা ঘটে যায়, তার একটা প্রতিবিম্ব আমাদের মনের অবচেতন স্তরে যুগ যুগ ধ'রে জমা হয়ে থাকে, কোন হদিসই পাওয়া যায় না। কিন্তু হঠাৎ—তার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এমন সামান্য একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি হ'বামাত্রই সেই ঘটনার প্রতিবিম্বটি অবচেতন থেকে একেবারে চেতন স্তরে এসে একটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে, পুরানো অনুভূতিটাও সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই জন্যই রক্ত দেখলে কিম্বা মাংসের গন্ধ পেলে চিড়িয়াখানার

বাঘ গর্জ্জন ক'রে ওঠে। আমার উত্তেজনা'টা'ও এমনি একটা পুরানো অনুভূতির আকস্মিক জাগ্রত অবস্থা—বুঝলে?

লালা: মনস্তত্ত্বের চেয়ে আমি দেহতত্ত্বটাই যে বেশী বুঝি দাদাজী! আমার মনে হয়, মনের ব্যাপারগুলো সবই অবাস্তর, কিন্তু দেহের কাজগুলো পুরোপুরি বাস্তব। তবে এই বাস্তব আর অবাস্তবের মধ্যে যে একটা পুরাদস্তুর মাখামাখি ভাব আছে, তা'ও না বলতে পারি না। যাই হোক, ভূমিকা ত শুনলুম, এবার কেতাবখানি শুনিয়ে দিন।

স্বামীজী: সত্যভঙ্গ আমি করব না লালা, অকপটেই আমার জীবনের অতীত অধ্যায়টি বলছি, শোন:—আমার সম্বন্ধে এইটুকুই তুমি জান যে, কতকগুলো ছেলেকে ধরে-বেঁধে দল পাকাবার জন্যেই আমার জেল হয়। কিন্তু তার আগের কোন পরিচয় তুমি পাওনি। শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন-যাত্রার ছন্দই আমার ছাত্র-জীবনকে মনোরম করেছিল। বাবা ছিলেন যাজক, বিশিষ্ট ভট্টাচার্য্য পদবী, ভারি সিদ্ধ-বংশ, অর্দ্ধকালীর বংশধর ব'লে আমরা সমাজে সম্মানিত ছিলুম। ধর্ম্ম আর ভগবান, ন্যায় আর পুণ্য—এই আবহাওয়ার ভিতর দিয়েই মানুষ হয়েছিলুম। মেধাবী ছাত্র ব'লে নিজের খ্যাতিও বড় কম ছিল না। ইংরাজী আর দর্শনে এম-এ পাশ করে যখন কুইন্স কলেজের অধ্যাপক পদে পাকা হয়ে বসি, আমার বাবা তখন সেইখানেই সংস্কৃতের প্রবীণ অধ্যাপকরূপে নাম করেছেন খুব। কলেজের কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায় নিজেদের বাড়ী। তার কাছাকাছি বড় বাগানবাড়ীখানিতে থাকতেন বেনারস ডিষ্ট্রিক্টের জজ সাহেব। তিনি ছিলেন আবার বাবার বাল্যবন্ধু, ময়মনসিং জেলার এক প্রসিদ্ধ গ্রামেই তাঁদের নাকি বাল্যজীবন কেটেছিল। কাশীতে কর্ম্মস্থানে দীর্ঘকাল পরে একই অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়ার সুযোগে তাঁদের শৈশব-জীবনের বন্ধুত্বটি আবার নূতন করে এমন জেঁকে উঠল যে, দুই বাড়ীর মধ্যে সঙ্কোচের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জজ সাহেব হলেন সম্পর্কে কাকা, তাঁর মেয়ে অনুপমা সেই সম্পর্ক ধরে দাদা বলেই আমাকে মেনে নিল। তন্বী সুন্দরী সে, মুখখানা এত চমৎকার যে, চোখে পড়লে পল্লব পর্য্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়, বয়স তখন বছর পনেরো, এনি বেসান্তের থিওজফিক্যাল গার্লস স্কুলে পড়ছে। জজ সাহেব বরাবর বাইরে বাইরে কাটিয়ে এসেছেন, তাঁর মতটিও ছিল খুব উদার, তাই তখন পর্য্যন্ত মেয়েকে আইবুড়ো রেখে স্কুলে পড়াচ্ছিলেন, আর—আমার মত তরুণ বয়স্ক যুবকের সঙ্গে পড়া-শুনার ব্যাপারে মিশতে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি কিম্বা মনে কোন রকম অবিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু তাঁর সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

লালা নিবিষ্ট মনেই স্বামীজীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন, এই সময় সহসা বলিয়া উঠিলেন: অবিশ্বাসের কথাই বা এল কেন দাদাজী? দু'পক্ষে অত মাখামাখি যখন, বিয়ের কথাটা ত…

লালার কথায় বাধা দিয়া স্বামীজী বক্র কণ্ঠে কহিলেন: শোন কথা, আরে বোকা, বিয়ের কথা ওখানে উঠবে কোথা থেকে? বললুম না, আমি হচ্ছি ভট্টাচার্য্যের ছেলে আর জজ সাহেব যে কায়েত—অর্থাৎ বাংলা দেশের 'লালা'। বামুন-কায়েতের মধ্যে বিয়ের কথা তুলবে সামাজিক মানুষ? অসম্ভব! কিন্তু আমার মন যে কোন্ ফাঁকে সমাজের এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটাকে বিস্তীর্ণ করে ফেলেছে, আর, আত্মার মিলনেচ্ছাটিই সেখানে বড় হয়ে মানুষের তৈরী ব্যবস্থাটাকে একেবারে মুছে দিয়েছে, সেটি জানতে পারিনি। জানতে পারলুম সেই দিন—কলেজ-ম্যাগাজিনে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনে আমার লেখা একটা প্রবন্ধের ব্যাপার নিয়ে যখন খুব সাড়া পড়ে গেছে,—আর সেটা অনুর কানে পর্য্যন্ত গিয়ে উঠেছে। কেন না, সেদিন সন্ধ্যার সময় তার পড়ার ঘরে ঢুকতেই সে একখানা কাঁচি আমার হাতে দিয়ে বলল—'পড়াতে বসবার আগে টিকিটি তোমার কেটে ফেল দাদা!' এর আগে আর একদিন সে আমার কিশলয়ের মত নূতন গজানো দাড়ীগুলি নিশ্চিহ্ন করবার জন্য জিদ ধরেছিল। সে দিনের যুক্তি ছিল তার—টিকি আর দাড়ী দুটোয় মিশ খায় না। কিন্তু বাধ্য হয়েই সেদিন আমাকে টিকি আর দাড়ী দুটোরই মাহাত্ম্য প্রচার করে তবে তাকে শান্ত করা গিয়েছিল। কিন্তু এ-দিন আর তাকে বশে আনা গেল না। ধনুর্ভঙ্গ-পণ তার—টিকি না কাটলে কিছুতেই আমার কাছে সে পড়বে না। জেদে আমিও কম যেতুম না, বললুম—বিদ্যাসাগর নূতন মতবাদ প্রচার করেছিলেন, কিন্তু তার জন্যে কেউ তাঁকে টিকি কাটতে বলেনি। উত্তরে অনু তার মুখখানার এক অপূর্ব্ব ভঙ্গি করে বলল—বিদ্যাসাগরের কোন বিধবা ছাত্রী ছিল আর তার ওপর নিদারুণ একটা লোভ থাকার জন্যই যে তাকে বিধবা বিয়ের ব্যবস্থা প্রচার করতে হয়েছিল—এমন কথা শুনিনি। মেয়েটির প্রতিবাদের যুক্তি আর

মুখের ভঙ্গি আমাব চোখের পরদা যেন খুলে দিল। বুঝতে আর বাকী রইল না, তাকে পাবার লোভ আমার ঐ লেখাটার ভিতব দিয়েই তার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে গেছে। মনে মনে খুসীই হলুম, আর মনের সঙ্গে মিলিয়েই ঝাঁ করে কথাটার পাল্টা জবাব দিলুম—সে-রকম সুযোগ যদি তাঁর আসত তখন, তাহলে তাঁর মতবাদ অত বাধা পেত না। কথায় আছে—'আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যে শিখাইবে।' এদিক দিয়ে কিন্তু আমি ভাগ্যবান। কথাগুলো বক্তৃতার সুরে এক নিশ্বাসে শেষ করে আমি তাব মুখেব পানে তাকাতেই দেখলুম, এত বড় কথা শুনে তাব মুখের ভাব একটুও বদলায়নি, ঠোঁটের কোণে স্বচ্ছ হাসিটুকু তেমনি জড়িয়ে আছে, শুধু চোখেব তাবা দুটি একটু বেশী চক্‌চক্ করছে। চোখাচোখি হতেই অনু বলে উঠল—আজ থেকে আর দাদা বলে তোমাকে ডাকব না, টিকি দাড়ী আব যুক্তির জোরে তুমি সাধু হয়ে গেছ। আমি তোমাকে সাধুজী বলেই ডাকব। এর পর আমাকে দেখলেই সে সাধুজী বলে ডাকত, আব এমন অপূর্ব্ব একটা সুরে ডাকত যে শুনেই তন্ময় হয়ে যেতুম।

লালা এই সময বলিয়া উঠিলেন : এখন বুঝতে পেরেছি দাদাজী, তনুকেও আপনি সাধুজী ব'লে কেন ডাকতে বাধ্য করেছেন! তনুর গলার মিষ্টি সুরের ভিতর দিয়েই অতীতের সেই অভিবাঞ্ছিত ডাকটি অনুভব করতে চান।

লালার কথাটার কোন উত্তর না দিয়া স্বামীজী আপন মনেই বলিলেন : এখন গল্পটার উপসংহার করা যাক। এর পর মনেব উৎসাহ এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়ল যে, বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সমাজের যা-কিছু প্রচলিত মতবাদ, প্রত্যেকটিকে নিষ্ঠুর পরিহাস করে একখানি কেতাব লিখে ফেললুম। বইখানা ছাপাবার জন্যে একটি মাস আমাকে এলাহাবাদে বাস করতে হয়। সেখান থেকেই ছাপা বই সর্ব্বপ্রথম রেজিষ্টারী ডাকে অনুর নামে পাঠিয়ে দিই। টাইটেলের পরেই উৎসর্গ পত্রে বড় বড় অক্ষরে যে কয়টি কথা ছাপা হয়েছিল, এখনো তা মনে আছে।

কথাগুলি হচ্ছে : যাকে প্রথম চোখে দেখেই আমাব মনের ঘটে এই উদার মতের বীজগুলি সঞ্চিত হয়, যার নিবিড় সংস্পর্শে ক্রমশঃ সেগুলি অঙ্কুরিত পল্লবিত ও মুকুলিত হয়ে ওঠে, আজ সেই সযত্ন-গ্রথিত মত-মঞ্জরী-গুলি মঞ্জুভাষিণী অনুপমার মঞ্জু-করে সাদরে উপহৃত হল।

বিস্ময়ের সুরে লালা বলিয়া উঠিলেন : বলেন কি ? অবিবাহিতা কন্যাব নামে বইয়েব পাতায় এই কথাগুলো ছেপে দিলেন ?

স্বামীজী সহজ সুরেই বলিলেন : তখন যে ভাব-জগতে বিচরণ করছিলুম ; তরুণ বয়েস, তার ওপর রূপ আর মতের মোহ—দুটোই দুর্দ্ধর্ষ। সমাজের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা যে খুবই খারাপ, সেটা তখন মনে আসেনি। এর পর ছাপানো বইগুলো নিয়ে কাশীতে ফিরে এসে জজ-সাহেবের বাড়ীতে ধুলো-পায়ে ঢুকতেই প্রথম ধাক্কাটা খেয়ে আকাশ থেকে পড়লুম আর কি! জজ-সাহেব তখন তাঁর বসবার ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিলেন। আমাকে দেখেই চাপরাসীকে দিয়ে ডেকে পাঠালেন। কাছে গিয়েই মামুলী প্রথায় স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেই আঙ্গুল দিয়ে সামনের ঘরখানা দেখাইয়া দিলেন। ঘরে ঢুকেই তাঁর মুখের পানে তাকাতেই চমকে উঠলুম। মনে হল, সেই হাস্যময় সদা-প্রসন্ন মুখখানার উপর একটা হিংস্র জানোয়ারের মুখ কে যেন বসিয়ে দিয়েছে, চোখ দুটো জ্বলছে। ঘরের দরোজাটা পিঠ দিয়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বাম দিকের র‍্যাক থেকে একখানা বই তুলে আমার সামনে গোল টেবিলের মাঝখানে ফেলে দিলেন, আর সেই সঙ্গে ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে হুকে টাঙ্গানো সাপের ন্যাজের মত চামড়ার চাবুকটি টেনে নিয়ে সেইটিই আঙ্গুলের মতন হেলিয়ে অত্যন্ত রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলেন—এ বই তোমার লেখা ? সেটি আমারই জ্ঞান-বৃক্ষের প্রথম ফুল বা ফল—এলাহাবাদ থেকে ডাকযোগে যেখানি অনুর নামে পাঠিয়েছিলুম। তখন পর্য্যন্ত অবস্থাটা ঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি, সপ্রতিভ ভাবেই স্বীকার করলুম যে বইয়ের লেখক আমিই। এর পর তাঁর দাঁতের ভিতর দিয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন বেরিয়ে এল আরও তীক্ষ্ণ হয়ে—বই লেখবার স্বাধীনতা তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার মেয়ের নামের সঙ্গে এই নোংরা কথাগুলো ছাপবার অধিকার তোমাকে কে দিলে ?—প্রশ্নের সঙ্গেই যেন মগজের চাপা পরদাটা কে খুলে দিল একটানে। সত্যই ত, অনুর নামটি স্পষ্ট করে ছেপে দেওয়াতেই আজ অধিকারের কথা উঠেছে! কিন্তু পরক্ষণেই তারুণ্যের অভিমান দীপ্ত হয়ে আমাকে তাতিয়ে দিল। চোখ তুলে উত্তর করলুম—'যা সত্য, তাই অকপটে লিখেছি। কাউকে কিছু দেওয়াটা হচ্ছে আমার ইচ্ছাধীন, তবে নেওয়াটা অন্যের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। এখানে অধিকারের কোন প্রশ্ন নেই।' চাবুকের মাথাটা টেবিলের ওপর সজোরে ঠুকে জজ-সাহেব হুঙ্কার

তুলিলেন—সাট-আপ্! কি বলব, তুমি জাতে ব্রাহ্মণ, তার ওপর তোমার বাবা আমার বাল্যবন্ধু, নতুবা এই চাবুক দিয়ে তোমার গায়ের চামড়া তুলে ও-কথার জবাব দিতাম।—এত বড় কথার পর আর বসে থাকা চলে না, মাথার ভিতরে তখন আগুন জলে উঠেছে। মুখের কথা মুখেই চেপে ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালুম। কিন্তু হাতের চাবুকটি তুলে জজ-সাহেব শাসালেন—'যাবে কোথায়? তোমার বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছে, তিনি আসছেন। তাঁর সামনেই এ ব্যাপারের হেস্ত-নেস্ত একটা হলে তবে তোমার নিষ্কৃতি।'

পরের ব্যাপারটির কথা সংক্ষেপেই শেষ করছি। সেই ঘরেই ঘণ্টা খানেক আমাকে আটক রেখে আমার বাবা আর অনুর বাবা দুই ঝুনো বুদ্ধের পাকা মাথা থেকে যে যুক্তি-বহ্নি বেরুল, তাতে ছাপা বইগুলিকে আনিয়ে আমার চোখের সামনে পুড়িয়ে ফেলা হল। এর ওপর জজ-সাহেব জানিয়ে দিলেন, তাঁর বাড়ীর দরজাই যে শুধু আমার জন্যে বন্ধ থাকবে তা নয়, আমাকে কাশী ছেড়ে অন্তত একটি বছর এলাহাবাদে থাকতে হবে, সেখানকার কায়স্থ কলেজে তিনি আমার চাকরী জুটিয়ে দেবেন! আর, আমার বাবাও বন্ধুর এই ব্যবস্থা নির্ব্বিচারে মেনে নিয়ে হুমকী দিলেন যে, এর অন্যথা হলে তিনি আমাকে ত্যাগ করতেও দ্বিধা করবেন না। ব্যস্, দুর্জ্জয় জেদ আমাকেও পেয়ে বসল, যেমন ধুলো-পায়ে জজ-সাহেবের বাড়ীতে সেঁধিয়েছিলুম, সেখান থেকেও তেমনি সেই অবস্থাতেই বৈরাগ্যের পথে পাড়ি দিলুম।

লালা এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন: জজ-সাহেবের মেয়ের সঙ্গেও দেখা করলেন না?

স্বামীজী গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন: না, তার যে মূর্ত্তি মনের মধ্যে এঁকে ফেলেছিলুম তাকেই ফুটিয়ে তোলা হল আমার কিছু কালের সাধনা। প্রিয়জনদের পরিত্যাগ করলুম, বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়ালুম, প্রফেসারী ছেড়ে দিলুম, কিন্তু অনুর স্মৃতি ভুলতে পারলুম না। বছর দুই পরে খবরের কাগজে দেখলুম, জজ-সাহেব বোম্বায়ে বদলী হয়েছিলেন, সেখানেই হার্টফেল করে মারা গেছেন। তখনো চলেছে পুরা উদ্যমে আমার মানস-প্রতিমার নিয়মিত অর্চ্চনা। খবরটা পেয়েই মনটা দুলে উঠল, আমি তখন কনখলে। সেখান থেকে লম্বা একখানা চিঠি ছাড়লুম অনুর নামে। পিতৃশোকে সমবেদনার সঙ্গে মানস-প্রতিমার উদ্দেশে কঠোর সাধনার কথাও বিস্তারিত ভাবেই তাতে লেখা ছিল। কিন্তু পত্রের উত্তর পেয়ে একবার যেন আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে পড়লুম। উত্তর দিয়েছেন—হরপ্রসাদ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক। খুব সংক্ষেপে লিখেছেন তিনি—অনুর কাছে আপনার ইতিহাস সবই শুনেছি আমি। আমরা ভেবেছিলুম, সর্ব্বত্যাগী হয়ে আপনি মানস-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছেন! কিন্তু তার বদলে আপনি যে পূর্ণ উদ্যমে মানস-প্রতিমা গড়তে লেগে গেছেন, এ খবর পেয়ে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করছি। অনুগ্রহ করে একদিন অধীনের অফিসে পদধূলি দিয়ে আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী অনুপমার বাস্তব-প্রতিমার সঙ্গে আপনার মনে-গড়া মানস-প্রতিমাটি মিলিয়ে দেখতে পারেন।

লালা বিস্ময়ের সুরে কহিলেন: সর্ব্বনাশ! এ যে সেই—গ্রীক্ মিট এ গ্রীক্—অর্থাৎ সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলির মতন হল! তারপর? গেলেন নাকি বোম্বায়ে?

স্বামীজী শুষ্ক স্বরে কহিলেন: পাগল! তাহলে বুকের ছাল তুলে ছবি খুঁজে বার করত ঐ হরপ্রসাদ! ডাইরেক্টরী খুলে জানতে পারি—সে একটা মস্ত মার্চ্চেণ্ট ওখানকার। সেই দিন থেকেই মনের ছবির ওপর পরদা ফেলে দিয়ে অন্য রাস্তা ধরলুম। খেয়ালের বশে অনেক কিছুই করা গেল, নানা রকম রাস্তা খুঁজে বার করে খুব ছুটোছুটিও চলল। কিন্তু কেউ যদি সন্ধানী দৃষ্টিতে তল্লাস করত, তাহলে বোধ হয় বেরিয়ে পড়ত যে ও-সবের তলে তলে রয়েছে মস্ত একটা আক্রোশ—ঐ মেয়েটাকে ঘিরে। কিন্তু ক্রমে তার স্মৃতি চাপা পড়েই গিয়েছিল। সে চাপা খুলে দিল তার মেয়ে···আর উপলক্ষ হলে তুমি।

লালা: কিন্তু এখন আপনি ইচ্ছা করলেই মনের আক্রোশ মেটাতে পারেন। হরপ্রসাদ ঘোষ মেয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

স্বামীজী: তাহলেই কি মনের আক্রোশ আমার মিটবে বলতে চাও?

লালা: টাকার লোভ আপনার নেই তা জানি, এদিক দিয়ে আপনি পরমহংস; টাকা-পয়সা স্পর্শও করেন না। তবে একটা মতলব ত কিছু আছে। না হয় দেবী চৌধুরাণীই তৈরী করলেন, কিন্তু তারপর? মেয়েকে দিয়েই কি শেষে বাপের ঐশ্বর্য্যের উপর ডাকাতি করে কিম্বা মাকে ধরে এনে মনে ঝাল মেটাবেন দাদাজী?

স্বামীজী: এ কথার উত্তর আমি তোমাকে এখন দিতে পারব না লালা; কেন না, আমি নিজেই তা জানি না। এখন আমি ওকে শুধু আমার মনের মতন করে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব—যে পর্য্যন্ত বয়স ওর ষোল

পূর্ণ না হয়। অন্নুর ছবি আমার মানস-পটে যখন আঁকতে সুরু করি—তখন সে-ও ছিল প্রায় ষোড়শী··· এর বেশী আর কিছু বলব না লালা, তুমিও এ-সম্বন্ধে আর প্রশ্ন তুল না ভাই। সময়ে সবই জানতে পারবে —বুঝেছ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া লালা কহিলেন: আপনি যতটুকু বললেন দাদাজী, এই যথেষ্ট। এর পরের অধ্যায় জানবার প্রলোভন আমার নেই। আমি অতীত আর ভবিষ্যৎ ছেড়ে বর্ত্তমানকে নিয়েই সাধনা চালাতে ভালবাসি।

স্বামীজী: তাই উচিত, বুদ্ধিবৃত্তির এইটিই হচ্ছে প্রধান অঙ্গ। আজ কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে বসে অন্নুর খেলা দেখতে আর যাওয়া হল না। তুমিও সেখানে অনুপস্থিত, খেলা বোধ হয় ওদের আজ আর হ'বে না।

লালা: আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলেই খেলার একটা নতুন ধারা দেখিয়ে দিয়ে এসেছি। আপনার দ্রোণাচার্য্যের অনুকরণ আর কি। একটা পাখী তৈরী করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়েছি। একশো হাত তফাতে দাঁড়িয়ে তার ছুঁড়ে তার চোখটি বিঁধতে পারলেই বাঁধন কেটে পাখীটা ঝুপ করে পড়ে যাবে। সেই প্রতিযোগিতাই ওদের চলেছে।

স্বামীজী উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন: চল তাহলে দেখা যাক খেলাটি কি ভাবে শেষ হল; মেয়েটাও অনেকক্ষণ চোখের আড়ালে রয়েছে।

স্বামীজীকে উঠিতে দেখিয়া লালাও উঠিলেন এবং পরক্ষণেই কক্ষের রুদ্ধ দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল তন্নু। হাতে তাহার বাখারীর ধনুক, পিঠের দুই দিকে দুইটি তূণ পরিপাটি করিয়া বাঁধা, তাহাতে নলখাগড়ার মুখে সংযুক্ত লোহার সরু-সরু ফলাগুলি চিক্-চিক্ করিতেছে। মেয়েটির কালো লম্বা চুলগুলি বেণীবদ্ধ হইয়া পিঠে দুলিতেছে, তার প্রান্তভাগে একটি পঞ্চমুখী জবাফুল বাঁধা। লাল পাড়ের যোগিয়া রঙে সাড়ীখানি হাতকাটা জামাটির সংযোগে, আঁটসাট করিয়া তাহার সুডোল দেহটিকে আবৃত করিয়াছে। অনাবৃত বাহুমূলে ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার আকারে সুশ্রী ফুলের বেষ্টনী। কানে রক্তবর্ণ দুটি প্রবাল ঝুলিতেছে, ললাটে সিন্দুরের উজ্জ্বল ফোঁটাটি যেন অগ্নিশিখার মত জ্বলিতেছে, তাহার একটু উপরে চুল ঘেঁসিয়া ফিতার মত প্রশস্ত পিঙ্গলবর্ণের এক শ্রেণীর লতার দ্বারা ফেট্টি বাঁধা; সুন্দর মুখখানি সাফল্যের উল্লাসে সমুজ্জ্বল।

মেয়েটি আসিতেই উভয়ে পুনরায় বসিলেন এবং স্বামীজী লালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: একবারে শিকারী সাজিয়েছ যে দেখছি!

তন্নুই উপরপড়া হইয়া তাড়াতাড়ি কথাটার উত্তরে বলিল: শুধুই সেজেছি না কি, শিকারও করেছি। আপনি ত শিকার দেখিয়ে চলে এলেন ওস্তাদজী, তারপর যা হোল মজা!

ওস্তাদজী অর্থাৎ লালা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তন্নুর পানে চাহিতেই সে পুনরায় বলিল: আপনার চামেলী জোর করে বলেছিল, পাখীটার চোখ বিঁধতে সেই পারবে। কিন্তু পেরেছি আমি, চামেলীর মুখ চূণ হয়ে গেছে।

সিদ্ধির আহুতিরূপে সিদ্ধাশ্রমে যে কয়টি জীবন্ত সমিধ আহৃত হইয়াছে, চামেলী নামে মেয়েটি তাহাদেরই একজন। প্রয়াগের চামেলী নামে তাহাকে পরিচিত করা হইয়াছে। এক-পাল মেয়ের আশ্রমেই এই পাঞ্জাবী বালিকাটিকে আমরা দেখিয়াছি। এখানের মধ্যে এই মেয়েটিই তন্নুর মত বুদ্ধিমতী এবং খেলাধুলায় তাহার প্রতিযোগিনী।

লালা: বল কি, তুমি ত তাহলে লক্ষ্যভেদেও সবার ওপরে ওঠে গেলে দেখছি!

স্বামীজী: তাই ত, তোমার লক্ষ্যভেদটা দেখাই হল না আমাদের! সে-দিন সাঁতার কাটা দেখে সত্যিই অবাক হয়েছিলুম।

তন্নু: সাঁতারেও চামেলী আমাকে হারাতে পারে নি, তিনবারই আমি সবার আগে পার হয়েছি।

লালা: কিন্তু দৌড়ে তুমি চামেলীকে হারাতে পারনি, তন্নু! তিনটে দৌড়েই সে তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে।

তন্নু: এবার যে-দিন দৌড়ের পরীক্ষা হবে দেখবেন —কে কাকে হারায়।

লালা: বল কি, তুমি ঐ দৌড়বাজ মেয়েটাকে হারিয়ে দেবে ভেবেছ? পারবে?

তন্নু: না পারি ত নিজের ঠ্যাং ভেঙ্গে ফেলব। প্রজাপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে দৌড় শিখছি, তা বুঝি জানেন না? চামেলী এবার আমুর না ছুটতে।

লালা: ভাল, দেখা যাবে কে হারে কে জেতে—কালই তোমাদের দৌড়ের পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

স্বামীজী: শিকারীর সাজ এখন ত ছেড়ে ফেল, এবার পড়া চলবে।

তন্নু: পড়া নয়—গল্প। পড়বার আগে ত গল্প শোনবার কথা! কালকের গল্পটি আজ শেষ করতে হবে সাধুজী! অর্দ্ধেক শুনেছি; মনে থাকে যেন

কাগজ ছেড়েই আমি এখুনি আসছি।—বলিয়াই দ্রুত-বেগে সে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

লালাজী জিজ্ঞাসা করিলেন: কিসের গল্প এখন চলেছে দাদাজী?

স্বামীজী বলিলেন: দেবী চৌধুরাণীর। কাল বলা সুরু হয়েছে, আজ শেষ করতেই হবে।

লালাজী বলিলেন: রোখ দেখলেন ত, কোন বিষয়েই পেছপাও নয়, কারুর পিছনে পড়ে থাকতে চায় না। বলল শুনলেন ত—এবার হেরে গেলে পা ভেঙ্গে ফেলব। দৌড়ে চামেলীর সঙ্গে পারেনি ব'লে প্রজাপতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ের কসরৎ করছে!

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন: সেই জন্যই ত দেবী চৌধুরাণীর গল্পটা শুনিয়ে জমি তৈরী করে রাখছি; এর উপর তুমি ওকে ঝাঁকে মিশিয়ে যে ভাবে পাকাপোক্ত করে তুলছ সব রকমে, বোলোষ পড়লে দেখো এ মেয়ে কি হয়।

লালাজী কি ভাবিয়া সহসা প্রশ্ন তুলিলেন: আচ্ছা দাদাজী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—মনের জোর যার এই বয়সেই এতখানি, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে কি একটা টোটকা ওষুধ আর আপনার ইচ্ছা-শক্তির জোরে আগের কথা সব ভুলে গেছে মনে করেন?

অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে লালাজীর মুখের পানে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন: তোমার টোলের মেয়েগুলোর অবস্থা দেখেও কি এটা বুঝতে পারনি লালা?

লালা: তাদের কথা আলাদা। তবুও কাউকে কাউকে আনমনা হতে দেখেছি, ঘুমের ঘোরে এক এক জন হেদোর, বাপ মা ভাই বোনকে ডাকে। চামেলীকেই কিছু বেশী বাড়াবাড়ি করতে দেখিছি। তবে আমার সামনে সজাগ অবস্থায় এখন আর কেউ টুঁ শব্দটিও করে না।

স্বামীজী: নিদ্রিত অবস্থায় ওদের অবচেতন মন জাগ্রত হয়ে ওঠে, ওগুলো তারই ক্রিয়া। কিন্তু তনুর সম্বন্ধে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, জাগ্রত অবস্থাতেও তার অবচেতন মন পূর্ব্ব-স্মৃতির সামান্য একটু স্পর্শেই সাড়া দিয়ে ওঠে। কাল সেই অবস্থাই দেখা গিয়েছিল।

লালাজী: কি রকম?

স্বামীজী: দেবী চৌধুরাণীর গল্প বলতে বলতে যেই হরবল্লভের কথা উঠল, অমনি তনু তার ডাগর ডাগর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় করে নিজের মনেই বিড়-বিড় করে বলে উঠল—হরবল্লভ? বউকে তাড়িয়ে দিল!...আচ্ছা, আমার বাবার নামও হর......এই পর্য্যন্ত বলতেই আমি তার চোখের পানে চেয়ে জোর-গলায় বললুম—তোমার বাবার ও-নামটুকু'তে যাবে কেন?

লালাজী: তার পর?

স্বামীজী: একবার চমকে উঠেই আস্তে আস্তে বলল—'তাই ত, আমার বাবা হলে অমন করে কখন তাড়িয়ে দিত না।' বুঝলুম, গল্পের হরবল্লভ নামটি শুনেই ওর অবচেতন মনের তারে বাপের হরপ্রসাদ নামটি ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। এর পর হরপ্রসাদের নাম চেপে 'ব্রজেশ্বরের বাবা' বলে গল্প শুনিয়ে তবে নিষ্কৃতি পাই। এমনি করেই এই শক্ত মেয়েটির মন থেকে পূর্ব্ব-স্মৃতি আমাকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে লালা। এ যেন সেই—বাঘের সঙ্গে খেলা চলেছে, একটু ভুল হলেই হালুম করে লাফিয়ে উঠবে।

লালা একটু থামিয়া বলিলেন: এ মেয়েকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মনের মতন করে গড়ে তোলা বড় সোজা কথা নয়, আপনি বলেই পারছেন। যা'হোক, চামেলীটাকেও এখন থেকে আপনাকে একটু ভাল করে তালিম দিতে হবে দাদাজী!

স্বামীজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন: সে তো দিচ্ছিই গো—যখনই যেখানে জল পড়ছে বলেছ, সামলানো যাচ্ছে না, তখনই ছুটতে হয়েছে ছাতি ধ'রে। বল ভায়া, কোন দিন 'না' বলেছি?

লালা কহিলেন: আমরা যাই করি না কেন, এটা ভাল করেই জানি যে, মাথার ওপরে আছেন আপনি বসে। কাজ যেখানে আটকাবে, আমার সাধ্যে কুলাবে না—সেখানেই আপনি গিয়ে দাঁড়াবেন 'মুস্কিল আসান' হ'য়ে। আচ্ছা, এখন তা হ'লে উঠি দাদাজী, আপনার ত এখন গল্পের আসর বসবে, আমার ছাত্রীরাও আটচালায় গিয়ে জমেছে—পাটশালা সেখানে বসিয়ে গুরুম'শায় হতে হবে।

স্বামীজী বলিলেন: হ্যাঁ হে ভায়া, তোমার মেয়ে-গুলোকে না কি জাত-ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষায় লায়েক করে তুলতে উঠে-পড়ে লেগেছ। ব্যাপার কি?

লালা উত্তর করিলেন: ব্যাপারটা একটু বাঁকা রকমের দাদাজী! আপনি যেমন তনুকে বাংলা, হিন্দী, উর্দ্দু আর ইংরিজী—এই চারটে ভাষায় লায়েক করে তুলতে চান, ওদের সম্বন্ধে আমার ইচ্ছাটিও তাই। তবে কি জানেন, বাঙ্গালী জাতটা ওপরপড়া হয়ে পরের ভাষা শেখে, বিদেশ গিয়ে মনের জোরে বিদেশী ভাষায় কথা বলে, কিন্তু অন্য জাত এর ঠিক উল্টো। তারা যেখানেই যাক, জাত-ভাষার মায়া কিছুতেই ছাড়বে না। এই জন্যেই ওদের জাত-ভাষাগুলোর ওপর

আপাতত ধামা চাপা দিয়ে বাঙলা আর ইংরেজীকেই চালু করে দিয়েছি। এরাও যখন সব বোলোয় পড়বে—তখন এর ফল কি হয় দেখবেন।

ঈষৎ হাসিয়া স্বামীজী একটি সংস্কৃত প্রবচন আবৃত্তি করিলেন—

এক ভূরুভয়োরেকদলয়োরেককাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পবিচীয়তে॥

লালা কহিলেন: শ্লোকটির অর্থ ত ঠিক বুঝতে পারলুম না দাদাজী?

স্বামীজী বলিলেন:—অর্থ হচ্ছে—একই ক্ষেত্রে শালি এবং শ্যাম ধান জন্মে, উভয়ের দল কাণ্ড প্রভৃতি একই রকম; কিন্তু ফলের দ্বারায় উভয়ের প্রভেদ জানা যায়।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া লালা বলিলেন: আপনার শ্লোকটি সত্যই ভাববার মতন; এটা আমার কাজে লাগবে। তাহলে এখন চললুম দাদাজী।

লালাজীর প্রস্থানের পরক্ষণেই তনু বেশ পরিবর্তন করিয়া স্বামীজীর কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিল। পরনে একখানি ছাপানো বৃন্দাবনী সাড়ী, মাথার চুলগুলি বেণী-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া পিঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, অঙ্গে ফুলের আভরণগুলির কোন চিহ্ন নাই, সে স্থলে হাতে দুই গাছি করিয়া সুশ্রী শাঁখা এবং গলায় এক ছড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামুদ্রিক শঙ্খের বিচিত্র মালা, ললাটে কাচ-পোকার একটি সুচিক্কণ টিপ। এই সামান্য বেশ-ভূষাতেই তাহার রূপশ্রী উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া ঘরখানিকে যেন আলো করিয়া দিয়াছে।

নির্দেশ মত তনু স্বামীজীকে 'সাধুজী' বলিয়া ডাকিতে অভ্যস্থ হইয়াছে। তনুর ন্যায় আশ্রমের অন্যান্য বালিকারাও তাঁহাকে 'সাধুজী' সম্বোধনেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন করিয়া স্বামীজী আটচালার আসরে উপস্থিত হইয়া আশ্রম-বালিকাদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার আবাস-ভবনে একমাত্র তনুই নিত্য নিয়মিত-রূপে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করে, উপদেশ ও গল্প শুনিয়া জ্ঞানার্জ্জন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। স্বামীজী বাছিয়া বাছিয়া বিশ্ব ইতিহাস এবং উপন্যাসের তেজস্বিনী নারীচরিত্রমূলক আখ্যানগুলি শুনাইয়া বালিকার কোমল অন্তরটির উপর একটি বলিষ্ঠ অনুভূতির সঞ্চার করিতে বদ্ধপরিকর। গল্প শুনিতে তনুর আগ্রহ এবং উৎসাহ এরূপ প্রচুর যে বড় বড় আখ্যায়িকা এক দিনেই সে নিঃশেষ করিতে উৎসুক, কিন্তু স্বামীজী তাহার আগ্রহকে অধিকতর উদগ্র করিবার অভিপ্রায়ে অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক স্থানেই বিরাম দিয়া পরদিনের জন্য ঝুলাইয়া রাখেন। অপরাহ্নে খেলাধুলার পরই তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্তন করিয়া সে স্বামীজীর বৈঠক-ঘরে গল্প শুনিবার আগ্রহে প্রবেশ করে এবং গল্পটি সম্পূর্ণ হইবার পর স্বামীজীর সহিত তাহাকে সান্ধ্য অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয়। এইরূপ বাঁধা-ধরা নিয়মের চাপে পড়িয়া তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি সমাহিত হইয়া পড়ে এবং পুনরায় যাহাতে অতর্কিতে সমুখ হইয়া ছাত্রীটিকে চঞ্চল বা চিন্তান্বিত করিয়া না তোলে, সেদিকে স্বামীজীকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

লালাজীকে বিদায় দিয়াই স্বামীজী তাঁহার গল্পের খেইটি ধরিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় তনু তড়িৎগতিতে আসিয়া একেবারে তাঁহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল: কাল যে আপনি বলছিলেন সাধুজী, আমার বাবার ও-নাম হবে কেন,—আজ কিন্তু আমি ভেবে ভেবে জেনেছি—আমার বাবারও নাম ছিল হর······

বালিকার কথার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর চক্ষুর তারা দুটিও এরূপ প্রদীপ্ত হইতেছিল যে তাহাদের আভায় তনুর কোমল মুখখানি বুঝি ঝলসিয়া গেল। কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইতেই অগ্নিবর্ষী দৃষ্টির সহিত স্বামীজী তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন: 'মিছে কথা, অমন কথা মনে ভাবাও মহাপাপ, তনু! তোমার বাবার ও-নাম নিশ্চয়ই ছিল না।'

দৃষ্টির প্রখরতা এবং কণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বরের প্রভাবে বালিকা অভিভূত হইয়া পড়িলেও মুখখানি তুলিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: ছিল না?

তাহার জিজ্ঞাসু চক্ষু দুটির উপর নিজের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্বামীজী তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন: না—ছিল না।

বালিকার কণ্ঠ তথাপি স্তব্ধ হইল না, প্রশ্ন উঠিল: কিছু ছিল না? আমার বাবা, আমার মা, আমার দিদি, আমার বাড়ী······

তর্জ্জনের মত স্বরে স্বামীজী বলিলেন: না—না—না, আমি বলছি না, কিছুই তোমার নেই। আমি বলছি—নেই—নেই—নেই।

বিহ্বল দৃষ্টিতে স্বামীজীর পানে চাহিয়া বালিকা স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিল: নেই—নেই—নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ তাহার চিবুকটি তুলিয়া ধরিয়া আহ্বানের সুরে ডাকিলেন: তনু—তনু······

ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া তনু এবার

মুদিত দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিল, তাহার পর অপ্রতিভের মত হইয়া কহিল : অ-মা, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম না কি ?

স্বামীজী বলিলেন : বেশ, যা হোক, গল্প শুনবে বলে এসে বসলে, তারপর অমনি মেয়ের ঘুম ! শিকারের খেলায় ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ—নয় ? গল্প শোনা তাহলে আজ থাক, কি বল ?

বালিকার উৎসাহ পুনরায় জাগ্রত হইয়া উঠিল, কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া কহিল : বা-রে, গল্প শুনব বলে ছুটে এলুম, আর আপনি বলছেন আজ থাক। না, তা হবে না আজ ও-গল্প শেষ করতেই হবে।

স্বামীজীকে তখন মৃদু হাসিয়া তাঁহার গল্পের শেষাংশ আরম্ভ করিতে হইল : সেই ত, সাহেব আর ব্রজেশ্বরের বাবাকে বোকা বানিয়ে দেবী রাণী তাঁর বজরায় তুলে দিলেন তাকে ছেড়ে, ঠিক সেই সময় আচমকা একটা ঝড় উঠে সব ওলট-পালট করে দিল। সাহেবের বরকন্দাজরা নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, আর দেবীর বজরা তখন ছুটল তীরের মত বেগে। বুদ্ধি খেলিয়ে আগে থাকতেই যে ফাঁদটি দেবীরাণী পেতে রেখেছিলেন, তাতেই সাহেব-বাঘটি ধরা পড়ল, আর তার সাথী ব্রজেশ্বরের বাবাও রেহাই পেল না। এখন এদের সঙ্গে দেবী চৌধুরাণীর একটা বোঝা-পড়া করবার সময় এল…

স্বামীজীর গল্প যখন এই ভাবে জমিয়া তনুর মনে একটা পুলকের শিহরণ তুলিতেছিল, সেই সময় আশ্রমের পূর্ব্বোক্ত অঞ্চলে বিস্তীর্ণ আটচালার মধ্যে অন্যান্য বালিকাগুলিকে লইয়া লালাজীর বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা-দানের বিচিত্র কসরৎ চলিতেছিল।

এ-সম্বন্ধে লালাজীর উদ্দেশ্যের আভাস পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার ছাত্রীগুলিকে সর্ব্বাগ্রে বাঙ্গলা ভাষায় পাকা-পোক্ত করিয়া লইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিখাইবেন। তনুর যেমন বাঙ্গলা ভাষায় স্বাভাবিক জ্ঞান প্রচুর, এই মেয়েগুলির অধিকাংশই তেমন হিন্দী ও উর্দ্দু বলিতে অভ্যস্ত। কিন্তু লালাজীর ধারণা, ভালো করিয়া বাঙ্গলা ভাষাটা শিখিতে পারিলে, যে-কোন ভাষা শিখিবার আগড় খুলিয়া যাইবে। যে কোন কারণেই হউক, এই ভাষাটির প্রতি আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা বশতঃ তিনি দলের সব কয়টি বালিকাকেই এমন ভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিখাইয়া পড়াইয়া পণ্ডিত করিয়া তুলিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন যে—প্রথম আলাপেই যে-কোন প্রদেশবাসীর দৃষ্টিতে ইহারা যেন বাঙ্গালীর মেয়ে বলিয়াই ধরা পড়িয়া যায়। তাই প্রত্যহই এই সময় এখানে বাঙ্গলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার মহলা বসে এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরাজীকে আমল দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু এই আসরে এই দুইটি ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষাকেই স্থান দেওয়া হয় না—বালিকাদের মাতৃভাষা হইলেও নয়।

আশ্রম-বালিকাগণ আটচালার অভ্যন্তরে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে দাঁড়াইয়া লালাজীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। লালাজীর মুখে ইংরাজী শব্দটি শুনিয়াই সমস্বরে বালিকারা তাহার বাঙ্গলা প্রতিশব্দ বলিবে—ইহাই এই আসরের সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা।

প্রথমেই লালাজী প্রশ্ন করিলেন : Daughter বল্‌তে কি বোঝ তোমরা ?

বালিকারা সমস্বরে উত্তর করিল : কন্যা।

প্রশ্ন : আর Girl মানে ?

উত্তর : মেয়ে।

প্রশ্ন : Daughters এবং Girls বল্‌লে কি বুঝবে ?

উত্তর : মেয়েরা।

প্রশ্ন : Daughters এবং Girls কি রকম দেখতে ?

উত্তর : যেমন আমরা।

প্রশ্ন : Body বল্‌তে কি বোঝ ?

উত্তর : শরীর ;

প্রশ্ন : আর Appearance ?

উত্তর : চেহারা।

প্রশ্ন : Head কি ?

উত্তর : মাথা।

প্রশ্ন : Brain ?

উত্তর : মস্তিষ্ক।

প্রশ্ন : Tears কাকে বলে ?

উত্তর : চোখের জল।

প্রশ্ন : আর Heart ?

উত্তর : হৃদয়।

এবার প্রশ্নের মোড় ফিরাইয়া লালাজী বলিলেন : হাত তোল সকলে একসঙ্গে।

বালিকারা প্রায় সকলেই একসঙ্গে উভয় হাত শূন্যে উঁচু করিয়া তুলিল। লালাজী উত্থিত হাতগুলি দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন : একবার হাতাহাতি কর ত দেখি।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বৃহৎ পংক্তিটি সমান্তর দুইটি লাইনে পরিণত হইল এবং মুখোমুখি

হইয়া বালিকারা পরস্পর হাতে হাত লাগাইয়া বল-পরীক্ষা সুরু করিয়া দিল। মিনিট সাতেক ধরিয়া ঠেলাঠেলি ও হুড়াহুড়ি চলিবার পর লালাজী হাত তুলিয়া হুকুম দিলেন: থামো সকলে, যেমন ছিলে তেমনি দাঁড়াও।

এক মিনিটের মধ্যেই পুনরায় বালিকারা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ওস্তাদজীর পরবর্ত্তী নির্দেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এবার ওস্তাদজী আদেশ করিলেন: গান ধর—কিসের তরে অশ্রু ঝরে……

বালিকারা সমস্বরে গান ধরিল:

"কিসের তরে অশ্রু ঝরে
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
কর্‌ব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্ব্বহারা
সর্ব্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্ব্বময়ী ভাগ্য দেবীর
নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
কর্‌বো মোরা পরিহাস।"

স্বামীজীর প্রয়োজনের অনুরোধ তাঁহার পাঠাগারে বিশ্বপণ্ডিতগণের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের সংগ্রহ-ব্যাপারে এই লালাটি যে পরিমাণে আগ্রহশীল ছিলেন, সংগৃহীত গ্রন্থগুলির ভিতরে প্রবেশ করিবার মত ধৈর্য্য বা অবসরের ততখানি অভাব দেখা যাইত। যদিও এককালে পড়াশুনা তাঁহার মন্দ ছিল না এবং অনেকগুলি ভাষাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইদানীং কয়টি বৎসর ধরিয়া এই বিস্তীর্ণ আশ্রমটির প্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক পরিকল্পনায় তাঁহাকে এরূপ লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে যে, পাঠাগারে বসিয়া গ্রন্থের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার স্পৃহা কদাচ দেখা যাইত না। তবে, ইহাও সত্য যে, আশ্রমে উপস্থিতির সময় সহস্র কার্য্যের মধ্যে অন্ততঃ একটি ঘণ্টা সময় করিয়া তিনি স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সহায়তায় বিশ্বপণ্ডিতদের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইতেন এবং নব নব তথ্যগুলি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগাইতে অবহেলা করিতেন না। স্বামীজী একদা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'হতভাগ্যের গান'টি সুর করিয়া গাহিয়া তাঁহাকে শুনাইতেছিলেন। লালাজী সেই সময় স্বামীজী সন্দর্শনে আসিয়া—বাহিরে দাঁড়াইয়া গানটি শুনিয়া মুগ্ধ হন। অতঃপর স্বরলিপিসহ স্বামীজীর নিকট হইতে তাহা নিখুঁত ভাবে আদায় করিয়া লইয়া তাঁহার ছাত্রীদের প্রাত্যাহিক গানে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনের বিখ্যাত সিদ্ধাশ্রমটির কার্য্যধারা এই ভাবে বিচিত্র গতিতে চলিতে থাকে।

এই বিচিত্র উপন্যাসটির প্রথম পর্ব্বের উপর এই-খানেই যবনিকা ফেলা গেল।

দ্বিতীয় পর্ব্ব

১

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর অনেকগুলি বৎসর কালের পরিবর্ত্তনশীল গর্ভে পড়িয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় যুগান্তে যে কাল সবুজের হিল্লোল তুলিয়া প্রগতির পথে অভিনব রূপে দেখা দিয়াছে, কর্ম্মী পুরুষ হরপ্রসাদ তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, সেই সঙ্গে তাঁহার সে-যুগের বলিষ্ঠ উদার মনটিও যেন আশ্চর্য্য রকমে বদলাইয়া গিয়া দুর্ব্বল ও কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে: প্রয়াগে আমরা এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মানুষটির প্রকৃতির যে প্রশংসিত পরিচয় পাইয়াছি, বর্ত্তমানে সেই প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই হইয়াছে!

প্রয়াগের বেদনাদায়ক দুর্ঘটনার বৎসরটির শেষভাগে হরপ্রসাদ সেই যে সপরিবার তাঁহার সযত্নরচিত প্রাসাদ-তুল্য নব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া বোম্বাই যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহার পর আর একটি দিনের জন্যও তাঁহাকে কেহ সেই অভিশপ্ত ভূমির ছায়াও স্পর্শ করিতে দেখে নাই। পাছে এলাহাবাদের বৈষয়িক আকর্ষণ ছিন্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হয়, তজ্জন্য এলাহাবাদের অফিস কানপুরে স্থানান্তরিত করিয়াছেন এবং বাড়ী দুইখানি ডাক্তার অধিকারীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বিক্রয় না করিয়া তাঁহাকেই বারো বৎসরের জন্য এই সর্ত্তে লীজ দিয়াছেন যে, বাড়ীর আয় হইতেই তাহাদের সরকারী ট্যাক্স সরবরাহ এবং সংস্কারাদি চলিবে, উপরন্তু হরপ্রসাদ বাবুর নিরুদ্দিষ্টা কন্যার অনুসন্ধান-সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ-পত্রও নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে ডাঃ অধিকারী রেণুকে যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন—নির্দ্ধারিত পুরস্কার ত পাইবেনই, উপরন্তু বসত-বাড়ীখানাও বোঝার উপর শাকের আঁটির মত কায়েমী ভাবে তাঁহার আয়ত্তাধীন হইবে। কিন্তু বারো বৎসরের মধ্যে যদি তিনি রেণুর সম্বন্ধে অকৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে লীজ ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে বার্ষিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে বারো বৎসরের দরুণ ছয় হাজার টাকার সহিত সুসজ্জিত বাড়ী দুইখানি নিখুঁত অবস্থায় বিনা ওজরে হরপ্রসাদ বাবু বা তাঁহার উত্তরাধিকারীদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে।

এলাহাবাদের পাট যখন এই ভাবে দীর্ঘকালের মত চুকিয়া যায়, সেই সময় কলিকাতায় মোটা রকমের কোন পাওনা টাকার ব্যাপারে হরপ্রসাদকে সেখানে একটা নূতন পাট পাকা করিয়া ফেলিতে হয়। অর্থাৎ, পাওনা টাকার সম্পর্কে বালিগঞ্জ অঞ্চলের কয়েক বন্দ জমি তাঁহার হাতে আসিয়া যায়। জমিগুলির জর্জ্জর অবস্থা অন্যের দৃষ্টিকে প্রলুব্ধ করিতে না পারিলেও, অসাধারণ দূরদৃষ্টির প্রভাবে হরপ্রসাদ তন্মধ্যে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর রত্নঝাঁপির আভা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সঙ্কীর্ণ একটি বিলকে উপলক্ষ করিয়া বালিগঞ্জের জনবিরল জঙ্গলাকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলটিকে তখন অভিনব পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করিবার আয়োজন চলিতেছিল। হরপ্রসাদ স্থির করেন, অঞ্চলটি সুসমৃদ্ধ হইলে ক্রীত ভূখণ্ডের একটি প্লটে মনোরম আবাস-ভবন তুলিয়া বন্ধু শম্ভুনাথের নামে তাহার নামকরণ করিবেন, এবং আর একটি প্লটের উপর কন্যার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম দিবেন—রেণু-নিবাস।

কিন্তু মাস কয়েক পরে বাড়ী পত্তন করিতে গিয়া হরপ্রসাদ দেখেন যে, কয় মাসের মধ্যেই এই অঞ্চলের জমির দর অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রমশঃই বাড়িতেছে। হরপ্রসাদের ব্যবসায়ী মন লাভের লালসায় দুলিয়া উঠায় সে সময় আর বাড়ীর পত্তন হয় নাই, বরং বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য যে টাকা কলিকাতার ব্যাঙ্কে আমানত রাখিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া আরও কতিপয় নূতন প্লট খরিদ করিয়া বোম্বায়ে ফিরিয়া যান। ফলে, কলিকাতায় পাশাপাশি দুইটি স্মৃতি-মন্দির নির্ম্মাণের কল্পনার উপর মুলতুবির আবরণ পড়ে। ইহার পর নানা দিক দিয়া কর্ম্মের চাপ এরূপ ব্যাপক হইয়া উঠে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক প্রতি-যোগিতা এমনই তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে, দুই জামাতার পক্ষে প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। তখন বাধ্য হইয়া হরপ্রসাদকে সমগ্র দৃষ্টি, শক্তি ও কূটবুদ্ধি তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশেই পুনরায় একাগ্র দৃঢ়তায় নিয়োগ করিতে হয়। প্রায় একাদশ বর্ষব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন কঠোর সাধনার পর প্রতিষ্ঠানটিকে সকল দিক দিয়া নিষ্কণ্টক করিয়া এবং কর্ম্মভার জামাতাদের উপর চাপাইয়া যে সময় হরপ্রসাদ অবশিষ্ট জীবনটুকু নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে কাটাইবার জন্য সময়োচিত কোন নির্ভরযোগ্য আশ্রয়-স্থানের সন্ধান করিতেছিলেন, তখন বালিগঞ্জে ক্রীত দীর্ঘকালের পতিত

ভূখণ্ডগুলি তাঁহাকে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। তখনই মনের উপর সঙ্কল্পের রেখাটি গভীর হইয়া উঠে—ঐখানেই একখানি নীড় বাঁধিয়া শেষ জীবনটুকু সস্ত্রীক অতিবাহিত করিবেন। নিকটে কলুষনাশিনী ভাগীরথী, দুর্গতিহারিণী জগদম্বার আস্তানা কালীঘাট। অবসর জীবন-যাপনের পক্ষে এমন উপযুক্ত স্থান আর কোথায়?

অর্থ সম্পর্কে হরপ্রসাদ চিরদিনই এমনই ভাগ্যবান যে, তাঁহার এই অবসর যাপনের ব্যাপারেও দেখা গেল—চঞ্চলা কমলা অচঞ্চল করে তাঁহাকে বরাবর যে কাঞ্চন-প্রসাদ বিতরণ করিয়া আসিয়াছেন, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অতীতের সঙ্কীর্ণ ঝিলটিকে মনোরম এক কৃত্রিম 'লেকে' পরিণত করিয়া নব নগরীর অপরূপ রূপসজ্জা এই অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে প্রাধান্যলাভ করায় প্রায় দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার ক্রীত জমিগুলির মূল্য বিশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ-অবস্থায় বুদ্ধিমান হরপ্রসাদ কমলার দেওয়া এমন সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহারই করিলেন। পাশাপাশি দুইটি প্লটের একটি উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া অপর প্লটটির উপর ব্যবসাদারদের উপযুক্ত পরিকল্পনায় এমন একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন যে, নিজেরা থাকিয়াও বাড়ীর বিভিন্ন অংশগুলি ভাড়া দিয়া রীতিমত আয়ের সংস্থান হয়। নবনির্ম্মিত বাড়ীখানির মধ্যাংশে আলিসার নীচে কোন বিশিষ্টস্থানে কনক্রিটের তৈয়ারী বড় বড় হরফে রচিত হইল—'রেণু-নিবাস।'

বাড়ীখানি যখন তৈয়ারী হইতেছিল, সেই সময় পত্নী অনুপমা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—রেণুর নামে যে হাসপাতাল করবে বলেছিলে, তার কি হল?

হরপ্রসাদ বাবু তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—হবে। লেকটার এক্স্‌টেনস্যান শেষ হলেই সে কাজে হাত দেব, দরও পাব বেশী। জমি থেকেই বাড়ী হয়ে যাবে।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট এই সময় লেকটিকে কাটাইয়া তাহার আয়তন আরও অনেকটা বাড়াইবার আয়োজন করিতেছিলেন। বিচক্ষণ হরপ্রসাদ তাহার নক্সা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বার তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যে যে সব জমি কিনিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, লেকের আয়তন বাড়িলে তাহাদের দামও সঙ্গে সঙ্গে বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং সেই সুযোগটুকু গ্রহণ করিয়া তিনি সেই সময় মাছের তেলেই মাছ ভাজিবার চেষ্টা করিবেন।

আগেই বলা হইয়াছে, ব্যবসাদারী বুদ্ধির সাহায্যেই হরপ্রসাদ তাঁহার পরিকল্পিত 'রেণু-নিবাস' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় মধ্যবর্ত্তী অংশটুকু নিজ ব্যবহারে রাখিয়াও দুই পার্শ্বে ব্লক দুইটি অনায়াসেই ভাড়া দেওয়া যায়। তিনটি ব্লকই এমন ভাবে প্রস্তুত যে প্রত্যেক ব্লকের নিচের তলায় উঠানটির দুই দিকে দ্বার খোলা থাকিলে সমস্ত বাড়ীখানিই এক হইয়া যায়, আবার ঐ দুই দরজা বন্ধ করিয়া দিলে বাড়ীর তিনটি অংশই স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে।

প্রয়াগে কুম্ভমেলার সময় হরপ্রসাদের যে মনোবৃত্তি প্রশংসিত ও উল্লেখযোগ্য ছিল, যুগান্তে সেই মানুষটির মন যে নিরতিশয় কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে, বালিগঞ্জের বাড়ীর সম্পর্কেই তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

বাড়ীখানির বৈশিষ্ট্য, উপযোগিতা ও চাহিদার প্রাচুর্য্য বুঝিয়া হরপ্রসাদ যেরূপ প্রচুর ভাড়া ও ধনাঢ্য ভাড়াটিয়া চাহিলেন, তাহা দুর্লভ বলিলেই চলে। এক একটি ব্লকের জন্য দুই মাসের ভাড়া ডিপজিট এবং মাসিক দেড় শত টাকা ভাড়া হার সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া তিনি বহু সম্রান্ত প্রার্থীকেই নিরাশ করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি কমলার এমনই আশ্চর্য্য কৃপা যে, গৃহস্বামীর এই অসঙ্গত ও অতিরিক্ত দাবী স্বীকার করিয়া প্রায় একই সময়ে দুইটি বিশিষ্ট পরিবার দুই পার্শ্বের দুইটি ব্লকে তাঁহাদের সংসার পাতিয়া স্থায়ী হইলেন।

উভয় ভাড়াটিয়া প্রত্যেকেই দুই মাসের ভাড়ার টাকা ডিপজিট রাখায় এবং প্রতি মাসের ভাড়ার দরুণ দেড় শত টাকা মাসান্তে দাখিল করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় গৃহস্বামী হরপ্রসাদ যেমন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, উভয় ভাড়াটিয়ার ভদ্র ব্যবহারও তেমনই তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে। এই সূত্রে তিনটি পরিবারের মধ্যে সমোচিত একটি সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।

'রেণু নিবাসে'র দক্ষিণাংশের ব্লকটির ভাড়াটিয়ার নাম রায় বাহাদুর কাশীনাথ বড়ুয়া। আসাম অঞ্চলে ইঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারী আছে। ছেলেদের পড়াশুনাকে উপলক্ষ করিয়া ইনি বহুদিন হইতেই কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক পুত্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে বহুবাজারের জনবহুল অঞ্চল হইতে বাসা তুলিয়া বালিগঞ্জের জনবিরল স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে হরপ্রসাদ বাবুর 'রেণু নিবাস' বাসোপযোগী হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বাড়ীতে বাসা উঠাইয়া আনেন। কর্ত্তা, গৃহিণী, একটি বিধবা ভগিনী এবং তিন পুত্র লইয়া ইঁহার সংসার। নরেন বিশ্বাস নামে অতিশয় প্রিয়দর্শন এক শিক্ষিত যুবা এই পরিবারটির অন্তর্ভুক্ত

হইয়া এ-বাড়ীতে আসিয়াছে। বাহিরের এই ছেলেটি ব্যতীত সরকার, পাচক, চাকর, চাপরাসী, দাসী, দারোয়ান প্রভৃতি আরও অনেকগুলি প্রাণী রায় বাহাদুরের সংসারটির সামীল হইয়া এক নম্বর ব্লকটিকে গুলজার করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে এই অসাধারণ রূপবান ও সুদর্শন ছেলেটিই বিশেষ ভাবে হরপ্রসাদ বাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। ছেলেটির আশ্চর্য্য রকম দীর্ঘ ঋজু দেহযষ্টি, বলিষ্ঠ বাঁধুনী, সুগৌর কান্তি এবং সহাস্য মুখখানির চমৎকার শ্রী ছাঁদ তাঁহাকে যেন অবাক করিয়া দেয়। কলিকাতায় আসিয়া অবধি কত ছেলেই ত তাঁহার নজরে পড়িয়াছে, চাহিয়া চাহিয়া তিনি বাঙলার ছেলেদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য যাচাই করিবার দৃষ্টিতেই দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন স্বাস্থ্য-পুষ্ট সুন্দর আকৃতির ছেলে এই প্রথম তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছে। রায় বাহাদুর ও তাঁহার পুত্রগণের সহিত এই ছেলেটির আকৃতিগত পার্থক্য তাঁহার মনে কেমন একটা কৌতূহলের সঞ্চার করিয়া দেয়। রায় বাহাদুর ও তাঁহার পরিজনবর্গ একটু বেলাতেই শয্যাত্যাগ করিতেন। কিন্তু হরপ্রসাদ তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, রাত্রি চারটা বাজিলেই ব্লকটির একতালার একখানি ঘরে বিজলীর আলো জ্বলে, আর সেই আলোকে এই সুন্দরকান্তি ছেলেটির সঞ্চরণশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়। এমন সময় উঠিয়া ছেলেটি কি করে এবং বড়ুয়া-পরিবারের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ তাহা জানিবার কৌতূহল সন্দিগ্ধচিত্ত হরপ্রসাদকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। শেষ রাত্রিতে শয্যা-ত্যাগ করিতে তিনিও অভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং একদিন অসময়ে অতর্কিত ভাবে তিনি রায় বাহাদুরের ব্লকের ফটকের সামনে আসিয়া আস্তে আস্তে এমন কৌশলে কড়া নাড়িলেন, তাহার ধ্বনি যাহাতে দ্বিতলে বা নিম্নের আলোকিত ঘরখানাতে না পৌঁছায়। ফটকের ভিতরে ক্ষুদ্র একটি প্রাঙ্গণ, তাহার মাঝখানে একখানি খাটিয়ায় দরোয়ান সাধু সিং ঘুমাইতেছিল, কড়ার শব্দেই তাহার ঘুম ছুটিয়া গেল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিদ্রাবিজড়িত চোখ দুটি রগড়াইয়া 'কোলাপসেবেল' দ্বারের দিকে চাহিতেই বাড়ীওয়ালার মূর্ত্তি তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি তালা খুলিয়া দুই হাতে লোহার ফটকের দুই অংশ দুই দিকে ঠেলিয়া দিয়া প্রথমে সে সসম্ভ্রমে এই সম্মানজনক মানুষটিকে মিলিটারী কায়দায় সেলাম করিল, তাহার পর বিস্ময়ের সুরে কহিল: হুজুর, ইতনে রাতমে? ফরমাইয়ে—

হরপ্রসাদ কহিলেন: ম্যায় রোজ ইস্ বখ্‌ত য়হাঁ টহল্‌তা হুঁ, তোমাসে বাবুজী তো দেরমে উঠতে হঁয়, মগর, ইধর, বত্তি জলতি রহ্‌তি হ্যায়; ক্যা, বচ্চে লোগ ইস্ বখ্‌ত পড়তা লিখতা হ্যায়?

দারোয়ান সবিনয়ে উত্তর দিল: নহি, ওলোগ ভি দেরমে উঠতে হ্যায় হুজুর, মগর মাষ্টার সাব রোজ আখিঁর রাতকে বখত উঠ্‌তে হঁয়—

হরপ্রসাদ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন: ক্যা, ও পড়তে হঁয়?

দরোয়ান একটু হাসিয়া উত্তর দিল: মাষ্টার সাব এক অজীব আদমী হঁয়, ইস্ বখত উঠ কর্ কসরৎ করতে হঁয়, উস্‌কে বাদ্ তসবীর খিঁচতে হয়—

মুখখানি প্রসন্ন করিয়া অস্ফুট স্বরে হরপ্রসাদ কহিলেন: ছোকরা তাহলে দেখতেই শুধু বাঙ্গা মুলো নয়, গুণও আছে। পরক্ষণে দরোয়ানকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন: আচ্ছা, দরোয়ানজী, তুম্ দরওয়াজা বন্ধ করকে শো যাও, তব্ তক্ মঁয় মাষ্টার সাবসে বাতচীৎ করু—

কথাগুলি বলিতে বলিতেই তিনি টানা সোপান-শ্রেণীর উপর দিয়া আলোকিত ঘরখানির দিকে অগ্রসর হইলেন।

সাজানো বড় হলঘরখানির উভয় পাশে দুইখানি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ঘর। একখানি ঘরে সরকার ও ভৃত্যেরা থাকে। অপরখানি তরুণ গৃহশিক্ষক একাই অধিকার করিয়া তাহার পড়াশুনার ও শিল্পচর্চ্চার জোড়-জোড় পাতিয়াছে।

ঘরখানি ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। দরজার দুই পাশের দুইটি বাতায়ন আলো-চলাচলের জন্য বোধ হয় বন্ধ করা হয় নাই। একটি বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতরে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া হরপ্রসাদ দেখিলেন, সুগৌর ও সুপুষ্ট দুইটি আঙ্গুলে সুদৃশ্য একটি তুলি ধরিয়া এই ঘরের সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটি তন্ময় ভাবে সমাপ্তপ্রায় সুদীর্ঘ একখানি ছবির প্রসাধন করিতেছে।

বাতায়ন-পথে গরাদের উপর ঝুঁকিয়া হরপ্রসাদ বাবু ডাকিলেন: মাষ্টার, ওহে মাষ্টার—

স্বর শুনিযাই ছেলেটি সচকিতে পিছনে চাহিল, গবাক্ষের ওপরে রেণু-নিবাসের অধিস্বামীকে এমন অসময়ে এভাবে দেখিয়া তাহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিতেই সে দেখিল, প্রবীণ আগন্তুক ইতিমধ্যেই দরজার সামনে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার মুখের হাসি সুপুষ্ট গোঁফজোড়াটির ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

চোখাচোখি হইবা মাত্র ছেলেটি সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া সবিনয়ে কহিল: আপনি এত ভোরে, সার? কিন্তু রায় বাহাদুর ত এখনো ওঠেননি, বিশেষ দরকার যদি থাকে...

হরপ্রসাদ বাবু কথাটায় বাধা দিয়া কহিলেন: না, না, বিশেষ দরকার কিছু নেই, রায় বাহাদুর যে বেলায় ওঠেন তা আমি জানি। আমি এসেছি তোমার সঙ্গেই আলাপ করতে—বুঝেছ?

ধনী গৃহস্বামীর অযাচিত উপস্থিতি এবং তাহার ন্যায় পরাশ্রিত দরিদ্রের সহিত আলাপ করিবার অভিব্যক্তি ছেলেটিকে যে কৃতার্থ করিয়াছে, তাহার মুখের ভাবে এমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। মনে হইল, সে যেন শুধু শিষ্টাচারের অনুরোধেই যুক্ত হাত দুইখানি প্রসারিত করিয়া আগন্তুককে তাহার কক্ষে আহ্বান করিল এবং তাড়াতাড়ি বেতের একখানি চেয়ার দরজার কাছে টানিয়া আনিয়া মৃদু স্বরে কহিল: বসুন, সার।

হরপ্রসাদ বাবু আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন: তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে, বৎস। নইলে আলাপ জমবে কেন?

ছেলেটি সবিনয়ে উত্তর দিল: দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, সার; যে কাজ ধরেছি, তাতে এমন কত ঘণ্টাই আমাকে একটানা দাঁড়িয়ে তুলি চালাতে হয়।

একটু হাসিয়া হরপ্রসাদ বাবু কহিলেন: বটে! তবে আমি শুনেছিলুম, ছেলে পড়ানোই তোমার পেষা, রায় বাহাদুরের ছেলেদের তুমি হোল টাইম-টিউটর। কিন্তু তুমি একজন আর্টিষ্ট, ছবি আঁকো, সেটা আমার জানা ছিল না।

ছেলেটি কহিল: এটা আমার নিজের বিজনেস। সারা দিন ত আর সময় পাই না, ছেলেদের পড়াতে হয়, নিজেকেও একটু পড়াশুনা করতে হয়, ভোরের দিকে এই সময়টাই নিশ্চিন্ত হয়ে ছবির চর্চ্চা করে থাকি।

দীর্ঘ অয়েল পেন্টিংটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া হরপ্রসাদ বাবু কহিলেন: এই ছবিখানা তাহলে তোমার ঐ চর্চ্চার ফল বল? খাসা হয়েছে ত! ওর ওপর চোখ পড়লেই মনে হয় যেন রায় বাহাদুর বড়ুয়া বসে রয়েছেন। তোমারই হাতের আঁকা ত?

মৃদু হাসিয়া ছেলেটি উত্তর দিল: অনেক দিনের চেষ্টার ফল, সার, এখনও শেষ হয়নি, 'ফিনিসিং টাচ্' চলেছে।

হরপ্রসাদ বাবু কহিলেন: সে ত দেখতেই পাচ্ছি হে, ওরই ওপর তুলি চালাচ্ছিলে। আমি এসে তোমার কাজে হয়ত বাধা দিলুম। কিন্তু আমার স্বভাব কি জান, ভালোই হোক আর মন্দই হোক—কোন দিক দিয়ে কারুর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছু হলে যেচে তার সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। আমারও অভ্যাস শেষ রাত্তিরে ওঠা। এ-পাড়ায় আমার মত 'আর্লি রাইজার' আর কেউ যে আছে তা জানতুম না। তোমার ঘরে আলো দেখেই মনে কৌতূহল জাগে, অবশ্য তোমাকে প্রথমে দেখেই মনটি দুলে উঠেছিল, দোলবার হেতুটা হচ্ছে—মুখখানা যেন চেনা—কোথায় যেন কোন দিন দেখিছি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারিনি। আচ্ছা—তোমার নামটি কি বল ত?

ছেলেটি জানাইল: নরেন বিশ্বাস।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: পদবীটা কিন্তু ভারি 'ট্রেচারাস'। সব জাতের ভেতরই 'বিশ্বাস' আছে। কাজেই পদবী ধরে সহজেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করা চলে। তোমার পদবীটা কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে?

মৃদু হাসিয়া নরেন উত্তর দিল: কায়েতের পর্য্যায়ে, সার! আমরা কায়স্থ।

—বটে, তাহলে আমাদের স্বজাতি তুমি। ভাল, ভাল; আচ্ছা! তোমরা কোন্ জেলার লোক হে? বাড়ী কোথায়?

এই প্রশ্নটিতে ছেলেটির মুখখানি গম্ভীর হইল। কুলজীর প্রসঙ্গ বরাবরই তাহাকে পীড়া দিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিলেই তাহার সুন্দর মুখখানা অমনই বিরক্তিতে বিবর্ণ হইয়া উঠে। সে তখনি কথাটা চাপা দিতে বা আলাপের গতি অন্য দিকে ফিরাইতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। বৃদ্ধের মুখটিও বন্ধ করিবার জন্য এক নিশ্বাসে সে বলিয়া দিল—ঘর-বাড়ী আমাদের বিহারে ছিল সার, কিন্তু 'নাইনটিন থার্টিফোরে'র ভূমিকম্পে সে-সব পাট চুকে গেছে। আমি সে-সময় ক'লকাতায় মেসে ছিলুম। তাই বিশ্বাস-বংশটা একেবারে লোপ পায়নি। বন পুড়ে গেলে এক একটা লম্বা গাছ যেমন মাথা তুলে একলা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার অবস্থাও হয়েছে, ঠিক তাই। আপনার বলতে কেউ নেই; যাঁরা ছিলেন, পাঁচ মিনিটের ভেতরেই নিঃশেষ হয়ে গেছেন। আমি এখন একলা, যেখানে থাকি সেই

আমার বাড়ী, এর বেশী আর কোন পরিচয় আমার নেই, স্যার!

মর্ম্মন্তুদ কথাগুলি হরপ্রসাদের মনে বেদনার সঞ্চার করিল। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী তারিখে বিহারে যে প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহার শোচনীয় কাহিনী তিনি সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় যে-সকল পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহারও সহিত তাঁহার জানাশুনাও ছিল। তাঁহারই স্বজাতির এই প্রিয়দর্শন সুশিক্ষিত তরুণটির পিতা-মাতা পরিজনবর্গ এক দিনেই একসঙ্গে সেই সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় শোচনীয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে, দুর্ভাগ্য ছেলেটির পরিচয় দেবার মত আর কিছু নাই, এই দুশ্চিন্তা তাঁহাকে আর্ত্ত ও অভিভূত করিয়া তুলিল। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন: জানতুম না যে তোমার পরিচয়ের পাতায় এত-বড় একটা দুর্ঘটনার ইতিহাস রক্তের হরফে লেখা আছে। একটা নূতন দিনের প্রভাতেই দুর্দ্দিনের সেই স্মৃতিটা জাগিয়ে তুলে হয়ত অন্যায় করেছি; আমিও যে ভুক্তভোগী!

নরেনের বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল—ঐ ভূমিকম্পে তা হলে আপনারও কোন দুর্ঘটনা—

হরপ্রসাদ কহিলেন—না, না, বিহারের ভূমিকম্পে নয়, কোন দুর্ঘটনাতেও নয়। সাধারণ সহজ অবস্থার মধ্যেই আমার ছোট মেয়েটিকে আমি হারিয়েছি। সেই মেয়ের নামেই আমার এই বাড়ী। কিন্তু যেদিন সকালে হারানো মেয়েটির কথা আমার মনে ওঠে, সেই দিনটিই আমার কষ্টে কাটে, কিছুতেই শান্তি স্বচ্ছন্দ পাই না। যাক্—তুমি তোমার কাজ কর, আমি উঠি। তোমাকে দেখে যেমন খুশী হয়েছিলুম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের পরিচয় পেয়ে তেমনি একটা বেদনা নিয়ে চললুম।

নরেনের সহিত হরপ্রসাদ বাবুর পরিচয়-সূত্রে ইহাই প্রথম আলাপ। ফলে পরিজনহীন এই ছেলেটির প্রতি তাঁহার চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। ইহার পর রায় বাহাদুর বড়বাবুর সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার মুখেও ছেলেটির স্বভাব ও শিক্ষার সুখ্যাতি শুনিয়া তিনি তাহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

২

'রেণু-নিবাসে'র অপর ব্লকটিতে যে ভাড়াটিয়ারা বসবাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত হরপ্রসাদ বাবু ও তাঁর পত্নী অনুপমার ঘনিষ্ঠতা গোড়ায় খুব গাঢ় হইলেও, পরে তাহাদের চাল-চলন স্বামি-স্ত্রীর মনঃপূত হয় নাই। নিখিল রায় নামে পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক ভদ্রলোক এই ব্লকটি ভাড়া লইয়াছিলেন। স্ত্রী ইন্দিরা ও তরুণী কন্যা মালা—এই দুইটি প্রাণী লইয়া ইঁহার সংসার। মিষ্টার রায় সিঙ্গাপুরের কোন বিখ্যাত ইন্সিওর কোম্পানীর সংশ্রবে কাজ করিতেন, বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাঁহাকে কোম্পানীর কাজে বাহিরে বাহিরে থাকিতে হইত। বাড়ীখানা বন্দোবস্ত করিয়া তিনি হরপ্রসাদ বাবুকে বলিয়াছিলেন—আমাকে অনেক জায়গায় ঘুরাঘুরি করতে হয়। দেখতে আপনি বড়-একটা পাবেন না; তবে, আমি যেখানেই থাকি মাসের পয়লা তারিখে তিনশো টাকা আমার স্ত্রীর হাতে এসে পৌঁছবে। এদের মাথার ওপর আপনি রইলেন, একটু দেখা-শোনা করবেন।

হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্তু নিখিল বাবুর প্রস্থানের পর তিনি তাঁহার স্ত্রী-কন্যার আচার-ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। মা ইন্দিরা চল্লিশের সীমারেখায় পদার্পণ করিয়াও সাজগোজের বাহার সমান ভাবেই বজায় রাখিয়াছেন। এই বয়সে বাহারী পাড়ের রঙীন শাড়ী কায়দা করিয়া পরিবার এবং মুখে রঙ মাখিবার ঘটা দেখিলে মনে হয় তিনি বুঝি ষ্টেজে নামিবার জন্য সাজিয়া গুজিয়া তৈরী হইয়াছেন। মায়ের সাজ-সজ্জায় এমন বাড়াবাড়ি যেখানে, মেয়ে মালাও সবে উনিশে পা দিয়েছে, বয়সের অনুপাতে তাহার সাজসজ্জা ও অঙ্গরাগ আরও কত উৎকর্ষ হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

প্রত্যহ বৈকালে মা ও মেয়ে যখন সাজিয়া-গুজিয়া বেড়াইতে বাহির হয়, মাঝের ব্লকের গবাক্ষ হইতে সে দৃশ্য দেখিয়া হরপ্রসাদের সেকেলে শিক্ষিতা সহধর্ম্মিণী অনুপমার মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বামীকে শুনাইয়া বলেন—দূর দূর! মাগী যেন খেমটাউলী আর মেয়ে ঠিক থ্যাটারের নটী! মা মেয়ে যেন মজরো করতে চলেছে! ঝাঁটা মারো—ঝাঁটা মারো! কলসী-দড়ি জোটে না—

মালা বেথুন হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ডায়সেসান কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। তাহার এখন সেকেণ্ড ইয়ার চলিতেছে। ইহাতেই সে দেমাকে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। ইহার উপর গানে তাহার নাম হইয়াছে, রেডিয়ো আসরে কয়েকখানি গান গাহিয়া সে লোকের সুখ্যাতি এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থ পাইয়াছে। কাগজে তাহার ছবিও ছাপা হইয়াছে; সঙ্গীতের আসরে তাহার চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

বয়সের দিক দিয়া মালা যদিও উনিশে পড়িয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিলে মনে হয় বুঝি সে বাইশ পার হইয়া গিয়াছে। দেহের রঙটুকু তাহার যতখানি ফর্সা, তাহাতে লাবণ্যের অভাব ঠিক ততখানি। এই অভাবটুকু তাহাকে প্রসাধনের সাহায্যে পূরণ করিয়া লইতে হয়। দেহযষ্টি তাহার সে অনুপাতে ঢ্যাঙা, দেহের বাঁধুনীও সেই পরিমাণে আলগা। তথাপি পরিপূর্ণ মুখখানির ছাঁদটুকু তাহার এমনই চমৎকার ও নিখুঁত যে, আকৃতিগত ত্রুটিগুলি অনায়াসে ঢাকিয়া তাহা একান্ত চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, সুতরাং মালার স্থান সকলের আগে; রূপপিপাসুরা তাহার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে, রূপের অহঙ্কারে মালার অন্তর সর্বদাই স্ফীত হইয়া থাকে।

মা ও মেয়ে দুইটি প্রাণীর জন্য দেড় শত টাকা ভাড়ায় এত বড় বাড়ীখানির প্রয়োজন হইয়াছে এবং পাচক, চাকর ও পরিচারিকা প্রভৃতি লইয়া আরও তিনটি প্রাণীকে ইঁহাদের পরিচর্য্যায় হিমসিম খাইতে হয়। কর্মস্থল হইতে প্রতি মাসে নিখিল রায় তিন শত টাকা পাঠান, কিন্তু টাকা আসিয়া পৌঁছাইবা মাত্রই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। বাড়ীর ভাড়াটি আদায় করিতে হরপ্রসাদ বাবু অতিশয় সতর্ক থাকেন বলিয়া তাঁহার ভাড়া বড় একটা পড়ে না, কিন্তু অপর পাওনাদারদের কষ্টের অবধি থাকে না। চাকর-বাকররা কোন মাসেই পুরা বেতন পায় না, গয়লা, মুদী, কয়লাওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ফেরিওয়ালারা পর্য্যন্ত ইঁহাদের পাওনাদার। প্রতি মাসে তাহাদের নিকট দেনার হার বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু মা ও মেয়ের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই, বাজে খরচ কমাইয়া ঋণের বোঝা হাল্কা করিতে ইঁহাদের কেহই সচেতন নহেন।

হিসাবী হরপ্রসাদ বাবু প্রায়ই খিট-খিট করেন, নিখিল বাবুর অনুরোধের মর্য্যাদা রাখিতে মা ও মেয়েকে হিসাব করিয়া চলিতে এবং ব্যয় সংকোচ করিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু মা ও মেয়ে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া হাসেন এবং পরিহাসের সুরে মন্তব্য করেন।

মা বলেন—বরাবর যে হালে চলে এসেছি, তা খাটো করলে নিন্দে হবে। লোকে বলবে—কর্তার আয় কমে গেছে। তাছাড়া দেনা কার না হয়? খরচ যাদের বেশী, বাজারে তাদেরই টাকা পড়ে। তার জন্যে আর হয়েছে কি?

মেয়ে বলে—পিঁপড়ের পেট টিপে আমরা চলতে শিখিনি দাদামশাই। চার-চারটে লোক আমাদের খিদমত খাটে দেখে আপনি চমকে উঠেছেন, কিন্তু এটা এমন কিছু বেশী নয়। একটা ঝি না হলে মা'র চলে না, আমার কাছে হামেশা একটা ব্যাহারা মোতায়েন চাই, চিঠি নিয়ে তাকে ছুটোছুটি করতে হয়। রাঁধুনী না রেখে নিজেরাই হাত পুড়িয়ে রাঁধবো না কি? তারপর—চাকরের কাজগুলো করবে কে? জল তোলা, বাসন মাজা, বাজার করা—এ সব? মানুষের মত থাকতে হলে এ-সব চাই-ই। আপনি দুনিয়ায় এসেছেন পয়সা সঞ্চয় করতে, আমরা এসেছি পয়সা খরচ করে জীবনটাকে সার্থক করতে। দোহাই আপনার, নিজের খরচ যত ইচ্ছে কমান, কিন্তু আমাদের খরচ কমাবার জন্যে উপদেশটুকু দয়া করে আর দেবেন না।

ইহার পর হরপ্রসাদ আর কি বলিতে পারেন! তিনি ইহাদের সম্বন্ধে ইদানীং মুখ বন্ধই করিয়াছেন। কিন্তু কোন মাসে বাড়ী ভাড়ার টাকা দিতে একদিন বিলম্ব হইলে তাঁহাকে এমনই মুখর হইয়া উঠিতে দেখা যায় যে, মা ও মেয়ের পক্ষে এই জবরদস্ত পাওনাদারটির পাওনা-গণ্ডা কোনরূপেই চাপিয়া রাখা সম্ভবপর হয় না। এই সূত্রে মা মুখখানা মচকাইয়া বিকৃত স্বরে প্রায়ই বলেন—ওঁর যেমন আক্কেল, বাড়ী আর খুঁজে পাননি, 'কানের কাছে কানাইয়ের বাসা' যেখানে, সেখানে থাকতে আছে কখনো! মণি-হর্ডার এলেই ডাইনির মত তাকিয়ে থাকে, সন্ধান রাখে। একদিন আর তর সয় না! যে টাকা আসে, তার অর্দ্ধেক ত উনিই আগে নিয়ে যান—বাকি টাকায় এত বড় সংসার চালাই কি করে?

এই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড তাণ্ডবে সারা বিশ্ব কাঁপিয়া উঠিয়াছে; বিশেষত, এই যুদ্ধে জাপানের যোগদানের ফলে বঙ্গদেশ হইতে আসামের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সামরিক এলাকায় পরিণত হইয়াছে—কলিকাতা হইতে শিলং ও প্রাচ্য-সীমান্তে কোহিমা পর্য্যন্ত থরহরি কম্প। এই অবস্থায় রায় বাহাদুর বালিগঞ্জের বাসা তুলিয়া সপরিবার দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। নরেন যেন আকাশ হইতে পড়িল। রায় বাহাদুর অবশ্য তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু নরেন তাঁহার সহিত আসামে যাইতে সম্মত হইল না। রায় বাহাদুরও বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিয়া তিনি নরেনের পাওনার উপর এক মাসের বেতন পুরস্কারস্বরূপ দিয়া বলিলেন:—তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে নরেন, তবে আমার বিশ্বাস, তোমার মত ছেলের

কাজের অভাব হবে না। ভগবান তোমাকে তোমার যোগ্য ক্ষেত্রই দেখিয়ে দেবেন!

রায় বাহাদুরের মত বিশিষ্ট ভাড়াটিয়ার সহিত সংস্রব ছিন্ন হওয়ায় হরপ্রসাদ বাবু যে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন, ইহা বলাই বাহুল্য। এই সঙ্গে রায় বাহাদুরের আশ্রিত পরিজনহীন ছেলেটির জন্যও তাঁহার অন্তরটি যেন দুলিয়া উঠিল। রায় বাহাদুর আসামে চলিয়া গেলে ছেলেটির অবস্থা কি হইবে? সম্পন্ন ভাড়াটিয়া অপেক্ষা, বিপন্ন ছেলেটির চিন্তাই তাঁহাকে যেন অধিকতর চঞ্চল করিয়া তুলিল।

বাসা তুলিয়া রায় বাহাদুরদের আসাম যাত্রার পূর্ব্বদিন সাঁঝে হরপ্রসাদ ভৃত্যকে দিয়া নরেনকে তাঁহার নিজের ব্লকের বৈঠকখানায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। নরেন তখন তাহার ঘরের জিনিসপত্রগুলি গুছাইতেছিল। বাড়ীর মালিকের আহ্বান তাহাকে চমকিত করিল, হাতের কাজ ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সে ভৃত্যের সহিত মাঝের ব্লকটির নিচের হলঘরে উপস্থিত হইল। হরপ্রসাদ তখন তক্তপোষের উপর পাতা ঢালা বিছানায় বসিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নরেনকে দেখিয়াই তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন: এস মাষ্টার এস, বস এইখানে।

করজোড়ে অভিবাদন করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে নরেন এই শ্রদ্ধাভাজন মানুষটির শয্যাপ্রান্তে বসিল। তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া এবং কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: রায় বাহাদুর ত কাল সকালেই সপরিবারে তাঁর দেশে যাচ্ছেন। তুমি যে তাঁর সঙ্গে আসামে যাবে না, এ খবর অবশ্য আমি পেয়েছি। কাজেই তোমার ব্যবস্থা কি হয়েছে, সেটা জানতে ভারি আগ্রহ হয়েছে আমার, তাই তোমাকে ডেকেছি মাষ্টার! আশা করি, এতে তুমি বেজার হওনি।

সসঙ্কোচে নরেন কহিল: আমার মত সামান্য লোকের বাসায় গিয়ে একদিন আপনি যেচে আলাপ করেছিলেন। সেই দিনই জেনেছি আপনি কোন্ স্তরের মানুষ। কিন্তু আমি এমনি অমানুষ আর মুখচোরা যে সাহস করে একদিনও আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারিনি। আজও আপনি দরদী হিতৈষীর মত আমাকে ডেকে—

নরেনের কথায় বাধা দিয়া হরপ্রসাদ কহিল: ও-সব ভূমিকার কি দরকার! তোমার ব্যবহারে আমি কোন দোষ দেখিনি, আমি বরাবরই কৌতূহলী, এরই ঝোঁকে তোমার বাসায় ঢুকে আলাপ করতে গিয়েছিলুম। তুমি আসনি পাল্টা আলাপ করতে, কি হয়েছে তাতে? আমি জানি তুমি কাজের লোক; বাজে কাজে যোগ দেবার ফুরসৎ তোমার মোটেই নেই। যাক, এখন কি করবে ঠিক করেছ?

নরেন কহিল: রায় বাহাদুর অবশ্য আমাকে তাঁর দেশে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাতে রাজি হতে পারিনি। এই জায়গাটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল, আর যে ঘরখানি পেয়েছিলুম—চমৎকার, আমার ইচ্ছা, যদি এ-পাড়ায় কম ভাড়ায় ছোট-খাটো একখানি ঘর পাই তাহলে আর কোথাও যাব না।

হরপ্রসাদ গম্ভীর হইয়া কহিলেন: ঘরের অভাব কি, ভাত ছড়ালে আবার কাকের ভাবনা! আচ্ছা—মাষ্টার, তোমার এ চাকরী কত দিনের?

নরেন: গত জুলাই মাসে এক বছর পূর্ণ হয়ে গেছে।

হরপ্রসাদ: মাসে তিনি কি রকম দিতেন?

নরেন: নগদ ত্রিশটি টাকা। খাই খরচও আমার লাগতো না।

হরপ্রসাদ: ছবি থেকে আয় কিছু হয়? রায় বাহাদুরের ছবি ত আঁকছিলে দেখে এসেছি, তার জন্যে—

নরেন: ওঁর ছবির দাম আমি নিইনি, তবে মাল-মসলা উনি কিনে দিয়েছিলেন। বাইরের ছবি থেকেও আমার আয় কিছু হয়।

হরপ্রসাদ: বাঁধা ত্রিশটি টাকা ত গেল, এখন কি করবে ঠিক করেছ? কোন চাকরী-বাকরী—

নরেন: আজ্ঞে না, চাকরী আমি আর করব না।

হরপ্রসাদ: চলবে কিসে? বাঁধা একটা আয় ত চাই।

নরেন: স্বাধীন ভাবে ছবির কাজই করব। আমার ভরসা আছে, এতেই আমি দাঁড়াতে পারবো।

হরপ্রসাদ: পড়াশুনা তোমার কত দূর জানতে পারি?

নরেন: পাঠ্যাবস্থা থেকে আমি সাব ছবি আঁকার দিকেই ঝুঁকে পড়ি। তার ফলে, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করেছি।

হরপ্রসাদ: আচ্ছা—মাষ্টার, যে রকম ঘরে তুমি আছ, ঠিক ঐ ঘর যদি তোমাকে আমি যোগাড় করে দিই, আর তোমার দু'বেলার খাই খরচ মায় চা-জলখাবারের ভারটুকুও যদি নেওয়া যায়,—তুমি তার জন্যে মাসে কত টাকা দিতে পার? ভাল করে ভেবে

বল—যেটা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে, অর্থাৎ সাধ্যে কুলাবে।

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে নরেনের অন্তরটি বুঝি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উল্লাসের সুরে সে উত্তর দিল: আমি যদি কোন মহৎ লোকের আশ্রয়ে তাঁর পরিজনের সামিল হয়ে থাকতে পাই সার, যে-রকম ঘরে ছিলুম, ঠিক তেমনি একখানি ঘর তিনি আমাকে ছেড়ে দেন, তাহলে মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা অনায়াসে দিতে পারি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নরেনের মুখের দিকে চাহিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: ভেবে বলছ? না হয় আজ থাক, বেশ করে বুঝে কাল সকালে আমাকে ব'ল।

নরেন ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল: না সার, আমার যা বলবার বলেছি। আমি জানি, কোন ভদ্রলোকের সংসারে ভদ্রভাবে থাকতে হলে এর কমে থাকা চলে না। আমি কারুর বোঝা বা গলগ্রহ হয়ে থাকতে ইচ্ছে করি না—নিজে যখন উপার্জ্জনের ক্ষমতা রাখি।

হরপ্রসাদ কহিলেন: এই ত মরদের কথা, কিছু-মাত্র মনুষ্যত্ব যার থাকে, সে কখন নিজেকে অন্যের বোঝা করে না, কারুর গলগ্রহ হয় না। যা হোক, তুমি পঞ্চাশ দিতে চাইছ, আমি সে জায়গায় বলছি—তুমি প্রতি মাসে ত্রিশটি করে টাকা আমাকে দিও, তাতেই তোমার থাকা আর খাওয়া-দাওয়া চলে যাবে।

নরেন সবিস্ময়ে বলে উঠল: এত কম টাকায় সার কি করে···

সহজ ভাবেই হরপ্রসাদ বলিলেন: বেশ ত, এখন এই দিও; এর পর তোমার আয় বাড়লে, তখন দেখা যাবে। তবে এখনো বুঝে বল বাপু, এই ত্রিশ টাকা মাস-মাস তুমি ঠিক মত দিতে পারবে ত?

নরেন দৃঢ় স্বরে বলিল: হ্যাঁ, সার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আপনি যদি বলেন, প্রথম মাসের ত্রিশ টাকা আমি এখনই আগাম দিতে পারি।

নরেনের এই কথায় হরপ্রসাদের মুখখানি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন: ভাল কথা, তোমার অসুবিধা না হলে টাকাটা দিতে পার। তাহলে কাল থেকেই তোমার থাকবার আর খাবার কোন ভাবনা রইল না। কাল ওঁরাও যেমন বেরুবেন, তুমিও অমনি তোমার লটবহর সব নিয়ে আমার বাড়ীতে এসে উঠবে।

বিস্মিত নরেনের কণ্ঠ হইতে মৃদু স্বর বাহির হইল: আপনার বাড়ীতে!

কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: হ্যাঁ, আমার বাড়ীতে। এই ঘরের পাশের ঘরখানাই তোমার। বুঝতেই পারছ, তিনটে ব্লকের ঘরগুলোই একই রকমের। যেমন ঘরে ছিলে, তেমনি ঘরে আসবে, কাজেই অসুবিধে হবে না। খাবার ব্যবস্থাও এখানেই হবে। তবে বাপু, আগেই বলে রাখছি, গেরস্ত মানুষ আমি, রাজা বা রায় বাহাদুর নই। ঘরের ছেলের মতন মানিয়ে-বানিয়ে থাকতে হবে তোমাকে। আমার সুখ-সুবিধে তুমি দেখবে, তোমার অসুবিধে যাতে না হয় সে দিকে আমারও নজর থাকবে। কেমন, রাজী ত?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নরেন উত্তর দিল: এ যে আমার পরম সৌভাগ্যের কথা সার! আপনার মত মহতের সংসর্গে থাকা যে আমার পক্ষে স্বর্গবাস!

ঈষৎ হাসিয়া হরপ্রসাদ কহিলেন: আগে ত বাসটা কর, তারপর হিসেব করে দেখো কোথায় এসেছ, স্বর্গে কিম্বা নরকে। আগে থাকতেই আহ্লাদে নেচে ওঠা ঠিক নয়, বুঝেছ?

নরেন কহিল: তাহলে টাকাটা নিয়ে আসি সার?

হরপ্রসাদ কহিলেন: আনো। আমি তাহলে রসিদটা তৈরী করে রাখি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, ঐ ত্রিশটি টাকার বিনিময়ে যে সুবিধা বা অধিকারগুলো এ-বাড়ীতে তুমি পাবে অর্থাৎ আমি দিতে বাধ্য থাকবো, একখানা চিঠিতে খোলসা করে সব লিখে দেব। তোমাকেও একখানা চিঠিতে লিখে দিতে হবে—টাকাটা মাস-মাস আগাম দেবে, ভদ্রভাবে থাকবে, আমাদের অসুবিধা বা বিরক্তিকর হয় এমন কোন কাজ করবে না। বুঝেছ?

নরেন হাসিয়া উত্তর দিল: আমার কিছুতেই আপত্তি নেই সার! আমার কাজ হচ্ছে তুলি টানা, তাতে একটু আওয়াজও হয় না, গোলমাল কিসের হবে? আমি যাই সার, টাকাটা দাখিল করে নিশ্চিন্ত হই।

হরপ্রসাদ কহিলেন: বেশ, নিয়ে এসো টাকা। আমি ততক্ষণ চিঠির মুসাবিদাটা করে ফেলি।

মিনিট দশেকের মধ্যেই নরেন টাকাগুলি আনিয়া হরপ্রসাদের সম্মুখে রাখিলে তিনি সেগুলি সতর্ক ভাবে গণিয়া এক আনার একখানি টিকিটের উপর সহি করিয়া পাকা রসিদ দিলেন। অতঃপর উভয় পক্ষের লিখিত একরারনামা দুইখানিরও আদান-প্রদান হইয়া গেল।

৩

হরপ্রসাদ ভাবিয়াছিলেন, কর্ম্মশালা হইতে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া নূতন বাসস্থানটিকে ধর্ম্মশালা করিয়া তুলিবেন। সহধর্ম্মিণী অনুপমা অবসরকাল ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়াই অতিবাহিত করিতে অভ্যস্ত, তিনিও পন্থার আদর্শ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সারা জীবনের সংস্কার এখানেও তাঁহাকে আর্থিক ব্যাপারে নিষ্কৃতি দিল না। বাড়ীর খালি ব্লকটির দিকে নজর পড়িলেই, মাসিক দেড় শত টাকা আয়ের ঘরের শূন্যটি বৃহত্তর হইয়া তাঁহার মনটিকেও যেন শূন্যময় করিয়া দেয়। ধর্ম্মপুস্তক খুলিলেই মুদ্রিত অক্ষরগুলির মধ্যে জনশূন্য ব্লকটি মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। আবার এখানকার বাড়ীভাড়ার আয়ের সঙ্গে অতীতের অপ্রীতিকর একটা ঘটনার ব্যাপারে তাঁহার অন্তরটিকে রীতিমত বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুর্দ্দিন ও দুর্ব্বার শোকের সুযোগ লইয়া ডাক্তার অধিকারী তাঁহার এলাহাবাদের প্রাসাদতুল্য বাড়ী এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি টাকা হস্তগত করিয়া কেমন নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। বোম্বায়ের কর্ম্মক্ষেত্রে নানা ভাবে বিব্রত এবং লিপ্ত থাকায় তিনি যেন এলাহাবাদের দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবসর পান নাই, কিন্তু ডাক্তার অধিকারীর ত কর্ত্তব্য ছিল মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা বা তাঁহার কাজের রিপোর্ট দেওয়া। বালিগঞ্জের বাড়ীর তুলনায় এলাহাবাদের বাড়ী অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াও সেখান হইতে এ পর্য্যন্ত কিছুই উসুল করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং সুনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার করিবারও কিছুই নাই। যথাস্থানে সংবাদ লইয়া তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন যে, ডাক্তার অধিকারী বাড়ীর ট্যাক্স ফেলিয়া রাখিয়া সর্ত্ত ভঙ্গ করেন নাই। সুতরাং সর্ত্তানুসারে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কোন সূত্রেই এলাহাবাদের সম্পত্তি ডাক্তার অধিকারীর কবল-মুক্ত করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেই হইবে। এখন সেই চিন্তাটিও তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। ডাক্তার অধিকারীকে য্যাটর্নীর দ্বারা সর্ত্ত সম্বন্ধে অবহিত হইবার নির্দ্দেশ দিয়া তিনি কাজ আগাইয়া রাখিয়াছেন,—এখন কয়টা মাস পূর্ণ হইলেই হয়।

ইহার উপর একদা সাধ করিয়া যে কাজল তিনি চোখে লাগাইয়াছিলেন, এখন তাহাও যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আত্মীয়-স্বজনহীন অসহায় নিরুপায় ছেলেটি তাঁহার চক্ষুর উপর নিরাশ্রয় হইতেছে দেখিয়া তিনি নিজেই যাচিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। রাজার হালে সে সুসজ্জিত ঘরে বাস করিতেছে, ষ্টুডিও সাজাইয়া ছবি আঁকিতেছে, দুই বেলার পরিপাটি আহার এবং সুনির্দ্দিষ্ট জলখাবার গৃহস্বামীই যোগাইয়া চলিয়াছেন; কিন্তু এই সুবিধাগুলির বিনিময়ে প্রতি মাসের প্রথমেই যে ত্রিশ টাকা নিয়মিতরূপে তাহার দাখিল করিবার কথা এবং সে নিজেই স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে—তিনটি মাস ঠিকমত দিয়াই চতুর্থ মাস হইতে বাকি ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাসের প্রথমে খরচের ঐ টাকা দেওয়া ত দূরের কথা, মাস শেষ হইয়া গেলেও দেয় টাকাগুলি কোন মাসেই সে সম্পূর্ণ দাখিল করিতে পারে না, এবং যাহা দেয় তাহাও কয়েকটি দফায়; ফলে, গৃহস্বামীর নিকট দেনা তাহার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। তিনি হইতেছেন কথার মানুষ, জীবনে কখন কথার নড়-চড় করেন নাই, এবং কেহ করিলে সহ্য করিতে পারেন না। প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়—যে লোক মুখের কথা রাখিতে পারে না, তাহাকে বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, মুখের কথাই হইতেছে মানুষের প্রকৃতির কষ্টি-পাথর, তাতেই তার ভিতরকার সমস্ত খবর ধরা পড়িয়া যায়। এই জন্যই ঋষিরা বলিয়াছেন—শব্দ ব্রহ্ম। সুতরাং মাস কয়েকের মধ্যেই বেচারী নরেনকে দেনা-পাওনার ব্যাপারে কথা রাখিতে না পারায় এক-কথার মানুষ হরপ্রসাদের নিকট হেয় হইতে হইয়াছে।

কিন্তু নরেনের আয়ের হিসাব লইতে বসিলে এবং সেই সঙ্গে তাহার শিল্পি-সুলভ অন্তরটির সত্যকার পরিচয় পাইলে করুণার উদ্রেক হইবারই কথা। সে জানে, শৈশব হইতেই দৈব তাহার প্রতিকূল, দুর্ভাগ্য যেন ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। শৈশবেই মাতা ও পিতাকে হারাইয়া মাতুলের গলগ্রহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মামীর বাক্য-বাণে তাহার অন্তরটি অনবরত বিদ্ধ হইয়া এমনই কড়া পড়িয়া গিয়াছে যে, কোনরূপ তিরস্কার সেখানে বেদনার অনুভূতি জাগাইতে পারে না। হৃদয়বান মাতুল অবস্থাটি উপলব্ধি করিয়া তাহাতে স্নেহের প্রলেপ দিতেন এবং তাঁহারই সুব্যবস্থায় কলিকাতার মেসে থাকিয়া সে শিক্ষার সুযোগ পায়। মাতুল তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, শিল্প-বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই একটি ভাল রকমের ষ্টুডিও খুলিয়া তাহাকে স্বাধীন ভাবে শিল্প-ব্যবসায়ের উপায় করিয়া দিবেন। কিন্তু এখানেও দৈব হয় তাহার প্রতিকূল। ফাইনাল পরীক্ষার পরই ১৯৩৪ অব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে তাহার সকল আশা বিধ্বস্ত হইয়া যায়। মাতুল তখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া

মুঙ্গেরে একটি সোনা-রুপার দোকান খুলিয়া—ব্যবসা চালাইতেছিলেন। দুর্ঘটনার পর অতিকষ্টে নরেন মুঙ্গেরে গিয়া মাতুলের ঘরবাড়ী এবং মাতুলবংশের জনপ্রাণীরও সন্ধান পায় নাই—সেই অঞ্চলটাই ভূগর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। ব্যাঙ্কে মাতুলের কিছু টাকা গচ্ছিত আছে বলিয়া যখন তাহাকেই একমাত্র ওয়ারিশন সাব্যস্ত করিয়া সংবাদ দেওয়া হয় এবং টাকা তুলিবার জন্য তদ্বির করিবার তাগিদ আসে, নরেন তখন শিক্ষানবিসীরূপে কোন চিত্রশালার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মেসের খরচটুকু সংগ্রহের সুযোগ পাইয়াছে। এ অবস্থায় অর্থহীন অসহায় মানুষের চিত্তে লালসার উদ্দীপনা স্বাভাবিক, কিন্তু এই ছেলেটির প্রকৃতি বুঝি বিধাতা সাধারণ ধাতুতে গড়িতে ভুলিয়াছিলেন। তাই আর্থিক প্রলোভন তাহার শিল্পি-মনে কোনরূপ চাঞ্চল্য তুলিতে পারে নাই—বরং সেখানে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার ভয়াবহ দৃশ্যের সহিত সর্ব্বহারা দুর্গতদের বেদনাতুর চিত্রই ভাসিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে সমবেদনার সুরে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়া জানায়—'আমার মাতুলের আত্মার তৃপ্তি এবং স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া তাঁহার যে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারস্বত্ব বিহারের দুঃস্থ অধিবাসীদের সাহায্যকল্পে আমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে পরিত্যাগ করিলাম।' কিন্তু এই ব্যাপারটি তৎকালে নরেনের মনে চাঞ্চল্য তুলিতে না পারিলেও বিহারী নেতাদের অন্তরগুলি বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছিল; কারণ, নরেনের মাতুল ব্যাঙ্কে যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাহার পরিমাণ দশ সহস্রেরও অধিক। পাটনার বিখ্যাত 'বিহার হেরল্ড' পত্রিকায় দুর্গত বিহারীদের সাহায্য ভাণ্ডারে বাঙ্গালী চিত্রশিল্পীর এই বিপুল দানের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ভাষায় যে সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও এই অদ্ভুত চিত্রশিল্পীর মনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

মনের এই উদারতা নরেনের কর্ম্মজীবনেও নানারূপ বাধার সৃষ্টি করায় অধিক দিন চাকুরী করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। রায় বাহাদুর বড়ুয়ার দরাজ অন্তরটির সহিত তাহার অন্তরের অনেকটা মিল হইয়াছিল বলিয়াই কোনরূপ অসদ্ভাব এখানে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বরং, বেতনের টাকা হইতে ক্রমে ক্রমে সে প্রথম শ্রেণীর ষ্টুডিওর উপযুক্ত উচ্চাঙ্গের বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কিনিয়াও কিছু টাকা সঞ্চয় পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—যাহা তাহার কোষ্ঠিতেও বোধ হয় লেখা ছিল না। চিত্রবিদ্যার তাহার বৈশিষ্ট্যের বিষয়টি উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে প্রকাশিত না হইলেও, ব্যবসায়ীমহলে এই অসামান্য প্রতিভাবান্ তরুণ শিল্পীটির শক্তির বিষয় অপরিচিত ছিল না; সুতরাং কঠিন কাজকর্ম্ম আসিলেই তাঁহারা নরেন বিশ্বাসকে স্মরণ করিতেন এবং তাহার উদারতার সুযোগটুকু পূর্ণমাত্রায় লইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এই জন্যই হাতে প্রচুর কাজ থাকা সত্ত্বেও এবং দিবারাত্র নিরলস ভাবে তুলি চালাইয়াও শ্রমের অনুরূপ অর্থ কিছুতেই সে উপার্জ্জন করিতে পারিত না। রায় বাহাদুরের সংস্রবে আর্থিক স্বচ্ছলতা নিবন্ধন তাহার শিল্পি-মন ব্যবসায়ের আবরণ পরিয়া নিজের সাধনাকে কোন দিনই বাজারে যাচাই করিতে ছুটে নাই। যে যেরূপ দক্ষিণা স্বেচ্ছায় দিয়াছে, তাহাই সে হাসিমুখে লইয়া বাসায় ফিরিয়াছে। সেখানে জীবিকার চিন্তা ত ছিলই না, উপরন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বাঁধা থাকায় আর্থিক সমস্যাও দাগ পাকাইবার সুযোগ পাইত না।

কিন্তু স্বাধীন জীবন-যাত্রার পথে নামিয়া সামান্য সঞ্চয়টুকু নিঃশেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইল যে, এ-পথ একেবারে কুসুমাস্তৃত নহে। পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ী বলিয়া যাঁহারা সমাজে গণ্য ও প্রতিষ্ঠাপন্ন, লাভের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহাদের কারবার। শিল্পীর সাধনাপ্রসূত দান তাঁহাদের নিকট পণ্য মাত্র। ব্যবসায়ীসুলভ দৃষ্টিতে এই পণ্য যাচাই করিয়া লভ্য নির্দ্ধারণেই তাঁহারা অভ্যস্ত। শিল্পীর সৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া আয়ের পথ সুপ্রশস্ত করিবার দিকে তাঁহাদের ধী-শক্তি এবং দৃষ্টিশক্তি যতখানি স্ফুট ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে, সেই নয়নানন্দদায়ক সৃজনীশক্তির পশ্চাতে অভাব ও দৈন্যের অন্ধকার কি ভাবে পুঞ্জীভূত —সে দিকে তাঁহাদের ততখানি ক্ষীণ এবং চিত্তবৃত্তিও নিরুৎসাহ হইয়া থাকে। সুতরাং শিল্পী নরেনের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাহার সৃজনীশক্তির যোগ্য মর্য্যাদা দিবে—এমন হৃদয়বান্ শিল্প-ব্যবসায়ী এদেশে কোথায়? কাজেই মাসের পর মাস হরপ্রসাদের নিকট নরেনের দেনা বাড়িতে থাকে, এবং তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধের সেকালের উদার মনটিও অতিরিক্ত পরিমাণে কৃপণ হইয়া পড়ায় তিনিও পাওনাদারের পর্য্যায়ে উঠিয়া তরুণ শিল্পীর অন্তরে একটা আতঙ্কের সঞ্চার করিয়াছেন।

এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার মধ্যে পাশের ফ্লাটের তরুণী ছাত্রী মালা ঝোড়ো বাতাসের মত এক-এক দিন তাহার ষ্টুডিওর মধ্যে ঢুকিয়া তাহার অভাবগ্রস্ত মনোরাজ্যটিও বুঝি ওলট-পালট করিয়া দিয়া যায়। নরেনের অত্যন্ত সুন্দর চেহারা এবং তাহার বৃত্তি মালার মনে একটু

হিল্লোল তুলিতেই সে নিজে নরেনের ষ্টুডিওতে একদিন হঠাৎ আসে এবং গায়ে-পড়িয়া আলাপ করে। নরেন তাহাকে দেখিয়া প্রথমটায় একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়ে, মালার প্রশ্নের উত্তর যোগাইতে জিহ্বা বুঝি তাহার স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ক্রমে বয়সের ধর্ম্ম এবং সঙ্গের প্রভাব সকল বাধাই ভাঙ্গিয়া দেয়। রীতিমত ঘামিয়া উঠিলেও নরেন প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে এবং সে-ভাব কাটাইয়া প্রতিবেশিনী এই প্রগতিশীলা তরুণীটির সহিত আলাপ করিতে থাকে। এ-ব্যাপারে তাহার বৃত্তিটাই তাহাকে প্রচুর সাহায্য করে। মালার প্রশ্নের উত্তরে ষ্টুডিও ও পেইন্টিং সম্বন্ধে এমন অনেক কিছুই তাহাকে বলিতে বা বুঝাইয়া দিতে হয়—যাহা এই তরুণী শ্রোত্রীটির নিকট একেবারে অভিনব।

কিন্তু নরেনের আর্থিক অবস্থা ও সঙ্গতির অভাব এই তরুণ-তরুণীর স্বচ্ছন্দ আলাপের মধ্যে অন্তরায় হইয়া উঠে। ঈশ্বরার ইচ্ছা নয় যে, তাঁহার কন্যা এরূপ একজন অসহায় অপদার্থ যুবার সঙ্গে মেলামেশা করে, কথাবার্ত্তা কহে। যে অর্থহীন, বড়লোকের ছেলে নয়, বড় রকমের কোন উপার্জ্জন করে না, চেহারায় হাজার চটক থাকিলেও তাঁহার বিচারে সে লোক অপদার্থ ছাড়া কিছুই নয়।

তাই নরেনের সম্পর্কে মা নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া মেয়েকে বলেন: যখন-তখন ঐ হতচ্ছাড়াটার ঘরে গিয়ে ওর সঙ্গে কথা কইতে তোর লজ্জা করে না যা?

মুখ-ঝাপটা দিয়া মালা বলিল: তোমারই বা ওর ওপরে এত রাগ কেন শুনি? দুটো কথা কয়েছি, তাতে হয়েছে কি? দিব্যি ছবি আঁকে, তাই দেখি।

মুখখানা আরও বিকৃত করিয়া বিরক্তির সুরে মা উত্তর করেন: ছাই আঁকে! তবু যদি পয়সা আনবার থাকত মুরদ। পরের বাড়ীতে প'ড়ে প'ড়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে দুটি বেলা কাঁড়ি গিলছে, একটি পয়সাও দেবার নাম নেই, ও আবার মানুষ? দূর—দূর!

শিল্পী মানুষটির সুন্দর চেহারা ও নিরীহ স্বভাব মালার মনের উপর যতটুকু দাগ টানিয়াছিল, মায়ের মুখে তাহার অক্ষমতার কথাটা উঠিতেই বুঝি সে জোর করিয়া সে দাগটি মুছিয়া দিতে সচেষ্ট হইল। অর্থহীনের প্রতি বরাবরই মালারও মর্ম্মান্তিক বিরাগ। কিছুদিন সে নরেনের ঘরের পানে ফিরিয়াও তাকাইল না। কিন্তু এ জন্য নরেন যে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং ছবি আঁকিতে বসিয়া তুলিটি হাতে চাপিয়া সে ঘরের বাহিরে কোন পরিচিত পদশব্দ শুনিবার জন্য কান দুটি পাতিয়া আছে—তাহার দিক দিয়া এমন কোন নিদর্শনও পাওয়া গেল না। দিবসের অধিকাংশ সময়ই নরেন তাহার নিজস্ব ঘরখানির মধ্যে চিত্রসংক্রান্ত কোন না কোন কার্য্যে নিশ্চেষ্ট ভাবেই লিপ্ত থাকে। কেবল সপ্তাহের মধ্যে কয়েকটি দিন অপরাহ্ণের দিকে ঘণ্টা তিনেকের জন্য ঘরখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে হয় সমাপ্ত কাজ ও তাহার পারিশ্রমিক আদান-প্রদানের জন্য। ইহা ভিন্ন সহরের কোন আকর্ষণ, এমন কি, বাসার সন্নিহিত নবরচিত কৃত্রিম লেকের প্রলোভন পর্য্যন্ত এই কর্ম্মযোগী তরুণ যুবকটিকে কিছুমাত্র প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। প্রস্তুত-করা ছবির সহিত অর্থ-প্রাপ্তির প্রচুর আশা লইয়া সে বাহির হইলেও অধিকাংশ দিনই রিক্ত হস্তে তাহাকে ফিরিতে হইত। কিন্তু তাহাতেও অবসাদে তাহার চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে এমন কিছু লক্ষণও সচরাচর পাওয়া যাইত না। আশাভঙ্গের দৌর্ব্বল্যটুকু নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য সে ফিরিয়াই নবীন উৎসাহে নূতনতর কোন সৃষ্টি ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিত। ইহারই মধ্যে ফুরসদ একটু মিলিলেই তাহার ফাঁকে হরপ্রসাদের মুখখানি তাহার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিত এবং বৃদ্ধের সেদিনকার তাগিদের একটা আশাপ্রদ উত্তরও তাহাকে মনে মনে তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হইত।

সেদিন একটু বেলাবেলিই নরেন তাহার বাসায় ফিরিয়া আসিল। দুই-তিনটি স্থানে অর্থপ্রাপ্তি সম্বন্ধে হতাশ হইয়াই ফিরিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় মনের বিকারটুকু নব সৃষ্টির আনন্দে মুছিয়া ফেলিবার জন্য অন্যান্য দিনের মত তুলি চালাইতে কোনরূপ ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। এমন সময় মালা ঝড়ের বেগে ঘরখানির মধ্যে ঢুকিয়া কহিল: একটা নতুন খবর শুনেছেন?

নরেনের মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হাতখানি তুলিয়া এবং চোখ দুটি মেলিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে মালার পানে তাকাইয়া রহিল।

মালা বলিল: আপনার গৃহস্বামী ত তল্পী-তল্পা বেঁধে বোম্বাই চললেন, এখন আপনার অবস্থা কি হবে?

এরূপ সংবাদ শুনিবার জন্য নরেন প্রস্তুত ছিল না। গৃহস্বামীর যে ইতিমধ্যে বোম্বাই যাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা আছে, তাহাও কোন দিন সে শুনে নাই। তাই বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করিতে হইল তাহাকে: তাই না কি: কিন্তু কিছু শুনিনি ত।

মালা: শুনবেন কি করে,—বেলা ঠিক চারটের সময় 'তার' এসেছে, আপনি তখন বেরিয়েছিলেন।

নরেন: সেখানকার খবর সব ভাল ত?

মালা : ও! আপনি দেখছি এখনো পঁচিশ বছর পেছিয়ে আছেন—টেলিগ্রাম এলেই বুঝি ভেবে নিতে হবে সেটা কোন দুঃসংবাদের বাহন হয়ে এসেছে।

নরেন : দেখুন, জীবনে একখানি টেলিগ্রামই পাই, আর সেটা এমন একটা সাংঘাতিক সংবাদ আনে......

মালা : আপনার গৃহস্বামীর বিকালের টেলিগ্রামখানি কোন সাংঘাতিক সংবাদ আনেনি, হারানো একটা সম্পত্তি পাওয়া যাচ্ছে কি না, তাই তার তদ্বিরের জন্য সেখানে যাবার নেমন্তন্ন এসেছে। জলেই জল বাধে, বুঝলেন?

জলে কি ভাবে জল বাধে, তাহা না বুঝিলেও এটুকু বুঝিতে নরেনের বিলম্ব হইল না যে, তাহার অন্নজলের পাট এ-বাড়ী হইতে উঠিয়াছে, এবং কয়েক মাসের পাওনা টাকা দাখিল করিবার জন্য এখনই কড়া তাগিদ আসিবে।

নরেনকে চিন্তিত দেখিয়া মালা কহিল : বুড়ো এখন আপনাকে নিয়ে ভারি ভাবনায় পড়েছে। তখন বলছিল—ছেলেটাই দেখছি ভারি মুস্কিলে পড়বে।

নরেন উৎকর্ণ হইয়া রহিল—পাওনা টাকাগুলির সম্বন্ধেও কোন সংবাদ মেয়েটির মুখ দিয়া বাহির হয় কি না তাহা শুনিবার জন্য। কিন্তু মালা কথাটার মোড় ফিরাইয়া কহিল : আর শুনেছেন, ওদিকের খালি ফ্ল্যাটটাও ভাড়া হয়ে গেল!

শুষ্ক কণ্ঠে নরেন জিজ্ঞাসা করিল : এবার কে ভাড়া নিলেন?

মালা কহিল : এক সাহেব, অবশ্য বাঙ্গালী সাহেব; খুব ন' কি বড়লোক, ন্যাশান্যাল ওয়ার ফ্রন্টের একজন উঁচু দরের কনট্রোলার। জানেন, যেখানে যত ফ্রন্ট আছে, মিলিটারী ক্যাম্প পড়েছে, ওয়ারিয়ার্সদের য়্যামিউজমেন্টস্, এনটারটেনমেণ্টস্ সব কিছু বিলি-ব্যবস্থা এঁকেই করতে হয়!

শুষ্ক হাসিয়া নরেন কহিল : আপনি দেখছি অনেক খবরই রাখেন, কিছুই বাদ যায় না।

মুখখানা লাল করিয়া মালা উত্তর দিল : বাঁচবার মতন বাঁচতে হলে দুনিয়ার সমস্ত খবরই রাখতে হয়—কুনো বিড়ালের মত ঘরের কোণে বসে থাকাটা গৌরবের নয়!

তুলি টানিতে টানিতে নরেন বলিল : একটা কথা তাহলে বলি আপনাকে, ঐ বাঙালী সাহেবটির ব্যাপারটাকে আপনি যতই বড় করে বাড়িয়ে বলুন, ভদ্রলোকে কিন্তু ভাল বলে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নরেনের পানে একবার তাকিয়ে মালা বলল : তাহলে সেই ভদ্রলোকগুলির একটা লিষ্ট আমাকে দেবেন, আমি ঐ সাহেবটিকে দেখাব।—কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই ঝড়ের বেগে সে বাহির হইয়া গেল।

নরেন বুঝিল, এখান হইতে এখন তাহাকে আস্তানা তুলিয়া পুনরায় অন্যত্র কোথাও গিয়া আস্তানা পাতিতে হইবে—'পুনর্মূষিকো ভব' গল্পের মত তাহার অবস্থা আর কি! কিন্তু এখানকার দেনা সে কি করিয়া শোধ করিবে, ইহাই এখন কঠিন সমস্যা!

এই সমস্যাটা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিল বাহির হইতে গৃহস্বামীর গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর অবলম্বন করিয়া : নরেন, ফিরেছ না কি হে?

স্বরের সঙ্গেই নরেন সচকিত হইয়া উঠিল এবং হাতের কাজ ফেলিয়া শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উত্তর দিল : আজ্ঞে—হ্যাঁ।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামী বলিলেন : আজ যে বেলাবেলিই ফিরেছ দেখছি।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নরেন বলিল : আজ আর বেশী ভোগান্তি হয় নি স্যার, প্রথমেই যেখানে যাই—যে-ক'জনের সঙ্গে দরকার ছিল আজ, তাঁরা ঐখানেই মিলেছিলেন কি না—তাই সবাই সময় নিলেন। এইটুকুই আমার ভাল, ঘোরাঘুরির অনেক সময় বেঁচে গেল।

—ব'স, কথা আছে তোমার সঙ্গে।—বলিয়াই হরপ্রসাদ তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে বসিয়া পড়িলেন, নরেনও তাহার টুলটির উপর আলগোছে যেন কোন রকমে বসিল, বুকের ভিতরটা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ-ঢিপ করিয়া উঠিল।

হরপ্রসাদ বলিলেন : তুমি বেরোবার পরই বোম্বাই থেকে জরুরী একখানা 'তার' আসে। ব্যাপারটা হচ্ছে—প্রায় বছর বারো আগে আমার একটা সেরা সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যায়, সেটি ফিরে পাবার জন্যে চেষ্টার কোন কসুর করিনি, আজ হঠাৎ খবর এসেছে—ফিরে পাবার সুরাহা না কি হয়েছে। সেই থেকে মনের অবস্থা যে কি রকম হয়েছে তা মুখে বলবার নয়। তাই কালই আমরা বোম্বাই মেলে রওনা হব ঠিক করে ফেলেছি। এখন ভাবনায় পড়েছি তোমাকে নিয়ে। কেন না, তোমার ব্যাপারটাও ত সেরে ফেলা আবশ্যক। কম্বলখানা ভিজিয়ে তুমি কি রকম ভারি করে ফেলেছ, তা' ত দেখতেই পাচ্ছ! এখন কি করতে চাও বল?

নরেনের মুখখানি নত হইয়া গেল, একটি নিশ্বাস সবেগে ত্যাগ করিয়া সে কহিল: দিতে হবে বৈ কি, এবং আমি এ-দেনা শোধ করবই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি যে করব ঠিক করতে পারছি না। আর, আপনারাও যে হঠাৎ চলে যাবেন—তাও ভাবিনি, দিন কতক সময় পেলে……

হরপ্রসাদ: দশ বছর সময় পেলেও তুমি কিছুই করে উঠতে পারবে না, আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি। তোমার আয়েরও ঠিক নেই, কথারও ঠিক নেই।

নরেন: আপনি এত দিনে তাহলে আমার রোগ ঠিক ধরেছেন সার। এখন আপনিই বলুন ত কি করি? কি উপায়ে আপনার দেনা শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়—উপস্থিত এই অবস্থায়?

হরপ্রসাদ: উপায় আমি স্থির করেছি শোন। আমি বেশ বুঝেছি, টাকা তুমি দিতে পারবে না। অথচ আমি টাকাগুলো ছাড়তেও পারি না। তুমি যদি এক কাজ কর, তোমার দেনাও শোধ হয়ে যায়, আর এ-বাড়ীতে তোমার থাকাও চলে।

স্তব্ধ-বিস্ময়ে নরেন বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কি উপায় তিনি দেখাইতে চান! তাহার মুখ দিয়া কথা আর ফুটিয়া বাহির হইল না।

ঘরখানির চারি দিকে দেনদার শিল্পীর হাতে সমাপ্ত-অসমাপ্ত বিভিন্ন চিত্রগুলির উপর দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া হরপ্রসাদ সহসা প্রশ্ন করিলেন: পুরানো ছোট কোন ফটো দেখে তুমি বড় অয়েল পেন্টিং করতে পারো?

সোল্লাসে নরেন উত্তর করিল: নিশ্চয়ই; এই ত আমার কাজ সার!

—তাহলে তুমি এই কাজই কর। একখানা পুরানো ফটো আমি তোমাকে দেব, তাই দেখে ফুল-সাইজ অয়েল পেন্টিং একখানা তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে তোমাকে। পারবে ত?

—ফটোখানা আমাকে দেখাবেন। আমি দেখে…

—আহা-হা, দেখে ভাববার মত কিছু নেই হে! কথা হচ্ছে—কাজটা করতে হবে, করা চাই-ই। জায়গায় জায়গায় একটু-আধটু 'ফেল্ট' হয়ত হয়ে থাকবে; তাতে কি এমন এসে-যাবে আর? তোমাদের ত রঙ আর তুলি চালানো কাজ, দেবে ঠিক-ঠাক চালিয়ে। আর দেখ, এই বাবদে আমি তোমার দেনার টাকাটা বেবাক রেহাই দিচ্ছি—একটি পয়সাও আর চাইব না; তা ছাড়া, তুমি যেমন আছ তেমনি থাকবে, এর জন্যে ভাড়া-টাড়া কিছুই দিতে হবে না। একটা ইকমিক্ কুকার তোমাকে দিয়ে যাবো, ভাঁড়ারেও জিনিসপত্র সব মজুত পাবে—খাবার বিশেষ কোন কষ্ট বা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে না। কিন্তু বাপু, ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, কাজগুলো আমার শেষ করে ফেলেছ—টাকার মত যেন না হয়।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নরেন গৃহস্বামীর পদধূলি লইয়া কহিল: আজ আমার মাথার ওপর থেকে মস্ত একটা দুশ্চিন্তা নামিয়ে দিলেন সার! আপনি আমাকে বাঁচালেন।

এই সময় উপর হইতে জলযোগ করিবার তাগিদ আসিলে গৃহস্বামী কহিলেন: আজ আর তোমার জল-খাবার এ-ঘরে আসবে না, ওপরের ঘরে চলো তুমি, সেখানেই জল-টল খাবে, ফটোখানাও তোমাকে বুঝিয়ে দেব।

উপরের একখানি ঘরে হরপ্রসাদের নিরুদ্দিষ্টা কন্যা রেণুর একখানি ফটো সাজানো ছিল। জলযোগের পর হরপ্রসাদ নরেনকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন: এই ফটোখানিকে বড় করাই তোমার কাজ নয়,—এ-কাজ তুমি এই ঘরে বসেই করবে। আমাদের জিনিসপত্তর সব দু'খানা ঘরে রেখে তালাবন্ধ করে যাচ্ছি। বাকি ঘরগুলো তোমারই জিম্মায় থাকবে। এই ফটোখানাকে তুমি যেন নিচের ঘরে নিয়ে যেয়ো না বাবা, এর যা-কিছু কাজ এই ঘরেই চলবে—বুঝেছ?

এই সময় বাহিরে মোটরের হর্ণের সঙ্গে চারি দিকে একটা হাঁক-ডাক পড়িয়া গেল। হরপ্রসাদ সচকিত হইয়া বলিলেন: তোমাকে বলতে ভুলে গেছি নরু, পাশের ব্লকটাও ভাড়া হয়ে গেছে। তাঁরাই বোধ হয় লটবহর নিয়ে এলেন। চল, নতুন ভাড়াটে ভদ্র-লোকটির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরেনকে হরপ্রসাদের সহিত বাহিরে যাইতে হইল। সাহেবী পোষাকে সজ্জিত এক ব্যক্তি ছড়ি হস্তে তখন মোটর হইতে নামিতেছিল। বয়স আন্দাজ বত্রিশ, চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়; বেশ ফিট্‌ফাট এবং সপ্রতিভ প্রকৃতি। নাম অবিনাশ সরকার; য়্যাংলো-আমেরিকান মিত্রবাহিনীর সরবরাহকার—বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালার বাহিরে নানা স্থানে তাহার সরবরাহ ব্যাপার চলিতেছে। যেমন দেদার উপার্জ্জন করে, তেমনই দুই হাতে উড়াইয়া তৃপ্তি পায়।

হরপ্রসাদের মধ্যস্থতায় নরেন বিশ্বাস ও অবিনাশ সরকার পরস্পর পরিচিত হইলে অবিনাশই উপর-পড়া হইয়া করমর্দ্দনে নরেনকে আপ্যায়িত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সগর্ব্বে জানাইয়া দিল: আর্টিষ্ট নিয়েই ত আমার

বিজনেস। কত আর্টিষ্ট যে করে খাচ্ছে আমার বিজনেসের দৌলতে তাব ঠিক-ঠিকানা নেই, দেবেন একখানা পিটীসান, আপনার নামটাও না হয় এনলিষ্ট করে নেব।

নরেন হাসিয়া উত্তর দিল: আপনার অনুগ্রহের জন্ম ধন্সবাদ, তবে আমার কারবার হচ্ছে অয়েল পেণ্টিং নিয়ে, আপনার সঙ্গে কাজ করা আমার পোষাবে না।

'ও আই সী'—এই কয়টি ই রাজী কথা শ্লেষের সুরে বলিয়া সরকার সাহেব সাহেবী কায়দায় তাহার ব্লকের ভিতর চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় ব্লকের বারান্দা হইতে ইন্দিরা মন্তব্য করিলেন: দিব্যি মানুষটি, দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। আসতে না আসতেই পাড়া গুলজার, যেন কোথাকার কে রাজা এল!

হরপ্রসাদ হাসিয়া বলিলেন: বটেই ত। সাহেব সেজে এসেছে; হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, দু'-তিনখানা মোটর, এত লোকজন,—শ্রদ্ধা ত হবারই কথা।

৪

পরদিনই হরপ্রসাদ সস্ত্রীক বোম্বাই রওয়ানা হইলেন। নরেন তাঁহাদিগকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে সঙ্গে চলিল। হাওড়া ষ্টেশনেও হরপ্রসাদ তাহাকে ফটোখানির কাজ তাড়াতাড়ি সারিবার এবং তাঁহার ব্লকের ঘর কয়খানি সতর্কতার সহিত দেখা-শুনা করিবার নির্দেশটি স্মরণ করাইয়া দিতে বিস্মৃত হন নাই। তিনি বিশেষ করিয়া তাহাকে বলিয়া দেন যে, তাঁর স্ত্রী অনুপমা দেবী রাত্রে প্রায়ই স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, তাঁহার সেই হারানো মেয়েটি বড় সড় হইয়া সৌন্দর্য্যের প্রতিমার মত সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। দীর্ঘ বারো বছরে যেমন বাড়-বৃদ্ধি হয়, রূপ উপচাইয়া পড়ে—ঠিক তেমনই হইয়াছে। সুতরাং বোম্বাই হইতে ফিরিয়া ছবিতে তিনি যেন সেই রূপের প্রতিমাটি দেখিতে পান।

সহরের খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক বিনয় ব্যানার্জ্জী নরেনকে কিছু কাজ দিয়াছিলেন। হরপ্রসাদকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া, কাজগুলি লইয়া সে অধ্যাপক মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। প্রণষ্টপ্রায় ফটোচিত্র হইতে কয়েকখানি পরিপূর্ণ চিত্র তাহাকে নিজের পরিকল্পনায় আদর্শ বজায় রাখিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। চিত্রগুলি দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় চমৎকৃত! তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, ও ভগিনীর তিনখানি দুষ্প্রাপ্য ফটোচিত্র এমন ভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহাদের যথাযথ আলেখ্য পাইবার আশা তিনি পরিত্যাগই করিয়াছিলেন। কতিপয় নামজাদা ষ্টুডিও এ-কার্য্য গ্রহণে স্বীকৃত হয় নাই। এক বন্ধুব অনুরোধে সন্দিগ্ধ চিত্তেই তিনি নরেনের হাতে প্রণষ্টপ্রায় ফটো তিনখানি অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখন কল্পনাও করেন নাই যে, এই অখ্যাতনামা তরুণ শিল্পী এত শীঘ্র এমন নিখুঁত ভাবে তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবে। নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়জনকে ফিরিয়া পাইলে মনে যেরূপ উল্লাস উপস্থিত হয়, অধ্যাপক সেইরূপ উল্লাসের সহিত নরেনের সম্বর্দ্ধনা করিলেন, প্রশংসা যেন তাঁহার মুখে ধরিতেছিল না।

অনেক বড় লোকের কাজ সে করিয়াছে, বড় বড় কলেজের সম্পর্কেও তাহাকে যাইতে হইয়াছে; সর্ব্বত্রই সে মনোনিবেশের সহিত কাজ করিয়া যায়, ইহাই তাহার চরিত্রেব বিশেষত্ব। কিন্তু কাজ পাইয়া এ-ভাবে তাহার সম্মুখে কেহ কোন দিন এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে নাই, কাজের এমন সুখ্যাতিও সে কাহারও মুখে শুনিবার অবকাশ কোন দিন পায় নাই। আজ তাহাকেও চমৎকৃত হইয়া চাহিয়া থাকিতে হইল।

শুধু মুখের প্রশংসা নয়,—অধ্যাপক মহাশয় যখন দশ টাকার দশখানি নোট তাহার হাতে নিতান্ত কুণ্ঠিত ভাবে গুঁজিয়া দিলেন, তখন নরেনের বিস্ময় একেবারে যেন ছাপাইয়া উঠিল!—একশো টাকা! সে যে বিশ টাকার বেশী প্রত্যাশা করে নাই; তাহাও যে আজই সদ্য-সদ্য পাইবে সে সম্বন্ধেও তাহার গভীর সংশয় ছিল। অভিভূতের মত সে কহিল—এ কি সার! দশখানা নোট যে, সবই দশ টাকার!

তাহার বিস্ময়-বিহ্বলিত মুখখানির দিকে চাহিয়া অধ্যাপক উত্তর দিলেন: এর বেশী আমাব কাছে এখন নেই, থাকলে সবটাই দিতাম। আসছে মাসের সলা তারিখে এই সময় এস। বাকিটা দেব।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! নরেন গাঢ় স্বরে কহিল: আপনি তাহলে আমার কথা বুঝতে পারেননি সার! আমি বলছি, আপনি আমাকে অনেক বেশী দিয়েছেন। আমি এত টাকা পাবার প্রত্যাশা নিয়ে আপনার কাজে হাত দিইনি।

বদ্ধদৃষ্টিতে অধ্যাপক তরুণ শিল্পীর দিকে চাহিয়া কহিলেন: তার কারণ তুমি তোমার প্রতিভা ওজন করবার সুযোগ এখনও পাওনি। আমি বুঝতে পেরেছি, আর্টকে তুমি সাধনা বলেই বরণ করেছ, অর্থ নিয়ে তাই যাচাই করতে শেখনি। কিন্তু এ ঠিক নয়। এতে চলার পথে পদে-পদে হোঁচট খেতে হবে। আমি তোমাকে একশো টাকা

মাত্র দিয়েছি যে কাজের বিনিময়ে,—তুমি বলছ, বেশী দিয়েছি তার জন্যে। জান, পাঁচটা বড় বড় ষ্টুডিও এ-কাজ নিতে ভরসা করেনি! আর যদি তাদের মধ্যে কেউ এ কাজে হাত দিত কত বিল করত বলতে পার? সাড়ে চারশোর কম নয়। আমি তোমাকে একশো দিলে, পয়লা তারিখে আর একশো দেব। নিজেকে এত সস্তা ক'র না, নিজের ওজন বুঝে দর দিয়ো, নইলে বড় হ'তে পারবে না কোন দিন! হাঁ, ভাল কথা, এক দল সাহেব 'গ্রাণ্ড হোটেলে' পিকচার একজিবিশন খুলেছে জান ত?

নরেন কহিল: ও-সব বড় ব্যাপার; আমাদের জেনে লাভ নেই, স্যার।

—লাভ নেই কি হে! লাভ হয়ত এই পথেই। আমি একখানা পামফ্লেট ওদের পেয়েছি। তুমি নিয়ে যাও, ওতে সব লেখা আছে। তুমি একখানা ছবি দেবার চেষ্টা কর। আমি তোমার প্রতিভার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে আমার বিশ্বাস, তোমার ছবি একটা প্রেস পাবেই। আমেরিকার বিখ্যাত 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফিলিম কোম্পানী' গ্রাণ্ড হোটেলে ছবির একটা একজিবিসান খুলেছে। প্রত্যেক দেশের সেরা 'বিউটি' সংগ্রহ করা হচ্ছে এদের বিজনেস। প্রাইজই বল বা রিওয়ার্ডই বল, মনে হচ্ছে—হাজার পাউণ্ড, প্রায় পনের হাজার টাকা; এ ছাড়া কোন বৈশিষ্ট্য বা অসাধারণত্ব আছে—এমন কোন ছবির জন্যে এরা স্পেশ্যাল রিওয়ার্ড দেবে জানিয়েছে। কখন কোন্ দিক দিয়ে অদৃষ্ট ফেরে কে বলতে পারে? চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? ছবি তৈরী হলে, বরং আমার কাছে এনো, আমি সেখানে পাঠাবার সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে দেব।

পামফ্লেটখানি হাতে লইয়া সেই মহানুভব অধ্যাপককে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া নরেন বিদায় লইল। কাজ করিয়া কাজের এমন উচ্চ পারিশ্রমিক এ-পর্য্যন্ত সে পায় নাই; ইহা তাহার পক্ষে যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনই আকাঙ্ক্ষার অতীত। পনের দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া সমাপ্ত কাজের জন্য যেখানে সে দশটি টাকা পাইবার প্রত্যাশা করিয়াছে, কাজে নানাবিধ ত্রুটি দেখাইয়া কর্ম্মকর্তা সেখানে হয়ত সাত টাকার রফা করিয়াছেন, তাহাও এক দফায় নয়,—অন্ততঃ সাত দিন হাঁটিয়া সাতটি টাকাও আদায় লইতে হইয়াছে। আবার এমন অনেক হৃদয়বানও আছেন, বরাবর হাঁটাইয়া চুক্তির অর্দ্ধেকটা দিয়া বাকিটুকু দিবার আর লক্ষণ প্রকাশ করেন না। কত স্থানে এমন কত টাকাই তাহার মারা গিয়াছে। কাজ করিয়া টাকার জন্য প্রার্থী হওয়াই তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয়; অথচ তাহার অভাবের অন্ত নাই। একসঙ্গে এতগুলি টাকা পাইয়া সে যেন হাঁফাইয়া উঠিল, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না—কি ভাবে টাকাগুলি খরচ করিবে, কি কিনিবে, সহরের কোন্ কোন্ বস্তুগুলি তাহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও একেবারে অপরিহার্য্য!

হরপ্রসাদের দেওয়া ছবিগুলির কাজ আরম্ভ করিবার জন্য ধর্ম্মতলা হইতে রং ও ক্যাম্বিশ লাগান ফ্রেম এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি পঁচিশ টাকা খরচ করিয়া প্রথমেই কিনিয়া ফেলিল। তাহার পর কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ব্যবহার্য্য জিনিসপত্রও কিছু-কিছু কেনা হইল। আজ তাহার পকেটে টাকা ধরে না; সুতরাং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে লেক রোডে ট্যাক্সী-যোগে পাড়ি দিয়া উপার্জিত অর্থগুলিকে সার্থক করিতে তাহার পক্ষে কোনও ত্রুটি হইল না।

৫

দোতলার একখানি ঘরে হরপ্রসাদের দেওয়া ছবিখানি লইয়া নরেন তাহা প্রসাধনে ব্রতী হইয়াছে। পাঁচ-ছয় বৎসরের এক অপূর্ব্ব বালিকার ছবি। যদিও তাহা মলিন ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি ছবির মেয়েটির মুখখানি কি চমৎকার! তাহাকে যেন পরিপূর্ণরূপে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে তাহার আকর্ণ-বিসারী অপূর্ব্ব সুন্দর দুইটি চক্ষু। বালিকার এই অপরূপ আলেখ্যটি তরুণ শিল্পীকে শুধু আকৃষ্ট নয়, অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। অনেক চিত্রের উপর সে তুলিকা চালাইয়াছে, বহু আয়তনেত্রার আলেখ্য তাহার নেত্র পথে পড়িয়াছে, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব দুইটি চক্ষু বুঝি সে কোথাও দেখিবার অবকাশ পায় নাই! ছবিখানি তাড়াতাড়ি শেষ করিবার জন্য সে ঠিক সম্মুখেই বিশেষ ভাবে রাখিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ইজেল-এ ক্যানভাস লাগাইয়া ব্যাক গ্রাউণ্ডে রং ফলাইতে মনোনিবেশ করিল।

ঘরের বাহিরে দালানটির এক পার্শ্বে নরেন কুকার চড়াইয়াছে। তাহার শিল্পি-জীবনে স্বহস্তে রন্ধন এই প্রথম। রন্ধন সংক্রান্ত ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পড়িয়া সে যথাযথ ভাবেই রন্ধনের আয়োজন করিয়াছে। ভাত, ডাল, ডিম ও তরকারী,—চারিটি বাটি ভরিয়া সিদ্ধ হইতেছিল।

ব্যাক গ্রাউণ্ড শেষ করিয়া নরেন মেয়েটির অপূর্ব্ব মুখখানির কিয়দংশ আঁকিয়াছে, এমন সময় দমকা হাওয়ার মত রুদ্ধ দরজাটি সশব্দে ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল—মালা। নিচের দালানে মালাদের ব্লকের দিকের দরজাটি সম্ভবতঃ সে ইচ্ছা করিয়াই বন্ধ করে নাই।

চমকিত নরেনকে কথা কহিবার অবসরটুকু না দিয়াই মালা কলকণ্ঠে কহিল: বাঃ! আপনি ত বেশ লোক মশাই! বুড়ো যেতে না যেতেই তার দোতলার ঘরখানি দখল করে তোড় জোড় পেতে বসেছেন!

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে নরেন কহিল: না, না, তা কেন? এ-সব তাঁরই তোড়-জোড় যে! অয়েল-পেন্টিংখানির বরাত দিয়ে গেছেন, আপনি ত শুনেছেন সে কথা। এই ঘরে বসেই এ ছবির কাজ করবার নির্দ্দেশও তিনি দিয়ে গেছেন।

নাসিকা কুঞ্চিত ও সুন্দর মুখখানি বিকৃত করিয়া মালা কহিল: আহা—কি বিউটি।

মালার কথায় ব্যথা পাইয়া নরেন কহিল: ছবিখানি ফেন্ট হয়ে গেছে, তাই 'বিউটি' বঝতে পারেননি। কিন্তু যাঁর ছবি, তাঁর ওপর কটাক্ষ করলে অবিচার করা হয়। এমন মুখ, এমন চোখ, এমন আশ্চর্য্য ভুরু—হাজারের মধ্যে একজনের থাকে কি না সন্দেহ!

মুখখানা মচকাইয়া মালা কহিল: তাহলেও মরা ঘোড়াকে দানা খাইয়ে কি লাভ বলুন ত?

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নরেন মালার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল: কার কথা বলছেন?

মালা শ্লেষের স্বরে কহিল: যার রূপসজ্জায় উঠে-পড়ে লেগেছেন? বুড়োর ছোট মেয়ে,—আপনি হয়ত ভাবছেন ছেলেবেলার ছবি, এখন তিনি পূর্ণ যুবতী; ছবি তুলে বাহাবা নেবেন,—কিন্তু সে গুড়ে বালি!

নরেনের কোমল চিত্তটি ব্যথায় ভরিয়া গেল। গাঢ় স্বরে বলিল: আমি কিছু-কিছু শুনেছি।

মুখে দুষ্টুমির হাসি টানিয়া মালা কহিল: আমি তাহলে রোগ ধরেছিলুম ঠিক বলুন?

আর্ত্ত স্বরে নরেন কহিল: আপনি আমাকে অনর্থক আঘাত দিচ্ছেন, রহস্যেরও বোধ হয় একটা সীমা আছে।

মালা কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিল: নিশ্চয়ই; রহস্যের যেমন সীমা আছে, রহস্যের পাত্রও তেমনি বিচার-সাপেক্ষ। আপনি হচ্ছেন এ-যুগের শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট, আপনার সঙ্গে রহস্য করবার যোগ্যতা আমার কতটুকু বলুন!

মালার কটাক্ষে নিজেকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া নরেন কহিল: দেখুন আমি অতি নগণ্য চিত্র-শিল্পী, রং-তুলি নিয়ে আমার কারবার,—কথা শিল্পী আমি নই যে, গুছিয়ে কথা বলব। আমার কথায় যদি দোষ-ত্রুটি হয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।

মালা তৎক্ষণাৎ ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল: ক্ষেপেছেন আপনি! ঠাট্টা বোঝেন না? আমি এ বাড়ীতে এসে অবধি দেখছি, বরাবরই আপনার উপর একতরফা ডিক্রী হচ্ছে, আর আপনি পড়ে-পড়ে সহে যাচ্ছেন? তাই ইচ্ছে হল, দেখি আপনাকে খোঁচা দিয়ে রাগিয়ে তোলা সম্ভব কি না।

নরেন প্রশ্ন করিল: কি দেখলেন?

মালা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল: একেবারে হোপলেশ। বুঝলুম, একতরফা ডিক্রী-জারীর যোগ্য পাত্রই আপনি; পড়ে পড়ে শুধু মার খাবেন বলেই দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়েছেন!

আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নরেন হাতের তুলিটি প্যালেটের গাত্রে গুঁজিয়া নূতন একটি তুলি টানিয়া লইল। মালা বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল: কি হবে এখন,—যে নেই—তারই রূপসজ্জা?

দৃঢ় স্বরে নরেন কহিল: হাঁ, আমার সমস্ত শক্তি ও সাধনা দিয়ে আমি এই মেয়েটির এমন একখানি ছবি আঁকব, যাতে আমার শিক্ষা হবে সার্থক, আর গৃহস্বামী ফিরে এসে এই ঘরে ঢুকেই স্তব্ধ-বিস্ময়ে দেখবেন—তাঁর কন্যাটি যেন জীবন্ত হয়ে প্রতীক্ষা করছেন এখানে।

চাপা নিশ্বাসের সহিত বিষাদের সুরে মালা কহিল: তাহলে দেখছি আমার কোন আশা নেই এ ক্ষেত্রে?

অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু তুলিয়া নরেন মালার দিকে চাহিতেই মালা অভিনয়-ভঙ্গিতে কহিল: আমার কথাটা তাহলে সহজ করেই বলি শুনুন! আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, হাতের সব কাজ ফেলে আপনি সর্ব্বাগ্রে আমার একখানি ছবি আঁকেন। এই প্রস্তাব নিয়েই এসেছিলাম আপনার কাছে। কিন্তু আপনি ত এখন মৃত অশ্বকে দানা খাওয়াতেই ব্যস্ত।

মালার কথায় নরেন যেন উৎসাহিত হইয়া উঠিল; হাতের তুলিটি প্যালেটের মধ্যে রাখিয়া বিস্ময় ও কৌতূহল-বিজড়িত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া কহিল: ছবি আঁকাতে চান আমাকে দিয়ে? আপনার? নিজের?

—এটা বুঝি খুবই ধৃষ্টতার কথা আমার পক্ষে?

—আপনার পক্ষে নয়, আমার পক্ষে; শুধু ধৃষ্টতা নয়, একান্ত বিস্ময়ের কথা।

—কেন বলুন ত?

—কোন একটা বিশেষ কারণে কাল রাতে আমার মনে ঠিক এই সঙ্কল্পই হয়েছিল।

—বলেন কি,—একই চিন্তা দু'জনের মনে একই সময়ে। তা'হলে ত সত্যই বিস্ময়ের কথা। আচ্ছা বলুন ত, সেই বিশেষ কারণটি কি, যার জন্যে আমার ছবি নেবার সঙ্কল্প আপনার মনেও শিহরণ তুলেছিল?

—বলুন না।

—খুব বড় করে ছবির একটা একজিবিসান খোলা হচ্ছে; আমি তাতে একটা ছবি দেব স্থির করেছি। খবরটা কালই পেয়েছি। কেন বলতে পারি না, হঠাৎ আমার মনে হ'ল আপনাকে আদর্শ করে যদি একখানা ছবি আঁকি, সেটা ব্যর্থ হবে না।

—কি সর্ব্বনাশ! এত-বড় কলকাতা সহরের মধ্যে অসংখ্য রূপসী মেয়ে থাকতে আমাকেই আপনি আদর্শ স্থির করলেন?

—দেখুন, আপনার কতকগুলো ভঙ্গিতে এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা আর্টের দিক দিয়ে একেবারে নিখুঁত। আমি সেইগুলো বজায় রেখে একটু নতুন ভাবে আপনার ছবি আঁকতুম।

—কিন্তু আপনি নিজে থেকে আমাকে ত কিছুই বলেন নি?

—সাহস পাইনি; যদি আপনি অন্য কিছু মনে করেন, এই ভয়ে।

—তাহলে টোপ ফেলবার আগেই মাছ আপনাকে ধরা দিয়েছে বলুন। এখনও ঐ সঙ্কল্প আপনার মনে আছে না কি?

—যদি আপনি অনুগ্রহ করে কথা দেন, তাহলে আজই আমি কাজ আরম্ভ করি; কেন না, সময় খুবই কম,—পনেরো দিনের মধ্যে ছবি সেখানে পাঠাতে হবে।

—এতে কি লাভ বলুন ত?

—লাভ-লোকসান হিসেব করে কাজ ত কোন দিন করিনি আমি!

—তা আমি খুব জানি; উদয়-অস্ত খেটে মরেন, পয়সার বেলায় ঢু-ঢু; অথচ এইটিই হচ্ছে সব চেয়ে বড় বস্তু।

—আপনি ভুল বুঝেছেন। কাজ করে তার সফলতায় যে আনন্দ, সেইটিই আমার কাছে সব চেয়ে বড় বস্তু—পয়সা নয়।

—হ'তে পারে, পয়সা আপনার কাছে হয়ত হাতের ময়লা, কিন্তু আমার কাছে ওরই সার্থকতা সব চেয়ে বেশী! আপনি লাভ-লোকসান না খতিয়েই কাজে নামতে পারেন, কিন্তু আমরা তা পারি নে। কাজেই আপনাকে কথা দেবার আগে আমার জানা দরকার—এ-কাজে আমার লাভের পরিমাণ কতটুকু?

—সবটুকুই আপনার প্রাপ্য, আমি তার কোন অংশই চাই না। ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেলে সব টাকাই আপনি বুঝে নেবেন।

—আর যদি বিক্রী না হয়,—ধরুন, যদি কেউ না কেনে?

—তাহলে ছবিখানাই আপনি নেবেন, সেইটুকুই আপনার লাভ।

—আর আপনার লভ্যাংশ বুঝি—শুধু যশ?

—লাভ-লোকসান যদি খতান—তা'হলে হয়ত গভীর অপযশ!

—সে আপনি বুঝবেন। আমরা হচ্ছি সুখের কপোতী, নিন্দা-অপযশের ধার ধারি না।—তা'হলে কি ভাবে আমার ছবি নিতে চান?

—প্রত্যহ আপনাকে নিয়মিত বসিয়ে সিটিং নেওয়া ত সম্ভবপর হবে না, তাই মনে করেছি, একদিন আপনাকে কষ্ট দিয়ে আমার নিজস্ব পরিকল্পনায় একখানা ফটো তুলে তাকেই আমার সাবজেক্ট করব।

—অর্থাৎ দুধের সাধটুকু ঘোলেই মেটাতে চান! তাহলে ছবি তুলবেন কখন?

—আজ বৈকালে ঠিক চারটেয়।

—এই ঘরেই?

—না,—নিচে—আমার ষ্টুডিওতে।

—অসম্ভব। বেলা ঠিক তিনটেয় যে আমার আবার এনগেজমেণ্ট আছে কালীঘাটে। সেখানে আধ ঘণ্টা থাকতে হবে। দুটো গান গেয়ে তবে ছুটি।

—বেশ ত, ছুটি পেলেই চলে আসবেন; পনেরো মিনিটও লাগবে না।

—ট্যাক্সি-ভাড়া ত লাগবে?

—নিশ্চয়ই, তার ভাড়া আমি এখনই আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি।

ঘরের আলনায় নরেনের সার্টটি ঝুলিতেছিল। পকেট হইতে পাঁচ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া মালার হাতে দিল। নোটখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মালা হর্ষোৎফুল্ল মুখে প্রশ্ন করিল: ভাল কথা, কি কাপড় পরে আসব?

—আপনার যা খুসী, অবশ্য সিটিং যখন দেবেন, তখন কাপড় জামা আপনাকে বদলাতে হবে। সে-সব এনে রাখব।

—ও-সবের ব্যবসাও আপনার আছে না কি?

—আমার নেই, তবে যাদের কাজ-কর্ম্ম করি তাদের আছে। সাউথ ষ্টোরের ছবির কাজ আমাকে করতে হয়। কাপড় আমি সেখান থেকেই আনব। রূপ তোলার মত রূপসজ্জাও শিল্পীর কাজ।

নরেনকে এই মেয়েটি যতটা অপদার্থ ভাবিয়াছিল, তাহার অদ্যকার কথাবার্ত্তায় সে ভাব অনেকটা কাটিয়া গেল, বুঝিল, মানুষটি একেবারে অবহেলার বস্তু নয়, তাহাতে বস্তু কিছু আছেই।

কুকারের ভেপার তখন সশব্দে দালানটিকে গুলজার করিয়া তুলিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই কলকণ্ঠে মালা কহিল: এখানে আবার এ কি কাণ্ড!

দরজার সম্মুখে আসিয়া নরেন কহিল: ইকৃ-মিক্-কুকার, শিল্পীর জন্ম রন্ধন করছে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি,—কিন্তু একলাই খাবেন?

—বেশ ত, আপনিও লেগে পড়ুন। আনাড়ী আমি, তাহলে ত বেঁচে যাই।

—রক্ষা করুন মশাই, রন্ধনকার্য্যে আমি আবার আপনার চেয়েও বেশী আনাড়ী,—বাঁধুনীর ওপর এ ভার দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত, আমি এবং আমার 'মাদার', দুজনেই।

—পুরুষদের পক্ষে এটা খুবই চিন্তার কথা, কেন না—রান্নাটাই মেয়েদের উঁচুদরের কলাবিদ্যা।

—ও! ভালগার!—আপনি দেখছি এখনো সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরীতে পিছিয়ে আছেন, তাই আপনার এই পচা অর্থোডক্স মনোবৃত্তি, ছি!

যেমন উদ্দাম বায়ুর মত সে ঘরটির ভিতর ঢুকিয়াছিল, তেমনই ক্ষিপ্র ভাবেই দালান হইতে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল! নরেন এই পেগলভা মেয়েটির সপ্রতিভ চঞ্চল গতির দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া—ভোজনের উদ্দেশে কুকার লইয়া পড়িল।

৬

ঠিক এই সময় বাড়ীর দরজার সম্মুখে একখানা ট্যাক্সী আসিয়া থামিল। মালা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিল, পাশের বাড়ীর নূতন ভাড়াটিয়া অবিনাশ সরকার ট্যাক্সী হইতে নামিতেছে। তাহার হাতে একটি চমৎকার ফুলের তোড়া। প্রবেশ-পথে মালার সহিত চোখাচোখি হইবা মাত্র সরকার সাহেব সাহেবী কায়দায় টুপি খুলিয়া মাথাটি ঈষৎ নত করিয়া শিষ্টতার পরিচয় দিল, মালাও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত দুটি তুলিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল: আপনিই বুঝি এ-সাইডটা ভাড়া নিয়েছেন?

অভিনেতার ভঙ্গিতে অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করিয়া সরকার সাহেব জানাইল: আপনাদেরই আশ্রিত হয়ে ধন্য হয়েছি। আপনিই বোধ হয় মিস্ রায়। আপনার গানের খ্যাতি শুনে আসছি অনেক দিন থেকেই; কিন্তু চাক্ষুষ দেখছি এই প্রথম। অবশ্য কাল এসেই জানতে পারি—আপনি এই হাউসেরই আদার সাইডে থাকেন।

—এই আশ্চর্য্য খবরটুকু কে আপনাকে জানিয়েছিলেন?

—আপনার মা। বলতে পারি না—শুনে আপনার হিংসে হবে কি না—এরই মধ্যে তিনি আমারও মা হয়ে গিয়েছেন।

—How interestin_! কিন্তু এ-ইতিহাস এ পর্য্যন্ত আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

—সম্ভবতঃ তিনি অবকাশ পাননি আপনাকে শোনাতে। আপনিও তখন প্রেজেণ্ট ছিলেন না।

—বিকালের দিকে কোন দিনই আমার বাড়ীতে প্রেজেণ্ট থাকবার জো নেই। কাল ছিল তিনটে এনগেজমেণ্ট। বলেন কেন!

—আপনার মা আমাকে সে-সব বলেছিলেন। অনেক কথাই হয় তাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধে; সে-সব শুনে আপনার ওপর শ্রদ্ধা আমার আশ্চর্য্য রকম বেড়ে গিয়েছে।

—মা'র কাণ্ড ঐ রকম। আমাকে বাড়াতে পারলে আর কিছুই চান না।

—তিনি বাড়িয়ে বলেননি কিছু! আপনার কথা আমি এখানে আসবার আগেই শুনেছি।

—আমিও শুনেছি, নানা রকমের ব্রেকফাস্ট স্ট্যাণ্ডস্ টৈরী করে রাখা আর সাপ্লাই করা না কি আপনার কারবার।—ময়রা যেমন করে খাবার সাজিয়ে রাখে—নয় কি?

—যা শুনেছেন, মিছে নয়; তবে ময়রার খাবার খেলেই ফুরিয়ে যায়—আমাদের খাবারগুলো প্রাণবন্ত, জীবন্ত—জীবনকে বসিয়ে দেয়, মাতিয়ে তোলে। যাবেন আজ বিকেলে গোটা কতক নমুনা দেখতে… অনেক নামজাদা বড় বড় অফিসার আসবেন আজ দেখতে।

—আপনি যে রকম বর্ণনা করলেন, তাতে দেখবার কৌতূহল হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে কি না আজ

আবার বিকেলে এনগেজমেণ্ট আছে অনেকগুলো। তাই ভাবছি, কি করা যায়।

—সেগুলোকে আজ পিছিয়ে দেওয়া যায় না? মাপ করবেন, আজকে আপনাকে এ-ভাবে 'ইনভাইট' করবার বিশেষ কারণ এই যে, বেলজিয়াম থেকে এক-জোড়া 'বিউটি' বেরিয়েছিল ইণ্ডিয়া টুর করতে; বোধ হয় কাগজে পড়ে থাকবেন; তারাই আজ অ্যাপিয়ার হবে ক্যালকাটায় এই ফার্ষ্ট—আমার য়্যামিউজমেণ্টস হলে তাদের নাচ সত্যই দেখবার জিনিস—আপনি 'ডিপলী এন্‌জয়' করতে পারবেন এবং খুসী হবেন। তা ছাড়া আরও অনেক-কিছু আছে।

বেলজিয়ামের 'বিউটি'দের কথায় মালার মন নাচিয়া উঠিল এবং ভাহার আবর্ত্তে পড়িয়া কালীঘাটের গানের এনগেজমেণ্ট ও লেকে নরেনকে সিটিং দিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সব গেল তলাইয়া। বেচারী শিল্পীর নিকট হইতে এইমাত্র যে পাঁচটি টাকা ট্যাক্সী-ভাড়া বাবদ লইয়াছে, সে সম্বন্ধেও কোন অনুভূতিই তাহার চিত্তে বিক্ষোভ তুলিল না।

সলজ্জ মৃদু হাসিয়া মালা কহিল: আপনি যখন এমন করে আমাকে 'রিকোয়েষ্ট' করছেন, তখন অসুবিধা হলেও—আজকের এনগেজমেণ্টগুলো 'ক্যানসেল' করা ভিন্ন আর উপায় কি! বেশ, তাই হবে; আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, মিষ্টার সরকার!

মাথা নত করিয়া সরকার সাহেব সহর্ষে কহিল: ধন্যবাদ। আমিও আপ্যায়িত হলাম। তাহলে আপনি প্রস্তুত থাকবেন, ঠিক চারটের সময় আমার 'কার' আসবে—আমরা একসঙ্গেই যাব।

সহাস্য ভঙ্গিতে সম্মতি জানাইয়া মালা সরকার সাহেবের হাতের সুন্দর তোড়াটির দিকে কটাক্ষপাত করিয়া প্রশ্ন করিল: ওটি সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে, —নিউ মার্কেট থেকে নিশ্চয়ই?

সরকার সাহেবের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ফুলের তোড়াটির উপর তাহার নব-পরিচিতা বান্ধবীর লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। তৎক্ষণাৎ সে সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল: গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়েছিলাম এক মেজর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করতে; তিনি এটি প্রেজেণ্ট করেছেন। এখন আপনি যদি অনুগ্রহ করে গ্রহণ করেন, তাহলে আমি কৃতার্থ হই।

অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই সরকার সাহেব হাতের সুন্দর তোড়াটি মালার করকমলে সাহেবী কায়দায় সমর্পণ করিল এবং মালার আরক্ত মুখখানি হইতে মৃদু স্বর বাহির হইল: থ্যাঙ্কস্।

৭

নিচের তলার ষ্টুডিওটি আজ পরিপাটীরূপে সাজাইয়া নরেন মালার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মেঝেয় বিছানো গ্রীণ রঙের পুরু সতরঞ্চির উপর বেতের একখানি সুশ্রী টেবিল পড়িয়াছে, তাহার দুই দিকে সামনাসামনি দুইখানি অনুরূপ চেয়ার। নিকটে কালো রঙের ঘেরাটোপ পরিয়া দামী ক্যামেরাটি অবগুণ্ঠনবতী বধূর মত দাঁড়াইয়া আছে। টেবিলের উপর ইজেল ও চিত্রাঙ্কনের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সাজানো। পাশের ঘরখানির দরজার উপর পরদা ফেলা হইয়াছে। উদ্দেশ্য, এই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার আজিকার 'মডেল' শ্রীমতী মালা বেশ-পরিবর্ত্তন ও প্রসাধন-পর্ব্ব সারিয়া লইবে। সেখানেও বেতের একটি ক্ষুদ্র টিপয় স্থান পাইয়াছে। তাহাতে সাজানো আছে ছোট একখানি আয়না, চিরুণী ব্রাস এবং কয়েকটি সেফটিপিন্। নিকটের এক পরিচিত প্রসাধনাগার হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য এগুলি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। দোকানের লোকই দ্রব্যগুলি আনিয়া নরেনের নির্দ্দেশ মত সাজাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর পুনরায় আসিয়া তুলিয়া লইয়া যাইবে।

ভবিষ্যতের চিন্তা এই তরুণ শিল্পীর আয়ুপুঞ্জে কোন দিন জট পাকাইবার ফুরসদ পায় নাই সত্য, কিন্তু আজ বুঝি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। ছবি তোলা হইয়া গেলে ঘণ্টাখানেক এই স্থানে বসিয়া মালার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিবার পরিকল্পনা একটা স্থির করিয়াই সে দোকানের ভৃত্যকে সন্ধ্যার পর সরঞ্জামগুলি লইয়া যাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছিল।

নরেনের ধারণা, দরিদ্র বলিয়া মালা তাহাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে। কিন্তু আজ সে এই প্রগতিশীলা মেয়েটিকে দেখাইয়া দিবে যে, দরিদ্র হইলেও রুচির সহিত তাহার শিল্পি-মনের কিরূপ নিবিড়তম পরিচয় রহিয়াছে! মালার প্রকৃতি বুঝিয়াই সে এখানে এতটা আড়ম্বর করিয়া ফেলিয়াছিল। নতুবা কোন মডেলের ছবি আঁকিতে কিম্বা ফটো তুলিতে এত সাজ-সরঞ্জামের কোন প্রয়োজনই হয় না এবং এ গুলির অভাবে তাহাদের কোন অসুবিধাও ঘটে না।

ক্যামেরাটি যথাস্থানে রাখিয়া বেতের কেদারা-খানিতে বসিয়া মালার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে নরেন। সম্মুখে টেবিলের উপর আধুনিক ডিজাইনের একখানি মেঘবর্ণ রেশমী শাড়ী ও অনুরূপ ব্লাউজ ভাঁজ-খোলা অবস্থায় রহিয়াছে; মালা আসিয়াই সেই শাড়ী

ও ব্লাউজ লইয়া স্ক্রীনের ভিতর ঢুকিবে। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলে, যে খুঁতটুকু থাকিবে নরেন তাহা ঠিক করিয়া দিবে। এমন কি, মাথার আগা সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হইয়া সে ব্লকের দরজা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু যাহার ছবি লইবার এবং সেই সূত্রে শিল্পি-মনের রুচিবিলাস দেখাইবার এত আয়োজন ও আকুল প্রতীক্ষা, চারটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিট হইয়া গেল, তথাপি তাহার দেখা নাই। নরেনের দুই চক্ষু হাতের ঘড়ী এবং বার দুটি বাড়ীর সামনে পাকা রাস্তাটির উপর পর্য্যায়ক্রমে ফিরিতেছিল। মোটরের হর্ণ শুনিবা মাত্র সে সচকিত হইয়া উঠে, কিন্তু যখন বুঝিতে পারে যে, মোটরের গতি হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া পূর্ণ-গতিতেই চলিয়া গেল—তখন প্রতীক্ষমাণ শিল্পীর উৎসাহ যেন শিথিল হইয়া পড়ে।

এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটিল,—হাতঘড়ীর কাঁটাটি নিষ্ঠুরের মত সাড়ে চারের কোঠাও পার হইয়া গেল। এবার নরেনের ধৈর্য্যের বাঁধন এলাইয়া পড়িল, বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতার সুরে আপন মনেই সে বলিয়া উঠিল: এল না সে,—হোপলেস্!

সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ যেন তাহার অবসন্ন হইয়া পড়িল, মাথাটি টেবিলের দিকে ঝুঁকিয়া আসিল। নানা স্থানে ছুটোছুটি করিয়া ছবি তুলিবার এই উদ্যোগ-পর্ব্বটি শেষ করিতে বেচারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আশাভঙ্গজনিত এই খর দুঃখ মনস্তাপ। টেবিলের উপর ডান হাতখানি পাতিয়া, তাহার উপর অবনত মুখখানি নামাইয়া মুদ্রিত নেত্রে মনে মনে সে প্রশ্ন করিল—এখন কি করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মিলিল—দোকান-দারের লোক লটবহরগুলি লইতে না আসা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা না করিয়া উপায় নাই।

তাহার চোখ দুটি কিছু অবসাদে একটু জড়াইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সামনের চেয়ারখানা হঠাৎ ক্যাঁচ-ক্যাচ শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠায় তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল এবং সবেগে সোজা হইয়া বসিতেই সামনের দৃশ্যটি তাহাকে একেবারে অবাক্ করিয়া দিল।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে দেখিল, টেবিলের অপর পার্শ্বে ঠিক তাহার সম্মুখে যে চেয়ারখানি মডেলের জন্য পাতা আছে, তাহা দখল করিয়া বসিয়াছে এক পাগড়ীওয়ালা তরুণ পরদেশী। বিচিত্র তাহার পরিচ্ছদ; পরনে খাকী হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা ময়লা বণ্ডীন জামা, তাহার ছাঁটকাটও অদ্ভুত, গলাবন্ধের আকারে নীল রঙের একখণ্ড রেশমী বস্ত্র পিনবদ্ধ হইয়া কণ্ঠ হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত আবৃত। মাথায় গেরুয়া রঙের এক অতিকায় পাগড়ী—তাহার প্রাচুর্য্যে আগন্তুকের মুখেরও কিয়দংশ ঢাকা পড়িয়াছে। এইরূপ বিসদৃশ পরিচ্ছদের ভিতর দিয়া এই অজাতশ্মশ্রু তরুণ আগন্তুকের স্বাস্থ্যপুষ্ট নিটোল দেহটির এমন এক অপূর্ব্ব লাবণ্য বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যাহার বৈশিষ্ট্যময় সৌন্দর্য্য, রূপান্বেষী শিল্পীকে ক্ষণকালের জন্য তন্ময় করিয়া ফেলিল।

সে ভাব কাটিতেই নরেন রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করিল: তুম কোন্ হায়?

অসঙ্কোচ ভঙ্গে আগন্তুক উত্তর দিল: ম্যয় ইন্সান হুঁ।

মনে মনে হিন্দী তরজমা করিতে করিতে নরেনের বিরক্তির ঝাঁঝ কমিয়া আসিল। পুনরায় প্রশ্ন করিল: তুম হামরা কিধার কেঁও আয়া?

আগন্তুক কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইল না, বরং এই বাঙ্গালী ছেলেটির মুখে এই ভাবে হিন্দী শুনিয়া মুখের হাসি চাপিয়া সেও সমান সুরে প্রশ্ন করিল: আপ হ্যায়। পূর্ণ ভগবান তোরব কেঁও আয়ে?

তরুণ পরদেশীর এই স্পর্দ্ধিত আচরণ এবং দৃঢ় স্বরে এরূপ প্রশ্ন আপত্তিকর বুঝিয়াও তাহার বলিবার ভঙ্গি নরেনকে এরূপ মুগ্ধ করিল যে, সে তাহার উত্তর না দিয়া পারিল না; কহিল: হাম লিয়া ফটো উতারনে আয়া।

—হাঁ, আপ লোগ্ উতারতে হেঁ,—তো হমারী এক উতার দীজিয়ে না?

এই দফা হিন্দী বলিয়া বেচারা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল; নরেন কি উত্তর দিবে ভাবিতেছে, এমন সময় টেবিলের উপর রক্ষিত শাড়ী ব্লাউজের উপর আগন্তুকের দৃষ্টি পড়িল, অমনি সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল: আরে, ইয়ে শাড়ী কিসকা হ্যায়? শাড়ীওয়ালী কিধর গয়া?

পরক্ষণেই সে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া একান্ত আগ্রহ সহকারে শাড়ীর উপরে হাতখানি রাখিতেই নরেন রুখিয়া শাড়ীখানা টানিয়া লইয়া কহিল: নেহি—নেহি, ইসমে হাত দেও মৎ। ই শাড়ী এক লেড়কী কো ওয়াস্তে হ্যায়, হাম, হাম উসিকো ফোটো খিঁচ লেগা, যব সে হিঁয়া আ কর এই শাড়ী পিনেগা।

বিড়াল যেমন সতর্কিত ভাবে অসতর্কের হাত হইতে ভক্ষ্য-বস্তু ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লয়, সেই ভাবে সহসা শাড়ীখানা বিস্ময়াভিভূত নরেনের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া আগন্তুক তাহার বৃহৎ পাগড়ী সমেত মাথাটি নাড়িয়া কহিল: হাম পহনে তো কেয়া হর্জ?

শিল্পীর এবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, দুই চক্ষু পাকাইয়া,

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল: তোমার ত ভারী আস্পর্দ্ধা হ্যায়,—জবরদস্তি করনে আয়া তোমার ছোড় দেও হামারা চীজ, নাহি ছোড়েগা—

আগন্তুকও তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। নরেনের কথায় কিছুমাত্র ত্রস্ত না হইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই সে কহিল: জী হাঁ, পহননে তো দো, হাম ওহী লেড়কী তো জাতী হৈ।—পরক্ষণেই পরদাঘেরা স্থানটি তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেই সে দিব্য মেয়েলী সুরে পরিষ্কার বাঙলায় কহিল: ওমা, গ্রীণরুমের ব্যবস্থাও রয়েছে দেখছি; তবে আর ভাবনা কি! বেশটা তাহলে ঐখানেই ছাড়ানো যাক।

শিল্পী অবাক্! এত বড় পাগড়ীধারী জবরদস্ত উর্দ্দুভাষী পরদেশীর মুখে এমন সুন্দর বাঙলা? কথাগুলিও কি চমৎকার, কেমন মধুর! তাহার মুখের রাগ মুখেই মিলাইয়া গেল, কৌতূহলের সুরে জিজ্ঞাসা করিল: তুমি বাঙলা জান?

—বাঙলা না জানলে বাঙলা বলতে পারি?

—তুমি খোট্টা, না বাঙালী?

—এতদিন খোট্টাই ছিলুম, কিন্তু বাঙলা দেশে বাঙলা মায়ের কোলে এসে আজ আবার বাঙালী হ'তে সাধ হয়েছে।

—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আপনার বোধশক্তি খুব উঁচুদরের নয় বলেই আমি আপনাকে এত শীঘ্র বিশ্বাস করতে পেরেছি, আর এই জন্য নির্ভয়ে আপনার কাছেই আজ এই প্রথম ধরা দিচ্ছি। মানুষ আমি এই বয়সে অনেক দেখেছি, এক নজরেই মানুষ চেনার যে শক্তি ভগবান আমাকে দিয়েছেন তাতেই আমার ধারণা হয়েছে, আপনার কাছ থেকে আমার কোনও ক্ষতি হবার ভয় ত নেই, বরং উপকার প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

কথাগুলি এমন মিষ্ট ও সহজ করিয়া সে বলিল যে, নরেন বিমূঢ় না হইয়া পারিল না। অনুরূপ স্বরে নরেনও কহিল: সে ভরসা যদি তোমার থাকে, তাহলে আমাকে সন্দেহের মধ্যে না রেখে তোমার যা বলবার, স্বচ্ছন্দে জানাতে পার।

আগন্তুক বলিল: বুঝেছি, এই বিশ্রী পোষাকটি আপনার চোখে পীড়া দিচ্ছে। আর, আমিও ব্যস্ত হয়ে উঠেছি এটা ছাড়বার জন্যে। কেন জানেন—এটা হচ্ছে আমার ছদ্মবেশ।

—ছদ্মবেশ!

—হ্যাঁ, আমি একটা 'গ্যাঙে'র সংস্রবে ছিলুম। দলের সবাই ধরা পড়েছে, আমি একাই অ্যাবস্কণ্ডেড্ টু হইড! সরে পড়েছি তাদের চোখে ধুলো দিয়ে, বুঝতে পারছেন ত আমার অবস্থা। আমি শুধু সখের ছদ্মবেশী নই, পলাতক ছদ্মবেশী।

কি সর্ব্বনাশ! কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে একেবারে বিষধর সাপ! একে ছদ্মবেশী, তাহার উপর কি না পলাতক—ফেরারী আসামী! কথার মধ্যে আবার ইংরাজী বুকনী ছাড়ে! কি কুক্ষণেই মালার সহিত আজ সে এনগেজমেণ্ট করিয়াছিল, তাহার জন্যই ত এই দুর্ভোগ! কিন্তু ইতিমধ্যেই ছেলেটির সুন্দর আকৃতি, কথা বলিবার ভঙ্গি, সারল্য এবং সাহস নরেনের শিল্পি-মনটিকে এরূপ অভিভূত করিয়াছে যে, তাহার মুখে শেষের সাংঘাতিক কথাগুলি শুনিয়াও সে কঠিন হইতে পারিল না, বরং মুখখানা তুলিয়া প্রশ্ন করিল: যারা তোমাকে ধরতে আসছে তারা কে—পুলিশ না কি?

দিব্য সপ্রতিভ কণ্ঠে উৎসাহের সুরে ছদ্মবেশী বলিল: যারা আমাকে এ্যাদ্দিন ধরে রেখেছিল তারা—তাদের সঙ্গে পুলিশ ত আছেই, যে-সে পুলিশ নয়—জঙ্গী পুলিশ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত ছদ্মবেশীর আপাদমস্তক আর একবার দেখিয়া লইয়া নরেন কহিল: অথচ তোমাকে দেখছি বিলক্ষণ নিশ্চিন্ত, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই!

ছদ্মবেশী এবার সহাস্যে উত্তর করিল: এ-সব ব্যাপারে ঘাবড়ালেই মুস্কিল, মাথা খেলিয়ে পা ফেলতে হয়। পালাবার সময় কিন্তু ঠিক এই পোষাক আমার ছিল না। তখন পরেছিলুম অন্য রকম পোষাক।

—কিন্তু ওরা যদি কোনো রকমে এখানেই এসে পড়ে?

—আসা আশ্চর্য্য নয় মোটেই,—কিন্তু তার আগেই এ খোলসও আমাকে বদলাতে হবে। আসন্ন বিপদের মুখ থেকে বিপন্নকে রক্ষা করবার ক্ষমতা রয়েছে এইখানেই আপনার হাতে। আপনি যে তা বুঝতে পারেন নি, এমন বোধ হয় না।

—তোমার মতলবটি বুঝতে পেরেছি! এখানে এসেই এই সব তোড়জোড় দেখে আমাকে দেখেই নিজের মুক্তির পথ স্থির করে ফেলেছ—ওদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে। এখন বাইরের দরজাটি—

—আপনি খুলে রাখলেও আমি ঢুকেই বন্ধ করে দিয়েছি। এখন শুনুন, যারা আমাকে তাড়া করেছে, আর আমি তাদের লক্ষ্য থেকে নিজেকে লুকাতে ব্যগ্র, এই সংবাদটুকুর উপর নির্ভর করে এখানেই আপনি আমার বিচার করতে ব্যস্ত হবেন না যেন! কেন আমি এই অবস্থায় এসে পড়েছি—আমার পিছনে কেনই বা ওরা ছুটেছে, তার পিছনের

বৃত্তান্তটুকু জানবার সমস্ত কৌতূহল যদি আপনি দমন করতে পারেন, তা' হলেই আমাকে আশ্রয় দিন। অন্যথায় আমাকে নিষ্কৃতির অন্য উপায় দেখতে হবে।

—দেখ, কৌতূহলকে আমি বড় একটা প্রশ্রয় দিই না। আর, দুঃসাহসী বলে আমার সুখ্যাতি না থাকলেও দুঃখ বা বিপদকে খুব ভীতির চক্ষে দেখি— এমন অপবাদ আমার শত্রুরাও দেবে না। তোমার সম্বন্ধে নিজের মনেই আমি স্থির করেছি যে, তোমাকে সাহায্য করা উচিত এবং তার জন্য ভগবান আমাকেই উপলক্ষ করেছেন। বেশ, ঐ পর্দ্দাটি তুলে ভিতরে যাও, কাপড়-জামা ত আগেই গুছিয়ে নিয়েছ, তাড়াতাড়ি এখন ড্রেসটা বদলে এসো, আমি ক্যামেরা ঠিক করছি। আমার পক্ষ থেকে তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই, এবং কোন প্রশ্নই আমার তরফ থেকে তোমার সম্বন্ধে উঠবে না, জেনো।

—ধন্যবাদ।

পর্দ্দাটি তুলিয়া সে ভিতরে অদৃশ্য হইল। নরেনের মনে অনেক চিন্তা উঠিয়া সংশয়ের দোলা দিতে লাগিল। এ কি অদ্ভুত ছেলে, এতটুকু ভয়-ডর ওর মনে নেই। একেবারে বেপরোয়া। কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে কে জানে! ভাল কথা—এনার্কিষ্ট নয় ত? আজকাল এই বয়সের ছেলেরাও রিভলবার লইয়া…নরেনের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মাথা তাহার ঘুরিয়া গেল। তাহার মনে হইল, গৃহটি যেন বহু জনে ভরিয়া গিয়াছে, লাল পাগড়ীধারী এক দল পুলিশ প্রহরী তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং এই পল্লীর সমস্ত লোক বাড়ীতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহার নিগ্রহ দেখিতেছে।

—আমি ত রেডী, কিন্তু আপনি দেখছি ঠায় ঠিক তেমনি বসে!

চিন্তার জাল সহসা ছিন্ন হইতেই সচকিতে সোজা হইয়া বসিয়া নরেন যাহা দেখিল, তাহাতে সমস্ত দুশ্চিন্তা তাহার সেই মুহূর্ত্তেই লুপ্ত হইয়া গেল। এ কি অপূর্ব্ব মনোমোহিনী মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে! কে বলিবে কয়েক মিনিট পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিই প্যান্ট-পাঞ্জাবীর আবরণে তাহাকে সমস্যায় ফেলিয়াছিল। ক্ষণকালের মধ্যে এ কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! অগ্নিশিখার মত তাহার প্রখর রূপ যেন জ্বলিতেছে, সদ্য ফুটন্ত গোলাপের মত অপরূপ মুখখানি যেন হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেছে। অতিশয় সুশ্রী ভুরু দুটি যেন কোন দক্ষ শিল্পী নিপুণ তুলিকায় গাঢ় কালি দিয়া আঁকিয়া দিয়াছে। দীর্ঘায়ত দুই চক্ষুর প্রভাও অতুলনীয়! পরিধেয় বস্ত্রখানির অঞ্চলটি পিঠের উপর দিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে,— অমার্জ্জিত রুক্ষ কুন্তলগুলি মুখের দুই পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া আগুল্ফ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হাতের গাছ-কয়েক সুশ্রী চুড়ি, গলায় একগাছা সরু হার দুলিতেছে। অন্য অলঙ্কারের বাহুল্য নাই। এই সাধারণ সজ্জায় কি চমৎকার তাহাকে মানাইয়াছে,—দাঁড়াইবার ভঙ্গিটুকুও কি সুন্দর।

শিল্প-বিদ্যালয়ের বার্ষিকোৎসবে ছাত্রসমাজে নাট্যাভিনয়ে ব্রতী হইলে নরেন স্বহস্তে নারী-ভূমিকার অভিনেতৃ ছাত্রগণকে এমন নিপুণ ভাবে সাজাইয়া দিত যে, অপরূপ রূপসজ্জার উৎকর্ষে তাহাদিগকে নারী বলিয়া ভ্রম হইত। কিন্তু আজ এই ছদ্মবেশী বালকটিকে অল্প সময়ের মধ্যে নিজের চেষ্টায় এমন নিখুঁত ভাবে আধুনিকা তরুণী সাজিয়া বাহির হইতে দেখিয়া সে চমৎকৃত হইল।

অপর কেহ হইলে নির্নিমেষ নেত্রে দীর্ঘকাল হয়ত এই অপূর্ব্ব রূপের দিকে চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু নরেন সত্যকারের শিল্পী, তাহার 'মডেল'টির অতুলনীয় রূপ-ভঙ্গি আদর্শ গ্রহণের এই অপ্রত্যাশিত ক্ষণটি সে পরিহার করিতে পারিল না, হঠাৎ স্বাপ্নভঙ্গের মত সচকিত হইয়া হাতের কাজ রাখিতে রাখিতে সে হাঁকিল: ঠিক অমনি দাঁড়িয়ে থাক, যেমন আছ।

নরেনের দুই চক্ষু তখন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—ইণ্টার ন্যাশানাল পিক্চার একজিবিশনের চিত্র-প্রতিযোগিতার উন্মাদনাময় বিজ্ঞপ্তির স্মৃতি তাহাকে উত্তেজিত করিয়া দিল—এই আশ্চর্য্য ছদ্মবেশীর রূপাভিনয়, চমৎকার রূপসজ্জা এবং দাঁড়াইবার অপূর্ব্ব ভঙ্গি। এই অপরূপ আদর্শ তুলিবার জন্য সে বুঝি সর্বশক্তি নিয়োগ করিল।

ঘণ্টার কাজটুকু সারা হইতেই কতকটা আশ্বস্ত হইয়া নরেন কহিল: আমার কাজ হয়ে গেছে। আশ্চর্য্য, সেই এক ঘণ্টা তুমি ঠায় ঠিক দাঁড়িয়ে আছ? এমন তুমি থাকতে পার।

ছদ্মবেশী মৃদু স্বরে মুখে হাসির একটু রেখা ফুটিয়ে বলল: প্রয়োজন হলে এখন থেকে সারা রাত আমি এই একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

নরেন সবিস্ময়ে বলিল: তোমার কথা আমি বিশ্বাস করছি। যতখানি সময় তুমি এই ভাবে দাঁড়িয়েছিলে, এটাও বড় কম কথা নয়। এর জন্যই আমার আঁকার কাজ সার্থক হয়েছে। অথচ, এই কাজটুকুর জন্যে এক জনের আশায় কি দুশ্চিন্তায় না পড়েছিলাম।

আঁচলটি মাথার উপর তুলিয়া দিয়া অবগুণ্ঠনবতী

হইয়া ছদ্মবেশী এবং তাহার নির্দিষ্ট বেতের চেয়ারটির উপর আস্তে আস্তে বসিল।

এই অপূর্ব্ব মায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া নরেন বলিল: আমি নিশ্চয় হলফ করে বলতে পারি—সে ডাকাতকে ওরা কস্মিন্‌কালেও খুঁজে পাবে না। ওদিক দিয়ে এখন আর কোন ভয় নেই।

নরেনের কথায় ছদ্মবেশী মুখখানা হাসিতে ভরাইয়া কহিল: আমার মনে কিন্তু বড় রকমের একটা আশঙ্কার কথা উঠছে।

অবাক্ হইয়া নরেন জিজ্ঞাসা করিল: সেটা কি?

—যে মেয়েটি ফটো তুলবেন ব'লে এত ঘটা করে সাজ-সরঞ্জাম আর শাড়ী-ব্লাউজ পর্য্যন্ত সাজিয়ে রেখেছিলেন—তিনি যদি এসে পড়েন, আর এই নতুন চীজটিকে দেখে কৈফিয়ৎ চান।—কথাগুলি এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে শিল্পীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

তাহার এই সন্দিগ্ধ স্বর নরেনকে যেন সহসা সঙ্কুচিত করিয়া দিল। সে বুঝিল, ছেলেটি সব দিক দিয়াই অসাধারণ। সংলাপের মধ্যে এক সময় অতর্কিত মুহূর্ত্তে এ প্রকার উদ্যোগ-পর্ব্বের পূর্ব্বাভাসটুকু অতি সংক্ষেপেই তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই অদ্ভুত ছেলেটি যে সঙ্গে সঙ্গেই সেটি মনের মধ্যে টুকিয়া লইয়াছে, তাহা নরেন ভাবে নাই। তাহার এই আশঙ্কাটিও যে অমূলক নয়, এবং ইতিমধ্যে মালা এখানে আসিয়া পড়িলে একটা বিশ্রী পরিস্থিতির যে উদ্ভব হইত, নরেনের চিত্ত তাহাতে সায় না দিয়া পারিল না। কিন্তু সে সম্ভাবনা যে আর নাই—মালার আসিবার সময় অনেক আগেই অতিবাহিত হইয়াছে, এই ধারণাই দৃঢ় হইয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত করিল, এবং সেও দৃঢ় স্বরে জানাইয়া দিল: না, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র শঙ্কিত নই। সে এলেও ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ছদ্মবেশী প্রশ্ন করিল: পারতেন তাঁকে ফেরাতে? বলুন না—সত্যিই পারতেন? এখনও যদি আসেন—ফিরিয়ে দিতে পারবেন আপনি?

নরেনের মনের প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ এবার স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিল, কঠিন কণ্ঠে এবার তাহাকে বলিতে হইল: কেন পারব না? তার সঙ্গে আমার চুক্তি হয়েছিল, ঠিক চারটের সময় এখানে এসে সেটিং দেবে। তাড়াতাড়ি আসবার জন্য আমি টাকা পর্য্যন্ত আগাম দিয়েছি। সে যদি চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে, আমি তাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না কেন?

মৃদু হাসিয়া ছদ্মবেশী উত্তর করিল: এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনার মনের যে পরিচয়টুকু পেয়েছি, তাতে জোর করে বলতে পারি—আপনি অত কঠিন হতে পারেন না। থাক্ গে, এ আশঙ্কা যখন আপনার মনে আমল পেল না, আপনার আশঙ্কাকেও আমি আমল দেব না।

রহস্য ভরে নরেন কহিল: আমার আশঙ্কাকে আমল না দেওয়ার সোজা মানে হচ্ছে তাকে এড়িয়ে যাওয়া; অর্থাৎ, জিনিসগুলোর মালিক আসবার আগেই তাদের শাড়ী-ব্লাউস পরা অবস্থাতেই সরে পড়া—এই ত?

মুখের হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া ছদ্মবেশী উত্তর দিল: নিষ্কৃতির পক্ষে এটা খুব সহজ উপায়ই ছিল, কিন্তু তাহলে যে আপনাকে বিপাকে ফেলা হয়। এত বড় বেইমানীর কাজ ত আমার ধাতে পোষাবে না।

এই সময় একটা দমকা বাতাসে ছদ্মবেশীর মাথার কতগুলি চূর্ণ-কুন্তল মুখমণ্ডলে পড়িয়া তাহার মুখের কথা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুডৌল হাতখানি তুলিয়া চুলগুলি সরাইবার কৌশলটুকু শিল্পীর দৃষ্টিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট করিয়া দিল, যাহা কোন পুরুষের পক্ষে সুলভ নহে। সঙ্গে সঙ্গে সে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল: এ কি হ'ল!—ও-রকম চুল তোমার মাথায় কি করে এল?

হাসিমুখেই ছদ্মবেশী বলিল: চুলে হাত পড়তেই বুঝি চুলগুলি এতক্ষণে নজরে পড়ল? কিন্তু চুল ত আমার সঙ্গেই ছিল।

কণ্ঠে জোর দিয়া নরেন কহিল: কিন্তু ও-চুল ত পরচুল নয়—দিব্যি মাথা থেকে গজিয়েছে দেখছি।

—ঠিকই দেখছেন। কিন্তু পরচুলের কথা তুললেন কেন বলুন ত?

—তুমিই ত বললে সঙ্গে ছিল।

—তাতে কি বুঝালো যে চুলগুলো আমি পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে এনেছিলুম। সঙ্গে ছিল মানে—যথাস্থানে অর্থাৎ মাথায় ছিল—পাগড়ীর ভিতরে।

—পুরুষ মানুষের এত লম্বা চুল হয়?

—কেন হবে না? প্রথম সাক্ষী ত আমি। সামনেই বসে আছি। আরও দু'-চারটে নমুনা দেখাতে পারি। তা-ছাড়া খবরের কাগজে 'চুল-বনাম-চোরে'র খবর পড়েন নি?

—চুল-বনাম-চোর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ভারি মজার খবর। এক ভদ্রলোক সখ করে মাথায় মেয়েদের মতন চুল রেখেছিলেন

বলে স্ত্রী প্রায়ই খোঁটা দিতেন। এখন হয়েছে কি, রাত্তিরে স্বামি-স্ত্রী খাটে শুয়ে পাশাপাশি ঘুমুচ্ছেন, এমন সময় সিঁদ কেটে ঘরে চোর ঢুকে স্ত্রীর গলা থেকে সোনার দামী হার-ছড়াটি খুলে নেবার জন্যে চুপি-চুপি মাথার কাছে এসে বসে। ভদ্রলোক মাথার চুল এলিয়ে শুতেন। চোর সেই চুল স্ত্রীলোকের চুল মনে করে তারই ওপর হাত চালিয়ে গলার হার খুঁজতেই স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাঁর চীৎকারে চোরও ধরা পড়ে। আদালতে বেচারা চোর স্পষ্টই বলে—কে জানত, পুরুষ মানুষ অমন লম্বা চুল রাখে, চুলের জন্যেই আমি ধরা পড়ে গেলুম।—এর পরও কি আপনি বলবেন, লম্বা চুল শুধু মেয়েদেরই একচেটে?

এই সরস প্রসঙ্গ শুনিয়া শিল্পীর মুখেও হাসির রেখা ফুটিল। মৃদু হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল: আর গয়না—এগুলো কোথা থেকে এল?

ছদ্মবেশী অসঙ্কোচেই কথাটির উত্তর দিল: এগুলো অংশুর অঙ্গ থেকেই গজায় নি, সঙ্গেই ছিল। অর্থাৎ শাড়ী যখন মাথায় ওঠে পাগড়ী হয়ে, ঝুটো গয়নাগুলো তখন প্যান্টের পকেটেই সেঁধিয়ে ছিল। সন্দেহ আপনার কাটল, না আরও কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?

গম্ভীর মুখে নরেন কহিল: আমি এখন হাঁপিয়ে উঠেছি, আর কিছু জানতে চাই না, ইচ্ছাও নেই। এখন তোমার কি ইচ্ছা তাই বল।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ছদ্মবেশী কহিল: আমার কি ইচ্ছা সেটা বলবার আগে আপনার কাছ থেকে এই কথাটি শুধু জানতে চাই—আমার অতীত সম্বন্ধে কোন কৌতূহল কি আপনার মনে উঠছে না?

দৃঢ় স্বরে নরেন উত্তর দিল: না। তোমার অতীতকে চাপা দিয়ে বর্ত্তমানকে নিষ্কণ্টক করাই আমার অভিপ্রায়। অর্থাৎ আজকের সঙ্কট মুহূর্ত্তে রক্ষকের যে দায়িত্ব বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছে আমাকে, শেষ পর্য্যন্ত তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীকার করতে আমার পক্ষ থেকে কিছুমাত্র দ্বিধা উঠবে না। অবশ্য তোমাকেও পিছনের পদচিহ্নগুলো সব মুছে ফেলতে হবে।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ছদ্মবেশী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বেতের টেবিলখানির পাশ কাটাইয়া একেবারে নরেনের পাশে আসিয়া স্বরে জোর দিয়া বলিয়া উঠিল: এত বড় কথার পর আর ত ধরা না দিয়ে থাকা যায় না, বিশ্বাস মশাই! বেশ, এখন একবার শিল্পীর দৃষ্টিতে ভাল করে আমাকে দেখুন ত, দেখে কি মনে হয় সেটাও বলুন। অতীতটা আপনার কাছে চেপে রাখলেও বর্ত্তমানের সম্বন্ধে এ-ভাবে আপনাকে আড়ালে রাখতে আমার প্রাণ সত্যি হাঁপিয়ে উঠছে।

কথাগুলি বলিতে বলিতে এমন অপরূপ ভঙ্গিতে গ্রীবাটি তুলিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কমনীয় দেহটি লীলায়িত করিয়া অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সস্মিতাননে সে দাঁড়াইল যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হইবে বুঝি দক্ষ ভাস্কর-শিল্পীর নির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব মর্ম্মরমূর্ত্তি। মন্ত্রমুগ্ধবৎ নরেন সম্মুখের সেই অপরূপ মূর্ত্তির পানে কিছুক্ষণ বদ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল। যে সন্দেহের চাঞ্চল্য তাহার বদ্ধ অন্তরদ্বারে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিয়েছিল, তাহাই কি নির্ঘাত বাস্তব হইয়া তাহাকে হতবুদ্ধি করিয়া দিল! আশ্চর্য্য, তাহার শিল্পি-সুলভ দৃষ্টির আবেদনকে এতক্ষণ সে কোন্ যুক্তিতে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল? মনের যে দুর্ব্বলতা এখন লজ্জার রূপ ধরিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছে, তাহাকে লুকাইয়া রাখিবার স্থান কি কোথাও সে খুঁজিয়া পাইবে?

সুখোত্থিতের মত সোজা হইয়া বসিয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে লজ্জাবিজড়িত স্বরে নরেন বলিল: মনের সন্দেহ যদি আগেই জোর করে প্রকাশ করতুম, তাহলে আপনি এ-ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে আমাকে লজ্জা দিতে পারতেন না। বসুন আপনি।

লীলায়িত ভঙ্গীতেই ছদ্মবেশী তাহার চেয়ারখানিতে বসিল এবং পরক্ষণে মুখখানি তুলিয়া কহিল: আপনার এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই, আমার সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টিতে যে সন্দেহ ফুটে উঠেছিল, সেটা আমার অজানা ছিল না। কিন্তু বলুন ত, সম্বোধনটাকে হঠাৎ উত্তম পুরুষে তুললেন কেন? পরিবর্ত্তন যে-দিক দিয়েই হোক, বয়সের দিক দিয়ে ত কিছু বদলাবনি! তবে?

নরেন ঘামিয়া উঠিয়াছিল, পকেট হইতে রুমালখানি বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিয়া উত্তর দিল: আপনি ত অনেক কিছুই জানেন, তাহলে এ কথাও স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই—সতেরো-আঠারো বছরের কোন ছেলেকে আমরা যে চোখে দেখতে অভ্যস্ত, সেই বয়সের কোন মহিলা আমাদের সংস্রবে এলে অনেকখানি বেশী সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতে আমাদের শিক্ষিত মন যেন বাধ্য এবং দেখেও থাকি। সুতরাং লজ্জা পাওয়াটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

—সে যাই হোক, আমার সম্বন্ধে কিন্তু স্বভাবের এই অভ্যাসটি আপনাকে বদলাতে হবে বিশ্বাস মশাই, নৈলে আমারও লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না। এতক্ষণ যেমন 'তুমি' বলে আলাপ করছিলেন, দয়া করে

সেইটেই বরাবর বজায় রাখতে হবে।—বলিয়াই সে অনুরোধপূর্ণ দৃষ্টিতে নরেনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অনুরোধের ভঙ্গিতে কথাগুলি বলিলেও নরেনের মনে হইল, প্রতি কথাটির মাত্রায় আদেশের সুরটুকু সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটি যেন স্প্রিংয়ের মত তাহার মাথার ভিতর দিয়া খেলিয়া গেল। প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রাঞ্জল কণ্ঠস্বর, বলিষ্ঠ আকৃতি, সুশিষ্ট অথচ সাহসী ভঙ্গি এবং তেজোদৃপ্ত ব্যবহারটি নরেনকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাঙলার মেয়েদের পরনির্ভরতা ও মেয়েলিপনা দেখিয়া দেখিয়া তাহার চোখে অরুচি জন্মিয়াছিল; সহসা নির্ভীক ভাবে আসিয়া সে যেন তাহার চোখের পরদাখানি পালটাইয়া দিল। একটু পরেই যখন প্রয়োজনের তাগিদে বেশ পরিবর্তন করিয়া আসিল, তখনও যেন তাহার কানে কানে কেহ এই বলিয়া গুঞ্জন তুলিয়াছিল—স্বাস্থ্যহারা যে সব মেয়ে শুধু প্রসাধনের চটকে রূপগন্ধে আমোদে। চোখের সামনে বেড়ায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়, এ চেহারা তাদের তুলনায় একেবারে আলাদা। কিন্তু মনের মধ্যে তাহার এই যে একটুখানি মোহের মত জন্মিয়াছিল, যখনই সে ভাবিল, এ ত সত্যই মেয়ে নয়—মেয়ের ছদ্মবেশ পরিয়াছে, তখনই সেটা অদৃশ্য হইয়া যায়। তবে মনের মোহটি সম্পূর্ণ ভাবে তখনও কাটে নাই—এমন কি, চুলের প্রসঙ্গে তাহার মুখে চুরিটা চাপিয়া রাখিবার জন্য বানানো গল্পটি পর্য্যন্ত শুনিয়াও, মনের মধ্যে যখন সন্দেহের এই দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তখন সে নিজের হাতেই মুখোস খুলিয়া শুধু যে ধরা দিয়াছে তাহা নয়—একান্ত অন্তরঙ্গের মত সহজ সরস আচরণের দাবী করিতেছে এবং নরেনও মনে মনে বেশ অনুভব করিয়াছে যে, স্বল্পক্ষণের পরিচয়ে এই রহস্যময়ী অপরিচিতা তাহার মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই তাহার মন সরিতেছে না।

মনের এই অবস্থায় মেয়েটির শেষ কথার উত্তরে দিব্য স্নিগ্ধ স্বরে নরেনকে বলিতে হইল: বেশ, তাই হবে। নিজেকে আর সব দিক দিয়ে গোপন রেখে সম্ভাষণের ওই শব্দটিকে যে প্রাধান্য দিচ্ছ তুমি—তাকেই উপলক্ষ করে শিল্পী তার সাধনা সুরু করবে।

প্রশংস দৃষ্টিতে শিল্পীর সঙ্কল্প-দৃঢ় মুখখানির পানে চাহিয়া মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল: শিল্পীর তাতে লাভ?

দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল নরেন: লুকানো হারানো গোপন-করা কিম্বা চাপা-পড়া বস্তুকে সাধনার আলোকে ফুটিয়া তোলার চেয়ে শিল্পি-জীবনে বড় লাভ আর কি থাকতে পারে?

নরেনের মুখের এই দৃঢ়ভঙ্গি এবং ততোধিক দৃঢ় কণ্ঠস্বর এই দুঃসাহসিকা মেয়েটিকে শুধু যে বিস্ময়ে অবাক্ করিয়া দিল তাহা নহে—তাহার অন্তর্নিহিত রুদ্ধ মর্ম্মদ্বারেও যেন সশব্দে আঘাত হানিয়া আঘাতজনিত বেদনার দুঃসহ জ্বালার চিহ্ন তাহার চোখে মুখে ফুটাইয়া তুলিল। এতক্ষণের মধ্যে তাহার বিহসিত মুখখানি এই প্রথম ভাবাক্রান্ত হইতে দেখা গেল এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ মথিত করিয়া চাপা কণ্ঠের আর্ত্তস্বর শ্বসিয়া বাহির হইল: আমার মনের সন্ধান কি করে আপনি পেলেন, কে আপনাকে দিল? আপনি কি অন্তর্য্যামী?

শান্ত কণ্ঠে শিল্পী উত্তর করিল: আমি শিল্পী, মানুষের মনের রূপ মুখে ফুটিয়ে তোলাই আমার সাধনা।

অশ্রুভাবাক্রান্ত দীর্ঘায়ত দুটি চক্ষু মেলিয়া শিল্পীর পানে চাহিয়া মেয়েটি বলিল: কিন্তু আমি যে অপরিচিতা।

তরুণ-শিল্পীর মুখে ক্ষীণ হাসিটুকু আত্মপ্রত্যয়ের আলোর মত ফুটিয়া উঠিল। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সম্মুখবর্ত্তিনী অপরিচিতার মুখে নিবদ্ধ করিয়া সংযত স্বরে ধীরে ধীরে কহিল: অপরিচিতাকে পরিচিত করেই শিল্পীর আনন্দ।

গাঢ় স্বরে তরুণী বলিয়া উঠিল: আর—উপাদান যোগান দিয়ে শিল্পীর আনন্দকে সার্থক করাই হচ্ছে অপরিচিতার কর্ত্তব্য।

তৃতীয় পর্ব্ব

১

পুলিসী শাসনতন্ত্রের দণ্ডধারীদের অক্ষমতাকে পরিহাস করিতে করিতেই শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রম বা কন্যা-প্রতিষ্ঠানটি উত্তরোত্তর এমনই প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার দিকে সংশয়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার মত দুঃসাহস এ-পর্য্যন্ত কাহারও দেখা যায় নাই। অতীতের সেই স্মরণীয় মহামেলাটির বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের কন্যাগুলি তলাইয়া যাওয়ায় সাময়িক ভাবে যে বিক্ষোভ উঠিয়াছিল, আজ তাহার কোন নিদর্শনই নাই। এ-সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলির কঠোর সমালোচনা শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজকে রীতিমত সন্তপ্ত ও সচকিত করিয়া তুলিলেও, তৎকালের কতিপয় সংখ্যায় কয়েকটি সম্পাদকীয় 'প্যারা'র মধ্যেই সেগুলি নিবদ্ধ হইয়া আছে—অতীতের সেই বেদনাদায়ক স্মৃতি আজ আর কাহাকেও পীড়া দেয় না। একই সময় একসঙ্গে এতগুলি কন্যার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের পিছনে যে কোন অপরাধপ্রবণ পরিকল্পনার সংযোগ থাকিতে পারে এবং ইহাদের উদ্ধারকল্পে অবহিত হওয়া অথবা কর্ত্তৃপক্ষকে প্ররোচিত করা যে একান্ত বিধেয়—যুক্তপ্রদেশের স্বরাজসাধক নেতৃমণ্ডলের স্নায়ুপুঞ্জেও ইহা বেদনার সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই, বন্ধনপীড়িত জাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে আত্ম-প্রাধান্য ও কর্ত্তৃত্ব করায়ত্ত করিতেই তাঁহারা তখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত; অপ্রাপ্তবয়স্কা কতকগুলি নিরুদ্দিষ্টা বালিকার জন্য দেশাত্মবোধের অনুভূতি-প্রবণ মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিবার অবসর তাঁহাদের কোথায়?

কিন্তু বৎসরের পর বৎসর অতীত হইলেও, ডক্টর অধিকারীর তদন্তের দপ্তরটি ঠিকই আছে, নিয়মিত ভাবেই কর্ত্তৃপক্ষের সেরেস্তায় তাঁহার 'কন্‌ফিডেনসিয়াল' শব্দ চিহ্নিত রিপোর্ট উপস্থিত হইয়া থাকে। বর্ষচক্রগুলি ইতিমধ্যে কত বিচিত্র ঘটনা বহন করিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, তৎকালের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয়দের কেহ কেহ বদলী হইয়াছেন, কেহ বা অবসর লইয়াছেন; কিন্তু ডক্টর অধিকারী একই ভাবে এই তদন্ত-তরণীর পুরাতন হালখানি ধরিয়া আছেন; এক কুম্ভমেলার পর আর এক মহামেলার আয়োজনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তথাপি তাঁহার উৎসাহের বন্ধন শিথিল হয় নাই বা হাতের হালখানি ত্যাগ করিয়া তিনিও সরিয়া আসেন নাই।

প্রায় একটি যুগ অর্থাৎ বারো বৎসরের মাথায় তদন্ত-বিভাগের নবাগত কর্ম্মকর্ত্তা বা 'চীফ' কথা-প্রসঙ্গে ডক্টর অধিকারীকে রহস্যচ্ছলে বলেন: আপনার রিপোর্টগুলো দেখছি আমাদের দপ্তরে একটা নূতন রকমের রেকর্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আগাগোড়াই সেগুলো পড়েছি, আর আপনার অধ্যবসায়ের তারিফ করেছি। কিন্তু স্থির করতে পারিনি, হাওয়ার পিছনে এ ভাবে ছুটাছুটি করে শেষ পর্য্যন্ত আপনার কি লভ্য হবে!

ডক্টর অধিকারী উত্তর করেন: নিউইয়র্কে এই ধরণের একটা ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয় সতেরো বছর পরে। সেই নজিরের দিকে চেয়েই আমি চলেছি, এ-পর্য্যন্ত সেই হাল ছাড়িনি। তা ছাড়া, মাকড়সার একটা জালের সন্ধানও পেয়েছি, এখন তার সুতোর পাকগুলো খুলতে পারলেই হয়।

চীফ তখন ধন্যবাদ দিয়া বলেন: সাফল্য লাভ করে এখানেও আপনি যদি ঐ রকম একটা নজির খাড়া করতে পারেন, আমরা খুসীই হব। কিন্তু ডক্টর অধিকারী, এ কথা আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আগামী কয় মাসের মধ্যে ঐ মাকড়সার জালটির সুতোগুলি খোলা যদি সম্ভব না হয়, অগত্যা আপনাকে এ-ব্যাপারে ইস্তফা দিতে হবে। কারণ, বারো বছর পূর্ণ হবার পরও আমরা আর এ কেসটার জের টানব না, নিউইয়র্কের নজিরও মানব না। আপনিও এরই মধ্যে এটা 'ক্লোজ-আপ' করতে সচেষ্ট থাকুন ডক্টর অধিকারী!

অগত্যা অধিকারী সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত বলিতে হয়: তাই হবে। বারো বছরের এলাকার বাইরে যাবার ইচ্ছা আমারও নেই।

২

এলাহাবাদের সেই হাতাওয়ালা সুশ্রী অট্টালিকাটি অতীতের বেদনাদায়ক বিশ্রী স্মৃতিগুলির নিদর্শনরূপে একই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দীর্ঘ দশ বৎসরে বাড়ীখানির বাহ্যিক অঙ্গ-সৌষ্ঠবের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু বাহিরের প্রাঙ্গণটি মরশুমি ফুল, বাহারী পাতা এবং তরি-তরকারীর গাছের প্রাচুর্যে রীতিমত একটি বাগিচায় পরিণত হইয়াছে।

বাহিরের বৃহৎ কামরাখানি অধিকারী সাহেব নিজের প্রয়োজন এবং রুচি অনুসারে এমন ভাবে সাজাইয়া লইয়াছেন যে, গৃহস্বামী হরপ্রসাদের পক্ষেও বর্ত্তমানে সেটি চিনিয়া লওয়া কঠিন হইবে। জোড়া তক্তপোশের উপর আস্তৃত সেই বিস্তীর্ণ ফরাসটির কোন চিহ্নই নাই; ভিতর মহল হইতে মূল্যবান সোফা-কৌচ আসিয়া সে স্থানটি অধিকার করিয়াছে। শতকায় গ্রন্থপূর্ণ একজোড়া বুক-কেস, টেবিলের উপর সাজানো বিবিধ যন্ত্রপাতি এবং দেওয়ালগুলিতে টাঙানো বিভিন্ন দেশীয় বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন বয়সের নরনারীর বিকৃত, বিকৃষ্ট ও বীভৎস ভঙ্গিপূর্ণ আলেখ্যগুলি যেন গৃহাগত আগন্তুকের চোখে আঙুল দিয়া জানাইয়া দিতেছে, গৃহস্বামী যে-সে ডাক্তার নহে—দেওয়ালে দোদুল্যমান ঐ সব ভীতিপ্রদ মানুষগুলি তাহার মনোব্যাধির চিকিৎসা।

হরপ্রসাদ বাবুর আমলে বাহির মহলে অধিকাংশ সময়ই লোকজন আসিত যাইত, সহিস, কোচোয়ান, দারোয়ান, চাকর, খানসামার দল ঘুরিয়া বেড়াইত; বহু রোগীরও নানা সূত্রে সমাগম হইত। এখন কিন্তু সে সব বালাই চুকিয়া গিয়াছে। কোমরে কুকরি বাঁধিয়া সময় সময় যদিও এক গুর্খাকে ফটকে বা বাহিরের আঙিনায় দেখা যায়, কিন্তু আবার তাহাকেই একসঙ্গে চাকর, বেয়ারা, খানসামা, এমন কি, সময় সময় সহিসের কাজ পর্য্যন্ত সারিতে হয়। তখন দেউড়ী রক্ষকহীন অবস্থায় খোলাই পড়িয়া থাকে। কিন্তু অধিকারী সাহেবের দবদবার ব্যাপারটি এমনই জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে, কোন ভিখারীও এ-বাড়ীর দেউড়ীর সামনে দাঁড়াইতে সাহস পায় না। নানা কারণে ব্যয়ের ভার বাড়িয়া যাওয়ায় এখন তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারে অত্যন্ত মিতব্যয়ী হইতে হইয়াছে। হরপ্রসাদ বাবুর গাড়ী-ঘোড়া যদিও অধিকারী সাহেবের বাহ্যিক মর্য্যাদা রক্ষার সহিত প্রচুর সুযোগ-সুবিধা দিতেছে, কিন্তু পুরাতন কোচোয়ান বা সহিসরা বহু পূর্ব্বেই কাজে ইস্তফা দিয়া গিয়াছে। এক অসহায় বৃদ্ধ কোচোয়ান পেট-ভাতায় অধিকারী সাহেবের আস্তাবল ও যানবাহনের ভার লইয়াছে। একাধারেই তাহাকে কোচোয়ান ও সহিসের কাজ করিতে হয়; মধ্যে মধ্যে গুর্খা দারোয়ান সের সিং তাহার হাতের কাজ সারিয়া বৃদ্ধকে সাহায্য করে। তবে উপযুক্ত খাদ্য এবং পরিচর্য্যার অভাবে ঘোড়াটির অকাল-বার্দ্ধক্য বৃদ্ধ কোচোয়ানের পক্ষে 'শাপে বর' স্বরূপ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া দুই শ্রেণীর দুই বৃদ্ধ পরস্পরের প্রতি বিশেষ সহৃদয় ও সহনশীল হওয়াতে বিরক্তি বা অসন্তোষের কোন কারণ ঘটে না।

পুলিস সাহেবের সেরেস্তা হইতে ডাক্তার অধিকারী সরাসরি বাড়ীতেই ফিরিলেন। গাড়ী যখন দেউড়ীর সামনে আসিয়া থামিল, সের সিং খাকী রঙের জঙ্গী পোষাক পরিয়া কোমরে চামড়ার খাপে ভরা কুকরি বাঁধিয়া ফটকে মোতায়েন ছিল। গাড়ী থামিবা মাত্র ক্ষিপ্রগতিতে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া মিলিটারী কায়দায় 'স্যালিউট' করিল।

ডাক্তার অধিকারী প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু ফটক হইতেই লক্ষ্য করিলেন, বাহিরের ঘরে বৈদ্যুতিক পাখাখানি পূর্ণগতিতে ঘুরিতেছে। অমনি তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন: সিং। কেও চল রহী হ্যায়? উস্ কমরেমে কৌন হ্যায়?

সের সিং সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নিবেদন করিল: দুসরা কৈ নহী হুজুর, মাতাজি অকেলী উস কমরেমে হ্যয়।

'আচ্ছা, অব তুম ফটক পর হাজির রহো'।—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই অধিকারী সাহেব সোজা বাহিরের ঘরের দিকে দ্রুতবেগে চলিলেন।

একখানা আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া সোনা একখানা চিঠি পড়িতেছিলেন। চিঠির বিষয়বস্তু তাঁহার মনটিকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, স্বামীর উপস্থিতি পর্যন্ত অনুভব করিতে পারেন নাই। কিন্তু মাথার উপরে প্রবহমান বায়ুর চাপ হঠাৎ স্তব্ধ হওয়ায় চোখ তুলিয়া চাহিতেই অধিকারী সাহেবের সহিত তাঁহার চোখাচোখি হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সোজা হইয়া বসিয়া তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন: আমিও তাই ভাবছিলাম!

মাথার টুপিটা যথাস্থানে রাখিয়া অধিকারী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন : কি ?

সোনা : তুমি এসেছ। আসাটা খুব নিঃশব্দে হলেও স্বভাবটা মাথায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিলে কি না! জানি ত, পাখা ঘুরতে দেখলেই মাথাটাও তোমার ঘুরতে থাকে।

অধিকারী : নভেম্বরের মাঝখানে পাখা কোথাও ঘোরে না : সাহেবদের আফিসে দেখে এলাম, পাখার গায়ে ক্র্যাফট পেপার জড়িয়ে একদম বন্ধ করবার হুকুম হয়েছে।

সোনা : তা হোক, সে হুকুম এখানে চলবে না। সারা সীজনটাই অন্ততঃ আমার মাথার উপরে পাখা ঘুরবেই। এখন মা'র এই চিঠি যে খবর এনেছে, সেটা শুনে মাথা গোলাতে হলে ফুল স্পীডে পাখা চালানো চাই···

অধিকারী : বল কি ?

সোনা : পাখাটা খুলে দিয়ে বসে পড়। তাহলে পড়তে পড়তে মাথাটা আর গরম হয়ে উঠবে না।

অগত্যা অধিকারী সাহেবকে পাখার সুইচটি খুলিয়া দিয়া স্ত্রীর পার্শ্ববর্ত্তী সোফাখানিতে বসিয়া পড়িতে হইল।

সোনা মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল : তোমার সুবিধার জন্যে ব্যাপারটার আগাগোড়া 'এনালাইজ' করে মা এই চিঠি লিখেছেন। এটাকে তাঁর কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে একটা নিখুঁত রিপোর্ট বলেই ধরে নিতে পার। অনেক জানা কথাও তিনি জানিয়েছেন কাজের সুবিধা আর ব্যাপারটার একটা 'লিঙ্ক' বা সামঞ্জস্য রাখবার জন্যে। আমি পড়ব, না তুমি পড়বে ?

মৃদুস্বরে অধিকারী সাহেব কহিলেন : তুমিই পড়, আমি নিবিষ্ট মনে শুনতে থাকি। তাঁর এই রিপোর্টের উপরেই আমাদের সব কিছু নির্ভর করছে!

স্বামীর মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া সোনা হাতের পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন :

স্নেহের সোনা,

যে কঠিন কাজটি সার্থক করবার ভার তোমরা আমার উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিয়েছ, দীর্ঘ এগারোটি বছর ধরে কায়মনঃপ্রাণে তারই সাধনা করেছি ;—আর কটা মাস কাটলেই, বারো বছর পূর্ণ হবে। তোমরা যেমন নিয়মিতভাবে এখানকার খরচ পাঠিয়েছ, আর ওখানে আমার পোষ্যগুলিকে প্রতিপালন করছ, আমিও সেই অনুপাতে বছরে বছরে 'কোয়ার্টারলি' রিপোর্ট পাঠিয়ে জানিয়েছি যে, কাজ ঠিকমত চলছে এবং আমরাও ঠিক আছি। আমি জানি, বারো বছর পূর্ণ হবার আগেই কাজের একটা হেস্ত-নেস্ত করা চাই—মিষ্টার ঘোষকে সমস্ত বুঝিয়ে দিতে হবে। হয়—এস্পার, নয় ত—ওস্পার। তাই আজ অনেক ভেবে চিন্তে এবং আমার পুরানো ফাইলগুলো ঘেঁটেঘুটে সুরু থেকে এ-পর্য্যন্ত যা-কিছু করা গিয়েছে তার একটা হিসাব পাঠাচ্ছি। এটাকে তোমরা আমার কাজের রিপোর্ট বলেই মনে করে তোমাদের কাজে লাগাতে পার।

অধিকারী মনের ডাক্তার হলে কি হবে, ছোটদের মন নিয়ে কোন নাড়া চাড়া ত করে নি—বড়োদের নিয়েই মাথা ঘামিয়েছে। কিন্তু আমাকে প্রাইমারী স্কুলে দীর্ঘকাল মাষ্টারী করতে হয়েছিল, তাতে ছোট ছোট মেয়েদের মনের সঙ্গে ভাল রকম জানাশোনাই হয়ে আছে। সেইজন্যে একটা মেয়েকে তৈরী করবার ব্যাপারে বরাবর নিজের ইচ্ছাটাকেই প্রাধান্য দিতে হয়েছে। অনেক জায়গাতেই অধিকারীর সঙ্গে মতের মিল হয়নি, জোর করে নিজের মতটাকেই বাহাল করে এসেছি। কিন্তু আজ সেটা বিচার করবার সময় এসেছে। এখন বোধ হয় বুঝতে পারবে যে, ভুলের রাস্তায় গিয়ে আমি সব গুলিয়ে ফেলেছি, কিম্বা ঠিক রাস্তাটি ধরে আসল জায়গাটির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

এটা বুঝতে হলে অতীতের পুরানো পাতাগুলো স্মৃতির আলোয় পড়ে নিতে হবে। আট বছরের সেই ছোট্ট মেয়ে রিনিকে মনে কর। মিষ্টার ঘোষের হারানো মেয়ে রেণুকে আমরা অবশ্য কেউ দেখিনি, কিন্তু তার ফটো দেখে আমরা মেনে নিই যে—তার চেহারার সঙ্গে এ মেয়েটির চেহারায় মিল যথেষ্ট আছে। আমিই বলেছিলাম তখন—একেই হুবহু 'রেণু' করে খাড়া করা যেতে পারে, তবে সময় লাগবে। অধিকারীর ইচ্ছা ছিল, তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে ফেলা, অর্থাৎ কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে তোলা। কিন্তু আমি তাতে সায় দিই নি।

মনে আছে বোধ হয়—মাস তিনেক রিনিকে নাড়া চাড়া করেই আমি বলেছিলাম যে, কাজের ধারা ঘুরিয়ে দিতে হবে। প্রথম কাজ হচ্ছে—ওটিদের সঙ্গে রিনির ছাড়াছাড়ি করা। কাজ

কাসিল হবার আগে ওরা যেন কেউ কারো কোন খবর না পায়—তিনটি মাসের মেলামেশার স্মৃতি ভুলে যায়। তারপর রিনিকে এলাহাবাদ থেকে সরাতে হবে। কিন্তু তার আগে মিষ্টার ঘোষের বাড়ী, আর সেখানে যা-কিছু জিনিষ আছে প্রত্যেকটিই তাকে দেখানো চাই। পুরো একটি মাস ঐ বাড়ীতে রিনিকে নিয়ে আমি থাকব, আর জনপ্রাণী সেখানে থাকলে চলবে না। মিষ্টার ঘোষের আমলের জনপ্রাণীও থাকবে না, তবে গুল্প আলোয়ার কেউ থাকে যদি ক্ষতি নেই, বরং তাতে সুবিধাই হবে। আমি এ-যুক্তিও সেই সঙ্গে দিয়েছিলাম যে, অধিকারী যেন ওটিন আর তোমাকে নিয়ে ঐ একটি মাস চেঞ্জের অছিলায় বাইরে কোথায় গিয়ে থাকে। আমার প্রস্তাবটা প্রথমে অধিকারীর মনে ধরেনি। কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে রাজি না হয়েও পারেন। ফলে, সে মিষ্টার ঘোষের লোকজনদের বিদায় দিয়ে তোমাদের নিয়ে লক্ষ্ণৌ চলে যায়, আর আমি রিনিকে নিয়ে চুপি চুপি মিষ্টার ঘোষের বাড়ীতে গিয়ে উঠি।

একটি মাস ধরে ঐ বাড়ীর প্রত্যেক ঘর, ঘরের জিনিষ পত্তর, মিষ্টার ঘোষের মেয়ের হরেক রকম খেলনা, মিষ্টার ঘোষ, তাঁর স্ত্রী ও পরিজনদের ছবিগুলি, বাগানের গাছপালা—প্রত্যেকটি তাকে চিনিয়ে আর আমার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এই ধারণাই তার মনের মধ্যে দৃঢ় করে দিই যে—আসলে রিনি এই বাড়ীরই মেয়ে; মিষ্টার ঘোষের ছবি দেখিয়ে বলতাম—তিনিই তার বাবা, মিসেস ঘোষের ছবি হ'ত মায়ের ছবি, এইভাবে বাড়ীর ছবিগুলির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিই।

কথাগুলো শুনে প্রথমটা সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। হবারই কথা ত। মায়ের কোলে মানুষ হয়েছে, নিজের মায়ের মুখখানা চোখের ওপর সর্ব্বদাই ভাসছে, কি করে তাকে ছেড়ে আর একজনকে মা ব'লে মেনে নেবে? বুঝতে পারছ, তার মনের মধ্যে এই মিথ্যাটাকেই সত্য করে গেঁথে তুলতে কি রকম কড়া হাতে কর্ণিক চালাতে হয়েছিল! তবে একটা মস্ত সুবিধা ছিল যে, রিনি তার বাপকে দেখেনি; যখন সে বছর দুয়েকের মেয়ে, সেই সময় বাপ মারা পড়ে। সেই সুবিধা-টাকেই কাজে লাগিয়ে দেওয়া গেল। রিনি শুনল—মিষ্টার ঘোষই তার বাবা, তিনি বোম্বাই সহরের এক মস্ত সদাগর, সেখানে সে জন্মেছিল। কিন্তু এই বাড়ীতে এসে মাস কয়েক থাকবার পর চোরে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। এখন সে যাকে মা বলে জানে, আসলে সে মা নয়—তাকে সেই সময় থেকে মানুষ করেছে মাত্র। তার মা হচ্ছেন ইনি—যার ছবি এ-বাড়ীতে টাঙানো রয়েছে। এর পর থেকেই রিনির মনে দোলা লাগে। মিসেস ঘোষকে ঠিক মা বলে মেনে নিলেও মিষ্টার ঘোষের সৌম্য আকৃতি তার কোমল মনটি বুঝি জুড়ে বসে। যে কটা দিন ঐ বাড়ীতে ছিল সে, এক দণ্ডও মিষ্টার ঘোষের অয়েল পেইন্টিংখানাকে চোখের আড়াল করতে চাইত না।

এই সময় আমি খবর পাই, রেঙ্গুনের চার্চ্চ মিশন সোসাইটি তাঁদের গার্লস স্কুলের মেয়েদের জন্যে একটি বোর্ডিং খুলছেন। সেখানে বালিকাদের তত্ত্বাবধান ব্যাপারে পাকাপোক্ত কয়েকজন খৃষ্টান মহিলার প্রয়োজন। তখনই আমার মনে লাগে যে, কাজটা যোগাড় করে রিনিকে যদি রেঙ্গুনে নিয়ে যেতে পারি, তাকে মনের মত করে তৈরী করা খুব সহজ হবে। তখনই দরখাস্ত পাঠাই, আর সেটা মঞ্জুর হয়ে যায়। আমি তখন প্রস্তাব করি, এলাহাবাদে এ-মেয়েকে রেখে তৈরী করা চলবে না, তাতে কোন একটা ফাঁকে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে। এমন কোন দূর দেশে একে রাখতে হবে—এখানকার চেনা-শোনা কোন লোকের টিকিটি তার চোখের সামনে কোন দিন যাতে না পড়ে। আমি রেঙ্গুনের কথা তুলি। কিন্তু তাতে খরচের কথা ভেবে অধিকারী চমকে উঠেছিলেন। তখন তাঁর চোখে আঙুল দিয়েই আমাকে কেসটার আগা-পাছা সমস্ত ছকে দেখাতে হয়। ব্যাপারটা সহজ নয় মোটেই, তবে এভাবে সাজিয়ে তৈরী করতে পারলে সিদ্ধির সম্ভাবনাই বেশী, এটা বুঝতে পেরে শেষ পর্য্যন্ত তাকে সায় দিতেই হয়েছিল।

কিন্তু রিনিকে নিয়ে রেঙ্গুনে এসে তার শিক্ষার ব্যাপারে আবার নতুন করে বনেদ তৈরী করতে হয়। তার ফলে কেসটা এই ভাবে সাজিয়ে ফেলি: খুব একটা বড় সহর আর বাড়ীর স্মৃতি তার মনে আছে। তার বাপ ছিল, মা ছিল, বোন ছিল, গাড়ী ঘোড়া, চাকর দাসী অনেক ছিল। কিন্তু কোথায়, তা জানে না। এক সাধু তাকে কোলে করে মেলা দেখাতে নিয়ে যায়। তার পরে একটা বুড়ির কথা মনে পড়ে। কাঁদলে সে খেলনা দিত।

খালি খালি বলত, 'বাবা আসবে, মা আসবে, কোলে করে নিয়ে যাবে'। তারপর জাহাজে ওঠে।...ছেলেবেলাকার এই পর্য্যন্ত স্মৃতি তার মনে আছে—এর ওপর ভিত্তি করে তাকে তৈরী করি। এর পরের ব্যাপারটা—আমাকে যা সাজাতে হয়েছে, তার কাহিনীটা এই রকম: যদিও আমি এই মেয়েটির অভিভাবিকা, কিন্তু এর বাপ মা বা বংশের কথা কিছু জানি না। রেঙ্গুনে আসবার সময় পথে এক অপরিচিতা বৃদ্ধার কাছ থেকে মেয়েটিকে আমি পাই। সে বলে, এক সাধু মেয়েটি তার কাছে গচ্ছিত রেখে বলেছিল—মাসখানেক পরে কলকাতা থেকে ফিরে এসে তাকে নিয়ে যাবে। মেয়েটির খরচের জন্য সে কিছু টাকাও দিয়েছিল। মেয়েটিকে সে রিনি বলে ডাকত। কিন্তু বছর ঘুরতেও যখন সাধু ফিরল না, সে তখন মেয়েটিকে নিয়ে তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। মেয়েটিকে পালন করবার তার সামর্থ্য নেই। সাধুকে না পেলে অগত্যা সে কাশীর অবলা আশ্রমে মেয়েটিকে তুলে দিবে। মেয়েটিকে দেখেই আমার মায়া হয়, আর সেও আমাকে দেখেই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন আমিই বুড়ীর কাছ থেকে মেয়েটিকে চেয়ে নিই। সেই থেকে আমারই তত্ত্বাবধানে সে আছে। রেঙ্গুনে আমার কর্ম্মস্থানে রেখে আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছি। বুড়ীর মুখে শুনেছিলাম যে, তার নাম রিনি; আমিও সেই নামই বাহাল রেখেছি। এবং আমার পদবী অনুসারে তার নামের সঙ্গে সেন পদবী জুড়ে দিয়েছি।

এই কাহিনীটাকে খুব হিসেব করে এফিডেভিটের আকারে পাকা করবার জন্য রিনির নামে তার অভিভাবিকারূপে হাজার টাকার একটা 'ম্যারেজ এনডাউমেন্ট পলিসি' পর্য্যন্ত নিতে হয়েছে। আমার মাইনের টাকা থেকে নিজেই তার 'প্রিমিয়ম' দিয়ে আসছি বরাবর। রিনির বিয়ের সময় 'বোনাস' শুদ্ধ টাকাটা তুলতে পারা যাবে। যদি কেসটা ফেঁসেও যায়, তবু এ বেচারীর একটা কিছু উপায় ত হবে। এখন রিনির অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ নানাভাবে তার মনের মধ্যে সেঁধিয়ে যে-সব খবর সংগ্রহ করা গেছে, তোমাদের কাজের সুবিধার জন্যে তারও একটা হিসাব দিচ্ছি:

আট বছরের মেয়ের মন থেকে আগেকার স্মৃতিগুলো যে কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না, একথা মনের ডাক্তার অধিকারীকেও মানতে হবে। তবে রিনির ব্যাপারে একটা বড় রকমের দুর্যোগই সুযোগটি এনে দেয়। জাহাজে দোল খেয়ে রিনির মাথা যায় গুলিয়ে, রেঙ্গুনের জেটিতে যখন নামি, জ্বরে সে বেহুঁস, চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। বাসায় এনেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। ডাক্তার বলেন, ভারি কঠিন রোগ, এতে মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু বাক্‌রোধ হয়, পূর্ব্বের স্মৃতি সব ভুলে যায়; এ রোগের নাম হচ্ছে ম্যাফেলেটিক ম্যাফেসিয়া। ডাঃ বার্কলি হিল এবং মেজর টমাস তাঁদের চিকিৎসা গ্রন্থে এ রোগের কথা প্রথম উল্লেখ করেন। যাই হোক, রোগ সারবার পর দেখা গেল, রিনির গলার স্বর বন্ধ হয়নি, তবে একবারে বদলে গেছে, আর অতীতের স্মৃতি তার কিছুই মনে নেই। ক্রমে ক্রমে তার মনে অস্পষ্টভাবে এলাহাবাদে মিষ্টার ঘোষের বাড়ীতে থাকবার সময়কার স্মৃতিটাই ফুটে ওঠে, আর সেই সঙ্গে ওটিনের কথাটাও তার মনে বোধ হয় দোলা দিতে থাকে। কেন না, রোগ থেকে সেরে ওঠবার পর তাকে মাঝে মাঝে টেনে টেনে বলতে শোনা যেত—'দেখনা, কোথায় আমাকে আনলে? মাগো, এখানে আবার মানুষ থাকে! আমার কত বড় বাড়ী, কত সব ছবি, কেমন খাসা গাড়ী, কত বড় ঘোড়া, আর কি সুন্দর ছেলেটি! তার সঙ্গে খেলতুম, নাম কিন্তু মনে করতে পারছিনে, ভুলে গেছি।' এমনি করে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলত সে। সেই থেকে আবার নতুন করে তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করতে হয়। এতে তাকে মনের মত করে তৈরী করবার কাজের যে কত সুবিধা হয়েছে সে কথা আর লিখে কি জানাব! সে সময় শুধু তার অসুখের কথাই লিখেছিলাম, কিন্তু এ সব ব্যাপার ইচ্ছা করেই চেপে রেখেছিলাম। যে বোর্ডিংয়ের ভার নিয়ে আমি আছি, সেই বোর্ডিংএ তাকে ভর্ত্তি করে দিই। বর্ম্মী আর ইংরাজী ভাষা সে এখান থেকে মোটামুটি শিখেছে। আমি তাকে নিজেই বাংলা শিখিয়ে নিই। কিন্তু মেয়েটির আর সব ভাল হলে কি হবে, বুদ্ধি ভারি মোটা, আর স্মরণশক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। অসুখ হবার আগেও তাকে খুব চটপটে, দুরন্ত আর চালাক চতুর দেখা গেছে, কিন্তু তারপর গলার স্বর বদলানো এবং স্মৃতিশক্তি হারাণোর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকৃতিও কে যেন একবারে পালটে দিয়েছে। এখন তার গলার স্বর এত সরু হয়েছে যে, হঠাৎ শুনলে মনে

হয় যেন নাকি সুরে কথা বলছে। প্রত্যেক কথাটিও টেনে টেনে আর খুব আস্তে বলে। কোন বিষয়ে তার কৌতূহল নেই, খেলাধুলা মোটেই পছন্দ করে না, সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, যেন কিছু মনে করতে চায় কিন্তু মনে আনতে পারে না। আমি কত বারই জিজ্ঞাসা করেছি, অমন মনমরা হয়ে থাকিস কেন রিনি, কি ভাবিস মনে মনে? প্রশ্ন শুনেই সে প্রথমটা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, তার পর টেনে টেনে বলে—খালি খালি আমার মনে সেই বাড়ী খানা যেন ছবির মতন ভেসে ওঠে, কি সুন্দর বাড়ী, অমন বাড়ী এখানে নেই। আর যে মানুষটি সে বাড়ীতে থাকেন, দেখতে ঠিক যেন আমাদের জজ সাহেবের মতন। ঠিক এমনি গোঁফ, এমনি সুন্দর মুখ। জজসাহেব হচ্ছেন মিষ্টার ব্যানার্জ্জী, রেঙ্গুন হাইকোর্টে জজিয়তি করেন, আর তিনিই আমাদের বোর্ডিংয়ের প্রেসিডেন্ট। তাঁর মুখের ভাব আর জমকালো গোঁফ জোড়াটি অনেকটা মিষ্টার হরপ্রসাদ ঘোষের মতনই। তাহলে বুঝতে পারছ, এলাহাবাদের বাড়ী আর সেই বাড়ীর দোতালার হলে টাঙানো মিষ্টার ঘোষের অয়েল পেইন্টিং ছবিখানা রিনির মনের উপর কি রকম ক্রিয়া করছে, আর এ ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে কতখানি সুযোগ এনে দিয়েছে। তার আট বছর বয়স থেকে এই উনিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত এই ভাবটা মনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তবে প্রথম প্রথম তার খেলার সাথীটির কথা তুলত, কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা আর তোলে না। এই চিঠি লেখার আগের দিন অর্থাৎ কালও তার মুখে এলাহাবাদের বাড়ীর কথা শুনিছি। এই নিয়ে তার সঙ্গে যে কথা হয়, হুবহু তুলে দিচ্ছি, তাতে তার বর্ত্তমান প্রকৃতির পরিচয়-টুকু ভাল ভাবেই পাবে।

ফুণা নামে সমবয়স্কা এক বর্ম্মী মেয়ের সঙ্গে ইদানীং রিনির খুব ভাব হয়েছে, ফুণার বাবা বাঙালী, মা বর্ম্মী। তার বাবা একটা স্কুলের হেডমাষ্টার হয়ে রেঙ্গুনে আসেন। এক বর্ম্মী সদাগরের বাড়ীতে থেকে তিনি তাঁর মেয়েকে পড়াতেন। তারপর মেয়েটি স্বয়ম্বরা হয়ে বাঙালী গৃহশিক্ষকের গলায় মালা দেয়। এরপর হেডমাষ্টারের ভাগ্য ফিরে যায়। সদাগরের ঐ একমাত্র মেয়ে; তিনি মেয়ে জামায়ের হাতে কারবার সঁপে দিয়ে এক মঠে গিয়ে ওঠেন। ফুণা এঁদের একমাত্র সন্তান। রিনিকে বড় একটা কোন মেয়ের সঙ্গে মিশতে দেখা যেত না, কিন্তু ফুণার সঙ্গে তার মনের মিল দেখে আমরা অবাক হয়ে যাই। ফুণার কাছেই রিনি তার মনের দুয়ারটি খুলে দিয়েছিল। তার ভিতরের খবরটি জানাতে হলে ওদের দুজনের কথাগুলোই তুলে দেওয়া ভালো। আড়াল থেকে যেমন শুনেছি, অবিকল তাই লিখছি:

ফুণা: তুই ভাই কি ভাবিস বলত? যখনই দেখি, চুপটি কোরে মনে মনে যেন কারো ধ্যান করছিস্। মনের মানুষটি কে ভাই, বলবি?

রিনি: মানুষ কেউ নয়, খালি একটা বাড়ী! খালি খালি সেইটিই মনে পড়ে।

ফুণা: বাড়ী? খালি—একটি বাড়ী? ভারি আশ্চর্য্য ত!

রিনি: সত্যিই এটা ভারি আশ্চর্য্য ভাই। ঘুমালেই স্বপ্নে ঐ বাড়ী ফুটে ওঠে। চমৎকার বাড়ী, সে রকম বাড়ী এখানে দেখতেই পাইনে। স্বপ্নে দেখি, আমি যেন একলাটি অত বড় বাড়ীখানার ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছি। সে বাড়ীর ঘরে ঘরে কত ভালো ভালো জিনিস, দেওয়ালে কত বড় বড় ছবি! আমি শুধুই চোখ মেলে দেখি; দেখা আর ফুরায় না যেন!

ফুণা: জ্যান্ত ছবি কিছু দেখিস না ভাই?

রিনি: তার মানে?

ফুণা: মানে বুঝলি না? গল্পের বইয়ে পড়িস নি, তেপান্তর মাঠের মধ্যে মস্ত বাড়ী, প্রত্যেক ঘরখানি দিব্যি সাজানো—যেন হাসছে। আর সেরা ঘরখানি আলো করে শুয়ে আছেন এক রাজপুত্তুর……

রিনি: দূর্……আমি কি তাই বলছি নাকি?

ফুণা: সেইটিইত চেপে যাচ্ছিস ভাই। অমন রাজপুরী নিত্য দেখিস্, ঘুরে বেড়াস তার মধ্যে; শুধুই কি ঘর, আসবাব, ছবি—আর কিছু দেখিস্ না?

রিনি: দেখি। দিব্যি একটি মানুষ। কিন্তু তাঁকে দেখতে ঠিক আমাদের ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট জজ সাহেবটির মত। অমনি গোঁফ, অমনি চেহারা, কিন্তু মুখখানা আলাদা……

ফুণা: জজ সাহেব ত বুড়ো মানুষ! একটা বুড়োকেই খালি দেখিস্! সোনার বরণ কোন রাজপুত্তুরের চাঁদপানা মুখখানা চোখে তোর পড়েনি কোন দিন?

রিনি : তাহলে আর বলব না।

কৃণা : রাগ করলি ভাই; না—না, আমি ঠাট্টা করছিলাম, তোর মন বোঝবার জন্যে। আচ্ছা, আর ও রকম কথা তুলব না। হাঁ, তারপর ?

রিনি : এখন এমনি হোয়েছে, দিনের বেলায় জেগে থেকেই চোখ দুটো বুজুলে দেখতে পাই—অন্ধকারে আলোর মত হোয়ে সেই বাড়ীখানা ফুটে উঠছে। তার ফটক আপনিই খুলে যাচ্ছে, আর ঘরগুলো অমনি হাতছানি দিয়ে আমাকে যেন ডাকছে। বলতে পারিস্ ভাই, কেন এমন হয় ? খালি খালি ঐ বাড়ীখানাই কেন অমন করে আমাকে টানে ?

কৃণা : আর, জজ সাহেবের মতন সেই বুড়োটি কি করেন ?

রিনি : তাঁকে সব দিন দেখতে পাইনে। যেদিন দেখি, চুপটি করে বসে আছেন শুধু। আমাকে দেখেন কিন্তু বলেন না কিছু।

কৃণা : এক কাজ করবি ? জানিস ত, আমার দাদু অর্থাৎ মাতামহ সব ছেড়ে ছুড়ে মঠে ঢুকেছেন। তিনি এখন মস্ত সাধু। চল্ একদিন তোকে নিয়ে তাঁর কাছে যাই। তিনি সব শুনলে নিশ্চয়ই বলে দেবেন—কেন এমন হয় আর পিছনের রহস্যটা কি !

রিনি : আচ্ছা ভাই, দিদাকে বলি। তিনি যদি মত দেন নিশ্চয়ই যাব।

ওদের এই আলাপ থেকেই ব্যাপারটি ভালো করে বুঝতে পারবে। রিনি আমাকে দিদা বলে, সে ত তোমরা জানোই। মঠে যাবার কথাটাও আমার কাছে পেড়েছে। আমি তাকে এই বলে আশ্বাস দিয়েছি—আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কৃণাও সঙ্গে থাকবে।

এখন আমার কথা এই, জালটি যেভাবে ছড়িয়ে ফেলা হোয়েছে, আর দেরী না করে এবার গুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করাই উচিত। মিষ্টার ঘোষের হারানো মেয়ে রেণুর কোন সন্ধানই যখন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি, তখন রিনিকে রেণু বলে চালিয়ে দেওয়া এখন আর কিছুতেই শক্ত হবে না। এমন কি, রেণু যদি থাকে বা কোন সূত্রে এসেও পড়ে—দৈবের মতন একটা ব্যাধি এসে রিনির মনের ওপর যে ছাপ দিয়েছে, তাতে তাকেই আসল বলে সকলকে মেনে নিতে হবে। আর একটা ভারি ভাবনার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এই অলক্ষুণে লড়াই। জাপানীরা যেভাবে জিততে জিততে এগিয়ে আসছে—এখানকার সবাই খুব ঘাবড়ে গেছে। এখন থেকে লোক সব সহর থেকে সরে যাচ্ছে। আমার মনে হয়, রিনিকে নিয়ে আমাদেরও খুব তাড়াতাড়ি দেশে যাওয়া উচিত। এখন কি করা যাবে—অধিকারীর সঙ্গে পরামর্শ করে খুব শীঘ্রই আমাকে জানানো চাই। আমি তারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

শুভার্থিনী মা—সারা।

ভাঁজ করিয়া চিঠিখানা দীর্ঘ লেফাফাখানির ভিতরে সন্তর্পণে ভরিতে ভরিতে সোনা অপাঙ্গে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন : শুনলে ত ? এখন বিচার করে বল—কি করতে চাও।

ডক্টর অধিকারী সোজা হইয়া বসিয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিলেন : কিছু করবার আগেই মাদার-ইন-ল'কে এখান থেকেই অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। শোন, চীফ্ আজকে আমাকে এই বলে ওয়ার্ণিং দিয়েছেন যে, কেস্‌টা আর বেশী দিন পেণ্ডিং রাখা চলবে না—অর্থাৎ বারো বছরের গণ্ডীর বাইরে ওঁরা এ ব্যাপারটাকে টেনে নিয়ে যাবেন না, ডিসেম্বরের মধ্যেই এটাকে শেষ করতে হবে। তার পর, আমিও খবর পেয়েছি—রেঙ্গুনের অবস্থা ভাল নয়, লোক জন সব তল্পী তল্পা নিয়ে এখন থেকেই নাকি সরে পড়ছে। কাজেই, আমাদের জালটাও এখন টেনে তুলতে হবে। মাদার-ইন-ল যাতে এই হপ্তার মধ্যেই ওখানকার পাট তুলে রিনিকে নিয়ে চলে আসেন, সে ব্যবস্থা আজই করে ফেলব। ওঁকে তার করেই, মিষ্টার ঘোষকেও জানাব—তিনি যেন সস্ত্রীক এখানে এসে আমাদের বারো বছরের দারুণ চেষ্টার ফলে খুঁজে পাওয়া তাঁর হারানো মেয়েটিকে সনাক্ত করেন।

স্বামীর কথায় আশ্চর্য্য হইয়া সোনা বলিয়া উঠিলেন : কি বলছ তুমি গো। মিষ্টার ঘোষকে পর্য্যন্ত খবর দিতে চাও—নিজে আগে ভালো করে মেয়েটাকে বেয়ে চেয়ে না দেখেই ?

মৃদু হাসিয়া অধিকারী বলিলেন : তবে তোমার মার লম্বা চিঠিখানা পড়ে বুঝলে কি ? ওর ওপরে আর আমার দাঁত ফোটাবার কিছু নেই; মাদার-ইন-ল খুব খাঁটি কথাই বলেছেন—ছেলে মেয়েদের মনের ওপর ডাক্তারী বিদ্যা চালাবার ক্ষমতা আমার চেয়ে তাঁর অনেক বেশী। অধিকন্তু,

প্রথমেই ত ওঁদের এ-বাড়ীতে আনছিনে, তিনি ও-বাড়ীতেই উঠবেন রিনিকে নিয়ে, তার পর তাঁর পরামর্শ মতই কাজ হবে। এদিকের চেয়ে আমার এখন ভাবনা হয়েছে—হতভাগা ওটিনটাকে নিয়ে। ও যে লেখা পড়া শিখে লায়েক হয়ে নিজের ইচ্ছা আর সুবিধামত কাজ বেছে নেবে, আমার মতামতের পরোয়া করবে না, আমি কিন্তু সেটা কল্পনাও করিনি। এখন বুঝতে পারছি, আমড়া গাছে আমরুৎ ফলে না।

ওটিন সম্বন্ধে স্বামীর কথাটা সোনার কানে [illegible]খল এবং তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের সুরে বলিল: [illegible] কথার চেয়ে বলতে পারতে—আমকতের চারা তুলে এনে আমড়াগাছের সঙ্গে মিলাতে চেয়েছিলে, কিন্তু মিশ খায়নি। তবে আমি বলব, ওটিনকেও যদি মায়ের হাতে দিতে, আজ তোমাকে এ আফ্‌শোষ করতে হতো না—ও ছেলে বিগড়ে যেত না। তোমার সর্ব্বগ্রাসী লোভই এর জন্যে দায়ী।

ক্ষুব্ধ স্বরে অধিকারী বলিলেন: য়্যাঁ! তুমিও শেষে একথা বলছ?

কঠিন মুখে সোনা বলিল: মিথ্যা বলেছি কি? তুমি চেয়েছিলে, ওটিন বরাবর সুবোধ শিশুটির মত তোমার বাধ্য হয়ে চলবে। সেই আশায় মনে মনে ফন্দী করেছিলে—রিনিকে মিষ্টার ঘোষের হারানো মেয়ে বলে চালাতে পারলে, ওটিনকেও পরের দফায় তাঁর হারানো বন্ধুর খুঁজে পাওয়া ছেলে প্রমাণ করে ওদের মধ্যে গাটছড়া বেঁধে দেবে, তার পর কামধেনুর মত দুজনকেই দোহন করতে থাকবে। ওটিন তোমার সে আশায় ছাই দিয়ে বিলেতে পড়তে গেছে, এই তার অপরাধ। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, যে রক্তে ওর জন্ম—তাতে ওসব প্রবৃত্তি ওর ধাতে সইবে না। ওর আশা তুমি ছেড়ে দাও।

ডক্টর অধিকারী রুক্ষস্বরে বললেন: কিন্তু ওটিন সম্বন্ধে আমার প্রকৃত সঙ্কল্প তুমি জানতে পারনি। মিষ্টার ঘোষের সেই বন্ধু-পুত্রটির মৃত্যু খবরই আগে দেওয়া হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, রিনিকে তাঁর মেয়ে বলে চালাতে পারলে, বধূরূপে আমিই সে-মেয়েকে দাবী করতাম। ওটিনের ভালর জন্যেই আমার মনে ঐ প্রবৃত্তি জেগেছিল। আর, তুমি বলবার আগেই ওর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি; এখন বিলেত থেকে ও ফিরে এলেই ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলব। ওকে নিয়ে আমার এখন আর মাথা ঘামাবার ইচ্ছা নেই।

কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলেই ডক্টর অধিকারী উঠে দাঁড়ালেন।

৩

ওটিনের সম্বন্ধে মনে মনে যে অনুমানটি রচনা করিয়া সোনা স্বামীকে আঘাত দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার অজ্ঞাতে তাহাই যে বাস্তবের দিক দিয়া একটা নূতন পরিস্থিতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিন্দু-বিসর্গও সোনা কিন্তু জানিতে পারেন নাই।

প্রায় পাঁচ বছর পূর্ব্বের কথা। ওটিন তখন বি-এস সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সে সময় কি একটা তদন্ত ব্যাপারে ডক্টর অধিকারীকে এক সপ্তাহের জন্য এলাহাবাদ ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে হয়। সেই সুযোগে ওটিন অধিকারী সাহেবের খাস-কামরাটি দখল করিয়া বসে। এই ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে যে-কয়টি বুক-কেস ছিল, তাহার প্রত্যেকটি দুষ্প্রাপ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে পূর্ণ। কিন্তু গৃহস্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য ছিল না যে, এই ঘরে ঢুকিয়া আলমারি হইতে কোন বই বাহির করিয়া পড়ে। ওটিনও একবার চেষ্টা করিয়া বাধা পাওয়ায়, সেই অভিমানে এই ঘরখানির ত্রিসীমাতেই আসিত না। কিন্তু কোন দুষ্প্রাপ্য বিজ্ঞান-গ্রন্থের প্রবল তাগিদ তাহার অভিমান ভাঙ্গিয়া দিয়া অধিকারী সাহেবের অনুপস্থিতির সুযোগে এই লোভনীয় গৃহটির মধ্যে তাহাকে আনিয়া ফেলে। প্রয়োজনীয় বইখানি খুঁজিতে খুঁজিতে নিউইয়র্কে প্রকাশিত এমন কতকগুলি দুর্লভ গ্রন্থের সহিত তাহার পরিচয় ঘটে যে, বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তাহাদের কোনটিকেই পরিত্যাগ করা চলে না। কাজেই গৃহস্বামীর প্রত্যাবর্তনের পূর্ব্বে—এক সপ্তাহের মধ্যেই এই নিষিদ্ধ গ্রন্থাগারের গ্রন্থগুলির সহিত পরিচয়-পর্বটি শেষ করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠে এবং এই ঘরেই তাহার পাসের পড়া চলিতে থাকে। কিন্তু এই তাড়ার মধ্যেই নিউইয়র্কে ছাপা একখানা পুরাতন বিজ্ঞানগ্রন্থের ভিতর হইতে 'নিউইয়র্ক-হেরল্ড' নামক সাময়িক পত্রের

মুদ্রিত এমন একটি কাটিংস বাহির হইয়া পড়িল, যাহার বিষয়বস্তু তাহার বইপড়ার নেশা ভাঙিয়া দিয়া কোন গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবিষ্কারে অনুসন্ধিৎসু গোয়েন্দার মতই তাহাকে উৎসাহী করিয়া তুলিল। ফলে, এই ঘরখানির সকল অংশ, প্রত্যেক আলমারীর মধ্যে সুরক্ষিত প্রতি গ্রন্থ, এমন কি—গৃহস্বামীর ব্যক্তিগত ও গোপনীয় ফাইলগুলিও তাহার সন্ধানী দৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি পাইল না। এজন্য বাহির হইতে চাবি সংগ্রহ করিয়া সুরক্ষিত বন্ধ দেরাজ-গুলির ডালা উদঘাটিত করিতে এবং পাঠোদ্ধারের পর যথাযথভাবে বস্তুগুলি পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া রাখিতে তাহার শিক্ষিত মনে কোনরূপ কুণ্ঠার সঞ্চার হয় নাই—এতই সে উৎসাহী ও উত্তেজিত হইয়াছিল।

এই অনুসন্ধানের ফল ওটিনের সংশয়াচ্ছন্ন অন্তর-প্রদেশে যে তীব্র আলোক-রশ্মি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে সুস্পষ্টভাবেই সে উপলব্ধি করিতে পারিল যে, কত বড় এক মিথ্যার পটভূমিতে তাহার জীবন-আলেখ্যটি অঙ্কিত হইয়াছে! আর যে লোকটি কঠোর প্রকৃতি পিতা ও জবরদস্ত অভিভাবকরূপে সুদীর্ঘ বিশ বৎসরের উপর তাহাকে শাসন করিয়া আসিতেছেন, দক্ষ যাদুকরের মত কি ভাবে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে ধোঁকার আবরণে আবৃত করিয়া দুনিয়াশুদ্ধ সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছেন এবং অপ্রতিহত গতি বেগে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সঙ্গে সহজভাবে মিশাইয়া দিয়া কেমন খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছেন। ভাবিতে ভাবিতে ওটিনের তরুণ মনের ভিতর এই অতি বড় কৌশলী ও পিতারূপে সুপরিচিত মানুষটির ছলনাময় কার্য্য-কলাপ যেন দাবানল জ্বালাইয়া দিল। বিক্ষোভের উপর আর একটা বিক্ষোভ তাহাতে ইন্ধন যোগাইল যে, শুধুই তাহাকে এক বিশিষ্ট বংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াই সে নিরস্ত নহে, আর একটি মেয়েকে মনের মত করিয়া গড়িয়া লইয়া আর এক বিশিষ্ট বংশের কোন নিরুদ্দিষ্টা কন্যার স্থানে বসাইবার জন্য তাহার কি কুচিন্তিত কদর্য্য আয়োজন চলিয়াছে! দশ বৎসর পূর্ব্বের সকল কথাই ছবির মত সহসা তাহার মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল। বাল্যজীবনে স্বল্প কালের জন্য যে সুদর্শনা মিষ্টভাষিণী রিনি নামে মেয়েটি তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল, সেই সূত্রে প্রথম পরিচয়, আলাপ এবং সেই বালিকাটির সম্বন্ধে দিদিমা সারার রহস্যময় ব্যবহার—যে-সব কথা সেই মেয়েটি চুপি চুপি শুধু তাহাকেই বলিত—একটি একটি করিয়া সে সবই মনে পড়িয়া গেল। দুজনের মধ্যে যখন ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময় হঠাৎ একদিন সে শুনিতে পাইল যে, তাহারা চেঞ্জের জন্য লক্ষ্ণৌ যাইবে। কিন্তু রিনিকে ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে তাহার মনে কি কম কষ্ট হইয়াছিল? তখন কি সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাড়াহুড়া করিয়া রিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগটুকু না দিয়াই কেন তাহাকে ষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল? তার পর চেঞ্জ হইতে ফিরিয়া আর সে রিনিকে দেখিতে পায় নাই। তাহাকে বলা হইয়াছিল যে, রিনির মা আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা বহুদূরে কোন্ বিদেশে নাকি বসবাস করিতেছে। কিন্তু তার পরও অনেক দিন ধরিয়া রিনির কথা সে মনে রাখিয়াছিল, কালক্রমে আবার অদর্শনে মনের মধ্যেই মিলাইয়া গিয়াছিল। এত কাল পরে আজ এ-বাড়ীর এই রহস্যময় ধোঁকার টাটখানি সরাইয়া যে সত্যকে সে উদঘাটিত করিয়াছে, তাহাই যেন তাহার চোখে আঙুল দিয়া অতীতের সব কথাই একটি একটি করিয়া দেখাইয়া দিতেছে—কেন তাহাকে লক্ষ্ণৌয়ে চেঞ্জের নামে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, আর রিনিকে সেই সময় কোন্ বিদেশে কাহার নির্দ্দেশে কোন্ উদ্দেশ্যে কে লইয়া গিয়াছে! তাহার দিদিমার রেঙ্গুণে বালিকা বোর্ডিং-এর সম্পর্কে থাকিবার মূলে কি রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং এই সব ব্যাপারের উপর প্রকৃত রহস্য হইতেছে—এই বাড়ীর সত্যকার মালিক মিষ্টার ঘোষের নিরুদ্দিষ্টা কন্যারূপে জাহির করিবার জন্যই রিনিকে তথায় বাঁধাধরা নিয়মে তালিম দেওয়া হইতেছে!……ইহার পর ওটিনের স্নায়ুপুঞ্জে পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে কোন কিছু কৌতুহল উদ্রিক্ত হইবার পূর্ব্বেই সে আপন মনে দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠে: কিন্তু চাকা এবার ঘুরে যাবে; আর, আমাকেই ঘুরিয়ে দিতে হবে।

'নিউইয়র্ক-হেরল্ডে'র যে নিদর্শনটুকু আশ্চর্য্য-ভাবে বিজ্ঞান গ্রন্থের ভিতর হইতে বাহির হইয়া ওটিনের মনোরাজ্যে এভাবে তুমুল বিপ্লব তুলিয়াছিল, তাহা ওটিনের পিতা ডক্টর অধিকারীর পরিপূর্ণ আলেখ্য সম্বলিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী। পত্রিকা হইতে কাহিনীটি সম্ভবত কাটিয়া ডক্টর অধিকারী এই গ্রন্থখানির ভিতরেই রাখিয়াছিলেন। অধিকারী সাহেব পরে যখন মৃত ডক্টর অধিকারীর সম্পর্কে ধোঁকার টাটখানি বিছাইতে থাকেন, তখন

নিপুণ হস্তে সকল নিদর্শন নির্মমভাবে নিশ্চিহ্ন করিয়াই দেশে ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু এত বড় সুস্পষ্ট নিদর্শনটি যে একখানি বিজ্ঞান-গ্রন্থের ভিতরে এভাবে আত্ম-গোপন করিয়া আছে এবং প্রায় বাইশ তেইশ বৎসর পরে এভাবে অকস্মাৎ আত্ম-প্রকাশ করিবে, তাহা যে ধারণারও অতীত বস্তু! চালাকী করিয়া যাহারা বিধাতার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাকে উল্টাইয়া দিতে চায় এবং আংশিক সাফল্যে আপনাদিগকে বিশ্বকর্মা ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তাহাদেরই ইচ্ছাকৃত তুচ্ছ একটা ভুলের পরশেই দীর্ঘকালের সযত্নে-রচিত কৌশল-জাল এই ভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

সন্দেহ বস্তুটির ক্রিয়া এমনই বিচিত্র যে, সংক্রামক ব্যাধির মতই তাহা বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া সুস্থ ব্যক্তিকেও অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সুতরাং সর্বতোভাবে সুস্থ ও বলিষ্ঠ যে ছেলেটি অধিকারী সাহেবের এই নিষিদ্ধ ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিতেও সঙ্কুচিত হইত, আজ সন্দেহের বীজাণু তাহার মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইয়া শুধু সন্দেহভাজন গৃহস্বামীর প্রতি বস্তুটি ওলটপালট করিয়াই নিরস্ত হইল না—সুদূর নিউইয়র্কে পর্যন্ত সন্ধানী আলোকপাত করিতে তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও একটা সান্ত্বনা তাহাকে আশ্বস্ত করিল যে—এই অবাঞ্ছিত এবং আকৃতি ও প্রকৃতিতে অতিশয় পার্থক্য-সম্পন্ন অপ্রিয় মানুষটি এতকাল লোক-চক্ষুতে ধূলি দিয়া তাহার পিতৃত্বের যে অধিকার বজায় রাখিয়াছে, তাহা মিথ্যা—তাহা একেবারেই মিথ্যা। আজ তাহার ঋষিকল্প পিতার জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞানই অপ্রত্যাশিত ভাবে সত্যপ্রকাশ করিয়া দিয়াছে। বর্তমানের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তাহার পক্ষে যেন 'শাপে বর' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন এই সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে, তাহার স্বাভাবিক সুকোমল অন্তর প্রকৃতির ইহা অনুকূল না হইলেও, দৃঢ়তার সহিত তাহাকে প্রতিকূল অবস্থার গতি ফিরাইয়া দিতে হইবে, কিন্তু বাহিরের কাহাকেও কিছুই জানিতে দিবে না।

ওটিন ছেলেটির মনোবল ছিল অসাধারণ। মনে মনে সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়া এবং সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি সুকৌশলে সংগ্রহ করিয়া অধিকারী সাহেবের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সে কলেজের হোস্টেলে চলিয়া যায়।

পরীক্ষা দিয়াই ওটিন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রার্থনা জানায় যে, বি, এস-সি পরীক্ষায় সে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবেই; কিন্তু তাহার পর বিজ্ঞান পড়িবার স্পৃহা ত্যাগ করিয়া সে সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কাজ শিখিতে একান্ত উৎসুক। কর্তৃপক্ষ যদি তাহাকে পরীক্ষাদির পর উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এখানে প্রাথমিক শিক্ষা দানের পর বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা শিক্ষাগারে পাঠাইয়া শিক্ষিত-পটু করিয়া লইবার সুযোগ দিলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ওটিনের প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষ উল্লসিত হইলেন। এভাবে কোন ভারতীয় ছাত্রকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে তাঁহারা দেখেন নাই। ওটিনের চেহারা ছিল ইউরোপীয়দের মত দীর্ঘ, ঋজু ও বলিষ্ঠ। বাকপটুতাও প্রশংসনীয়। সুতরাং তাহার আবেদন সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্জুর হইয়া যায়। বিভাগীয় পরীক্ষাতেও ওটিন উপযুক্ত বলিয়া প্রশংসাপত্র লাভ করে। তখন তাহাকে সরকারী তত্ত্বাবধানে শিক্ষানবিশরূপে রাখিবার বিশেষ ব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষ সম্মত হন। কয়েকমাস পরে বি, এস-সি পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, ওটিন প্রথম বিভাগে সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায় পুলিস বিভাগে ওটিনের খাতির আরো বাড়িয়া যায়।

ডক্টর অধিকারী এই সময় নানা স্থানে ঘোরাঘুরি করিতেছিলেন। ওটিনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার অবসর তাঁহার ছিল না। তবে ওটিন পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হওয়ায়, তিনি বলিলেন—ওটিনকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়া দিবেন। ওটিন শুনিল, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিল না। ইহার পর একদিন তাহার নিকট হইতে এই মর্মে এক পত্র পাইয়া ডক্টর অধিকারী যেন আকাশ হইতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন। ওটিন সেই পত্রে খুব সংক্ষেপে লিখিয়াছে:

স্যার, সরকারের ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আমি ইউরোপ চলিয়াছি। আমার শিক্ষা বা জীবিকার জন্য আপনাদিগকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না; কারণ আপনার কোন সাহায্যই আমার প্রয়োজন নাই। আমাকে ফিরাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিবেন না—

এই চিঠি যখন আপনার হস্তগত হইবে, আমি তখন সমুদ্রবক্ষে জাহাজের কেবিনে।

আপনাদের স্নেহের—ওটিন।

এই ব্যাপারে, ওটিনের এরূপ নির্মম ব্যবহারে অধিকারী অধৈর্য্য হইয়া উঠেন—তাহার সম্বন্ধে নানাভাবে অনুসন্ধানও করিতে থাকেন। কিন্তু ওটিন মাথা খেলাইয়া এবং কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া তাহার এই বিদেশ যাত্রার পিছনের পদচিহ্নগুলি এমনভাবে মুছিয়া দেয় যে, কোন সূত্রেই ডক্টর অধিকারী তাহার নাগাল পান নাই। এই অবস্থায় সোনাই তাঁহাকে বাধা দিয়া বলে—তার এই চিঠি পড়েও তুমি কি বুঝতে পারনি, সে তোমার কোন তোয়াক্কা রাখে না, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই সে মানুষ হতে চায়—রক্তের তেজ যাবে কোথায়?

অধিকারী তখন উগ্রভাবে ওটিনের উদ্দেশে অনেক অপ্রিয় কথা বলিতে থাকেন—বেইমান, অকৃতজ্ঞ, পাষণ্ড……

সোনা মুখনাড়া দিয়া স্বামীর কথায় বাধা দেয়—থাক্, অত গরম মেজাজ নাই বা দেখালে। ওটিনের নামে ও সব কথা বলা তোমার মুখে সাজে না। এই নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করবে না, আমি বারণ করছি।

অগত্যা অধিকারী সাহেব প্রকাশ্যে মুখ বন্ধ করিলেও, মনে মনে তিনি ওটিনের এভাবে গৃহত্যাগ সম্বন্ধে নানাবিধ কল্পিত প্রসঙ্গ লইয়া চিন্তাজাল রচনা করিতে থাকেন। ওটিন কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র চিঠিখানির পর আর কোন প্রকার খবর পাঠানো প্রয়োজন মনে করে নাই। তবে সে যে বিলাতের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এবং ওয়াসিংটনের বিখ্যাত পুলিস ইনষ্টিটিউসনে প্রবেশ করিয়া আধুনিক উন্নততম শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং নিজের বিশেষ কৃতিত্বে কর্তৃপক্ষকে পরিতুষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সে পরিচয় তাহার পরবর্ত্তী কর্ম্মজীবনে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

৪

ওদিকে শ্রীবৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রমেও বর্ষের পর বর্ষ পরিক্রমার তালে তালে স্বামীজীর প্রিয়তমা শিষ্যাটির তনুলতা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। কি ভাবিয়া কে জানে, স্বামীজী অনুর নূতন নাম করণ করিয়াছেন—দেবী। সিদ্ধাশ্রমের সকলেই ইহাতে প্রীত হইয়াছে—লালা লছমনজী পর্য্যন্ত। দেবী ত—দেবীই; এমন আশ্চর্য্য বলিষ্ঠ রূপ ইহার আগে আশ্রমবাসী কেহ নাকি কখনও দেখে নাই। দেবীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার সর্ব্বাঙ্গে যৌবনের কমনীয় রেখাগুলি যতই পরিস্ফুট হইয়া উঠে, স্বামীজীর রূপসজ্জাও সেই অনুপাতে চক্ষু-চমৎকারী হওয়াতে আশ্রমবাসীদের আলোচনার বস্তু করিয়া তুলে। এই প্রসঙ্গে একদা মনস্তাত্ত্বিক আলোচনাসূত্রে লালা স্বামীজীকে বিদ্রূপের সুরে মন্তব্য করেন—বছর বারো আগে প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় যে-লোক আপনাকে প্রথম দেখেছিল, আজ যদি তাকে সামনে এনে হাজীর করা যায়, সে এখনকার চেহারা দেখে বিশ্বাসই করবেন না যে—সেই লোক আপনি!

লালার কথা শুনিয়া স্বামীজী সেদিন চমকাইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি দেখছি আমার চেয়েও বড় সয়তান!…তাহার পরই কিছুটা পরিতুষ্টির সুরে বলিয়া উঠেন—'তাহলে তোমাকে না বলে পারছিনা লালা, শোন তবে—প্রথম যৌবনে আমার যে মানসী প্রিয়ার স্মৃতি মনের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল, সে চাপাটি এখন খুলে দিয়েছে নিজের হাতে এই মেয়েটি—বারো বছর আগে তুমি যার হাতখানি ধরে আমার সামনে এনে হাজীর করেছিলে। এখন ওর পরিপূর্ণ আকৃতি, মুখ চোখ ও কথার ভঙ্গি, অদ্ভুত রূপলাবণ্য আমার মনে এই ধরণের একটা চিন্তা জাগিয়ে তুলেছে—'প্রথম যৌবনের সেই মানসী প্রিয়তমাই কি দেবীর মুর্ত্তি ধরে ফিরে এসেছেন?'

স্বামীজী হয় ত কথার পীঠে আরও কিছু বলিতেন। কিন্তু তাঁহাকে সে সুযোগ না দিয়া লালা গম্ভীর মুখে হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন: তার মানে, নিজের সৃষ্টি দেখেই আপনি মোহিত হয়েছেন: আর এ-কথাও ঠিক, বারো বছর আগে আপনার হাতে যখন এই মেয়েটিকে তুলে দিই, তখন ভাবতে পারিনি যে, আপনার হাতে পড়ে আর এদেশের জোরে সেদিনের সেই মেয়েটি এমন অসাধারণ হয়ে উঠবে।

স্বামীজী এই কথার উত্তরে সহাস্যে বলিলেন: সেদিন তুমিই ত বাঁটোয়ারা করেছিলে ভাই!

এক পাল মেয়ে তোমরা নিয়ে আমার ভাগ ব'লে এই একটি মেয়েই সেদিন দিয়েছিলে—আমিও এতেই সন্তুষ্ট হয়েছিলাম।

লালাও জবাব দিলেন: তাহলে চাণক্য পণ্ডিতের সেই শ্লোকটা আওড়াতে হয় দাদাজী—'একশ্চন্দ্র স্তমো হন্তি ন চ তারা সহস্রশঃ।' এও তাই। আপনিই জিতে গেছেন দাদাজী।

স্বামীজী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ক্ষণকাল লালার দিকে তাকাইয়া রহিলেন: পরে দৃষ্টি কোমল করিয়া কহিলেন: জানো, আমার সারা জীবনের সঞ্চিত বিভূতি সব উজোড় করে একে তৈরী করেছি। কিন্তু এই মেয়েটি যদি তোমার ভাগে পড়ত, পাঁটার দলে মিশিয়ে দিতে। তার বদলে আমি একে সব দিক দিয়ে চৌখস আর অসাধারণ করেই এমন ভাবে গড়ে তুলিছি—অনায়াসে দেবীর মত মহীয়সী বলা যায়।

লালাজী একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলিলেন: কিন্তু দাদাজী—আমিও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, একটা দিক লক্ষ্য করে আমার ভাগের মেয়েগুলিকে পুষেছি—

কথাটায় বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে স্বামীজী বলিলেন: হঁ, কশাই যে উদ্দেশ্য নিয়ে ছাগল পোষে—এ কথা আমি আগেই বলেছি লালাভাই।

লালাজীও ইহাতে না দমিয়া মুখখানা আরও কঠিন করিয়া জবাব দিলেন: সেটা হচ্ছে কশায়ের বৃত্তি বা পেশা—ত কে দোষ দেওয়া যায় না। মানলাম, আমার ভাগের মেয়েগুলিকে আমার বিদ্যা বুদ্ধি আর প্রবৃত্তিমত শিখিয়ে পড়িয়ে সংসার বাঁধতে লাগিয়ে দিয়েছি, আর এতদিন ধরে দেখা-শোনার ও লায়েক করে তোলবার মজুরী চড়াদরেই উসুল করে নিয়েছি। সেই আয় থেকেই এত বড় আশ্রম চলছে—আপনিও আপনার মানসীকে নিয়ে রাজর্ষির মত বাহাল তবিয়তে দিন গুজরান করছেন। এখন আপনিই বলুন ত দাদাজী—যে কুপ্রবৃত্তি নিয়ে দেবীকে আপনি অসাধারণ করে তুলেছেন, আপনার সেই প্রবৃত্তিটা কি কশায়ের প্রবৃত্তির চেয়ে কম বিশ্রী?

তৎক্ষণাৎ সবেগে সোজা হইয়া বসিয়া দুই চক্ষু পাকাইয়া স্বামীজী হুমকি দিলেন: লাল—

লালা সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া বলিতে লাগিলেন: পুরাণের একটা গল্প শুনেছিলাম, এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি দাদাজী। একবার বিধাতাজীর মনে সাধ হলো, এমন এক রূপসী সৃষ্টি করবেন, যার তুলনা ত্রিভুবনে কোথাও থাকবে না। তৈরী করলেন তেমন মেয়ে; কিন্তু তার রূপ দেখে নিজেই লালসায় হলেন অস্থির। তারপর অবিশ্যি, ভুল তাঁর ভেঙে গিয়েছিল। আপনিও দাদাজী, আমার এই গল্প থেকেই নিজের অবস্থাটি বুঝে নিন। এই ব্যাপার নিয়ে আপনার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে তর্ক করতেও আমার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়। যদি আমার অনুমান মিথ্যা হয়ে থাকে, যে শাস্তি আমাকে দেবেন—আমি তা মাথা পেতে নেব। আর, যদি সত্যি হয়—এর পর কি করা উচিৎ, আপনিই ভাববেন…এখন আপনার কি করা উচিত।

কথাগুলি শেষ করিবার পর আর লালা সে কক্ষে স্বামীজীর সামনে বসিয়া রহিলেন না, ঝাঁ করিয়া উঠিয়া ছায়ার মত সরিয়া গেলেন।

কিন্তু দুই বুদ্ধিমানের কথোপকথনের প্রাক্কালে দেবী যে পাশের ঘরে আসিয়া পড়ে এবং লালার কণ্ঠে সহসা তাহার নাম শুনিয়া কৌতূহল সহকারে গবাক্ষের পাশে দাঁড়াইয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা শুনিয়া ফেলে, কেহই ইহা লক্ষ্য করেন নাই। সাধারণতঃ দেবী এই সময় পাকশালায় রন্ধনকার্যে লিপ্ত থাকে; কিন্তু তাহারই ফাঁকে একটা প্রয়োজনে তাহাকে এই কক্ষে আসিতে হইয়াছিল। ফলে, কিছুকাল হইতে সাধুজীর আচরণ সম্পর্কে দেবীর অন্তরে যে প্রশ্ন কুহেলিকাচ্ছন্ন এক বিচিত্র মায়াজাল রচনা করিতেছিল, এদিনের এই সংলাপ ঠিক নবারুণের কিরণ সম্পাতের মতই তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া সত্যের সন্ধান দিল।

ওদিকে লালাজীর ঝটিতি প্রস্থানের পর আনন্দস্বামীর পরিপক্ক স্নায়ুপুঞ্জ আলোড়িত হইয়া উঠিল তাঁহার মনের মণিকোঠায় প্রচ্ছন্ন গূঢ় অভিসন্ধির আবরণটি এভাবে হঠাৎ লালাজীর কথার আঘাতে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়ায়। অস্থায়ী এক একটি বুদ্‌বুদের আকারে কত গুপ্ত তথ্যই বাহির হইতে থাকে এবং ছবির মত ক্ষণিক চাঞ্চল্য জাগাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। প্রথমেই মানসপটে ফুটিয়া উঠে—তরুণ যৌবনের মানসী প্রিয়াটির ছবি। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান তিনি, মাথায় মস্ত এক টিকি—সিদ্ধ কুলের নিদর্শন। সিদ্ধ বংশজাত বন্ধু পুত্রের শিক্ষিত পুত্র জানিয়া এবং মাথায় সেই টিকি দেখিয়া বয়স্থা কন্যার শিক্ষা ভার দিয়াছিলেন বিচারপতি গুহস্বামী বিশ্বাস

করিয়া। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বিদ্বান ছাত্র ছাত্রীর অনুপম রূপ দেখিয়া চিত্ত হারাইয়া ফেলেন—তাহার বংশ ও জাতিগত পার্থক্যের কথা না ভাবিয়াই ভালবাসিতে থাকেন। পড়াইতে বসিয়া কত সব অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ তুলিয়া ছাত্রীকে চমৎকৃত করিয়া দেন। নীটুসের নীতি 'কোট' করিয়া প্রচলিত মতবাদের উপর তাঁহার সে কি তীব্র ব্যঙ্গোক্তি!...পুরানো ঈশ্বররা সব মরে গেছে, এখন নতুন ঈশ্বর তৈরী করা চাই।...ছাত্রী এ-কথা শুনিয়া প্রশ্ন করিত—কেমন করে সেটা সম্ভব হবে পণ্ডিত মশাই?...শিক্ষকও অসঙ্কোচে উত্তর দিতেন—ওপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে মাটির পানে তাকাও, পৃথিবীকে ভালবাস, মানুষকে বিশ্বাস কর; যার শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি করেছে—তাদের টুঁটি চেপে আগে সরিয়ে দাও; তখন দেখবে, ঈশ্বর বেরুচ্ছেন তোমার আমার ভিতর দিয়ে—যারা প্রেমিক, যারা ভালবাসতে জানে—তাঁদের মধ্যেই ঈশ্বর লুকিয়ে থাকেন।...ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলের মুখে এই ধরণের কথা শুনিয়া সেই দিনই ছাত্রী একখানি কাঁচি হাতে করিয়া আসিয়া বলিল—পড়াতে বসবার আগেই আজ আপনাকে মাথা থেকে টিকিটা কেটে ফেলতে হবে পণ্ডিত মশাই!...ফ্যাল ফ্যাল করিয়া ছাত্রীর মুখের পানে চাহিয়া থাকেন শিক্ষক, তাঁহার মুখ দিয়া কথা ফুটিয়া বাহির হয় না। ছাত্রী তখন মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলেন—টিকির সঙ্গে ঐ সব কথা খাপ খায়না কিনা, তাই ওটা কাটতে চেয়েছি—বুঝেছেন পণ্ডিত মশাই?...শিক্ষক তখন গম্ভীর হইয়া বলেন—বিদ্যাসাগরও এমনি নতুন কথা বলেছিলেন, কিন্তু কেউ ত তাঁর হাতে টিকি কাটবার জন্য কাঁচি তুলে দিতে যায় নি।...ছাত্রী তৎক্ষণাৎ মুখখানি গম্ভীর করিয়া জবাব দেন—কিন্তু বিদ্যাসাগর যে কোন বিধবা ছাত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্যেই বিধবা বিবাহ প্রচার করেছিলেন—এমন কথাও ত শোনা যায় নি, পণ্ডিত মশাই!...সেই দিন হইতে তাঁহার মস্তিষ্ক গুলাইয়া যায়, মনে প্রশ্ন জাগে—তবে কি ছাত্রী তাঁহার মনোভাব ধরিয়া ফেলিয়াছেন? কায়স্থ কন্যা সে, তাহার প্রতি ব্রাহ্মণ শিক্ষকের লোভটি উপলব্ধি করিয়াই কি সে টিকিটি নিশ্চিহ্ন করিতে কাঁচি দেখাইয়াছিল?...আশ্চর্য্য! চল্লিশ বৎসর পরে আজও তাঁহাকে সেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রবীণ বয়সে বছরের পর বছর ধরিয়া যে বালিকাটিকে তিনি নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষায় দীক্ষায়—শক্তি সামর্থ্য ও বিবিধ বিদ্যায় পটীয়সী করিয়া তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন... তাহার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীরও চোখের পরদা যেন একটু একটু করিয়া পালটাইতে থাকে। বর্ত্তমানের এই অষ্টাদশী তরুণী ছাত্রীটির সঙ্গে তাঁহার সে দিনের—চল্লিশ বৎসর আগেকার সেই জল-হৃদিতা প্রিয়তমা ছাত্রীটির কোন পার্থক্যই নাই! তন্ময় হইয়া স্বামীজী শুধু দেখেন—সারা অন্তর দিয়া পূর্ব্বতন প্রিয় ছাত্রীটির সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকেন... দেখিতে দেখিতে অভিভূত হইয়া পড়েন। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই মর্ম্মস্পর্শী ভঙ্গি, সেই অপরূপ তনুলতা... একদিন যাহার পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কামনা করিয়াছিলেন—সুকোমল দুটি কমনীয় করপল্লব তাঁহার দেহপাদপটি পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিবে। সে দিনের আশা ও উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল, কিন্তু আজ?...কই, সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শুখাইয়া নিরস হইয়া যায় নাই...কিশলয়ের মত পুনরায় যে হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। উগ্র প্রবৃত্তিকে রুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি কি তাহার পথ ছাড়িয়া দেন নাই? তাহার সাক্ষ্য ত নিজের বর্ত্তমান চেহারা। সেফ্‌টি ক্ষুরে নিত্য দাড়ী না চাঁচিলে এখন রীতিমত অস্বস্তি বোধ করেন, স্নো-পাউডারের প্রলেপ না দিলে মন যেন খুঁৎ খুঁৎ করে। লালাকে খবিশ্চি বুঝাইতে হইয়াছে যে, দীর্ঘ দাড়ী ও জটা দেখিয়া মেয়েটা ভয় পায় বলিয়াই ও পাট তুলিয়া দিতে হইয়াছে; কিন্তু সত্যই কি তাই? সেবারের প্রিয়াটি টিকি কাটিবার জন্য কাঁচি দেখাইয়াছিল, কিন্তু এবারের মেয়েটির জন্য তাঁহাকে স্বহস্তে চুল দাড়ি মুড়াইতে হইয়াছে। ফলে, যে জীবন মরচে ধরে অচল হয়ে পড়েছিল, এই মেয়েটির সংস্পর্শে ও মোহে তাহার শ্রীছাঁদ বদলাইয়া গিয়াছে। স্বামীজীর ধারণা ছিল, মনকে তিনি চোখ ঠারিয়া অন্ততঃ লোকের চোখে ধূলা দিতে পারিয়াছেন—তাঁহার মনের পাপ অন্যের চোখে ধরা পড়ে নাই; কিন্তু আজ লালাজীর কথায় সে ভুল তাঁহার ভাঙিয়া যায়; তাই অতীতের চিন্তার সঙ্গে বর্ত্তমানের চিন্তার এই যোগ-সাজস ঘটে, ভাবিতে ভাবিতে তিনি বিহ্বল হইয়া ডাকিতে থাকেন: দেবী, দেবী!

দেবীর অন্তর মধ্যেও এতক্ষণ দুশ্চিন্তার সপ্ত সমুদ্র যেন উথলিয়া উঠিতেছিল ; তাহারও স্নায়ুপুঞ্জ আলোড়িত হইতেছিল সাধুজী ও লালাজীর সংলাপ সম্পর্কে এদিনের বিস্ময়কর প্রসঙ্গটির প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া। সেই সঙ্গে জোর করিয়াই বুঝি এই সাধু নামধেয় মানুষটির সহিত তাহার সংস্রব ও ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রতিদিনের ঘটনাপঞ্জিকা সে স্মরণ করিতে চাহিতেছিল।···সাধুজীর নিজস্ব ঘরখানির পাশেই দেবীর ঘর ; সেখানে অধ্যয়ন ও শক্তি চর্চার যাবতীয় উপাদানগুলি তাহাকেই পর পর সাজাইয়া রাখিতে হইয়াছে···স্বামীজী প্রত্যহ সেখানে গিয়া সেগুলি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এই ঘরের পরেই ক্ষুদ্র একটি অঙ্গন, তাহার পরই স্বামীজীর জন্য স্বতন্ত্র পাকশালা—প্রাপ্তবয়স্কা হইবার পর দেবীকে ইহার ভার লইতে হইয়াছে। আশ্রমস্থ পাকশালায় প্রস্তুত আহার্য্য গ্রহণে স্বামীজী অভ্যস্ত থাকিলেও, প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, সে ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পাকশালা হইতে সাধুজীর আহার্য্য প্রস্তুত হইয়া থাকে—দেবীকেই স্বহস্তে পাক করিতে হয়। রন্ধন-বিদ্যাও স্বামীজী হাতে ধরিয়া কৈশোরকাল হইতে দেবীকে শিখাইয়াছেন।

আশ্রমের ভাণ্ডার হইতে দুই বেলা সিধা আসে—নানাবিধ পুষ্টিকর দ্রব্যের সহিত প্রচুর পরিমাণ দুধ ঘি'র ব্যবস্থা থাকে। আমিষও আশ্রমে নিষিদ্ধ নয়—ভিন্ন প্রদেশের রীতি ও রুচি অনুযায়ী মাংস রান্নার প্রণালী দেবীকে সযত্নে শিক্ষা করিতে হইয়াছে সাধুজীর কাছে। এখন তাঁহার মুখে দেবীর হাতের রান্নার সুখ্যাতি ধরে না। শুধু কি ইহাই······ইদানীং দেবীও লক্ষ্য করিয়াছে—তাহার অজ্ঞাতে রান্নাঘরের বাহিরে বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া সংগোপনে সাধুজী চাহিয়া চাহিয়া তাহার রন্ধনপরায়ণা মূর্ত্তিটি দেখিতেছেন···মারাঠা মেয়েদের মত আঁটসাঁট করিয়া দীর্ঘ শাড়ীটি সে পরিয়াছে, আঁচলখানি কটিদেশে জড়াইয়া বাঁধিয়াছে, কালো চুলের রাশি পীঠ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, আগুনের আভায় তাহার মুখখানি আরক্ত হইয়াছে···আর তাহার অজ্ঞাতে অন্তরাল হইতে লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন আর কেহ নয়—তাহার গুরুস্থানীয় পূজ্য সাধুজী। চোখোচোখি হইবামাত্র মৃদু হাসিয়া সরিয়া যান। দেবী ভাবিত, আড়াল হইতে সাধুজী দেখিতেছেন, তাহার কোন অসুবিধা হইতেছে কি না। কিন্তু আজ সে বুঝি লজ্জাকে লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাইতেছে না! ছি, ছি, ছি—সাধুজীর প্রকৃতিও এমনই······আবার মনে পড়িয়া যায়—পড়াইবার সময় ইংরাজী সংস্কৃত ও বাঙলা কাব্য নাটক হইতে বাছিয়া বাছিয়া আদি রসাত্মক অংশগুলি খোলাখুলি ভাবে বুঝাইবার জন্য তাঁহার কি প্রয়াস! লজ্জায় দেবীর আনন আরক্ত হইলেও, সাধুজীর উৎসাহ যেন আরও উগ্র হইতে থাকে। তৎকালে সাধুজীর চোখের ভাষা দেবী বুঝে নাই, বুঝিতে চেষ্টাও করে নাই ; কিন্তু এখন সেই দৃষ্টির কথা মনে পড়িতেই সে শিহরিয়া উঠে—তাহার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়া যায়।······মনে পড়ে—দেবী খবরের কাগজ পড়িয়া শুনাইতেছে সাধুজীকে···আপন মনেই দেবী পড়িয়া যাইতেছে ; হঠাৎ কি একটা প্রশ্ন করিবার জন্য কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সাধুজীর দিকে চাহিতেই দেখে—সাধুজীর চক্ষু মুখ মন সব কিছু নিবদ্ধ রহিয়াছে দেবীর মুখের দিকে। অমনি কি ভাবিয়া সে উঠিয়া পড়ে, প্রশ্ন মনেই থাকিয়া যায়। সাধুজীও তখন দেবীর পড়ার তারিফ করিয়া মোড়টা ঘুরাইয়া দেন। কিন্তু তখন কি দেবী বুঝিয়াছিল—সে দৃষ্টির কি অর্থ। কিন্তু আজ? এখন?···এমনই কতদিনের কত কথাই দেবীর মনে পড়ে, আর ঘৃণায় লজ্জায় তার সমস্ত দেহটি রী রী করিয়া উঠে।

এই সময় পাশের ঘর হইতে সাধুজীর আহ্বান আসিল। সে যে পাকের ঘর হইতে এই ঘরে আসিয়া সংগোপনে সব কথা শুনিয়াছে এবং এইখানেই রহিয়াছে, ইহা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে কোনও সাড়া না দিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গেল।

একটু বিলম্ব করিয়াই দেবী স্বামীজীর গৃহে প্রবেশ করিয়া শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল : আমাকে ডাকছিলেন সাধুজী?

দেবীর মুখের দিকে চাহিতে চোখোচোখি হইবার আশঙ্কায় দেবী চোখের দৃষ্টি নত করিল। দেবীর মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন : মুখখানা ভার ভার দেখছি যে? কেউ কিছু বলেছে নাকি?

তেমনি দৃষ্টি নত করিয়া দেবী জবাব দিল : না তো। হ্যাঁ, তবে একটা স্বপ্নের কথা ভাবছিলাম, কাল রাত্তে ভারি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেবীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন: সে কি গো? এত লেখাপড়া শিখে শেষে স্বপ্ন দেখে ভাবতে বসেছিলে? স্বপ্ন কখনো সত্য হয়?

দেবী অসঙ্কোচে বলিল: স্বপ্নের কথা নিয়ে বিশ্বপণ্ডিতরা ত চর্চ্চাও অনেক করেছেন সাধুজী! অবচেতন মনের ক্রিয়া বলেও অনেকে উল্লেখ করেছেন। ভালো করে ভাবলে বলতে হয়, স্বপ্নের অনেক ব্যাপার যেমন সত্য হয় না, তেমনি সবই মিথ্যা বলে উপেক্ষা করাও চলে না।

—কি স্বপ্ন তুমি দেখেছ দেবী—বল ত শুনি?

—খুব খারাপ, অথচ আমরা যে অবস্থায় আছি, তার সঙ্গে যে খাপ খায় না, একথাও বলা যায় না।

—বেশ ত, বলই না শুনি, কি দেখেছ স্বপ্নে?

—শুনবেন? এখানকার মেয়েরা বড় হলেই যেমন চলে যায়, কিম্বা এখান থেকে তাদের বিদায় করে দেওয়া হয়, তেমনি আমাকেও যেন বিদায় করে দিয়েছেন।

হো হো করিয়া হাসিয়া স্বামীজী বলিলেন: তোমাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে; এই স্বপ্ন দেখেছ তুমি?

—হ্যাঁ। আমাকে যেন অনেক দূরে নিয়ে গেছে কারা। সে দেশ কখনো দেখিনি চোখে। তারপর সেখানে হলো কি, একটা বুড়ো মানুষ—অনেক বয়েস হয়েছে তার, গলায় ফুলের মালা দিয়ে বিয়ের সাজে সেজে আমার সামনে এসে দাঁড়াল; তার পর আমার হাতে এক ছড়া মালা দিয়ে বলল সে—আমার গলায় পরিয়ে দাও, আমিও ঐ মালা তোমার গলায় পরিয়ে দেব।

শুষ্ক কণ্ঠে স্বামীজী বলিলেন: এই স্বপ্ন দেখেছ তুমি? বিয়ে হচ্ছে তোমার—একটা বুড়োর সঙ্গে?

দেবী দৃঢ়স্বরে বলিল: সেই বুড়ো চাইছিল আমাকে বিয়ে করতে। কিন্তু আমি তার হাত থেকে মালা ছড়াটি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে কুচোকুচি করে বললাম—এই জন্যেই তুমি আমাকে এখানে এনেছিলে? সে কথার উত্তরে বুড়ো বলল—হ্যাঁ, তবে আমি তোমাকে বিয়ে করব বলে আনিনি; এনেছিলুম—মেয়ের মত তোমাকে পালন করব বলে; কিন্তু এখন তোমার রূপ দেখে আমার মনে লোভ হয়েছে। আমি তোমাকে চাই—বিয়ে করতে চাই। ঐ এক ছড়া মালা ছিঁড়ে ফেললে কি হবে, এখনি হাজার ছড়া মালা এসে পড়বে।··· আমিও তখন মরিয়া হয়ে উঠিছি; বুড়োকে বললাম—ফের যদি তুমি ও চেষ্টা কর, তাহলে তোমার জীবনটাকেও আমি ঐ মালার মত করে ছিঁড়ে ফেলব জেনো। যেই এ কথা বলা, অমনি আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেই থেকে আমার সারা মন যেন বিষিয়ে উঠেছে সাধুজী।

এই পর্য্যন্ত বলেই দেবী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীজীর মুখের পানে তাকাতেই স্পষ্ট লক্ষ্য করল যে, তাঁহার মুখখানা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে, যেন মুখের উপর কালো একটা ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া স্বামীজী স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন: ছি! এই নিয়ে তুমি মন খারাপ ক'রনা দেবী। তোমার কোন ভয় নেই। কার সাধ্য তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। আজ বিকেলে তোমাকে চণ্ডীদাস পড়ে শোনাব, মন শান্ত হবে।

ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া দেবী বলিল: না, সাধুজী—না, আমি আর পড়ব না, কোন কাব্য চর্চ্চা করব না, ওতে মনের ভাব কোমল হয়। আমি মনকে পাথর করতে চাই—আজ থেকে আমি আবার ছোরা ছুরি নিয়ে কসরৎ করব; তারপর—যেমন করে পারি, আমার এই রূপকে কেটে চেঁচে খুঁচিয়ে এমন কদর্য্য করে তুলব যে, দেখলেই লোকে মুখ ফিরিয়ে নেবে—কেউ আর লুব্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাবে না।

স্বামীজীর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠে···আজই বা হঠাৎ দেবীর মুখে এই সব কথা শোনা যায় কেন? তাহার স্বপ্নের বৃত্তান্ত এবং সেই সূত্রে মনের এই বিক্ষোভ কি নিরর্থক? তিনি ত ভাল ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন—দেবী যেন আজ আর তাঁহার দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিতেছে না। তবে কি অন্তরাল হইতে দেবী লালাজীর সহিত তাঁহার সংলাপ সব শুনিয়াছে? কিন্তু তাহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা মানেই আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া স্বামীজী বলিলেন: তুমি দেখছি আজ বড় উত্তেজিত হয়েছ দেবী। সাধারণভাবে একটা স্বপ্ন দেখে এভাবে অধৈর্য্য হয়ে ওঠা ঠিক নয়। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে পরে কথা হবে; এখন হাত মুখ ধুয়ে আহারের উদ্যোগ কর, আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

এ কথার পর আর কোন কথা না বলিয়া দেবী তাড়াতাড়ি পাকশালায় চলিয়া গেল। স্বামীজী তাঁহার অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি অনুমানের সহিত সাজাইতে বসিলেন।

৫

সে-দিন অপরাহ্নের দিকে লালা লছমন দাস আনন্দ স্বামীর কক্ষে আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন: করাচীর সর্ব্বনেশে খবর শুনেছেন দাদাজী, দেশময় হুলস্থুল পড়ে গেছে!

স্বামীজী তখন অপরাধ-বিজ্ঞান সম্পর্কে একখানি ইংরাজী কেতাব পড়িতেছিলেন; লালাকে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া বইখানি মুড়িতে মুড়িতে বলিলেন: আজকের কাগজে ওখানকার দুর ডাকাতদের ব্যাপার, আর তাদের সঙ্গে পীর পাগোরার যোগাযোগের খবর খুব ফলাও করে বেরিয়েছে বটে! পীর সাহেবের সঙ্গে তোমার কারবার আছে না লালা?

লালা একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন: কেন, আপনিও কি জানেন না দাদাজী—আমাদের আশ্রমের সেরা খদ্দের হচ্ছেন করাচীর পীর পাগোরা, তাঁর টাকাতেই আমাদের যত সব নপর চপর খবরের কাগজে ত আপনি মোটামুটি খবর পড়েছেন, এখন আসল খবর এই চিঠিতে লিখে পাঠিয়েছে ওখানকার দালাল বিঠলদাসজী!...বলিতে বলিতে লালাজী ফতুয়ার পকেট হইতে ডাকঘরের ছাপ দেওয়া পুরু একখানা লেফাফা বাহির করিয়া স্বামীজীর হাতের কাছে রাখিলেন। খামের মুখ খোলা, চিঠিখানা লালা আগেই পড়িয়াছিলেন। স্বামীজী বলিলেন: চিঠি পরে পড়া যাবে, তার আগে তোমার মুখেই খবরটা শুনি—বিঠলদাস কি লিখেছে; সংক্ষেপেই বল আমাকে।

লালাজী বলিলেন: খবর খুব সাংঘাতিক। পীর সাহেবের রঙমহলে এখান থেকে যে সব মেয়ে চালান দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন পালিয়ে এসে পুলিসের কাছে আমাদের সিদ্ধাশ্রমের কথা সব বলে দিয়েছে। বিঠলদাসজী তাই লিখেছেন—এ চিঠি টেলিগ্রাম মনে করে আমরা যেন হুঁসিয়ার হই; মেয়েগুলোকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলি—কেননা, তাঁর ধারণা—পুলিস ঐ চিঠির ব্যাপারে এখানেও তদন্ত করতে পারে।

স্বামীজী বললেন: এ ত ভারি তাজ্জব ব্যাপার হে লালা! করাচীর পীর পাগোরা শুনিছি সিন্ধুদেশের বাদশার মত প্রভাবশালী; তাঁর তাঁবে রীতিমত পলটন আছে; ধনৈশ্বর্য্যেরও সীমা নেই। অথচ, সেখান থেকে একটা মেয়ে পালিয়ে এসে পুলিসের কাছে একরার করল? তার ঘাড়ে কি দুটো মাথা ছিল? আর, তুমিও ত হামেসাই বলে আসছ—তোমার আশ্রম থেকে যে সব মেয়েকে বাইরে পাচার করা হয়, তাদের এমন করে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে রেখেছ যে—কোন বেফাঁস কথা তাদের মুখ থেকে কখনো বেরুবে না। তাহলে এ হলো কি?

লালা বলিলেন: চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লেই সব আপনি বুঝতে পারবেন। কে এক নতুন গোয়েন্দা বিলেত থেকে এলেমদার হয়ে এদেশে আসে, আর সরকার তাকেই পীর পাগোরার হদিস নেবার জন্যে তার পিছনে লাগান। সেই লোকই ভিতরকার খবর সব টেনে বার করে সরকারকে জানায়; সরকারের ফৌজ পীরের আস্তানা ঘিরে ফেলে। তার পর ভিতরে সেঁধিয়ে বিস্তর লুঠের মাল আর হাজার হাজার মেয়ে উদ্ধার করে; তাদের মধ্যে আমাদের আশ্রমের অনেক মেয়ে ছিল—কেবল একটা মেয়ে সেই গোয়েন্দার চালাকীতে ঘাবড়ে গিয়ে এখানকার কথা সব বলেছে।

স্বামীজী জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন: তাহলে বল যে, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কাল সাপ বেরিয়ে পড়েছে। ভালো, চিঠিখানা পড়েই দেখা যাক্।

চিঠিখানা পড়িয়া ও পূর্ব্ববৎ খামের মধ্যে ভরিতে ভরিতে স্বামীজী বলিলেন: পীর পাগোরার মত নামজাদা জবরদস্ত আলেমের আস্তানায় সেঁধিয়ে পুলিস যখন খানাতল্লাসী করতে পেরেছে, তখন আর কোন সুরাহা দেখি না। তারপর এখানকার মেয়েটা যখন একরার করেছে—এই আশ্রম থেকেই তাকে ওরা নিয়ে গেছে, তখন আর সব মেয়েদের কাছ থেকেও পুলিস কথা বার করে নিয়ে তবে ছাড়বে। ভাল কথা, এখান থেকে কতগুলো মেয়েকে পীর পাগোরার আড্ডায় পাঠানো হয়েছে শুনি?

লালাজী একটু ভাবিয়া বলিলেন: তা প্রায় জন বারো হবে, দাদাজী!

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া স্বামীজী বলিলেন: তাহলেই বোঝ এখন ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। পুলিস যদি জানতে পারে, এখনকার একটা বিশিষ্ট আশ্রম থেকে পীর পাগোরার মত কুখ্যাত ব্যক্তির আস্তানায় এইভাবে এতগুলো মেয়ে পাচার করা হয়েছে, তখন ত ওদের মনে এই আশ্রমের ওপরে রীতিমত একটা সন্দেহ জাগবেই। আর, তার ফল কি হবে বুঝতেই পারছ? একেই, বড় বড় মেলা থেকে মেয়ে চুরির হিড়িক সারা দেশে একটা আতঙ্ক ও বিক্ষোভ জাগিয়ে রেখেছে, পুলিস এর কোন কিনারা করতে না পারায় লেখালিখিও হয়েছে; এখন এক সঙ্গে একটা জায়গা থেকে একই আশ্রমের এতগুলো মেয়ে ধরা পড়লে, শুধু পুলিস কেন—সারা দেশের নজর পড়বে এই আশ্রমের উপরে। তার কি ফল হবে জানো—বাইরের ছদ্ম আবরণ কিছুতেই এ আশ্রমকে আর রক্ষা করতে পারবে না। পাপ এমনি করেই সব পয়মাল করে দেয় লালা!

ম্লান মুখে লালা জিজ্ঞাসা করিলেন: এখন আমাদের কি কর্তব্য তাই বলুন দাদাজি?

স্বামীজী এ প্রশ্নের উত্তরে মুখখানি কঠিন করিয়া কহিলেন: এখন হয়েছে কি জানো লালা, এক-চক্ষু হরিণের মত তোমরা একটা দিকেই কড়া নজর রেখে আগুন নিয়ে বরাবর খেলা করে এসেছ; একবারও ভাবনি যে, একটু অসামাল হলেই সর্বনাশ হবে। যাই হোক, আমি এখনি কিছু বলতে পারছিনে—এর পর কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে। আজ আমাকে ভাবতে দাও। কাল বিকেলে এ সম্বন্ধে কথা হবে।

পরদিন খবরের কাগজে করাচীর পীর পাগারোর ব্যাপারটি আরও বিস্তারিতভাবে বাহির হইল। করাচীর পুলিস পীর সাহেবের সুবিস্তীর্ণ আস্তানা খানাতল্লাস করিয়া বহু বন্দীকে উদ্ধার করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে কতক পীর সাহেবের বিরাগভাজন হইয়া কয়েদীর জীবন যাপন করিতেছিল, কতক তাঁহার মিত্রপক্ষের দুষমন বলিয়া এখানে গুম করিয়া রাখা হইয়াছিল। নানা দেশ ও জাতির শতাধিক রূপসী নারীকে পুলিস উদ্ধার করিয়াছে। ইহাদের নিকট হইতে পুলিস যে গোপন তথ্য জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এখনও অবাধে নারী বিক্রয়ের ব্যবসায় চলিয়াছে এবং সমাজের অভিশাপস্বরূপ অর্থলোলুপ এক শ্রেণীর পাষণ্ড মঠ আশ্রম আখড়া প্রভৃতি নামের সাইন বোর্ডের অন্তরালে এই ঘৃণিত ব্যবসায় দীর্ঘকাল ধরিয়া চালাইয়া আসিতেছে। ফলে, ইহারা দেশের গৌরবস্বরূপ কল্যাণধর্মী বিশিষ্ট মঠ ও আশ্রমাদির বিভীষিকাস্বরূপ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্কা সুন্দরী বালিকাদের নিরুদ্দেশ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ পাওয়া যায়, কর্তৃপক্ষের ধারণা, এই সূত্রে তাহার রহস্য আবিষ্কৃত হইবে। সম্প্রতি ওদেশের স্কটল্যাণ্ড ইয়াড ও ওয়াসিংটন ডিটেকটিভ ইয়ার্ড হইতে আধুনিক প্রণালীর গোয়েন্দাগিরীতে বিশেষ শিক্ষা-প্রাপ্ত বিচক্ষণ কর্মী মিষ্টার এ, এন, অধিকারীর উপর সরকার দীর্ঘকাল ধরিয়া এদেশের বালিকাচুরীর রহস্যময় ব্যাপারটির তদন্তভার দিয়াছিলেন। তিনি অভিনব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কার্য্যারম্ভ করিয়া এই সূত্রে দুর্নীতির এমন এক বিরাট কেন্দ্রস্থান আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহার কাহিনী আরব্যোপন্যাসের মত বিস্ময়াবহ। অপহৃতা নারীদের সহিত যে সমস্ত ধন-দৌলত পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ এক কোটী টাকারও অধিক। কুখ্যাত হুর দস্যুগণ কর্তৃক এই বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। বহু দস্যুও এই সঙ্গে ধরা পড়িয়াছে। পল্টনের সাহায্য লইয়া মিষ্টার অধিকারী এই দুষ্কর কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার এই অভিনব আবিষ্কার বহু ছদ্ম প্রতিষ্ঠানের অদৃশ্য অভ্যন্তরে আলোকপাত করিবে।

বৈকালে সংবাদপত্রের এই বিবরণী লালাই স্বামীজীকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। স্বামীজী বলিলেন: কাল তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলে, এ অবস্থায় তোমাদের কি কর্তব্য? এখন সেই কথাই বলছি—আর একটা দিনও নয়, রাতটুকুর মধ্যেই এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে না নিলে, আবার জেলে গিয়ে ঘানি টানতে হবে।

স্বামীজীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া লালা বলিলেন: আপনি কি নিজের দিকে চেয়েও একথা বলেছেন দাদাজী?

—হ্যাঁ। তবে আমার কথাটা আরও একটু

খোলশা করে বলা উচিত মনে করছি। দেবীর সম্বন্ধে তুমিই আমার মনের গলদ ধরিয়ে দিয়ে চোখের পরদা সরিয়ে দিয়েছিলে। ঠিকই ধরেছিলে—আমি দেবীর ওপর আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি—যৌবনে যে রূপ আমাকে বিহ্বল করেছিল, বার্দ্ধক্যে সেই রূপ আমার মনে বৈরাগ্যের প্রবৃত্তি আনতে পারে নাই।

লালাজী জিজ্ঞাসা করিলেন: তাহলে এ অবস্থায় আপনি এখন কি করবেন?

দাদাজী বলিলেন:—প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া এ অবস্থায় আমার করবার কিছুই নেই। আজই বেরিয়ে পড়বো লোটা আর কম্বল মাত্র সম্বল করে।

—দেবীকেও ছেড়ে যাবেন?

—হাঁা; দেবীকে তোমার হাতে দিয়ে যাবো এই সর্ত্তে—তুমি যেখান থেকে ওকে ভুলিয়ে এনেছিলে, সেই খানেই আবার নিয়ে গিয়ে ওর বাপের হাতে সঁপে দেবে। তাতে তুমি মোটা রকমের খশিসও পাবে।

লালা মুখখানা মচকাইয়া বলিলেন: সে গুড়ে বালি দাদাজী! দেবীকে ওর বাপের কাছে নিয়ে যাওয়া মানেই জেলখানায় যাবার জন্তে পা বাড়িয়ে দেওয়া।

স্বামীজী বলিলেন: না—বরং দেবীই তোমাকে নিষ্কৃতির পথে নিয়ে যাবে; তার পরের কথা, তোমার শেষ জীবনটা সুখে ও আরামে কাটাবার উপলক্ষও হবে। আমি সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে এমন ভাবে এক একখার পত্র লিখে দেব—সেখানাই হবে তোমার ছাড়-পত্র! দেবীর মা বেঁচে থাকেন ভালই, নতুবা ওর বাবাও সে পত্র পড়লে কখনই তোমার বিরুদ্ধে যাবেন না। তুমি তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নাওগে—আমি ঐ চিঠিখানা লিখে ফেলি।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী দেবীকে ডাকিয়া স্নেহের সুরে বলিলেন: কাছে বস ত দিদি।

দেবী অবাক। এমন স্নেহের সুরে আহ্বান সাধুজীর মুখে ত ইদানীং শুনে নাই সে। বিদ্রোহী মনকে সামলাইয়া লইয়া দেবী সাধুজীর কাছে বসিল। এইবার পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সহাস্তে ও তেমনি স্নেহের সুরে তিনি বলিলেন: হাত খানি দেখি দিদি।

চোখের দৃষ্টির রূপ আর মুখের কথার সুর ধরিয়া এই মনস্বিনী মেয়েটি মানুষকে চিনিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিল। আশ্চর্য্য, সাধুজীর চোখে এমন নির্ম্মল ভঙ্গি, তাঁর কথায় স্নেহের এমন মাধুর্য্য ত আগে দেখে নাই দেবী। আর এই সম্বোধনও যে একেবারে নূতন। স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে সাধুজীর দিকে একটিবার নীরবে চাহিয়াই বাম হাতখানি সে অগ্রে বাড়াইয়া দিল। দেবীর করতলের রেখাগুলি নিবিষ্টচিত্তে কিছুক্ষণ পরীক্ষার পর স্বামীজী বলিলেন: তোমার হাতে নতুন একটি রেখা উঠেছে দেখছি।

সহজভাবেই দেবী বলিল: তাই নাকি? কিন্তু ও রেখা উঠলে কি হয় সাধুজী?

স্বামীজী বলিলেন: এ রেখা উঠলে সত্যকার আপনার জনের সন্ধান পাওয়া যায়। রেখার সংস্থান দেখে মনে হচ্ছে দিদি—খুব শীঘ্রই হয়ত তোমার বাপ মা'র সঙ্গে মিলন হবে।

বিচিত্র এক পুলকে দেবীর আপাদ মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, শিরায় শিরায় তড়িদ্বেগে শোণিত সঞ্চালনের গতিভঙ্গি সে অনুভব করে। এ কি অদ্ভুত কথা আজ সহসা সাধুজীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—যাহা সে কোনদিন কল্পনাও করে নাই! তাহার পক্ষে যে-ব্যাপারটি একেবারে অপ্রত্যাশিত, সাধুজীর মুখেই তাহা শুনিতে পাইল এই মাত্র! তাহার সত্যকার আপনার জন··· পিতা মাতা···তাঁহাদের সহিত মিলন···একি শুনিতেছে সে? সত্যই কি এই সিদ্ধাশ্রম ছাড়া আর একটা দুনিয়া আছে—যেখানে সে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করিতে পারে···সেখানে কি সত্যই তাহার কোন আপনার জন···।

দেবী আর ভাবিতে পারে না, যেন কিসের একটা আবেগে তাহার সমস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠে, মুখের কথা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়, বিহ্বলভাবে সে সাধুজীর মুখের দিকেই চাহিয়া থাকে।

স্বামীজী তাহার মনোভাব বুঝিতে পারেন, তাঁহারও সমস্ত চিত্ত দুলিয়া উঠে, কিন্তু এ অবস্থায় তাহাকে কি বলিবেন···তাছাড়া, বলা উচিতও নয়; তাই তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া পূর্ব্ববৎ স্নেহের সুরেই বলিলেন: হাতের রেখা দেখেই আমি ঐ সম্ভাবনার কথা বলেছি। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তুমি শীঘ্রই সব জানতে পারবে। এখন কিন্তু এই নিয়ে মনে মনে যেন আকাশ কুসুম রচনা ক'র না

দিদি। এখন তাড়াতাড়ি রাতের খাবারটা তৈরী করে ফেল। খাওয়ার পাট সেরে আমাকে সারা রাত ধরে তোমার হাতের এই রেখ-বিচার করতে হবে। কাল সকালে হয়ত আরও কিছু জানতে পারবে।

ইহার পর দেবীকে পাকশালায় প্রবেশ করিতে হইল। স্বামীজীও তাঁহার কাগজপত্র লইয়া বসিলেন।

দেবী যখন পাকশালায় রন্ধনে ব্যস্ত, সেই সময় স্বামীজী লালাকে ডাকাইয়া তাহার হাতে শীলমোহর করা একখানি পত্র দিলেন। উপরে লেখা নামটি পড়িয়া লালা বলিলেন: আমি ভেবেছিলাম, দেবীর মায়ের নামেই চিঠিখানা লিখেছেন; কিন্তু এ যে দেখছি, দেবীর নামে চিঠি!

স্বামীজী বলিলেন: ভেবে দেখলাম, এইটিই উচিত। আর, এতেই কাজ হবে। অনুরোধ আমি দেবীকেই করতে পারি, আর, দেবী কখনই তা ঠেলতে পারবে না। পরে তুমিও বুঝবে এ চিঠির সার্থকতা। এর মধ্যেই সব আছে। তোমার ভয় নেই লালা, আমি শপথ করে বলছি—তোমাকে কোন রকম অসুবিধায় যাতে পড়তে না হয়, উপরন্তু শেষ জীবনটা সুখে ও আরামে কাটে এবং ওঁরা যাতে তোমার সহায় হন সর্ব্বতোভাবে, সেগুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি এই চিঠি লিখেছি। আমি আবার বলছি, তুমি কোন বিপদে পড়বে না, কোন দুঃখ কষ্ট এর পর তোমার থাকবে না। এ ছাড়াও দেবীকেও আমি এই মর্ম্মে এক আলাদা পত্রে নির্দ্দেশনামা লিখে দিয়ে যাব যে, তোমাকে সন্তুষ্ট রেখে তোমার সুপরামর্শ মত চললে, সে তার বাপ-মা'র দেখা পাবে; তার কারণ—তুমি ছাড়া আর কেউ তাঁদের সন্ধান জানে না। কিন্তু এই সঙ্গে এ কথাও তোমাকে বলছি লালা, তুমি যদি কোন রকমে এ বিশ্বাস ভঙ্গ করে দেবীকে বিপথে নিয়ে যেতে চাও, তাহলে স্বয়ং সয়তানও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

লালাজী একথা শুনিবামাত্র শিহরিয়া উঠিয়া এবং দন্তে জিহ্বা কাটিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন: রাম, রাম, রাম। এমন কথা বলবেন না দাদাজী—শুনেই আমার বুকখানা কেঁপে উঠছে। আমি আপনার ওপর, দেবীর ওপর বেইমানী করব! আর সে কি সম্ভব দাদাজী? আমি আপনার দুই পা ছুঁয়ে বলছি, বেইমানি আমি করব না—হাজারো সয়তান আমার কানে দিন রাত মন্ত্র দিয়েও আমাকে বেইমান বানাতে পারবে না।

ইহার পর সবার অলক্ষ্যে সেই কক্ষেই দুই কর্ম্মী পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন—নীরবে আর্দ্র চারিটি চক্ষুর সংযোগে এই বেদনাকর পর্ব্বের সমাপ্তি হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া অভ্যাসমত সাধুজীকে দর্শন করিতে গিয়া দেবী দেখিল, সাধুজীর সিদ্ধাসনটির কোন চিহ্নই নাই—পুরু কম্বল, গৈরিক বর্ণের আস্তরণ, মহার্ঘ মৃগচর্ম্ম, কমণ্ডলু, কাষ্ঠ-পাদুকা, দণ্ড ও গৈরিক বর্ণের দীর্ঘ ঝুলি—এগুলিও অদৃশ্য হইয়াছে। পড়িয়া রহিয়াছে কতকগুলি গ্রন্থ, পুঁথী, বস্ত্র, ও ব্যবহার্য্য যাবতীয় দ্রব্যাদি। দেবীর বিস্ময়ের অন্ত নাই—অতীতের যবনিকা তুলিলে, যতদূর তাহার স্মরণ হয়, এই কক্ষে একই ভাবে সে দেখিয়া আসিতেছে—মধ্য স্থলে আস্তৃত সাধুজীর বিস্তীর্ণ সিদ্ধাসন, তাহার উপর অধিষ্ঠিত এক সিদ্ধ পুরুষ···যিনি এখানে সর্ব্বজন-বরেণ্য। আজই প্রথম দেখিতেছে—সেই চিরপরিচিত সিদ্ধাসনের সহিত সিদ্ধ পুরুষটিও অদৃশ্য হইয়াছেন।

সহসা শ্বেতপাথরের আধারটির উপর দেবীর দৃষ্টি পড়িতেই দেখিতে পাইল—হাতল দেওয়া একটা বড় ক্লিপের মধ্যে একখানা খামে মোড়া চিঠি রহিয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে খামখানি ক্লিপ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার উপরে সাধুজীর হাতে লেখা নিজ নামটি দেখিয়া দেবী শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণে খাম হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। সাধুজী লিখিয়াছেন—

দিদি! তোমার মনে শিক্ষার যে আলো পড়েছে, তাতে তুমি তোমার শিক্ষাদাতা, প্রতিপালক ও দীর্ঘকালের অভিভাবক এই সাধু-বেশধারী ভণ্ডটির মনোবিকার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ; আর—নিজের মনের বিচারশক্তি দিয়ে কিছু কিছু বুঝতেও পেরেছ। কিন্তু এই বিকারের মূলে ছিল আর একটি মেয়ে—যার আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ, কথা, ভঙ্গি সবই তোমার মত। তরুণ যৌবনে সে ছিল আমার ছাত্রী। কিন্তু নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও ব্রাহ্মণেতর জাতির সেই মেয়েটির রূপগুণে আমি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ভাবি, মেয়েটিও আমাকে প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেবে। কিন্তু আমার অভিপ্রায় সে জানতে পেরে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে আমাকে আঘাত দিয়ে সমস্ত আশা ভেঙে

দেয়। এ হলো আমার প্রথম যৌবনের কথা—তার অনেক দিন পরে তুমি হয় ত পৃথিবীর আলো দেখেছ। কিন্তু শৈশবে তুমি যখন আমার সংস্রবে এলে, তোমাকে সেই বয়সে দেখেই চমকে উঠেছিলাম; তার কারণ, সেই মেয়েটির মুখ ও চোখের আদল যেন তোমার মুখমণ্ডলে দেখতে পেলাম। তার পর শুক্লপক্ষের শশিকলার মত যতই তুমি বাড়তে থাক, তোমার আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে আমি যেন বহুবছর আগে ছেড়ে আসা সেই মেয়েটির রূপরেখা ফুটে উঠতে দেখি। প্রথমে সেই মেয়েটির [illegible]মের সঙ্গে ছন্দের মিল রেখে তোমার নাম রাখি '[illegible]মু'; এর পর সেটা বদল করে নাম রাখি 'দেবী'। আশ্রমশুদ্ধ সবাই এ নাম শুনে খুসি হয়। এর পর কখন যে তুমি কৈশোরের সীমারেখা পার হয়ে যৌবনের সেই চিহ্নিত স্থানটি দখল করে বসেছ, আমি সেটা ধরতেই পারি নাই। আমার মনে হয়—প্রথম যৌবনের সেই ছাত্রীটিই বাঞ্ছিত ও পরিচিত মূর্ত্তি ধরে আমার কাছে এসেছে, কিম্বা হয়ত আমার অবচেতন মনের সাধনার প্রভাবেই তোমার রূপের এই পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আমার মন এমনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে, সময়ের ব্যবধান নিয়েও কোন বিতর্ক ওঠেনি, বা আমি কোনরূপ বিঘ্ন ঘটাতে দিই নাই। মনের এই বিকৃতি আমার প্রকৃতিকে পর্য্যন্ত আড়ষ্ট করে দিয়েছিল; তারই প্রভাবে আমি ইদানীং দুর্নিবার এক কামনার দৃষ্টিতে তোমাকে লক্ষ্য করতে থাকি—যে দৃষ্টি দিয়ে বহু বছর আগে সেই মেয়েটিকে দেখতাম। ক্রমশঃই আমার দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠছিল। সাধক বিল্বমঙ্গলের মনেও একদিন এই বিকার এসেছিল, কিন্তু তিনি সেই বিকারকে নষ্ট করবার জন্যে অসীম মনোবল দিয়ে নিজের দুই চোখ নষ্ট করেছিলেন; আমার সে সাহস নেই বলে, চোখ দুটোর কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছি—এরা আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে, আমার গতি বা গন্তব্য স্থান সেইখানেই। এই হচ্ছে আমার প্রায়শ্চিত্ত দিদি। নিজের কথা এইখানে শেষ করে এখন তোমার কথাই বলছি। যে রেখা তোমার হাতে উঠেছে, তা মিথ্যা বা কাল্পনিক নয়—তোমার পিতা মাতা এই পৃথিবীতে ছিলেন এবং আছেন। এক মাত্র লালাজীই তাঁদের সন্ধান দিতে পারেন। সেই জন্যেই আমি লালাজীর অভিভাবকত্বে তোমাকে রেখে যাচ্ছি দিদি। সে যেমন করেই হোক তোমার পিতা মাতার সন্ধান তোমাকে দেবে। কিন্তু যদি সে দিন সত্যই আসে দিদি, লালাজীকেও তোমায় রক্ষা করতে হবে—ধনে মানে প্রাণে। সে আমার কাছে শপথ করেছে, তোমার নারীত্বের অমর্য্যাদা বা অবমাননা-সূচক কোন কাজই সে করবে না। সুতরাং লালাজীকে অভিভাবক ভেবে তারই নির্দ্দেশমত তোমাকে চলতে হবে। তবে যদি দেখ, লালাজী বিশ্বাস ভঙ্গ করছে, তখন আমার বিশ্বাস, যে শিক্ষা তুমি আমার কাছে পেয়েছ, তারই আলোকে মুক্তির পথ দেখতে পাবে—মহাশক্তিই তখন তোমাকে শক্তি যোগাবেন।—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।' আমিও আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি—দেবীশক্তি তোমার সহায় হোক।

আশীর্ব্বাদক—তোমার সাধুজী।

চিঠিখানি পড়িয়া মুখ তুলিতেই দেবী দেখিল যে, লালাজী নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন! চোখাচোখী হইতেই তিনি বলিলেন: শুনেছ বোধ হয়—দাদাজী আশ্রম থেকে চলে গেছেন?

দেবী হাতের চিঠিখানি দেখাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল: তাঁর এই চিঠি পড়ে এই মাত্র জানতে পেরেছি।

লালাজী জিজ্ঞাসা করিলেন: চিঠিতে তিনি কি লিখেছেন, আমাকে বলবে?

হাত বাড়াইয়া চিঠিখানি লালাজীর সামনে আগাইয়া দিয়া দেবী বলিল: সে অনেক কথা; বলার চেয়ে আপনি পড়েই দেখুন কাকাজী।

চিঠি পড়িতে পড়িতে লালাজীর মনে প্রশ্ন উঠিল, দেবী এ চিঠি তাহাকে পড়িতে দিল কেন? যে সকল কথা ইহাতে আছে, দেবীর মত মেয়ের পক্ষে অপরকে জানিতে দেওয়া ত সঙ্গত নয়! তবে কি, স্বামীজীর প্রস্থানে দেবী ভাঙিয়া পড়িয়া তাহার উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছে? হঠাৎ চিঠি হইতে চোখ দুইটি তুলিয়া বক্রদৃষ্টিতে দেবীর মুখভাব তিনি দেখিয়া লইলেন। কিন্তু সে মুখ আজ অত্যন্ত গম্ভীর, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।

স্বামীজীর চিঠি পড়া হইলে লালাজী পুনরায় দেবীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন: তাহলে তোমার এখন কি মতলব জানতে পারি?

তেমনই শান্ত ও সহজকণ্ঠে দেবী উত্তর করিল: আমি ত আশ্রমের ব্যাপার মোটামুটি জানি। সাধুজীর অবর্ত্তমানে আমি এখন আপনারই সম্পত্তি, যেহেতু আপনিই এখন আশ্রমের সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাছাড়া সাধুজীও আমাকে আপনার নির্দ্দেশ মত চলবার জন্য এই চিঠিতে জানিয়েছেন। এখন আমাকে আপনার মন যুগিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আপনিও জানেন যে, সাধুজীর কাছে আমি যতটুকু শিক্ষা সহবৎ পেয়েছি, তাতে আমার মনের গতি বা প্রকৃতি আশ্রমের আর সব মেয়েদের মতন নয়। সুতরাং আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি কাকাজী—আপনি আমাকে কখনই পণ্যের সামিল করবেন না।

লালাজীও দেবীর কথার সঙ্গে সঙ্গে দন্তে জিহ্বা চাপিয়া রাম নাম স্মরণ পূর্ব্বক রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন: রাম কহ—রাম কহ! ছো-ছো-ছো! আমি কি তোমার হাল চাল রীতি মতি জানিনা দেবীমায়ী! স্বামীজী কাল রাতে আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন—যাতে তোমার বাপ মা'র সন্ধান করে আমি তোমাকে তাঁদের কাছে পৌঁছে দিই।

দেবী এখন লালাজীর মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল: আপনি কি সত্যই আমার অতীত সম্বন্ধে সব জানেন? কার মেয়ে আমি, কোথায় বাড়ী, কেমন করে আমাকে এখানে চুরি করে আনা হয়েছিল—

দেবীর কথায় এখানে বাধা দিয়া লালাজী অপ্রসন্নমুখেই বলিলেন: ও কথা ব'ল না দেবী, এখানে কাউকে চুরি করে আনা হয় না; তুমিও ত ভালো করেই জানো—হারানো মেয়েদের সংগ্রহ করে এনেই এখানে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাদের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা দিয়ে তার পর বড় হলে—তারা যাতে সংসার ধর্ম্ম করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। অবশ্য এর জন্য অর্থও যে আমরা উসুল করি না, তা নয়; কিন্তু আমাদের দায়িত্বের তুলনায় সেটা বেশী নয়। এখনো সমাজের অনেক জায়গাতেই আছে, পাত্রপক্ষকে টাকা পণ দিয়ে মেয়ে নিতে হয়।

দেবী বলিল: দেখুন, আমি এখানকার হাড়হদ্দ সব জানি—আমাকে ভুল বোঝাবেন না। হারানো মেয়েদের নিয়েই আপনাদের এই আশ্রম; আর এখানে তাদের তৈরী করে বিয়ের বয়স হোলে চড়া দামে বিক্রী করাই হোচ্ছে উদ্দেশ্য। কিন্তু কখনো শুনিনি—কোন হারানো মেয়েকে তার অভিভাবকের সন্ধান করে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লালাজী দেবীর এইরূপ মন্তব্যে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া প্রতিবাদের সুরেই বলিলেন: তার কারণ হোচ্ছে—এমন অবস্থায় হারানো মেয়েরা আমাদের আশ্রমে এসে পড়ে, অভিভাবকদের সন্ধান করা নানা কারণে সম্ভব হয় না। হারানো মেয়েরা প্রায়ই কয়েক হাত ফিরতি হয়ে তার পর আমাদের হাতে আসে। এর আগেই তারা বাপ মা দেশভূমির নাম সব ভুলে যায়, অথবা চেষ্টা করে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। মেয়েরাই যদি কোন পাত্তা দিতে না পারে, আমাদের চেপে যাওয়া ছাড়া উপায় কি বল? এই তোমার কথাই বলি—যখন এখানে তোমাকে আনা হয়, বয়স কতই বা হবে, পাঁচ কি বড় জোর ছয় বছর—কিন্তু তোমার মনে কিছু পড়ে? তোমার মত শক্ত ধাতের মেয়ের যদি এ অবস্থা হয়, আর সকলের কথা ত বক্তব্যই নয়।

এ কথায় দেবীর মুখখানা যেন সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। ক্ষণকাল স্থির ভাবে নিস্তব্ধ থাকিয়া তার পর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিয়া উঠল: দেখুন, আমিও এখন প্রায়ই সেই কথা ভাবি—আগেকার কথা আমার মনে পড়ে না কেন? আপনাদের এখানে হারানো মেয়েরা এলে—তাদের শেখানো পড়ানো আমি দেখিছি; কিন্তু তার আগে প্রথম দু'-তিন মাস আপনারা তাদের সংস্রবে কাউকে যেতে দেন না—সেই সময়টা কি যে করেন, আপনারাই জানেন; তবে আমার মনে হয়—মেসমেরাইজ করে তাদের অতীত ভুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা চলে খুব গোপনে। আর এ ব্যাপারে সাধুজী ছিলেন ওস্তাদ মানুষ। কাউকে ঘুম পাড়িয়ে যেমন সাময়িক ভাবে তার মানসিক বা দৈহিক কষ্ট ভুলিয়ে দেওয়া যায়, যোগনিদ্রা বলে একটা ক্রিয়া আছে, তার সাহায্যে মানুষের মন থেকে অতীত স্মৃতি লোপ করে দেওয়া কঠিন নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি—আমাকে একান্ত ভাবে আপনার করে নেবার লোভে সাধুজী আমার মত মেয়ের মনের ওপর যাদু করেছিলেন। যখনই আমি আমার অতীত সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করেছি, সাধুজী তখনই তাতে

প্রচণ্ড বাধা দিয়েছেন। তবে একথাও আমি বলছি কাকাজী, তাঁর প্রভাবের বাহিরে যখন এসেছি, আমার ছেলেবেলার যে স্মৃতিকে তিনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, একদিন সে ঘুম তার ভাঙবেই; আর, এখন থেকে সেই স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলাই হবে আমার মনের সাধনা।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই দেবী সহসা থামিয়া লালাজীর মুখের পানে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। লালাজীও যেন এই রহস্যময়ী মেয়েটিকে আজ আবার নূতন করিয়া জানিবার জন্য তাহার এই ধরণের কথাগুলির ভিতর হইতে কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছিলেন—তাঁহার অবিচলিত দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দিয়া। এই অবস্থায় দেবী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: আমি যে কথা জানতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে, তাতে আপনি বাধা দিলেন বলেই এত কথা আমাকে বলতে হলো। যাক্, এখন আমি আবার সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি কাকাজী—আমার জন্মস্থান, বাপ মা'র কথা, কি ভাবে আমাকে এখানে আনা হয়, এ সব যদি সত্যিই আপনার জানা থাকে—

লালাজী পুনরায় এখানে বাধা দিয়া বলিলেন: জানা আমার নেই, তবে জানবার জন্যে দাদাজী আমাকে বিশেষ করে বলেন; তিনিও কিছু কিছু সূত্র আমাকে দিয়ে গেছেন—যেগুলির সাহায্যে তোমার বাপ মা'র সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আমি এখনি সে সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে পারব না, আর তুমি আমাকে সে অনুরোধও ক'র না। তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি মা—তোমার বাপ মা'র সন্ধান আমি করবই, দাদাজীর মত আমিও কথায় জোর দিয়ে বলছি—তোমার বাপ মা সত্যিই আছেন, আর সন্ধান করে তাঁদের বা'র কর বার মত মাল মসলা আমার কাছে আছে।

দেবী বুঝিল, লালাজী এখন তাহাকে হাতে রাখিয়া নিজের কাজ গুছাইয়া লইবেন। তাহার পিতামাতার কথা জানা থাকিলেও এখনই জানাইয়া তাহাকে এত শীঘ্র মুক্তি দিবার পাত্রই তিনি নহেন। তাই সহজভাবেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল: সাধুজীর অবর্ত্তমানে এখন আমার কি কাজ বলুন কাকাজী—আমাকে কি করতে হবে?

লালাজী বলিলেন: উপস্থিত তুমি তোমার রুটিন মতন কাজই করে যাবে। নিজের হস্ত রান্না বান্না, পড়া শোনা, ব্যায়াম—সবই চলবে। তবে দাদাজী যখন নেই—সে দিকটা ফাঁকই থাকবে। দু এক দিন এই ভাবেই ত চলুক, এরপর যদি কিছু বদলানো দরকার হয়, তোমাকে জানানো যাবে। এখন তুমি তোমার কাজ কর, আমার মাথাতেও এখন অনেক ঝঞ্ঝাট, আমি তাহলে চলি।

তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলিয়াই লালা চলিয়া গেলেন। দেবীও মুখখানা গম্ভীর করিয়া লালাজীর আগের কথাগুলি হইতে তাহাদের নির্গলিতার্থ বাহির করিতে সচেষ্ট হইল।

৬

আফিস-ঘরে গিয়াই লালাজী বিঠলদাসের আর এক খানি চিঠি পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—ব্যাপার খুব সাংঘাতিক, চিঠি পাওয়া মাত্র উপস্থিত আশ্রমের দরজা বন্ধ করে মজুত মালপত্র নিয়ে দূর দেশে না সরে পড়লে হাতেনাতে ধরা পড়তে হবে। করাচীর কাজের ভার পুলিসের ওপর দিয়ে অধিকারী সাহেব আশ্রমের সেই মেয়েটাকে এপ্রুভার খাড়া করে আগ্রায় যাচ্ছেন শীগ্গীর। তাঁর আগ্রায় যাওয়া মানেই বৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রম সার্চ্চ করা। তার আগেই সরে পড়বার ব্যবস্থা করা চাই।

চিঠি পড়িয়া লালাজী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বুঝিলেন, সত্যই আর বিলম্ব করিলে চলিবে না; অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর এই নিষিদ্ধ ব্যাপারের জীবন্ত পণ্যগুলিকে পাচার করিতে হইবে। কিন্তু ইহা ত বড় সাধারণ কথা নয়! ইদানীং নূতন পণ্য আমদানীর পথ এক প্রকার বন্ধ হইলেও, সঞ্চিত পণ্যগুলি রীতিমত বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং দেশব্যাপী অশান্তি, বিপ্লব ও অবশেষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভীতিপ্রদ আবর্ত্ত এই ব্যাপারে দারুণ প্রাতবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং এখনই তাড়াতাড়ি আশ্রমের ষোল সতেরোটি যুবতী কন্যাকে লইয়া কোথায় যাইবেন, কেমন করিয়া লুকাইয়া রাখিবেন? সিন্ধুর পীর পাগোরা ছিলেন এই ব্যাপারের এক জাঁদরেল মহাজন; তুলোট করিয়া তিনি মাল কিনিতেন। পাল্লার এক দিকে বসিত এক একটি যুবতী কন্যা, অপর দিকে সোনা রূপার ইট, ভারি ভারি জেবর বা গহনা। সেই মহাজন মাত হইয়া গেলেন সরকারী গোয়েন্দার সন্ধানী চোখের জলুসে। তাঁহার তুলনায় তিনি ত নগণ্য প্রাণী। এখন উপায়?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চিন্তার প্রবাহ চলিল, কিন্তু উপায় কিছুই স্থির হইল না। এমনই সময় স্থানীয় ডাক পিওন কলিকাতা ডাক অফিসের ছাপ মারা একখানা লম্বা লেফাফা ডেলিভারি দিয়া গেল। খামের উপরে বড় বড় ইংরাজী হরফে প্রতিষ্ঠানের নাম ছাপা—অল ইণ্ডিয়া এনটারটেনমেণ্টস বুরো। খাম হইতে চিঠি খুলিয়া লালাজী সর্ব্বাগ্রে প্রেরকের নামটি পড়িলেন—অবিনাশ সরকার। অমনি আনন্দে তাঁহার ম্লান মুখমণ্ডল হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—'আরে, সরকার সাহেব···এ ব্যাপারের আর এক দিলদার কাপ্তেন···বড় দরের ব্যাপারী···ম্যাদ্দিন পরে হঠাৎ তিনি···ম্যা!'···সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ নিশ্বাসে চিঠিখানি পড়িয়া ফেলিলেন। সত্যই শ্রীরামচন্দ্রজী তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া হাতে হাতে বাঁচিবার উপায় বাতলাইয়া দিয়াছেন! সরকার সাহেবের চিঠির মর্ম্ম হইতেছে: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গড়াইয়া বাঙলা দেশের কলিকাতায় আসিয়াছে। তাই এইখানে বসিয়াছে মহাযুদ্ধের মস্ত ঘাঁটি। পূর্ব্বে সরকার সাহেব নানাস্থানে কার্ণিভ্যাল খুলিয়া আমোদ-প্রমোদের কারবার করিতেন, এখন লাখো লাখো নানা-দেশী পল্টনের চিত্তবিনোদনের জন্য আমোদ-প্রমোদ প্রদর্শনের ভার নসীবের জোরে তিনিই পাইয়াছেন।

উপরওয়ালাদের সহিত চুক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এ ব্যপারে চাহিদা হচ্ছে নাচ গান জানা, সুদর্শনা, হাসি খুসি মেয়ের ঝাঁক। তাই সরকার সাহেবের লোকেরা সেকেলে আড়কাটির মত তামাম হিন্দুস্থানে আমুদে মেয়ের সন্ধানে ঘুরিতেছে; একটি দুইটি নয়—এক শত, দুই শত, সহস্র—যত পাওয়া যায়। টাকার কথা এখানে তুচ্ছ। সুতরাং লালাজীর বৃন্দাবনের আড়তে বারো তেরো বছরের উপরে যতগুলি মাল আছে, গাড়ী-বন্দী করিয়া চালান দিলেও আপত্তি নাই। সরকার সাহেবের এখন নিশ্বাস ফেলিবারও সময়ের অভাব—নতুবা তিনি নিজেই মাল গস্ত করিতে আসিতেন। এ অবস্থায় মিঃ সরকার পুরাতন বন্ধু লালাজীর উপর ভার দিতেছেন—এই পত্র টেলিগ্রাম স্বরূপ মনে করিয়া অবিলম্বে একটি চালান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি মালের সহিত স্বয়ং আসিলে লেন দেন পাকা হইয়া যাইবে ইত্যাদি।

এ হেন প্রস্তাব অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া পড়ায় লালাজীর সকল দুশ্চিন্তা ও দারুণ একটা সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। তিনি জানিতেন, সরকার সাহেব সরকার-ঘেঁসা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। কার্ণিভ্যাল চালাইবার সময় অনেকগুলি মেয়ে তিনি এই আশ্রম হইতে সওদা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং দরের সম্বন্ধেও তিনি খুব দিলদরিয়া। এখনও তিনি সারা ভারতবর্ষে যেখানে যত পল্টনের ঘাঁটি আছে, সেখানকার জঙ্গীদের মনের খোরাক যোগাইবার সরবরাহকার! স্পষ্টই ত লিখিয়াছেন—দুটি একটি নয়, দুশো পাঁচশো হাজারো সওদার চাহিদা সেখানে।

সেইদিনই আশ্রমের মধ্যে ঘোষণা জারি হইল যে, লালাজী সকলকে লইয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হইবেন; সিদ্ধাশ্রমের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রত্যেককে গৈরিকবসন ব্যবহার করিতে হইবে—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আদর্শে সর্ব্বত্র হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবেন। ফলে আশ্রমে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

ওদিকে বড় বড় ট্রাঙ্কের মধ্যে লালাজীর সম্পদ-সমূহ ভরিয়া তালা বন্ধ করা হইল। ট্রাঙ্কের উপর মোটা মোটা হরফে লেখা হইল—শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায়। বহনযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যজাত এবং দীর্ঘকালের সঞ্চিত খাদ্যপত্র বাক্সবন্দী হইয়া ষ্টেশনে প্রেরিত হইল।

লালাজী জানিতেন, কৈফিয়ৎ দিবার মত একজনমাত্র এই আশ্রমে আছেন—কিছুই যাহার লক্ষ্য এড়ায় না; সে হইতেছে দেবী। অষ্টাদশী এই মেয়েটির সঙ্গে বুদ্ধির সংগ্রামে কিম্বা বিতর্কে লালাজীর মত চৌখস ব্যক্তিকেও হিমসিম খাইতে হইত। তাই দেবীর নিকট হইতে প্রশ্ন আসিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাকে জানাইয়া দিলেন যে, দেবীর জন্য তাঁহাকে বাঙ্গালা দেশে সফর করিতে যাইতে হইতেছে। কারণ দেবী বাঙ্গালা দেশের মেয়ে। কিন্তু তাহারা যে বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতায় যাইতেছে, একথা দেবী ভিন্ন তিনি এখনো কাহাকেও বলেন নাই—দেবীও যেন কথাটা চাপিয়া রাখে।

দেবী তাহার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শুধু লালাজীর পানে চাহিয়া কথাগুলি শুনিয়াছিল, কিন্তু কোন কথা নিজে বলে নাই। বাঙ্গালা দেশের মেয়ে সে, কলিকাতায় চলিয়াছে, ইহা ত

তাহার পক্ষে আনন্দের কথা। কিন্তু দেবী লালাজীকে ভাল করিয়াই চিনিত; লালাজীর ঘোষণা সত্য, তাহারা দেশ পর্য্যটনে চলিয়াছে। কিন্তু কালকাত্তাই তাহাদের গন্তব্য স্থান কিনা এবং এই পর্য্যটনের আসল উদ্দেশ্য কি, সে সম্বন্ধে দেবীর মনে গভীর সন্দেহ ছিল—সেইজন্যই লালাজীর মুখের উপর বদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহাকে সত্যের সন্ধান করিতে হয়। সে যাহাই হোক, দেবী কোন প্রতিবাদ করে নাই, তাহার নীরব ভঙ্গিই সম্মতি লক্ষণ বুঝিয়াও লালাজী জিজ্ঞাসা করেন —তোমার কিছু বলবার আছে দেবী?

অবিচলিত কণ্ঠে দেবী বলে—সাধুজী আমাকে যে চিঠি দিয়ে যান, সে চিঠি আপনি পড়েছেন। চিঠিতে জানাবার আগেই আমি তাঁর মনের পাপ ধরে ফেলেছিলাম। নিজেই তিনি সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বেরিয়ে পড়েছেন জেনে আমি যে কত শান্তি পেয়েছি, আর আমার দায়িত্ব যে কত কমে গেছে, আমি তা মুখে জানাতে পারব না কাকাজি। পাপ করলেও যাঁদের চিত্তে প্রায়শ্চিত্ত-পিপাসা জাগে, তাঁরা শ্রদ্ধেয়। তাই আমি সাধুজীর প্রত্যেক কথাটি আদেশ মনে করে মেনে চলব। আপনি ত জানেন, পত্রের শেষের দিকে তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, আপনাকে অভিভাবক মনে করে আমাকে চলতে হবে—আপনার প্রত্যেক নির্দ্দেশ মেনে। এর পর আমার আর বলবার কি থাকতে পারে বলুন কাকাজী। এখন আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার কথা মত চলা ছাড়া আমার উপায় নেই। হ্যাঁ, তবে আপনি যদি সে বিশ্বাস ভঙ্গ করেন, তাহলে তখন আমার কি কর্ত্তব্য—সে কথাও ত সাধুজী আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।

এ কথার পর লালাজী গম্ভীর মুখে বলিলেন: আমি এই কথাই জানতে চেয়েছিলাম—তোমার কথা শুনে সন্তুষ্ট হলাম। তোমার দিক দিয়ে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।

তাড়াতাড়ি উদ্যোগ পর্ব্ব শেষ করিয়া তৃতীয় দিনে লালাজী সদলবলে রওনা হইলেন। বৃন্দাবন ষ্টেশনে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করিয়া কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী মেন লাইনের আগ্রা ষ্টেশনে লরি যোগে ভারি ভারি বাক্সগুলি পাঠাইয়া লগেজ করানো হইল। সম্প্রদায় লইয়া লালাজীও ঐ ভাবে গভীর রাত্রিতে আগ্রায় রওনা হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তুফান মেলের একখানি কামরা সম্প্রদায়ের জন্য রিজার্ভ করা ছিল।

ওদিকে সরকার সাহেবকেও টেলিগ্রাম করা হইল—নির্দ্দিষ্ট ট্রেণ হাবড়ায় পৌছাইবার সময় তিনি যেন স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। আশ্রমের ফটকে তালা লাগাইয়া এমন সতর্কতার সহিত লালাজী এত বড় একটা সম্প্রদায় লইয়া সরিয়া পড়িলেন যে, বাহিরের কেহ কিছু জানিবারও সুযোগ পাইল না।

কিন্তু পরদিন প্রত্যুষেই রীতিমত তোড়জোড় করিয়া বহুসংখ্যক পুলিস প্রহরীর আবির্ভাবে শ্রীবৃন্দাবনের বাসীন্দারা ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তখন প্রকাশ পাইল যে, সিদ্ধাশ্রম পুলিস বাহিনী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্রমের ফটকে বড় বড় তালা ঝুলিতেছে। এ অবস্থায় সকলেই বুঝিলেন যে, পুলিস খানাতল্লাস করিতে আসিতেছে, কোন প্রকারে ইহা জ্ঞাত হইয়া আশ্রমের অধ্যক্ষ লালাজী রাতারাতি সকলকে লইয়া ফটকে তালা লাগাইয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। ভারত সরকারের গুপ্ত তদন্ত বিভাগের স্পেশাল অফিসার এ, এন, অধিকারী সাহেবের পরিচালনাধীনে আগ্রা পুলিস সিদ্ধাশ্রম খানাতল্লাস ও 'সীজ' করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার ধারণা যে, একান্ত তৎপরতার সঙ্গেই তিনি এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যে পাখীর ঝাঁক উড়িয়া যাইবে, ইহা সত্যই অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা হউক, তিনি স্থানীয় মাতব্বর ব্যক্তিদের সমক্ষে ফটকের তালা ভাঙ্গিলেন এবং তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যে।

কিন্তু সমস্ত আশ্রম তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস সত্ত্বেও এমন কোন নিদর্শনই পাইলেন না মিষ্টার অধিকারী, যাহা একজিবিট স্বরূপ কোন অপরাধ-মূলক অভিযোগ প্রণয়নের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। এত বড় একটা বিস্তীর্ণ আশ্রম মধ্যে পুরুষ বাসীন্দাদের বসবাসের নানা নিদর্শন পাওয়া গেলেও, তাহাদের হাতে লেখা এক টুকরা এমন কোন কাগজ মিলিল না, যাহা হইতে কাহারও নাম বা কোন খবর পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য্য এই যে, নারীর বেসাতি সম্পর্কে কোন হদিস পাওয়া ত বড় কথা, তাহাদের বসতি সংক্রান্ত কোন আভাসই পুলিস পাইল না। এমন কি, সাড়ী সায়া সেমিজ ব্লাউজ প্রভৃতির এমন কোন

অংশ, চুলের এক টুকরা ফিতা, কিম্বা ছ'একটা মাথার কাঁটা পর্য্যন্ত কোথাও পড়িয়া নাই। আনন্দ স্বামী যে দিকে থাকিতেন, সেই অংশে আশ্রমের পাঠাগার। তাহার বন্ধ দ্বারেও তালা ঝুলিতেছিল। তালা ভাঙিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অধিকারী সাহেব দেখিলেন—সারি সারি অনেকগুলি আলমারী, প্রত্যেকটি বিবিধ গ্রন্থে পূর্ণ। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, গুজরাটি, ও তেলেগু ভাষায় লিখিত অসংখ্য গ্রন্থ—সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত সংক্রান্ত বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সমাবেশ। একটি আলমারীর মধ্যে যাবতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। আর একটির ভিতর হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথিপত্র। কিন্তু এখানেও কোন পুস্তকের মধ্যে কোন কাগজ পত্র মিলিল না, পুস্তকের মলাটে 'সিদ্ধাশ্রম—শ্রীবৃন্দাবন' ভিন্ন আর কিছু লেখা নাই।

আশ্রমের প্রত্যন্ত দেশে গুহার মত একটি স্থানে অধিকারী সাহেবের দৃষ্টি পড়িল। প্রথম দর্শনে মনে হয় না যে, এদিকে কোন গৃহ আছে। কিন্তু অধিকারীর সন্ধানী দৃষ্টিতে এই গুহাপথেই যে ঘর খানি বাহির হইয়া পড়িল, লালা লছমনজীর তাহাই নিভৃত কক্ষ। এখানে একখানি তক্তপোষের উপর একটি ডেস্ক দেখা গেল। তক্তপোষ খানির উপর হইতে আচ্ছাদনী বস্ত্রখানি তুলিয়া লইবার নিদর্শন রহিয়াছে; দেওয়াল হইতে ছবি এবং ঘরের দ্রব্যাদি চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু শিশু কাঠের পালিশ করা সুশ্রী ডেস্কটির গায়ে চাবির রিঙটি ঝুলিতেছে। সম্ভবতঃ তাড়াতাড়িতে চাবিটি ডেস্ক হইতে খুলিয়া লওয়া হয় নাই। অধিকারীর দুই চক্ষু এতক্ষণে কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ডেস্কের ডালাটি তুলিতেই সবিস্ময়ে তিনি দেখিলেন—পোষ্ট আফিসের ছাপ-মারা কয়েকখানি খামেভরা চিঠি একটি লাল রেশমী ফিতায় বাঁধা অবস্থায় রহিয়াছে। এ অবস্থায় বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, অতিবড় সতর্ক আশ্রম-চালকের যত কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এই ডেস্কই থাকিত। আর সব কাগজ পত্র বাহির করিয়া লইয়া চিঠি কয়খানি ফিতায় বাঁধিয়াছিলেন—কিন্তু তাহা আর ডেস্ক হইতে লইয়া ডেস্কের চাবিবন্ধ করা হয় নাই। সামান্য একটু ভুলে অত্যন্ত হিসাবী মানুষদেরও ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।

চিঠির এই তাড়াটির মধ্যে করাচী হইতে বাজাজ খিঠলদাসের সাবধানী পত্রগুলির সহিত কলিকাতার অবিনাশ সরকারের পত্রখানিও ছিল।

এতক্ষণ পরে অধিকারী সাহেবের মুখ উৎফুল্ল হইল—এইখানেই খানাতল্লাসী শেষ করিয়া তিনি সদলবলে আগ্রা রওনা হইলেন।

সিদ্ধাশ্রম স্থানীয় পুলিসের হেফাজাতে রহিল।

৭

কলিকাতায় এখন যুদ্ধের ঘাঁটি বসিয়াছে। চৌরঙ্গী অঞ্চল নানা দেশের সৈনিকে ভরিয়া গিয়াছে। ইহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য কর্তৃপক্ষকে মুক্ত হস্তে অর্থ ঢালিতে হইয়াছে। মিঃ সরকার এইসব ব্যাপারে করিৎকর্মা লোক—সামরিক বিভাগের কর্ত্তাদের সহিত চুক্তি করিয়াছেন যে, আমোদ প্রমোদ দেখাইবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। ঐ জন্যে নানা দেশের ও সমাজের রূপসী তরুণীদের সংগ্রহ করিতে হইয়াছে তাঁহাকে। নাচ গান হাসি কৌতুক ম্যাজিক প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদিগকে তালিম দিয়া তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়। মিঃ সরকার খুব জাঁক-জমকে থাকিতে অভ্যস্ত। মোটর ছাড়া পথ চলেন না, তাঁহার ফ্লাটে চাকর চাপরাশি দরোয়ান বাবুর্চি আয়া প্রভৃতি গিস্ গিস্ করিতেছে।

মালার মা ইন্দিরা দেবীর মুখে মিঃ সরকারের সুখ্যাতি ধরে না। বলেন—হ্যাঁ, একেই বলে মানুষ—আসতে না আসতেই পাড়া গুলজার—যেন কোথাকার কোন্ রাজা এল—দেখলেই শ্রদ্ধা হয়।

হরপ্রসাদ সে কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—বটেই ত। সাহেব সেজে এসেছে, হাতে ছড়ি, মাথায় টুপি, মোটর, লোকজন—শ্রদ্ধা ত হবারই কথা।

হরপ্রসাদ নিজেই উদ্যোগী হইয়া নরেনকেও তাঁহার এই নতুন ভাড়াটের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন। মিঃ সরকার নরেনের পরিচয় পাইয়া বলেন—আর্টিষ্ট নিয়েই ত আমার বিজনেস; কত আর্টিষ্টকে যে পুষছি তার ঠিক ঠিকানা নেই। যাবেন একদিন আমার চৌরঙ্গীর চেম্বারে—দেবেন একটা পিটিসন—আপনার নামটাও এনলিষ্ট করে নেব।

নরেন সবিনয়ে বলিয়াছিল—আপনার অনুগ্রহের

অজস্র ধন্যবাদ, কিন্তু চাকরী আমার ধাতে পোষাবে না।

ইন্দিরা দেবী কিন্তু ওপর-পড়া হইয়া মিঃ সরকারের সহিত আলাপ জমাইয়া ফেলেন, মালার কথা তুলিয়া তাহার বিদ্যা ও নাচ-গানের খ্যাতি তুলিয়া সাহেবকে সচকিত করিয়া তুলেন। সাহেব বলেন— একদিন এসে আপনার মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে যা'বো মা!

সে আলাপ সেদিন নরেনের কক্ষ হইতে ফিরিবার সময় ফ্লাটের পথে যে ভাবে হইয়া যায়, সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

লালাজী তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায় সহ হাওড়া ষ্টেশনের প্লাটফরমে নামিবার পূর্ব্বেই গাড়ীর গবাক্ষ হইতে দেখিলেন— সরকার সাহেব লোক জন লইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনায় উপস্থিত। লালাজী বাবাজী সাজিয়া কলিকাতায় আসিলেও, সরকার সাহেবের চোখে ধাঁধা লাগাইতে পারেন নাই। গাড়ী হইতে নামিতে নামিতে দুই সাঙাতে চোখে চোখে কথা হইয়া গেল। পরক্ষণে লালাজীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া একটু তফাতে লইয়া গিয়া সরকার সাহেব খুব সংক্ষেপে তাঁহাদের এই ব্যাপারের যে আভাসটুকু দিলেন, তাহাতে লালাজী বুঝিলেন যে, গোবিন্দজী তাঁহাকে সময় বুঝিয়া ঠিক জায়গাতেই আনিয়া ফেলিয়াছেন। সরকার সাহেব হইতেছেন তাঁহার পুরাতন বন্ধু, তাহার উপর শাঁসালো খরিদদার—এখন আবার সরকারের ঠিকাদার হইয়াছেন মজলিশী ব্যাপারে। তাঁহার হাতে আছে মস্ত এক বাড়ী, তার গায়ে প্রকাণ্ড বাগান, তাঁবে আছে অনেক লোক জন। সুতরাং এখানে লালাজী তাঁহার দলবল লইয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পারিবেন, আর যে সব মাল আনিয়াছেন, সরকার সাহেব এক নজরে দেখিয়াই বলিয়াছেন যে, বিস্তর টাকা মিলিবে। এসব ছাড়াও, তিনি আশ্রম হইতে যে বিপুল ধনসম্পদ আনিয়াছেন, সেগুলি নিরাপদে রক্ষা করাই এখন মস্ত কথা। সরকার সাহেবের আশ্রয়ে থাকিলে দুই দিকই বজায় থাকিবে এবং সেখানকার পুলিসের পক্ষে এখানে আসিয়া সন্ধান করা'ও সম্ভব হইবে না। সুতরাং লালাজী খুসী মনেই সরকার সাহেবের আতিথ্য স্বীকারে সম্মত হইলেন। তাঁহাকে অতঃপর আর কিছুই দেখিতে হইল না— সরকার সাহেবের লোকজন মালপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দলের সকলকেই একখানি প্রকাণ্ড মনোরম বাসে তুলিয়া বালিগঞ্জের প্রমোদ-নিকেতনে লইয়া গেল। লালাজী সরকার সাহেবের মোটরে উঠিয়া আলাপ করিতে করিতে চলিলেন।

বালিগঞ্জ অঞ্চলের একাংশে প্রকাণ্ড একখানা বাগানবাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। যুদ্ধের হিড়িকে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে এই বাড়ী লীজ লইয়া আগাগোড়া সংস্কার করিয়া সুচারুরূপে সাজাইয়া মানাইয়া এখন তাহাকে বিভিন্ন শ্রেণীর মিলিটারী অফিসারদের প্রমোদশালায় পরিণত করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সরকার সাহেব ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কার্ণিভ্যাল খুলিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার আইন করিয়া কার্ণিভ্যাল বন্ধ করিয়া দিবার পর মিঃ সরকার মাথা খেলাইয়া যুদ্ধের মরশুমে যোদ্ধাদের অবসর কালে মনের রসদ সরবরাহের ঠিকাদারী পাইয়া মস্ত এক আড়ৎ খুলিয়া বসিয়াছেন। মিলিটারী ঘাঁটিগুলিতে শুধু রেসন বা খাদ্য সরবরাহ করিলেই কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যের সমাপ্তি নাই; অবসরকালে তাহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা করিতে হয়—ইহাই হইতেছে মনের খোরাক। সেই খোরাক সরবরাহ করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছেন মিঃ সরকার কার্ণিভ্যালের কারবারে ভাড়া করা রূপ জীবিনীদের সাহায্যে নিম্ন শ্রেণীর বিবিধ আমোদ প্রমোদ দেখাইয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার প্রচেষ্টা অনেকটা সার্থক হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বিভিন্ন জাতির নওজোয়ানগণ এই মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছেন; কলিকাতা হইয়াছে যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি। বিভিন্ন দেশ ও জাতির যোদ্ধৃবর্গ মহানগরী কলিকাতায় সমবেত হইয়াছেন। ইঁহাদের তুষ্টি-সম্পর্কে কোন্ শ্রেণীর আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা বিশেষভাবে লোভনীয়, সরকার সাহেব ভালভাবেই তাহা জ্ঞাত আছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর আবির্ভাব আমাদের দেশের সততা সত্যনিষ্ঠা সাধুতা সহৃদয়তা প্রভৃতি মানবীয় কোমল বৃত্তিগুলি উৎখাত করিয়া বেপরোয়াভাবে যে সকল দুর্নীতিকে সেকাজে প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বিকৃত ও কদর্য্য আমোদ-প্রমোদও একটি ঐতিহাসিক ব্যাপার। শঠতা, নৃশংসতা, অতি লোভ, সর্ব্বগ্রাসী

স্পৃহা, অনাচার, কালোবাজারী মুনফা প্রভৃতির মত এই উদ্দাম প্রমোদ-ব্যাপারটিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্নীতিমূলক আমদানি। এই প্রমোদ-স্পৃহা মানুষের প্রবৃত্তিকে নরকে নামাইয়া দেয় এবং সভ্য মানব-মনের লজ্জা ও শালীনতাকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। বিদেশী এজেন্টরা এই সব দুর্নীতির প্রবর্ত্তক হইলেও, এদেশের মুনফালোভী দালালরা ইহার মধ্যে ভাগ্যোদয়ের সুযোগ-সন্ধান পাইয়া নাচিয়া উঠে এবং চোখের চামড়া তুলিয়া ফেলিয়া কোমর বাঁধিয়া তাহাদের দালালী করিতে লাগিয়া যায়। ইহারাই পণ্যমূল্যে নারীর লজ্জাকে ক্রয় করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, যুদ্ধের দৌলতে যে সুযোগ আসিয়াছে, আর তাহা আসিবে না। লজ্জাবতী লতা সাজিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকিলে এক মুঠি ভাতও জুটিবে না, যে রূপ-যৌবন বিধাতা দরাজ-হাতে দিয়াছেন—তাহা অনাহারে শুখাইয়া ঝরিয়া পড়িবে। কিন্তু বিধিদত্ত এই রূপ-যৌবনের বাহার দেখাইয়া আঁচলা ভরিয়া টাকা আনিতে দোষ কি?

বনে হাতী ধরিবার সময় ফাঁদ পাতিয়া শিকারীরা পোষা হাতী ছাড়িয়া দেয়, তাহারাই হস্তিযূথকে ভুলাইয়া গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলে। এখানেও সরকার সাহেবের মত প্রমোদ-ব্যাপারীরা রূপসী বাক্‌পটীয়সী নারী হস্তিনীদের সহায়তায় ভদ্রঘরের নারীদের লজ্জার আবরণ মোচন করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করে। পায়ের স্যাণ্ডেল হইতে মাথার চুলের ফিতা কাঁটাটি পর্যন্ত বাড়ী বহিয়া লইয়া গিয়া সযত্নে সাজাইয়া দেয়; তাহার পর বেড়াইবার অছিলায় একটিবার মঞ্চে আনিয়া বসাইলেই সেদিনের মত ছুটি, ফিরিবার সময় অঞ্চলেও কিছু না কিছু বাঁধিয়া দেওয়া হয়, সাজসজ্জাগুলি উপরিলাভ—তবে সর্ত্ত থাকে যে, দিনান্তে অপরাহ্নের দিকে প্রমোদ-মঞ্জিলে একবার বেড়াইয়া যাওয়া চাইই! বলা বাহুল্য, বেড়াইতে আসিয়াও লাভ কি কম? মঞ্চে গিয়া দর্শকমহলকে একবার দর্শন দান করিবার পর জলযোগের হল-ঘরে না আসিলেই নয়—চা কাফি কোকো, কেক, চপ, কাটলেট—দুর্লভ খাদ্যসম্ভার…সরকার সাহেব স্বয়ং হাসিমুখে প্লেট আগাইয়া দেন। তাঁহার মত লোকের অনুরোধ রাখিতেই হয়… লজ্জার বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। সুখাদ্য চর্ব্বণের সঙ্গে সরকার সাহেবের কথাগুলি যেন কর্ণে সুধাবর্ষণ করে…দেখুন, এই যুদ্ধ এসেছে এক শ্রেণীর লোককে পিষে ফেলতে, আর এক শ্রেণীর লোক এই যুদ্ধের দৌলতে গবরমেণ্টের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ সংস্থান করে নিচ্ছে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, কলকাতায় যুদ্ধের ঘাঁটি বসেছে; বড় বড় জাঁদরেল অফিসার সব এখানে জমেছে। আমার ওপর ভার পড়েছে তাদের সামনে আমাদের দেশের আমোদ-আহ্লাদ দেখানো। এর জন্যে কর্ত্তারা দেদার টাকা ঢেলেছেন। এখন আমার ইচ্ছা কি জানেন, যাঁদের অবস্থা সচ্ছল নয়, ইচ্ছা থাকলেও ভাল কাপড় জামা পরতে পারেন না, কোথাও বড় একটা বেরুতে পারেন না—তাঁদের কিছু না কিছু উপায় করে দিই। ভাল ভাল জামা কাপড়, অল্প সল্প কিছু কিছু বা গহনাপত্র পাঠালুম, সেজেগুজে তাঁরা এলেন, মঞ্চে গিয়ে একটু বেড়ালেন, যাঁর গান জানা আছে—একখানা গানই বা গাইলেন—ব্যস্‌, তাহলেই হলো। ওঁরাও খুসী হন, আপনারাও কিছু না কিছু দক্ষিণা আঁচলে বেঁধে নিয়ে বাড়ী যান। দু'-চার দিন এমনি আসা যাওয়া করতে করতে সাহস বেড়ে যাবে, তখন দেখবেন—যিনি গান জানেন না, শিখে নেবেন; নাচবার জন্যে অনেকের পা তখন চুলবুল করবে। তার মানে—এদের জন্যে আলাদা দক্ষিণার বরাদ্দ আছে।

এই ভাবে অভাবগ্রস্ত ভদ্রঘরের নারীদের প্রলুব্ধ করিয়া এই শ্রেণীর দালালরা বিষের বীজ ছড়াইতে থাকে। যে সব মেয়ের মনের জোর থাকে, দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ দেখবার মত সামর্থ্য রাখেন, তাঁহারা এসব প্রলোভন কাটাইয়া সরিয়া যান; অনেক স্থলে অভিভাবিকাদের দৃঢ়তায় দালালদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়—প্রেরিত উপহার-সামগ্রী পদদলিত অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া ইহারা স্থান কাল পাত্র পাত্রী বুঝিয়া এমন কৌশলে প্রলোভন-জাল পাতিয়া বসে যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মানুষের সৃষ্ট অভাব অনটন তাহাদের ধৈর্য্য ও সংযমের আবরণ শতচ্ছিন্ন করিয়া দেয়…ক্রমে ক্রমে ইহারাই প্রমোদ-ব্যাপারের পণ্যে পরিণত হয়।

প্রমোদ-মঞ্জিলের একটি নিভৃত মহলা লালাজীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন সরকার সাহেব। পাঁচখানা বড় বড় ঘর, গোসলখানা, পাকশালা, প্রাঙ্গণ, প্রচুর স্থান। ঘরে ঘরে বিজলির আলো, পাখা। প্রত্যেক ঘর সুসজ্জিত। লালাজী ও সম্প্রদায়ভুক্ত আর সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল; দেবী

একাই বিষণ্ণ। অবশ্য লালাজীর সংস্রবে আসিলেই মুখের উপর উল্লাসের একটা কৃত্রিম আবরণ টানিয়া দিতে হয়। কেননা, কথা বাড়াইতে তাহার আদৌ ইচ্ছা নাই। ম্রিয়মান দেখিলেই লালাজী হয়ত প্রশ্ন করিয়া বসিবেন—সবাই উৎফুল্ল, একা দেবীর মনেই বিষাদ কেন? আসল কথা, ষ্টেশনে অবিনাশ সরকারকে দেখিয়া দেবী খুশী হইতে পারে নাই। চোখের দৃষ্টি দিয়া মানুষের ভিতরটা দেবী পুস্তকের মত পড়িতে পারিত। বছর কয়েক পূর্বে সিদ্ধাশ্রমে অন্তরাল হইতে এই লোকটিকে দেবী দেখিয়াছিল। সেই সময় আশ্রমের তিন মেয়েকে সরকার সাহেব লইয়া যান। দেবী সেদিন সাধুজীকে বলে—জানেন সাধুজী, তিনটে মেয়ে আজ এখান থেকে চলে গেল—এদের বরাতে কি আছে, কে জানে।

স্বামীজী পরিহাসের সুরে বলিয়াছিলেন—ওদের বরাতে বিয়ের ফুল ফুটেছে বোধ হয়। তাই নিয়ে গেল।

দেবী এ কথার উত্তরে বলে—ও কি মানুষ, যে বিয়ে করবে! ওটা যেন খোক্কস—তিনটে মেয়ের রক্ত চুষে খাবে। কি বলব, লালাজী রাগ করবেন, নৈলে আমি ওকে দাঁত দিয়ে টিট করে দিতাম।

যাহারাই সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া মেয়ে লইয়া যাইত, তাহাদের উপর দেবীর ক্রোধের অন্ত থাকত না; সেদিনের সেই লোকটিকে ষ্টেশনে দেখিয়া এবং সেই লোকের আশ্রয়ে ইহারা চলিয়াছে শুনিয়া, দেবী নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। ওদিকে ষ্টেশনে একবার মাত্র বিদ্যুৎ ঝলকের মত দেবীকে দেখিয়াই সরকার সাহেব চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য—শত সহস্র নারী লইয়া তিনি ছিনি মিনি খেলিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এই প্রথম এমন একখানি মুখ তিনি দেখিলেন, কাহারও সহিত যাহার তুলনা হয় না।

গাড়ীতে উঠিয়াই সরকার লালাজীকে জিজ্ঞাসা করেন—সেবার আশ্রমে গিয়ে আপনার ঐ দেবী মেয়েটিকে ত দেখিনি! নতুন আমদানি নাকি?

লালাজী বলেন—নতুন নয়, সে সময় স্বামীজী ওকে নিজের কুঠীতে আগলে রাখতেন—বাইরের লোক ওখানে এলে মিশতে দিতেন না। স্বামীজী ওকে গল্পের দেবী চৌধুরাণী করতে চেয়েছিলেন। মেয়েটি সত্যই অসাধারণ।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সরকার বলেন—তাই নাকি। তাহলে এখনই বলে রাখছি—সবদিক দিয়ে চৌকস্ এমনি একটা অসাধারণ মেয়েই আমার দরকার, মোটা রকমের একটা দাঁও মিলবে।

ম্লান মুখে লালাজী উত্তর করেন—কিন্তু ওটি হচ্ছে নিষিদ্ধ ফল। দেবার উপায় নাই, স্বামীজীর গচ্ছিত মাল কিনা। তাহলে ওর ব্যাপারটা বলি শুনুন—

লালাজী তখন দেবীর কাহিনীটি রাখিয়া ঢাকিয়া—যতটুকু যেভাবে বলা উচিত, সংক্ষেপে অবিনাশ সরকারকে শুনাইয়া দিয়া, এই বলিয়া প্রসঙ্গটির উপসংহার করিলেন যে, স্বামীজী যাবার সময়ও আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন—যেমন করেই হোক ওর বাপের সন্ধান করে ফিরিয়ে দিতে হবে।

সরকার সাহেব সহাস্যে বলেন—বেশ ত, বাপকে ও মেয়ে চেনে না; বাপ একটা খাড়া করতে কতক্ষণ! সে ভার আমিই নিলাম লালাজী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সম্প্রদায় বালিগঞ্জে বাগানবাড়ীতে আসিলে সরকার সাহেব নিজেই হামরাই হইয়া স্বতন্ত্র হলের, বিশেষ কারয়, লালাজী ও দেবীর জন্য আলাদা আলাদা দুইখানি সুসজ্জিত ঘর নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: স্বামীজীর মত সম্মানে তুমি আশ্রমে আলাদা ঘরে থাকতে, তাই তোমার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছি। ঘরখানা পছন্দ হয়েছে ত?

দেবী জিজ্ঞাসা করিল: আপনি কি করে জানলেন যে আমি ওখানে সসম্মানে আলাদা ঘরে থাকতাম?

লালাজী এই সময় সরকার সাহেবের পরিচয় দিয়া দেবীকে বলিলেন: মিঃ সরকার অনেকদিন থেকেই আমাদের আশ্রমের সংস্রবে আছেন। দায়ে ঘায়ে অনেক উপকার করেছেন। ভারি লায়েক আদমী, আর দেখছ ত—এখানে ওঁর কি রকম বোল বোলাও। সরকার সাহেবকে তুমি যেন পর মনে কর না দেবী।

সরকার সাহেবও লালাজীর কথার পীঠে পীঠে বলিলেন: তোমার যখন যা দরকার হবে, তখনি আমাকে বলবে। এ বেলা একটু জিরিয়ে নাও, বিকেলে তোমাকে কলকাতা সহরটা ঘুরিয়ে আনব।

দেবী বলল: আমার দরকার কিছুই হবে না।

নিজের হাতে আমি বেঁধে খাই। আমার সঙ্গে সে সবই এনেছে। ফুরালে বলব বইকি। আর সহর দেখবার কথা বলছেন—যখন এসেছি, দেখা হবেই। আমরা সবাই একদিন এক সঙ্গে এসে কালীঘাটে গিয়ে মা মহামায়ীকে দর্শন করব, তাহলেই সব দেখা হবে।

দেবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য ও আকৃতি শুধু নয়, তাহার কথা বলিবার বাঁধুনি, কথার সুর ও ভঙ্গির স্বাভাবিকতায় সরকার সাহেব একেই অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, নারীর সংস্পর্শে যুক্ত তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে কখনও এমন কাণ্ড ঘটে নাই। তিনি ভাবিয়া পান না, এ মাদকতা মেয়েটির রূপে, স্বাস্থ্যে, কিম্বা তাহার কণ্ঠের অবিচলিত সুরে ও স্বরে।

দেবী কিন্তু দেবী দর্শনের কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছিল কোন উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়াই। অবিনাশ সরকারের আশা ও আকাঙ্ক্ষা তখনও চরিতার্থ হয় নাই—আর একবার দেবীকে দেখিতে এবং তাহার মুখের তীক্ষ্ণ মধুর কথা শুনিবার আশায় উন্মুখ হইয়া রহিলেন।

কিন্তু দেবীর দর্শন মিলিল না। দলের একপাল মেয়ে তখন তাহাদের থাকিবার স্থান লইয়া কলরব তুলিয়াছিল। দেবী শুনিতে পাইয়া, নিজের ঘরের কাজ ফেলিয়া তাহাদের উদ্দেশে ছুটিল। দেবীকে দেখিবামাত্র কোলাহল থামিয়া গেল। দেবী বলিল: একটা কথা সবলে মনে রেখ—আমরা এখন অন্যের বাড়ীতে অতিথি। যা দিয়েছেন বা দেবেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কথায় আছে না—ভিক্ষের চাল হাসি মুখে নিতে হয়, সে চাল সরু কি মোটা, কাঁড়া কি আঁকাড়া—সে বিচার যে করে, তাকে বলতে হয়—আহাম্মুখ। তাই কথা আছে—ভিক্ষের চাল—তা আবার কাঁড়া আঁকাড়া। আমি তোমাদের জায়গায় সব বিলি-ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—সেই জায়গায় যে যার বিছানা পেতে ফেল।

অবিনাশ সরকার সন্নিহিত বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া দেবীর কাণ্ড দেখিতেছিলেন। বুঝিলেন, এ মেয়ে সত্যই অসাধারণ। তিনি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া লালাজীর ঘরের দিকে গেলেন।

লালাজী তখন নিজের ঘরখানি তাঁহার খাস পরিচারকদের সাহায্যে গুছাইয়া লইতেছিলেন। সরকার সাহেবকে দেখিয়া ঘরের বাহিরে বারাণ্ডায় দুইখানা বেতের চেয়ার পাতিবার হুকুম দিলেন অনেক পরিচারককে লক্ষ্য করিয়া। তাহার পর পাশাপাশি দুই জনে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া যে পরামর্শ করিলেন, তাহার প্রধান বিষয়বস্তু দেবী।

ইহার পর সরকার সাহেব দুই বেলাই প্রমোদ-নিকেতনের এই নিভৃত মহলায় আসিয়া দেখা শোনা করেন; অভাব অসুবিধার প্রসঙ্গ তুলিয়া দলের প্রত্যেক মেয়েটিকে ব্যস্ত ও বিব্রত করেন। কিন্তু আসল যাহার লক্ষ্যস্থল দেবী হইলেও, তাহার দর্শন পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে; প্রায়ই জানা যায়, কোনও না কোন কাজে দেবী নিবিড়ভাবে লিপ্ত—তাহার কক্ষদ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ।

কাজের কথা শুনিয়া সরকার সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া ভাবেন, এই বয়সে অতটা একটা মেয়ের এত কি কাজ—যে, সর্ব্বক্ষণই সে ব্যস্ত থাকে, দেখা করিবারও ফুরসদ পায় না? লালাজী হাসিয়া বলেন—সাধে কি বলেছিলাম সাহেব, এ মেয়ে সব দিক দিয়েই অসাধারণ। ভোর চারটা বাজলে বিছানা ছেড়ে ওঠে এখন থেকেই সুরু হয় তার প্রাতঃকৃত্য; তার পর ব্যায়াম, হঠযোগ, পূজা পাঠ, তার পর স্কুল-কলেজের ছেলে মেয়েদের মত নিয়ম করে পড়া শোনা। ও যে শুধু আমাদের দেখবার সরকার সাহেব—মুটিজী আপনি স্বয়ং দেখে খুঁকেছেন।

কিন্তু সরকার সাহেব একটু গম্ভীর হইয়া বলেন,—আপনার কথায় আমার লোভ আরো বেড়ে যাচ্ছে। তবে আপনি ঘাবড়াবেন না—এ ত আর বৃন্দাবনের আখড়া নয়, কলকাতার গোলকধাঁধা; এখন আমি একটা প্ল্যান করেছি শুনুন ত।

পুনরায় দুই বুদ্ধিজীবী পরামর্শে প্রবৃত্ত হন এবং দেবীর রুদ্ধ কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত পরামর্শ চলিতে থাকে।

অবিনাশ সরকার নাছোড়বান্দা—নিজের কাজের ফুরসদ হইতেই তাহার কক্ষে গিয়া গল্প সুরু করিয়া দেন। নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন দেবীকে, তাহার রুচি, সখ, আগ্রহ সম্বন্ধে। দেবী মৃদু হাসিয়া বলে—বেণা বনে মুক্তো ছড়িয়ে কি লাভ বলুন? সখ বলে আমার কিছু নেই, আর বিশ্বের কোন জিনিষের উপরে লোভও রাখিনে।

জিজ্ঞাসার উত্তর যাঁ করিয়া বলিয়াই দেবী এত দ্রুত উঠিয়া পড়ে যে, সরকার সাহেবের মত ঝানু লোকও আর তাহাকে আঁটাইতে সাহস

আবার উভয়ের মধ্যে পরামর্শ চলিল। এদিনের পরামর্শে স্থির হইল যে, কর্তৃপক্ষের সমক্ষে শীঘ্রই প্রমোদ-পর্ব্বের যে বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে, তাহাতে লালাজীর সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবে এবং দেবীকে দিয়াও কতকগুলি আঙ্গিক কসরৎ দেখানো হইবে।

দেবী বুঝিয়াছিল যে, সাধুজীর সঙ্গে লালাজীর অনেক প্রভেদ। লোভের মোহ ইনি এখনও কাটাইতে পারেন নাই; বিশেষতঃ, সরকার সাহেব তাহাতে নূতন করিয়া ইন্ধন যোগাইতেছেন। দেবী ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিল—অবশিষ্ট যে কয়টি মেয়ে সরকার সাহেবের আয়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে প্রমোদ-মঞ্চে উঠিয়া বিদেশী জঙ্গীদের সমক্ষে নানাপ্রকারে আনন্দদান করিতে হইবে। দেবী তলে তলে চেষ্টা করিতেছিল, মেয়েগুলিকে ইহার বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়া নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য ক্ষেপাইয়া তুলিবে। কিন্তু একই আশ্রমে লালিত-পালিতা হইলেও দেবীর শিক্ষা দীক্ষা মনোবৃত্তি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; সে লক্ষ্য করিল, সরকার সাহেবের প্রমোদ-মঞ্চের মোহে তাহারা দেবীর সঙ্গেই লুকাচুরি খেলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বহু সাধ্যসাধনা করিয়াও সরকার সাহেব দেবীকে তাঁহার মোটরে তুলিয়া নগর ভ্রমণে লইয়া যাইতে পারেন নাই: অথচ দেবী জানিতে পারিল, ইতিমধ্যেই ইহারা সহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া ফেলিয়াছে এবং ইদানীং সরকার সাহেবের সহিত মোটর ভ্রমণে ইহাদের উৎসাহের অন্ত নাই। দেবী তখন গম্ভীর হইয়া ভাবিতে থাকে—তাহার এখন কর্ত্তব্য কি? কেমন করিয়া এই কঠিন স্থান হইতে সরিয়া পড়িবে সে।

সেদিন লালাজী দেবীর ঘরে আসিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন: আমার একটা কথা রাখতে হবে মা। সরকার সাহেব মস্ত এক আসর বসাচ্ছেন—বড় বড় সাহেব সুবা সব আসবেন··· যায় লাট সাহেব পর্য্যন্ত। আমাদের আশ্রমের মেয়েরা ঐ আসরে খেল দেখাবে। সরকার সাহেবের একান্ত ইচ্ছা, তুমিও ঐ সঙ্গে এমন দু'চারটে কসরৎ দেখাও, সবাই দেখে ধন্যি ধন্যি করে।

দেবী ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে লালাজীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল: কাকাজী, এখানে আপনার আসার উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেও, এটা কিন্তু কল্পনা করিনি, আপনি আমাকেও এত নীচুতে নামাতে চাইবেন। হোতে পারে, সখ করে ঝোঁকের মাথায় আমি আপনার সাকরেদদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোরা ছুরি চালাবার কসরৎ শিখিছি, কিন্তু তাই বলে আমাকেও আপনি বাইরের লোকের সামনে সেগুলো দেখাতে বলবেন, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি; তাহলে আমি ওসব কখনই শিখতাম না। আপনি শুধু সাধুজীর কথা মনে করুন; তিনি আমাকে যে চিঠি দিয়ে যান—আপনিও তা পড়েছেন!

লালাজী বললেন: হ্যাঁ—সে চিঠিতে তিনি তোমাকে আমার কথা সব মেনে চলতে বলে গেছেন।

দৃঢ়স্বরে দেবী বলল: তাহলে বলব—আপনি কথাগুলি ভুলে গেছেন বা বুঝতে পারেন নি। আমার মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে আপনি যে নির্দ্দেশ দেবেন, আমাকেও তা মেনে চলতে হবে—এ কথাই সাধুজী লিখেছিলেন কাকাজী। আপনাকে আমি এখনি সে চিঠি দেখাচ্ছি।

লালাজী বাধা দিয়া বলিলেন: না, না, তার দরকার নেই; আমার চেয়ে তোমার স্মরণশক্তি যে খুব বেশী, সে আমি জানি। কিন্তু কি করি বল, আমি সরকার সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছি। যদি তুমি কথা না রাখ, তার জন্যে আমাকে মোটা টাকা খেসারত দিতে হবে, হয়ত বা এখান থেকে চলে যেতে হবে।

দেবী বলিল: সেও আপনার পক্ষে অনেক ভাল ছিল কাকাজী। আপনি যদি সরকার সাহেবের পাল্লায় না পড়ে আলাদা একখানা বাড়ী ভাড়া করে সবাইকে নিয়ে উঠতেন—

দেবীর কথায় লালাজী বলিলেন: ওসব কথা শুনতেই ভালো। জানো, সারা দেশের মানুষ আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে? এক মুঠো ভাতের জন্যে কত সোনার চাঁদ মেয়ে ইজ্জত বিলিয়ে দিচ্ছে। সরকার সাহেব আমাদের রাজার হালে রেখেছেন, কোন কষ্ট নেই, যা চাইছি তখনি পাচ্ছি, আমাদের কি কোন কৃতজ্ঞতাও নেই? তবুও আমি তোমাকে নামাতে চাইছি—চায়েলীকে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতাম; কিন্তু তার ভবিষ্যৎ ভাল নয়, ক'দিন থেকেই পেটের ব্যথায় ভুগছে;

সেইজন্যেই তোমাকে ধরা গেছে। লক্ষ্মীটি, এই দিনটির মত তুমি আমার মুখ রাখ। আর আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, এর পর আমার একমাত্র কাজ হবে তোমার বাপ মা'র সন্ধান—

ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া দেবী এইখানে বলিয়া উঠিল: না, না, না, আমার বাপ মায়ের সন্ধান আপনাকে দিতে হবেনা; আমি চাই না, আমি চাই না; আমি জানি—জগতে আমার কেউ নেই, কেউ নেই, আমিই শুধু আমার।

৮

অচ্যুত সরকার সাহেব লালাজীর মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া তাঁহার সুপক্ব ও পুরুষ্টু কোয়াগুলি আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে সিদ্ধাশ্রমের কার্যগুলির অবগুণ্ঠন মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ * তাঁর চমৎকারী সজ্জায় দেখিয়া পুলকিত হইবেন, তিনিও এই সুযোগ কাজে গুছাইয়া লইবেন। ইতিমধ্যেই প্রচারিত হইয়াছে যে, সরকার সাহেব এই গুরুত্বপূর্ণ প্রমোদ প্রদর্শনীর 'অর্গানাইজার'রূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু প্রয়াসে ও বিপুল অর্থব্যয়ে যে সকল আনন্দময়ী উদ্ভিন্নযৌবনা স্বাস্থ্যবতী রূপসীদের সমন্বয় ঘটাইয়াছিলেন, তাহা এক বিস্ময়াবহ ব্যাপার। এই জন্যই তিনি লালাজীকে বিশেষভাবে তোয়াজ করিয়া অবহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, যেমন করিয়া হউক, অন্ততঃ বিভিন্ন কয়েকটি রূপসজ্জায় দেবীকে তিনি মঞ্চে নামাইবেন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া দেবীকেও অগত্যা লালাজীর অনুরোধ রক্ষা করিতে হইয়াছে। গম্ভীর মুখে সে লালাজীকে বলিয়াছে যে, তাঁহার সহিত কথা কাটাকাটি করিয়া একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি করিতে সে অনিচ্ছুক। লালাজীর উপদেশে সে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিজের সমস্ত ভার দিতেছে; এখন তিনিই বলুন, তাহাকে কি করিতে হইবে।

লালাজী ইহাতে যেন বর্তাইয়া যান; কারণ, তর্কে তিনি দেবীর সহিত পারিয়া উঠিতেছিলেন না; এ কথায় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন: খুব ভালো কথা মা! এর পর আমি তোমাকে এমন কোন অনুরোধ করব না, যেটা তোমার মনে না লাগে। শুধু ঐ দিনটার জন্যে তুমি আমার মুখ রাখো, মা! হাঁ, কি তোমাকে করতে হবে, সে কথাও বলছি। সরকার সাহেবের নিজের দলের মেয়েদের নাচ গান হল্লা দেখে দেখে সবার অরুচি হয়ে গেছে। এখন আমাদের পালা। এমন কিছু দেখাতে হবে—সকলেই যেন তাজ্জব মনে করে। সিদ্ধাশ্রমের কন্যাদের হিম্মত তো তোমার অজানা নেই মা; তুমি যদি ভার নাও, যেমন প্রোগ্রাম তুমি করে দেবে, ওরা ঠিক সেই মত চলবে। আর তুমি নিজে এমন কিছু সেজে বেরুবে, সেই সঙ্গে দু' একটা কসরৎ দেখাবে—তুমি ছাড়া যেগুলো আর কারুর পক্ষে অদ্ভুত মনে হবে। বুঝেছ আমার কথা?

দেবী ঘাড় নাড়িয়া বলিল: বুঝিছি; বেশ, আমি একটা নাচের পালা ঠিক করে নিজেই ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেব। মোট কথা, আমি যথাসাধ্য করব কাকাজী—আপনাদের ঋণ শোধবার জন্যে।

শেষের কথাগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দুই চক্ষু অশ্রুভারে ভারী হইয়া আসে— কণ্ঠের স্বরও যেন আর্তনাদের মত শোনায়। লালাজী দেবীর কথায় এত উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইয়া উঠেন যে, উচ্ছ্বাসের দ্বারা তাহাকে ধন্যবাদ দিয়াই তৃপ্তি পান কিন্তু তাহার অন্তরটা বুঝিবার সামান্য চেষ্টাও করেন নাই।

অবশেষে সেই বিশেষ প্রমোদ পর্বের দিনটি আসিয়া গেল। ছুটির দিন বলিয়া বেলাবেলি 'ম্যাটিনী' প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ—মেজর, কাপ্তেন, লেফটেন্যান্ট প্রভৃতি উপাধিধারী বহু অফিসার, কর্তৃপক্ষস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বহু মহিলা মঞ্চের সন্নিহিত আসনগুলি অলঙ্কৃত করিয়াছেন। পিছনের বিস্তীর্ণ আসনগুলি বিভিন্ন দলের সৈনিকগণে পরিপূর্ণ। কলকাতায় তখন পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশের যোদ্ধৃপদবাচ্য ব্যক্তিদের একত্র সমাগম ঘটিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভারতীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সমর-বিভাগের কর্মীদের সংখ্যাও কম নয়।

দেবীর পরিকল্পনা অনুসারে অপরূপ একটি নৃত্য-নাট্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐকতান বাদনের পর আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে সিংহাসনাধিষ্ঠিতা মহীয়সী রাজ্ঞীর সজ্জায় অপূর্ব এক রূপসীকে দেখা গেল। রাজ্ঞীর রূপসজ্জায় এই রূপসী—দেবী।

সিদ্ধাশ্রমের কন্যাগণ রাণীর সহচরীরূপে সুসজ্জিতা অবস্থায় রাণীকে চামর ব্যজন করিতেছে। এমন সময় নৃত্যভঙ্গিতে এক অনুচরী আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া জানাইল যে, দেশে যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়াছে; প্রজাগণ নিরাশ্রয়, অসহায়, অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। এই সংবাদে রাণী চমকিত হইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া, নৃত্যভঙ্গিতে জানাইলেন যে, ভয় নাই, তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।

যেমন রাণীর কথা, সেই মত কাজ। রাণী সহচরীদের সঙ্গে দুর্গত নরনারীদিগকে অর্থ ও পণ্য বিতরণ করিতেছেন। আতুর নরনারী বালক-বালিকাগণ মুক্ত কণ্ঠে রাণীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

ইহার পর দেখা গেল—রণে মত্ত ধ্বংসকারী রাজদস্যুগণের রণনৃত্য। নৃত্যভঙ্গিতে সরদার রাজা জানাইতেছেন—ধ্বংস কর, ধ্বংস কর, ধন ধান্য পণ্য সব লুণ্ঠন কর। সিদ্ধাশ্রমের কন্যাগণই মুখোস পরিয়া পুরুষ সাজিয়াছে।

পর দৃশ্যে সর্ব্বহারা রাণী সহচরীদের সহিত পলাইতেছেন। এখন তাঁহাদের আর সেই বেশভূষা নাই। কিন্তু নিরাভরণা একবস্ত্র-পরিহিতা রূপসী রাণীর রূপ আরও মনোমোহিনী হইয়াছে। নৃত্যভঙ্গিতে রাণী বলিতেছেন—সকলকে লইয়া বনবাসিনী হইবেন। বনের ফল মূল, গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিবেন।

রাজদস্যুগণের উৎসব আরো সব পাবে চলিয়াছে। তাহাদের নৃত্যলীলায় ধরা কম্পমান করিতেছে। সরদার রাজা নৃত্যভঙ্গিতে জানাইলেন, আমোদ-প্রমোদ পরিপূর্ণ করিতে চাই—সুধা। রাজ্যের নারীদের আনো—তাহারা আসিয়া আমাদের আনন্দ সার্থক করিবে। কিন্তু এক অনুচর, নৃত্যের তালে তালে আসিয়া জানাইল—নারীরা নগর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। তাহাদের বড় লজ্জা। রাজদস্যুরা লজ্জার নামে হাসিয়া অস্থির। সরদার রাজা হুঙ্কার দিলেন—লালসা কোথায় ডাক তাকে। সে লজ্জাশীলাদের নির্লজ্জা করিবে।…লোভ ও লালসার প্রতিমূর্ত্তি বিচিত্ররূপিণী এক নারী উত্তম সূক্ষ্ম বসনে সাজিয়া নাচিতে নাচিতে আসিলে সরদার রাজা জানাইলেন তাহাকে—তুমিও নারী, নিজের লজ্জা যেমন করে হারিয়েছ, এই রাজ্যের লজ্জাশীলাদের লজ্জাও সেই ভাবে হরণ করিয়া তাহাদিগকে এখানে আনিয়া উপস্থিত কর। এর জন্য ভাণ্ডার-দ্বার খুলিয়া দাও—স্বর্ণ বস্ত্র আহার্য্য সব লইয়া যাও…তাহাদের বিনিময়ে ক্রীত পণ্যের মত কামিনীদিগকে ক্রয় করিয়া আন।

নগর ছাড়িয়া গ্রামান্তরে আশ্রয় লইয়াছে নারীবৃন্দ…নারীদের বাহারও বক্ষে সঙ্গে সন্তান। অন্নাভাবে কষ্টের অবধি নাই…অভাব রাক্ষসী মুখ ব্যাদান করিয়া ভয় দেখাইতেছে। এমনি সময় রূপ-সজ্জায় সজ্জিতা বিলাসিনীর বেশে নৃত্যভঙ্গিতে আসিল লালসা; তাহার সঙ্গে নানা বস্ত্র, আভরণ, উত্তম উত্তম খাদ্য। অভাব রাক্ষসী তখন অদৃশ্য হইয়াছে। লালসা তাহাদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল চটুল নৃত্যলীলায়। নারীরা লোভাতুরা হইয়া তাকাইয়া আছে—এমন সময় সর্ব্বহারা সেই রাণী আসিয়া বাধা দিলেন—এবং ভূষণ টানিয়া নিক্ষেপ করিলেন। লালসার সঙ্গে উন্মুক্ত ছোরা হস্তে ভীষণ মূর্ত্তি দুই রক্ষী আসিল—লালসা নির্দ্দেশ দিল রাণীকে ধরিতে। অমনি রক্ষীরা অগ্রসর হইতেই রাণীও কটিদেশে লুক্কায়িত ছোরা টানিয়া বাহির করিয়া বাধা দিলেন…দুই জন দুর্দ্ধর্ষ রক্ষীর সহিত একক নারীর ছোরা যুদ্ধ চলিল এবং রক্ষীদ্বয় আহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। তখন রাণীর নির্দ্দেশে নারীরা লালসাকে সম্মার্জ্জনী প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিল।

পরদৃশ্যে পলায়িত রাজা ও রাজপরিষদদের সমক্ষে লালসা আসিয়া তাহার দুরবস্থা নিবেদন করিতেছে নৃত্যভঙ্গিতে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সৈনিকদিগকে আদেশ দিলেন—নারীদিগের সহিত সেই বিদ্রোহী রাণীকেও ধরিয়া আন। লালসা তোমাদিগকে পথ দেখাইবে।

নারীদের তখন চরম অবস্থা। অন্নাভাবে অনশনে দেহ শীর্ণ, অঙ্গ বসন শতছিন্ন, দুর্দ্দশার অন্ত নাই। এমন সময় খবর আসিল—সেই কুটিনী রাজসৈন্য লইয়া তাহাদিগকে ধরিতে আসিতেছে। নারীরা তাহাদের শৌর্য্যরূপিণী রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল—এখন কি করিবে তাহারা?…রাণী নৃত্যভঙ্গিতে জানাইলেন—দুই পথ আছে, ধরা দিয়া মরা, কিম্বা মরিয়া বাঁচা। কি চাও?… নারীরা বলিল…আমরা ধরা দিয়াই বাঁচিতে চাই। অভাব—অনাহার—দারিদ্র্য আর সহ্য করিতে

পারিতেছি না।...রাণী বলিলেন—তোমাদের যাহা অভিরুচি তাহাই কর। কিন্তু আমি মরিয়া বাঁচিতে চাই—তাহা হইলে আমার আদর্শে তোমরাও বাঁচিবে।...রাণী একাকিনী বিপরীত পথে চলিয়া গেলেন সাশ্রুলোচনে বিদায় লইয়া।

রাজপথ। রাজা সৈনিক বেষ্টিত, ধৃতা নারীদিগকে দেখিয়া নিকটে আসিলেন—একে একে প্রত্যেককে দেখিয়া শ্লেষের ভঙ্গিতে জানিতে চাহিলেন—এখন যে বড় আসিলে? কি চাও?

নারীরা জানাইল—তাহারা আনন্দ দান করিয়া বাঁচিতে চায়, খাইতে চায়, বসন ভূষণ আরাম বিলাস চায়—তাই আসিয়াছে।

ভ্রূকুটি করিয়া রাজা লালসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ইহারাই অসীম দম্ভে রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছিল? না, না, না, ইহারা নয়—

নারীরা সভয়ে জানাইল—সত্যই তাহারা নয়; যে তাহাদিগকে মাতাইয়া ছিল, বাঁচিবার জন্য আসিতে দেয় নাই, সে ত আসে নাই; সে গিয়াছে মরিতে।

রাজা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—ভুল, ভুল। তোমরাই মরিতে আসিয়াছ, সেই বাঁচিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইবে না—সে বাঁচিলে রাজতন্ত্র ধ্বংস হইবে, তোমরাও আবার বাঁচিয়া উঠিবে, তাহাকে চাই, তাহাকে চাই—ধরা চাই; চল, চল, সমস্ত শক্তি লইয়া তাহাকে ধরি।...সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—ধর, ধর, তাহাকে ধর। ঘোর রোলে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়িল।

সকল শ্রেণীর দর্শক সমান আগ্রহে এই অপূর্ব্ব নৃত্য-নাট্যের অভিনয় উপভোগ করিতেছিলেন। ঘন ঘন প্রেক্ষাগার করতালি-শব্দে মুখরিত হইতেছিল; বিশেষতঃ রাণীর নৃত্যভঙ্গ এতই চিত্তাকর্ষক হয় যে পরবর্ত্তী অঙ্কটির জন্য প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এই দলটি সম্বন্ধে—বিশেষ করিয়া নায়িকা-নর্ত্তকীর রূপসজ্জায় যে মেয়েটি আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখাইয়াছে, তাহাকে লইয়া আলোচনার অন্ত ছিল নাই। সরকার সাহেব এই দিনই মিস্ মালার সহিত পরিচিত হইয়া তাহাকে এই অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন এবং নিজেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন, তাঁহারা এক পার্শ্বে পাশাপাশি দুই খানি চেয়ারে বসিয়া এই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন। দেবীর রূপ ও নৃত্য দর্শনে মিস্ মালার মুখের কথা বন্ধ হইয়া যায়। প্রথম অঙ্কে যবনিকা পড়িতেই সে যেন হাঁফাইয়া উঠে; সরকার সাহেবকে ঐ মেয়েটির সম্বন্ধে কি যে বলিবে ঠিক করিতে পারে না। এমনই সময় কর্ত্তৃপক্ষের আহ্বানে সরকারকে ব্যগ্রভাবে তাঁহাদের লাইনে গিয়া দাঁড়াইতে হয় হুকুম শুনিবার আশায়। বড় বড় পদস্থ অফিসার প্রত্যেকের মুখেই একই প্রশ্ন দেবী মেয়েটির প্রসঙ্গে।

—ঐ মেয়েটি কি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান?

—কোথা হইতে ওকে সংগ্রহ করলেন?

—বেলজিয়াম থেকে যে কটা মেয়ে কলকাতায় এসেছে, তাদেরই কেউ নাকি?

এই ভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। সরকার সাহেব পুলকিত হইয়া উঠেন; তাঁহার কল্পনা সত্য হইয়াছে; দেবী মেয়েটি সত্য সত্যই সাহেবদের মুণ্ড ঘুরাইয়া দিয়াছে। তিনি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন: না স্যার, আপনাদের অনুমান ঠিক নয়; যে ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার দায়িত্বও ত কম নয়। আমাকে লোক লাগিয়ে ভারতের নানা স্থান থেকে সুগঠনা স্বাস্থ্যবতী আনন্দময়ী মেয়েদের সংগ্রহ করতে হয়। এই নাচের নাটকে তারই নমুনা আপনারা দেখছেন। আর যে মেয়েটির কথা বলছেন, সে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বা বেলজিয়ামের বিউটি নয়—একেবারে ইণ্ডিয়ান গার্ল। এই নাচের নাটকের পর কতকগুলো নির্ব্বাচিত নৃত্যে বিদেশিনী মেয়েরা আপনাদের অভিবাদন জানাবে।

কথা-প্রসঙ্গে ইহাও স্থির হইয়া গেল যে, নৃত্য-নাট্যের পর সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষগণকে ভিতরে লইয়া গিয়া সরকার সাহেব এই নূতন দলটি, বিশেষতঃ নায়িকা মেয়েটির সহিত পরিচিত করিয়া দিবেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই মেয়েটি অর্থাৎ দেবীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ করিবার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে নবাগত জনৈক নূতন অফিসার ছিলেন এবং কোন প্রশ্ন না করিয়া নিবিষ্ট মনে ইঁহাদের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এই প্রমোদ-মজলিসে পুলিস বিভাগের জনৈক পদস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন; নবাগত এই অফিসারটি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নৃত্য-নাটিকার অভিনয়

আগাগোড়া দেখিয়াছেন এবং নর্তকীদের সম্বন্ধে আলোচনাও শুনিয়াছেন। ইনি অন্য কেহ নহেন—করাচীর পীর পাগোরার গুপ্ত আড্ডার উদ্ভাবক ও অবরুদ্ধ নারীদের উদ্ধারক বিচক্ষণ গোয়েন্দা অতীন্দ্রনাথ অধিকারী। বৃন্দাবনের সিদ্ধাশ্রমে প্রাপ্ত পত্র অবলম্বন করিয়া কয় দিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং এদিন কৌতূহলী হইয়া সরকার সাহেবের অনুষ্ঠিত প্রমোদ-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। যুদ্ধের ব্যাপারে 'ন্যাশানাল ওয়ার ফ্রণ্ট' 'ওয়ারিয়ার্স ঘ্যামিউজমেণ্ট সিণ্ডিকেট' 'অল ইণ্ডিয়া য়্যামিউজমেণ্ট ব্যুরো' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তখন টাকা লইয়া ছিনি মিনি খেলিতেছেন এবং সরকারক্রপী গৌরীসেনের কোষাগারের দ্বার এই সকল ব্যাপারে সদা উন্মুক্ত। অতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সবিশেষ বলিয়াও বিশেষ উৎসাহ পান নাই। কারণ, সেনাবিভাগের কর্তৃপক্ষের সহিত সরকার সাহেব চুক্তিবদ্ধ হইয়া সেনাদলের চিত্তবিনোদের জন্য নানাস্থান হইতে প্রমোদ-প্রদর্শনের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছেন। এ অবস্থায় সরকার সাহেবকে দণ্ডবিধির সামনে আনা সহজ কথা নহে। তবে সিদ্ধাশ্রমের সাক্ষ্য লছমন দাসের উপর এক হাত লওয়া যাইতে পারে, যদ্যপি তাহার আয়ত্তাধীনা নারীদের মধ্যে অন্ততঃ একটি নারীও সরকারী সাক্ষী হইয়া সমস্ত স্বীকার করে। এই সময় বিশেষ আনন্দানুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি দেখিয়া বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অতীন্দ্রনাথের জন্য একখানি প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করেন এবং পুলিস অফিসার রূপে তিনি অতীন্দ্রনাথকে লইয়া বিশেষ দৃষ্টিতে এই নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখিতেছিলেন। দৃশ্যের পর দৃশ্যের নৃত্যাভিনয় দেখিতে দেখিতে অতীন্দ্রনাথের দুই চক্ষুর দৃষ্টি পরিবর্তিত হইতে থাকে—তাঁহার স্নায়ুপুঞ্জেও কতকগুলি অভিনব সুরে সঞ্চারিত হইয়া তাঁহাকে কৌতূহলী করিয়া তুলে।

দেবী নিজের জন্য এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র ঘর আলাদা করিয়া রাখিয়াছিল—সেই ঘরে বসিয়া স্বহস্তে সাজসজ্জা করিবার জন্য। মঞ্চ হইতে এই ঘরে আসিয়া সবে মাত্র সে বসিয়াছে, এমন সময় সরকার সাহেবকে সঙ্গে লইয়া লালাজী সেখানে প্রবেশ করিয়া বলিলেন: সবার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছ মা, একবারে তাজ্জব কাণ্ড!

সরকার সাহেব বলিলেন: সিট ছেড়ে কেউ ওঠেনি; এর পর কি কাণ্ড তুমি কর, সেটা দেখবার জন্যে বিপুল আগ্রহ নিয়ে বসে আছে।

দেবী তাড়াতাড়ি উঠিয়া করযোড়ে বলিল: আপনারাও দয়া করে ওঁদের গিয়ে বসুনগে; আমাকে এখনি সাজতে হবে।

সরকার সাহেব বলিলেন: তুমি সাজ, আমরা যাচ্ছি। তবে একটা কথা, ড্রপ পড়বার পর ওপরওলারা এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন, হয়ত প্রেজেণ্ট করবেন তোমাকে দামী দামী জিনিস। তুমি কিন্তু প্রথমে যে পোষাক পরেছিলে, সেইটে পরেই ওঁদের সঙ্গে আলাপ করো—বুঝলে?

'যে আজ্ঞে; তাই হবে। এখন আমাকে ছুটি দিন।' বলিয়াই দেবী ঘুরিয়া দাঁড়াইল। সরকার সাহেব লালাজীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন। দেবী দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় বেয়ারা-ম্যান দ্বারপ্রান্ত হইতে বলিল: আপনাকে সাহায্য করবার জন্যে কিছু…।

'না—আমার কাজ আমি নিজের হাতেই করে নেব; তুমি ওদের দেখগে।' বলিয়া দেবী দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

ক্ষুদ্র ঘরখানির মধ্যে দেবী এখন একা। ধীরে ধীরে সে ড্রেসিং টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বেই একটা আলমারীর মধ্যে সজ্জার উপযুক্ত নানাবিধ পোষাক পরিচ্ছদ ছিল। দেবী সেগুলি টানিয়া বাহির করিয়া টেবিলখানির উপর রাখিল; তাহার পর ক্ষিপ্র হস্তে বাছিয়া বাছিয়া যে সব উপকরণ লইয়া সজ্জিত হইল—অভিনয়ে নৃত্য-নাটিকার নায়িকা নর্তকীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই; এখন তাহাকে দেখিয়া ছদ্মবেশিনী দেবী বলিয়া কে ভুল করিবে? তাহার পরনে খাকী হাফপ্যাণ্ট, গায়ে একটা ময়লা রঙীন জামা, তাহার হাটকও অদ্ভুত। চোয়ালের মত পুরু ও ফুলো, এক খণ্ড নীল রঙের রেশমী চাদর স্কন্ধের দুই পার্শ্ব দিয়া কটি দেশ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। —গলা ও বুকের কাছে পিন দিয়া উভয় পার্শ্বের বস্ত্রাংশ সংযুক্ত। মাথায় গেরুয়া রঙের প্রকাণ্ড এক পাগড়ি। তাহার মধ্যে এলোমেলো খোঁপাটি সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

সজ্জা সমাপ্ত হইলে দেবী সামনের রুদ্ধ দ্বার

কোন সম্বন্ধ নাই। একদিনের ও কিয়ৎক্ষণের আলাপ পরিচয়েই দেবী এই তরুণ শিল্পীটিকে চিনিতে পারিয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির বহু লোকের সহিত তাহার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে, এই ছোকরাটি যেন তাহাদের মধ্যে এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। পুরুষের মুখ চক্ষু ও ভঙ্গি দেখিয়াই দেবী নির্ণয় করিতে অভ্যস্ত যে, কোন্ শ্রেণীর জানোয়ারের প্রকৃতি তাহার প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে! কিন্তু এই প্রথম তাহার দৃষ্টির পরিধি মধ্যে এমন এক পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, সত্যকার মানুষরূপেই যাহাকে সে চিনিতে পারিয়াছে। দেবীর অন্তরে এই সম্পর্কে যে অজস্র বিস্ময়ের আলোড়ন উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে—এই আশ্চর্য্য মানুষটির মানসিক দৃঢ়তা ও অদ্ভুত রকমের সংযমশীলতা। পুরুষের ছদ্মবেশে দেবীর নাটশালায় উপস্থিতি এবং তাহার পর বিস্ময়কর আত্মপ্রকাশের পিছনে যে গভীর রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই সে এ পর্য্যন্ত করে নাই। শুধু তাহাই নহে, বিনা সর্ত্তে দেবীকে সে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া সে সত্ত হইলেও বিচ্যুত হয় নাই সে—ভুলিয়াও প্রশ্ন করে নাই কোন দিন কোন সময় কেন সে পুরুষের ছদ্মবেশ ধরিয়াছিল, কোথা হইতে সে আসিয়াছে, কি তাহার পরিচয়? অবশ্য, নরেন যে সর্ব্ব-বন্দোবস্তযুক্ত কোন তরুণীর আগ্রহ অঙ্কনের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল, তাহার বিলম্বের জন্য হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল এবং দেবী স্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করায় তাহার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু কাজ শেষ হইবার পর স্বল্প সংলাপের মধ্যে দেবী ছেলেটির কৌতূহলবিহীন বলিষ্ঠ মনের যে পরিচয় পায়, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার পর, ভাড়া-করা শাড়ী ও ব্লাউস প্রভৃতি লইবার জন্য তাহার পরিচিত বস্ত্র-প্রতিষ্ঠানের লোক আসিলেই, নরেন যখন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া গৃহস্থঘরের মেয়েদের উপযোগী এগারোহাতি শাড়ী ও ঐ ব্লাউসের মাপের 'ছিটের ব্লাউস' কয়েক জোড়া আনিবার ফরমাস করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়, আড়ালে কথা হইলেও বুদ্ধিমতী দেবী তাহা অনুমানে বুঝিয়া প্রশ্ন করিবামাত্র নরেন যখন সহজভাবেই বলে- 'বিপন্না অবস্থায় শুধু আশ্রয় দিলেই ত গৃহীর কর্ত্তব্য শেষ হয় না।

এখন লজ্জা রক্ষার জন্য বস্ত্র চাই, দেহরক্ষার জন্য খাদ্য চাই। যদি গ্রহণ করতে না চাও, তাহলে আমি বুঝব—মানুষ চিনতে তুমি ভুল করেছ!'—তখন দেবী বেদনার সুরে সবিনয়ে বলিয়া উঠে—'না, ভুল আমি কি অন্যায় করেছি; তবে মানুষ চিনতে যে আমি ভুল করি নাই—এ কথা আমি জোর দিয়েই বলছি। এ-রকম অসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় আমি যখন আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি, আপনাকেই আমার আশ্রয়দাতা অভিভাবক মনে করে আতিথ্য স্বীকার করছি। কিন্তু এই ঋণের বোঝা কি করে যে শোধ করব—'

এইখানে দেবীর কণ্ঠস্বর উদ্গত অশ্রুর বাষ্পে রুদ্ধ হইয়া যায়। নরেনও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়—'তুমি তাহলে আবার ভুল করছ। অতিথির অন্তরে ত ঋণের প্রশ্ন ওঠবার কথা নয়। আন্তরিকতার সঙ্গে আমি যখন তোমাকে আতিথ্য গ্রহণে নিমন্ত্রণ দিয়েছি, আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সেখানে তোমার অন্তরে কোন দ্বিধা বা সংকোচ ওঠবার কথা নয়। তবে যদি আমার সম্বন্ধে তোমার মনে কোন সংশয় ওঠে, আশঙ্কা জাগে, সে কথা আলাদা। তাহলে বুঝব যে, মানুষ বলে আমাকে স্বীকার করে নিতে তোমার অন্তরে এখনো সন্দেহ আছে।'

এই কথায় দেবীর সমস্ত অন্তরটি যেন দোলা দিয়া উঠে। অভিমানের সুরে সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে—'না না, ও কথা আপনি বলবেন না, আমি শুনতে পারছি না। তাহলে এখন আপনাকে বলি—আমার চোখে পূর্ণ মানুষের মূর্ত্তি এই প্রথম পড়েছে। এইখানে এসেই আমি দেখছি, সবাই মানুষ কেমন হয়। দেখুন, এই বয়সে আমি যা দেখেছি, যে আবেষ্টনে আমি মানুষ হয়েছি, যদি আপনি শোনেন—'

শান্ত কণ্ঠে নরেন দেবীর কথায় বাধা দিয়া বলে—'না, সে কথা আমি শুনতে চাইনে। তুমি যে আমাকে মানুষ বলে চিনেছ, এতেই আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আর তোমার সম্বন্ধেও তাহলে বলি—নারী মাত্রেই মহামায়ার কায়া, তাই সকল অবস্থায় তিনি পূজ্যা ও শ্রদ্ধেয়া—এই ধারণা আমি পোষণ করে থাকি। সুতরাং সংশয়ের স্থান এখানে নেই। এখানে আমার কতটুকু প্রতিষ্ঠা, কি অবস্থায় আমি থাকি, সেটা আমি তোমাকে খানিক পরেই বলব। এই বাড়ীর উপরতলায় ভিতরের

দিকে ছোট একটি মহল আছে; সেখানে একখানি থাকবার ঘর, স্নানের জায়গা, রান্নার ব্যবস্থা সবই আলাদা। মহলের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করলে বার মহলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। বার মহলে একখানা ঘরে আমি কেবলমাত্র ছবির কাজ করি। আমার শয়ন কক্ষ ওই নীচেই। চল তোমাকে সব দেখিয়ে দিই; কাপড় চোপড় এসে পড়লেই স্নান করে গা ধুয়ে বিশ্রাম করবে। তার আগে কিঞ্চিৎ জলযোগ ত করা চাই।'

বিনা প্রতিবাদে অতঃপর দেবী নরেনের সঙ্গে উপর-তলায় গিয়া তাহার মহলটি দেখে, আর মনে মনে ভাবিতে থাকে—বিধাতা তাহাকে নরক হইতে এ কোন স্বর্গে আনিয়া এভাবে আশ্রয় দিলেন! কিন্তু খানিক পরে দেবী নরেনের মুখে তাহার বৃত্তান্ত শুনিয়া নরেনকে অনুরোধ করিয়া বলে—'দেখুন, একটু আগে আপনি বলছেন—নারী মাত্রেই মহামায়ার ছায়া, তার সব অবস্থাতেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি, তাহলে আমার কথা হচ্ছে—এই নারী অতিথি হব উনি, আপনার এই ক্ষুদ্র গৃহ গৃহিণীর ভার নিতে হবে। চা-জলখাবার থেকে দুবেলার রান্নাবান্না আমিই করব নিজের হাতে; আমি থাকতে আপনাকে বুকাবার চিন্তা করতে দেব না। আপনি শুধু আপনার ছবির কাজ করে যাবেন; আমিই আপনাকে বলব কোন দিন কি আনতে হবে। তার পর আপনাকে আর কিছুই দেখতে হবে না।

নরেন একথা শুনিয়া একবার শুধু দেবীর মুখের পানে তাকায় এবং তাহার মুখের ভাব দেখে প্রসন্ন মনে জানায়—বেশ, তাই হবে। আমার কোন আপত্তি নাই।

অতঃপর বাঁধাধরা নিয়মে নির্দিষ্ট দিনের পর দিন বেশ নিরাপদে এই দুইটি তরুণ-তরুণীর দিন কাটিতে থাকে। কেবলমাত্র প্রাতঃকালে প্রাতরাশের সময় এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রির প্রথম প্রহরের মধ্যভাগে ভোজনকালে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। সে সময় দেবী সযত্নে নরেনের পরিচর্য্যা করে।

অতি আপনার জনের মতই দেবীর সাগ্রহ যত্ন নরেনকে বিব্রত করিয়া তুলে, কিন্তু দেবীর খাওয়া-দাওয়া সবই সংগোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সেদিকে নরেন আগ্রহ প্রকাশ করিলে সে বলে যে, এদেশের মেয়েরা যে ভাবে সংসার চালায়, রান্নাবান্না করে পুরুষদের আগে যত্ন করে খাইয়ে তার পর আড়ালে বসে খাওয়ার পাট সারে—ছেলেবেলা থেকে সেই শিক্ষা আমি পেয়েছি। অতিথি হলেও আমাকে ঐ অভ্যাস ছাড়বার জন্যে কিছু অনুরোধ করবেন না।

সেই অনুরোধ কোন দিন নরেন করে নাই; তবে প্রথম প্রথম দুই একদিন অনুসন্ধান করিয়াছিল যে, তাহার অতিথি নিজের জন্য আহার্য্যাদি রাখিয়াছে কি না।

নরেনের মুখে দেবী গৃহস্বামীর সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানিয়াছে যে, সস্ত্রীক তিনি বোম্বাই গিয়াছেন, সেখানে তাঁহার কন্যা-জামাতা থাকেন; নরেন এমন আশ্বাসও দিয়াছে যে, তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি, তাঁহার স্ত্রীও দয়াবতী। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে সে দেবীকে কন্যার মত এ-বাড়ীতে আশ্রয় দিবার জন্য অনুরোধ করিবে। সেই সময় দেবী তাহার কাহিনীও বলিবে। দেবীর সম্বন্ধে নরেন এইমাত্র জানিয়াছে, সে অসহায়, নিরাশ্রয়, সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই। তাহার প্রতিপালক বিশ্বাস করিয়া যাহার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া যান, সে ব্যক্তি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করায় সে পলাইয়া আসিয়াছে। [illegible] দেবী [illegible] আশঙ্কা, পাছে [illegible] আসিয়া দেবীকে দেখিয়া ফেলে এবং সেই সূত্রে অনর্থ বাধাইয়া বসে। [illegible] সংক্রান্ত কাগজপত্র [illegible] আনাইয়া দেবী সতর্ক করিয়া রাখিয়াছে। এই মায়া মেয়েটির সান্নিধ্য লাভের জন্য যে নরেন সেদিন প্রতীক্ষায় ছিল এবং দেবী আসিয়াই তাহার আশা-প্রতীক্ষা আর একদিক দিয়া সার্থক করিয়াছে, ইহাও দেবী জানিয়াছে!

দেবী আসার পর নরেনের চিত্রাঙ্কনের কাজ দিবারাত্র অবিরাম গতিতে চলিয়াছে। ইতিমধ্যেই সে দেবীকে আদর্শ করিয়া তাহার সিদ্ধ হস্তের তুলিকায় অপরূপ এক আলেখ্য আঁকিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেখানি তাহা অধ্যাপক ডাঃ রজত রায়ের হাত দিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলে পিকচার এক্জিবিসনের কর্তৃপক্ষের বরাবর পাঠাইয়া দিয়াছে। ছবির নামকরণ করিয়াছে—'ভারত মহিলা।'

অধ্যাপক ছবিখানি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন।

যেদিন সকালের দিকে নরেন ছবিখানি লইয়া অধ্যাপকের বাসায় যায়, সেইদিন তাহার অবর্তমানে তাহার ফ্লাটে এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মালা কয় দিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়াছে, এদিকের ফ্লাটের দরজা সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে, কড়া নাড়িলেও কেহ খুলিয়া দেয় না। তাহার ধারণা, সেদিনের ব্যাপারে শিল্পীর মনে নিশ্চয়ই অভিমান হইয়াছে; সেই জন্যই এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা। কিন্তু তাহাদের ফ্লাটের ছাদ হইতে একদিন এদিকের ফ্লাটে সাড়ীর একটা অংশ উড়িতে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠে। এ ফ্লাটে সাড়ী পরিবার মত কেহ আসিয়াছে নাকি? ফ্লাটগুলি এমনভাবে নির্মিত যে, এক ফ্লাট হইতে উঁকি ঝুঁকি দিয়া অন্য ফ্লাটের কিছুই দেখা যায় না—ছাদের দিকেও ঐরূপ আড়ালের ব্যবস্থা। কিন্তু বাতাস সেদিন অনর্থ বাধাইয়া দেয়—সাড়ীর খানিকটা অংশকে উর্দ্ধাকাশে তুলিয়া। পর দিনই সকালে আপন-ভোলা শিল্পী সম্ভবতঃ রন্ধনরতা দেবীকে নীচের দরজা বন্ধ করিবার জন্য না ডাকিয়াই ভুল ক্রমে চলিয়া গিয়া থাকিবে এবং সেই অবকাশে মালা আচম্বিতে মুক্ত দ্বার পথে ফ্লাটে প্রবেশ করে।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই উঁকি দিয়া মালা দেখিল, শিল্পীর সাধনা ঘরখানির দরজা বন্ধ, কড়ায় বন্ধ তালা ঝুলিতেছে। ঘরের সামনের দালান ও দরদালান অতিক্রম করিয়া সে ভিতর মহলের দরজার সামনে গিয়া দেখিল, ভিতর হইতে তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। মালা সেদিন আসিয়া দেখিয়াছিল, আগের ঘর খানির সামনে দালানে এই সময় শিল্পীর কুকার তাহার আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে। কিন্তু আজ তাহার চিহ্ন নাই। তবে কি শিল্পী ভিতরের পাকশালায় কুকার লইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু···সন্দিগ্ধভাবে মালা ধীরে ধীরে রুদ্ধ দরজার কড়া দুটি বাজাইতে লাগিল।

রান্নার পাট সারিয়া দেবী তখন অবসর পাইয়া মাথার ভিজা চুলগুলি আঁচড়াইতেছিল দীর্ঘ মুকুর-খানির সামনে দাঁড়াইয়া। কড়া বাজিবার শব্দে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিতেই দেখিল, সম্মুখে তাহারই সমবয়সী সুসজ্জিতা এক তরুণী—পরণে তাহার সোনালী রঙের রেশমী সাড়ী, পায়ে লাল রঙের নাগরা, মাথায় কাপড় নেই, আঁচলখানি পিছনের দিকে এলো খোঁপার পাশ দিয়া লুটাইতেছে।

মালা ভাবিয়াছিল, কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া শিল্পী ছুটিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া সামনে দাঁড়াইবে। কিন্তু সে স্থলে যে মূর্ত্তি দেখিল, তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। দুই চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করিয়া সে দেখিল, চওড়া লাল পাড়ের বাহার দেওয়া সাদা ধবধবে সাড়ী পরা এক নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে ঠিক তাহার সামনাসামনি দাঁড়াইয়াছে; মুখখানি তাহার হাসি হাসি হইলেও, কৌতুক যেন তাহার সহিত মিশিয়া ঝলমল করিতেছে; এক রাশি কাল চুল সমস্ত পীঠ ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে; হাতে তাহার মোটা দাড়ার একখানি দেশী চিরুনী—দেখিয়াই বুঝিতে পারিল মালা, কড়ার আওয়াজ পাইয়াই মেয়েটি চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে ছুটিয়া আসিয়াছে দরজাটি খুলিয়া দিবার জন্য।

বিস্মিতা মালাকে অধিকতর বিস্ময়ান্বিতা করিয়া দেবীই প্রথমে কথা কহিল, বিহসিতমুখে প্রশ্ন করিল: আপনিই বোধ হয় মাঝের ফ্লাটের মিস্ মালা?

দেবীর মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মালা জিজ্ঞাসা করিল: আপনার সঙ্গে কোন পরিচয় ত আমার নেই, নাম জানলেন কি করে?

মুচকি হাসিয়া দেবী উত্তর দিল: নাম ছড়িয়ে বেড়ানো যাঁদের পেশা, পরিচয় না থাকলেও তাঁদের জানতে দেরী হয় না।

কথাটা মালার ভাল লাগিল না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল: আমরা ত জানি, এখানে একজন আর্টিষ্ট থাকেন—ছবি আঁকেন তিনি। তাঁকে ডাকতেই চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে এসে আপনি সাড়া দেবেন, তা ভাবি নি। জানতাম না কিনা!

মুখের হাসি আরও একটু তীক্ষ্ণ করিয়া দেবী কহিল: কিন্তু এটাও আপনার জানা উচিত ছিল—ছবি আঁকতে হোলে মডেল চাই; আর যারা চিরুনীতে এলো চুল আঁচড়ায়—তারাই মডেল হোয়ে আসে শিল্পীর কাছে।

দুই চক্ষু বড় করিয়া মালা জিজ্ঞাসা করিল: আপনি কি তাহলে নরেনবাবুর মডেল হয়ে এসেছেন এখানে?

তেমনই হাসিমুখে দেবী জবাব দিল: আপনার

সৌজন্যেই এই চান্সটা আমার জীবনে এসে গেছে।

রুক্ষস্বরে মালা জিজ্ঞাসা করিল: তার মানে?

স্নিগ্ধ কণ্ঠে দেবী বলিল: বুঝতে পারেন নি—সত্যি বলছেন?

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মালা বলিল: আপনার সঙ্গে দিল্লিবিলিলেন্স করতে আসিনি; কি মনে করে ঐ কথাটা বললেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

একটু গম্ভীর হইয়া দেবী বলিল: তাহলে আট দিন আগের কথা আপনাকে মনে করতে বলি। বেলা চারটের সময় নীচের ঘরে শিল্পীর সঙ্গে আপনার সিটিং দেবার কথা থাকে। আপনি না আসায় শিল্পীর যোগাড়-যন্তর যখন পণ্ড হতে বসেছে—কাজ খুঁজতে খুঁজতে সেই সময় আমি এসে পড়ি; আপনার আসনে তখন আমাকেই বসিয়ে শিল্পী তাঁর কাজ তুলে নেন। কথাটার মানে এখন বুঝতে পেরেছেন?

মুখখানা বিকৃত করিয়া ঘৃণার ভঙ্গিতে ও সুরে মালা বলিয়া উঠিল: ননসেন্স! আমার ত আর কাজ ছিল না—একটা লোফারের সামনে বসে তার মডেল হওয়া আমি ডিসগ্রেস্‌ মনে করি।

শেষের সুরে দেবীও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল: কিন্তু সেই লোফারের সামনে হাত পেতে এই উদ্দেশ্যেই যখন পাঁচ টাকার নোটখানা নিয়েছিলেন, তখনো কি আপনার মনে এই বিরাগটুকু ছিল?

দেবীর কথাগুলি ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মত মালার হৃদয়টি বুঝি তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ করিল—সুন্দর মুখখানি তার মুহূর্তমধ্যে কালো হইয়া গেল. এত বড় কথা এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে নাই, আজ কি না বাজারের একটা ভাড়াটে মেয়ে এ বাড়ীতে উড়িয়া আসিয়া তাহাকে অপমান করে? কিন্তু তাহার কথার উত্তর দিবার মত ভাষা না পাইয়া মালা এক দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বসিল: ডান হাতখানা সবেগে তুলিয়া দেবীর গণ্ডের দিকে চালাইয়া দিল। দেবী বোধ হয় জানিত, মুখের দৌড় কমিলে হাত সক্রিয় হইয়া উঠে! তাহার এই অভিজ্ঞতা সার্থক হইল। মালার হাত তাহার গণ্ডে পড়িবার আগেই সে কিশোরের হাতের অভ্যস্ত কৌশলে মালার হাতখানি চাপিয়া ধরিল এবং মণিবন্ধের দুর্ব্বল স্থানটিতে এমন টিপুনি দিল যে, মালার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, সেই সঙ্গে বিবর্ণ মুখ দিয়া যন্ত্রণার সুরে আর্ত্তস্বর খসিয়া বাহির হইল—মাগো!

ওদিকে কিছু পূর্ব্বে ইহাদের কথা কাটাকাটি শুনিয়া নরেন নিঃশব্দে দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং এই অনর্থের জন্য নিজের অসতর্কতামূলক প্রসঙ্গকেই দায়ী করিতেছিল মনে মনে। সংঘাতের এই মোক্ষম সময় নিকটে আসিয়া উদ্বেগের সঙ্গে বলিল: একি কাণ্ড?

মালা অসহায় ভাবে আর্ত্ত করুণ দৃষ্টিতে নরেনের দিকে তাকাইল—সে দৃষ্টি দিয়া তাহার দৈহিক যন্ত্রণার আভাস পাওয়া যাইতেছিল। নরেন মিনতির সুরে দেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল: ওকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু দেবীর মূর্ত্তি একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুনের ঝলক বাহির হইতেছে—তাহার আভায় মুখখানাও ঝলমল করিতেছে যেন। নরেনের মিনতি বোধ হয় তাহার কর্ণস্পর্শ করে নাই। এই সময় মালা ধনুকের মত বাঁকিয়া এলাইয়া পড়িবার মত হইয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতে প্রয়াস পাইল—'খুন করলে আমাকে… মাগো!' কিন্তু বেদনায় আড়ষ্ট কণ্ঠ দিয়া অত্যন্ত ক্ষীণভাবেই সে স্বর বাহির হইল।

নরেন তখন কম্পিত কণ্ঠে যুক্ত করে মিনতি জানাইল: সত্যই মরে যাবে—ওকে ছাড়, আমার অনুরোধ।

মালার হাত ছাড়িয়া দিয়া দেবী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল: যা হয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে আমি বলছি—শুনে আপনি বিচার করুন।

নরেন বলিল: আমি সব শুনেছি; তোমার কোন দোষ নেই। অনধিকার প্রবেশ ও অনধিকার চর্চ্চার জন্য ওঁর লজ্জা পাওয়া উচিত।

দেবীর চক্ষু দিয়া তখনও যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতেছিল। মালার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া দৃপ্ত স্বরে সে বলিল: আমার গায়ে কেউ হাত তুললে সে হাত আমি আস্ত রাখি না। আপনার কথাতেই ওঁর হাতখানা রক্ষা পেল।

দেবীর এই পরিবর্ত্তিত রূপ মালার চোখে পড়িতে এই অবস্থাতেই হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল; তাহার মনে পড়িয়া গেল—এইরূপ সে দেখিয়াছে। হ্যাঁ, এই চোখ, এই মুখ, এই ভঙ্গি! সেদিন

প্রমোদ-মজলিসে মঞ্চের উপর যে মেয়েটি নায়িকা রাণী সাজিয়া নাচিয়াছিল, প্রথম অঙ্কের পর যে পলাইয়া যায়, সেই মেয়েটিই—এখানে এই ফ্ল্যাট বাড়ীতে শিল্পী নরেনের মডেল হইয়া লুকাইয়া আছে। মালা আজ নিজের লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া তাহাকে চিনিয়াছে। আন্তরিক কষ্টের দরুণ মালার বেদনাক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখেও অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বুকে বিজলী বিকাশের মত হাসির রেখা আঁকিয়া দিল। কিন্তু তাহার মুখের এই পরিবর্তিত ভঙ্গিটুকু দেবীর দৃষ্টি এড়াইল না।

বিস্রস্ত বেশভূষা ও এলায়িত দেহটিকে গুছাইয়া সোজা করিয়া মালা টলিতে টলিতে দালানের দিকে গেল, তাহার পর সেখান হইতে মুখখানি ফিরাইয়া শ্লেষের সুরে নরেনকে বলিল: বড়ো বাড়ী ছেড়ে যেতে না যেতেই আপনি এখানে মজা জমিয়েছেন ভালো?

নরেন বলিল: কথাটার কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না।

'মানে না হয় আর এক দিন এসেই বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।'—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়াই মালা দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

দেবী বলিল: আমি আর এ কথার মানে বোঝাবার মত সাহস ওঁর মনে নেই। তাই সব দেখিয়ে গেলেন।

নরেন বলিল: ওকে চটানো মানেই বোলতার বাসায় ঘা দেওয়া। ওঁর চেয়ে ওর মাকে আমার বেশী ভয়।

দেবী সহাস্যে বলিল: সমবয়সীদেরই চিনি, আর তাদের সঙ্গে ঝগড়া হোলে আমি সবসময়েই জিতি। বেশ ত, বর্ষীয়সী ঝগড়াটে মেয়েদের গল্পই শুনিছি, একদিন মুখোমুখী না হয় হওয়া গেল। থাক্, আপনি হাত মুখ ধুয়ে আসুন, আমি ভাত বাড়ি ততক্ষণ।

দেবী ভিতরে চলিয়া গেল; নরেনও নীচে তাহার ঘরের দিকে নামিতে লাগিল।

হরপ্রসাদ প্রদত্ত তাঁহার হারানো কন্যার বালিকা বয়সের ছবিখানির বর্তমান আদলটি আন্দাজ করিবার জন্য মালার স্থলে দেবীর পরিপুষ্ট অঙ্গের আদল দেখিয়া শিল্পী নরেনকে দারুণ চিন্তায় পড়িতে হয়। রাত্রির পর রাত্রি উপরের ছাদ-ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কত কি সে ভাবিতে থাকে। চিত্রবিদ্যাও যে অনেক স্থলে অঙ্কের মত নিজের অবকাশ রাখে, শিক্ষিত-পটু শিল্পী নরেনকে গভীরভাবে অনুশীলন ও অনুভূতির প্রভাবে তাহা উপলব্ধি করিতে হইয়াছে। দিবারাত্রি পরিশ্রমের ফলে, সেই বালিকার বর্তমান সময়োপযোগী আলেখ্যটি আঁকিবার পর, তাহাকে বার বার দেখিয়া সে চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে। এদিকে দেবীকে আদর্শ করিয়া যে ছবি আঁকিয়া পিকচার একজিবিসনে পাঠাইয়া দিয়াছে, যদিও সে ছবি তাহার কাছে এখন নাই, কিন্তু তাহার অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, হরপ্রসাদ-বাবুর বালিকা কন্যার প্রমাণ ছবিখানির সহিত তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। এক এক বার মনে হয়, হয় ত দেবীকে দেখিবার পর সে প্রভাবান্বিত হওয়াই ঐ ছবি আঁকিয়াছে, সেইজন্য এই সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। কিন্তু দেবীর মূর্তির সহিত মিলাইয়া দেখা যদিও এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই, তাহা হইলেও হরপ্রসাদ বাবুর কন্যার পূর্ণায়তনের ছবি দেখিয়া দেবীর পানে তাকাইলে মনে হয় যে, দেবীকে দেখিয়াই সে এই ছবি আঁকিয়াছে। কিন্তু শিল্পী নরেনের অঙ্কিত ছবির বৈশিষ্ট্য এই যে, একখানি ছবির সহিত আর একখানি ছবির কোন সাদৃশ্যই ধরা পড়ে না। তথাপি নরেনকে রীতিমত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইতে হইয়াছে বৈকি। এই জন্যই ওদিকের কাম্য সমাপ্তির পর সে অবসর সময়ে দেবীকে নীচের ঘরের সেই স্মরণীয় স্থানটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আনিয়া এখন একটি বিশিষ্ট ভঙ্গির আলেখ্য আঁকিতেছে—হরপ্রসাদ বাবুর কন্যাটির বহুদিনের মলিন আলেখ্য-খানি যে ভঙ্গির প্রতিচ্ছবি রূপে রহিয়াছে। এই ছবির কাজ শেষ হইলে দুইখানি ছবি সাজাইয়া সত্য নির্ণয় সহজ হইবে। এ সম্বন্ধে কত আশায় চিত্ত অনবরত উদ্বেলিত হইবার কথা; কিন্তু নরেন সবলে হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া গভীর নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন করিয়া চলিয়াছে।

মালা সেদিন ভালো করিয়াই জানিয়াছে যে, প্রমোদ-আসরে সরকার সাহেবের সহিত পাশা-পাশি বসিয়া যে রূপসী নায়িকাটির নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, সকলেই ধন্য ধন্য করিয়াছে এবং তাহার পর গ্রীণরুম হইতে শিকল কাটিয়া পলায়ন করিয়াছে—চারিদিকে যাহার তল্লাস চলিয়াছে,

আশ্চর্য্য যে, সেই মেয়েটিই রেণু-নিবাসে শিল্পী নরেনের 'মডেল' হইয়া সবার চক্ষুতে অনায়াসে ধূলির রাশি ছড়াইয়া দিয়াছে! প্রথম দর্শনে সহজ অবস্থায় মালা তাহাকে চিনিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু ক্ষেপাইয়া দিবার পরই তাহার আসল রূপ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে—এ সেই পলাতকা কন্যা না হইয়া যায় না। এখন সে মালার হাতের মুঠার মধ্যে, সরকার সাহেবের ফ্ল্যাটে গিয়া খবরটি দিলেই হইল। কিন্তু মালার চিত্ত ইহা সমর্থন করিল না। এই মেয়েটি যে সরকার সাহেবের মত বাহাদুর পুরুষের মনে দারুণ একটা আসক্তির সঞ্চার করিয়াছে, সে কথা মালার অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং মালাও যাহার প্রতি বিশেষ ভাবে ঝুঁকিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার হাতে এই মেয়েকে তুলিয়া দেওয়ার অর্থ, নিজের স্বার্থকে খর্ব্ব করা। না, না, মালা তাহা পারে না। তাহা ছাড়া, সরকার সাহেবের প্রমোদ-শালা সেই ব্যাপারের পর বন্ধ রহিয়াছে—তাঁহাকেও হরদম ছুটাছুটি করিতে হইতেছে; সেখানে পুলিসের পাহারা বসিয়াছে—মেয়েগুলিও পুলিসের হেফাজতে রহিয়াছে এবং পলাতক মেয়েটির সন্ধানও চলিয়াছে। মালা এই অবস্থায় বেনামী পত্র দ্বারা পুলিসকেই সংবাদ করা সমীচীন মনে করিল। আবার তাহার মনে লোভেরও একটা মোহ জাগিল। বেনামী পত্রে পুলিসকে খবর দিলে, কাহারও নাম ত প্রকাশ পাইবে না, সুতরাং যদি কিছু প্রাপ্তি-যোগ থাকে, তাহার ভোগে আসিবে না। বিশেষতঃ মেয়েটা তাহাকে যে ভাবে লাঞ্ছিতা করিয়াছে, তাহার ত কোন প্রতিশোধই লওয়া হইবে না। না—ঐ মুখরা ও গোঁয়ার মেয়েটাকে রীতিমত জব্দ করা চাই, নতুবা তাহার গায়ের জ্বালা যাইবে না। সে আবার ভাবিতে বসিয়া গেল। এবার স্থির করিল যে, বোম্বায়ের ঠিকানায় হরপ্রসাদের নামে একখানা লম্বা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইলে কেমন হয়? এমন ভনিতা করিয়া চিঠি লিখিবে যে, বুড়া গিন্নীকে লইয়া ফিরিয়া আসিবার পথ পাইবে না। সেই সময় সে তাহার মায়ের সহিত ও-বাড়ীতে গিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁটা পিটিয়া সায়েস্তা করিয়া দিবে।

পরদিনই মালার লিখিত পত্র বোম্বাই মেলে রওনা হইয়া গেল।

১১

বোম্বাইয়ের মোকামে গিয়াই হরপ্রসাদ ডাক্তার অধিকারীকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত লিখিত চুক্তি অনুসারে এলাহাবাদের বাড়ী যেন তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। যেহেতু, কন্যাকে ফিরিয়া পাইবার আশা তিনি ত্যাগ করিয়াছেন।

ডাঃ অধিকারী সেই পত্রের উত্তরে তাঁহাকে জানাইলেন যে, এখন এমন একটি কন্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, আকারে বয়সে সে তাঁহার কন্যা রেণু না হইয়া যায় না। শীঘ্রই তাহাকে এলাহাবাদে আনা হইতেছে। আসিবামাত্র তিনি হরপ্রসাদ-বাবুকে তার করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সহিত চলিয়া আসিবেন।

ডাঃ অধিকারীর চিঠির সুরে বোধ হইল, তিনি হরপ্রসাদবাবুর নিরুদ্দিষ্টা কন্যার নিশ্চিত সন্ধানই পাইয়াছেন। সুতরাং এই সংবাদ বোম্বায়ের ভবনে আশা ও আনন্দের উদ্দীপনা যেন নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল। তিনি যখন সাগ্রহে ডাঃ অধিকারীর তারের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সময় কলিকাতার রেণু-নিবাস হইতে শ্রীমতী মালার লিখিত পত্রখানি উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নূতন এক চিন্তায় দারুণ ভাবে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল।

মালার দীর্ঘ পত্রের মর্ম্ম এই যে, হরপ্রসাদ বাবুরা বোম্বাই সহরে যাইবার দুই এক দিন পরেই তাঁহার আশ্রিত শিল্পী নরেনবাবু এক যুবতী রূপজীবিনীকে উপরতলার ঘরে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে। এই বাড়ীতেই সে থাকে। একদিন মালা গিয়া আপত্তি করায় সে যে কাণ্ড বাধাইয়াছিল, কেবল গৃহস্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াই সে সহ্য করিয়াছে। আবার শোনা যাইতেছে, সেই মেয়েটির নামে নাকি সরকারের হুলিয়া আছে। এ অবস্থায় আপনার আর কালবিলম্ব না করিয়া অন্ততঃ দুই চারি দিনের জন্যও এখানে আসা উচিত—নতুবা আপনার হাতেও পুলিসের দড়ি পড়িবে।

হরপ্রসাদবাবু খবরের কাগজে মেয়ে-এনার্কিষ্টদের কাহিনী পড়িয়াছেন। হয় ত ভাল মানুষ নরেন ছোকরা এই ধরণের কোন

মত তাহাকে তুলিয়া দরজার বাহিরে দাঁড় করাইয়া দিল; সেইসঙ্গে নিজেও বাহিরে আসিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া কড়ায় দোদুল্যমান তালাটির চাবি বন্ধ করিয়া নিজের আঁচলের খোঁটে বাঁধিয়া রাখিল।

এমন যে হইবে, মালা তাহা কল্পনাও করে নাই। যে মেয়েটিকে ঘাড় ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া রাস্তায় দাঁড় করাইবার জন্য সে আটঘাট বাঁধিয়া বিজয়িনীর মত এখানে হাজির হইয়াছে, সেই মেয়েটাই যেন এক লহমার মধ্যে চর্কি ঘুরাইয়া দিল। সবার সামনে তাহারই ঘাড় ধরিয়া যেন পাখীটির মত তুলিয়া বাহির করিয়া দিল। মেয়ে মানুষের হাতে এত জোর! নিজেকে সামলাইয়া লইয়া এখন সে মারমুখী হইয়া তর্জনের সুরে বলিল: আমাকে তুমি ছুঁতে সাহস কর— এত তোমার তেজ, এত বড় আস্পর্দ্ধা—

মাথায় আঁচলখানা অল্প তুলিয়া দিয়া দেবী তীব্র দৃষ্টিতে মালার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল: ও তিরস্কার আপনারই প্রাপ্য; অন্যায় আপনি করেছেন বলেই আপনার গায়ে আমাকে হাত দিতে হলো।

কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলিয়া মালা বলিল: আমি অন্যায় করেছি! মুখ সামলে কথা কও বলছি।

সংযত কণ্ঠে দেবী উত্তর দিল: যা করেছেন, তাই আমি বলছি। জুতো পায়ে দিয়ে আপনি ঘরের ভিতরে ঢুকেছিলেন।

উদ্ধত কণ্ঠে মালা ঝঙ্কার দিয়া কহিল: বেশ করেছি—তাতে কি হয়েছে?

দেবী এখানে কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ দৃঢ় করিয়া কহিল: ঐ ঘরে বসে যিনি মা সরস্বতীর সাধনা করেন, তাঁকে অপমান করা হয়েছে।

সমবয়স্কা দুইটি তরুণী মুখোমুখী দাঁড়াইয়া যতক্ষণ এ-ভাবে কথা-কাটাকাটি করিতেছিল, অদূরে দালানে দাঁড়াইয়া সকলেই তাহা আগ্রহসহকারে শুনিতেছিলেন। সবার পিছনে দাঁড়াইয়াছিলেন, মালার মা ইন্দিরা দেবী। এই কথার পর তাঁহার পক্ষে আর ধৈর্য্যধারণ করা সম্ভব হইল না, তিনি পিছন হইতেই গর্জ্জিয়া উঠিলেন: ওরে আমার ভাটপাড়ার ঠাকরুণ রে! ঝাঁটা মেরে তোমার নিষ্ঠেপনা ঘুচাচ্ছি দাঁড়াও!

কথা বলিতে বলিতে তিনি পাশ কাটাইয়া দেবীর দিকে ধাওয়া করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া বর্ষীয়ান ভদ্রলোকটিই বাধা দিয়া বলিলেন: থাম, মালার মা! মেয়েতে মেয়েতে কথা কাটাকাটি করছে—তুমি কেন ঢুকছ ওদের মধ্যে! ঐ মেয়েটির কথাগুলি আমার ভারি মিষ্টি লাগছিল।

মালা অমনি ফোঁস করিয়া উঠিল; বৃদ্ধের দিকে প্রখর দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল: তা মিষ্টি যখন লেগেছে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন—কোলে বসিয়ে মিষ্টিমুখ করান?

আগন্তুকদের সঙ্গে বৃদ্ধের গৃহিণীও ছিলেন। ইন্দিরা দেবীর প্রায় সমবয়স্কা তিনি হইলেও, তাঁহার মত বিজ্ঞ পরিজাতির সহজাত লজ্জাকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই এখনও। স্বামী নিকটে থাকায়, তাঁহার মাথায় অবগুণ্ঠন ছিল, তাহা একটু সরাইয়া চাপা গলায় কহিলেন: তোর মেয়ের আরো মুখ হয়েছে ইন্দিরা, লঘুগুরু জ্ঞান নেই! ছিঃ!

ইন্দিরা দেবী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন মনেই বলিলেন: একেই বলে কালের ধর্ম। যার জন্যে মায়ে ঝিয়ের চোখে ঘুম নেই— সব বাবার জো হয়েছে দেখে চিঠি লিখে খবর দিয়ে আনানু—তাতে নাকে দড়ি দিয়ে বেড়াবার জন্যে; এখন তারা মাথায় বসে দেখে লেগেছে তা কি বুঝিনে!

বৃদ্ধ হয়ত কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দেবীর কথায় তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া গেল! দেবী তাঁহার দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল: দেখুন, আপনাকে দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে বলেই সরলভাবে জিজ্ঞাসা করছি—উনি কি আপনার উপরে আসবার জন্যে অনুমতি দিয়েছেন?

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন: কার কথা তুমি বলছ মা? কে অনুমতি দেবে?

দেবী বলিল: নীচের ঘরে বসে যিনি ছবির কাজ করছেন—

ঈষৎ হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন: বুঝেছি—বরুণের কথা তুমি বলছ। কিন্তু সে ত নীচে নেই—তার ঘর বন্ধ, অথচ বাইরের দরজা খোলাই ছিল।

তিক্ত স্বরে মালা বলিল: খাঁচা খুলে পাখী গেছে উড়ে! বোধ হয়, আগেই সাড়া পেয়েছিল। এখন নিষ্ঠাবতীর বাড়ে চাপিয়েছে দিন রাত্তির—বিনা অনুমতিতে নিজের বাড়ীতে কেন এই অনধিকার প্রবেশ?

দেবীর দুই চক্ষু এখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

সুন্দর মুখে তাহার আভা পড়িয়াছে। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা বৃদ্ধের দিকে মুখখানি ফিরাইয়া নম্রস্বরে কহিল: এখন আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কে! আমি ত জানতুম না, তারপর একটা ওঁর ব্যবহারে হয়ত আমাকে কঠিন হতে হয়েছিল, তার জন্যে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। আরও একটা কথা, [illegible] আমি আপনার কথা সব শুনেছি। তিনি আপনাকে গুরুজনের মতন ভক্তি করেন। তাই আমিও আপনাকে প্রণাম করছি।

তৎক্ষণাৎ নত হইয়া বসিয়া, মাথাটি মেঝেয় ঠেকাইয়া দেবী গৃহস্বামী হরপ্রসাদকে প্রণাম করিল। তাঁহার পিছনে অনুপমা দেবী দাঁড়াইয়াছিলেন, দেবী সেই অবস্থায় একটু আগাইয়া গিয়া ঐভাবে তাঁহাকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করিল—কিঞ্চিৎ দূরত্ব বজায় রাখিয়া। অর্থাৎ কাহাকেও সে স্পর্শ করিল না।

হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন: এঁকেও যে গড় করে ফেললে—এঁর পরিচয় পেয়েছ?

দেবী বলিল: পরিচয় না পেলে সহজে আমি কারুর পায়ের কাছে মাথা এমন করে নীচু করি না। ওঁকে দেখেই জেনেছি—এ বাড়ীর মা।

হরপ্রসাদ বলিলেন: থাক, মালা যে কৈফিয়ৎ দেবার কথা বলছিল আমাকে, দেখছি তার আর প্রয়োজন নেই।

ইন্দিরা সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল: মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করতেই গলে গেলেন বাবা! ছি! ছি! সব রোখ নিবে গেল নাকি? জিজ্ঞেস করুন ঐ কালামুখীকে—কোত্থেকে ওকে ধরে এনে আপনার বাড়ীতে তুলেছে? সে অনামুখোই বা ভয়ে [illegible] হলো কেন?

দেবী এবার কঠিন হইয়া কঠোর স্বরে কহিল: যিনি এখানে নেই, তাঁর উদ্দেশে অমন করে ইতরের মত কথা বলবেন না বলছি। আপনার জন্যে আমার মুখ আলগা না হলেও, হাত দুখানা কিন্তু তার শক্ত, তা বলে রাখছি।

ইন্দিরা দেবী এই কথার পর অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া চীৎকার তুলিলেন: কি বললি, মারবি নাকি? কিসের এত তেজ তোর শুনি? আমরা কি বুঝিনে—কর্তাকে দেখেই যে হৎকম্প জেগেছে—

দেবী দৃঢ় স্বরে বলিল: ভাগবার মানুষ তিনি নন, অন্যায়ও তিনি করেন নি। আমি আবার আপনাকে বলছি, আমাকে যা ইচ্ছা হয় বলুন, কিন্তু সেই দেবতাকে লক্ষ্য করে যদি কিছু বলেন, আমি আপনার মুখ চেপে ধরব।

দেবীর মুখভঙ্গি দেখিয়া মালাই এখন চাপা গলায় বলিল: মা, চুপ কর তুমি—

কিন্তু সে কথা অগ্রাহ্য করিয়া ইন্দিরা দেবী তর্জ্জন করিলেন: থামব কেন, ওর ভয়ে—শাসানি শুনে? মুড়ো ঝাঁটা গাছটা ওবাড়ী থেকে আনত একবার দেখি—

হরপ্রসাদবাবু এই সময় বিরক্ত ভাবে বলিলেন: মালার মা, বলি—এসব হচ্ছে কি? থামো তুমি, চেঁচিও না অমন করে।

মুখ বাঁকাইয়া ইন্দিরা দেবী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন: সাধ করে কি চেঁচাচ্ছি! বাইরে অত রোখ দেখালে, বললে,—ঘাড় ধরে রাস্তায় বার করে দেবে... এটি হুলুস্থুল কাণ্ড বাধাবে! তার পর উপরে এসে কালামুখীকে দেখে একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ! যাদু জানে, যাদু জানে! তা আর জানিনে! ওর ওষুধ হচ্ছে—মুড়ো ঝাঁটা!

দেবী এবার ধীরে ধীরে হরপ্রসাদের আরও সান্নিধ্যে আসিয়া বলিল: দেখুন, আপনাদের ব্যাপারটা আমার বোঝা হয়ে গেছে। কিন্তু উনি না এলে ত আমাদের ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হবে না। [illegible] ওঁকে তাড়া দেব বলে নীচে যাচ্ছিলাম—নীচের ঘরেই উনি ছিলেন। কিন্তু ভুলে এ ঘরখানিও খুলে রেখে গেছেন দেখে, আমি এই প্রথম এ ঘরে সবেমাত্র ঢুকেছি, এমন সময় আপনারা উপরে এলেন। আমার মনে হচ্ছে—তিনি নীচে থেকেই কোথাও গেছেন। এখন, আমার কথা শুনুন—তিনি না আসা পর্য্যন্ত যে ঘর আপনারা তালাবন্ধ করে গেছেন, খুলে বসুন, বিশ্রাম করুন। আমি যথাসাধ্য আপনাদের সেবা করব।

মুগ্ধভাবেই গৃহস্বামী এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটির কথাগুলি শুনিতেছিলেন। আর তাঁহার স্ত্রী অনুপমা দেবী উপরে উঠিয়া সেই যে প্রথম মেয়েটির মুখের উপর তাঁহার বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তাহা এ পর্য্যন্ত সরাইতে পারেন নাই—চুম্বকের মত তাঁহার চক্ষু দুটিকে যেন ক্রমাগত আকৃষ্ট করিতেছিল ইহার অপরূপ মুখমণ্ডল।

দেবীর কথার পর হরপ্রসাদবাবু ক্ষণকাল চুপ

১২

একতালার সুসজ্জিত বৈঠকখানা গৃহস্বামী বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। সেই ঘরে তিনি প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ রজত রায়কে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছেন। অধ্যাপকের খ্যাতির কথা হরপ্রসাদের অবিদিত ছিল না; এদিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইলেন। অধ্যাপক মহাশয়ই নরেনের প্রসঙ্গ তুলিয়া, তাঁহার বোম্বাইযাত্রার পরবর্তী সকল ঘটনা—মালার স্থলে কি ভাবে দেবী মেয়েটির সহিত তাহার সংযোগ হয় এবং একান্ত অসহায় অবস্থায় তাহাকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়—নরেনের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সবই তাঁহাকে খুলিয়া বলিয়াছেন। অবশেষে, গত রাত্রে নরেনের ছবিই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে জ্ঞাত হইয়া তিনিই সকালেই নরেনকে স্টুডিও হইতে তাঁহার মোটরে তুলিয়া লইয়া যান। তাড়াতাড়িতে দেবীকে খবর দেওয়াও হয় নাই। সেই অবস্থায় হরপ্রসাদ বাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হন।

হরপ্রসাদ বাবু এইসময় উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: নরুর ছবি ফার্স্ট হয়েছে? তাই নাকি! তাহলে নরু ওর দরুণ কিছু পাচ্ছে ত?

অধ্যাপক বলিলেন: কিছু নয় ঘোষ মশাই—প্রচুর। ইণ্টার ন্যাশানাল ফিল্ম কোম্পানী পনেরো হাজার টাকায় ছবিখানা কিনে নিয়েছে।

বিস্ময়ের সুরে হরপ্রসাদ বলিয়া উঠিলেন: বলেন কি? পনেরো হাজার টাকা? হাতে আঁকা এক খানা ছবির দাম?

নরেন এই সময় পকেট হইতে চেকখানা বাহির করিয়া হরপ্রসাদের হাতে দিয়া বলিল: এই যে। আপনিই রাখুন দাদামশাই।

হরপ্রসাদ পড়িয়া দেখিলেন, সত্যই পনেরো হাজার টাকার এক কেতা চেক—লয়েড ব্যাঙ্কের উপর, নরেনের নামে। তাঁহার চক্ষুর তারকা দুইটি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; স্টুডিওতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যে সব ছবি সে গ্রাহকদের নিকট দাখিল করিত, তাহা হইতে সে নিজের খরচটুকুও মিটাইতে পারিত না বলিয়া তিনি তাহাকে অন্নসংস্থানে অপটু ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেন। অথচ বিদেশী সমজদারের চোখে তাহার আঁকা ছবি এখন কত উচ্চ মূল্যে বিকাইয়াছে।

আর মালা—বৈঠকঘরের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সবই শুনিতেছিল। পনেরো হাজার টাকার চেকখানা যেন তাহার পীঠে হাণ্টারের ঘা দিয়া সে দিনের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিল…'ছবিখানা বিক্রী হয়ে গেলে সব টাকা আপনিই বুঝে নেবেন।'

হর্ষোৎফুল্ল মুখে হরপ্রসাদ কহিলেন: বেশ, বেশ; ভারি খুসি হয়েছি নরু। আমি তোমার জন্যে সত্যিই ভাবতাম; কিন্তু এখন বুঝছি, আমাদের ভাবনার কোন দাম নেই। ভাগ্যই ভবিষ্যৎ গড়ে রাখেন নিজের হাতে।

চেকখানি তিনি নরেনের হাতে ফিরাইয়া দিতে গেলেন; কিন্তু নরেন হাতখানি সরাইয়া লইয়া সসম্ভ্রমে কহিল: আপনার কাছেই রাখুন দাদামশাই। ও ব্যাঙ্কে আপনার একাউণ্ট আছে জানি—আপনিই জমা করে নেবেন। পিছনে আমি নাম এনডোর্স করে দিয়েছি।

চেকখানি ভাল করিয়া দেখিয়া হরপ্রসাদ বলিলেন: তুমি এবার আমাকে হারিয়ে দিলে নরু। শিল্পীরা অনিশ্চিত, সাধারণতঃ উচ্ছৃঙ্খল আর বিলাসী হয়ে থাকে, তুমিই তার দৃষ্টান্ত দেখালে বটে! আমার উপর এতটা বিশ্বাস, সামান্য কথা নয়।

নরেন কুণ্ঠিত হইয়া কহিল: আমি যে আপনাকেই আমার অভিভাবক বলে জানি দাদামশাই। সাহসটা সেইজন্যেই বেড়েছে; নৈলে ঐ মেয়েটিকে আমি আপনার অনুমতি না নিয়েই আশ্রয় দিতে পারতুম কখনো?

হরপ্রসাদ এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন: তাহলে আমি এখন বলব নরু, আমার দেওয়া ছবির কাজটা ছোট হোলেও, তার 'আয়-পয়' আছে।

এ কথার উত্তরে নরেনের কথাটা অধ্যাপকই বলিয়া ফেলিলেন: নরেন নিজেই একথা স্বীকার করেছে ঘোষ মশাই। আপনার মেয়ের ছবিখানা ফেল্ট হয়ে গেলেও, নরেন তা থেকেই এদেশের একটি আদর্শ মেয়ের ছবি আঁকবার প্রেরণা পায়। আরও মজার কথা শুনুন, সেই ওরিজিন্যাল ছবিখানাই এখন নরুকে ওর এক ভয়ঙ্কর রকমের প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে রক্ষা করবার উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হরপ্রসাদ বলিলেন: সে আবার কি কাণ্ড?

অধ্যাপক বলিলেন: অবাক কাণ্ড বলবেন—ব্যাপারটা শুনলে। ওখানকার কাজ মিটিয়ে হোটেলের রেষ্টুরেণ্টে বসে চা খাচ্ছি মশাই, এমন সময় ছবিখানা যাঁরা কিনেছেন—ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফিলিম কোম্পানীর কর্তারা—ইয়া চুল-দাড়ীওয়ালা এক পাগলকে এনে সেখানে হাজির। পাগল মানে—লোকটা নাকি স্মৃতিভ্রষ্ট। অথচ, তার সঙ্গে ওঁদের প্রায় বারো বছরের সম্বন্ধ। কি একটা দুর্ঘটনায় তার মাথা বিগড়ে যায়, আগেকার সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলে; তবে লোকটা যে বর্ণ-আর্টিষ্ট, ছবির ব্যাপারে ওস্তাদ—সেটা এঁরা জানতে পারেন; কারণ, ঘা খেয়ে মাথা হারালেও সহজাত প্রতিভা তাঁকে ছেড়ে যায় নি। সেই জন্যেই এঁদের ছবির ইউনিটে ওকে রাখেন। বারো বছর ধরে এই লোক ওঁদের সঙ্গে কাজ করে আসছে—আর নানা ব্যাপারে ওঁরা উপকৃতও হয়েছেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালেও তার পূর্বস্মৃতি ফিরে আসেনি। মিষ্টার আর্টিষ্ট নামেই লোকটি ওঁদের প্রতিষ্ঠানে পরিচিত। আগের নাম পর্য্যন্ত মনে নেই। তাহলেও ছবির ব্যাপারে কিছুই ভুলচুক নাকি তার হয় না। তাই মিষ্টার আর্টিষ্টের প্রতি ওঁদেরও অগাধ বিশ্বাস। কেনবার সময় নরুর ছবি দেখে ঐ লোকটিও পছন্দ করেছিল—এমন কি, সে সময় খুব সুখ্যাতিও করেছিল লোকটা। কিন্তু, তার পরেই হঠাৎ বিগড়ে যায়; বলে—এ ছবি অরিজিন্যাল নয়—চুরি করা; আর একখানি ছবিতে ঠিক এমনি চোখ মুখ ও ব্যক্তি দেখেছে। এ ছবির সঙ্গে তার মিল আছে।

হরপ্রসাদ বিচলিত কণ্ঠে বলিলেন: কি মুস্কিল। তারপর—

অধ্যাপক বলিলেন: সে বলতে চায়—সেই ছবির সাবজেক্ট নরু চুরি করেছে। নরু বলে, তার ছবির সাবজেক্ট ১৬ বছরের মেয়ের একটা পুরনো ছবি। মিঃ আর্টিষ্ট তা মানতে চায়না; বলে, মিছে কথা। এ ছবির সাবজেক্ট তারই দেখা সেই ছবি। নরু ত তখন মারমুখো হয়ে তার সঙ্গে হাতাহাতি করে আর কি! তখন মিষ্টার আর্টিষ্ট বলল—তার চেম্বারে সে ছবি হয় ত আছে। নরুর এই ছবি দেখেই সে ছবির কথা তার মনে পড়ে গেছে। যাই হোক, এখানকার ঠিকানা তাকে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বামাল নিয়ে হয়ত এখনই আসবেন। সুখের কথা যে, আপনি এসে পড়েছেন। বলতে পারবেন—আপনার মেয়ের ফটো নরুকে দিয়েছিলেন, নরু সম্ভবতঃ তাকেই তার ছবির সাবজেক্ট করে থাকবে।

হরপ্রসাদ হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন: ভালো! পাগলের পাল্লায় নরু পড়েছিল দেখছি। আর, রীতিমত একটা অন্যায় কাণ্ড না হলে, নরুর মত ছেলে কখনো মারমুখী হয়ে উঠতে পারে না।

এমন সময় দরজার সামনে মোটর আসিয়া থামিবার শব্দ পাওয়া গেল। অধ্যাপক তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন: ঐ বুঝি এলেন। আচ্ছা, আমি দেখছি—নরুর আর এগিয়ে গিয়ে কাজ নেই…হয়ত, হাতাহাতি হয়ে যাবে।

পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারী, গম্ভীর মূর্ত্তি তিন জন ভদ্রলোকের সহিত দাড়িগোঁফ শুভ্র ও স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত আবৃত কেশপাশ বিশিষ্ট, পাদ্রীদের মত ঢিলা ওভারকোট পরা অপরূপ এক বর্ষীয়ান পুরুষকে লইয়া অধ্যাপক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদধারী তিন ব্যক্তিই গৃহস্বামীকে 'গুড্ মর্ণিং' শব্দে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু শ্মশ্রুগুম্ফধারী 'নমস্তে' বলিয়া দক্ষিণ হাতখানি ললাটে ঠেকাইলেন। হরপ্রসাদবাবু প্রত্যভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক বসাইলেন।

ইণ্টার ন্যাশন্যাল ফিলিম প্রতিষ্ঠানের প্রবীণ কর্ণধারদ্বয়ের সহিত অধ্যাপকের পরিচয় পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে হরপ্রসাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়া তৃতীয় ব্যক্তির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই সেই ব্যক্তি বলিলেন: হোটেলে যখন ছবি নিয়ে আপনাদের কথান্তর হয়, আমি সেখানে ছিলাম। এ-ব্যাপারে আমি কৌতূহলী বলেই মিষ্টারদের সঙ্গে এসেছি। আমাকে একজন সরকারী কর্মচারী বলেই জানবেন।

ইহার পর অধ্যাপক শ্মশ্রুগুম্ফধারী বর্ষীয়ান পুরুষটিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন: ঘোষ মশাই, ইনিই ওঁদের প্রতিষ্ঠানের শিল্পী—মিঃ আর্টিষ্ট।

কিন্তু এ কথা শুনিয়াই আর্টিষ্ট সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন: নো, নো, বলুন—শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট। হ্যাঁ, এখন শুনুন—সেই ছবিখানা আমার পক্ষে ঠিক যেন ওষুধের মতন হয়েছে… ওটা দেখেই যে ছবিখানার কথা মনে পড়ে যায়…

এই ব্যাগের ভিতরে তাকে পেয়েছি। আবার এমনি কাণ্ড, সাথে সঙ্গে সঙ্গে আগেকার কথা একটু একটু মনে পড়ছে। তবে, আমি যা বলো সাব, সত্য কি না—এখন মিলিয়ে দেখুন।

তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি ব্রোমাইড করা আলেখ্য বাহির করিয়া—আর্টিষ্ট পার্শ্বস্থদিগকে দেখাইয়া দিলেন।

নরেনের পক্ষে এ অবস্থায় হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন হইল। হরপ্রসাদ এ পর্য্যন্ত বরাবর একই ভাবে এই অদ্ভুত আর্টিষ্টের শ্মশ্রুসমাচ্ছন্ন মুখখানির দিকে চাহিয়াছিলেন। ইঁহার হাতের ছবিখানি দেখার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের চূড়ার মত টিকালো নাসিকাটিও দেখিলেন। অমনি তাঁহার মুখখানিও বিকশিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই হাসির ব্যাপারে বৃদ্ধ শিল্পীর সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল তরুণ শিল্পী নরেন্দ্র ছোকরার উপরে। গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন: বড় হাসছ যে ছোকরা? মিলিয়ে দেখ, মিলিয়ে দেখ—

বলিতে বলিতে হাতের আলেখ্যখানি তিনি হরপ্রসাদের সামনে ফরাসের উপর নিক্ষেপ করিয়া সাক্ষীদিগকে ইংরাজীতে বলিলেন: আপনারা ত হোটেলে গিয়ে মিলিয়ে দেখে এসেছেন, এখন ঐ ছোকরাকে বলুন, ঠিক কি না?

একজন বর্ষীয়ান সাহেব বলিলেন: ফটোর এই মেয়েটির অদ্ভুত ধরণের চোখ আর মুখের সঙ্গে মিষ্টার বিশ্বাসের ছবির মিল আছে, এ কথা সত্য। এর জন্য আমরা মিঃ আর্টিষ্টের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির প্রশংসা করেছি। কিন্তু তা বলে আমরা মিঃ বিশ্বাসের প্রতিভাকেও নীচু করতে চাইছি না। সাত দিন পরে একজিবিসন শেষ হলে, সে ছবি পাওয়া যাবে, তখন মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা শুধু এই জন্যেই আপনাদের কষ্ট দিয়ে জানাতে এসেছি যে, আমাদের আর্টিষ্টের কথা মিথ্যা নয়।

ইতিমধ্যেই হরপ্রসাদের ইঙ্গিতে নরেন ষ্টুডিও হইতে হরপ্রসাদ প্রদত্ত ব্রোমাইড করা তাঁহার কন্যার ছবিখানি আনিয়া ফরাসের উপর রক্ষিত পূর্ব্বের ছবিখানির পাশে রাখিয়া বলিল: তাহলে এই ছবি খানাও দেখুন সকলে।

হরপ্রসাদ দুই হাতে দুই খানি ছবি লইয়া হাত ঘুরাইয়া সকলকে দেখাইয়া দিলেন। একই আকারের একই সময়ে তৈয়ারী করা একই বালিকার দুই খানি আলেখ্য।

শ্রীমন্ত আর্টিষ্ট সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন: এ ছবি তুমি কোথায় পেলে ছোকরা?

চোখের ইঙ্গিতে নরেনকে নিরস্ত করিয়া হরপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন: এখন আপনি বলুন ত—ছবিখানা আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?

এই প্রশ্নের পর শ্রীমন্ত আর্টিষ্টের পরিপূর্ণ দৃষ্টি হরপ্রসাদের মুখের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। শিল্পী নরেনের হাতের অঙ্কিত ছবিখানি দেখিয়া যেমন অতীত স্মৃতির কিছুটা তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছিল; হরপ্রসাদের মুখে এই প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার সেই লুপ্ত স্মৃতির আর একখানি পাতা খুলিবার মত হইল।

হরপ্রসাদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন: ঐ ব্যাগের ভিতরে আরো একখানি ছবি বোধ হয় আছে—একটি ছোট ছেলের?

তখনো শিল্পী হরপ্রসাদের মুখের পানে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। হরপ্রসাদের এই প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বিহ্বল ভাবে বলিয়া উঠিলেন: ছেলের ছবি…ছেলের…হ্যাঁ, হাঁ—

পূর্ব্ববৎ ব্যাগের ভিতর হইতে তিনি একখানি ব্রোমাইড-করা আলেখ্য বাহির করিয়া সেখানি তুলিয়া ধরিয়া হরপ্রসাদকে দেখাইয়া বলিলেন: এই যে!

হরপ্রসাদ বলিলেন: ঐ ছবির পাশে রাখো। এখন বুঝছ—আগের ছবিখানা হচ্ছে আমার মেয়ের আর এই ছবিখানি তোমার ছেলের। এবার মনে করে দেখ ত—এমনি করে ছবি দুখানা কোথায় পাশাপাশি রেখেছিলে? আমাকে চিনতে পারছ না?…তুমিই ত নাকু?

স্বপ্নাবিষ্টের মত শিল্পী এতক্ষণ হরপ্রসাদের কথাগুলি শুনিতেছিলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁহার লুপ্ত স্মৃতিপর্দ্দার এক একখানি পাতা যেন উঠি উঠি করিতেছিল। এমনি অবস্থায় হরপ্রসাদের মুখ দিয়া 'নাকু' নামটি নির্গত হইবামাত্র তিনি বিপুল উল্লাসে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন: মনে পড়েছে, মনে পড়েছে; হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে চিনি—চিনি—তুমি—তুমি—কিন্তু তোমার নাম ত…

হরপ্রসাদ বলিলেন: আমি—হরু। আর তুমি হচ্ছ—নকুনাথ বোস। তেমনি উল্লাসোচ্ছ্বাসে

বৃদ্ধ শিল্পী পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি হর, আমি শম্ভু—শম্ভুনাথ সাধু। তুমিই চিনিয়ে দিলে হর। আমি অ্যাদ্দিন ভোলানাথ হয়ে ছিলুম ভাই। এখন মনে পড়েছে, আমার ছেলের ছবি নিয়ে তোমার বাড়ীতে যাই—জায়গাটা হচ্ছে···জায়গাটা···

হরপ্রসাদ বলিলেন: প্রয়াগ···এলাহাবাদ···

পুনরায় উল্লাসের সঙ্গে শিল্পী বলিলেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, এলাহাবাদ। এখন সব মনে পড়েছে। এই ব্যাগের মধ্যে ছিল আমার ছেলের ছবি, তোমাকে দেখাতেই তুমি তোমার মেয়ের ছবিখান এনে পাশে রাখলে। অনেক কথা হলো—এখন মনে পড়ছে। তার পর তুমি মেয়েকে ভাবলে—তার আসল চেহারা দেখবার জন্যে। খবর এলো—মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না···তারপর আর মনে পড়ে না হর। এখন তুমি বল, তুমি বল, তোমার মেয়ে···

হরপ্রসাদ বলিলেন: পাওয়া যায়নি; অনেক খোঁজা খুঁজি করি। শুধু কি মেয়ে···মাথা বিগড়ে তুমি পালালে···তোমাকে, সেই সঙ্গে তোমার ছেলেকে খুঁজে বার করবার জন্যে কত চেষ্টা করেছি, অনেক টাকা খরচ করেছি, ডাক্তার অধিকারী নামে একজন বিচক্ষণ লোককে কাজে লাগিয়ে এলাহাবাদের বাড়ী পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এসেছি—তিনি অনেক করে খুঁজে বার করলেন এই ঠিকানায়। কিন্তু কোন পাত্তাই তিনি করতে পাননি এ পর্যন্ত—তবে এখনো হাল ধরে আছেন। তারপর কলকাতায় এসে এই বাড়ী কিনি; মেয়ের নামেই নাম রেখেছি [illegible]। এখানে এসে এই ছোকরা আর্টিষ্টকে পাই—তুমি যার পেছনে লেগেছ। মেয়ের একখানা ছবি তুমি নিয়ে যাও; আর একখানা আমার কাছে থাকে—সেখানা দিয়ে ফরমাজ করি—দু'বছরের মেয়ের এই ছবি দেখে বারো বছর পরে এমন ভাব যে বয়স হোক, সেই ভাবেই একখানা ফুল সাইজের ছবি আঁকতে।

—তোমার তো দেখছি অদ্ভুত খেয়াল।

—খেয়ালটা আমার স্ত্রীর। তিনি নাকি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেন, তাঁর মেয়ে দিব্যি বড় সড় হয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছে।

শম্ভুনাথ নরেনের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন: এখনকার আর্টিষ্টরা কাজ পেলেই বর্তে যায়। আন্দাজে ও রকম ছবি কেউ কখনো আঁকতে পারে?

নরেন দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল: শিক্ষা, সাধনা ও নিষ্ঠা থাকিলে শিল্পীই পারে। সত্যকার শিল্পীর অসাধ্য কিছু নেই।

শম্ভুনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নরেনের মুখের পানে চাহিতেই, হরপ্রসাদ বলিলেন: আমি বলি, ওকে কি দরকার। ওর আঁকা ছবি দেখবার জন্যে আমার চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নরু, তুমি ছবিখানা এইখানেই আন।

নরেন তখনই উঠিয়া গেল। শম্ভুনাথ এই সময় হরপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন: ছোকরার নাম কি বললে—নরু?

হরপ্রসাদ বলিলেন: নাম ওর নরেন, পদবী মিত্তির। আমাদেরই স্বজাতি। আমি ওকে ছেলের মত দেখি, আর ওকে নরু বলেই ডাকি।

শম্ভুনাথ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—ছোকরাকে তুমি যে নামে ডাকলে, আমার ছেলের কথা মনে পড়ে গেল। তার নামও মনে পড়েছে, নরনারায়ণ—কে জানে, কোথায় আছে, কিম্বা চলে গেছে।

শম্ভুনাথের শিশু পুত্রের [illegible], অধ্যাপক এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিলেন। তিনি এই সময় বলিলেন: আপনার মাথা ত এখন খুলে গেছে দেখছি; কিন্তু গোলমেলে ধাঁধা এই যখন আপনার বারো বছর আগের দেখা ছবির চোখ মুখ মনে করে রেখেছেন, আপনার নিজের ছেলের এই অদ্ভুত রকমের চোখের চাহনি কি এখনো আর কারুর মুখ চোখে দেখতে পাননি?

শম্ভুনাথ অদ্ভুত দৃষ্টিতে অধ্যাপকের মুখের পানে চাহিয়া নীরব রহিলেন, এ কথাটির অর্থ তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

সরকারী কর্মচারীর পরিচয়ে শিল্পদর্শনে যে যুবকটি বিদেশাগত দুই প্রবীণ ব্যক্তির পার্শ্বে কেদারায় এতক্ষণ নির্বাকভাবে বসিয়াছিলেন, তিনি হইতেছেন, সুবিখ্যাত গোয়েন্দা অভীন্দ্রনাথ। এই ঘটনার সংস্রবে কোন সূত্র পাইয়াই এখানে আসিয়াছেন। এই সময় তিনি বলিলেন: আমার মনে হয়, অধ্যাপক মহাশয় আমাদের তরুণ শিল্পীর চেহারার সঙ্গে এই ছবির চেহারা মিলিয়ে দেখবার কথা বলছেন।

শম্ভুনাথের মুখের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু হরপ্রসাদ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলিলেন: না, না, সে কি করে হতে পারে? মুখ চোখে মিল

হলেও, অন্য সব দিকেই যে গরমিল। ডক্টর অধিকারীকে আমি শম্ভুর ছেলের খবর নেবার ভার দিয়েছিলাম, তিনি দানাপুরে গিয়ে সেখানে সন্ধান করে আমাকে জানিয়ে দেন—সে ছেলে বেঁচে নেই।

শম্ভুনাথ এ প্রশ্নে বলিলেন: হ্যাঁ, বেঁচে নেই। হ্যাঁ,—ঠিক কথা। মনে পড়েছে—দানাপুরে মামার কাছে তাকে রেখে আসি। তাহলে—বেঁচে নেই। ব্যস্!

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন: এখন আমি এমন কিছু নূতন কথা শোনাব, আপনারা ভাববেন—গল্প বলছি। ডক্টর অধিকারী আগাগোড়াই আপনাকে ব্লাফ দিয়ে এসেছেন। হালেও আপনাকে তিনি জানিয়েছেন—আপনার কন্যার সন্ধান পেয়েছেন। তার মানে, সেই সময় থেকেই তিনি আপনার মেয়ের মত বয়সের একটি মেয়ে, এমন একটি মেয়ে সংগ্রহ করে তাকে তৈরী করতে থাকেন। এই দীর্ঘ বারোটি বছর তাকে তৈরী করতে কেটে গেছে। সে মেয়ে তাঁর হাতের মুঠোয়; এই গেল প্রথম কথা। এরপর তাঁর নজর পড়ল—শম্ভুবাবুর ছেলে নরনারায়ণের ওপরে। তিনি বুঝেছিলেন, এ ছেলেটিকে আনিয়ে আপনি নিজের ছেলের মতন পালন করবেন; আর যদি মেয়েটিকে ফিরে পান, তার সঙ্গেই বিয়ে দেবেন বড় হলে। ডাক্তার সাহেব দেখলেন—এ আবার আর এক ফ্যাসাদ। কেননা, তিনি তাঁরই ছেলে ওটিকে ঠিক করে রেখেছিলেন, নকল মেয়ে আসল বলে চালু হলেই, দাবী করবেন—তাঁর ছেলের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিতে হবে। কাজেই তার পাবা মাত্রই তাঁর কাজ হলো—দানাপুরে নরনারায়ণের মামার সন্ধান করে কাজ বাগানো। তাঁকে জানালেন, শম্ভুনাথ বিপ্লবীদলের সম্পর্কে ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। সে জন্যে তাঁকেও মুস্কিলে পড়তে হবে। তখন ছেলের নাম আর পদবী পাল্টানো হলো, দানাপুর থেকে বদলী হবার অজুহাতে ছুটি নিয়ে বাসা তুলে নিবারণ বাবু দেশে গেলেন। সেখান থেকে ডক্টর সাহেব আপনাকে জানালেন যে, শম্ভুনাথবাবু যে সময় নিরুদ্দেশ হন, তাঁর ছেলেও সেই সময় গতায়ু হয়েছে। ওদিকে ভাগনে একটু বড় হোলে নিবারণবাবু তাকে কলকাতার মেসে রেখে পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছু কাল পরে তিনি চাকরী থেকে অবসর নিয়ে মুঙ্গেরে গিয়ে বাস করতে থাকেন। ১৩৩৫এর ভূমিকম্পে মুঙ্গেরের যে-দিকটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, সেইখানেই তিনি থাকতেন। নরেন তখন কলকাতায় ছিল বলে রক্ষা পায়।

সকলেই অবাক বিস্ময়ে অতীন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনিতেছিলেন। হরপ্রসাদই প্রথমে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন: আপনি এ-সব কথা কি করে জানলেন, আর ডক্টর অধিকারীর বিরুদ্ধে যে-সব কথা বললেন, সত্য হলে খুবই সাংঘাতিক অবস্থা হবে তাঁর, কিন্তু প্রমাণ করতে পারবেন?

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন: ডক্টর অধিকারীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। নকল মেয়ে নিয়ে তিনি আর আপনার কাছে আসবেন না। এলাহাবাদের বাড়ী আমিই আপনাকে খালাস করে দেব। তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ হয়েছে, পরে সে সব জানতে পারবেন। তবে, নরেনবাবুই যে নরনারায়ণ, তাঁর মামা নিবারণবাবু, মামার কথায় তিনি নাম ও পদবী পরিবর্ত্তন করেন, এমন কি, বিহার ব্যাঙ্কে মামার ডিপোজিটের টাকার তিনিই ওয়ারিশান সাব্যস্ত হয়েছিলেন...কিন্তু সে টাকা তিনি নিজে না নিয়ে বিহার ভূমিকম্প-ফণ্ডে দান করেন। এ সব কথা পরেও অজানা নয়। আর এ-থেকেও জানতে পারবেন যে, উনিই নিবারণবাবুর ভাগনে কি না।

হরপ্রসাদ বাষ্পকণ্ঠে বলিলেন: হ্যাঁ, এটা একটা মস্ত প্রমাণ বটে। নরু কিন্তু এ সব কথা আমার কাছে চেপে গিয়েছিল। ওর বংশ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে শুধু বলেছিল—'ভূমিকম্পে আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে; আমি তখন কলকাতার মেসে ছিলাম বলে বিশ্বাস বংশটা লোপ পায়নি। আমি এখন একলা, যেখানে থাকি সেই আমার বাড়ী, এর বেশী আর কোন পরিচয় আমার নেই।' এমন সুরে কথাগুলি বলেছিল নরু, তার পর আর কিছু জিজ্ঞাসা করা চলে না। শম্ভু, সব শুনছ ত হে। তোমার কি মনে হয়? ইনি যে বলছেন নিবারণবাবু নরুর মামা, এ কথা ঠিক ত?

শম্ভুনাথ বলিলেন: হ্যাঁ, এখন তার নামও মনে পড়েছে। নরুকে তারই কাছে রেখে আসি। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে—বারো বছর পরে যে ছোকরার সঙ্গে গোড়াতেই দেখা হতে ঝগড়া করলাম, শেষে কিনা—

এই সময় আবরণ মণ্ডিত তৈলচিত্রখানি লইয়া

নরেনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শম্ভুনাথ কথাটা আর সমাপ্ত করিলেন না। দেওয়ালের দিকে একখানা টেবিলের উপর ছবিখানা রাখিয়া নরেন হরপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করল: এখনি খুলব কি?

হরপ্রসাদ বলিলেন: একটু অপেক্ষা কর নরু—আগে তোমাকে গুটি কয়েক প্রশ্ন করব: তার পর ওটা খোলা হবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নরেন হরপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হরপ্রসাদ বলিলেন: শৈশবে তোমার নাম ছিল নরনারায়ণ বসু। কোন প্রভাবকের প্ররোচনায় তোমার মাতুল নিবারণচন্দ্র মিত্র তোমার পিতৃদত্ত নাম বদল করে নরেন বিশ্বাস রাখেন। এ কথা কি ঠিক?

এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে চমকিত হইয়া নরেন বলিল: আপনি এ খবর কোথায় পেলেন? যাই হোক, আপনার কাছে কথাটা আমি অস্বীকার করব না। তবে, আমার যতটুকু স্মরণ হয়, তাতে আমি এই কথাই বুঝেছিলাম যে, আমার কল্যাণের জন্যেই তিনি ঐ পরিবর্তন করেছিলেন। মামার কথা এখনো আমার মনে আছে—নরনারায়ণ খুড় বড় নাম, কলকাতার স্কুলে পছন্দ করবে না। আর আমার ঠাকুরদাদার পদবী ছিল বিশ্বাস—নবাবের দেওয়া পদবী। আমার বাবা বলতেন—নবাবী আমল যখন নেই, ও পদবীও মিছে। তাই তিনি বসু পদবী নেন। কিন্তু পদবী বদলে ভালো হয় নি যখন—সাবেক 'বিশ্বাস' পদবী আবার বাহাল রাখাই ভালো। আমি কিন্তু এখন ভাবি, পদবী বদলে আমার ভালোই হয়েছে, তবে যিনি বদলে দিয়েছেন, তাঁর ভালো হয় নি।

হরপ্রসাদ বলিলেন: ভূমিকম্পে সপরিবার তাঁর অপমৃত্যুর কথা বলছ ত? তা মিছে নয়। তাছাড়া, তাঁর নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা ছিল, তুমি তার একমাত্র ওয়ারিসান হয়েও নাকি তুলে নাও নি—একথা কি সত্যি?

নরেন কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ভাবে বলিল: সে সব পুরোনো কথা তুলে কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন বলুন। হাজার দশেক টাকা মামার ব্যাঙ্কে ছিল। বিহার রিলিফ কমিটি আমাকে অনুরোধ করেন, অত বড় একটা প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারে দুর্গতদের মুখ চেয়ে আমি যেন ঐ টাকা থেকে কিছু দান করি। আমি তখন মামা ও তাঁর পরিজনদের আত্মার কল্যাণের জন্যে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা সারি। অর্থাৎ মামার টাকার সবটাই রিলিফ ফণ্ডে দিই।

হরপ্রসাদ সাগ্রহে বলিলেন: কিন্তু এ খবরটি তুমি আমাকে না দিলে নরু, তাহলে তোমার ও দিকটাও আমি জানতে পারতাম। আচ্ছা আর একটা কথা—তুমি ত এক স্বভাব-শিল্পী, তোমার বিদ্যা ত আর যাচাই করা নয়; এখন তোমার অধ্যাপক মহাশয়ের হাতে যে ছেলেটির ছবি রয়েছে, ওখানা একবার ভাল করে দেখ দেখি। ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঐ রকম একখানা ছবি দেখে বাপো বছরের হারানো স্মৃতি খুঁজে পেয়েছেন। তুমিও দেখ দেখি—ওথেকে কিছু বার করতে পার কি না।

অধ্যাপক মহাশয় ছবিখানি নরেনের হাতে দিয়া বলিলেন: শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে ঘোষ মহাশয়ের কথার জবাব দেবে। এও তোমার এক বড় পরীক্ষা।

ছবিখানি হাতে লইয়া নরেন নিবিষ্ট চিত্তে কিছুক্ষণ দেখিল, তাহার পর ঘরের একদিকে টাঙানো দীর্ঘ মুকুরখানির সামনে গিয়া ছবির মুখখানির প্রতি অংশ শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। ছবির মুখের সহিত নিজের মুখের প্রতিচ্ছায়া মুকুরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। প্রায় দশ মিনিট এই ভাবে পর্যবেক্ষণের পর নরেন ছবিখানি হরপ্রসাদ বাবুর সম্মুখে ফরাসের উপর রাখিয়া ভাবপ্রবণ স্বরে বলিল: খানিক আগে আপনার মুখেই শুনছিলাম, ছবির এই শিশুটি কার ছেলে। এখন আপনার কথাতেই শিল্পীর দৃষ্টিতে জানতে পেরেছি—ছবির এই শিশুটি কে!

এই পর্যন্ত বলিয়াই নরেন গম্ভীরমুখে উপবিষ্ট শম্ভুনাথের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া তাঁহার পদযুগল দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল: আমাকে ক্ষমা করুন বাবা! আজ পৃথিবীতে আমার চেয়ে সুখী কেউ নেই। পিতৃহারা আজ তার পিতাকে ফিরে পেয়েছে।

শম্ভুনাথও তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া দুই হাতে নরেনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া সাশ্রুলোচনে আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন: বাবারে! আমার নরু—আমার নরু! আজ আমার বুক ভরে গেছে। অন্ধের চোখ পাওয়ার চেয়েও এ আনন্দ আরো বেশীরে বাবা! আঃ!

হরপ্রসাদ বলিলেন: পরীক্ষায় তুমি কাষ্ট

খণ্ডিত অবস্থায় ছিল। নরেন সেই ছবিখানি তুলিয়া আনিয়া এ-ঘরে টেবিলের উপর রক্ষিত দেবীর ছবির পাশে রাখিয়া তাহার আবরণটি খুলিয়া দিল। পাশাপাশি স্থাপিত সমতুল্য বয়স ও আকৃতিবিশিষ্ট অপরূপ আলেখ্য দুইখানি তখন কক্ষে সমবেত প্রত্যেকের কৌতূহলী দৃষ্টির পরিধিভুক্ত হইল।

নানাভাবে দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়া, প্রত্যেকেই এক মত হইলেন যে, শিল্পী যাহা বলিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত নয়—বিস্ময়কর সত্য। এরূপ সন্দেহ সম্ভব বলিয়াই, তিনি স্বেচ্ছায় এই কঠিন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গৃহস্বামীর কন্যার ছবি প্রণয়নে শিল্পী তাঁহার অসাধারণ শিল্পীমন, অন্তঃশক্তি ও বিরাট পরিকল্পনা যেন প্রত্যেকের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। বিদেশীয় দুই বর্ষীয়ান ব্যক্তিও এই গুণী শিল্পীকে 'জিনিয়াস' বলিয়া অভিনন্দন জানাইলেন।

এই সময় অতীন্দ্রনাথ বলিলেন: দেখুন, কৌতূহলী দর্শক হিসেবেই আমি হোটেল থেকে এঁদের এখানে এসে পড়ি। তার পর এখানকার ব্যাপারটা এমনি নাটকীয় ভাবে জমে ওঠে যে, ওঠবার কথা পর্যন্ত ভুলে যাই। এখন কিন্তু এই ছবি দুখানা দেখে এই প্রশ্নই উঠবে—ঐ দেবী মেয়েটি কে? দুনিয়ায় তার আপনার বলতে কেউ নেই, অথচ পিছনে একটা বিপত্তি আছে। তাকে ঠেকাবার জন্যে সে ছদ্মবেশে শিল্পীর কাছে এসে আশ্রয় চায়, শিল্পীও তাঁর শিল্পবিদ্যার সাহায্যে মেয়েটির বিপত্তিকে ঠেকিয়ে রাখেন। এখন প্রথম কথা হচ্ছে—এই মেয়েটির সত্যকার কি পরিচয়? দ্বিতীয় কথা—এই ছবি, যার ঐ মেয়েটির মুখের সাদৃশ্য যে যথেষ্ট রয়েছে, আমরা কেউ তা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এ সাদৃশ্য কেন? এর পিছনে যুক্তিসহ কোন কারণ আছে কি না?

এই সময় সাহেবদের মধ্যে একজন বলিলেন: আপনি ঠিক ধরেছেন, আমাদের মনেও ঠিক এই প্রশ্ন উঠেছে। এখন আমাদের মনে হচ্ছে—ঐ মেয়েটি যখন এই বাড়ীতেই আছেন, তাঁকেই এখানে ডাকা হোক, তিনিই তাঁর কাহিনী বলুন।

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন; ওঁকে সে কষ্ট আমি দিতে চাই না। উনি যে কাহিনী শোনাবেন, তার মধ্যে ওঁর কুল-পরিচয় কিছুই পাওয়া যাবে না; তাহলে উনি নিজেই সে পরিচয় দিতেন। দেখুন, আমি শুধু ঐ ছবির ব্যাপারে কৌতূহলী হয়েই আসিনি, এই সূত্রে ঐ মেয়েটির সন্ধানও আমার আসার অন্য উদ্দেশ্য। কেন, সেটা আমার মুখেই শুনুন। আমি এমন একটা আশ্রমের কথা জানি, যেখানে চালানে মেয়েদের প্রতিপালন করা হয়। সেই সূত্রে তারা নানা রকম শিক্ষাও পায়, নাচ গান শিখিয়ে তাদের চাহিদা আরো বাড়ানো হয়। তার পর যৌবনে পড়লে পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে তারা পণ্যের মত সওদা হয়ে আশ্রমের পুঁজি বাড়ায়। কাবুলিওলা কিম্বা সার্কাসওয়ালারাও এই সব মেয়ে কিনে এনে তাদের ব্যবসা জাঁকায়।

এই দেবী মেয়েটিও এমনি একটি আশ্রমে মানুষ হয়। কিন্তু ওর বরাতগুণে আশ্রমের বড় বাবাজী ওকে নিজের কাছে রেখে তৈরী করতে থাকেন। সে লোকটা বিশ্বপণ্ডিত, অনেকগুলো ভাষা জানে, কিন্তু ক্রিমিন্যাল; নাম ভাঁড়িয়ে বাবাজী সেজে ঐ আশ্রম খুলে বসে। তার ঝোঁক—দেবীকে দেবী চৌধুরাণী তৈরী করবে। সেই আদর্শে ওকে অনেক কিছু শেখায়, বহু গ্রন্থ পড়ায়, ছুরি খেলার ব্যাপারে চৌকস করে তোলে। দেবীকে সেজন্যে রান্না বান্নাও শিখতে হয় ভাল করে। দেবীর হাতের রান্নাই বাবাজী খায়; বাবাজীর সতর্ক পাহারায় দেবী থাকে। ঐ বাবাজী তরুণ যৌবনে এক ছাত্রীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে তাকে পাবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই ছাত্রী ও ছাত্রীর পিতা তাকে সে জন্য যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও অপমান করেন। তার পরই সে ক্রিমিন্যাল হয়। দেবী যৌবনে পড়লে বাবাজীর মনে হয়—এ যেন তার তরুণ যৌবনের কামনার নিধি সেই ছাত্রীর প্রতিচ্ছবি। তখন সে অস্থির হয়ে উঠে, তার মাথার মধ্যে ঝড় বইতে থাকে। এমনি সময় এক খবর এল—সিন্ধুদেশে চালান দেওয়া গুটিকয়েক মেয়ে ধরা পড়ে পুলিসের কাছে আশ্রমের কথা সব বলে দিয়েছে। শীঘ্রই আশ্রম খানাতল্লাস করবে পুলিস। অমনি বাবাজীর চোখের সামনে জেলখানার ছবি ফুটে উঠল, প্রেমের নেশাও কেটে গেল। তখনই সে আশ্রমের কর্মকর্তা'কে তাড়াতাড়ি দিন কতকের জন্যে মেয়েগুলোকে নিয়ে কোথাও সরে পড়তে পরামর্শ দিল। আর দেবীর

সম্বন্ধে তাকে অনুরোধ করলে—ওর বাপ মাকে খুঁজে বার করে দেবীকে তাদের হাতে যেন সে ব্যক্তি সঁপে দেয়। এই সব ব্যবস্থা করেই বাবাজী রাতারাতি আশ্রম ছেড়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে নিরুদ্দেশ পথে পাড়ি দেয়। দেবীকে সে এক পত্র লিখে জানিয়ে যায় যে, এখন থেকে কর্ম্মকর্ত্তা তার অভিভাবক, সে যেন তার কথা মত কাজ করে। সে দেবীকে তার বাপ মা'র কাছে নিয়ে যাবে। তবে সে যদি দেবীর অমর্য্যাদাসূচক কোন কাজ করে তাহলে বাবাজীর কাছে শিক্ষা পেয়ে দেবী যে আত্মশক্তির অধিকারিণী হয়েছে, সে যেন সেই শক্তির সাহায্য নেয়—সেই তাকে বিপদে রক্ষা করবে। এর পরই ঘটল আর এক কাণ্ড। এই আশ্রমেরই এক গ্রাহক কর্ম্মকর্ত্তাকে লিখল যে, কলকাতা যুদ্ধের ঘাঁটি হওয়াতে, যোদ্ধাদের জন্য আমোদ-প্রমোদের যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে মিলিটারি কর্তাদের তরফ থেকে, সেই ব্যক্তির ওপরেই তার ভার পড়েছে। সুতরাং আশ্রমের সব কটা মেয়েকেই সে এ ব্যাপারে নিতে চায়, মোটা টাকা দেবে। আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্তা তখন যেন হাতে স্বর্গ পায়। সেই দিনই তারে কথা-বার্ত্তা পাকা করে আশ্রম তালাবন্ধ করে সবাইকে নিয়ে কলকাতায় এসে পড়ে। দেবীকে বলা হয়, তার বাপমার পাত্তা দেওয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কর্ম্মকর্ত্তা বাবাজীর কথা ঠেলে ফেলে, দেবীকেও দলের মেয়েদের সঙ্গে ভেড়াতে চাইল। এর পর এই দলের মেয়েদের নাচ দেখাবার জন্যে একটা দিন স্থির হলো। দেবীর আপত্তি টিকল না। সে তখন তার গুরু বাবাজীর নির্দেশমত আত্মশক্তির সাহায্য নিল। সেই দিনই নাচের আসরে নাচ দেখিয়ে, তার পর প্রথম অঙ্কের ড্রপ পড়তেই সাজ-ঘর থেকে সবার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। এ দিকে এই বাড়ীতে শিল্পী নরেন বাবু ছবির তোড় জোড় সাজিয়ে বসেছিলেন—দেবীর অদৃষ্ট তাকে এইখানে নিয়ে এলো। পরের ঘটনা আপনারা সবই জানেন।

হরপ্রসাদ সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি এ সব খবর কোথা থেকে যোগাড় করলেন? এ-পর্য্যন্ত যা শোনালেন, যেন রীতিমত গল্প! কি করে বুঝব—এ কাহিনী সত্য?

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন: ঘটনাস্থলগুলিতে গিয়ে আমাকে এ-সব খবর সংগ্রহ করতে হয়েছে। আর, এর পিছনে রীতিমত প্রমাণও আছে। তা ছাড়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমার এই কাহিনী সত্য।

হরপ্রসাদ বলিলেন: আপনার কথা শুনে জানা যাচ্ছে, অনেকদিন ধরেই আপনি এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন—সমস্ত খবর রাখেন। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য কি জানতে পারি?

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন: অনেকদিন ধরে একটা আশ্রমকে খাড়া করে কতকগুলো সুবিধাবাদী যে দুর্নীতির জাল বুনে এসেছে, সেটা ছিঁড়ে দেওয়া। এত দিনে গবর্ণমেন্টের টনক নড়েছে; তার ফলে আমার উপরেই তদন্তের সঙ্গে বামালশুদ্ধ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার ভার পড়েছে।

মুখ ভঙ্গি গম্ভীর করিয়া হরপ্রসাদ বলিলেন: ও! তাহলে আপনি ডিটেকটিভ্—পুলিসের লোক। কিন্তু এসে অবধি আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেছেন, আমরা কেউই আপনাকে পুলিসের লোক বলে সন্দেহ করতে পারিনি।

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন: এইখানেই পুলিসের লোকের বাহাদুরী ঘোষ মশাই! ইনটেলিজেন্স দপ্তরে শিক্ষানবিশী করে এটা শেখবার জন্তে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাকে বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, তার পর মার্কিণ মুলুকে ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছিলেন ষ্টেটের খরচে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গুপ্ত অপরাধের সন্ধান করে সমাজকে রক্ষা করাই আমাদের মূল নীতি।

হরপ্রসাদ এবার সহসা প্রশ্ন করিয়া বলিলেন: তাই যদি, এই যে আশ্রমের কথা বললেন, তার সংস্রব থেকে যে মেয়েগুলো পেয়েছেন আর পালিয়ে এসেছে বলে—এখানে যে মেয়েটির সন্ধানে এসেছেন, এদের বাপ মা'র সন্ধান করে, তাদের বাকি জীবনগুলো সার্থক করতে পারবেন?

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন: সেই আশা নিয়েই ত এত বড় একটা দুর্নীতির পিছনে ধাওয়া করতে হোয়েছে। তবে একথা আপনাকে বলতে পারি, এই দেবী মেয়েটির জীবন যে সার্থকতার পথে এসেছে, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

হরপ্রসাদ স্থূল গুম্ফযুগল স্ফীত করিয়া

বলিলেন : তাই নাকি? তাহলে স্পষ্ট করেই সব বলুন।

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন : সেই কথাই বলছি। দেখুন, দেবী মেয়েটি নাচের মজলিস থেকে পালিয়ে আসবার সময় তার পিছনের চিহ্নগুলো এমন করে মুছে দিয়ে এসেছিলেন যে, তাঁকে খুঁজে বার করা সম্বন্ধে আমার বিলিতী ও মার্কিনী শিক্ষাও ব্যর্থ হয়ে যায়। একটু আগে আপনার মুখেই শুনেছি, মালা দেবীর চিঠি পেয়ে আপনি এখানে তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন। এখন আমিও বলতে বাধ্য হচ্ছি—আজ সকালেই ঐ মালাদেবী ই এক পত্রে আমি জানতে পারি যে, দেবী আপনার ফ্ল্যাটেই শিল্পী নরেনবাবুর মডেল হয়ে আছে। শিল্পীর ছবির খবরও আজকের কাগজে ছাপা হয়। চিঠিখানি নিয়েই আমি গ্রাণ্ড হোটেলে যাই ছবিখানা দেখতে। তার পর, যে সব ঘটনা হয়, আর কৌতূহলী দর্শকরূপে আমি এখানে আসবার সুযোগ পাই, সে ত সব জানেন। এখন এই কথাই আমি বলব যে, আজকের এই যোগ যোগ ঘটেছে মালা দেবীর জন্যই। তাঁর চিঠি পেয়ে আপনি বোম্বাই থেকে কলকাতা এসে পড়েছেন, আমিও দেবী মেয়েটির সন্ধান পেয়ে এখানে এসে তাঁর অতীত সম্বন্ধে এত কথা আপনাদের জানাতে পেরেছি।

হরপ্রসাদ বলিলেন : আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন; কিন্তু মালা দেবীর এই প্রচেষ্টা—তা সে যে উদ্দেশ্যেই হোক…আসলে কিন্তু সেটা দেবীর পক্ষে 'শাপে বর'-এর মত শুভ হয়েছে কিনা, এখনো আমরা জানতে পারি নি।

অতীন্দ্র বলিলেন : সেইটিই জানানো হচ্ছে এখন আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহলে দেবীকে এখানে আসতে হবে; তাঁর সামনেই সে কথা আমি বলতে চাই!

ডাকিতে বা খবর দিতে হইল না, একদিকের দরজার উপর দোদুল্যমান পুরু পরদাখানির পাশ দিয়া দেবীই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল—সে করযোড়ে আর সকলকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া, সাহেব দুইজনকে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে 'গুড ডে' বলিয়া অভিনন্দন জানাইল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবরাও টুপী খুলিয়া তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

নরেন্দ্র বলিল : ইনিই দেবী। কিন্তু প্রথম দিন যখন আমার ষ্টুডিওতে আসেন, দেখে পাঞ্জাব বা বেলুচিস্থানের কোন তরুণ যুবা মনে হয়েছিল। উনি না বলা পর্য্যন্ত সে ছদ্মবেশ ধরতে পারি নি।

দেবী বলিল : উনি তখন মালা দেবীর ছবি নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন। তারই আসনে আমাকে বসতে দেখে ওঁর মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। নতুবা ওঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার ছদ্মবেশ তখনি ধরা পড়ে যেত।

হরপ্রসাদ হাত বাড়াইয়া দেবীকে নিজের কাছেই ফরাসে বসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দেবী এবার এক কাণ্ড করিয়া বসিল। আঁচলখানি গলায় দিয়া—হরপ্রসাদ, শম্ভুনাথ ও নরেন্দ্রের পদতলে পর পর মাথা ঠেকাইয়া এবং অপর সকলকে পুনরায় যুক্ত করে নমস্কার করিয়া হরপ্রসাদের ফরাসে গিয়ে বসিল।

অতীন্দ্রনাথ দেবীকে এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন। সে ফরাসে বসিলে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় দেবাই প্রথমে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল : আপনার সব কথাই আমি ও-ঘর থেকে শুনেছি। প্রথম বা আমার সম্বন্ধে যা যা বলেছেন, সবই সত্য। এ কথা আপনি আমাকেই প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবেন, তাই নিজে থেকেই আপনাকে জানিয়ে দিলাম।

অতীন্দ্রনাথ বলিলেন : তুমি যে খুব বুদ্ধিমতী, আমাদের মেয়েদের মত চটপট হয়ে কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে অভ্যস্ত, তার অনেক পরিচয় আমি পেয়েছি। তোমার আর কিছু বলবার আছে?

দেবী বলিল : আমার কথা ত আপনিই সব বলেছেন। অবশ্য, শিল্পীকে আমার ঐ সব অতীত কাহিনী পরে বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম, কিন্তু তিনি শোনবার জন্যে মোটেই আগ্রহ দেখান নি, আমি আশ্চর্য হয়েছি, নিজের শিল্প সাধন দিয়েই উনি আমার পরিচয় জানবার আশা মনে পোষণ করতেন।

অতীন্দ্রনাথ : আপনি কি এখন নিজের সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হয়েছেন?

দেবী : আপনি যেটা অনুমান করে আমাকে এই প্রশ্ন করলেন, আমি সে দিক দিয়ে না গিয়ে এই কথাই বলব—প্রথম দিন এখানে এসে শিল্পীকে যেই মানুষ বলে চিনতে পারি, তখনই আমি এই আশা পোষণ করেছি যে, আর যাই হোক, আমাকে সেই নরকে ফিরে যেতে হবে না। আমি মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়েছি।

অতীন্দ্রনাথ : আপনি নিজের সম্বন্ধে আর কিছু জানতে চান ?

দেবী : আমি চলে আসার পর আশ্রমের মেয়েগুলি আর কর্মকর্তা লালাজীর অবস্থা কি হয়েছে, জানবার আগ্রহ হয়।

অতীন্দ্রনাথ : আর কিছু ?

দেবী : সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যারা যুদ্ধ করে, তাদের জন্যে সরকারের এত দরদ যে, পেটের রসদের সঙ্গে মনের রসদ যোগাবার ব্যবস্থাও হয়েছে আর, আমাদের দেশের লোকই এ ব্যাপারে দালাল হয়ে আমাদের মত অসহায় মেয়েদের কি সর্বনাশ করছে, কলকাতায় এসে নিজের চোখে তা দেখিছি—আপনাদের মত বিজ্ঞ যোদ্ধাদের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিয়েও এসেছি। এখন বলবেন আমাকে দয়া করে—আমার সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে কিনা ?

অতীন্দ্রনাথ : এই মাত্র তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে যে কথা বললে, কটা যোক্ষম নাচের মধ্যেই সেটা দেখিয়ে সবার চোখ যে খুলে দিয়েছ, আজ আর সেটা চাপা নেই। মিলিটারী কর্তারাও ও সিষ্টেম বন্ধ করে দিয়েছেন। তুমি সত্যই অদ্ভুত মেয়ে। ওখানকার আর কিছু জানতে চাওনা ?

দেবী : বেশ বুঝতে পারি, লালাজী ধরা পড়েছেন। সিদ্ধাশ্রমের নাম নিয়ে তিনি যে সব অন্যায় কাজ করে এসেছেন, তাতে তাঁর নিস্কৃতি নেই—এ আমি জানতাম। এখন মেয়েগুলির কি অবস্থা হবে, কি ব্যবস্থা তাদের সম্বন্ধে করেছেন, জানতে ইচ্ছা হয়।

অতীন্দ্রনাথ : চেষ্টা করা যাবে—তাদের বাপ-মার যদি সন্ধান পাওয়া যায়—

দেবী : সেটা খুব কঠিন। কেন না, আশ্রমের প্রথম আর প্রধান কাজ ছিল, তাদের অতীত ভুলিয়ে দেওয়া।

অতীন্দ্রনাথ : তোমার অতীত সম্বন্ধে কিছুই কি মনে পড়ে না ? বাপ, মা, জন্মস্থান—

দেবী : তাহলে এ ঘটনা কি এভাবে এত দূরে এগিয়ে আসত বলতে চান ?

অতীন্দ্রনাথ : লালাজীর কাছেও কি কোন সন্ধান পাও নাই ?

দেবী। এ প্রশ্নেরও ঐ উত্তর ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন।

অতীন্দ্রনাথ : লালাজীকে বাধ্য করে তোমার সম্বন্ধে অতীত সংবাদ সংগ্রহ করতেও চাও না ?

দেবী : না। তাঁর মত সুবিধাবাদী ব্যক্তির কথাকে আমার এ অবস্থায় বিশ্বাস করা উচিত নয়।

অতীন্দ্রনাথ : আর সাধুজীর কথা ?

সাধুজীর নাম শুনিবামাত্র দেবী যুক্ত করে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করিয়া বলিল : তিনি আমার গুরু, শিক্ষাদাতা, কর্মে দিয়াছেন দীক্ষা। আত্মশক্তি কি করে বিকাশ করতে হয়, সেও তাঁরই কাছে জেনেছি। কিন্তু পরে যখন জানতে পারি—অতবড় শক্তিশালী পুরুষের মনের একটা দিকে ঘুণ ধরেছে, পাপ সেখান থেকে উঁকি দিয়ে তাঁর মনকে বিকৃত করে তুলছে, তখন আমাকেও শক্ত হতে হচ্ছিল—তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য। কিন্তু ভগবান সে সঙ্কট থেকে আমাকে রক্ষা করেন ; নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে লজ্জায় তিনি পালিয়ে যান প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে। কিন্তু তবুও আমি বলছি—তিনি যদি আমার অতীত সম্বন্ধে কিছু বলে যেতেন, আমি তাকে পরম সত্য বলে স্বীকার করতাম।

অতীন্দ্রনাথ সপ্রশংস দৃষ্টিতে আত্ম-স্বার্থ-সম্বন্ধে অনাসক্তা, লোভশূন্যা এই মনস্বিনী মেয়েটির নির্মল ও প্রাঞ্জল মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন ; তাহার কথা শেষ হইলে বলিলেন : তাহলে এখন তোমাকে বলি, লালাজী যখন জানতে পারে, তার মৃত্যুবাণ আমার হাতে এসে পড়েছে—আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই, তখন আত্মহত্যা করে সে নিজেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

আর্তকণ্ঠে দেবী এই সময় বলিয়া উঠিল : আত্মহত্যা করেছেন কাকাজী! আমিও জেনেছিলাম, তিনি ভুল রাস্তায় মৃত্যুর পথেই এসেছেন। সাধুজীর মত সংযমশক্তি তাঁর নেই, তাই লোভের পাক ছাড়াতে না পেরে আরো জড়িয়ে পড়েছেন। ভগবান তাঁর আত্মাকে মুক্তি দিন, এই প্রার্থনাই করি।

অতীন্দ্রনাথ পকেট হইতে গালা দিয়া শীলমোহর-করা একখানি লেফাফা বাহির করিয়া দেবীর সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন : লালাজীর জিনিস পত্র তল্লাস করে এই চিঠিখানা পাওয়া গেছে। তোমার নামেই চিঠি ; কিন্তু চিঠির লেখক তোমার গুরু সাধুজী আনন্দ স্বামী। এই পত্রখানা দেবার জন্যই নানা ভাবে তোমাকে

খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। এখন সবার সামনে এই পত্র তোমাকে দিচ্ছি, তুমি পত্রখানি অবিকল পড়বে সবার সামনে এই সর্ত্তে।

লেফাফাখানি হাত বাড়াইয়া লইয়াই তাহার শিরোনামার হরফ গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেই দেবী বুঝিল, কে এই পত্রের লেখক। শ্রদ্ধার সঙ্গে লেফাফাখানি সর্ব্বাগ্রে সে ললাটে ঠেকাইল; তাহার পর গালা ভাঙিয়া মোড়ক খুলিয়া সুস্পষ্ট অনুচ্চস্বরে পড়িতে লাগিল:

স্নেহের দেবী!

তোমার কুল-পরিচয় আজ আমিই তোমার কাছে প্রকাশ করিতেছি এই পত্রে। কিন্তু তুমি ত জান, এই পরিচয়প্রসঙ্গে তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বরাবরই আমাকে কঠিনভাবে বলিতে হইয়াছে—আমি কিছুই জ্ঞাত নহি। সুতরাং তোমার সামনে বসিয়া তোমার চোখে চোখ রাখিয়া—সেই আমি তোমার কুলপরিচয় কখনই মুখে বলিতে পারিতাম না। সেইজন্যই এই পত্রের অবতারণা। তুমি যখন—আমার স্বহস্তে লিখিত এই পরিচয়-পত্র পড়িবে—আমি তখন দূরে—বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি; ইহলোকে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না।

পাঁচ ছয় বছরের বালিকা তুমি তখন—প্রয়াগে মহাকুম্ভের মেলা চলিয়াছে; লালাজীর উদ্যমে সিদ্ধাশ্রমেরও শিবির পড়িয়াছে মেলার একাংশে। নিত্য দুটি চারটি করিয়া বালিকা আসিতেছে। সাধুজীকে দেখিয়া তাহাদের দারুণ ভয়, কি কান্না। তার পর একদিন তোমাকে আনিয়া আমার সামনে উপস্থিত করিল লালা। বলিল—এই মেয়েটি বাঘ দেখিতে চায়। কিন্তু বাঘের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি সাধুজীকে দেখিয়া তুমি হাসিয়া অস্থির। আমার দীর্ঘ দাড়িটি টান দিয়া আমাকেও অবাক করিয়া দাও। তুমি ভাবিয়াছিলে, পেশাদার সাধুর মত নকল দাড়ি পরিয়া আমি সাধু সাজিয়াছি। আমি কিন্তু ইহাতেই বুঝিতে পারি, তুমি কি ধাতের মেয়ে। তোমার চোখ, মুখ, আর মনের তেজ দেখিয়া আর একটি ডাগর মেয়ের কথা মনে পড়িল। তিনি ছিলেন এক পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর মেয়ে, আমি তখন দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁহাকে পড়াইতাম, কায়স্থ তাঁহারা। কিন্তু ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়াও সেই কন্যাকে আমিও বিবাহ করিবার কামনা পোষণ করি। কন্যা ত আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া খুন। তাহার পরিহাসকে আমি অনুরাগ মনে করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করি। তার ফলে আমাকে কারা-দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। আমি সেই অবস্থায় প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। কিন্তু জেল হইতে বাহির হইয়া সেই কন্যাকে পত্র লিখিলে জানিতে পারি—কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সেই কন্যার স্বামীই সুখবরটি দিয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তখন বাধ্য হইয়া আমাকে তাহার আশা ত্যাগ করিতে হয়। তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করি। তাহার পর অনেকগুলি বৎসর চলিয়া যায়। আমি আশ্রমের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করি—প্রচ্ছন্ন থাকে একটা উদ্দেশ্য। এমনই সময় তোমাকে পাইলাম। তোমার মধ্যেই আমি যেন আমার সেই ছাত্রীকে দেখিতে পাইলাম। মুখে চোখে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য। তাহার পর নাম জিজ্ঞাসা করিতেই তুমি যেই জানাইলে—তোমার নাম রেণু, পুনরায় আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুপুঞ্জে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল; যেহেতু, আমার সেই ছাত্রীর নাম ছিল—অনু বা অনুপমা। তাহার পরই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে তোমার মাতা ও পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তুমি তৎক্ষণাৎ বলিলে—শ্রীমতী অনুপমা ও শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ ঘোষ। তখনই সব সমস্যার সমাধান হইল। আমার অন্তরের পশুটা উল্লসিত হইয়া চেঁচাইয়া দিল আমাকে—'ঠিক হইয়াছে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। সিদ্ধির বীজ পাইয়াছ হাতের মধ্যে।'...তুমি তখন বাড়ী যাইবার জন্য মারমুখী; আর আমি তোমাকে সাদরে কোলে বসাইয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া বলিতে থাকি—আমার পানে তাকাও খুকী, আমার দেওয়া খাবার খাও, এখনই ঘুমাইয়া পড়িবে, ঘুম ভাঙিলে বাড়ীর কথা মনে থাকিবে না।

কিন্তু সেদিন আমারই ভুল হইয়াছিল—সম্মোহন বিদ্যা, নানা বিধ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াও তোমার স্মৃতিলোপ করিতে পারি নাই। দুই চারি দিনের মধ্যে অপর বালিকাদিগকে তাহাদের অতীত ভুলাইয়া দেওয়া সহজ হইয়াছিল, কিন্তু তুমি আমাকে হিমসিম খাওয়াইয়াছিলে। বহু কষ্টে বহুদিনে বিবিধ প্রক্রিয়ার পর তোমার স্মৃতি হইতে অতীতের কথা মুছিয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

তাহার পর দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী কঠোর প্রচেষ্টার

ফলে, তোমার শিক্ষা যখন সার্থক হয়—অন্তরে তোমার আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন আমার হুঁস হইল। এতদিন আমি আদর্শ শিক্ষা দানের দায়িত্ব মধ্যে মগ্ন ছিলাম। বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রভাবকেও শিক্ষাদানের সহায়রূপে গ্রহণ করায় শিক্ষার মধ্যেই আমি ছিলাম আত্মস্থ। সেই ধ্যান ভঙ্গ হইতেই সাধারণ দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিলাম। তখন আমি বৈদিক যুগের ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ঋষির শিক্ষাপীঠ হইতে নামিয়াছি। দেখিলাম প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকতুল্য তোমার যৌবনদৃপ্ত রূপরাশি—অমনি মনে পড়িল, পূর্ব্ব ছাত্রী অনুপমাকে; মনে হইল, আমার সাধনায় অনুপমাই আমার আশ্রমে আসিয়াছে। নিদারুণ একটা লালসার আভায় আমার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসিয়া উঠিল। আমি উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম।···আমার বাঞ্ছিতাকে আমি এইভাবে পাইয়াছি···দ্বাদশ বৎসরের সাধনার প্রভাবে। জানিনা, শিক্ষালব্ধ আত্মশক্তির আলোকে তুমি আমার তৎকালীন কলুষিত প্রবৃত্তি উপলব্ধি করিয়াছিলে কি না?

কিন্তু অন্তরস্থিত ব্রহ্মশক্তি তখনও লুপ্ত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয়—প্রবৃত্তির চক্র পরিবর্ত্তিত হইল। সেই শোচনীয় অবস্থায় আমার চিত্তকেই বিবেক কশাঘাত করিতে লাগিল। এদিকে পাপের কলা পূর্ণ হওয়ায় আশ্রমেও দুর্য্যোগ ঘনাইয়া আসে। তখন প্রায়শ্চিত্ত-পিপাসা আমাকে আকুল করিয়া তুলে। আশ্রম ত্যাগের প্রাক্কালে তোমাকে লালাজীর অভিভাবকত্বের অধীনে অর্পণ করিয়াও ক্ষুদ্র এক পত্রে তোমাকে যথাযথ নির্দ্দেশ দান করি। এই পত্রে তোমার অতীতের পরিচয় অসঙ্কোচে বিবৃত করিলাম। তোমার পিতা মাতা যদি শ্রীভগবানের প্রসাদে সংসারে থাকিয়া থাকেন, আমার এই পত্রবর্ণিত কাহিনী তাঁহাদের স্মৃতির উপর আলোকপাত করিবে। এবং তোমাকে আত্মপ্রত্যয়শীলা, স্বধর্ম্মনিষ্ঠাবতী, অপাপবিদ্ধা বিশুদ্ধা কুমারী কন্যারূপেই গৃহে বরণ করিয়া লইবেন। এক দিক দিয়া আমি তাঁহাদিগকে দারুণ বেদনা ও মনস্তাপ দিয়াছি সত্য, কিন্তু পক্ষান্তরে আমার নিকট শিষ্যারূপে তুমি যে বিদ্যা ও শিক্ষালাভ করিয়াছ—তাহা বৈদিক যুগে বেদোক্ত ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমেই সম্ভব ছিল। জৈব সত্তার ঊর্দ্ধে মানুষের যে স্বতন্ত্র একটা সত্তা আছে, তাহার সূক্ষ্ম রূপ দেখিবার মত দৃষ্টিশক্তি তুমি পাইয়াছ। তোমার জীবন, তোমার শক্তি, তোমার অস্তিত্ব যে বৃথা নয়, তুচ্ছ নয়, তুমি তাহা জানিয়াছ। এই অবিশ্বাসের যুগে সাধারণ নারীর কথা তুলিতে চাই না, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত কয়জন যুবকের অন্তরে এই শিক্ষার আলোকপাত হইয়াছে?

উপসংহারে আমি কেবল মাত্র, লালাজীর নিমিত্ত অনুরোধ করিব। তোমার পিতা মাতা এবং তুমি তাহাকে এই পুনর্ম্মিলনের সংযোজক সেতুস্বরূপ মনে করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে সুখে ও নিরুদ্বেগে অতীত হয়, সেই ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে।

আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি পিতা মাতাকে পাইয়া সুখী হও, তোমার ভাবী জীবন সুখ ও শান্তিময় হউক।

শুভানুধ্যায়ী—সাধুজী।

দেবীর পত্র পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র হরপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: সাধু, সাধু! প্রথমেই আমি সাধুজীকে প্রণাম জানাচ্ছি। অকপটে তিনি সত্য প্রকাশ করেছেন। আমার মনে কোন খুঁৎ বা সংশয় নেই। ওপরে উঠেই যখন তোমাকে প্রথম দেখি, তখনই মন আমার দুলে উঠেছিল; তার পর সেই জোরালো কথাগুলি ভারি মিষ্টি লেগেছিল মা! তুমিই আমাদের হারানিধি রেণু। আমার বিশ্বাস, উনিও এই কথা বলবেন—ভিতরে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করে এসো।

দেবী বলিল: উপরের ঘরে শিল্পীর আঁকা ছবি দেখেই মায়ের স্বপ্ন-দৃষ্টি খুলে যায়—মায়ের মনের ছবির সঙ্গে শিল্পীর আঁকা ছবি, মিলে গেছে জেনে তখনি তিনি আমাকে তাঁর সেই হারানো-মেয়ে রেণু বলেই কাছে টেনে নেন; সেই থেকে ও-ঘরে আমাকে কোলে করে বসেছিলেন। আজ চারদিক থেকে আনন্দ আমাকে ঘিরে ধরেছে—হারানো বাপ মাকে আমি আশ্চর্য্যভাবেই ফিরে পেয়েছি।

শম্ভুনাথ বলিলেন: এমন আশ্চর্য্য ঘটনা বাস্তবে ঘটে না। এখন বারো বছরের আগেকার কথা—সেই ভীষণ দিনটির কথা মনে পড়েছে হরু! সর্ব্বহারা হয়ে বিদেশের পথে পাড়ি দেবার মুখে, তোমার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যায়··· দুটো ছেলে মেয়ের ছবি আমাদের দুই বন্ধুর মনে মিলনের এক নূতন আনন্দের সঞ্চার করে, তার পরেই ওঠে বিবাদের ঝড়···রেণুকে পাওয়া গেল

না। সেই সূত্রে হয়িষে বিষাদে আমার হলো স্মৃতি লোপ। অতীতের কথা মুছে যায়—এই দুই মহাশয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আমার জীবনযাত্রা চলতে থাকে নুতন পথে। ভগবানের অপার কৃপা যে, সহজাত সংস্কারের মত যে চিত্রবিদ্যা আমাকে প্রেরণা দিয়ে এসেছে, তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন নি; বরং স্মৃতিলোপ হওয়ায় সেটা আরো প্রবল হইয়া ওঠে। আজ আমিও পেয়েছি নুতন জীবন, কিন্তু সেই সঙ্গে হারানো জিনিস সব আমাকে ঘিরে ধরেছে। তবে দুঃখ এই—সেদিনের মত আজও আমি রিক্ত, নিঃসম্বল।

সাহেবরাও এতক্ষণ নিঃশব্দ মনে এই উপাখ্যান শুনিতেছিলেন। বাঙালা ভাষা তাঁহারা ভালরকমই জানিতেন, সুতরাং উপলব্ধি করিতে অসুবিধা হয় নাই। সেই সময় এক ব্যক্তি শম্ভুনাথকে বলিলেন: মিঃ আর্টিষ্টের এই দুঃখের কোন কারণ নেই। অতীতের স্মৃতিলোপ হলে এঁর সংস্কার-লব্ধ শিল্পশক্তি আশ্চর্য্যভাবেই এঁর পরিকল্পনাকে প্রবুদ্ধ করে নব নব প্রেরণা দিতে থাকে, আমরা এই দীর্ঘকাল ওঁর সেই বিরাট প্রতিভার দান গ্রহণ করে প্রচুর লাভবান হয়েছি। উনি কিন্তু বিনিময়ে ভরণ পোষণ ছাড়া কিছুই গ্রহণ করেন নাই। আমরাও ওঁর প্রাপ্য দেবার কোন সুযোগ না পেয়ে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি। মুনফার সঙ্গে সে সব টাকা ওঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আমরাও নিশ্চিন্ত হব।

অপর সাহেবটি অতঃপর বলিলেন: আপনি নিজেকে রিক্ত ও নিঃসম্বল বলে দুঃখ করছিলেন মিষ্টার আর্টিষ্ট, কিন্তু আপনার যে প্রাপ্য জমা আছে, মুনফার সঙ্গে তার পরিমাণ কত জানেন? অন্ততঃ বারো লক্ষ টাকা হবে।

শম্ভুনাথ অবাক বিস্ময়ে তাঁহার পরম শুভানুধ্যায়ী সাহেব দ্বয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নরেন্দ্র বলিলেন: আপনাদের মত ব্যবসায়ী জাতির পক্ষেই এতখানি সততা সম্ভব। কিন্তু এ-দেশের পক্ষে এ কল্প—কথা, স্যর।

এই সময় মালা ধীরে ধীরে ক্লাসের নিকট আসিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে দেবীকে বলিল: আমি না বুঝে আপনার কাছে অপরাধিনী হয়ে আছি। এখন মাপ চাইতেও আমার লজ্জা, হচ্ছে।

দেবী সহাস্যে বলিল: কেন তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছো ভাই; আমরা প্রত্যেকেই তোমাকে অপরাধিনী না মনে করে, হিতৈষিণীই ভাবব। তোমার জন্যেই এত শীঘ্র ও এত সহজে আমার শাপ মুক্তি হয়েছে। এই সহৃদয় সরকারী কর্মচারী মহাশয়ও সে কথা স্বীকার করেছেন একটু আগে, আজকের এই যোগাযোগের উপলক্ষই যে তুমি ভাই।

হরপ্রসাদ বলিলেন: সুতরাং তোমাকে আমরা এমন একটা পুরস্কার দেব, যা আজকের এই ঘটনার স্মৃতিচিহ্নের মত হয়ে তোমাকেও আনন্দ দেবে। আমার বেটু মা, এর পর ভেবে চিন্তে আমাকে সেটা বলবেন। আর তোমাকেও বলছি বেটুমা, লালাজী যখন বেঁচে নেই, তার কাছে চাইবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, এমন কিছু তুমি আমার কাছে এখন দাবী কর, তোমার নিজের পছন্দমত যে কোন ব্যাপারে সেটা লাগানো চলে।

দেবী সানন্দে বলিয়া উঠিল: এইত আমার বাবার মত কথা। তাহলে আমার প্রার্থনা আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি: জ্ঞান হয়ে অবধি আমি যা দেখেছি, তার পর, বড় হয়ে যা বুঝেছি, সে শুধু মেয়েদের লাঞ্ছনা। সওদার সামিল করে তাদের মানুষ করা হয়। বড় হলে পণ্যের মত তারা দেশ দেশান্তরে চলে যায়। এ দিকে দেশের কারুর নজর নেই। এই যে মহাযুদ্ধ চলেছে, এর আগেও দেশে যে মন্বন্তর হয়ে গেছে—আমি কাগজে তার কথা সব পড়েছি। লক্ষ লক্ষ লোক তাতে মরেছে; কিন্তু কত লক্ষ মেয়ে যে হারিয়ে গেছে, তালিয়ে গেছে, তার হিসেব নেই। এখনো মেয়েদের নিয়ে এই ছিনি মিনি খেলা চলেছে। আমি চাই এর প্রতীকার—হারানো মেয়েদের উদ্ধার করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচাবার ব্যবস্থা করা। আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি এই সরকারী তদন্তকারী পুলিস অফিসার মহাশয়কে—ইনিই সরকারের চোখ খুলে দিয়েছেন; এঁর জন্যই এত বড় একটা নারী-পণ্যাগারের দরজা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এখনো দেশের অনেক স্থানে এই অনাচার চলেছে। আমার বাবা আমাকে আজ তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করবার জন্য হাত পাততে বলেছেন। আমি এই প্রার্থনা করছি—দেশের হারানো মেয়েদের উদ্ধার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য করুন। বিভিন্ন প্রদেশে তার শাখা

খোলা হবে; দেশের লোকের কাছে আবেদন জানানো হবে তাঁরা যাতে যথাশক্তি সাহায্য করেন। আমি অনুরোধ করছি—সিদ্ধাশ্রমের হারানো মেয়েদের উদ্ধার করে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন যিনি, সরকারের সেই সুদক্ষ কর্মচারী এর ভার গ্রহণ করুন। আমিও আমার শিক্ষা, দীক্ষা, প্রভাব, সময়—সব কিছুই এর জন্য উৎসর্গ করব।

হরপ্রসাদ বলিলেন: খুব ভাল প্রস্তাবই তুমি করেছ মা! বেশ, হারানো মেয়েদের উদ্ধারের উদ্দেশ্য নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান প্রথমে কলকাতা সহরেই গড়ে উঠুক। আমি তার জন্যে একখানা বড় বাড়ী আর এক লাখ টাকা নগদ উপস্থিত দেব। তার পর, প্রদেশে প্রদেশে ব্রাঞ্চ খোলবার সময়ও প্রয়োজন মত সাহায্য করব। আমার এলাহাবাদের বাড়ীখানাও এই উদ্দেশ্যে দান করছি।

শম্ভুনাথও সহর্ষে বলিলেন: আমি ত খানিক আগে নিজেকে রিক্ত বলেই জানতাম। এখন শুনছি, আমি নাকি কীর্তিমন্ত বড়লোক, লাখ লাখ টাকার মালিক। তাই যদি হয়, অর্দ্ধেক টাকা আমি রেণু-মা'র প্রতিষ্ঠানে দিলাম।

শিল্পী নরেনও এই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিল: আমিও তাহলে যে টাকাটা আজ ছবির দরুণ পেয়েছি, সেটা এই প্রতিষ্ঠানেই দেবার জন্য জেঠাবাবুকে অনুরোধ করছি।

সকলেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে দাতাদের উদ্দেশে ধন্যবাদ দিলেন। অতীন্দ্রনাথও দেবীর প্রশংসা করিয়া বলিলেন: দেশে যদি তোমার মত মেয়ে আর গোটাকতক জন্মায়, তাহলে দেশের হাওয়া বদলে যাবে। তুমি যে প্রস্তাব করেছ, এ এক বিরাট কীর্তি। আমি নিজে ত এতে কর্মী রূপে যোগ দেবই, তা ছাড়া সরকারও যাতে নিয়মিতভাবে সাহায্য করেন, তার ব্যবস্থাও করব। আর এক কথা, লালাজীর বাসা থেকে প্রচুর ধনসম্পত্তি পাওয়া গেছে, আমি চেষ্টা করব, এই টাকা যাতে তোমার প্রতিষ্ঠানের কাজে প্রদত্ত হয়।

এইসময় হরপ্রসাদ প্রস্তাব করিলেন: আপনারা যখন এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে এত খানি সময় দিলেন, তখন এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করবার জন্য আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার এই অনুরোধ রক্ষা করলে বিশেষ অনুগৃহীত হব।

হরপ্রসাদের কথার সঙ্গে দেবীও করযোড়ে মিনতি জানিয়ে বলল: যখন আমাকে আপনারা এ-বাড়ীর মেয়ে বলে স্বীকার করেছেন, আমাকেই আপনাদের আতিথ্য পরিবেষণের অনুমতি দিতে হবে—আমি সেটা সৌভাগ্য মনে করব।

সমস্বরে সকলেই সম্মতি দান করিলেন। এই সময় হরপ্রসাদ ফরাস হইতে উঠিয়া নরেনের কাছে গেলেন, এবং তাহাকে দুই হাতে আসন হইতে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন: এখন তাহলে আসল কথা বলি নরু—রেণুকে তুমিই উদ্ধার করেছ; ছবির রেণুও তোমার, আর জীবন্ত দেবীও তোমার।

এই সঙ্গে নরেন ও দেবী উভয়ে হরপ্রসাদের সহিত শম্ভুনাথকেও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

সমাপ্ত

'অপরিচিতা' উপন্যাসখানি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পর পর কতিপয় সংস্করণ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ইহার শেষাংশ পড়িবার জন্য পাঠক মহলের আগ্রহের অন্ত ছিল না। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির এই উপন্যাসখানি মদীয় গ্রন্থাবলীতে সন্নিবেশিত করায়, কর্তৃপক্ষের আগ্রহে 'অপরিচিতা' উপন্যাস অতিদ্রুত সমাপ্ত করিয়া দিলাম। সম্পূর্ণ উপন্যাস এই প্রথম প্রকাশিত হইতেছে।

লেখক।

বিগ্রহ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগ্রহ

হরিপুর গ্রামখানির প্রান্তভাগে নদীর তীরে অন্ধ সাধু শ্রীদাসের আশ্রম। সুবিস্তীর্ণ পুরাতন এক বটগাছের তলায় মাটির একটি বেদী দেখা যায়। এই বেদীর উপর অপূর্ব এক গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করে সাধু তাঁর পূজা অর্চনা করিতেন—পূজার প্রধান উপচার ছিল সাধু শ্রীদাসের ভক্তিমাখা মধুর ভজন। অনাড়ম্বরে সাধু করতে চাইতেন পূজা—কিন্তু গ্রামের লোকের আন্তরিকতাপূর্ণ আগ্রহের ফলে সেটা সম্ভব হয় নি। তারা নিত্যই পূজার সময় সাগ্রহে সমবেত হয়ে ভীড় জমায়—ভরে যায় সমস্ত প্রাঙ্গণটি আবাল-বৃদ্ধ বনিতার সমাগমে। সাধারণত, সন্ধ্যার পরই সাধুর আশ্রমে এই ভাবে প্রত্যহ জন-সমাগম হয়ে থাকে।

সেদিন সকালেই আশ্রম জনতায় ভরে গেছে—কিন্তু লোকের মুখে অন্য দিনের মত ভাবানন্দের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে বিরক্তি ও ক্রোধের ভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; শান্তি-স্নিগ্ধ আশ্রমটিও যেন আনন্দময় পরিবেশের আবরণ ছিন্ন করে একটা অশান্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এর কারণ—গত রাত্রে আশ্রমের বেদী থেকে বিগ্রহটি চুরি হয়ে গেছে—এই খবর পেয়ে এমন অসময়ে গ্রামের লোকজন সব কাজকর্ম ফেলে আশ্রমে ছুটে এসেছে। এ ব্যাপারে তারা ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত। কিন্তু আশ্চর্য, যাঁর ঠাকুর—যিনি এই আশ্রমের অধিকারী, এত বড় বেদনাদায়ক ব্যাপারে তাঁকে কিছু মাত্র বিচলিত দেখা যাচ্ছে না—আগেকার মত তেমনি স্বাভাবিক প্রসন্নভাব হাসিতে মুখখানি তাঁর ভরে রয়েছে।

জনতা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আস্ফালন করছে: এ অন্যায়, আমরা কিছুতেই সহ্য করব না—এর প্রতিকার চাই।

কথাটার সমর্থন করে সবাই চেঁচিয়ে ওঠে: নিশ্চয়ই।

মালাকার যুবক বিশ্বনাথের ক্ষোভ বুঝি সবার চেয়ে বেশী। তার তরুণী স্ত্রী সুরতী দুবেলা ঠাকুরকে ফুল-মালা যোগায়, নানাভাবে সাধুকে সাহায্য করে—সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথ এসে আর সকলের সঙ্গে সাধুর ভজন শোনে। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ বিশ্বনাথ হাতের লম্বা লাঠিটা দেখিয়ে বলে: এর জন্য যদি লাঠালাঠি করতে হয়—তাতেও পেছপাও হব না।

এ কথায় জনতা আরো উত্তেজিত হয়ে তাকে সমর্থন করল: আলবৎ।

সাধু শ্রীদাস সহাস্যে বললেন: ঠাকুরকে কারা নিয়ে গেছে—তা যখন জানা নেই, তখন বাতাসে লাঠি মেরে কি হবে বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ: জানতে কি আমাদের বাকি আছে দেবতা? জমিদারের লোক ছাড়া এ কাজ আর কে করতে পারে?

শ্রীদাস: ছি, ছি, ছি, কি বলছ বিশ্বনাথ। তিনি বৃদ্ধ, সদাশয়, প্রজাবৎসল। তোমাদের মধ্যেই কত সুখ্যাতি তাঁর শুনেছি—

বিশ্বনাথ: জমিদার বাবুর কথা ত বলিনি দেবতা, তাঁর লোকের কথা বলেছি—ঐ যে নয়া মেনেজার সাহেব এসেছে—শুনতে পাই তিনি নাকি 'কিরেস্তান'—

শ্রীদাস: তাতে কি হয়েছে বিশ্বনাথ—

বিশ্বনাথ: তাতেই ত ভাল হয়েছে দেবতা—তোমার এখানে আমরা সবাই আসি, তোমার মুখের ভজন শুনি, তোমাকে দেবতা বলে পূজি—এ সব উনি পছন্দ করেন না। তাই না সন্দ করি—এ কাজ ওনারই।

জনতাও বিশ্বনাথের কথা সমর্থন করে। বিশ্বনাথ বলে: দল বেঁধে সবাই যাব জমিদারের কাছে—এর বিচার চাইব।

শ্রীদাস: যে বিগ্রহের জন্যে তোমাদের এত ব্যাকুলতা, তাঁর কাছেই কেন বিচার চাও না বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ: তাঁকে পাব কোথায়—তিনি ত নেই।

শ্রীদাস : বেদীতে না থাকতে পারেন, কিন্তু তোমাদের মনেও কি নেই? এই তোমাদের ভালবাসা?

বিশ্বনাথ : কি বলছ দেবতা?

শ্রীদাস : আমার ঠাকুর কি শুধু ঐ ছোট বেদীটুকু জুড়ে থাকেন রে ক্ষ্যাপা—তিনি যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। আমার চোখ নেই- স্থূল দৃষ্টিতে কিছুই দেখি না—দেখতে পাই না; কিন্তু যে দৃষ্টিতে বরাবর দেখে এসেছি--ঠাকুর বেদীতে বসে আছেন বাল-গোপালের রূপ ধরে; দৃষ্টি ত মলিন হয় নি—আমি যে দেখছি তাঁকে, ঐ বসে আছেন।

বিশ্বনাথ : তুমি দেখছ দেবতা?

শ্রীদাস : তোমরাও দেখতে পাবে—যদি ঠাকুরের ওপরে তোমাদের সত্যকার নিষ্ঠ থাকে। এই বেদীতে তিনি না থাকলেও তোমরা যদি তাঁকে ভুলে না যাও, মনে প্রাণে ডাকতে থাক, এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ বজায় রাখ—ঠাকুর আবার এই বেদীতে ফিরে আসবেন।

একথায় জনতা চমৎকৃত হয়—তারা অনেকটা আশ্বস্ত হয়েই চলে যায়। কিন্তু বিশ্বনাথের স্ত্রী সুরভীর ব্যথা তখনো যায় নি—সে মিনতির সুরে সাধুকে বলল : দেবতা, ঠাকুর যখন নেই—তুমি একলাটি আর এখানে থেকে কি করবে? তার চেয়ে আমাদের বাড়ী চলো।

শ্রীদাস তেমনি হেসে বলেন : একলা কেন থাকব সুরভি, বললুম যে—ঠাকুর আছেন আমার অন্তরে; আর বাইরে রয়েছে অন্ধের যষ্টির মতন এই—মমতা।

বলেই হাত বাড়াতে ৮।৯ বছরের একটি মেয়ে ছুটে এসে সাধুর হাত দুখানির মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে বলল : এ মাকে ডাকছ সাধু!

এই বালিকাটিকে অসহায় নিরাশ্রয় দেখে সাধুই আশ্রয় দিয়েছিলেন—দাদুর মত আদরে ইনি বালিকাটিকে দেখেন।

হরিপুরের জমিদার প্রতাপনারায়ণ রায় উজ্জ্বল কান্তি বর্ষীয়ান পুরুষ। বৃদ্ধ হলেও দেহ তাঁর এখনো ভেঙ্গে পড়েনি। একমাত্র পুত্রের অকাল-বিয়োগ-জনিত দারুণ শোকও তিনি দমন করেছেন মনস্বিনী তরুণী পুত্রবধূ মাধবী দেবীকে অবলম্বন করে। বুদ্ধিমতী মাধবীও আদর্শবাদী শ্বশুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর কাছ থেকে যেমন জমিদারী রক্ষা সম্পর্কে কূটনীতি গুলির সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছে, জমীদারীকে আদর্শ একটি জনপ্রিয় রাষ্ট্রে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে স্বামীর যে উন্নত পরিকল্পনা ছিল, সে সম্পর্কে তাঁর সযত্ন-সঞ্চিত গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে—স্বামীর কল্পনাকে বাস্তব করবার সুযোগ প্রতীক্ষা করেছে। এমনি সময়—সহসা প্রতাপনারায়ণ বিস্তীর্ণ জমিদারীর উপর খবরদারির জন্ম এক যুবক ব্যারিষ্টারকে ম্যানেজার বাহাল করে বসলেন। এঁর নাম—নৃপেন চৌধুরী—চৌধুরী সাহেব বলেই পরিচিত।

ম্যানেজারের পদে বসবার জন্যে অনেকগুলি দরখাস্ত এসেছিল। অমরনাথের সঙ্কল্প ছিল—ব্যারিষ্টার বন্ধুকে জমিদারীর ম্যানেজারিতে বাহাল করে জমিদারীকে বিখ্যাত করে তুলবে, তার পরিকল্পনাও বন্ধুর সাহায্যে সার্থক হবে। কিন্তু বিলাতে নৃপেন চৌধুরীর পড়াশুনাতেই অমরনাথের মৃত্যু হলো। ফিরে এসে সে সংবাদে চৌধুরী মুসড়ে পড়ে প্র্যাকটিস সুরু করে দেয়। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে বন্ধুর কল্পনা তার মনে জেগে ওঠে এবং প্রতাপনারায়ণের সঙ্গে দেখা করা সঙ্গত মনে করে। দরখাস্তকারীর মিষ্ট কথা শুনে—সুশ্রী চেহারা দেখে--প্রতাপনারায়ণ অভিভূত হলেন : উপরন্তু যেই শুনলেন, তাঁর স্বর্গতপুত্র অমরনাথের সঙ্গে নৃপেন চৌধুরীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, এমন কি—অমরনাথের পরামর্শেই সে ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেতে গিয়েছিল; তখনই তিনি নৃপেন চৌধুরীকে ম্যানেজারের নিয়োগ-পত্র দিয়ে জমিদার-বাড়ীর বিস্তীর্ণ উদ্যান সংলগ্ন একটা অংশে ছবির মত যে বাড়ীখানি Out-House রূপে সাহেবসুবাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট—সেই বাড়ীখানাই তার বসবাসের জন্ম ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন।

ম্যানেজার নিয়োগের সময় মাধবী হরিপুরে ছিল না—মায়ের একটা ব্রত উপলক্ষে পিত্রালয়ে গিয়েছিল সে। ফিরে এসে শুনল যে, নতুন ম্যানেজার বাহাল করা হয়েছে, তার নাম নৃপেন চৌধুরী। নামটা শুনেই মাধবীর মনটা ছাঁৎ করে উঠে। মনে পড়ে তার কুমারী-জীবনের কথা—ধূমকেতুর মত তার জীবনের আকাশ-পথে যে লোকটির আবির্ভাব হয়েছিল, তারও নাম ছিল—নৃপেন চৌধুরী। মাধবীর সঙ্গে নৃপেনের বিয়ের কথা এক রকম পাকাই হয়ে গিয়েছিল এবং সেই

সুযোগে উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে নৃপেনের সঙ্গে মেলা-মেশারও সুযোগ ঘটেছিল মাধবীর। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনায় সব ওলট-পালট হয়ে যায় এবং, ওলট-পালট করে দেয় মাধবী নিজেই। মাধবী তার মাকে বলে: এমন লোকের হাতে আমাকে তুলে দিতে চলেছ তোমরা—যে মদ খায়, আর প্রকৃতি যার অতি ইতর।

ঘটনাচক্রে নৃপেনের বাবাও এই সময় মাধবীর বাবার কাছে প্রস্তাব করেন—একটা সরকারী জঙ্গল ইজারা নিচ্ছি, হাজার পাঁচেক টাকা আমাকে দিতে হবে, বিয়ের পণ বাবদেই আগাম নিচ্ছি মনে করুন। কথা ছিল, কন্যাপক্ষ এ বিবাহে ইচ্ছামত যা দেবেন—পাত্রের বাবা তাই হাসি মুখে নেবেন। এখন এই প্রস্তাব যেন ভ্রুকুটি করে নির্দিষ্ট একটা দাবী জানালো। ওদিকে মাধবী মাকে বলেছে—বিয়ে আমি করব না।...তখন মাধবীর বাবাও সুযোগ বুঝে জানালেন—পণের কথা তো ওঠেনি আগে; ইচ্ছামত দেওয়া মানে—মেয়েকে কিছু গয়না-পত্র, দান-সামগ্রী, বেনারসী সাড়ী, ঘড়ি, আংটি, পাদুকা, এই বুঝেছিলাম। আমরা গেরস্ত মানুষ, অত দাবী-দাওয়ার মধ্যে নেই।...মাধবীও জমিদার-কন্যা, তার উপর শিক্ষিতা, এঁদের কৌলিক প্রতিষ্ঠাও প্রচুর। পাত্রের পিতা সরকারী চাকরিই বরাবর করে এসেছেন, বন বিভাগের চাকরি, উপরি-আয় যথেষ্ট। বড় ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে মোটা দাঁও মারবার আশা মনে মনে পোষণ করেই ওভাবে কথা দিয়েছিলেন—ভেবেছিলেন এই চালেই জিতে যাবেন। এখন ভাবলেন, ভাগ্যিস্ ফেঁচে গেল; নইলে শেষে পস্তাতে হতো। কন্যাপক্ষ ভাবলেন—ভগবান বাঁচিয়েছেন। মাধবী ভাবলো—ছেলেবেলা থেকে শিবপূজা করে আসছি—আমাকে ঠকায় কার সাধ্যি।......বিয়ের পর মাধবী স্বামীকে এ গল্প বলেছিল। অমরনাথ শুনে বলেছিল—নৃপেনকে আমি জানি; এক সঙ্গে আমরা বি-এ পাশ করি। ক্লাসেই ও মদ খেয়ে আসত। কিন্তু ছেলেটা ভারি ব্রিলিয়েণ্ট। বি-এ পাশ করেই ও বিলেতে গেছে ব্যারিষ্টারী পড়তে। আমার ইচ্ছা আছে—ধরে এনে জমিদারী দেখার ঘানিতে জুড়ে দেব।...মাধবী অবাক হয়ে বলেছিল—বলছ কি, ঐ দুষ্ট লোককে তুমি ডেকে এনে জমিদারীতে ঢোকাবে? অমরনাথ মৃদু হেসে উত্তর করেছিল—সাপকে আমি খেলাতে বড় ভালবাসি।...মাধবীর মনে অতীতের এই সব কথা ছবির মত চোখের উপর যেন ভেসে ভেসে উঠছিল—নৃপেন চৌধুরীর নাম শুনেই।

এদিকে চৌধুরী ম্যানেজারের পদ পেয়েই প্রথমে হারপুর গ্রামখানার হালচাল দেখে শুনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল। সে দেখল—গ্রামের অস্পৃশ্য শ্রেণী সাধু শ্রীদাসের নামে পাগল—সাধুর প্রভাব ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত সমাজেও বিস্তীর্ণ হচ্ছে। এই জমিদারী পরিচালনা সম্পর্কে সে প্ল্যানটি সে মনে মনে ছকে ফেলেছে, ভেবে ও মিলিয়ে দেখতে লাগল—সাধুর ব্যাপারটা সেখানে অনুকূল কিংবা প্রতিকূল।

যে প্ল্যান নিয়ে চৌধুরী জমিদারী শাসন করতে এসেছে—সেও তার আর এক অদ্ভুত পলিসী। এই জমিদারীর পরেই যে সরকারী জঙ্গল "নীচের জঙ্গল"—তার ইজারাদার হচ্ছে এই চৌধুরী! তার মনে পড়ে, এই জঙ্গলের জন্যেই তার বাবা বিয়ের পণ দাবী করে, তার ফলে সে মাধবীর মত রূপসী মেয়েকে হারায়। সেই দুঃখেই সে বিলেতে চলে যায় ব্যারিষ্টারী পড়তে। সেই মাধবী আজ কোথায়—কার হাতে পড়েছে, কে জানে! যাই হোক, তার ক্ষমা করা জঙ্গলকে দখল করে সে যে কাণ্ড করেছে—যে দল গড়েছে, মাধবী দুনিয়ার যেখানেই থাক, তাকে ধরে আনবেই সে। একবার বাস্তব জীবনে সে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়। বিলাতে গিয়ে একটা ক্রিমিনাল দলের কাহিনী সে শোনে—অমনি তার উর্বর মস্তিষ্কে তার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। চৌধুরী ভেবে দেখে, তেমনি পোড়ো জঙ্গল তো আমার রয়েছে, বাবা মরবার সময় অনেক টাকাও রেখে গেছেন; কৈফিয়ৎ দেবার মত কোন অভিভাবকের অস্তিত্ব নেই: নিজেই সে নিজের মালিক। তাই মাথা খেলিয়ে দেশে ফিরেই সে জঙ্গল নিয়ে পড়ে, খুঁজে খুঁজে দাগী, ফেরারী, জামীন ভাঙা ক্রিমিনালদের সংগ্রহ করে এই জঙ্গলের লাল-কুঠিতে এনে রাখে—যেন তারা জঙ্গল তদারক করে, কাঠ কাটে, চাষবাস চালায়, এই সব তাদের কাজ। কিছু কিছু কাজও সে অবিশ্যি ব্যবস্থা করে দিয়েছে। মেয়েরা মধু সংগ্রহ

করে, ময়ূরগুলোকে পালন করে, একটা পোলট্রি ব্যবসায়ও খুলেছে। হাঁস, মুরগী, পেরু, ছাগল, ভেড়া, গরু, মোষ—এদের দেখা শোনা করে দলের লোক। তারাও সব যেন বর্তে গেছে। এ অঞ্চলে বাইরের মানুষ ঢোকেনা, কেউ-ঢুকলেও কুত্তা লেলিয়ে দিয়ে, আড়াল থেকে বাঘের ডাক ডেকে, এমন করে ভড়কিয়ে দেয় যে, কেউ আর এমুখো না হয় ভয়ে।

নৃপেন চৌধুরী শুনেছে, বিধবা বধূকে বৃদ্ধ জমিদার জমিদারী-কার্য্যে শিখিয়ে পড়িয়ে পটীয়সী করে তুলেছেন—এখন তিনি পিত্রালয়ে। শুনে চৌধুরী হাসে, মেয়েমানুষ আবার জমিদারীর কাজ বোঝে। মাথা খেলিয়ে চৌধুরী আরও একটি কাজ করেছে। ময়না নামে একটি মেয়েকে তালিম দিয়ে জমিদার-বাড়ীতে পরিচারিকারূপে ভিড়িয়ে দিয়েছে; কিন্তু ময়না যে তারই আমদানী—এ কথা কাউকে জানতে দেয়নি—ময়নাকেও সাবধান করে দিয়েছে। ময়নাও খুব চালাক মেয়ে, ইশারায় সব বোঝে, নাচে গানেও ওস্তাদ। বৃদ্ধ প্রতাপনারায়ণ মেয়েটির কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে মাধবীর জন্যে তাকে চাকরিতে বাহাল করেন; তবে বলে দেন তোমার আসল মনিব হচ্ছেন আমার বৌমা। তাঁর মন যুগিয়ে চলবে। তিনি যদি পছন্দ করেন, তবে তোমার থাকা হবে—তোমার থাকা না থাকা নির্ভর করছে বৌমার উপরে—মাস খানেকের মধ্যেই তিনি আসবেন।

পিত্রালয় থেকে এসেই এবার মাধবী যেন দেখতে পেল, কি একটা পরিবর্তন ঘটেছে এ বাড়ীতে এবং সারা গ্রাম খানার মধ্যেও।

সব দিকেই মাধবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—গ্রামের খবরও সে রাখে। পরিবর্তন শুনে সে ভাবতে বসে। ভাবনার বিষয়বস্তু হলো—নতুন ম্যানেজারের আসা, তার সাহেবী মেজাজে সেরেস্তায় অসন্তোষ, গ্রামে চাঞ্চল্য। গ্রামের একপ্রান্তে অন্ধ সাধুর আশ্রম থেকে ঠাকুর চুরির ব্যাপারেও লোকে ম্যানেজারের নাম করে দেয়। মাধবী ভেবে পায় না কেন এমন হলো।

মাধবী ফিরে আসতে প্রতাপনারায়ণ সহর্ষে বললেন: আঃ—বাঁচলুম মা, আমি যেন হাঁফিয়ে উঠেছিলাম তোমার অভাবে।

মাধবী বলল: কেন বাবা, আমার অভাবে কি এমন অসুবিধা হয়েছিল—সবই ত দিব্যি চলেছে।

প্রতাপনারায়ণ: শোন কথা, একে কি দিব্যি চলা বলে মা? যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি যেন একটা গোলমেলে আবহাওয়া এসে পড়েছে, ভিতরটা ঠিক ঠাওর হচ্ছে না।

মাধবী: আপনি আমাকে বড্ডো বেশী বাড়ান বাবা।

প্রতাপ: বাড়াবোনা! আমার কি ধারণা জান মা—রায়বাঘিনী, ভবসুন্দরী, রাণী ভবানী, জাহ্নবী চৌধুরাণীর মত এ-যুগের নারী-দেবীদের গুণগুলি আঁচলে বেঁধে আমার কুল উজ্জ্বল করতে এসেছ তুমি।

মাধবী: আপনি কি যে বলেন বাবা। ওঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া—সবার নমস্যা। আমি ওঁদের পদরেণুরও যোগ্য নই—আমার শিক্ষা-দীক্ষা যা কিছু আপনারই দেওয়া।

প্রতাপ: তা হতে পারে মা। কিন্তু দেওয়া শিক্ষা এমন করে ফুটিয়ে তোলাও ত সাধারণ ক্ষমতা নয় মা! সদর-নায়েব তাই বলছিলেন—আলাদা ম্যানেজার রাখবার কোন দরকারই ছিল না।

মাধবী: তাহলে কেন রাখলেন বাবা?

প্রতাপ: জানি মা, অত টাকা মাইনে দিয়ে ম্যানেজার বাহাল করা তোমারো ইচ্ছা ছিল না। তবে কি জান মা, যতই করনা কেন, তুমি হচ্ছ পরদানসিন; আর আমিও ইদানীং বিষয়-কর্ম থেকে সরে দাঁড়িয়েছি—সে ত দেখতেই পাচ্ছ। অথচ, এমন একজন চৌখস লোকের দরকার—ষ্টেটের বাইরের ব্যাপারগুলো—এই যেমন, সাহেব সুবোদের সঙ্গে দহরম-মহরম রাখা—আইন-আদালত দেখা,—তারপর···ডিসিপ্লিনের সঙ্গে ম্যানেজমেণ্টের অভিজ্ঞতা যার আছে—

মাধবী: ও-গুলোর চেয়ে বড় কথা বাবা—প্রজাদের সুখ-সুবিধা আর অভাব-অভিযোগের দিকে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু আমি এখানে এসেই ওঁর যে-রকম হাকিমী মেজাজের কথা শুনিছি—

প্রতাপ: এসেই সব শুনেছ মা! অবিশ্যি আমার উচিত ছিল—তুমি ফিরে এলেই ওঁকে বাহাল করা। কিন্তু চৌধুরী যেই বলল—অমরনাথ ছিল তার ক্লাস-ফ্রেণ্ড; একটা জমিদারীকে ঠিক একটা রাষ্ট্রের মত গোড়ে তোলা—ওদের দুই বন্ধুরই ছিল পরিকল্পনা; অমরনাথের

আগ্রহেই ও ছোকরা বিলেতে যায় ব্যারিষ্টারী পড়তে, সেই সঙ্গে ষ্টেট চালানো সম্পর্কে শিক্ষা নিতে···

মাধবী: বুঝিছি বাবা, তাঁর বন্ধু ছিলেন শুনেই আপনি আর কিছু জানতে চান নি—তাড়াতাড়ি ওঁকে বাহাল করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বাবা—তাঁর কি বিরাট পরিকল্পনা ছিল, সে ত আপনি শুনেছেন।

প্রতাপ: শুধু শোনা নয় মা—আমার অমরনাথের ইচ্ছাকে তুমি সার্থক করতে শোকতাপ ভুলে কোমর বেঁধেছ জেনেই ত তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণা অত উঁচু হয়ে উঠেছে।

মাধবী: আর, সেই পরিকল্পনাকে ইনি এসেই কি ভাবে রূপ দিতে চেয়েছেন—তাও বোধ হয় আপনি শুনেছেন?

প্রতাপ: তাতে কি হয়েছে মা। চৌধুরী ত তোমার হুকুমের চাকর। এখন থেকে তোমার ইচ্ছাকেই সে রূপ দেবে। আমিও তাকে বাহাল করবার সময় বলেছি—মালিক আমি নই—আমার বউরাণী। হ্যাঁ—আর একটা কথা, ময়নাকে তোমার কেমন মনে হচ্ছে মা? চালাক-চতুর লেখাপড়া জানা একটি মেয়ে তুমি চেয়েছিলে—

মাধবী: মেয়েটির আর সব ভাল, তবে একটু ফাজিল; তা আমি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক করে নেব। ঐ যে···ময়না?

১৬ ১৭ বছরের তরুণী এই ময়না—সুশ্রী ছিপছিপে চেহারা, মুখে চোখে প্রতিভার আভাস পাওয়া যায়। সে এতক্ষণ অতি সন্তর্পণে এঁদের সংলাপ শুনছিল। সংলাপের শেষ ভাগে সহসা মাধবীর চোখে পড়ে যায়—অমনি মাধবীর মুখভঙ্গি অন্যরূপ হয়ে ওঠে; সে ময়নাকে ডাকে। ময়নাও বুঝতে পেরেছিল, সে ধরা পড়ে গেছে। সেও আপনাকে সামলে সহজ ও সপ্রতিভ ভাবেই এগিয়ে এল হাসিমুখে।

ময়না: আমাকে ডাকছেন বউরাণী?

মাধবী: হ্যাঁ। কিন্তু ডাকবার আগে আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলে?

ময়না: না-ত। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিয়াকে ছাতু খাওয়াচ্ছিলুম।

মাধবী: ছাতু খাওয়াও তাতে কথা নেই, কিন্তু আড়াল থেকে কারুর কথা শুনতে নেই—এটা মনে রেখো।

বধূর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শ্বশুরকে চমৎকৃত করে।

সবার অলক্ষ্যে চুপি চুপি ময়না নেপেন চৌধুরীর বাংলোয় যায়—এদিনের কথাগুলো সব ব'লে মুখ চোখ ঘুরিয়ে টিপ্পনী কাটে: মেয়েমানুষে জমীদারী চালাচ্ছে শুনে তখন হেসেছিলেন, এখন বুঝছেন ত বৌরাণী কি চিজ?

চৌধুরী: কিন্তু হুশিয়ার, বৌরাণী কোন রকমে যেন জানতে না পারে—তুমি কি চিজ! অর্থাৎ তুমি হোচ্ছ আমার হাতের পাঁচ।

ময়না: চাণ্ডগুণেও তা টের পাবে না। ওদিক দিয়ে আপনার ভয় নেই—এখন আপনাকে সামলান ত।

চৌধুরী: বৌরাণীর চেহারাখানা ত তাহলে দেখতে হচ্ছে। কিন্তু কি করে দেখা যায় বল ত?

ময়না: তার জন্য ভাবনা নেই, তাঁর দরবারে আপনার ডাক পড়ল বলে।

এরপর একদিন সত্য সত্যই বউরাণীর মহলে চৌধুরীর ডাক পড়ল। প্রতাপনারায়ণ তখন খুব অসুস্থ। মাধবী তাঁর পরিচর্যা করতে করতে জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে স্বাধীনভাবে হুকুম চালাবার অনুমতি লাভ করে।

প্রতাপনারায়ণ বলেন: মা! আমাকে আর ও-সব ঝক্কির মধ্যে ফেলনা—আজ থেকে আমি তোমার ওপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হলাম। বাহাল বরতরফ শাস্তি বকশিশ যেখানে যা দরকার বুঝবে, তুমি নিজেই করবে। এমন কি নিজের চোখে যদি দেখাশোনার কিছু দরকার হয়, কিম্বা, প্রজা বা কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাও—তাতেও আমার মানা নেই। পাল্কী বেহারা বরকন্দাজ সব তৈরী থাকবে তোমার হুকুম মানতে।

অন্দরমহলে একখানি সুসজ্জিত ঘরে চৌধুরী সাহেবকে বসানো হয়েছে। সাগ্রহে তিনি বউরাণীর প্রতীক্ষা করছেন। একটা রুদ্ধ দরজার সামনে চৌধুরী একখানা চেয়ারে বসেছেন। হঠাৎ দরজার একাংশ খুলে গেল—ফাঁকটুকুর সামনে চিক পড়েছে; চিকের ওদিকে একখানা চৌকিতে বৌরাণী বসেছেন। চৌধুরী এটা অনুভব করল, কিন্তু কোন মূর্তি তার নজরে পড়ল না।

একটু পরেই তীব্র বংশী ধ্বনির মত মিঠে-কড়া একটা সুর চৌধুরীর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করল। বৌরাণী কয়েকটি কাজের কৈফিয়ৎ চাইলেন, চৌধুরী বুঝল যে, চিকের ওপারে বসে যিনি প্রভুত্বব্যঞ্জক

স্বরে প্রশ্ন করছেন, তিনি বৌরাণী ছাড়া আর কেউ নন। চৌধুরী সাহেব প্রস্তুত ছিলেন না—কল্পনাও করেন নি, অশিক্ষিতা একটি মেয়ে—পল্লীঅঞ্চলের জমিদারের বিধবা বধূর মুখ থেকে এমন প্রশ্ন উঠবে। মামুলি কথায় খণ্ডন করতে গেলেন কিন্তু বৌরাণী এক কথায় মুখ তাঁর বন্ধ করে দিলেন। বললেন: শুনেছি আমার স্বামীর পরিকল্পনার সঙ্গে আপনি পরিচিত। কিন্তু প্রজার বিরুদ্ধে আপনি যে যুক্তি শোনালেন, তাকে কি বলতে চান?

এর পর প্রশ্ন করলেন: অন্ধ সাধু শ্রীদাসের আশ্রম থেকে গোপনে বিগ্রহ চুরি হয়ে গেছে—আপনি তার কি করেছেন?

চৌধুরী: এতে আমাদের করবার কি আছে—ওটা যখন সাধুর নিজস্ব ব্যাপার?

বৌরাণী: কিন্তু আমার শ্বশুর ঐ দেবস্থান সাধুকে দান করেছিলেন। বিগ্রহ চুরি যাওয়ায় আমাদের প্রজারাও বিক্ষুব্ধ হয়েছে। আমি তখন পিত্রালয়ে। বাবা অসুস্থ ছিলেন। খবরটা তাঁর কানেও ওঠেনি। আপনিও গ্রাহ্যই করেন নি। অথচ আপনার মাথায় রয়েছে বড় বড় পরিকল্পনা। জমিদারীকে রামরাজ্য করবার চমৎকার দৃষ্টান্ত বটে।

চৌধুরী অবাক হয়ে ভাবতে থাকে—এমনি চোখা চোখা কথা এর আগে কোথায় যেন শুনেছে। মাধবীর মনেও সন্দেহ জাগে—নেপেন চৌধুরী সম্বন্ধে কথাও মনে পড়ে।

মাধবী তখন কুমারী। এই চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ের কথা তার পাকা হয়ে যায়। ঘনিষ্ঠতা হয় তৎকালে। মাধবী জানতে পারে, নেপেন সেই বয়সেই মদ খায়—চারিত্রিক নিষ্ঠাও নেই। মাধবীর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বলে—সম্বন্ধ ভেঙে দাও বাবা, এ বিয়ে হবে না।

মনস্বিনী মেয়েকে পিতা নির্ভর করতেন। বুঝলেন, মেয়ের কথা নিরর্থক নয়। এই সময় চৌধুরীর পিতার পক্ষ থেকেও একটা আর্থিক দাবী ওঠে, যেটা অযৌক্তিক। ফলে বিবাহ সম্বন্ধে ভেঙে যায়।

চৌধুরীর মন ভেঙে পড়ে। ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত যায়।

মাধবীর সঙ্গে তারপর প্রতাপনারায়ণের পুত্র অমরনাথের বিবাহ হয়। চৌধুরী তখন বিলেতে।

জমিদারীকে আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত করবার পরিকল্পনা নিয়ে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে নেপেন চৌধুরীর কথা ওঠে। অমরনাথ বলে: আমিই তাকে বিলেতে পাঠিয়েছি—কিছু টাকাও দিয়েছি। কথা আছে ব্যারিষ্টারী পাস করে সে আমার সঙ্গে যোগ দেবে ষ্টেটের কাজে।

মাধবী বলে: তোমার চৌধুরীকে আমি জানি—এই বয়েসে নেশা করে। ঐ দুষ্ট লোককে নিয়ে তুমি জমিদারী চালাবে?

অমরনাথ বলে: ওটা নাকি ওদের কৌলিক রোগ। কিন্তু ছোকরা খুব ইন্‌টেলিজেন্ট এবং ব্রিলিয়েণ্ট। আমি ওকে শুধরে নেব দেখো। তা'ছাড়া, সাপ নিয়ে খেলতে আমার বড় ভাল লাগে।

সেই চৌধুরী ঘটনাচক্রে তারই কর্মচারীরূপে চিকের আড়ালে বসে কথা কইছে! তার কুমারী-জীবনে এই লোকটাই মত্তপ অবস্থায় তাকে অপমান করতে হাত বাড়িয়েছিল!

কথার উপসংহারে মাধবী চৌধুরীকে বললে: এখন আমার কথা শুনুন—সাধুর ঠাকুর উদ্ধারের পরে আমাদের ব্যয়েই তাঁর আশ্রমে প্রতিষ্ঠা হবে। আর এ কাজ যারা করেছে, সাধুর সামনে তারা কঠিন শাস্তি পাবে, এই ব্যবস্থা আমি করলাম। এই বুঝে আপনিও কাজ করুন। আপনি অক্ষম হলে কলকাতা থেকে নাম-করা গোয়েন্দা আনতেও আমরা কার্পণ্য করব না।

মাধবীর কথাগুলো চিকের আড়াল থেকে শুনে নেপেন চৌধুরী বুঝতে পারে এ মেয়ে কি চিজ! ঝাঁ করে তার মনে পড়ে যায়, বছর দশেক আগে এক কিশোরীর কথা। বিয়ের কথা পাকা হওয়ায় তারা মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিল এবং সেই সুযোগের আশ্রয় নিয়ে একদা মত্ত অবস্থায় সেই কিশোরীর কোমল হাতখানি হাতের মধ্যে আনতে গিয়েই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তাকে স্তব্ধ হতে হয়েছিল তার তেজোদৃপ্ত কথায়—'সরে যান্‌···আমি জানতাম না যে আপনি মদ খান। আর কোনদিন আমার সামনে আসবেন না।' সে কথার ঝাঁঝ এখনো নেপেন চৌধুরীর মন থেকে মুছে যায় নি··· সেই ঝাঁঝ পুনরায় আজ তার স্নায়ুর মধ্যে জ্বালা ধরাল—তার মালিক-স্থানীয়া এই বিধবা মেয়েটির জ্বালাময়ী কথায়। এখন কথা এই—ইনি কে?

সেরেস্তার সকলে মাধবীকে 'বউরাণী' বলেই জানে—নাম জানবার স্পর্ধা কেউ করেনি। এখন এই বধূটির নাম জানবার জন্যে—তাছাড়া

কোন প্রকারে তাকে একবার দেখবার আশায় চৌধুরী ক্ষেপে উঠল এবং এর জন্যে ময়নাকে চাপ দিতে লাগল।

ময়না বলল : অতক্ষণ ধরে দুজনে কথা কাটাকাটি হলে—চিকের এ-পিঠে আপনি ও-পিঠে তিনি—তা মুখখানি দেখতে পাননি? ·····চৌধুরী বলল······এমন ভাবে চিক ফেলা ছিল, ভিতরের মানুষকে দেখবার যো নেই। তিনি আমাকে দেখেছেন, কিন্তু আমি দেখতে পাইনি তাঁকে—কথাই শুনেছি; বিয়ের সময় চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে—প্রীতি-উপহারও ছাপা হয়েছিল নিশ্চয়—তাছাড়া ফটোও থাকতে পারে—সন্ধান কর, নাম আর ফটো আমার চাইই।

ময়না বলে···'থাকলেও বার করা মুশকিল। বউরাণীর ঘরখানি যেন ট্রেজারীর ষ্ট্রং রুম। বিনা এত্তেলায় সেঁধোয় কার সাধ্যি।'

চৌধুরী বলে : 'তবে তোমাকে সাধ করিয়েছি কি জন্যে···ওর নাম আর ফটো বার করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয় তোমার পক্ষে। ভাল কথা—ওঁর বাপের বাড়ীর খবর পেলেও······,

ময়না শিউরে উঠে বলে···বাবা, সেই মেয়ে কিনা! উপোপড়া হয়ে কিছু জানতে গেলেই এমনি করে চায় যে, বুকখানা শুকিয়ে যায়। আচ্ছা, খবর আমি দিচ্ছি—ভাববেন না।

শেষে ময়না বৌরাণীর ঘর থেকে তাঁর বিবাহ-কালের একখানা ফটো চুরি করে চৌধুরীকে দিল—বর-কনের ছবি···অমরনাথ ও মাধবী হাসিমুখে পাশাপাশি বসে আছে।···ছবি দেখে চৌধুরীর চোখের দৃষ্টি আর মুখের ভঙ্গি এমন অদ্ভুত রকম হয়ে উঠল যে, ময়না পর্যন্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

অপহৃত বিগ্রহের উদ্ধার সম্পর্কে চৌধুরীকে যে সব কথা মাধবী বলে, সেটা জানাজানি হয়ে যায়—সেরেস্তায় আলোচনা হতে থাকে; মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। সুরভী পাড়ায় শুনে এসে স্বামীকে বলে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় শ্রীদাস যখন শূন্য বেদীর সামনে বসে গান গাইছিলেন—সুরভী তাঁকেও বলে। শ্রীদাস বলেন : ঠাকুর যদি তোমাদের মনে থাকেন, সামনে আসতে কতক্ষণ।

পরদিন সকালে শ্রীদাস তেমনি করে তাঁর ভজন গানে ঠাকুরের পূজারতি করছেন—অনেক লোকও জমেছে, এমন সময় একটা চাঞ্চল্য উঠল; ছুটে এসে একজন খবর দিল—পাল্কি করে বৌরাণী আসছেন। শ্রীদাস কিন্তু নির্বিকার, একইভাবে চলেছে তাঁর গান।

জমিদার-বাড়ীর মখমলের আবরণ মণ্ডিত রূপার ডাণ্ডাওয়ালা বৃহৎ পাল্কি আটজন উড়িপরা বেহারা বহন করে পাড়া কাঁপিয়ে আশ্রমের দিকে আসছিল তখন—পিছনে আশাসোটা নিয়ে কতিপয় বরকন্দাজ। বাহকরা পাল্কি নিয়ে আশ্রমের হাতার মধ্যে ঢুকছিল—কিন্তু পাল্কি থেকে মাধবী বলল : এইখানে পাল্কি রাখ।

বরকন্দাজদের সর্দার এগিয়ে এসে জানাল : সামনে লোকজন ভিড় করে আছে—হুকুম হলে পাল্কি চালার সামনে নিয়ে যাই, পাল্কিতে বসে বৌ-রাণীমা—

মাধবী বাধা দিয়ে বলল : না। এটুকু আমি পায়ে হেঁটেই যাব।

তারপর সবাইকে অবাক করে মাধবী পাল্কি থেকে নেমে এগিয়ে যায়। বরকন্দাজরা ভীড় সরাতে উগ্রমূর্তি ধরতে মাধবী হাত তুলে বাধা দেয়। তারপর চালার দিকে এগিয়ে যায়।

সুরভী ছুটে এসে গড় করে। মাধবী তাকে সস্নেহে তুলে তার হাত ধরে শ্রীদাসের কাছে এগিয়ে যায়। শ্রীদাস তখনও গান গাইছেন। গান শেষ হলেই মাধবী তাঁকে প্রণাম করল। সুরভী বলল : বউরাণী এসেছেন দেবতা।

এবার শ্রীদাসের সঙ্গে মাধবীর যে ভাবময় সংলাপ হয়, তাতে মাধবীর মর্মের আর একটা অংশ আলোকিত হয়ে উঠল—সেই আলোকে শ্রীদাসকেও ভাল করে দেখতে পেল সে। মাধবীর মনে হলো—ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্যের যুগ্ম অবদানের লীলা চলেছে এই অন্ধ সাধু শ্রীদাসের মধ্যে।

জমিদারী ব্যাপারে চৌধুরী পদে পদে মাধবীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে—মাধবী শুম হয়ে থাকে। শেষে একদিন সে চৌধুরী সাহেবের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করল।

সেদিন সকালেই সেরেস্তায় একটা চাঞ্চল্য তুলেছে চৌধুরী সাহেব। 'নীলের জাঙ্গাল' নামে জঙ্গল-মহলের লাগোয়া অঞ্চলের কতকগুলো প্রজা এমন কোন ব্যাপারে জমিদার সরকারে দরখাস্ত করে, যেটা চৌধুরীর স্বার্থবিরুদ্ধ। কারণ, নেপেন

চৌধুরী নিজেই ঐ জঙ্গল-মহলের ইজারাদার—অবশ্য একথা এ অঞ্চলে কেউই জ্ঞাত নয়।

প্রতাপনারায়ণের তালুকের প্রজারা জঙ্গল-মহালের ইজারাদারের বিরুদ্ধে চৌধুরীর সেরেস্তাতেই নালিশ করে। চৌধুরী সাহেব তাদের তলপ করে—কাছারী বাড়ীর সামনে একটা রেলিং ঘেরা জায়গায় আটক করেছেন। প্রজারা উগ্রভাবে কথা বলায় তিনি পাইকদের হুকুম দিলেন: কান ধরে ওঠবস্ করাবার—

এমন সময় ফটক দিয়ে বৌরাণীর পাল্কি এসে ঢুকল। গোলমাল শুনে তিনি পাল্কি থামাতে বললেন। বৌরাণীর পাল্কি শুনে একজন প্রজা সরোদনে তাঁর দোহাই দিল। বৌরাণী পাল্কি থেকেই হুকুম দিলেন: পাইকদের সরিয়ে নেওয়া হোক প্রজাদের স্নানাহারের ব্যবস্থা হোক—তিনি নিজে সব শুনবেন ওবেলা।

আবার সেই চিক ফেলা দরজার দুপাশে দুজন বসেছেন—দুজনের মনেই দারুণ জ্বালা। চৌধুরীর কথা—সবার সামনে এভাবে তাঁকে অপমান করে বৌরাণী নিজের পায়েই কুড়ুলের ঘা দিয়েছেন, এর পর আর কেউ জমিদারের শাসন মানবে না।

বৌরাণীর কথা—শাসনের যুগ চলে গেছে—এ জ্ঞানও কি চৌধুরী সাহেবের মত আইনওয়ালা লোকের নেই? অকারণ কতকগুলো লোককে তলপ করে এনে, তার পর তাদের উপর পেয়ে পাইক দিয়ে লাঞ্ছনা করানো কি খুব পৌরুষের কাজ? যদি ঠাকুর-চোরদের ধরে এনে এ বীরত্ব তাদের উপর দেখাতে পারতেন—আপনার দক্ষতা বুঝতাম। ...এরপর চৌধুরী হঠাৎ মাধবীকে জিজ্ঞাসা করল, শুনলাম নাকি শ্রীদাসের আশ্রমে গিয়েছিলেন?

তীক্ষ্ণ স্বরে উত্তর করল: এ আপনার অনধিকার চর্চা—কি মতলবে এ প্রশ্ন তুলতে আপনি সাহস করলেন?

চৌধুরী বলল: ওখানে আপনার যাতায়াতে এ বংশের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মাধবীও তৎক্ষণাৎ জানান: এ বংশের মর্য্যাদাকে সত্য সত্যই ক্ষুণ্ণ করছেন আপনি—প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করে; আর আমার ব্যবহারে—বংশের মর্য্যাদা মহত্বই পেয়েছে।

কথাটা প্রতাপনারায়ণের কানে গেল। তিনি মাধবীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল: 'আপনিই বিচার করবেন বাবা, তখন সব শুনবেন।' কিন্তু প্রতাপনারায়ণ বললেন: সব ভার যখন তোমার উপর বিশ্বাস করে দিয়েছি মা, আর কিছুতেই মাথা দেব না—যা করবার তুমিই করবে।

বিকেলে সেই চিকের ঘরে আবার বিচার আরম্ভ হলো। চিকের ভিতরে মাধবী; বাইরে, চৌধুরী ও প্রজারা। সব শুনে মাধবী তাদের সসম্মানে মুক্তি দিয়ে চৌধুরীকে বলল: আপনি অন্যায় করেছেন। এভাবে প্রজাপীড়নের জন্য আপনাকে এত টাকা মাইনে দিয়ে বাহাল করা হয়নি—আজকের ব্যাপার থেকে আপনি ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক হবেন আশা করি।

চৌধুরী গুম হয়ে সব শোনে। সে ঠিক করতে পারেনা—মাধবী তাকে চিনেছে কিনা।

চৌধুরীর এখন প্রধান চেষ্টা—নির্জনে মুখোমুখি বুঝাপড়া কি করে করবে মাধবীর সঙ্গে। আপন মনে সে ভাবে—যে মেয়েটার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে বিলেত থেকে ফিরেই বিলেতের 'ক্রিমিনাল'দের আদর্শে দল গড়েছে। কিন্তু এখন দেখছে—সেই মেয়েটাই তার এক-সময়ের সহপাঠী অমরনাথের স্ত্রী। আজ অমরনাথ নেই—কিন্তু মাধবীকে সেই যে সুখে এনেছে—সে কি তা জেনেছিল। অমরনাথের কাছে সে ঋণী। কিন্তু অমরনাথ তাকে বঞ্চিত করে মাধবীকে নিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল কি? আজ সে নেই, কিন্তু মাধবী আছে। এখন মাধবীকে যদি সে মুঠোর মধ্যে আনতে পারে, তাহলেই শোকশোধ হয়। কিন্তু সেটা কি এতই অসম্ভব? মনে করলে সে কিনা করতে পারে। কিন্তু তার আগে একবার একান্তে মাধবীর মনের সঙ্গে তাকে বোঝাপড়া করতে হবে—তার পরে অন্য কথা—দেহের সঙ্গে বোঝাপড়া।

মাধবী সম্বন্ধে নিজের মনের কথা চৌধুরী ময়নার কাছেও চেপে রাখে—মাধবীকে হাত করে সে জমিদারীটা হাতের মধ্যে আনতে চায়, একথাই ময়নাকে জানায়। আসল কথা ময়নার কাছে চেপে রাখবার কারণ, ময়নাকে সে আশ্বাস দিয়ে রেখেছে—সে তাকেই ভালবাসে, বিয়ে তাকে করবেই।

মাধবী এখন প্রায়ই শ্রীদাসের আশ্রমে যায়—

তাঁর গান শোনে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে। এখন আর বরকন্দাজদের সঙ্গে নেয় না—সাধারণভাবে আসা-যাওয়া করে। এই সূত্রে সুরভীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হয়েছে। সে সুরভীকে তার সঙ্গিনী করে নিয়েছে। এই নেওয়ার মধ্যেও মাধবী একটা কৌশল খেলেছে। মাধবী তার মহলের দেবালয়ে বালগোপালের একখানি ছবিকে বিগ্রহরূপে স্থাপিত করে পূজা করত। এখন তার জন্তে সুরভীকে নিযুক্ত করল। সে ফুল যোগায়, মালা গাঁথে, চন্দন তৈরী করে। অন্ত দিকে সুরভীর কাছ থেকে সে প্রজাদের সুখ দুঃখের খবর নেয়। দুজনে পরামর্শ করে।

ময়না সুরভীকে সন্দেহের চোখে দেখে। সুরভীও ময়নাকে সন্দেহ করে। দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। সুরভী সেদিন গোপালের প্রসাদ নিয়ে চৌধুরী সাহেবের বাংলোয় গেল। দেখল, সাহেব নিবিষ্ট মনে একখানা ছবি দেখছে। পিছন থেকে উঁকি দিয়ে সুরভী দেখল, সে ছবি আর কারুর নয়—বৌরাণীর। সে চমকে উঠতেই তার হাত থেকে একটা পাত্র পড়ে যায়—চৌধুরী সচকিতে উঠে দাঁড়ায়। সুরভী বলল: বৌরাণী ঠাকুরের প্রসাদ পাঠিয়েছেন। চৌধুরী ক্ষিপ্রভাবে ছবিখানা উল্টে রেখে—হাসিমুখে সুরভীকে অভ্যর্থনা করে—আলাপ জমাতে গেল। সুরভীও হেসে হেসে কথা বলতে লাগল। চৌধুরী আশান্বিত হয়ে সুরভীকে বলল: তোমার মারফতেই বৌরাণীর কাছে খেজুরা পাঠাচ্ছি—আমি দুচার দিনের জন্তে বাইরে যাচ্ছি—বলবে···চোরাই বিগ্রহের সন্ধান একটা পাওয়া গেছে। ফিরে এসে সব জানাবো।

সুরভী এসে সব কথা মাধবীকে বলে—ছবির কথাও। আড়াল থেকে ময়না তা শোনে। সেও শুনে অবাক হয়। সে ত বিয়ের সময়কার বর-কনের ছবি দিয়েছিল—কিন্তু সুরভী বলছে, বউরাণীর একলার ছবি! এ কেমন হলো? তারও মনে সন্দেহ জাগে। চৌধুরী বউরাণীর একানে ছবি কোথায় পেলে—আর সে ছবি নিয়েই বা তার অমন পেয়ার কেন?

মাধবীও ভাবে, তার ছবি চৌধুরীর ঘরে কি করে গেল! তারপর তার মত এক নিষ্ঠাবতী বিধবার ছবি নিয়ে চৌধুরীর ভাব বিলাসের কথা শুনে—মাধবীর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। সুরভীই তাকে শান্ত করে। মাধবীর ইচ্ছা করছিল—এক গাছা চাবুক নিয়ে চৌধুরীর বাসায় গিয়ে নিজেই উপযুক্ত শাস্তি দেয়। সুরভী তাকে সাধুর গানের একটা পদ শোনায়:

মন যদি তোর থাকে খাঁটি,
না থাকে তায় ময়লা মাটি,
লোকের কথায় কুৎসা নিন্দায়
কিসের তোর ভয়?

সুরভীকে নিয়ে মাধবী সাধুর আশ্রমে গেল—সব কথা তাঁকে বলে যুক্তি চাইল। সাধু মৃদু হেসে গাইলেন একটি গান। সেই গানের মধ্যেই মাধবী পেল কর্তব্যের সন্ধান। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এসেছিল, হাল্কা মনে ফিরে গেল।

সব কাজের মধ্যে শ্বশুরের পরিচর্যাও মাধবীর কাজের অন্তর্গত। শ্বশুর জিজ্ঞাসা করেন: মুখখানা যে কদিন ধরে ভার ভার দেখছি মা! বুঝেছি ঝড় উঠেছে।

মাধবী বলে: সংসারে ঝড় ঝাপ্টা ত আছেই বাবা! আপনার আশীর্বাদ যখন পেয়েছি, সব সামলে নেব জানবেন!

গভীর রাত। কালো রঙের একটা ঘোড়ায় চড়ে চলেছে এক অদ্ভুত আরোহী। মাথায় নীল রঙের পাগড়ি, পাদরীদের মত লম্বা আলখাল্লা পরা, কুচকুচে কালো তার রং; কোমরে রেশমী ফেটি বাঁধা, টকটকে লাল। গলায় পবাল ও রাঙন পাথরের মালা। কালো কুচকুচে দাড়ি নাভি পর্যন্ত লম্বা।

হরিপুরের এলাকার বাইরে জঙ্গলমহলের বাঁধের কাঁচা রাস্তা ধরে অশ্বারোহী চলেছে—নাম এর আলি রায়। জঙ্গলমহলে এই অদ্ভুত লোকটিকে লক্ষ্য করে নানা রকম প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুরা বলে ইনি জঙ্গলের দেবতা দখিন রায়! মুসলিমরা বলে—সাক্ষাৎ পীর! হিন্দু-মুসলিম সবাই এঁর আপনার। তাই নাম নিয়েছেন—আলি রায়।

বাঁধের রাস্তা দিয়ে আলি রায় জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গল দুর্গম—কিন্তু এঁর অজানা নয়। মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে পথ দেখে নেয়।

জঙ্গলের মাঝখানে পুরাকালের নীল কুঠি। তার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের চার কোণে চারটি মশাল জ্বলছে। কালো মুস্কো মুস্কো চেহারা একদল লোক, আর

কতকগুলো হৃষ্টপুষ্ট মেয়ে মণ্ডল করে নাচ-গান করছে।

কুঠির ফটকে এসে আলি রায় ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়াকে একটা গাছে বেঁধে ভিতরে ঢুকল। উঠানের এক ধারে পাথরের পৈঠে, তার অনেক ওপরে একখানা বড় পাথর পাতা—সেইখানে গিয়ে আলি রায় হাত তুলে একটা হুংকার দিয়ে বলল: আনন্দ রহো।

পলকে নাচ-গান সব থেমে গেল। ভূলুণ্ঠি হয়ে সকলে গড় করে সেই পাথরখানার দু'পাশে দাঁড়াল যোড়হাত করে; একদিকে পুরুষ, অন্য দিকে নারী।

আলি রায় বলল: নেতাজী সুভাষচন্দ্র যেমন ৩৬ জাতকে এক জাত করে আজাদ হিন্দ দল গড়েছিলেন, আমিও তেমনি খুঁজে খুঁজে তোমাদের মতন দাগীদের পুলিসের এক্তিয়ারের বাইরে এনে এই দল গড়েছি।

দল থেকে ধ্বনি উঠল: জী! আবাদী হানাদার দল।

আলি রায়: হাঁ, আবাদী হানাদার। এই জঙ্গল আমি ইজারা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি তোমাদের হাতে; আবাদ কর তোমরা রুটির জন্যে; আর হানা দাও আমার প্রয়োজনে—নয় কি?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, বেসক্।

হুজুর এখানে এনে না খুলে ফেলে পচে মরতাম।

পুলিপোলাও যেতাম।

ফাঁসি কাঠে ঝুলতাম।

আমাদের জান মান জিন্দিগি—সব কিছুর মালিক হচ্ছেন হুজুর।

আলি রায়: মান ত, তোমাদের জাত নেই, ধর্ম নেই, সাবেক নামও মুছে গেছে। আনন্দে আছ, খাচ্ছ দাচ্ছ মৌজ করছ, ফুর্তি চালাচ্ছ, কোনো পরিচয় তোমাদের নেই?

নিশ্চয় নিশ্চয়—বেসক্—বেসক্—

আমাদের সব কিছু—হুজুর।

আলি রায়: তোমাদের সাবেক জীবন মরে গেছে—নতুন করে বেঁচে উঠেছ আবার। বাঁচা চাই, বাঁচতে হবে বাঁচবার মত।

আলবৎ। তার জন্যে আমরা হরবখত, তৈরী আছি।

আলি রায়: তাহলে শোন—সরকারের সঙ্গে আমাদের ঝামেলা নয় ও-রাস্তা আমাদের নয়—

হুজুর যে রাস্তা বাতলাবেন, সেই রাস্তা আমাদের।

আলি রায়: ইমান নিয়ে, ইজ্জৎ নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, খানদানি নিয়ে যারা করে হুজ্জত, তারাই আমাদের দুশমন। ওদের ওপরে আমাদের হামলা চালাতে হবে।

বহুৎ আচ্ছা হুজুর।

আলি রায়: আর এক কথা—তোমরা আবাদী হানাদার; আনন্দ নিয়ে তোমাদের কারবার! দুখের পরোয়া রাখ না। কাজ হাসিল করতে গিয়ে জান দেবে তবু ধরা দেবে না—হালাল হবে তবু হার মেনে হাজতে যাবে না।

আলবৎ, বেসক্—

আলি রায়: সাফাই হাতে যেমন একটা কাজ করেছ—হরিপুর মহল্লায় চমক লাগিয়েছ—এখন এক বার হরিপুর মহল্লায় চাষী দুশমনদের ওপর এক হাত নিতে হবে—

তাহলে হুকুম হোক হুজুর হদিশ জান।

আবাদী হানাদার হো—হাতিয়ার ধরো—

আলি রায়: আজ নয়, কাল রাতে, ঠিক এই সময়।

সকালে পূজার ঘরে মাধবী শুনল—চৌধুরী কাল গভীর রাতে ফিরে এসেছে।

সুরভী বলল: তাহলে প্রসাদ নিয়ে জেনে আসি—যে কাজে গিয়েছিলেন, কি তার করে এলেন?

বেরুবার জন্যে চৌধুরী সাহেব তৈরী হয়েছেন, এমন সময় সুরভী পদাবলীর একটি পদ কীর্তনের সুরে গাইতে গাইতে এসে উপস্থিত। তার বেশভূষায়ও নূতনত্ব। ললাটে তিলক, গলায় ফুলের মালা, মুখে বিচিত্র হাসি। চৌধুরী খুশি মনে রসালাপ করতে করতে বাড়াবাড়ি করে ফেলতেই সুরভী বলল: আহা করেন কি, আমার ঘরে বৈষ্ণব আছে তা বুঝি জানেন না? এখন কাজের কথা বলুন—সাধুর বিগ্রহের পাত্তা কিছু মিলিল? পরিহাসের ভঙ্গিতে চৌধুরী বলল, সময় হলেই টের পাবে; গোয়েন্দা কি আগে থেকে খবর ফাঁস করে।

গভীর রাত। আবাদী হানাদারদের একটি দল কালো পোষাক পরে মুখে মুখোশ এঁটে চুপি

চুপি চলেছে। প্রত্যেকের হাতে এক একটা জলন্ত মশাল ও বল্লম। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বাঁধের রাস্তা ধরে বার-হরিপুরের ডুলে পাড়ায় তারা ঢুকল। সারি সারি পর্ণকুটির, ধানের মরাই। একদল পিচকিরি দিয়ে পেট্রোল ছুঁড়তে লাগল চালায় চালায়। তারপর অন্য দল এক সঙ্গে প্রত্যেক ঘরের চালে মশালের আগুন ধরিয়ে দিল—দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে ঘরগুলো সব জলে উঠল।

সাধু শ্রীদাস ঠিক এই সময় আশ্রম-কুটিরে বসে তন্ময় হয়ে আবেগ ভরে গান গাইছিলেন—গানের সুর বায়ুতরঙ্গে মিশে যেন সুপ্ত গ্রামবাসীর তন্দ্রা ভেঙে দিচ্ছিল। অদ্ভুত গান—গান বলছে: ওরে গ্রামবাসী ঘুম ছেড়ে উঠে দেখ—মনের বনে কে দিলে আগুন। চারদিক থেকে ছুটে আসে লোকজন—সবার মুখে এক কথা—আগুন, আগুন, ডুলে পাড়া পুড়ছে। শ্রীদাসের গান তাদের মাতায়—দল বেঁধে সবাই ছোটে আগুন নেবাতে। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি নামে।

সকালে মাধবী খবর পায়—ডুলে পাড়ায় আগুন লাগে। শ্রীদাসের গানে লোকের ঘুম ভাঙে—গ্রাম শুদ্ধ সবাই ছুটে গিয়ে শেষ রক্ষা করেছে—নইলে সব পুড়ে যেত। আশ্চর্য্য! অন্ধ শ্রীদাস জানতে পেরে গান গেয়ে সবাইকে জাগান—তাঁর মেঘমল্লার সুর মেঘ ডেকে আনে—কি বৃষ্টিই নামল।

সেই চিকের দুদিকে আবার বসেছে মাধবী দেবী ও চৌধুরী সাহেব। মাধবী তাকে ডুলেপাড়ার অগ্নিকাণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করল। চৌধুরী জানালো কি করে আগুন লাগে, সেটা জানা যায় নি। মাধবী বলে, আমি কিন্তু খবর পেয়েছি, আগুন লাগানো হয়েছে। চৌধুরী বলে বাজে কথা। মাধবী জিজ্ঞাসা করে, মাসখানেক আগে যে কজন লোককে আপনি তলপ করে এনে ওঠ-বস করতে চেয়েছিলেন, তাদের ঘরেই আগে আগুন লাগে, এ কথাও কি বাজে? চৌধুরী বলে, আগুন ওপাড়ার সবার ঘরেই লেগেছিল, তবে বরাত তাদের ভাল, এ গ্রামের সবাই গিয়ে পড়ে, আর বৃষ্টিও নামে। নইলে সমস্ত গ্রামখানাই পুড়ে যেত। মাধবী বলল, আমি বিশ্বনাথ মালাকারের ওপর তদন্তের ভার দিয়েছি। ওখানকার ক্ষয় ক্ষতির হিসেবও তাকে দাখিল করতে বলেছি। চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল: বৈষ্ণবী সুরভীর স্বামী? মাধবী: হ্যাঁ। চৌধুরী: সেরেস্তায় কি পাকাপোক্ত লোকের অভাব আছে যে, একটা মালীর ওপর এ ভার দেওয়া হলো? ওটা ত মালঞ্চ নয়। শ্লেষের সুরে মাধবী বলল: পোড়া বাড়ীগুলোকে যাতে মালঞ্চ করা যায়, সেই জন্যেই পাকাপোক্ত মালীকে লাগানো হয়েছে।

সেদিন সকালে গোপালের পটখানিকে নানারকম ফুল দিয়ে সাজিয়েছে সুরভী, যেহেতু সেদিন পূর্ণিমা। নিজেও ফুল সাজে সেজে ফুলের একটা সাজি আর নানারকম মিষ্টি নিয়ে চৌধুরীর ঘরে যাত্রা করল। যাবার সময় মাধবীকে ইসারা করে বলে গেল—বিশ মিনিট পরেই। মনে থাকে যেন।

সুরভীকে দেখে চৌধুরী হেসে বলল, তুমি কি বসন্তরূপা? সেদিন এলে বৈষ্ণবী সেজে—

সুরভী বলল: আজ এসেছি মালিনী হয়ে। দেখুন দিকিনি কেমন ধরখানি? মালঞ্চ বলে মনে হয় কি?

চৌধুরী পরিহাস করে বলে, তোমার মালাকর ত পোড়া ঘরের পাড়াকে বাগিয়েছে, তুমিই এখন আমার মনের বাগানে মালঞ্চ বসাও। সাজ কিন্তু সাড়ান নেই। মালঞ্চের গন্ধে মধুকর অন্ধ হয়েছে মালিনী—এস।

সুরভীর হাত ধরেছে চৌধুরী, এমন সময় ময়না এসে পিছনে দাঁড়াল। সুরভী কৃত্রিম কোপে বলে ওঠে, করেন কি, করেন কি, ছাড়ুন, ছাড়ুন—

ময়নার কথায় চৌধুরী চমকে ওঠে। পিছন থেকে জলন্ত দৃষ্টি চৌধুরীর মুখে ফেলে পরক্ষণে সুরভীকে বলে—মালঞ্চ ছেড়ে এখন গৃহে চল, বৌরাণী খুঁজছেন। 'কেমন মজা, এখন সামলান' বলে সুরভী অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষপাত করে চলে গেল। চৌধুরী ময়নাকে ডাক দিতে গেল। ময়না মারমুখী হয়ে চৌধুরীকে বলল: থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। আপনার ভণ্ডামি সব জেনেছি। বৌরাণীর ছবি নিয়ে মাতামাতি, তারপর এই নেতায়া ছুঁড়িটাকে নিয়ে…চৌধুরী যেন আকাশ থেকে পড়ে। ময়না বলে আপনাকে বাঁদর নাচাচ্ছে তা ত জানেন না। সেদিনের ছবির কথা সব বলে, সুরভী দেখে গিয়ে বৌরাণীকে যা বলেছে। আর সে যে আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিল ওদের কথা—তাও বলে। চৌধুরী শুনে চমকে ওঠে।

সে রাত্রে শ্রীদাসের গানে গ্রামবাসীর জাগরণ——তারপর মুষলধারায় বারিবর্ষণে শ্রীদাসের প্রতি সবার শ্রদ্ধা আরও গভীর হয়েছে। শ্রীদাস একলা বসে গান গাইছেন, সুরভী এসে গড় করল। শ্রীদাস চমকে উঠে আর্তস্বরে বললেন : কে, সুরভী দিদি !···সুরভী বলল, হ্যাঁ দেবতা, মালাকার বৌরাণীর কাজে ব্যস্ত, আমাকেও বৌরাণীর কাছে থাকতে হয়, সব সময় আসতে পারি না। কি জানি আজ মনটা কেমন করছে আপনার জন্যে, তাই ছুটে এলাম।

শ্রীদাস বললেন : আমার জন্যে না নিজের জন্যে ?

মাধবী : ও কি বলছ দেবতা ?

শ্রীদাস : আমার মনটাও আজ কেমন করছে হয়ত তোমার জন্যেই দিদি। যেদিন বেদী থেকে গোপাল চলে যান, সেদিনও মনে এমনি একটা বেদনা এসেছিল।

সুরভীর মনটা দুলে ওঠে, চোখ দুটো বড় করে শ্রীদাসের মুখের পানে চেয়ে থাকে। শ্রীদাস বলতে থাকেন : যার ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাটি বাজে। কথাটা খুব খাঁটি। তুমি কেন ওসব ঝামেলায় ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলে দিদি।

সুরভী বলে : গোপালের জন্যে দেবতা, তাকে খুঁজে আনবার জন্যে। শ্রীদাস বলেন : তা যদি হয়, গোপালই তোমাকে চেয়েছেন দিদি।

ময়না চৌধুরীর অজ্ঞাতে আঁতি পাতি করে সব খুঁজেছে——কোথায় সে ফটো। শেষে খুঁজে পায়——তার শয্যার বালিশের নীচে। অমরনাথ ও মাধবীর পাশাপাশি ছবি সে চৌধুরীকে দিয়েছিল——কিন্তু এ ত সে ছবি নয়। এতে ত অমরনাথের ছবিটা নেই। ময়না বিস্ফারিত চোখে দেখে——ছবির নীচে চৌধুরী স্পষ্ট স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে লিখেছে——'তুমি আমার——তুমি আমার! আমি তোমারি নেপেন চৌধুরী।'

এমন সময় চৌধুরী এসে পড়ে। তার মুখের উপর ছবিখানা তুলে ধরে কৈফিয়ৎ চায় ময়না। চৌধুরী প্রকৃতিস্থ ছিল না——প্রচুর মদ গিলে মাতাল হয়েছে। বলে ফেলল ব্যাপারটা——অমরনাথের ছবিটা বাদ দিয়ে মাধবীর ছবিটা আলাদা করে নিয়েছি। এখন আমার কাজ হচ্ছে——ছবির নীচে মাধবীকে দিয়ে লেখাব'——আমিও তোমার' নিজের হাতে এর নীচে সে লিখবে নিজের নাম মাধবী। তারপর আমাকে আর কে পায় ? বলেই সামলে নেয় ময়নাকে তোষাজ করে···বলে——তারপরে ওকে করব তোমার বাঁদী ···ক্রমে সে ঝিমিয়ে পড়ে——ময়না ছবিখানা ব্লাউজের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে।

বিশ্বনাথ ও সুরভী মাধবীর সঙ্গে আলোচনা করছে। ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর তোলা হচ্ছে। মাধবী বিশ্বনাথের কাজের সুখ্যাতি করে। সেরেস্তার উপর হুকুম দেয়—পাঁচ হাজার টাকা দেবার জন্যে।

সেরেস্তায় বিশ্বনাথ মাধবীর হুকুমনামা দাখিল করেছে। চৌধুরী সাহেবের খাস কামরায় দস্তখতের জন্য বেয়ারা নিয়ে গেল। কাগজখানা পড়েই ভ্রূকুঞ্চিত করে বিশ্বনাথকে ডাকল। বিদ্রূপের সুরে বলল : দুলে পাড়ায় এখন ফুলবাগান বানানোর কাজ চলছে শুনলাম ? বিশ্বনাথ মুখ তুলে জবাব দিল : হ্যাঁ, বৌরাণীমা তাই বলেছেন——ওদের পাড়াটা যেন ফুলের বাগিচার মতই খাসা হয়। চৌধুরী নীরবে একটা বিশ্রী ভঙ্গি করল। সেরেস্তা থেকে বেরুবার সময় চৌধুরী সরকার মশাইকে বলল——খাওয়া-দাওয়ার পর আমি সদরে রওয়ানা হচ্ছি——হয় ত আজ ফেরা হবে না। ভিতরে এ খবরটা দেবেন।

রাত এক প্রহর। শ্রীদাসের কীর্তন খুব জমেছে। শ্রীদাসের কীর্তন শুনতে এসেছেন আদি রায়। এই অদ্ভুত লোকটির নাম অনেকে শুনেছে, কিন্তু এ অঞ্চলের কেউ এই শোনা লোকটিকে দেখেনি। গানের পর শ্রীদাসের সঙ্গে হয় তার হাস্যময় সংলাপ। প্রথমেই সে শ্রীদাসকে এই বলে ধন্যবাদ দেয় যে, তার জাত নেই, ধর্ম নেই, সংস্কার কিছু নেই——তা বোলেও শ্রীদাস যে তাকে কাছে ডেকে বসিয়েছেন, এতেই তাঁর মহত্ত্ব বোঝা যাচ্ছে। ···শ্রীদাস বলেন——দৃষ্টি দিয়ে কোন কিছু বিচার করবার শক্তি যখন আমার নেই——তখন নির্বিচারে সবাইকে গ্রহণ করেই আনন্দ পাই।···আদি রায় বলে——আমরা চোখে দেখি, আপনি মন দিয়ে দেখেন শুনেছি। আচ্ছা সাধুজী, আমাকে দেখে কি বুঝছেন বলুন ত ?···শ্রীদাস হেসে বলেন——দৃষ্টিহীনকে যখন দেখার প্রশ্ন করেছেন, তখন তারও উত্তর হচ্ছে রায়সাহেব——যে সত্য আমরা এখন দেখতে অক্ষম, কালে আমরা সবাই তা দেখতে পাব···হাঃ হাঃ···হাসবেন হয়ত শুনে।···আদি রায়ের মুখখানি অন্ধকার হয়ে যায়।

একটু তফাতে বিশ্বনাথ ও সুরভী বসে এদের

সংলাপ শুনছিল। ক্রমে সব লোক চলে গেল। সুরভীকে শ্রীদাস বললেন: বাড়ী যাও দিদি। বিশ্বনাথ বলল: আমরা সবার শেষে যাব দেবতা। তখন—'নমস্তে, আর একদিন আসা যাবে' বলে আলি রায় উঠল।

আশ্রমের মুখে আলি রায়ের পাল্কি নিয়ে আটজন ষণ্ডামার্কা বাহক অপেক্ষা করছিল। আশ্রম থেকে বেরিয়ে আলি রায় পাল্কিতে উঠল। পাল্কি নিয়ে বেহারারা নিঃশব্দে একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল—সেখানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। পাল্কি থেকে আলি রায় জিজ্ঞাসা করল—কাছে কেউ আছে? উত্তর হলো—না।·· আলি রায়: হুঁশিয়ার হয়ে থাক।

···এই বাঁক থেকে একটু দূরে বিশ্বনাথের কুটির। দুটো লোক টর্চের আলো ফেলে কুটিরের ভেতরটা তন্নতন্ন করছে। একজন তক্তাপোষের কাঁথাটা টেনে তুলতে তার নীচে থেকে নোটের তাড়া মেঝের উপর ছিটকে পড়ল। টর্চের আলো ফেলে দেখে কুড়িয়ে নিয়ে একজন বলল: পেয়েছি রে—কাজ ফতে।···

সেনাপতির পাল্কির কাছে আসতে পাল্কি থেকে আলি রায় বলল: আবাদী হানাদার?··· তাক দুটো বলল—জী হুজুর, আবাদী হানাদার।·· আলি রায় বলল: হুঁশিয়ার, তৈরী থাক—যেন টুঁ শব্দ করতে না পারে। তার পরে—এই পাশে···কয়েদ ঘরে—কড়া পাহারা × ×

একজন জিজ্ঞাসা করল—হুজুর কিসে যাবেন? × × আলি রায় বলল: হুজুরের এখানে কাজ আছে। কাল রাতে হবে মোলাকাত। চুপ্‌·······

বিশ্বনাথ ও সুরভী দুজনে একটা গান গাইতে গাইতে আসছিল। এইখানে আসতেই কালো রঙের এক একটা থলে যেন আকাশ থেকে তাদের মুখের উপর পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে চার-জন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

একটু পরে তাদের পাল্কির মধ্যে পুরে—পাল্কির ঢাকনার দরজা বন্ধ করে বেহারারা পাল্কি নিয়ে ছুটলো। আলি রায় টর্চের আলো ফেলে গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে বেশ ছাড়তে লাগল। প্রথমে খুলল মাথার পাগড়ি, তারপর আলখাল্লা—

খানিক পরে দেখা গেল—ধীরে ধীরে চৌধুরী সাহেব তাঁর বাংলোয় ঢুকছেন—হাতে একটা পুঁটলি।

সকালে সারা গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গেছে। গ্রামের চৌকিদার ভোর-রাত্রে রোঁদ দিতে গিয়ে দেখে—বিশ্বনাথের বাড়ীর দরজা খোলা। ডাকাডাকি করে কারুর সাড়া না পেয়ে ভিতরে গিয়ে দেখে—ঘরে বিছানা ও জিনিসপত্র সব ছড়ানো; মানুষ নেই। চৌকিদারের হাঁক ডাকে সবাই ছুটে আসে। কি আশ্চর্য—কাল রাতে যে তারা শ্রীদাসের আস্তানায় তাদের দুজনকে দেখেছে। গ্রামবাসীরা শ্রীদাসের আশ্রমে ছোটে।

প্রাতঃকৃত্য সেরে অন্যান্য দিনের মত শ্রীদাস গান গাইছিলেন। লোকজনের কোলাহলে তাঁর গান থেমে গেল। সব শুনে তিনি তেমনি নির্বিকার ভাবে বললেন: গোপাল গোপাল করে পাগল হয়েছিল দুজনে; গোপালই বুঝি নিয়ে গেল টেনে। আশ্চর্য, এত বড় ব্যাপারেও তিনি হাউ হাউ করে উঠলেন না; গোপাল চুরি যেতে যেমন ছিলেন নির্বিকার, এবারও তাই।

মাধবীকে খবর দিল ময়না। ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখে মাধবী—পূজার আসনে যোগাড়যন্ত্র হয়নি, পুরুত নেই। সেই সময় ময়না এসে বলল, সুরভী তার বাড়ী থেকে চুরি হয়ে গেছে বউরাণী, তার স্বামী পর্যন্ত। পরিচারিকারা এসে বিস্তারিত খবর দেয়, রাত্রে তারা শ্রীদাসের আশ্রমে গান শুনেছে···

মাধবী পাল্কি করে রওনা হল। পূজাপাঠ সব ফেলে পাল্কিতে উঠে সে যায় শ্রীদাসের আশ্রমে।

আশ্রমে শ্রীদাসের সামনে গ্রামের নরনারী ভিড় করে মালাকার দম্পতির কথাই বলছিল। মাধবীর পাল্কি দেখে তাদের শোক আরো উথলে উঠল। বউরাণীর দোহাই দিয়ে তারা প্রতিকার প্রার্থনা করতে লাগল। হাত তুলে অভয় দিয়ে বউরাণী শ্রীদাসের সামনে গিয়ে প্রণাম করল। আলাপ চলল দুজনে।

বাড়ীতে ফিরে মাধবী শুনল, চৌধুরী সাহেব দেখা করবার জন্যে এসে ছিলেন, সেরেস্তায় আছেন। মাধবী তাঁকে ডেকে পাঠাল। চিকের আড়ালে কথা হলো আগেকার মত। চৌধুরী বলল: আমি ওদের বাড়ী পর্যন্ত তদারক করে এসেছি। আশপাশের লোকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি, শেষরাত্রে চৌকিদার ছাড়া কেউ কিছু জানতেই পারেনি। ডাকাতি হলে একটা গোলমাল ত

হতো। মাধবী জিজ্ঞাসা করল: তাহলে আপনার কি মনে হয়? চৌধুরী বলল: সেরেস্তা থেকে পাঁচ হাজার টাকা কাল সকালে বিশ্বনাথ নিয়ে গেছে, [illegible] এই ব্যাপার। এমনও হতে পারে, ঘরদোরের ঐ রকম অবস্থা করে ওরা দুজনে টাকাটা নিয়ে সরে পড়েছে।

মাধবী বলল: আপনার এই অন্ধ অনুমান নিয়েই আপনি থাকুন। আমি ওদের চিনি, যা করবার আমিই করব।

মাধবী তার দাদাকে চিঠি লিখতে বসে। তার নাম নিরঞ্জন। সম্প্রতি খবরের কাগজে সে দেখেছে, নিরঞ্জন কলকাতা পুলিসে এসেছে। এর আগে সে বোম্বাই পুলিসে আই, বি, বিভাগে ঢুকেছিল। সরকার তাকে বিলেতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে গোয়েন্দাগিরি শিক্ষায় ওয়াকিবহাল ক'রে আনিয়েছেন। মাধবী সব ব্যাপার খুলে তাকে লিখল। আলি রায় সম্বন্ধে সে যা শুনেছে তাও লিখল--চৌধুরীর কথাও।

মাধবীর চিঠি পেয়ে নিরঞ্জন মনে মনে হাসল। আশ্চর্য, যে তদন্ত সম্পর্কে সে ফাইল খুলে বসেছে, মাধবীর চিঠি যে তারই অন্তর্ভুক্ত। সেই ফাইলেই চিঠিখানা সে রাখল।

নীলের জঙ্গলের একাংশ। কতকগুলো মেয়ে জঙ্গলে নৃত্য করছে। তাদের সাজ-সজ্জা বিচিত্র। এরা বন্য নারীর মত সেজেছে, প্রবৃত্তিতেও আদিম যুগের বন্যনারীর মত পিছনে টেনে নিয়ে গেছে যেন। জঙ্গলের এক অংশে গাছে দোলা টাঙানো হয়েছে, দোলায় দোল খেতে খেতে গান গাইছে, নাচছে।...ওদিকে শিকারীর মত সাজ-গোজ করে কতকগুলো ষণ্ডামার্কা যোয়ান ও হল্লোর করছে—দুজনে মাতামাতি।

হঠাৎ এদের চোখ পড়ে আলি রায়ের দিকে—একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সে এদের লাস্য নৃত্য দেখছে। সবাই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে গড় করে। আলি রায় কাছে এসে হাসতে হাসতে তাদের পিঠ চাপড়ায়, মেয়েদের খোপার ফুল কানের দুল নেড়ে দেয়। দু-একটা মেয়ে এগিয়ে এসে তার হাতে ফুল দেয়—

নীলকুঠির একটা বড় ঘর। তক্তপোষে বিছানা। বেতের খুরসি—টেবিল পাতা। নানা রকম জিনিসপত্র থরে। দেয়ালে নর-নারীর কুরুচিপূর্ণ ছবি ঝুলছে।...এই ঘরে ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুরভী ঘরে জানালা নেই, দরজা বন্ধ।...সুরভী, অস্থিরভাবে প্রত্যেক জিনিসটি নেড়ে চেড়ে দেখছে—ভাবছে। খুট করে দরজা খুলে যায়—ঘরে ঢোকে আলি রায়—দরজা বন্ধ করে দেয়। এগিয়ে আসে সুরভীর দিকে—মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল দৃষ্টি মিলিয়ে চেয়ে থাকে দুজনে। আলিরায় হো হো করে হেসে উঠে বলে: সাধুর আশ্রমে তোমাকে দেখেছিলাম?

সুরভী: তারপর আপনার পাল্কি চেপে এখানে এসে আর এখন আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, এ কাজ আপনারই।

আলি রায়: তোমারই ভালর জন্যে এ কাজ করা হয়েছে। আমি গণনা বিদ্যা জানি—তা বুঝি জান না?

সুরভী: তাই নাকি? গণে কি দেখলেন?

আলি রায়: তুমি আনন্দ চাও। তোমার মালাকর থাকতেও চৌধুরী সাহেবকে তোমার যৌবন মালঞ্চের মধুকর করতে ক্ষেপে উঠেছিলে।

সুরভী: হতে পারে। কিন্তু আপনাকে ত আমি চাইনি। আপনি আমাকে ধরে আনলেন কেন?

আলি রায়: তোমাকে ভাল করে যাচাই করে দেখতে। চৌধুরী সাহেবকে ভালবেসেও তাকে ফাঁসাতে চেয়েছিলে, তিনি যে বৌরাণীর ছবির ভক্ত, সে কথা বৌরাণীকে বলে দিয়েছিলে।

সুরভী: এই আপনার গণনার বিদ্যে? মেয়েমানুষের মন জানেন না—চৌধুরী সাহেবকে পাবার জন্যেই বৌরাণীর কাছে চুকলি করতে হয়েছিল তাঁর নামে। যাতে ও পথে কাঁটা পড়ে।

আলি রায়: বটে! তাহলে ত আমার গণনায় সত্যিই ভুল হয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলাম—চৌধুরী সাহেবের ওপর তুমি নারাজ হয়েছ। সেই জন্যেই ত অনেক আশা করে তোমাকে এনেছিলাম।

সুরভী: আমার আশা ছাড়ুন—জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না। তাহলে মালাকর বেচারীই বা কি করেছিল।

আলি রায়। চৌধুরী সাহেবকে তুমি সত্যিই তাহলে ভালবাস?

সুরভী: গুণতে যখন জানেন—গণনা করে দেখুন না।

আলি রায়:—গণনায় যদি দেখি সত্যি—তাকে

এখুনি এখানে আকর্ষণ করে আনতে পারি তা জান?

সুরভী : বেশত, আনান না—সামনেই বোঝাপড়া হয়ে যাক।

আলি রায় : আচ্ছা, বিশ মিনিট অপেক্ষা কর।

আলি রায় বুভুক্ষু দৃষ্টিতে তার পানে আর একবার চেয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল; দরজাটা বন্ধ করে—শিকলটা তুলে দিয়েই গেল—তালা কুলুপ আর লাগাল না; খোলা অবস্থায় ঝুলতে লাগল।

এই ঘরের পাশ দিয়ে পাথরের সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে, সেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল আলি রায়। ভুগর্ভ মধ্যে একটা বিচিত্র ঘর। ঘরে ঢুকে টর্চ জেলে একটা বাতি দিয়াশিলাইয়ের কাঠি ঠুকে জ্বালল। একখানা বড় আরশির সামনে দাঁড়াল আলিরায়। আরশির পানে চেয়ে আস্তে আস্তে মাথার পাগড়ি খুলতে লাগল।

অন্যদিকে ভুগর্ভ মধ্যে আর-একটা ঘর। মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে একটা। মেঝের উপর একখানা মাদুর পাতা। এককোণে একটা জলের কলসি, পিতলের একটা লোটা···এই ঘরে বিশ্বনাথ বাঘের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে—এক একবার দরজা ধরে টানছে।

হঠাৎ বাইরে থেকে দরজা খোলার শব্দ হলো। ঘরের কোণ থেকে পিতলের ঘটিটা নিয়ে বিশ্বনাথ আক্রমণ-ভঙ্গিতে প্রতীক্ষা করতে থাকল। দরজা খুলে রুটি-তরকারির থালা নিয়ে ঢুকল অর্ধবয়সী একটি মেয়ে, নাম তার—থাকমণি।

বিশ্বনাথ ঘটিটা তুলতেই থাকর সঙ্গে তার চোখোচোখি হয়ে গেল—দুজনেই চমকে উঠল। থাক বলল—মালাকার?···বিশ্বনাথ হাত নামিয়ে বলল—থাক, তুমি এখানে?···থাক বলল—বরাতের ফেরে এহানে নকরী নিয়ে এসেছি মালাকার। জানত, চোরাই মাল ধর থেকে বেরুতে পুলিসের হুলিয়া বেরোয় আমার নামে, তাই না পেলিয়ে এসে এখানে রান্নার কাজ নিয়েছি। কিন্তু তুমি কয়েদ ঘরে কেন মালাকার?

বিশ্বনাথ : কেন তা জানিনে। শুধু আমি নই—আমার বৌকেও ধরে এনেছে। কোথায় রেখেছে জানি না।···থাক বলে···আমি জানি, অ-মা! সেই মেয়েটি তাহলে তোমার বৌ? বিয়ে করছ মালাকার। তা এক কাজ কর, রুটি এনেছি, খেয়ে নাও।

বিশ্বনাথ : খাওয়া মাথায় থাক থাকো—যদি আগেকার উপকার মনে থাকে তাহলে—* * * থাক বলে : মনে নেই, আড়াই কুড়ি টাকা ধারি তোমার কাছে—একটি দিন উঁচু কথা বলনি। মনে নেই? আজ সে ঋণ শোধ করব মালাকর। কিন্তু দোহাই, দুখানা রুটি আর একটু গুড় মুখে দাও, আর খেতে খেতে বল—আমিও মতলব ভাঁজি—তোমার বৌ'এর ঘরেও খাবার নিয়ে যাব আমি, এই থালা নিয়েই তুমি বস মালাকর—

আগের ঘরে সুরভী—একটা আধারের পাশে রক্ষিত একটি বস্তুকে লক্ষ্য করে বলছে : তোমাকে যখন পেয়েছি, কেউ আমার কিছু করতে পা বে না—তোমাকে নিয়ে যাবই। এখন মনে পড়ছে দেবতার কথা—গোপালই তোমাকে টেনেছেন দিদি। * * * এমন সময় দরজা খুলে ঘরে ঢোকে বিশ্বনাথ ও থালা হাতে করে থাকমণি। সুরভী বিকৃত কণ্ঠে বলে—এসেছ তুমি? কি করে এলে?···বিশ্বনাথ বলে : এই থাকমণির দয়ায়। সদরে ফুল টোপরের দোকান ছিল এর। থাক বলে : আর তোমার বর হচ্ছেন আমার মহাজন—অনেক ট্যাকা ধারি, আজ সেটা শোধ দেব দিদি—কিছু খেয়ে ত আগে নাও।···সুরভী বলে : না না, খাবার কথা বল না, এখনি সে ডাকাত আসবে, তার আগেই আমাদের···।···থাক বলে : তাহলে এসো, আর দেরি নয়।

সহসা সেই বস্তুটির দিকে চেয়ে সুরভী বলল : এটা তুলে নাও মালাকার।···বিশ্বনাথ—কি ও?

সুরভী বলে : পথের সাথী, যাঁর টানে এসেছিলাম। বস্ত্রাবৃত মূর্তিটি বিশ্বনাথ কোলে করে নেয়। বাইরে এসে ঘরের শিকল টেনে দিয়ে তারা চলে যায়।

বাইরের চত্বরে তেমনি নাচ-গানের হল্লোর চলেছে। গুপ্ত পথে এদের এগিয়ে দিয়ে থাকমণি ফিরে আসে।

ভুগর্ভের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে একটি লোক, কালো একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে, মুখখানা তার দেখা যাচ্ছে না। শিকল খুলে ঘরে ঢুকল সে। দেখল—সুরভী নেই। খুঁজতে খুঁজতে দেখে—মেঝের উপর থালায় রুটি-তরকারি পড়ে আছে। স্তব্ধ হয়ে খানিকটা ভাবল। তারপর ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল শিকলটি তুলে দিয়ে, আবার নামতে লাগল নীচের সিঁড়ি দিয়ে ; তারপর সেই ঘরে ঢুকেই—আরশির কাছে গেল, ঘরের মধ্যে তখনো বাতি জ্বলছিল। পাগড়িটা আবার হাতে তুলে নিয়ে বেশ পরিবর্তন করতে লাগল।

বাইরে নাচ-গান চলেছে।…একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে হাত তুলে হুংকার দিল আলিরায় : হো আবাদী হানাদার।

নাচ-গান সব থেমে গেল। ভূমিষ্ঠ হয়ে সবাই গড় করল। তারপর মাথা তুলে দাঁড়াল।

আলিরায় : আমাদের শিকার ভেগেছে। জলদি যাও, দেখ কোথায় গেল—তাদের চাই, ধরা চাই।

সবাই চীৎকার করল—হো আবাদী হানাদার।

পুরুষরা তাড়াতাড়ি হাতিয়ার সংগ্রহ করে চারিদিকে ছুটতে লাগল।

বিশ্বনাথ ও সুরভী এঁকে বেঁকে অনুসরণকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে ছুটেছে—ওদিকে আবাদী হানাদার দল লাফাতে লাফাতে খুঁজছে পথের দু'পাশ ঝোপ ঝাপ গাছ পগার প্রতিটি স্থান।—পথের একটা স্থানে জলাভূমি—দিগন্তবিসারি ধানের ক্ষেত—সবুজবর্ণের ধানগাছগুলি জলের সঙ্গে যেন মাতামাতি করছে। জলাভূমির ধারে একখানা শালতি ভাসছিল—বিশ্বনাথ ও সুরভি ছুটতে ছুটতে এসে সেই শালতিতে চেপে বসল। বিশ্বনাথ লগা ঠেলে শালতিটাকে ধানবনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে—ধানবনের ভিতর দিয়ে শালতি ছুটল। একটু পরে অনুসরণকারীরা সেখানে এসে পড়ল—খানিকটা দাঁড়িয়ে তারা সামনের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে শালতি এসে জলাভূমির কিনারায় ভিড়ল। বিশ্বনাথ ও সুরভী শালতির উপর দাঁড়িয়ে দেখল—কেউ কোথাও নেই। বিশ্বনাথ তার বোঝাটি কাঁধে নিল—দুজনে রাস্তায় না উঠে কিনারা দিয়ে ছুটল। খানিক পরে রাস্তায় উঠতেই দেখল—হানাদারেরা ছুটে আসছে এবং তাদের দুটিকে দেখতে পেয়ে—হল্লা তুলেছে। বিশ্বনাথ ও সুরভী একটা গাছের পাশ দিয়ে বাঁকের দিকে ছুটতে থাকে।

বাঁকের পর একটা তেমাথার মুখে বেদেদের টোল পড়েছে। বেদের সরদার হল্লা শুনে তাঁবুর বাইরে এসেছে। বিশ্বনাথ ও সুরভী তার কাছে এসে বলল : আমাদের একটু আশ্রয় দেবে বাবা।

ডাকাতদল আমাদের পিছু নিয়েছে। জিজ্ঞাসা করে সরদার জানল—তারা নীলের জাহাজ থেকে আসছে। বেদে-সরদারের চোখ বিস্ফারিত হয়—নীলের জাহাজ আর ডাকাতের নাম শুনে। সে তখনি পরদা তুলে ইসারা করে : ভিতরে যাও, ভয় নেই। একটু পরে হানাদাররা এসে এখানে থামে, বেদেকে জিজ্ঞাসা করে দুটো লোককে দেখেছে কি-না ? বেদে আঙুল বাড়িয়ে সামনের রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সেই পথে তারা এগিয়ে যায়।

প্রতাপনারায়ণের অসুখ খুব বেড়েছে। মাধবী মাথার কাছে বসে। প্রতাপনারায়ণ বললেন : স্বপ্ন দেখছিলাম মা, শ্রীদাসের গোপাল নাচতে নাচতে আসছে, আমার গ্রামে ঢুকেছে। কি রূপ, তার আলোয় চারিদিক হাসছে। হ্যাঁ মা, তুমি সেই থেকে ঠায় বসে আছ—যাও ঘুমাও গে।

মাধবী বলে : আপনি একটু সুস্থ হয়েছেন, এবার আমি যাচ্ছি বাবা। ময়নাকে আগে ঘুমিয়ে নিতে বলেছি, এখন সে এসে বাকি রাতটুকু আপনার কাছে বসবে।

নিজের ঘরে বিছানায় বসে ময়না এক কাণ্ড করছে। মাধবীর যে ছবি সে চৌধুরীর অলক্ষ্যে নিয়ে এসেছিল, সেই ছবিখানা, চৌধুরীর একখানা ছবি, আর নিজের ছবি, এই তিনখানা ছবি নিয়ে পাশাপাশি রেখে পরখ করছিল, কিসে বেশ মিল হয়। চৌধুরীর ছবি মাঝে ঠিক আছে, তার পাশে একবার মাধবীর ছবি রাখছে, আর একবার নিজের খানা তার পাশে রাখছে।

এদিকে মাধবী এসে পিছন থেকে যে এই খেলা দেখছে, তা সে জানতে পারেনি, জানতে পারল—মাধবীর কথায়। মুখখানা শক্ত করে মাধবী প্রশ্ন করল : ও কি হচ্ছে ?

ময়নার মুখ শুখিয়ে গেল ভয়ে। তাড়াতাড়ি মাধবীর ছবিখানা লুকোতে গেল, কিন্তু মাধবী খপ করে হাতখানা ধরে দৃঢ় স্বরে বলল : দেখি ?

জোর করে হাত ছাড়িয়ে ছবিখানা উল্টে রেখে ময়না বলল : না, এ-ছবি আপনি দেখবেন না।

মাধবী ছবিখানা ময়নার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলল : দেখতে হবে বৈকি, ছবিখানা যখন আমার।

ছবি আপনার হলেও ওর মালিক আপনি নন, দিন আমার ছবি। বলেই ময়না বিদ্যুদ্বেগে

উঠে ছবিখানা কেড়ে নিতে গেল। মাধবী ঠাস করে তার গালে একটা চড় বসিয়ে বলল: ভদ্রলোকের বাড়ী চাকরি করতে এসেছিস, ভদ্রতা শিখিসনি?

ময়না: আপনি আমাকে মারলেন?

মাধবী: তুই যদি আমার মেয়ে হতিস, আর এমনি বেয়াদবি করতিস, এর চেয়েও বেশী মার খেতে হত। এখন কথার উত্তর দে—এ ছবি কোথায় পেলি?

ময়না কিছুতেই মানবে না, শেষে মাধবী যখন বলল: না মানলে কাল সকালে সেরেস্তায় সবার সামনে হাজির করে এর বিচার হবে—তখন সে বলল যে, চৌধুরী সাহেবের টেবিলে ছবিখানা দেখে, সেখান থেকে লুকিয়ে এনেছিল। মাধবী বুঝল কথাটা সত্যি; চৌধুরীর হাতের লেখা মাধবীর অচেনা নয়, ছবির নীচের লেখা দেখে বুঝল, চৌধুরীই লিখেছে। তারপর ময়নাকে জেরা করে বুঝল যে, ওভাবে ছবি সাজাবার কি উদ্দেশ্য ছিল ময়নার। চৌধুরীর নীচ মনোবৃত্তি তার সম্বন্ধে এবং ময়নার আশা চৌধুরীর দিকে—সবই তার কাছে জলের মত সোজা হয়ে গেল; কিন্তু রাগে তার সারা অঙ্গ জ্বলতে লাগল।

তারপর ময়নাকে বলল: বাবার ঘরে গিয়ে তাঁর কাছে বোসগে, আমি একটু পরে যাচ্ছি হাত-মুখ ধুয়ে, এ রাত্রে আমার আর ঘুম হবে না।

সকালে প্রাতঃকৃত্য সারবার অছিলায় ময়না চৌধুরী সাহেবের বাংলোয় গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সব কথা বলল। চৌধুরী ক্ষেপে উঠল তার উপর: ছবিখানা ক'দিন ধরেই পাচ্ছি না, কে জানত তুই এ কাজ করেছিস। আমার সর্বনাশ করলি তুই, সব আশা ভেঙে দিলি। এখন একটা উপায় আছে, হয় এস্পার, নয় ত ওস্পার। কিন্তু সে কাজ তোকেই করতে হবে।

ময়না বলল: যদি আমাকে যমের বাড়ী যেতে বলেন, তাতেও আমি রাজি! ও খাণ্ডারনি ছুঁড়িকে নষ্ট করতে যা বলবেন, তাই আমি করব। আমার সত্যিই ওর ওপরে হিংসা হয়েছিল, এখন সে হিংসা হয়েছে প্রতিহিংসা।

চৌধুরী বলে—তাহলে নিবিষ্ট মনে শোন।

চৌধুরী তার প্ল্যান বলতে থাকে।

ময়না গিয়ে মাধবীর কাছে কেঁদে পড়ে। বলে: চৌধুরী তাকে বিয়ে করবার লোভ দেখিয়েছিল। সেই আশাতেই সে মশগুল ছিল। কিন্তু খোরাণীর ফটো তার কাছে দেখে, আর ফটোর নীচে লেখা সব পড়ে তার মন বিগড়ে যায়, ফটো চুরি করে আনে। এখন চৌধুরীর সব কীর্তি সে ফাঁস করে দিতে চায়। মাধবী অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। ময়না বলতে থাকে: সব নষ্টের গোড়া ঐ চৌধুরী সাহেব ঠাকুর চুরি, মেয়ে চুরি, মানুষ চুরি, সব ওর কীর্তি।

বেদের দল আসার পরে সারা গ্রামে একটা চাঞ্চল্য পড়েছে। বহুরূপী সেজে দলের সবাই ঘুরে বেড়ায়। আবার একদল পুলিসও হাজির হয়েছে গ্রামে, বেদেদের উপর নজর রাখাই নাকি তাদের কাজ, ওপর থেকে হুকুম এসেছে। কিন্তু বেদের দলের সর্দারের গতিবিধিও অদ্ভুত; বিশ্বনাথ ও সুরভী সেই যে বেদে-সর্দারের ক্যাম্পে ঢুকেছে, সেই থেকে তারা আর বেরোয় নি। ক্যাম্পের ভিতরে সর্দারের সঙ্গে তাদের গোপন পরামর্শ বসে। সুরভীকে সর্দার বহিন বলে। সরদার হয়েছে তার দাদা। দলের বেদেরা নানাভাবে ঘোরাঘুরি করে, আর প্রত্যেক খবর এনে সরদারকে দেয়। একটা খবর একজন এনে সেদিন সরদারকে দিল, সরদার সে খবর শুনে উদ্বিগ্ন ও সচকিত হয়ে সকলকে ডাকল।

মাধবী দেবী এত উত্তেজিত হয়েছিল যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিছু না ভেবেই সে ছবিখানা নিয়ে চৌধুরীর ঘরে উপস্থিত হলো। সামনা-সামনি মুখোমুখি তাদের এই প্রথম দেখা।

বিস্ময়ের কৃত্রিম মুখভঙ্গি করে চৌধুরী বলে উঠল: মাধবী দেবী—আপনি!

গম্ভীরমুখে মাধবী বলল: খোরাণী বলুন।

চৌধুরী: সেই মাধবী, কিছু বদলায় নি, তেমনি কথার ঝাঁঝ! মনে পড়ে সেদিনের কথা?

মাধবী: অতীতের কথা নিয়ে খোঁজা-পড়া করতে আমি আসি নি, আপনার বর্তমানের নীচ প্রকৃতির যে পরিচয় পেয়েছি, তারই কৈফিয়ৎ আমি নিতে এসেছি। আমার এ ফটো আপনি কোথায় পেয়েছিলেন?

চৌধুরী: সংগ্রহ করেছিলাম।

মাধবী: আমাদের বিয়ের সময় যে ফটো তোলা হয়েছিল, তা থেকে আপনি—

চৌধুরী: হ্যাঁ, অমরনাথকে ছেঁটে বাদ দিয়ে আপনারটাই আলাদা ব্রোমাইড করে নিয়েছিলাম—মন্দ দেখাচ্ছে? যে নেই—

মাধবী: আমার ফটোর নীচে আপনি…এই সব নোংরা কথা নিজের হাতে কোন্ সাহসে লিখেছেন বলবেন?

চৌধুরী: সাহসে নয়, দুঃখে। চিকের আড়ালে তোমার মুখ আমি দেখতে না পেলেও, তুমি ত আমাকে দেখেছিলে মাধবী—

মাধবী: মুখ সামলে কথা বলবেন! জানেন, আপনার এই ধৃষ্টতার কি শাস্তি—চৌধুরীর মুখে হাসি ফুটলো, এতক্ষণ বসেছিল, দাঁড়িয়ে উঠে সবেগে দরজা বন্ধ করে তার পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল: বটে! শাস্তি দিতে এসেছো নাকি? এখন শোন মাধবী, তোমার ছবির নীচে যা লিখেছি, তা যেমন বাস্তব; তোমার মনের কথা ঠিক অমনি করে তুমিও লিখবে—এই ঘরে এখুনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি নিজের হাতে—এও তেমনি বাস্তব।

মাধবী: চৌধুরী—

চৌধুরী: হা হা হা! খুব চটে গেছ দেখছি। কিন্তু ভেবে দেখেছ, চৌধুরী সাহেবের ঘরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ একলা, সামনে তোমার ছবি! কর চীৎকার, ডাক তোমার বরকন্দাজদের, আসুক সবাই; দেখুক, ঘরের মধ্যে আমরা দুজনে, তখন আমার যা বলবার সব বলব! কিন্তু এখন তুমি আমার হাতের মধ্যে—আমি তোমাকে জয় করেছি মাধবী।

শুনতে শুনতে মাধবী তখন একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, তার মুখ চোখ দিয়ে আগুনের একটা জ্বালা যেন ফুটে বেরুচ্ছে। কি বলবে, কি করবে এ অবস্থায় ঠিক করতে পারছে না যেন…সত্যিই কি আজ সে শয়তানের সম্মুখীন হয়েছে? …চৌধুরী তখন দু হাত উদ্যত করে মাধবীর দিকে এগুতে থাকে…মাধবী টেবিলের পাশ ধরে অন্যদিকে যায়, হাতের কাছে কিছু না পেয়ে টেবিলের ড্রয়ারটা আত্মরক্ষার জন্য টেনে খুলতেই তার ভিতর পিস্তল দেখতে পায়; সেটা তখনি তুলে নিয়ে চৌধুরীর সামনে উদ্যত করে বলে: এক পা আর এগুলেই আমি ঘোড়া টানব—এর ব্যবহার আমি জানি—

চৌধুরী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, হিংস্র নেকড়ের দৃষ্টিতে মাধবীর পানে চেয়ে থাকে…

জানালায় একখানা মুখ দেখা গেল এই সময়, তারও হাতে রিভলভার—

তোমাকে কষ্ট করতে হবে না মাধবী, আমি এসেছি, আমি সব দেখেছি।

ইনি আর কেউ নন, মাধবীর সেই ভাই—গোয়েন্দাচীফ। আলি রায়ের আবাদী হানাদার-দলের সন্ধানে তিনি যখন ব্যস্ত, সেই সময় মাধবীর চিঠি পান। বেদের দলের ছদ্মবেশে তাঁর অধীনস্থ দল নিয়ে এখানে আসেন।

এর পর সব প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিশ্বনাথ শ্রীদাসের আশ্রমে গিয়ে বলে: ঠাকুর পাওয়া গেছে। শ্রীদাস বলেন: পাওয়া যাবে, আমি জানতাম।

এমন সময় খবর এলো চৌধুরী সাহেব যত নষ্টের গোড়া। মাধবী দেবী নাকি সবার সামনে তাকে পাইক দিয়ে চাবুক পেটার ব্যবস্থা করেছেন। সাধু শ্রীদাসের আশ্রমে তাকে দিয়েই ঠাকুর মাথায় করিয়ে আনা হবে।

শুনে শ্রীদাস চঞ্চল হয়ে ওঠেন। বিশ্বনাথের হাত ধরে অকুস্থলে উপস্থিত হন। শ্রীদাসকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে। গোয়েন্দা-চীফ বললে: যে রাত্রে সুরভী ও বিশ্বনাথকে গুম করা হয়, সে রাত্রে আলি রায়কে সবাই শ্রীদাসের আশ্রমে দেখেছিল। এ অঞ্চলে যত কিছু গণ্ডগোল সবার মূলে এই আলি রায়। শুনে আপনারা অবাক হবেন, আলি রায় আর কেউ নয়, নেপেন চৌধুরী নিজে। তার ছদ্মবেশের তোড়জোড় পাওয়া গেছে, আমার বেশকার তাকে সাজিয়েছে, ঐ দেখুন। যারা শ্রীদাসের আশ্রমে আলি রায়কে দেখেছিল, তারা দেখে অবাক! আশ্চর্য, চৌধুরী আর আলি রায় একই লোক!

গোয়েন্দা-চীফ বললেন, এই বেশে একে কলকাতায় নিয়ে যাব, সারাদেশে একটা সেনসেসান জাগবে।

চিকের আড়ালে থেকে মাধবী জানালেন, তার আগে কাছারী বাড়ীর উঠানে ওকে দাঁড় করিয়ে গুণে গুণে পচিশ ঘা চাবুক লাগান হোক পিঠের জামা খুলে।

একজন বলল: পাইক পাতিরাম চাবুক নিয়ে তৈরী আছে।

আলি রায়-বেশী চৌধুরীকে উঠানে সবার সামনে এনে দাঁড় করানো হলো; পাইক চাবুক তুলেছে।

এমন সময় বিশ্বনাথকে অবলম্বন করে শ্রীদাস সেখানে এলেন; গম্ভীর মুখে সাধু বললেন: একটু দাঁড়াও।

সবাই সাধু শ্রীদাসের পানে তাকান। সাধু বললেন: একে ক্ষমা কর, এই আমার মিনতি।

সুরভী ছুটে এসে শ্রীদাসের পায়ের কাছে বসে বলল: দেবতা, একি বলছ? ওর কীর্তি ত সব শুনেছ, তোমার ঠাকুরকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল ঐ পাজিটা; ছুলে পাড়া পুড়িয়ে দিয়েছিল ঐ শয়তান। আমাদের দুজনকে গুম করে রেখেছিল ঐ ডাকাত। তারপর এত বড় আস্পর্ধা…আমাদের দেবী, আমাদের মা বৌরাণীকে পর্যন্ত অপমান করতে চেয়েছিল। সেই লোককে তুমি বলছ, ক্ষমা করতে।

সাধু শ্রীদাস তেমনি হেসে বললেন: হ্যাঁ সুরভি, পাপ করে তারাই, শক্তির বিচার করতে যারা অক্ষম। শক্তিমানের কাছে একদিন তাকে নতি স্বীকার করতেই হবে। হয়েছেও তাই। এখন চৌধুরী বুঝেছে, তার শক্তি কত নগণ্য, পাপের মোহে সে প্রখর দৃষ্টিবান হয়েও দৃষ্টি হারিয়েছিল। আজ সে সত্যকার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু শাস্তি ত পায় নি দেবতা?

শ্রীদাস: পাইকের হাতের চাবুক কি বড় শাস্তি সুরভি?

গোয়েন্দা-চীফ: কিন্তু আইন ওকে ছাড়বে কেন সাধু?

শ্রীদাস: সব চেয়ে সেরা আইন হচ্ছে বিবেক। তার যুক্তি হচ্ছে, পাপকে শাস্তি দাও, পাপীকে রক্ষা কর। চৌধুরীকে আমি ভিক্ষা চাইছি তোমাদের কাছে, ওর প্রাপ্য শাস্তি আমাকে দাও, কিন্তু ওকে ক্ষমা কর।

মাধবী: তাই হোক, দাদা, ওকে ছেড়ে দিন, শ্রীদাসের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

চৌধুরী: "না, না, আমাকে শাস্তি দিন, শাস্তি দিন।" এই সময় প্রতাপনারায়ণ টলতে টলতে এসে বললেন: তাহলে এই শাস্তি ওর ওপর দেওয়া হোক, গোপাল বিগ্রহ নিয়ে যে মিছিল শ্রীদাসের আশ্রমে যাবে, ঐ চৌধুরী তার পুরোভাগে থেকে গোপালের সঙ্গে সাধু শ্রীদাস নামে জয়ধ্বনি তুলবে।

গোপাল বিগ্রহকে নিয়ে বিরাট শোভা-যাত্রা চলেছে শ্রীদাসের আশ্রমে, নেপেন চৌধুরী পট্টবস্ত্র পরে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে সে মিছিলে চলেছে, তার পিছনে বিশ্বনাথ, সুরভী, ময়না, আরও অনেকে। শ্রীদাস তখন আশ্রমে দাঁড়িয়ে সময়োচিত মধুর সঙ্গীতে গোপালকে আহ্বান করছেন।

আত্ম-সমর্পণ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয়

এই উপন্যাসখানি সুপ্রসিদ্ধ 'তপোবন' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। তৎকালে তরুণ মুসলমান সমাজে ইহার সম্পর্কে যে আলোচনা উঠিয়াছিল, কতিপয় বিশিষ্ট মুসলমান সাহিত্যিকের পত্রে আমি তাহা জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। পত্রগুলির মোটামুটি মর্ম এই যে, মুসলমান সমাজের যে চিত্র আমি 'আত্ম-সমর্পণে' আঁকিয়াছি, তাঁহারা তাহাতে আশান্বিত হইয়াছেন এবং আমি যে শেষ পর্য্যন্ত আখ্যানবস্তুটির সঙ্গতি বজায় রাখিতে পারিব, আমার সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস তাঁহাদের অবশ্যই আছে। আমার এই সাহস ও উদ্যমের জন্য তাঁহারা বাঙ্গালার তরুণ সমাজের পক্ষ হইতে আমাকে অভিনন্দিত করিতেছেন—ইত্যাদি।

দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায়, পত্রগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান আমার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। আজ 'আত্ম-সমর্পণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ায়, তাহারই অবতরণিকায় আমি তাঁহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ জানাইয়া দুটি কথা বলিতেছি,—ইহাই গ্রন্থকারের অন্তরের কথা।

বাঙ্গালার দুইটি সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত পাশাপাশি যে দুইখানি সুবৃহৎ গ্রামের চিত্র এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা একেবারে কল্পনা-প্রসূত না হইতেও পারে। এরূপ গ্রামাঞ্চলের সহিত আশৈশব সংস্রব এবং এইরূপ একটি আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষালয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় দুইটি গ্রামের মধ্যে যোগসূত্র রচনার দর্শক হিসাবে যে অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করা লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল, আলোচ্য গ্রন্থে অতি সন্তর্পণেই তাহার অনুসরণ করা হইয়াছে। সুতরাং যদি ইহাতে আদর্শ তথা যথাযথ সঙ্গতি বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়া থাকি, ভবিষ্যতেও কল্পনার রূপায়িত রচনায় তাহা অক্ষুন্ন থাকিবে। যেহেতু, শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যার অবসান সম্বন্ধে যাঁহারা উচ্চ আশা পোষণ করেন লেখক তাঁহাদেরই মতানুবর্ত্তী। বাঙ্গালার বলিষ্ঠ ও নির্ম্মল সাহিত্যই অদূর ভবিষ্যতে নবীন বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনৈক্যের ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করিয়া মিলনের সেতু রচনা করিবে, এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়াই আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনায় প্রয়াস পাইয়াছি। উপযুক্ত শক্তির একান্ত অভাব বুঝিয়াও মাত্র কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ও সাহসটুকু পাথেয় করিয়াই এই দুর্গম পথে আমি নামিয়াছি। ভরসা এই যে, চলার পথে সহযাত্রীর সংযোগ অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটিয়া থাকে।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
৪২, বাগবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা—৩
শ্যামবাজার সাইড.

আত্ম-সমর্পণ

১

স্কুলের ছুটির পর খাতা বই বগলে করিয়া ছেলেরা বাড়ী ফিরিতেছিল।

অন্যদিন এই সময় ইহাদের কোলাহলে পল্লীপথ মুখরিত হইয়া উঠে, কিন্তু আজ সকল কণ্ঠ সংযত এবং দলটি বিক্ষিপ্ত ও বহুধা বিভক্ত হইয়া মৃদুস্বরে কোনও গুরুতর বিষয়ের গবেষণায় একান্ত ব্যস্ত ছিল।

ইহাদের গবেষণার বিষয় চিত্ত-উপভোগ্য এবং কৌতুকাবহ, একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নয়। তাহার সংক্ষিপ্ত-সার এইরূপ:—

জমিদার-বাড়ীর ছেলে বিশু শুধু বনেদীয়ানার চালে নয়, নিজের গায়ের জোরে ও সমস্ত বিদ্যার ভারে স্কুলের ছেলেদের এ পর্য্যন্ত কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছিল, কোন ছেলে কোন-বিষয়ে কোন-দিন তাহাকে হারাইয়া দেওয়া ত দূরের কথা—তাহার সমকক্ষ হইতেই পারে নাই। কিন্তু আজ এই স্কুলে এমন এক পড়ুয়া আসিয়াছে, একদিনেই যে, লেখাপড়ায় বিশুরই প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও পাঁচটা আঁকের সব কটাই বিশু 'রাইট' করিয়াছিল, নূতন ছেলেটি একটি শুধু ভুল করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়,—রচনায় সে হইয়াছে 'ফার্ষ্ট'; পণ্ডিত মহাশয় পর্য্যন্ত বলিয়াছেন—'বাঃ! খাসা ত!'

অতএব, 'বিশু' ছেলেটির এই একচ্ছত্র প্রভাব এতদিন যাহাদিগকে বিদ্যা-মন্দিরে অবহেলিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা আজ এই নবাগত ছেলেটিকে বিশুর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী সাব্যস্ত করিয়া সাদরে নিজেদের দলে টানিয়া লইয়াছিল এবং এমনই ভাবভঙ্গীর সহিত অনুচ্চস্বরে বিশুর বেয়াদপির কথা ও কাহিনীগুলি তাহাকে শুনাইতেছিল—যাহাতে সেগুলি অদূরবর্ত্তী সেই আলোচ্য ছেলেটির কর্ণে সহসা প্রবেশ না করে।

ছেলেদের এই সতর্কতাটুকু অবলম্বনের এইমাত্র কারণ যে, নূতন ছেলেটির বিদ্যার পরিচয় যদিও তাহাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে, কিন্তু তাহার দেহের শক্তির পরিমাণটুকু এখনও তাহারা নির্ণয় করিতে পারে নাই। অথচ এ সম্বন্ধে বিশুর দুর্ব্বার প্রভাব বহুবার তাহারা অনুভব করিয়াছে; দলের মধ্যে যাহাদের সাহস একটু বেশী, তাহারা প্রত্যেকেই একা একা বিশুর সহিত লড়িতে গিয়া যে মার খাইয়াছিল, তাহা কেহই এখনও ভুলিয়া যায় নাই; গায়ের জ্বালায় ইহার শোধ তুলিতে কয়েকবার দল বাঁধিয়াও তাহারা বিশুর উপর 'চড়াও' করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাকে দাবাইতে পারে নাই। ছেলেটা এমনই দুর্দ্দান্ত ও গোঁয়ার এবং প্রকৃতি তাহার এমনই উগ্র ও দুর্ব্বার যে, মারামারির সময় আগা-পাছা ভাবিয়া সে হাত চালায় না কোনদিন,—কেহ পড়িল কি মরিল, মাথা ফাটিল কি দাঁত ভাঙ্গিল, সে সব দিকে কোন ভাবনাই তাহার থাকে না, সে যেন হারিবে না—এই পণ করিয়াই মরিয়া হইয়া লড়ে, কাজেই বিপক্ষ যোদ্ধৃদল খুনখারাপির ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পিছাইয়া পড়ে;—এমন গোঁয়ার যে ছেলে, তাহাকে আঁটা ত সোজা কথা নয়। অগত্যা এই অঞ্চলের ছেলেরা সকলেই এহেন দুর্দ্ধর্ষ ছেলে বিশুকেই 'চাম্পিয়ান' বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই বিশুর সহিত ইহাদের আশার প্রতীক এই নূতন ছেলেটির শক্তি পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে কিছুতেই ইহারা বিশুকে ঘাঁটাইতে পারে না। বয়স ইহাদের যতই কাঁচা থাকুক ও বুদ্ধিশুদ্ধি পরিপক্ক না হউক, তথাপি এই বয়সেই এইরূপ একটা 'পলিটিক্স' ইহারা খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিল ও তাহার অনুসরণ করিয়াই কচি কচি মাথাগুলি চালাইতেছিল।

নূতন যে ছেলেটিকে দলে পাইয়া পুরাতন ছেলেদের এতটা স্ফূর্ত্তি ও আস্ফালন, তাহার নাম রহিম। কিন্তু নাম লিখাইবার পূর্ব্বে কেহই সাব্যস্ত করিতে পারে নাই যে, ছেলেটি হিন্দু নয়, মুসলমান।

ছেলেটির চেহারা, চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা ও বেশ-ভূষায় তাহাকে হিন্দু বলিয়া ভুল করিবার মূলে এই কারণটুকুই যথেষ্ট ছিল,—যে আনন্দপুর গ্রামে এই স্কুলটি অবস্থিত, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বাহির-আনন্দপুরের সমস্ত অধিবাসীই যদিও মুসলমান, এবং পরিবার 'সংখ্যাও প্রায় সহস্রাধিক' তথাপি সমস্ত গ্রামখানি তোলপাড় করিলেও এমন একটি পরিবারের অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে না—যেখানে শিক্ষার ঈষৎ আলো পড়িয়াছে ও সেই আলোকে পরিবারভুক্ত কেহ বালির বাদামী কাগজের উপর কালি-কলমে বর্ণ-পরিচয়ের বর্ণ কয়টি দাগিবার যোগ্যতাটুকুও অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে। বিদেশের সিঙ্গার-মেসিন এই পল্লীর প্রায় প্রতি 'দলিজে'ই অপরিহার্য্যভাবে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ খানিও এ পর্য্যন্ত এই গ্রামে প্রবেশাধিকার বা আসিবার আহ্বান পায় নাই; প্রয়োজনও হয় নাই। কেন না, কথার অত ভাবিতে না ভাবিতেই ওস্তাগর সাহেবদের দলিজে নাম লিখাইয়া সুচের ছেঁদায় সুতা পরাইতে পারিলেই শিশুরা যদি খানার সংস্থান করিতে পারে, পয়সা খরচ করিয়া পাঠশালায় তাহারা নাম লিখাইতে যাইবে কেন? ঘরের কড়ি দিয়া নায়ে চড়িয়া ডুবিতে যাইবার কি দরকার? সুতরাং, সিঙ্গার মেসিনের চাকার অবিরাম ঘর্ঘর শব্দ ইহাদের চিত্তে আত্মপ্রসাদের একটা একঘেঁয়ে স্পন্দন তুলিলেও, শিক্ষার সংস্পর্শে বিশ্বের প্রাণশক্তির যে উদ্দীপনাময় স্পন্দন—তাহার কোন অনুভূতিই এ পর্য্যন্ত ইহাদের দেহ মন প্রাণ স্পর্শ করে নাই।

কাজেই, রহিম তাহার পরিচয় ও পাঠাভ্যাসের অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, স্কুলশুদ্ধ সকলকেই প্রথমে চমকিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। অবশ্য, পরে তাহার কথাসূত্রে সকলেই জানিবার অবকাশ পায় যে, কলিকাতায় চাঁদনী চকে রহিমের বাবার কাটা-কাপড়ের কারবার, তাহারা বরাবর কলিকাতাতেই মানুষ, সেলাইয়ের কারখানা খুলিবেন বলিয়া তাহার বাবা বাহির-আনন্দপুরে বাড়ী করিয়াছেন। রহিমরা সকলেই এই বাড়ীতে আসিয়াছে। তাহাদের বংশের সকলেই লেখাপড়া শিখিয়াছেন, সেও শিখিবে।

রহিমের এই কাহিনীর পর শিক্ষক মহাশয় স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশে আবেগের সহিত এই মর্ম্মে এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন,—তোমাদের নূতন সহপাঠী এই রহিম ছেলেটিকে দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে, শিক্ষার কি প্রভাব, বিদ্যার সামান্য ছায়াটুকুও মনের ওপর পড়লে মানুষের কত পরিবর্ত্তন হয়, তাকে কেমন সুন্দর দেখায়। ও-পাড়ার দর্জ্জীর ছেলেদের দেখলে তোমরা মুখ ফেরাও, মিশতে চাওনা; তার কারণ, তারা কোনো পুরুষে পাঠশালার ত্রিসীমায়ও আসেনি, বিদ্যার আলো তাদের মনের আঁধারটুকু কাটাতে ত কোনো দিন পারেনি; তাই তাদের ব্যবহার অমন বিশ্রী; মুখে অশ্লীল কথা লেগেই থাকে, ঐটিই হচ্ছে তাদের কথার মাত্রা; এমন কি, আমি, তুমি, আপনি—এসব বলতেও মুখে বাধে, বলবে—মুই, মোর, মোকে, এমনি কত কি! শিক্ষার দীনতা, সাহচর্য্যের অভাব, এদের এখনও সভ্যভাব সংস্রব থেকে পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে দিয়েছে। আর, এদিকেও দেখছ ত রহিমকে, ওদেরই জাত, কিন্তু কত তফাৎ! যেমন চেহারা, তেমন স্বভাব, তেমনই কথাবার্ত্তা, সব দিক দিয়েই চমৎকার। এর কারণ, সৎশিক্ষা, সৎসঙ্গ, সদিচ্ছা। এই তিনটে কথা তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখবে।

ছুটির পর যে সকল ছেলে পরমোল্লাসে রহিমকে দলে টানিয়া লইয়া বিশুর বিরুদ্ধে একটা দল পাকাইতেছিল, তাহারা শিক্ষক মহাশয়ের বক্তৃতার শেষের তিনটি উপদেশকে তাহাদের অবধারিত কার্য্যধারার সংস্রবে শ্রদ্ধা-সহকারেই এইভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, রহিমের মত ছেলের সঙ্গ নিশ্চয়ই সৎ, বিশুকে আচ্ছা শিক্ষা দেওয়াই সৎ এবং দুষ্টদমনের ইচ্ছাটুকুও সৎ। সুতরাং এক সঙ্গে তিনটি সৎকার্য্যেই তাহারা উদ্যোগী হইয়াছিল।

স্কুলে প্রথম দিনটি আসিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়া পড়ায় এবং এতগুলি ছেলে দলপতির সম্মান প্রদান করায়, রহিম মনে মনে খুসীই হইয়াছিল। তাহার ভক্তদের অস্ফুট আলোচনায় সে হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়াই চলিয়াছিল; কিন্তু কথার পীঠে যখন বিশুর বেয়াদপির কথা উঠিল ও এক ভক্ত আর্ত্তস্বরে প্রকাশ করিয়া ফেলিল, এই পথেই একদিন বিশু একটি ঘুসিতে কি করিয়া তাহার দুইটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল,—তখন রহিমের মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল; তাহার মুখ দিয়া একটা

বিস্ময়ের স্বর খুব মৃদুভাবেই বাহির হইল,—সত্যি! সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া তাহাদেরই অগ্রবর্ত্তী দলের মধ্যবর্ত্তী ছেলেটির দিকে চাহিল।

এই দলেই ছিল বিশু,—যাহাকে লইয়া এতগুলি ছেলের এত আলোচনা। বিশু যে একেবারেই একা পড়িয়াছিল, তাহার অবস্থা দেখিয়া একথা বলা চলে না। কেন না, কতকগুলি ছেলে তাহাকেও পরিবেষ্টন করিয়া চলিয়াছিল এবং রহিমকে খাড়া করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে একটা কাণ্ড উহারা বাধাইবে, তাহারই আভাস দিতেছিল। কথার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তীদের দিকে কৌতুক-ভঙ্গীতে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিয়াও দেখিতেছিল।

বিশুর কিন্তু কোন দিকেই আজ লক্ষেপ নাই, সঙ্গীদের কথা তাহার দুইটি কর্ণেই যে ফুটিতেছিল, তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু কোন কথাতেই তাহাকে সায় দিতে দেখা গেল না। সে যেন নিজের মনেই গোঁভরে চলিয়াছে। সর্ব্বজ্যাছারা সহপাঠীরা আর কোনও দিন তাহাকে এমন গম্ভীর হইতে দেখে নাই। তাহার এই গাম্ভীর্য্যের কারণটুকুও তাহারা নির্ণয় করিতে পারে নাই। কি এমন তাহার হার হইয়াছে? আঁকে ত কেহই তাহাকে আঁটিতে পারে নাই, আর এইটিই যখন সব চেয়ে কঠিন বিষয়। রচনায় না হয় রহিম তাহার চেয়ে একটু ভাল লিখিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়াছে—যে মুখ ভার করিয়া থাকিতে হইবে।

কিন্তু এই গম্ভীর-প্রকৃতি অদ্ভুত ছেলেটির এদিনের মনের গতি তাহার চপলমতি সহপাঠীরা নির্ণয় করিতে পারে নাই; পারিলে বুঝিতে পারিত,—'যেখানে অস্ত্রের লেখা, ব্যথাও তথায়।'

যে ছেলেটি চিরদিন শ্রেণীর পুরোভাগে প্রথম স্থানটুকু সদর্পে অধিকার করিয়া আসিয়াছে, কোন বিষয়ে কোন দিন কেহই তাহার সমকক্ষ হইবার স্পর্দ্ধা করে নাই, আজ বাহিরের এক অপরিচিত ছেলে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত, তাহার সহিত যোঝাপড়া করিতে। যে পরীক্ষা আজ তাহাদের মধ্যে হইয়াছে, যদিও সে ঠিক হারে নাই, কিন্তু জিতিতেও ত পারে নাই। ইহাই যে তাহার পক্ষে মরণের অধিক হইয়াছে। রচনায় প্রথম হইয়া তাহার কি অহঙ্কার! আর—

চিন্তার সূত্রটা এইখানেই অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল, সন্নিহিত আর একটি দলের কলকণ্ঠের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে।

অদূরেই আনন্দপুরের বড় রাস্তা; বিশুরা যে রাস্তা ধরিয়া স্কুল হইতে ফিরিতেছিল, সেই রাস্তাটি এইখানে আসিয়া বড় রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। বিশুদের দলটি বড় রাস্তায় উঠিতে না উঠিতেই বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীর দল কোলাহল তুলিয়া অন্যদিকের রাস্তা হইতে তেমাথার ঠিক সংযোগ-স্থলটিতে দেখা দিল। এই দলটিও ছুটির পর বাড়ী চলিয়াছে এবং ছেলেদের ঠিক এই সময়টিতে দলবদ্ধ হইয়া আসিতে দেখিয়া তাহাদের কচি কচি মুখগুলি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দলের প্রথমেই ফুলের মত ফুটফুটে যে মেয়েটি ছিল, সে বিশুকে দেখিয়াই মাথায় লাল রেশমের ফিতায় বাঁধা বেণীটি দুলাইয়া করতালি দিয়া ও তার দিকে ছুটিয়া গেল, উল্লাসের উচ্ছ্বাসে কহিল,—বিশুদা, দু'দিন আমাদের ছুটি; কালও স্কুল নেই, পরশুও নেই।

কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে বালিকা এত বড় উল্লাসের খবরটি দিল, তাহার মুখে উৎসাহের কোন আভাস পাওয়া গেল না। কালো কালো দুইটি আয়ত চক্ষু মেলিয়া বালিকা বিশুর মুখের দিকে চাহিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল, পলকে তাহার সুন্দর মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল; তাহার বিশুদার এমন ম্লান মুখ ত এ সময় সে কোন দিন দেখে নাই!

পশ্চাতের দলটি ইতিমধ্যে ইহাদের অনেকটা নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। এই দলে রহিমের ঠিক পার্শ্বেই ছিল ফুটবিহারী, বিশুর উপর ইহারই আক্রোশ ছিল সকলের চেয়ে বেশী; বিশু একদা ইহারই দুটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। সে রাগ এখনও তাহার পড়ে নাই; সুযোগ পাইলেই বিশুকে সে দংশন করিবার প্রলোভনটুকু ছাড়িত না, আজও ছাড়িতে পারিল না। বালিকাটি করতালি দিয়া কলকণ্ঠে বিশুর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইতেই সে তাহার দিকে আঙ্গুল তুলিয়া রহিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল,—ঐ মেয়েটাকে চিনে রাখ রহিম, ওর নাম হচ্ছে শোভা,—বিশুর হবু বউ!

যে কণ্ঠগুলি এতক্ষণ রুদ্ধ হইয়াছিল, ফুটবিহারীর এই অপ্রত্যাশিত সরস উচ্ছ্বাসে তাহারা যেন সহসা মুক্তি পাইয়া কলহাস্যে পল্লীপথ মুখর করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে শোভার গোলাপের মত সুন্দর মুখখানি অপরাহ্নের তাপক্লিষ্ট স্থলপদ্মের মত লজ্জারক্ত হইয়া

মুসড়াইয়া পড়িল। আর কোন দিকে না চাহিয়া অচপলভাবে বালিকা নিজের দলের দিকেই ফিরিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা প্রবল ঝাঁকুনিতে স্তব্ধ হইয়া সে চোখ তুলিতেই দেখিল, বিশু তাহার বইয়ের দপ্তরটি জোর করিয়াই যেন তাহার হাতের বই খাতার উপর চাপাইয়া দিতে ব্যস্ত, তাহার মুখের সে ভাবটুকু আর নাই, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, চোখের দুটি তারা যেন আকাশের তারার মত চক্ চক্ করিতেছে।

বালিকা দুই হাতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া দুইজনের বই এর দপ্তর কোনো রকমে সামলাইয়া লইল বটে, কিন্তু পরক্ষণে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার বিশুদার যে কাণ্ড সে দেখিল, তাহাতে নিজেকে সামলাইয়া রাখা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

বিশু ইতিমধ্যেই ঘুসি পাকাইয়া ছুটবিহারীর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি অব্যর্থ আঘাত দিয়াছে যে, তাহার নাক দিয়া রক্তের ধারা ছুটিয়াছে ও সে রক্তে উভয়ের গায়ের জামা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

একটা তীব্র আর্তনাদ তুলিয়া ছুটবিহারী মাটির উপর লুটাইয়া পড়িতেই দলের প্রায় সকলেই সভয়ে তফাতে হটিয়া গেল। ছুটবিহারীর দেহের রক্ত তাহার নাক দিয়া বাহির হইতেছে দেখিয়া বিশুর গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, এমন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং ভূলুণ্ঠিত ছুটবিহারীর চোয়াল লক্ষ্য করিয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার মুষ্টি উদ্যত করিতে দেখি। সকলেই শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু এই আঘাতটি ছুটবিহারীর বদনখানি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই রহিম অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতায় বিশুর উদ্যত হাতখানি তাহার দুইটি সবল বাহুর সংযুক্ত মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—হচ্ছে কি।

এই অপ্রত্যাশিত অথচ একান্ত আকাঙ্ক্ষিত দৃশ্যটি ছেলেদের মনে একটা আগ্রহপূর্ণ উদ্দীপনার সঞ্চার করিল বটে, কিন্তু মেয়েগুলি ভয়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আর, ছুটবিহারীও ঠিক এই সময় কোঁচার খুঁটে নাকের রক্তধারা মুছিতে মুছিতে রহিমের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাঙা গলায় কান্নার সুরে আবার তুলিল,—রহিম ভাই, তোমাকে বন্ধু বলেছি, যদি বিশের হাতখানা আজ মুচড়ে ভেঙে না দাও ত অতি বড় দিব্যি তোমায় রইল।

শোভার হাত হইতে খাতা বই রাস্তার উপর পড়িয়া গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সরোদনে চীৎকার তুলিল,—ও বিশুদা, তুমি চলে এসো, তোমার পায়ে পড়ি বিশুদা, চলে এসো।

ছুটবিহারীর নাকে প্রথম আঘাত ও রক্তপাত এবং বিশুর দ্বিতীয় আঘাতের প্রয়াস ও তাহার উদ্যত হাতখানি দুইহাতে ধরিয়া রহিমের বাধা দিবার সঙ্গেই পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ঘটিয়া গেল।

হঠাৎ এইভাবে বাধা পাইয়া বিশু প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল যে ছেলেটির সম্বন্ধে তাহার সমস্ত মনটাই আজ বিষাইয়া রহিয়াছে, সে যে এ সময় সহসা উপরপড়া হইয়া তাহাকে রুখিবে, ইহা সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু অকস্মাৎ এই ভাবে বাধা পাইয়া সে বুঝিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছুটবিহারী নয়, স্কুলের আঁক ও রচনার পরীক্ষা অপেক্ষা এখানকার পরীক্ষা আরও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

রহিমের পশ্নের কোন উত্তর না দিয়া জ্বালাময় দৃষ্টিতে সে মুহূর্তের জন্য তাহার মুখের দিকে চাহিল, পরক্ষণেই হাতখানিকে মুক্ত করিয়া লইতে প্রবল বেগে একটা ঝাঁকুনি দিল। কিন্তু হাত মুক্ত হইল না। বিশুর সর্ব্বাঙ্গে তখন বিষের জ্বালা ধরিয়াছিল, সে স্পষ্টই বুঝিতেছিল, যাহারা দূরে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে ইহা দেখিতেছে, তাহাদের কেহ যদি এই ভাবে তাহার হাত ধরিত ও সে একটা ঝাঁকুনি দিত, তাহা হইলে সে সঙ্গে সঙ্গে ঠিকরাইয়া রাস্তার খাতে গিয়া পড়িত।

রহিমও মনে মনে বুঝিতেছিল, দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে হাতখানি সে দুই হাতে মুষ্টিবদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে অধিকক্ষণ আয়ত্ত করিয়া রাখা কতটা সম্ভবপর। সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীকে একেবারে কাবু করিতে ধৃত হাতখানিতে সজোরে মোচড় দিল।

বিশুর মুখে ক্লেশের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—হাত ছাড়বে না?

রহিম দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল,—না।

বিশু কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়া আদেশের ভঙ্গীতে কহিল,—এখনো বলছি ছাড়ো।

রহিম কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া উত্তর দিল,—ছাড়তে পারি, যদি দিব্যি কর, ওর গায়ে আর হাত তুলবে না।

প্রস্তাবটা শুনিয়াই বিশু জ্বলিয়া উঠিল, কোন

উত্তর দিল না; কিন্তু এমন জোরে আর একটা ঝাঁকুনি দিল যে, রহিম সে বেগ সামলাইতে পারিল না, বিশুর হাত ছাড়িয়া দিয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু পরক্ষণেই উঠিয়া নিজের আসন্ন বিপদটুকু অনুমান করিয়া কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

বিশু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

শোভা এই সময় পিছন হইতে বিশুর জামার পশ্চাদ্ ভাগ টানিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে মিনতির সুরে কহিল,—আবার কেন এগোচ্ছ বিশু দা, মিটে ত গেল; দোহাই তোমার, আর মারামারি ক'র না রাস্তায়—

কিন্তু এ সময় বিশুদা তাহার কথায় কান দিবার পাত্রই বটে। এক ঝটকায় জামাটা ছাড়াইয়া লইয়া শোভার মুখের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ করিয়াই সে সক্রোধে মুখখানা ফিরাইয়া লইল।

মেয়েটির ম্লান মুখ ও অশ্রুভরা এক জোড়া অপূর্ব চক্ষুর উপর রহিমও ঠিক এই অবসরে তাহার দুই চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সহসা শিহরিয়া উঠিল; কে যেন তাহার চক্ষুপল্লবের উপর অদৃশ্য কোমল করের অতি মধুর পরশ দিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, এই মেয়েটি যেন তাহার অতি আপনার জন, ইহার সহিত যেন বহুদিনের তাহার পরিচয়, কতদিন কতবার, কত পরিচিত স্থানেই সে ইহাকে দেখিয়াছে! কিন্তু কোথায় তাহা সহসা সে নির্ণয় করিতে পারিল না। মেয়েটির মুখের মধুর কথা শুনিয়া, তাহার চক্ষুপ্রান্ত অশ্রুভারাক্রান্ত দেখিয়া, সমবেদনায় এই ভাবপ্রবণ ছেলেটির কোমল চিত্তখানি দুলিয়া উঠিল; স্থান, কাল ও অবস্থা ভুলিয়া স্নেহাতুর কণ্ঠে সে কহিল,—খুকী, তুমি বাড়ী যাও।

খুকী দুই চক্ষুর দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল করিয়া এই অপরিচিত ছেলেটির দিকে চাহিল, তাহার দৃষ্টি যেন অক্ষর হইয়া তাহাকেও অনুরোধ জানাইল,—তুমিও তা হলে মারামারি করবে না বল?

রহিমের প্রায় সম্মুখে গিয়াই বিশু রূঢ় কণ্ঠে কহিল,—খুকীর ভাবনা ভাবতে হবে না তোমাকে, নিজের ভাবনাই আগে ভাব।

রহিম প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বিশুর মুখের দিকে চাহিল।

বিশু কহিল,—তোমার সঙ্গে ত আমার ঝগড়া বাধে নি, তবে তুমি আমার হাত ধরলে কেন?

রহিম উত্তর দিল,—তুমি ওকে মারছিলে তাই।

বিশু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—ও দোষ করেছিল, তাই শাস্তি দিচ্ছিলুম, তুমি বাধ দেবার কে?

রহিম কহিল,—ওকে শাস্তি দেওয়া বলে না, বরং বলা চলে—মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া। আমি মানুষ, তাই বাধ দিয়েছিলুম।

বিশু কহিল,—মার খেয়েও ও ছেলেটা মাপ চায়নি, তাই আবার ঘুঁসি তুলেছিলুম; চাইলে, তুলতুম না। আর বছর ওর দুটো দাঁত ভেঙে দিই, সে দাঁত দুটো আবার উঠেছে। আজ ওর নাক ভেঙেছি, এবার দাঁত দুটোও ভেঙে দেব,—যদি না মাপ চায়।

কথা কয়টি জোরের সহিত বলিয়া বিশু রহিমের পাশ দিয়া অদূরবর্ত্তী দুর্টাবহারীর দিকে ছুটিল। কিন্তু রহিম সঙ্গে সঙ্গে সলম্ফে বিশুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাধা দিবার ভঙ্গীতে কহিল,—না, তুমি ওর গায়ে হাত তুলতে পারবে না—কিছুতেই।

এরূপক্ষেত্রে বিশুর হঠকারিতার প্রকাশ স্বাভাবিক, কিন্তু আজ তাহার আচরণে সংযমের দৃঢ়তাই প্রকাশ পাইল। সে ক্ষণকাল রহিমের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার পর কহিল,—হঠাৎ তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়, এ আমার ইচ্ছা নয়; কিন্তু দেখছি তুমি ঝগড়া না বাধিয়ে ছাড়বে না

রহিম কহিল,—তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। ঝগড়া বাধাতে আমিও চাই না, কিন্তু তুমি যে আমার বন্ধুকে কুকুরের মত ঠেঙাবে, তা হবে না।

বিশু কথাটা শুনিয়া ক্রুদ্ধভাবেই কহিল,—আমার যা ইচ্ছা, তা আমি করব; কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, আমি তা বুঝি।

রহিম একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কহিল,—তুমি শুধু মন্দটাই বোঝ।

বিশুও সশ্লেষে প্রত্যুত্তর দিল,—তাহলে এখনও তুমি এরকম খাড়া থাকতে না।

রহিম বিকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—কি করতে?

বিশু সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিল,—আমার এই হাতখানা তোমার দুখানা হাত দিয়ে যখন চেপে ধরেছিলো, মন্দ ইচ্ছা মনে থাকলে, এই বাঁ হাতখানা চালিয়ে ঐ দুটোর মত তোমার নাকটাও ভেঙে দিতে পারতুম।

মৃদু কণ্ঠে রহিম জিজ্ঞাসা করিল,—তাওনি কেন? দিলেই ত পারতে।

বিশু এবার দৃপ্তস্বরে উত্তর দিল,—সেটা ঠিক নয়—মশায়,—তাই দিই নি। একজনের দুটো হাতই যখন জোড়া, তখন তার মুখের ওপর ঘুসি চালানো কি উচিত? তাই চুপ করেছিলুম।

রহিম কিছুকাল স্তব্ধভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল, এই ছেলেটির সম্বন্ধে সে যে সব কথা শুনিয়াছে, ইহাকে যতটা নীচ ও নৃশংস সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে, এ ত ঠিক তাহা নহে।

বিশু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিরুত্তর দেখিয়া আর কথা কহিল না, তাহাকে অতিক্রম করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু রহিম তৎক্ষণাৎ তাহার হাত দুইখানা প্রসারিত করিয়া বিশুর অগ্রগমনে পুনর্বার বাধা দিল।

রহিমের পশ্চাদ্ভাগে প্রয়োজন মত দূরবর্ত্তিতা বজায় রাখিয়া আহত ছুটবিহারী ও তাহাদের এই দলের অন্যান্য সঙ্গীরা একটা সংঘর্ষের প্রতীক্ষায় ছিল। দুর্ব্বার ক্ষুধা এক্ষণে অদম্য আগ্রহ ও উদগ্র কৌতূহলে পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ, বাড়ী ফিরিবার এই সরু ও সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি অধিকার করিয়া দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দণ্ডায়মান। রাস্তার দুই পার্শ্বে জলপূর্ণ গভীর খাত, অগ্রসর হইবার উপায়ও ছিল না।

এই সঙ্কীর্ণ পথটি আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছিল রহিম; হাত দুখানি প্রসারিত, মুখে দৃঢ়তা। বিশু বুঝিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কিছুতেই তাহাকে ছুটবিহারীর কাছে ঘেঁসিতে দিবে না, মারা ত পরের কথা। অথচ, সে যদি এ চেষ্টা ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে তাহারই হার সাব্যস্ত হইবে। সবাই হাসিয়া হাততালি দিয়া বলিবে—দুয়ো, বিশু!

মনে মনে কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়াই বিশু সহসা তাহার গায়ের জামাটা সজোরে টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়া অনতিদূরে শোভা যেখানটিতে দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে ছুঁড়িয়া দিল; পরক্ষণে কোঁচাটি কাছার দিকে গুঁজিতে গুঁজিতে দুই চক্ষু পাকাইয়া রহিমের দিকে চাহিয়া কহিল,—তাহলে এসো, তোমার সঙ্গেই আগে বোঝাপড়া হয়ে যাক।

রহিমও বুঝিয়াছিল, যে রাস্তায় তাহাকে ঘটনাচক্রে দাঁড়াতে হইয়াছে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত একটা বোঝাপড়া না করিয়া তাহারও ফিরিবার উপায় নাই। এই বয়সেই নিজের শক্তি ও সাহস সম্বন্ধে তাহার একটা অভিমান ছিল, সুতরাং বিশুর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা তাহার পক্ষেও অসম্ভব। সেও তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিয়া মালকোঁচা আঁটিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে ফিরিল।

সমবয়স্ক, সমভাবে সুশ্রী, সুন্দর স্বাস্থ্যপুষ্ট, সুগঠিতকায়, প্রায় সমতুল্য আকৃতি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কিশোর শক্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় মুখোমুখি দণ্ডায়মান; অপূর্ব্ব তাহাদের দেহভঙ্গী, অপরূপ উভয়ের জয়াশাদৃপ্ত মুখ ও অতি সতর্ক দুই জোড়া চক্ষুর প্রদীপ্ত দৃষ্টি। সহসা দেখিলেই মনে হয়, যেন একই বংশের দুই সহোদর ভাই রেষারেষি করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামিয়াছে।

প্রায় সকলেরই মুখে ও চক্ষুতে আগ্রহ উদ্দীপিত, বড় রাস্তা ধরিয়া এই সময় যাহারা গঞ্জে গমন করিতে যাইতেছিল এবং ধানের মোট মাথায় করিয়া ফিরিতেছিল তাহারাও সারি বাঁধিয়া এই দুইটি ছেলের 'লড়াই' দেখিতে দাঁড়াইয়াছে। ছেলেরা ক্লাসে 'পলাশীর যুদ্ধ' পড়ে, সুতরাং তাহাদের উদ্বেলিত মনে দ্বিধা জাগিতেছিল,—কি হয়, কি হয়, রণে, জয়-পরাজয়!

শুধু বালিকা শোভার মুখে উদ্দীপনার কোনো আভাই পড়ে নাই, বরং তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া ভাবনায় চিন্তায় আশঙ্কায় তাহার মুখের স্বাভাবিক দীপ্তিটুকুও বুঝি নিভিয়া গিয়াছে। এই অপ্রীতিকর ঘটনাটা কিছুতেই তাহার পছন্দ হইতেছিল না, অথচ ইহাতে বাধা দিবার মত তাহার ত কোনো সাধ্যই নাই! সে ত তাহার বিশুদাকে চেনে এবং মেজাজটি যে তাহার কি প্রকৃতির, তাহা জানিতেও ত বাকি নাই! কিন্তু ঐ নূতন ছেলেটি কে? বিশুদার উপরেই বা ওর অত রাগ কেন? যদি বিশুদা সত্যই আজ হারিয়া যায়, ঐ ছেলেটির সঙ্গে জোরে না পারে!—সহসা মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া বালিকা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল এবং ত্রস্তা কুরঙ্গীর মত ক্ষিপ্রগতিতে বিশুর একখানি হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল,—আমি তোমাকে লড়তে দেবনা বিশুদা, কিছুতেই না।

এক সঙ্গে একই মুহূর্ত্তে তিন যোড়া চক্ষুর অপূর্ব্ব দৃষ্টি সংঘাত। বালিকার মুখের নিষ্প্রভ

ভাবটুক এখন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, উৎসাহে প্রদীপ্ত দুই চক্ষুর দীপ্তির সহিত অস্তমিত সূর্য্যের রক্তিম আভাটুকুর সংযোগে তাহার মুখখানি যেন ঝলমল করিতেছে।

শোভার এতটা বাড়াবাড়ি বিশু প্রত্যাশাই করে নাই, যুদ্ধের সূচনাতেই একি বিভ্রাট! সে তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া প্রথমেই বিঘ্ন ঘটাইতে চায়! বিরক্তিকুটিল দৃষ্টিতে সে শোভার মুখের দিকে চাহিতেই তাহাদের চোখোচোখী হইল; বিশু দেখিল, শোভার চোখে এখন শুধু মিনতি নয়—আদেশের ভঙ্গীতে অপূর্ব্ব দীপ্তি তাহাতে। পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুগ্ধ দৃষ্টি তাহাকে পলকে উগ্র করিয়া তুলিল। সেও শোভার সুন্দর মুখখানির দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়াছিল। বিশুর চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে শোভার চক্ষুদুটিও বিস্ফারিত হইয়া এই অপরিচিত নূতন ছেলেটির মুখের দিকে পড়িয়াছিল।

একান্ত অবজ্ঞাসহকারে বিশু নিজের হাতটি ছাড়াইয়া লইবে, এমন সময় অদূরবর্ত্তী ছেলের দল সহসা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সভয়বিস্ময়ে দেখিল, অকুস্থলে শিক্ষক মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত!

দুই প্রতিযোগীর কর্ণে শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নটি ঠিক মেঘগর্জ্জনের মতই শুনাইল,—কি হচ্ছে এখানে শুনি?

শোভা ইতিমধ্যে বিশুদার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া গিয়াছিল এবং বিশু ও রহিম উভয়েই রণবেশ যতটুকু সম্ভব সংবরণ করিয়া লইতে-তৎপর। কিন্তু তাহাদের কৈফিয়ৎ দিবার পূর্ব্বেই রহিমের পক্ষেই ঝুঁকিয়া একজন ব্যাপারটার একটা মনগড়া আখ্যান শুনাইয়া দিল এবং প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করিল রক্তাক্ত-দেহ নুটবিহারীকে। দোষটা যেন সমস্তই বিশুর, রহিমের উপর হিংসা করিয়া সে তাহাকে পথে মারধর করিতে যায়, নুটু বাধা দেওয়ায় গোঁয়ার বিশুটা ঘুসি মারিয়া তাহার নাক ভাঙিয়া দিয়াছে।

শিক্ষক মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক আরক্ত দুই চক্ষু অস্বাভাবিকরূপে গাঢ়তর রাগরক্ত করিয়া বিশুর দিকে চাহিলেন, তাহার পর তর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—বিশু, এ স্বভাব তোমার কিছুতেই গেল না! গেল বছর তুমি ওর দাঁত ভেঙে দিয়েছিলে, তার শাস্তি বোধ হয় ভুলে গেছ,

আবার আজ এই ডাকাতে কাণ্ড বাধিয়েছ! কাল এর রীতিমত বিহিত হবে জেনো। আমি তোমাকে রাষ্টিকেট করব।

সকলেই স্তব্ধ, শিক্ষক মহাশয়ের মুখের উপর কথা কহিবার সাধ্য কোনো ছেলেরই ছিল না।

প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর বিশুর বলিবার আর কিছু নাই। কিন্তু গোড়ার দিকে তাহার বিরুদ্ধে সনাতন নামে ছেলেটি যাহা যাহা বলিয়া গেল, তাহা যে হুবহু মিথ্যা, সে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলিবার জন্য মুখটি তুলিয়াছে, এমন সময় সে অবাক হইয়া দেখিল, তাহারই পরম প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটী শিক্ষক মহাশয়ের পায় সান্নিধ্যে গিয়া বেশ সপ্রতিভভাবেই বলিতেছে,—ও ছেলেটি বিশুর নামে মিথ্যে বলেছে, স্যর আমার ওপর বিশু হিংসে করেছে কি না জানি না, কিন্তু তাই নিয়ে মারধর ত করে নি; দোষ ছিল গোড়াতে ঐ ছেলেটিরই—বিশু যার নাক ভেঙে দিয়েছে।

রহিমের এই এজেহার ঘটনার সহিত বিচার-পন্থা অন্য খাতে ফিরাইয়া দিল। সকলে চমৎকৃত, কতকগুলি ছেলের মুখ অবশ্য শুকাইয়া গেল। শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নে রহিম ঘটনাটির আগাগোড়া সমস্তই ঠিক বর্ণনা করিল নিজের কথাও লুকাইল না।

শোভারও ডাক পড়িল এবং তেমাথার উপর বড় রাস্তায় যে সকল বালিকা এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকেও সাক্ষ্য দিতে হইল। তাহাদের কথায় রহিমের এজেহার সত্য বলিয়া প্রকাশ পাইল। তথাপি নিষ্ঠুর প্রহারের জন্য বিশুকে শিক্ষক মহাশয় কঠোর তিরস্কার করিলেন।

আহত নুটবিহারীর নাকের রক্ত অগৌণে ধুইয়া একটা টোটকা ঔষধের ব্যবস্থা দিয়া তিনি জনতা ভাঙিয়া দিলেন এবং তৎসঙ্গে এই মর্ম্মে একটা নূতন ঘোষণাও জারি করিলেন, যে, অতঃপর পথে যদি এ রকম ব্যাপার ঘটে, যে যে ছাত্র তাতে জড়িত থাকবে, তাদের রাষ্টিকেট করা হবে। কেউ কোনো দোষ যদি করে, সে কথা স্কুলে আমাকে জানাবে, আমি বিচার করব। নিজেই যে অন্যের বিচার করতে যাবে, আমার স্কুলে তার ঢোকবার অধিকার থাকবে না।

এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের একটি উপরি-পাওনার কাজ ছিল। সেটি বাহির-আনন্দপুরের দর্জ্জিশালার হিসাবের খাতা পত্র

লেখা। প্রত্যহ এই সময়টিতে তিনি ঐ অঞ্চলে যাইতেন। কোনো একটি বিশিষ্ট ওস্তাগরের গলিতে তাঁহার দপ্তরখানা বসিত এবং পাড়ায় যাহাদের কারখানা আছে, তাহারা সেই স্থানে সমবেত হইয়া লেখাপড়া সংক্রান্ত কাজগুলি সম্পন্ন করাইয়া লইত।

কর্ম্মস্থানের উদ্দেশ্যেই শিক্ষক মহাশয় এই সময় এই রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহাতেই অনিবার্য্য সংঘর্ষটির এমনভাবে সমাধান সম্ভব হইয়াছিল।

শাস্তির পর তিনি রহিম ও অন্যান্য ছেলেদের অগ্রবর্ত্তী করিয়া দিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

শোভা রাস্তায় ছড়ানো বিচ্ছিন্ন বইগুলি এক এক খানি করিয়া গুছাইয়া দপ্তরে বাঁধিতেছিল। হাতের এই কাজটি শেষ হইতেই সে উঠিয়া বিশুর দিক চাহিল। বিশু তখন নিক্ষিপ্ত জামাটা তুলিয়া লইয়া তাহার ধূলা ঝাড়িয়া গায়ে চড়াইবার উপক্রম করিতেছিল। শোভা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মর্ম্মস্পর্শী স্বরে ডাকিল,—বিশুদা।

শোভার এই কোমল আহ্বান যে বিশুর মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, তাহার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না; জামাটি গায়ে চড়াইয়া দুই হাতের ঝাপটায় তাহার ধূলাময়লা নিঃশেষ করিতেই সে তখন অখণ্ড মনঃসংযোগ করিয়াছিল; অথচ, ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে এতটা ব্যগ্র হইতে শোভাও তাহাকে আর কোনও দিন দেখে নাই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই সে বিশুর এই নিষ্প্রয়োজন প্রয়াস লক্ষ্য করিল, তাহার পর সহসা একটু হাসিয়া কহিল,—ওতে ধুলো ত আর নেই বিশুদা, মিছিমিছি ওটাকে ঠ্যাঙাচ্ছ যে।

মুখখানা গম্ভীর করিয়া বিশু শোভার দিকে চাহিল, কথাটা সে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করে নাই; কিন্তু অতঃপর তাহাকে আর জামার উপর হাতের ঝাপটা দিতে দেখা গেল না, একখানা হাত পীঠের দিকে হেলাইয়া, অন্য হাতখানি শোভার দিকে তুলিয়া সে রুক্ষস্বরে কহিল,—আমার বই দে।

বিশুর বইগুলি শোভা পূর্ব্বেই গুছাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রসারিত হাতখানির উপর তুলিয়া দিল। বইগুলি লইয়াই বিশু গোঁভরে অগ্রসর হইল।

শোভা ছল-ছল চক্ষুতে বিশুর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল, তাহার পর অভিমানের সুরে কহিল,—বেশ ত তুমি বিশুদা, আমাকে একলা ফেলে চললে!

বিশু ফিরিয়া চাহিল, বিকৃতকণ্ঠে কহিল,—আ—হা—কচি খুকি, পথ চেনেন না—

কথাটা শোভার বুকে বাজিল, আর্ত্তস্বরে কহিল,—তা বলবে বই কি! ইল্লীর ঢুমঢুমুনী বিল্লীর ঘাড়ে,—এ ত জানা কথা—

দুই চক্ষু পাকাইয়া বিশু কহিল,—কি বললি?

শোভা নির্ভয়ে কহিল,—কেন, বুঝতে পারনি? সেই ছেলেটার ওপর যত কিছু রাগ এখন আমার ঘাড়েই চাপাচ্ছ, আমিই যেন যত নষ্টের গোড়া!

দৃঢ়স্বরে বিশু কহিল,—ঠিকই ত, তুই পোড়ারমুখী যদি গেজীর মত ছুটে এসে কথা না বলতিস, তাহলে হুটো ও কথা বলতে পারত?

শোভা বিস্ময়ের সুরে কহিল,—বা-রে, আমি ছুটির কথাটা বলেছিলুম বলেই যত দোষ হল! হুটোর কথা শুনে তুমিই বা অমন করে ক্ষেপে উঠলে কেন? না হয় সে ঠাট্টাই করেছিল, কিন্তু সে ত সত্যি নয়; তুমি তার নাকটা ভেঙে না দিলেই পারতে।

মুখখানা ভ্যাঙাইয়া বিকৃত করিয়া বিশু কহিল,—ভেঙে না দিলেই পারতে!—যেমন তোর বুদ্ধি আর বিদ্যে, তেমনি বলবি ত; সে আমাকে ঠাট্টা করবে সবার সামনে, আর আমি তাই শুনে চুপ করে স'য়ে যাব;—আমি ঠিক করেছি—

শোভা কহিল,—তাহলে আমাকে কেন খোঁটা দিচ্ছ! আমি কি করেছি! আমার অতি দিব্যি রহিল, আর যদি আমি কখনও তোমার কথায় থাকি—

শেষের কথাগুলি অশ্রুর আবেগে উচ্ছ্বসিয়া উঠিল। এতটা হইবে বিশু ভাবে নাই, শোভার কথার খোঁচা সে সহ্য করিলেও তাহার চক্ষুর অশ্রু তাহাকে কাতর ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ সে তাহার কণ্ঠের স্বর সমবেদনায় গাঢ় করিয়া কহিল,—অমনি, মেয়ের কান্না আরম্ভ হল! কি এমন আমি তোকে বলেছি! আচ্ছা, আমি না হয় মাপ চাইছি, আর তোকে কখনও কিছু মন্দ কথা বলব না, চল ভাই, বাড়ী যাই, যেতে যেতে সব কথাই তোকে বলি।

বালিকা মনের ব্যথা ভুলিয়া গেল, বড় বড় দুইটি চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ছেলেটির মুখের উপর

তুলিয়া কহিল,—দেখ দিখিনি, এবার কেমন লক্ষ্মী ছেলে হলে ;—চলো।

পরক্ষণেই ইহারা ছুটিতে পাশাপাশি আনন্দপুরের বড় রাস্তা ধরিয়া কথা কহিতে কহিতে বড়বাড়ীর অভিমুখে চলিল।

২

প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিভিন্ন পরগণার অন্তর্গত বহুসংখ্যক গ্রামের অধিবাসিগণ আনন্দপুরের বড়বাড়ীর সহিত নানা সূত্রে পরিচিত। দীর্ঘকাল হইতেই এই পরিচয় অত্যাশ্চর্য্য বস্তুর ন্যায় এমনই প্রসিদ্ধি পাইয়াছে যে, বর্ষীয়ান দাদামহাশয় ও বর্ষীয়সী ঠাকুমা-দিদিমারা বালকবালিকাগণকে রূপকথা শুনাইবার সময় সাতমহল রাজপুরীর প্রসঙ্গ উঠিলে, আনন্দপুরের বড়বাড়ীর উপমা দিয়া থাকেন। এ উপমা যে এককালে কোনও অংশেই নিরর্থক ছিল না, বর্ত্তমানের বড়বাড়ীর জরাজীর্ণ অবস্থা হইতেও তাহার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। সাতখানা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ সমন্বিত দুর্গতুল্য সুউচ্চ সুবিশাল অট্টালিকা, বাহির মহলের শ্রেণীবদ্ধ অতিকায় স্তম্ভযুক্ত সুদীর্ঘ পূজার দালান, প্রকাণ্ড অঙ্গন ও চকমিলান মনোরম চর্ম্ম্য, মর্ম্মরময় ভীতিপদ দেউড়ী ও সম্মুখবর্ত্তী বহুদূরব্যাপী ছাতা, সারি সারি গগনস্পর্শী শিবমন্দির সংলগ্ন সুগভীর দীর্ঘিকা, উদ্যানের পর উদ্যান এবং এই বিরাট বাস্তুর পরিবেষ্টনে সুপ্রসর পরিখা প্রভৃতি আনন্দপুর গ্রামখানির অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়া বড়বাড়ীর যে অনবদ্য প্রতিষ্ঠাকে স্থায়ী ও কালজয়ী করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস, কালের প্রখর প্রহারে তাহার বাহ্য সৌষ্ঠব অনেকটা শ্রীহীন হইলেও আভ্যন্তরীণ সুষমা এখনও সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া পড়ে নাই ; অপূর্ব্ব অতুলনীয় শোভা সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্যের এই অবশেষটুকুই এখনও বঙ্গশ্রীর অতীত অসংখ্য গৌরবময় স্মৃতির প্রতীকরূপেই যেন তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

এ-হেন বড়বাড়ীর যিনি বা যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাদের কথা ও কাহিনী এখন উপকথায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত বংশ-তরুর শাখা-প্রশাখা ও তাহাদের বিভিন্ন অংশে আলম্বিত বিবিধ লতিকা পল্লবিত হইয়া এমন দৃঢ়তার সহিত এই বাড়ীটির সর্ব্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইদানীং সর্ব্বধ্বংসী কালপুরুষের কঠোর হস্তের ঘন ঘন প্রহারও ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এমন কি, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বড় বাড়ীর সংযুক্ত মহলের মধ্যবর্ত্তী খিলান ফাটিয়া যখন একটা ভয়াবহ ফাটলের সৃষ্টি করিল, তখন পল্লীর সকলেই ভাবিয়াছিল, এই দুইটি মহলার বাসিন্দাদের এবার বুঝি পথে দাঁড়াইতে হয়! কিন্তু সপ্তাহ মধ্যেই দেখা গেল, ফাটলগুলি রীতিমত দাগরাজি করিয়া পুনরায় বাসোপযোগী করা হইয়াছে ; আর একটা ভূমিকম্পের আবর্ত্ত না আসা পর্য্যন্ত তাঁহারা এখন নিশ্চিন্ত।

আনন্দনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক শক্তিমান ভূস্বামী তাঁহার একান্ত অনুরক্ত তিন অনুজের সহযোগিতায় বর্গীবিপ্লবের সময় এই বড়বাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারই নামানুসারে সমগ্র গ্রামখানি আনন্দপুর নামে অভিহিত হয়। আনন্দনাথ বাঘকে বশীভূত করিবার ও সাপের মুখে চুমা খাইবার বিবিধ কৌশলই জানিতেন। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দরবারে গিয়া নবাবের পরম সহায়করূপে যেমন রাজকীয় সম্মান পাইতেন, পক্ষান্তরে নবাবের কালস্বরূপ বর্গী-সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতের ছাউনীতে দর্শন দিয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ মারাঠা ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাটুকুও আকর্ষণ করিতেন। ইহার ফলে আনন্দপুরের বড়বাড়ীর উপর কোনও দিন বর্গীর লুণ্ঠনস্পৃহা উদগ্র হইয়া উঠে নাই, বরং লুণ্ঠিত প্রচুর ধনরত্ন গচ্ছিতরূপে বড়বাড়ীর কোষাগারে রক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি যে কোনও দিন নির্গত হইবার পথ পাইয়াছিল, এমন কথা শুনা যায় নাই। এই সূত্রে এমন কিংবদন্তীও শুনা যায় যে, যদি নবাব আলিবর্দ্দী বুদ্ধি খাটাইয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে তাঁহার দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া সুকৌশলে কোতল না করিতেন, তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ই নবাবের শিরশ্ছেদ করিয়া শিরোপাস্বরূপ আনন্দনাথকেই বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়া যাইতেন। কিন্তু বিচক্ষণ আনন্দনাথ অবশ্য কালনেমীর মত দুরাশার জাল রচনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন না, গচ্ছিত বিপুল অর্থরাজির অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, এরূপ বড়বাড়ীর প্রতিষ্ঠা করিয়াই সানুজ আনন্দনাথ নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইহার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত বিপুল ভূসম্পত্তি অর্জন

করিতে এমন কৌশলে একই সঙ্গে মাথার বুদ্ধি ও বাহুর শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, বর্গী-বিপ্লবের বিভীষিকা তাহাতে কোনওরূপ আন্দোলন তুলিবার অবকাশ দেয় নাই।

নবাবী আমলের সেই বড়বাড়ী এবং সাম্বুজ আনন্দনাথের বংশধরগণ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া নানারূপ স্বত্বের প্রভাবে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগসূত্র এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে বলিয়াই এবাড়ীর উপর সর্ব্বধ্বংসী কালের পুনঃপুনঃ আঘাত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশস্থলেই দেখা যায়, পুরাকালের গগনচুম্বী সৌধসোপম কত শত অট্টালিকা কালক্রমে পরিত্যক্ত হওয়ায় ভগ্নস্তূপে ও পশুর বাসায় পরিণত হইয়াছে। কিন্তু আনন্দপুর স্বাস্থ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ ও নদীমাতৃকা পল্লীরূপে প্রকৃষ্ট বলিয়া অথবা বড়বাড়ীর ঘরগুলি এখনও বাসোপযোগী ও তাহার অধিবাসীরূপে পরিচয় দেওয়াও গৌরবজনক বলিয়া এই সুবৃহৎ বাড়ীর কোনও কক্ষই আজ পর্য্যন্ত জনশূন্য অবস্থায় একটি দিনও পড়িয়া থাকে নাই বা নবাবী আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন একটি সন্ধ্যা বড়-বাড়ীর কোনও কক্ষেই নীরবে প্রবেশ করিয়া তাহার অসিত ছায়া বিকাশ করিতে পারে নাই,—সঙ্গে সঙ্গেই প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখা ও তৎসহ শতাধিক শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া তাহার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

বর্ত্তমানে এই শতাধিক গৃহস্থই নানাসূত্রে এই বড়বাড়ী ও তাহার অন্তর্গত বিপুল জমিদারীর মালিক। কিন্তু মালিকেরা সকলেই যে বংশপতি সাম্বুজ আনন্দনাথের গোত্রানুসারে মুখুটি, তাহা বলা চলে না; বংশপতি চারি ভ্রাতার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি-ক্রমে যেমন বংশলতা পল্লবিত হইয়াছে, দৌহিত্র-প্রদৌহিত্রাদি অনুসারে শাখা-প্রশাখাও সেই পদ্ধতিতে বড়বাড়ী ও তৎসংশ্লিষ্ট ভূসম্পত্তির উপর অধিকার সাব্যস্ত করিয়াছে।

বিশু বা বিশ্বনাথ নামে যে ছেলেটির কথা আমরা এই উপন্যাসের প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি, সে এই মুখুটি বংশেরই মূল বংশধর; বড়বাড়ী ও আনন্দপুর এষ্টেটের বর্ত্তমানে এই ছেলেটিই জু-আনির মালিক। সুতরাং বড় বাড়ীর অপেক্ষাকৃত বড় ও ভাল অংশটি উত্তরাধিকারসূত্রে বিশুরাই অধিকার করিয়া আছে। ইহাদের মালিকানা স্বত্ব অধিক ও অবস্থা অধিকাংশ সরিকদের তুলনায় অনেক ভাল হইলেও পরিজন সংখ্যা অতি অল্পই। বিশু শৈশবেই পিতৃহীন, মা হেমাঙ্গিনী দেবীই সংসারের অভিভাবিকা ও বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়িকা; বিশুর অগ্রজ বা অনুজ কেহ নাই, সে-ই বংশের একমাত্র সন্তান। শৈশবে বিধবা ও নিরাশ্রয়া মাতৃস্বসা দুর্গামণি, বিশুরই সমবয়স্ক পুত্র কিশোর ও কন্যা প্রভার সহিত ভগিনীর সংসারের অন্তর্ভুক্তা হইয়া তাহার কতকটা পুষ্টিবিধান করিয়াছেন।

শোভা নামে যে মেয়েটিকে আমরা বিশুর সংস্রবে দেখিয়াছি, সে বড়বাড়ীর মূল মুখুটিবংশের কন্যা নহে; শোভার পিতামহ এই বংশের সাত পাইয়ের মালিক রঘুনাথ মুখুজ্যের ভাগিনেয় বংশীধর চক্রবর্ত্তী কলিকাতার অপর পারে শিবপুর নামক অঞ্চলে পৈতৃক জীর্ণ বাড়ীতে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; নিঃসন্তান মাতুলের আকস্মিক তিরোধানে তিনি শিবপুরের আস্তানা তুলিয়া সপরিবার আনন্দপুরের বড়বাড়ীতে মাতুলের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া তাঁহার সাত পাই অংশের মালিক হইয়া বসেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে পুত্র ধরণীধর সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীদেবী ও কন্যা শোভার সহিত বড় বাড়ীতেই বসবাস করিতেছেন।

ধরণীধরের পিতা বংশীধর শিবপুরে অবস্থিতির সময়ে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। মাতুলের সাত পাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াই তিনি বসত বাটির ঘর কয়খানি রাখিয়া ভূসম্পত্তিটুকু বিক্রয় করিয়া ঋণমুক্ত হন। সেই সম্পত্তিটুকু যিনি ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনিও মূল মুখুটি বংশের এক প্রবল সরিক, চার আনার মালিকান ভূসম্পত্তির উপর একমাত্র নির্ভর ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও আইন পরীক্ষায় কৃতবিদ্য হইয়া ব্রহ্মদেশে সপরিবার ভাগ্য পরীক্ষায় বাহির হইয়া পড়েন। তাঁহার এখানকার সম্পত্তি পরিদর্শন ও বড়বাড়ী রক্ষণাবেক্ষণের ভার বর্ত্তমানে ধরণীধরের উপরেই ন্যস্ত আছে। উক্ত সম্পত্তির মালিক ও উকীল চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত ধরণীধরের একটিবার মাত্র চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিয়াছিল; বর্ত্তমানে চিঠি পত্রেই নিয়মিত ভাবে সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং ন্যায়নিষ্ঠ ধরণীধর তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বেতনটুকু ও সংস্রাবী খাতের খরচ পত্র কাটিয়া লইয়া কিস্তী কিস্তী নিয়মিত মালগুজারি

সরকারে দাখিল করেন ও উদ্বৃত্ত টাকা ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় মালিকের বরাবর ব্রহ্মদেশে সরবরাহ করিয়া হিসাব নিকাশ দুরস্ত রাখেন।

ইহা ভিন্ন এক আনা হইতে এক পাই পর্য্যন্ত অংশের যে সকল মালিক বড়বাড়ীর অংশ-বিশেষ অধিকার করিয়া এখনও রাজগী চালাইতে অভ্যস্ত, তাহারা গণনায় অসংখ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং এই অসংখ্য পরিবারের মধ্যে কলহ-বিবাদ দ্বেষাদ্বেষী, দলাদলী ও সেই সূত্রে মামলামকদ্দমা লাগিয়াই আছে।

কিন্তু অন্যতম মালিক হেমাঙ্গিনী দেবী ও তৎপুত্র বিশু এবং অনুপস্থিত মালিক চন্দ্রনাথের অছি ধরণীধর তাঁহার স্ত্রী সাবিত্রী দেবী ও কন্যা শোভা,—এই দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি বরাবরই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আছে।

৩

শৈশব অবস্থা হইতেই বিশু ও শোভার ঘনিষ্ঠতা এই সম্প্রীতি দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছে। এই দুইটি বালক বালিকার প্রীতিপূর্ণ আচরণ উপমাস্থানীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। বড়বাড়ীতে সমবয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা পর্য্যাপ্ত এবং সুন্দরী বালিকা শোভার সহিত খেলিতে প্রত্যেকেই একান্ত আগ্রহশীল, কিন্তু শোভার লক্ষ্য একমাত্র বিশুদা, সকলকে এড়াইয়া সেই দিকেই তাহাকে ঝুঁকিতে দেখা যায়। বড়বাড়ীর পুরোবর্ত্তী বিশাল প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণে বালক বালিকারা যখন নানারূপ খেলায় ব্যস্ত, তখন একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত, এই দুইটি বালক বালিকা খেলাধূলা ছাড়িয়া অদূরবর্ত্তী বকুল-দীঘির চাতালে বসিয়া বকুলফুলের মালা গাঁথিতেছে—দীঘির ঘাটের দুই ধারে দুইটি সুবৃহৎ বকুল গাছ, তাহাদের তলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া সুপ্রশস্ত বাঁধানো চাতাল, দুই চাতালের মধ্যদেশ দিয়া বাঁধা ঘাটের সোপানশ্রেণী দীঘির কালো জলের ভিতর গিয়া মিশিয়াছে।

বালক বিশু দীঘির পাড় হইতে বকুল ফুল কুড়াইয়া কোঁচড় পূর্ণ করিয়া চাতালে উপবিষ্টা বাল্যসখীর সম্মুখে ঢালিয়া দিতেছে, বালিকা শোভা হাসি মুখে গোলকের লতার সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে মাল্য রচনা করিতেছে।

আবার এই স্থানে বসিয়া উভয়ের মধ্যে কত গল্প চলে, কত কথা কাটাকাটি হয়, কলহও যে বাধে না, এমন বলা চলে না।

তাড়াহুড়া করিয়া ঝটপট কাজ শেষ করা বিশুর একান্ত অভ্যাস। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচুর ফুল শোভার সম্মুখে স্তূপীকৃত করিয়া দিলে, সে প্রসন্ন মনে হাসিয়া হয় ত বলিয়া বসে,—আর ফুল তোমাকে কুড়ুতে হবে না, বিশুদা। তুমি একটা গল্প বল, আমি মালা গাঁথতে গাঁথতে শুনি।

বিশুর অদ্ভুত স্মরণশক্তি; যাহা একটিবার শুনে, তাহাই তাহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। তাহার মাসীমা ভাল গল্প বলিতে পারিতেন, রাত্রিকালে বিছানায় শুইয়া বিশুরা তাঁহার গল্প শুনিত এবং যেমনটি শুনিত, ঠিক তেমনই করিয়াই সময় বিশেষে শোভাকে তাহা শুনাইয়া দিত।

সেদিন বিশু পূর্ব্ব রাত্রিতে মাসীমার মুখে শোনা একটা ভূতের গল্প শোভাকে শুনাইতে বসিল।

গোলকের সরু ডাঁটার মধ্যে একটি একটি করিয়া ফুল গাঁথিতে গাঁথিতে শোভা আতঙ্ক-বিস্ময়ে এই রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতেছিল। গল্প যখন শেষ হইল, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে দিগন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে।

শোভার হাতের মালা ছড়াটিও তখন গাঁথা শেষ হইয়াছে, খোঁপায় সেটি জড়াইতে জড়াইতে সে কহিল,—ভাগ্যিস পরীটার পাখা ছিল, তাই উড়ে পালালো; আচ্ছা বিশুদা, ভূতের বুঝি পাখা থাকে না?

বিশু বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করিয়া কহিল,—আরে পাগলী, এ যে নিছক গল্প; সত্যি কি আর ভূত বলে কিছু আছে যে পাখা থাকবে!

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিশুর দিকে চাহিয়া বালিকা প্রশ্ন তুলিল,—ভূত তাহলে নেই,—বলছ কি তুমি, বিশুদা?

দৃঢ়স্বরে বিশু জানাইল,—না, নেই।

তবে বাড়ীতে সকলে ভূতের কথা বলে কেন?

তা কি করে বলব?

তাহলে পরীও নেই?

হয়ত নেই, চোখে ত দেখিনি; যা কোনোদিন দেখিনি, কি করে বলব আছে?

তাহলে তোমার গল্পটা নিছক মিথ্যে ত?

গল্প কি আর সত্যি হয়?

যদি হয় না, তবে তুমি মিছি মিছি মিথ্যে কথা বানিয়ে বল কেন? এদিকে ত আমাকে ঘটা করে শেখানো হয়—সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা বলিবে না;—তবে?

এ ত আর একটা কিছু দোষ করে শাস্তি নেবার ভয়ে অমান্য করার মত মিথ্যে বলা নয়; এ হচ্ছে একটা মজার কথা শুনিয়ে দেওয়া, সবাই এমন দেয়।

সবাই দেয়?

দেয়। কথামালার গল্পগুলো পড়া হলে কি? সাঁচ্যা বলে মানতে পারবি? দাঁড়কাক ময়ূরের পালক পরে, সিংহের চামড়া প'রে গাধা সবাইকে ভয় দেখায়, পশুরা সকলে কথা কয়,—এ সব সত্যি না'ক? শুনেছিস্ কোনো দিন আমাদের রাঙী গাইকে মানুষের মত কথা কইতে?

বিশুদার এবারকার কথাগুলি শুনিয়া বালিকা দমিয়া গেল; কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর কহিল,—কিন্তু কথামালা যখন পড়ি, তখন ত মিথ্যে মনে হয়না, বিশুদা। মনে হয় যেন সত্যি, যেন তাদের চোখ দিয়ে দেখছি, কথাগুলোও সব শুনছি।

বিশু কহিল,—আমার গল্পটাও কি মিথ্যে মনে হয়েছিল?

বালিকা আগ্রহের সুরে কহিয়া উঠিল,—তা হয় নি, কিন্তু তুমি নিজেই ত বলছ মিথ্যে। আমার কি দোষ বল না?

শেষের কয়টি কথার সঙ্গে সঙ্গে বালিকার দুই চক্ষু অশ্রুভারে স্ফীত হইয়া উঠিল।

বালিকার শেষের আর্তস্বর শুনিয়াই বিশু রুক্ষস্বরে কহিল,—অমনি মেয়ের চোখ ডবডবিয়ে উঠল। আমি কি তোকে বকেছি?

আমি কি তা বলেছি, আমার চোখে অমন জল আসে।

মুখখানি এবার বিকৃত করিয়া বিশু কহিল,—জল আসে; যেন কচি খুকি। একটু যদি কিছু হল, প্যানপেনিয়ে সারা হলেন; বে হলে তখন দেখবি মজা—

অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদুটি মেলিয়া বালিকা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—আমার বয়ে গেছে বে করতে, কিছুতেই আমি তোমাকে বে করব না।

বিশু এবার কণ্ঠে রীতিমত জোর দিয়া উত্তর দিল,—তোর সঙ্গে আমি যদি আর কখ্খনো কথা কই—

বালিকার মুখখানি এ কথায় ছায়ের মত সহসা ফ্যাকাসে হইয়া গেল, কণ্ঠের স্বর মৃদু ও আর্দ্র করিয়া কহিল,—পড়া পর্য্যন্ত বলে দেবে না?

বিশু মুখখানা অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া কহিল,—না।

আমাকে নিয়ে আর খেলবে না? ফুল কুড়িয়ে দেবে না?

না—না—না—

বালিকা একথায় কাঁদ কাঁদ হইয়া কহিল,—সত্যই আড়ি তাহলে দিচ্ছ তুমি বিশুদা বেশ; আমারও ঐ কথা—আ—ড়ি।

বলিয়াই বালিকা অঙ্গুষ্ঠটি ভঙ্গী করিয়া চিবুকে স্পর্শ করিল।

বিশু সঙ্গে সঙ্গে চাতাল হইতে এক লম্ফে রাস্তার উপর লাফাইয়া পড়িয়া আপন মনে কহিল,—আচ্ছা, আমি এখন গাঙের ধারে বেড়াতে চললুম, আর ঐ বকুল গাছ থেকে সাঁকচুন্নী নাক বাড়িয়ে এক জনের খোঁপা থেকে গন্ধ ফুলের মালাটাও তুলে নিক্—

আর কোথায় থাকে বালিকার অভিমান; ক্ষিপ্র পদে চাতাল হইতে নামিয়া বিশুর দিকে ছুটিতে ছুটিতে কহিল,—দোহাই তোমার, বিশুদা! আমায় একলাটি ফেলে যেয়ো না, আর কখ্খনো আমি তোমার সঙ্গে আড়ি দেব না—

তাহলে ভাব?

সরোদনে বালিকা উত্তর দিল,—ভা—ব।

এই ভাবে এই দুইটি বালক বালিকার খেলা-ধূলা, আড়ি-ভাব ও মান-অভিমানের অভিনয় চলিত। পরিজনগণ পরমানন্দে ইহা উপভোগ করিতেন, ইহাদের উপাখ্যান লইয়া আলোচনাও চলিত; হিতৈষীদের অনেকেই এই বলিয়া উভয় পক্ষের অভিভাবকদিগের সমক্ষে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন,—এমন মিল কখনো দেখিনি, ভগবানই এদের যোট বেঁধে দিয়েছেন, এদের দুটি হাত এক সঙ্গে মিললে রাজযোটক হবে, তোমরা যেন শেষে অন্যমত ক'র না বাপু।

অভিভাবকরা হাসিতেন, বাড়ী ও পল্লীর বালক বালিকারা পরিহাস করিবার একটা উপলক্ষ পাইত। সুতরাং সেদিন ইস্কুলের পথে দুটবিহারী শোভাকে দেখিয়াই যখন পরিহাসের ভঙ্গীতে

'বিশুর বউ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাহা একবারে ভিত্তিহীন ছিল না।

— -

৪

যে সময়ের কথা লইয়া এই আখ্যায়িকার সূচনা, তখন ইয়োরোপের মহাযুদ্ধ রাষ্ট্র জগতে যেমন চাঞ্চল্যের সাড়া তুলিয়াছে, কতকগুলি ব্যবসায়ে একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া তেমনই ব্যবসায়ী সমাজকেও চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে।

যে সকল ব্যবসায়ী সরকারী পল্টনের পোষাক সরবরাহ করিয়া আসিতেছিলেন, এইবার তাঁহাদের ব্যবসায়ে মাহেন্দ্রযোগ দেখা দিল। রহমান সাহেব চাঁদনী-অঞ্চলে যদিও খুব বড় রকমের কারবারী বলিয়া পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি-যে সহরের বাহিরের দর্জ্জীদের দ্বারা সুবিধায় অর্ডারী মাল তৈয়ারী করাইয়া সরকারকে সরবরাহ করিতেন এবং এইটিই ছিল তাঁহার বড় কারবার, এ খবর তাঁহার সহ-ব্যবসায়ীরাও জানিতেন না। যখন জানিলেন, যুদ্ধ তখন জাঁকিয়া উঠিয়াছে এবং অধিকাংশ অর্ডারপত্রই চুক্তিবদ্ধভাবে রহমন সাহেবের হস্তগত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদনী মার্কেটে শত মুখে ভবিষ্যদ্বাণী প্রচারিত হইল যে,—রহমন মিঞা তলে তলে তালাও খুলিয়ে ফেলেছে, এবার লাল হয়ে যাবে।

একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও যে সকল স্বাবলম্বী মুসলমান স্বাধীনভাবে লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই, অবলম্বিত ব্যবসায়ে যে পরিমাণ দক্ষতা দেখা যাইত, উচ্চশিক্ষার দিক দিয়া ততটা অভাবও প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু তথাকথিত ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে দুই এক জন ভাগ্যবান উচ্চশিক্ষার সংস্রবে আসিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, ব্যবসায়ে অসামান্য সাফল্যের সহিত যেমন তাঁহারা প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রগামী হইতেন, তাঁহাদের অধ্যুষিত সমাজে শিক্ষার বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়া শিক্ষা-দীন স্বজাতিকে আদর্শের পথে আকর্ষণ করিতে কিছুমাত্র অবহেলা করিতেন না। উচ্চশিক্ষিত ব্যবসায়ী রহমন সাহেবও করেন নাই।

বাহির-আনন্দপুরের স্বজাতীয় শত শত দর্জ্জী অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে রহমন সাহেবের তহবিল স্ফীত করিয়া তুলিতেছিল; যদিও ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করিয়াই তিনি কার্য্য আদায় করিয়া লইতেছিলেন এবং এক্ষেত্রে অতিরিক্ত করুণা প্রকাশের কোনও আবশ্যকই তাঁহার পক্ষে ছিল না, তথাপি তাঁহার স্বজাতীয় শ্রমিকদের শ্রমলব্ধ কার্য্যে লাভের অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য্য দেখিয়া তিনি এই শ্রমিক-গ্রামের সংখ্যাধিক স্বজাতিকে মানুষ করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

মনের সঙ্কল্প ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখা রহমন সাহেবের স্বভাববিরুদ্ধ; সুতরাং সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। মনে দৃঢ় ইচ্ছা এবং হাতে সুপ্রচুর পয়সা থাকিলে সৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে বিলম্ব হয় না। স্থানীয় জনৈক মাতব্বর ওস্তাগরের সহায়তায় জমি খরিদ করিয়া বাড়ীর পত্তন আরম্ভ হইয়া গেল। স্থির হইল, কলিকাতার বাস তুলিয়া সপরিবার তিনি বাহির-আনন্দপুরে তাঁহার জাতি-ভ্রাতাদের মধ্যে বাস করিবেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের যেমন সুবিধা হইবে, তেমনই তাঁহার ব্যবসায়ের সহিত সংসৃষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত কুসংস্কার এবং সেই সূত্রে সত্যকার যে সকল অভাব ও সমস্যা বর্ত্তমান, তাহাদের সংস্কার ও সমাধান হইয়া যাইবে।

কয়েক মাসের মধ্যেই মাঝারী রকমের একখানি পাকা বাড়ীর নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া গেল। বাড়ীখানির কোনও রূপ বাহ্যাড়ম্বর না থাকিলেও দিব্য পরিষ্কার ও হাওয়াদার,—আবরু রক্ষা করিতে বায়ুর গতিপথ অবরুদ্ধ করিবার কোনও ব্যবস্থাই অতি সন্তর্পণে অবলম্বিত হয় নাই। বাহিরের দিকে পাকা দালান;—এখানেই পল্লীর ওস্তাগরদের চিরপরিচিত 'দলিজ' বা দর্জ্জিখানা। সুদীর্ঘ দালান যুড়িয়া লম্বা লম্বা মাদুর বিছানো, তাহার উপর সারি সারি সিলাইয়ের কল। দর-দালানের দুইদিকে দুইজন বিচক্ষণ ওস্তাগরের স্থান, তাঁহাদের নির্দ্দেশ অনুসারে নানা বয়সের বহু সংখ্যক দর্জ্জী সীবন-শিল্পের সাধনা করে।

বসতবাড়ী ও বাহিরের দর্জ্জীখানার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতেই আনন্দপুর ও বাহির-আনন্দপুরের সংযোগস্থলে অপেক্ষাকৃত প্রকাণ্ড রাস্তার ধারে সংগৃহীত ভূখণ্ডের উপর অতি তৎপরতার

সহিত আর একখানি পাকাবাড়ীর নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছিল। কি অভিপ্রায়ে পল্লীর বাহিরে এই বাড়ীর পত্তন, ইহা জানিতে পল্লীবাসীদের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইলেও রহমন সাহেব কিছুই প্রকাশ করেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন,—এই ইমারতের কাজটুকু শেষ হলেই আমিও এখানে কায়েমী হ'য়ে বসব,—তখনই আপনারা সবাই জানতে পারবেন, কি উদ্দেশ্যে এটা বানান হচ্ছে।

অগত্যা কৌতূহলী অধিবাসিগণকে ইমারতের কাষটি শেষ হইবার দিনটির দিকে তাকাইয়া আগ্রহ দমন করিতে হইয়াছে। বাসা এবং ব্যবসায় এখানে থাকিলেও রহমন সাহেব নিজে এখানে পাকা হইয়া বসিতে পারেন নাই,—কলিকাতাতেও তখন তাঁহার বহু কার্য্য, যদিও জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র আনোয়ার ও মতিয়ার সে কার্য্যে লিপ্ত থাকে, তথাপি মাথার উপর তিনি না থাকিলে চলে না। এদিকে পল্লী-পক্ষে স্বজাতি দর্জ্জীদের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁহার অবস্থিতি অপরিহার্য্য; অগত্যা দুই দিক বজায় রাখিতে কনিষ্ঠপুত্র রহিম, বালিকা কন্যা পারবানু এবং পত্নী আমিনাকে পল্লীর নূতন বাটিতে পাঠাইলেন এবং ইহাদের অভিভাবকস্থানীয় হইয়া দেখা শুনার ভার দিলেন সম্পন্ন প্রতিবেশী প্রবীণ ওস্তাগর ওয়ারিশ আলীর উপর। ইনি বাহির আনন্দপুরের মুসলমান-সমাজের মাথাওয়ালা মুরুব্বীবিশেষ এবং কাট-কাপড়ের কারবার ও সকল প্রকার ক্ষমতার খ্যাতিও ইঁহার প্রচুর। এ অঞ্চলে রহমান সাহেবের প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেই ইনি ছিলেন প্রধান সহায়ক এবং সুশিক্ষিত মার্জ্জিতরুচি রহমন সাহেব তাঁহারই সমবয়স্ক পল্লীবাসী এই বহুদর্শী ওস্তাগরটিকে নিরক্ষর জানিয়াও তাঁহার সরলতা, ঔদার্য্য, আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বকৃত উপার্জ্জন প্রচুর বিত্ত প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া সহযোগী বন্ধুর মর্য্যাদাই দিয়াছিলেন।

রহমন সাহেবের নূতন বাড়ীর বাহির মহলে সুবৃহৎ দালানে দর্জ্জীদের কাজকর্ম্মের সম্পূর্ণ তদারক করেন ওস্তাগর ওয়ারিশ আলী এবং অন্দর মহলে নূতন-পাতা সংসারটির উপর লক্ষ্য রাখেন ওস্তাগর সাহেবের সহধর্ম্মিণী সাকিনা ও তাঁহার সুবৃহৎ পরিবারের অন্যান্য মেয়েরা। পাশাপাশি বাড়ী বলিয়া দুই পরিবারের মেয়েদের মিশিবার যেমন সুবিধা হইয়াছে, ঘনিষ্ঠতাও ইতিমধ্যেই তেমনি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

ওস্তাগর সাহেবের কন্যার নাম হাজী। যে বৎসর সাহেব মক্কাসরীফে 'হজ' করিতে গিয়াছিলেন, সেই বৎসরেই এই কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই জন্যই 'হজে'র স্মৃতিরক্ষা কল্পে কন্যার নামকরণ করেন—হাজী। মেয়েটির গায়ের রং যদিও খুব ফরসা নয়, কিন্তু অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখের গঠন মোটের উপর ভালই। তবে তাহার বয়সের সীমা প্রায় তেরোয় গিয়া পঁহুছাইলেও এ পর্য্যন্ত সে অবিবাহিতাই আছে এবং ইহাতে প্রতিবেশীদের মধ্যে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যও উঠিয়াছে। এ অঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতেই প্রচলিত; পনেরো ষোলো বছরের অকৃতদার ছেলে এবং আটের উপরে অনূঢ়া মেয়ে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়, এবং যাহাদিগকে দেখা যায়, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধকতাই তাহাদের দাম্পত্য-জীবনের মিলন-গ্রন্থী রচনা করিতে দেয় নাই।

মহাযুদ্ধের বাজারে পিতার অনবসর কার্য্যের চাপেই হাজীর অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত 'বিবি' হইবার সুযোগ আসে নাই। একটু সামলাইয়া লইয়া বেশ ঘটা করিয়াই মেয়ের 'সাদি' দিবেন, ইহাই ছিল ওয়ারিশ ওস্তাগরের বাসনা। কিন্তু এদিক যখন একটু সামলাইলেন, রহমন সাহেবের বেগার তখন পড়িল, সেই সঙ্গে দুটি মুগ্ধ চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল—বন্ধু-পুত্র রহিমের সুন্দর চেহারাখানি; মনে মনে ভাবিলেন,—বাঃ, খাসা ছেলে; হাজীর সঙ্গে দিব্যি মানাবে!

মনের কথা বন্ধুর কাণে উঠিতে বিলম্ব হইল না, তিনি হাসিয়া কহিলেন,—ভালই ত, এতে আর বাধা কি! তবে একটু কথা আছে।

কথাটাও তিনি তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিলেন; যথা,—তঁ হাকে এখন দুই নৌকায় দুইখানি পা রাখিয়া টাল সামলাইতে হইতেছে; কলিকাতার কারবারের একটা পাকা ব্যবস্থা করিয়াই তিনি যেমন এখানে স্থির হইয়া বসিবেন, তখনই সমারোহের সহিত এই কাজটুকুই আগে সারিবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এ কাজ না হইতেছে, মেয়েটিকে একটু লেখাপড়া শিখাইবার ও সেই সঙ্গে চালাক-চতুর হইতে সুযোগ দিবার ব্যবস্থা করা চাই।

রীতিমত বিস্মিত হইবার কথাই বটে! যে অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত বিদ্যার আলোক পড়ে নাই, ছেলেরাই সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; হাজী মেয়ে

হইয়া সেই অজ্ঞাত পথে ছুটিবে,—বাবুপাড়ার মেয়েদের মত পাঠশালায় বসিয়া 'স্লাকা-পড়ুই' করিবে! কি তাজ্জব!

কিন্তু রহমন সাহেব তাঁহার কন্যা পরিবানুকে ডাকিয়া তাহার বিদ্যার পরিচয়টুকু যখন দিলেন, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া ওস্তাগর সাহেব ত একেবারে অবাক! তাঁহারই মেয়ের প্রায় সমবয়সী এই মেয়েটি বই লইয়া কেমন কেতাবের একটি গল্প পড়িয়া শুনাইল, কোরাণ-সরীফের বাঙ্গালা অনুবাদের কেতাব হইতে কি মধুর স্বরেই কতিপয় পরিচিত বয়েদ আবৃত্তি করিল; কথাবার্ত্তায়ও কেমন আদপ ও কায়দা,—লেখাপড়া না শিখিলে ত এমন হইবার কথা নয়! চমৎকৃত হইয়া তিনি বাহোবা ত দিলেনই এবং রহমন সাহেবের সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, পাঠশালার সহিত সংস্রব না রাখিয়া যে ক্ষতি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে কুড়াইয়াছেন, পয়সায় ও ক্ষমতায় তাহা পূরণ হইবার নহে। অতঃপর হাজীকে পাঠশালায় পাঠাইতে তাঁহার মনে আর দ্বিধা রহিল না; স্থির হইল, আপাততঃ রহিম যেমন আনন্দপুরের বিদ্যালয়ে পড়িবে, হাজীও তেমনই পরির সহিত ওখানকার মেয়ে স্কুলে লেখাপড়া শিখিবে।

এই ব্যবস্থা অনুসারে রহিম আনন্দপুরের বিদ্যালয়ে গিয়া নাম লেখায় এবং প্রথম দিনেই তাহার বিদ্যার পরিচয় দিয়া ছাত্রসমাজে যে ভাবে চাঞ্চল্য তুলে ও সেই সূত্রে ছুটির পর পথে যে অপ্রীতিকর ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা সূচনাতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৫

যদিও আনন্দপুর সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম এবং নবাবী আমোলের পুরাতন জমিদার-বংশের সহিত আরও অনেকগুলি বিশিষ্ট বংশের অস্তিত্ব এখানে বর্ত্তমান, তথাপি তাঁহাদিগের সন্তানগণের উচ্চশিক্ষার কোনরূপ ব্যবস্থা এ গ্রামে ছিল না। যে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা গ্রামে দেখা যায়, পূর্ব্বে ইহা সাধারণ পাঠশালা বলিয়াই গণ্য হইত এবং ইহার অধিকার প্রাইমারী বা নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রায় বারো বৎসর হইল, বর্ত্তমানের প্রধান শিক্ষক ব্রজমোহন দত্ত এই বিদ্যালয়টির ভার লইবার জন্য আনন্দপুরে উপস্থিত হন। কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বকায় এই নবাগত মানুষটির স্বাভাবিক গম্ভীর মুখ এবং সেই মুখের গুরুগম্ভীর স্বর হইতে গ্রামের মাতব্বরগণ একবাক্যে স্বীকার করিলেন,—হাঁ, সেকেলে গুরুমহাশয়ের মত চেহারা আর আওয়াজ বটে,—ছেলেগুলো এবার দুরস্ত হবে।

ছেলেরা অবশ্য তখনও চেহারার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে শিখে নাই, কিন্তু নূতন শিক্ষকের স্বাভাবিক রক্তবর্ণ ঘূর্ণ্যমান দুইটি চক্ষুর সন্ধান পাইয়াই বুঝিয়াছিল, আর তাহাদের পরিত্রাণ নাই। এমন চক্ষুর যিনি মালিক, তাঁহার নিকট কোনও গলদই তাহাদের চাপা থাকিবে না।

নবাগত শিক্ষকমহাশয়ও তাঁহার ঘূর্ণিত নেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এইখানেই তিনি স্থায়ীভাবে স্থিতি হইতে পারিবেন। কেন না, বিদ্যায় তিনি অতি বিচক্ষণ ও শিক্ষকতায় প্রচুর কৃতিত্ব অর্জ্জন করিলেও, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদের নির্দ্ধারিত বাঁধা-ধরা ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অভ্যস্ত ছিলেন না এবং এই অনভ্যস্ততার জন্য কর্তৃপক্ষের সহিত সর্ব্বত্রই তাঁহার ঠোকাঠুকি হইয়াছে। কিন্তু এখানকার পাঠশালাটি যতই ছোট হউক, সরকারী সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না, স্থানীয় জমিদার-বংশের পূর্ব্বপুরুষদের ব্যবস্থায় এই শিক্ষালয়টির পরিপোষণে কিছু ভূসম্পত্তি বরাদ্দ ছিল, তাহাতেই ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। নূতন শিক্ষক মহাশয় নানাদিক দেখিয়া বিদ্যালয়ের আয় কিঞ্চিত বাড়াইতে ও স্থানীয় ছাত্রদের অসুবিধা মোচন করিতে এক নূতন পরিকল্পনা করিলেন। ছেলেরা নিম্ন প্রাথমিকের পাঠ সাঙ্গ করিলে এই গ্রাম হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ তফাতে মহেশখালীর হাই-ইস্কুলে ইংরাজী পড়িতে যাইত। ইনি ব্যবস্থা দিলেন যে, অভিনব ব্যবস্থায় এখানেই ছাত্রদিগকে এমন ভাবে তিনি শিক্ষা দিবেন—যাহাতে এখানকার পাঠ শেষ করিয়াই তাহারা হাই-স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে গৃহীত হইতে পারে।

গ্রামের মাতব্বর বা জমিদার বংশের বংশধরেরা এ পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষগণের ব্যবস্থাই যথেষ্ট মনে করিয়া এই গ্রাম্য পাঠশালাটির শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ছিলেন এবং গ্রামের বয়স্ক ছেলেরা দল

বাঁধিয়া যখন গ্রীষ্ম ও বর্ষার বিষম অসুবিধা মাথায় করিয়া গ্রামান্তরে বিদ্যার্জ্জন করিতে যাইত, সে দৃশ্য উপভোগও করিতেন। মনে তাঁহাদের এই যুক্তিই তখন দৃঢ় হইয়া উঠিত যে, বাল্যে তাঁহারা যে কষ্ট সহ্য করিয়া মানুষ হইয়াছেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তীগণও ত সেই পথেই চলিয়াছে।

কিন্তু শিক্ষক মহাশয় তখন নানা যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দিলেন,—জগতের সকল দিকেই পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; পূর্ব্বে লোকে হাঁটিয়া ছয় মাসে কাশী গয়া বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে যাইত, এখন চব্বিশ ঘণ্টায় যায়। দুই বেলায় তিন ক্রোশ হাঁটিয়া গ্রামান্তরে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা গ্রামে বসিয়া তাহা উপার্জ্জন করা সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃ। যুক্তি শুনিয়া গ্রাম্য মাতব্বরগণ শিক্ষক-মহাশয়ের প্রস্তাবে সায় দেন এবং তাহাতেই নব পরিকল্পনায় এই বিদ্যালয়টি গঠিত ও উন্নত হইয়া উঠে।

তাহার পর সুদীর্ঘ বারোটি বৎসরে যে সকল ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া ইংরাজী হাইস্কুলে প্রবেশ করে, কোনও বিষয়েই তাহাদের খুঁৎ দেখা যায় নাই, সুতরাং আনন্দপুরের আদর্শ বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ এ পর্য্যন্ত ইংরেজী বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীতেই সাদরে গৃহীত হইয়া আসিতেছে।

যাহারা এই বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়াই মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়াছে—উচ্চ শিক্ষা-লাভের আর সুযোগ ঘটে নাই, তাহাদের মধ্যেও মোটামুটি শিক্ষা ও সভ্যতার এমন পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাহাদিগকে অশিক্ষিত বলিয়া অবহেলা করা চলে না, বরং তাহারা সভ্য সমাজে মিশিবার দাবী করিতে পারে। এই বিদ্যালয়ের অদ্ভুত শিক্ষকটির শিক্ষকতার ছিল, ইহাই বিশেষত্ব।

তথাপি, একটি বিষয়ে এই কৃতী পুরুষটির অকৃতকার্য্যতাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বারো বৎসরের মধ্যে আনন্দপুরের কত ছেলেকেই তিনি মানুষ করিয়া দিয়াছেন, কত অচল বালক তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষার অপূর্ব্ব আলোক পাইয়া চলার পথে চলিতে শিখিয়াছে, কত গাধাপ্রকৃতির নির্ব্বোধ ছাত্র তাঁহার প্রসাদে সুবোধ ও বিদ্বান হইয়াছে, কত দুর্দ্ধর্ষ ডানপিটে ছেলেকে পিটিয়া তিনি সায়েস্তা করিয়া দিয়াছেন,—কিন্তু এই একটি যুগ যথাসাধ্য চেষ্টা এবং সাধ্য-সাধনা করিয়াও তিনি বাহির-আনন্দপুরের কোনও ওস্তাগর অথবা দর্জ্জীর কোনও ছেলেরই নাম এই বিদ্যালয়ের খাতায় লিখাইতে পারেন নাই।

কিন্তু বারো বৎসরে ঝুনো শিক্ষক ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় যাহা সার্থক করিয়া তুলিতে পারেন নাই, রহমন সাহেব এখানে আসিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অর্থাৎ এই গ্রামের সহস্রাধিক বাসীন্দার যিনি মাথা, তাঁহার মেয়েটিকেই পাঠশালায় পাঠাইতে পারিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শিক্ষক মহাশয়ের আর একটি উপরি উপায় ছিল; সেটি—বাহির-আনন্দপুর গ্রামের দর্জ্জীদের হিসাবের খাতা-পত্র লেখা ও চিঠি বা দলিল দস্তাবেজের মুসাবিদা করিয়া দেওয়া। এই সূত্রেই রহমন সাহেবের সহিত শিক্ষক মহাশয়ের পরিচয় হয়। একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতধারী, আর একজন শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগী; এক্ষেত্রে পরস্পরের সম্প্রীতি স্বাভাবিক। শিক্ষক মহাশয়ের অক্ষমতা ও ব্যথার কথা শুনিয়া রহমন সাহেব হাসিয়া বলিয়াছিলেন, —মাষ্টার মশাই, মুখের কথায় এখানে কিছু হবে না; বক্তৃতাই বলুন, আর উপদেশই বলুন, এরা বুঝবে না—মানবে না; কেননা, লেখা পড়া না শেখাটাকেই এরা মস্ত বাহাদুরী বলেই বরাবর ভেবে এসেছে; কথায় এতদিনের ভুল ত এদের ভাঙাতে পারবেন না; এখানে প্রয়োজন—দৃষ্টান্ত; এরা যাদের মানে, তাদের কারুর এগিয়ে গিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে, এরা ভুলের রাস্তা ধরেই চলেছে। আপনি ভাববেন না, সেই রাস্তা আমিই ওদের দেখাব; এর পর আপনিও দেখে নেবেন—আলোর সন্ধান পেয়ে পোকাগুলো যেমন পাগল হয়ে সেদিকে ছোটে, এরাও তেমনই যেই বুঝবে অন্ধকারে পড়ে আছে, আলো সামনে—তখনই তার পরশ পেতে আকুল হয়ে উঠবে, আর সাধতে হবে না।

রহমন সাহেব ও শিক্ষক ব্রজমোহনের এই আলাপের পরেই দৃষ্টান্তেরও সমাবেশ ঘটে; রহিম সেদিন স্কুলে নাম লিখাইয়া ও সেদিনের পরীক্ষায় যোগ দিয়া ছেলেদের চমৎকৃত করিলেও, শিক্ষক মহাশয়ের সহিত তাহার সংস্রব ও গুরুশিষ্য সম্বন্ধ যে তাহার পূর্ব্বেই স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

সেদিন রহিম যখন ক্লাসে ঢুকিল, স্কুল বসিয়া

গিয়াছে, শিক্ষক মহাশয়ের পরিকল্পনা অনুসারে তিনটি ক্লাস লইয়া এই স্কুলের কার্য্য চলে। তৃতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বর্ণ-পরিচয় হইতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা দেন একজন প্রবীণ শিক্ষক। দ্বিতীয় শ্রেণীতে মধ্যবয়সী এক বিচক্ষণ শিক্ষক পরবর্ত্তী পাঠ্য ও গণিতের বিষয় প্রধান শিক্ষকের নির্দ্দেশ মত শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের লইয়া প্রথম শ্রেণী গঠিত এবং প্রধান শিক্ষক স্বয়ং এই শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বিভিন্ন বিষয়ে এমন ভাবে কৃতবিদ্য করিতে সচেষ্ট থাকেন—যাহাতে তাহারা ইংরেজী বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে।

প্রধান শিক্ষক মহাশয় তখন চেয়ারে বসিয়া খাতায় ছাত্রদের হাজিরা লিখিতেছিলেন। রহিম ধীরে ধীরে ক্লাসে আসিয়া প্রথমেই শিক্ষক মহাশয়কে অভিবাদন করিল। রহিমকে দেখিয়াই ছেলেদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল, অনেকেই তাহাকে পার্শ্বের স্থানটুকু ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। বেঞ্চির প্রথম স্থানটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছিল বিশু, তাহার সুন্দর মুখখানি আজ অস্বাভাবিক গম্ভীর; রহিম ক্লাসে ঢুকিতেই চকিতে সে একবার বক্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণে দুই চক্ষুর দৃষ্টি এমন ভাবে পুস্তকের পাতায় নিবদ্ধ করিল, যেন ইহা ভিন্ন অন্য কিছুই তাহার লক্ষ্যের বিষয় নহে। রহিমও শিক্ষক মহাশয়কে অভিবাদন করিয়াই ক্লাসে উপস্থিত সহপাঠীদিগের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়াছিল এবং সে সময় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের গাম্ভীর্য্য ও অনেকগুলি ছেলের তাহাকে চক্ষুর ইঙ্গিতে পার্শ্বে আহ্বানের ঔদার্য্য তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই, কিন্তু সে কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বশেষের বেঞ্চটির প্রান্তদেশে উপবিষ্ট ছেলেটিকে একটু ঠেলিয়া তাহার পার্শ্বেই বসিয়া পড়িল।

ঠিক এই সময় শিক্ষক মহাশয়ও তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন,—রহিম আলী চৌধুরী?

রহিম সসম্ভ্রমে উঠিয়া নম্রভাবে উত্তর দিল,—প্রেজেণ্ট স্যর।

অতঃপর পাঠ আরম্ভ হইল। ক্লাসের ছেলেদের মনে এখন এই সমস্যাই বড় হইয়া উঠিতেছিল যে, প্রথম দিনের পরীক্ষাতেই যে ছেলেটি ক্লাসের সেরা ছেলে বিশুর প্রায় সমকক্ষ হইয়াছিল, এখন যদিও সে 'লাষ্ট' হইয়া বসিয়াছে এবং বিশু 'ফাষ্ট' হইয়াই আছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে? এই ছেলেগুলির মনোবৃত্তি এমনই সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিশুকে অতিক্রম করিয়া তাহার আগে বসা ইহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য জানিয়া, অগত্যা রহিমকেই ইহারা অগতির গতি সাব্যস্ত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে নাই; যেন রহিম নিজের কৃতিত্বে বিশুকে হারাইয়া দিলেই ইহারা বর্ত্তাইয়া যায়।

কিন্তু এদিন শেষ পর্য্যন্তও রহিম বিশুকে কোনও বিষয়েই হারাইতে পারিল না; বিশু যেন আজ হারিবে না পণ করিয়াই ক্লাসের প্রথম বেঞ্চিখানির প্রথমেই বসিয়াছিল,—যেমন সে প্রতিদিনই বসিয়া আসিতেছে। রহিম শেষ বেঞ্চির শেষে বসিলেও অধিকক্ষণ তাহাকে সেখানে থাকিতে হয় নাই; শিক্ষক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশুর বাধে নাই, কিন্তু অন্যান্য ছেলেরা যাহা পারে নাই, রহিম তাহার ঠিক উত্তর দিয়া উঠিতে উঠিতে একেবারে বিশুর ঠিক পার্শ্বে গিয়াই বসিয়াছিল। ক্লাসের সকল ছেলের দৃষ্টিই তখন পাশাপাশি উপবিষ্ট এই দুইটি ছেলের দিকে; বিশুকে যেমন প্রশ্ন করা হয়, রহিমও সেই সঙ্গে উদগ্র হইয়া উঠে, বিশু না পারিলেই সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়া তাহার উপরে গিয়া বসিবে, তাহার মুখে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে; কিন্তু বিশুও এ বিষয়ে এত সতর্ক ও তৎপর যে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তীকে তাহার অপেক্ষা পটুতা প্রকাশের অবসরমাত্র দেয় না। বিশু আজ ভাল রকমেই বুঝিয়াছে যে, তাহার এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীটি যদি কোনও বিষয়ে আজ তাহাকে হারাইতে পারে, তাহা হইলে সহপাঠীদের নিকট সে একবারে হেয় হইয়া যাইবে, সুতরাং নিজের প্রতিষ্ঠাটুকু অক্ষুন্ন রাখিতে তাহার মুখেও উদ্বেগ সুপরিস্ফুট। ছাত্র-সমাজের চিত্তবৃত্তি-নির্ণয়ে চির-অভ্যস্ত সুদক্ষ শিক্ষক মহাশয় এই দুইটি সমবয়স্ক প্রতিযোগী বালকের মানসিক উদ্বেগ ও উত্তেজনা অনুভব করিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইতেছিলেন।

ছুটির পর কলকণ্ঠে উল্লাসধ্বনি তুলিয়া ছেলেরা বাড়ীর দিকে ছুটিল। সেদিন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ পরীক্ষা থাকায় সেই শ্রেণীর ছেলেদিগকেই রাস্তায় দেখা গিয়াছিল, আজ তিনটি শ্রেণীর ছেলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া বড় রাস্তায় অভিমুখে অগ্রসর।

এদিনও রাস্তায় সেই পরিচিত সংযোগস্থলে

বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে দেখা গেল। অধিকাংশ বালিকাই আজ আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ীর দিকেই চলিয়াছিল, কেবল তিনটি বালিকা তে-মাথার মোড়টির উপর দাঁড়াইয়া স্কুলগত ছাত্রদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। ছাত্রদল লক্ষ্য করিল, এই তিনটি মেয়ের মধ্যে একটি তাহাদের চিরপরিচিতা শোভা, সে তাহাদের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহার সঙ্গিনী দুইটিকে যেন কি বলিতেছে, কিন্তু সেই দুইটি বালিকা তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিতা।

এই সময় বিশু সহসা তাহার অগ্রবর্ত্তী বালকদিগকে ক্ষিপ্রপদে অতিক্রম করিয়া মোড়ের দিকে অগ্রসর হইল; সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই শোভার এই নির্দ্দেশ; এক্ষেত্রে হেতু জানিতে উৎসুক হইয়া উঠা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক।

নিকটে আসিতেই শোভারই সমবয়স্কা দিব্য ফুটফুটে মেয়েটি তাহার সুর্ম্মামাখা টানা টানা দুটি কালো চক্ষুর দৃষ্টি বিশুর ঈষৎ উত্তেজিত মুখখানির উপর তুলিয়া সকৌতুকে প্রশ্ন করিল,—তোমার নাম বিশু, তুমিই কাল এইখানে আমার দাদার সঙ্গে দাঙ্গা বাধিয়েছিলে?

বিশু ত অবাক! জানা নাই, শুনা নাই, হঠাৎ তাহাকে দেখিয়াই মেয়েটি গায়ে পড়িয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল! আচ্ছা মেয়ে ত! অতি বিস্ময়েই সে মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

বিশুকে নিরুত্তর দেখিয়া পরি অধিকতর উৎসাহের সহিত দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিল,—তুমি ত তাহলে ভারি দুষ্টু ছেলে!

শোভা পরির কথায় খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বিশুর মনের রাগটুকু এবার শোভার উপরে গিয়া পড়িল; তাহার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া শাসনের ভঙ্গীতে কহিল,—তুমি বাড়ী চল আগে!

শোভার মুখের হাসিটুকু তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া গেল, কিন্তু পরি তাহা লক্ষ্য করিয়া সঙ্গে সঙ্গে কহিল, কি করবে বাড়ীতে গেলে শুনি? কাল ত আমার দাদাকে মারবার জন্তে হন্তে হয়ে উঠেছিলে, আজ আমার বোনটিকে খুন করবে নাকি?

বিশু এবার বিব্রত হইয়া উঠিল। সাধারণতঃই সে অল্পভাষী, শোভা ভিন্ন আর কাহারও নিকট সে মনের দুয়ারটি সহজে খুলিয়া দেয় না, অপরিচিতের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে যা যাচিয়া ভাব করিতে বরাবরই সে নারাজ; এই নূতন মেয়েটির কথার কি উত্তর সে দিবে, সহসা স্থির করিতে পারিল না, অথচ মেয়েটি ত তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেছে না! বার বার দাদার কথা তুলিয়া খোঁটা দিতেছে, তবে কি এ রহিমের বোন,—যে তাহার অতি বড় শত্রু হইয়া এই বিদ্যালয়ে আসিয়াছে?

হঠাৎ সুতীক্ষ্ন কণ্ঠস্বরে বিশুর চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—তোরা এখানে দাঁড়িয়ে যে!

বিশু ফিরিয়া চাহিতেই দেখিল ক্লাসের কতকগুলি ছেলের সহিত রহিম তাহাদের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন এবং এই প্রশ্নের জবাব লইতে দুই চক্ষুর দৃষ্টি অতিশয় তীক্ষ্ন করিয়া মেয়েটির দিকে সে চাহিয়া আছে।

অকুণ্ঠিতভাবেই মেয়েটি উত্তর দিল,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের ঝগড়ার জায়গাটা দেখছি।

কণ্ঠে জোর দিয়া অনুযোগের সুরে রহিম কহিল—জ্যাঠামো করবার জায়গা এটা নয়,—খুব কথা শিখেছিস।

পরি সপ্রতিভ ভাবে কহিল,—কিন্তু তোমাদের মত ঝগড়া করতে শিখিনি।

রুক্ষস্বরে রহিম কহিল,—কি বললি?

পরি চঞ্চল দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল,—যেটা এতক্ষণ বলি-বলি করছিলুম, সেইটিই তাহলে বলি শোন,—তুমি ইস্কুলে এসেই এই ছেলেটির সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছ, আর আমরা দুই বোনে আজ ভর্ত্তি হতে এসেই এই মেয়েটির সঙ্গে ভাব করে ফেলিছি।—কথাটা শেষ করিয়াই সে অপরূপ ভঙ্গিতে পার্শ্ববর্ত্তিনী শোভার হাতখানি টানিল। শোভাও হাসিয়া উঠিল।

হাজী এতক্ষণ অবাক হইয়া ইহাদের কাজ দেখিতেছিল; রাস্তায় দাঁড়াইয়া মেয়ে-ছেলের এভাবে বাকবিতণ্ডা তাহার পক্ষে নূতন। সে এই সময় পরির কাণের কাছে মুখখানি তুলিয়া কহিল,—মোর খালি খালি সরম লাগছে বহীন্, ঘরকে চল্।

কথাটা আস্তে বলিলেও, রহিমের কাণে তাহা তীক্ষ্ন হইয়াই বাজিল; বিশুও এই মেয়েটির বাঁকা কথা শুনিয়া সকৌতুকে তাহার দিকে চাহিল।

অন্যান্য ছেলেরাও তখন অকুস্থলে আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরি তৎক্ষণাৎ বিশুকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—এ মেয়েটিকে বুঝি চেন না? ওয়ারিশ সাহেবের মেয়ে, এর নাম হাজী; আর,—আমার দাদার সঙ্গে এর হবে শীগ্‌গীর সাদী।

এমন মুখরোচক খবর বিশুর গম্ভীর মুখে হাসির লহর তুলিতে পারিল না বটে, কিন্তু দলের অন্যান্য ছেলেরা কলকণ্ঠে নানারূপ উল্লাসের ধ্বনি তুলিতে লাগিল।

রহিম এবার রীতিমত রুষ্ট হইয়া কহিল,—চুপ কর, পোড়ারমুখী।

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া পরি পুনরায় বিশুর উদ্দেশ্যে কহিল—দেখলে ত আমার দাদার মেজাজ কত ঠাণ্ডা! সে দিন একটা ছেলে তোমাকে এমনি কি বলেছিল ব'লে, তুমি তার নাকটাই ভেঙ্গে দিয়েছিলে; আর আমার দাদা শুধু মুখ-খিঁচিয়ে আমাকে বললে, পোড়ারমুখী! যাক্, এখন তোমরা দুটিতে ভাব কর দেখি।

বিশুর সর্ব্বাঙ্গে এবার কে-যেন জল-বিছুটির ঝাপটা দিল, সহসা অতিমাত্র অধৈর্য্য হইয়াই সে পরির দিকে চাহিয়া বিকৃত মুখে কহিল,—ডেঁপো মেয়ে কোথাকার!

নব সঙ্গিনীর প্রতি বিশুদার এই সম্ভাষণে শোভা নিজেকেই অপরাধিনী ভাবিয়া অপ্রান্তত-কণ্ঠে প্রতিবাদের স্বরে ডাকিল,—বিশুদা!

কণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া বিশু কহিল,—থাক্, ঢের হয়েছে; নতুন বন্ধু যখন যুটেছে, আমাকে কি দরকার?

কথাটা এক নিশ্বাসে শেষ করিয়াই সে অগ্রবর্ত্তিনী তিনটি বালিকার পাশ কাটাইয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল। শোভার মুখখানি মুহূর্ত্তে যেন শুকাইয়া গেল, রহিম জলন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, আর পরির মনে হইল—বিশুর কথাগুলি মারবেলের গুলীর মত তাহার ক্ষুদ্র বুকটির উপর সজোরে আসিয়া আঘাত দিল।

৬

ছেলেরা ভাবিয়াছিল, আজও একটা গণ্ডগোল বাধিবে এবং সেদিন যাহা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে, আজ তাহার চরম নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু গোল বাধাইবার যে গুরু, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে অকুস্থল ত্যাগ করিতে দেখিয়া ছেলেদের উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া গেল।

শোভার দৃষ্টি পড়িয়াছিল রাস্তার দিকে—যে পথটি ধরিয়া বিশু গোভরে বাড়ীর দিকে চলিয়াছিল। সহসা দৃষ্টি পরির দিকে ফিরাইয়া সে কহিল,—পরি ভাই, আমি বাড়ী যাই।

বিশুর কথায় পরি মনে মনে যে ব্যথাটুকু পাইয়াছিল, তাহা যেন উপেক্ষা করিয়াই হাসিমুখে কহিল,—আর, আমরা বুঝি এখানেই থাকব?

রহিম অনুজ্ঞার সুরে কহিল,—বাড়ী চল্ পরি।

পরি ভ্রাতার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—চলো না বাপু, আমি ত পা বাড়িয়েছি; কি ক'রব বল, ছেলেটা পালালো, নইলে তোমার সঙ্গে ঠিক মিল করিয়ে দিতুম আজ।

রহিম চক্ষু পাকাইয়া কহিল,—ও মিছে বলে নি, তুই ভারি ডেঁপো হয়েছিস্।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া ভ্রাতার দিকে চাহিয়া পরি কহিল,—কথাটা তাহলে তোমার ভাল লেগেছে বল! তবে আর মিল হতে বাকি কি রইল?

রহিম কোন উত্তর দিল না; অগ্রবর্ত্তিনী তিনটি মেয়ের পিছু পিছু সে ও তাহার সঙ্গীদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। রহিম এই মুখরা বোনটিকে ভালরকমই চিনে, কথায় বাড়ীর কেহই এই মেয়েটিকে আঁটিয়া উঠে না; অথচ এজন্য তাহাকে অনুযোগ করিবারও উপায় নাই; কেননা রহমন সাহেব কন্যার এই বাকপটুতার বিশেষ সমর্থন করেন, উৎসাহ দেন; বলেন—কথায় ও কাজে মেয়েদের এমনই চটপটে হওয়াই ত চাই।

বড় বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই বাহির-আনন্দপুর যাইবার রাস্তা। শোভা বাড়ীর বিশাল দেউড়ীর নিকটে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইতেই পরি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—এইটিই বুঝি তোমাদের বাড়ী?

শোভা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল,—ঠিক আমাদের নয়—আরও অনেকেরই, তবে আমরা এই বাড়ীতেই থাকি; আর ঐ বিশুদাও যে এই বাড়ীর একদিকে থাকে, তা বুঝি জান না?

পরি হাসিমুখে কহিল,—এই ত জানলুম; তুমি

বললে—তাই। বাড়ীটা কিন্তু খুব মস্ত ত! আচ্ছা ভাই, তাহলে তুমি যাও।

শোভা অনুরোধের ভঙ্গীতে কহিল, তোমরাও এসো না; এখনো ত ঢের বেলা রয়েছে; মস্ত বাড়ীটার ভেতর-মহলগুলো সব তোমাদের দেখাবো—

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া এবং মুখে দুষ্টামীর হাসিটুকু আনিয়া পরি কহিল,—তবেই হয়েছে! আমরা তোমাদের বাড়ীতে যাই, আর তোমার বিশুদার সঙ্গে আমার দাদাটির আবার লড়াই বাধুক—

শোভা কহিল,—তা কেন, একদিন ঝগড়া বেধেছিল বলে রোজই বাধবে? আর, বিশুদা সে ধরণের ছেলে নয়, যদিও সে একটুতেই রেগে ওঠে, কিন্তু রাগ থামলে একেবারে মাটির মানুষ। অমন ছেলে এ তল্লাটে নেই।

পরি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—বটে! আচ্ছা ভাই, আজ আর নয়; আর একদিন যাব আমরা: শুধু আমি আর হাজী। তুমি তা হলে বাড়ী যাও।

শোভা মুখখানি তুলিয়া পরিদের দিকে একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

হাজী বরাবর পরির পাশেপাশেই ছিল ও চলিতে চলিতে তাহার অপটু পা-দুইটি বরাবর জড়াইয়া যাইতেছিল। বড়বাড়ীর সম্মুখে শোভা থামিতে ইহারাও দাঁড়াইয়াছিল; রহিম খানিকটা অগ্রসর হইলেও পুনরায় নিরুপায়ভাবে একান্ত অনিচ্ছায় তাহাকে ইহাদের প্রতীক্ষা করিতে হইয়াছিল।

প্রথম চলার পথে হাজী আজ ইহাদের সাথী হইয়াছে। কিন্তু পথ চলিতে সে যেমন অনভ্যস্ত, গুছাইয়া কথা কহিতেও তেমনই অপটু; যদি বা সাহস করিয়া দুই একটি কথা বলে, কিন্তু তাহা সকলেরই কৌতুক উদ্রিক্ত করিয়া তুলে। বিদ্যালয়ে মেয়েরা হাজীর কথা শুনিয়া হাসি চাপিতে পারে নাই, আবার পরির মুখের পাকা পাকা কথা তাহাদিগকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। কথা শুনিয়া তাহারা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই—এইটুকু বয়সে এত কথা সে কেমন করিয়া শিখিল! হাজী মনে মনে স্থির করিয়াছিল, সে সকলের কথা শুনিয়া যাইবে, নিজে মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিবে না। কিন্তু পরি যখন শোভার অনুরোধের উত্তরে এই বলিয়া বিদায় দিল যে, হাজীকে লইয়া সে একদিন তাহাদের বাড়ীতে যাইবে, হাজীর কানে কথাটা প্রবেশ করিতেই সে এই পরিচিত কথাটার উত্তর না দিয়া পারিল না, তখনই আহ্লাদে অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া জানাইয়া দিল,—মুই বাজীর সাথে এহানে কতদিন এসেছি, তখন মোর ছাওয়াল বয়েস ছ্যালো।

পরি হাসিয়া কহিল,—আর এখনই বুঝি তোর যোয়ান বয়েস হয়েছে? হাজী লজ্জাবিকৃত মুখে কহিল,—ছ্যাৎ!

হাজীর কথাগুলি রহিমের কানেও বাজিয়াছিল; তাহার পক্ষে তখন সান্ত্বনার বিষয় এইটুকু ছিল যে, সহপাঠীদের কেহই সঙ্গে ছিল না, যে যাহার বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে; সে শুধু একাই এই দুইটি মেয়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল। হাজীর মুখের কথাগুলি শুনিয়া পরি যেমন কৌতুক অনুভব করিত, তেমনই তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া এখনকার ধারা অনুসারে কথাগুলি শুধরাইয়া দিবারও চেষ্টা পাইত; হাজীর কথা কিছুতেই রহিম বরদাস্ত করিতে পারিত না; যাহাদের নাম ডাক আছে, টাকা পয়সা যথেষ্ট, এত বড় কারবার চালায়, তাহারা ভাল করিয়া কথা কহিতে শিখে নাই, হইলই বা পাড়াগাঁয়ে ঘরবসত! পরির কথা না-হয় ছাড়িয়া দেওয়াই গেল,—যেহেতু সে কলিকাতায় থাকিয়া এত বড়টি হইয়াছে, কিন্তু শোভা নামে ঐ মেয়েটি, সেও ত এই পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়াছে, এখানেই থাকে, কিন্তু সহরের মেয়েদের মতই ত কথা বলে, শুনিয়া হাসি পায় না, লজ্জা হয় না। অথচ, পাশাপাশি দুইটি পল্লীজাত এই দুইটি মেয়ের প্রকৃতিগত এই পার্থক্যের কি কারণ, তাহা সে স্থির করিতে পারে না।

হাজীর কথার সঙ্গে সঙ্গে রহিম অসহিষ্ণুভাবে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল,—আমি চললুম বাড়ী, তোরা পড়ে থাক্—

পরি কহিল,—আমরাও পথ চিনি, কিন্তু তুমি মিছে রাগ করছ দাদা; হাজীর ত সবে হাতে খড়ি হয়েছে, এরই মধ্যে কি মনে কর ওর কথা সব শুধরে যাবে?

রহিম উষ্ণ ভাবেই কহিল,—তুই তো মেয়ে-

গুলোকে একটা সঙ্ দেখাবি বলে ওটাকে এনেছিস্।

দুইপাটি দন্তে জিহ্বাটি চাপিয়া পরি কহিল,—আরে ছি! কি তুমি বলছ, দাদা! আমার কি ইজ্জতের ভয় নেই? হাজী আমার চাচার মেয়ে, আমি তাকে খাটো করব দশজনের কাছে!

কিন্তু যাহাকে লইয়া এই সব আলোচনা চলিয়াছিল, সে ইহাতে মোটেই মনোযোগ দেয় নাই; তাহার উৎসুক দৃষ্টি পূর্ব্ব হইতেই ঊর্দ্ধ আকাশে যেখানে দুই বর্ণের দুইখানি যুধ্যমান ঘুঁড়ি বিজিগীষু হইয়া পরস্পর আস্ফালন করিতেছিল—সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

পরি সহসা হাজীর পৃষ্ঠে ঠেলা দিয়া কহিল,—কি দেখছিস্ হাঁ করে—চল্।

হাজী কহিল,—ঘুড়্ডীর লড়াই, দেখ না—হোই যাঃ, ভো কাটা—

হরিদ্রাবর্ণের ঘুড়িখানার সুতা কাটা যাওয়াতেই সেটি মাতালের মত টলিতে টলিতে মাটির দিকে পড়িতেছিল। হাজীর ইচ্ছা, বেওয়ারিশ ঘুড়িখানা ধরিবার জন্য তাহার উদ্দেশে ছুটিয়া যায়; পরি তাহার মুখ ও চক্ষুর ভঙ্গীতে তাহা বুঝিতে পারিয়া সহসা তাড়া দিয়া কহিল,—ও বলে ওর পেছনে এখন ছোটা হবে না, বাড়ী চল্; দেখছিস্ না—দাদা কি রকম রেগে উঠেছে।

দুই চক্ষু মেলিয়া রহিমের দিকে চাহিয়া হাজী কহিল,—মোর তাতে কি। আর, মুই কি ঘুড়ি লুটতে ছুটছি?

অভিমান ভরে এবার সে নিজেই বাড়ীর পথে অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

পরি কহিল,—বেশত, তুই-ই আমাদের পথ দেখিয়ে বাড়ী নিয়ে চল্—

হাজীর উৎসাহ তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চলার গতিও থামিল; পথের এক প্রান্তে আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া কহিল,—ধ্যেৎ।

রহিম কহিল,—তুই ত গোল বাধালি পরি, তার চেয়ে ওকে বল্, ও 'ভো-কাটা' ব'লতে ব'লতে ঘুড়িখানার পেছনে পেছনে ছুটুক, আমরাও ওর পায়ের জোর দেখে বাহবা দিই।

হাজী এবার রীতিমত চটিয়া গেল এবং মুখখানা বাঁকাইয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিল,—আল্লার কিরে, মুই না বিলকুল বাজীরে কই।

রহিম হাসিয়া উঠিল; পরি মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—হোর বাজী আমার চাচা, আমারও বাপের মতন, কি তাঁকে কইবি শুনি?

হাজী সরোদনে কহিল,—মোরে নিয়ে আকসার মস্করা কর তোমরা।

রহিম কহিল,—শুনলি, পরি?

পরি রহিমের কথায় কাণ না দিয়া হাজীর হাতখানি ধরিয়া স্নেহের সুরে কহিল,—দাদা ঠাট্টা ক'রে একটা কথা বলেছে বলে তুই একবারে কেঁদে ফেললি, হাজী? বেশ ত' তুইও ঠাট্টা কর না ওকে, বেশ ক'রে দু-কথা শুনিয়ে দে না—

হাজী ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল,—মুই কি অত কথা জানি তোমাদের মত—যে পাল্টা তকরার করব?

পরি কহিল,—এই ত, কথা তোর মুখে দিন দিন কত স্পষ্ট হয়ে ফুটছে, এর পর আরও ফুটবে; তখন দাদাও পেরে উঠবে না তোর সঙ্গে দেখিস! অবশ্য, যদি আমার কথা শুনিস আর আমার কথামত চলিস।

হাজীর মুখে আর কথা নাই, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া পরির মুখখানির দিকে তাকাইয়া রহিল।

৭

রহিমের কথায় হাজীর মনে যে ব্যথা জাগিয়াছিল, পরির সময়োচিত সান্ত্বনায় তাহাদের মধ্যে মনোবাদ আর স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু বিশু শোভাকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে যে কয়টি কথা বলিয়া কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, সেগুলি শোভার বুকে বিঁধিয়া কাঁটার মতই খচ্ খচ্ করিতেছিল। এই কাঁটাগুলি সে নিজেও তুলিতে পারিল না, বিশুও তুলিয়া দিতে আসিল না, সুতরাং এবারের অসদ্ভাবের উপর সহজে সৌখ্যের প্রভাব পড়িতেও দেখা গেল না।

বিশু আর শোভাকে ডাকে না এবং শোভাও তাহার অনুপম কুন্তলগুচ্ছ দুলাইয়া বিশুদার কাছে পড়িতে আসে না। সহসা সামনাসামনি হইলে উভয়েই মুখ ফিরাইয়া গোঁভরে পাশ কাটাইতে চেষ্টা করে।

বড়বাড়ীর অনেকেই সকৌতুকে প্রশ্ন করেন,—হ্যাঁরে এ কদিন তোদের হয়েছে কি? কথাবার্ত্তা

নেই, খেলাধুলো নেই, দুজনেই মনমরা হয়ে আছিস, ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

কিন্তু কোনও পক্ষ হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যায় না এবং যাঁহারা প্রশ্ন করেন, প্রশ্নের উত্তর না পাইয়াও মনে মনে হাসিতে থাকেন। কেন না, তাঁহারা সকলেই জানেন, যেমন ইহাদের সদ্ভাব, আবার তেমনই মনোবাদও দেখা যায়, কিন্তু তাহা ঠিক শরতের আকাশে মেঘের মতই ক্ষণস্থায়ী, একটু ঝড় বা এক পশলা বৃষ্টির পরই আকাশ আবার নির্মল হইয়া হাসিয়া উঠে।

সে শুধু ভাবিত, আমার কি দোষ! না হয় আমি পরির সঙ্গে ভাবই করেছি, সেটা অন্যায় হবে কেন? খামকা আমাকে সকলের সামনে অমন করে খোঁটা দিলে, সেটা ওর দোষ হ'ল না—যত দোষ আমার? বা—রে!

বিশুও মনে মনে হিসাব করিত,—ঠিক কথাই ত আমি বলেছি,—ভেঁপো মেয়েটা আমাকে শাসিয়ে যা তা বলতে লাগলো, আর উনি তার হাত ধরে মুখ টিপে হাসতে লাগলেন! আবার এমনি তেজ হয়েছে ওর, সেধে কথা কইবেন না আমার সঙ্গে, আমি গিয়ে আগে সাধব—ভেবে রেখেছেন; বোয়ে গেছে আমার! নিজেই দোষ করেছেন, আবার চস দেখাচ্ছেন! আচ্ছা, আমারও নাম বিশু, নীচু আমি কিছুতেই হব না।

বিশুর মনের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় কুসুম আসিয়া আব্দারের সুরে বিশুকে অনুরোধ করিল,—আর ত চাঁপা ফুল পাড় না বিশুদা, আমাকে দেবে গোটাকতক পেড়ে? লক্ষ্মীটি! এই মেয়েটিও সম্প্রতি এই বাড়ীর বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কুসুমের পিতা পতিতপাবন কলিকাতার কোনও থিয়েটারে চাকুরী করিতেন; যদিও তাঁহার বিদ্যার দৌড়টুকু পরিচয় দিবার মতই ছিল, কিন্তু তাহাকে অতিক্রম করিয়াছিল তাঁহার সুকণ্ঠ ও সুশ্রী সুন্দর চেহারা এবং ইহারাই কালে তাঁহার কাল হইয়া দাঁড়ায়। পতিতপাবন যখন কলেজে পড়েন, তখন হইতেই সখের অভিনয়ে গীতি-বহুল ভূমিকায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি প্রশংসিত হন। এম-এ পাশ করিয়া তিনি সরকারী আফিসে ভাল চাকুরীও পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রাখিতে পারেন নাই। রঙ্গালয়ে অভিনয়ের মোহ তাঁহাকে একদা বাস্তবের বৃত্তিবদ্ধ-গৃহ হইতে টানিয়া অবাস্তবের নর্ত্তন নিকেতনে দাঁড় করাইয়া দিল। পতিত-পাবনের বিদ্যা ছিল, সঙ্গীতেও ছিল শিক্ষালব্ধ অধিকার, আর ছিল সহজাত সুকণ্ঠ; সুতরাং নাম বাজিতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু এই জাতীয় নামের সার্থকতা কোথায়? যত দিন জনসাধারণের সহিত আনন্দদানের যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ থাকে, ততদিনই এই নামের মর্য্যাদা; তাহার পর? 'দেহ-পট সনে নট সকলই হারায়।'

পতিতপাবন আর সবই পাইয়াছিলেন, পান নাই কেবল সংযম ও চারিত্রগত নিষ্ঠা। সুতরাং ইহা বলিলে বোধ হয়, অন্যায় হইবে না যে, সব পাইয়াও এই দুইটি বস্তুর অভাবে তিনি সবই হারাইয়াছিলেন। অতিরিক্ত মদ্যপান ও নানা অনাচারে যখন তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল, কণ্ঠে ক্ষত দেখা দিল, তখন রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে অনাবশ্যক মনে করিয়া, আবর্জ্জনার মত অনায়াসে বর্জ্জন করিলেন।

আহিরিটোলায় পতিতপাবনের পৈতৃক বাড়ী; বাড়ীর সদরে ছোট একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পতিতপাবনের পিতামহ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেইজন্যই দেবোত্তরের অভেদ্য বর্ম্ম আঁটিয়া বাড়ীখানি পরবর্ত্তী তিন সরিকের অধিকারে থাকিয়াও এ পর্য্যন্ত ক্ষতবিক্ষত বা হস্তান্তরিত হইতে পারে নাই। এই অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পতিতপাবন তাহার অংশটুকু ভাড়া দিয়া স্ত্রী নবতারা ও কন্যা কুসুমকে লইয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের আগ্রহে তাঁহারই আলয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। বড়বাড়ীর সাত শরিকের সরিক রমানাথ বাবু পতিতপাবনের শ্বশুর এবং নবতারা তাঁহার একমাত্র কন্যা। রমানাথবাবুর আর কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না।

নবতারা এই বাড়ীরই মেয়ে, দীর্ঘকাল সহরে কাটাইয়া আসিলেও এখানকার সকল ধারাই তাহার পরিচিত; কাজেই বড়বাড়ীর বৃহৎ গোষ্ঠীরই সে সামিল হইয়া গেল। কিন্তু তাহার মেয়েকে লইয়াই গোল বাধিল। সমবয়স্ক মেয়েরা প্রথমটা কুসুমের চেহারা ও কাপড়চোপড় পরার কায়দা দেখিয়া চমকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার পরেই এই সহুরে মেয়েটির চাল-চলন, চোখ-মুখের ভঙ্গী, অশোভন রকমের বাচালতা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনা দেখিয়া প্রত্যেকেই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কেহ কেহ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল,—মাগো, মা! সহরে থাকলেই বুঝি এমনই হতে

হয়? সমীহ নেই, লজ্জাসরম নেই, লঘুগুরু জ্ঞান নেই; দূর, দূর!

কুসুম আহিরিটোলার মেয়ে; ইস্কুলে পড়িয়াছে, এই বয়সে বটতলার অনেকগুলি বই পড়িয়াও শেষ করিয়াছে। কলিকাতার রঙ্গালয়-সমূহে তাহার বাবার দ্বার অবারিত, সুতরাং তাহাদেরও প্রবেশ অনায়াসসাধ্য ছিল। নবতারা যদিও কোনও দিন স্বামীর যশোমন্দিরে তাহার যশ যাচাই করিতে যায় নাই, কিন্তু এ বিষয়ে মেয়ের ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। শোর প্রভৃতি অভিনয়-রজনীতেই সে বাপের সহিত রঙ্গালয়ে যাইত, ক্রমে ক্রমে কৌতূহল তাহার এতই নিবিড় হইয়া দেখা দিত যে, যখন তখন সাজঘরেও তাহাকে দেখা যাইত। সেখানে থিয়েটারের যে সব মেয়ে প্রসাধন করিত—তাহারই সমবয়স্ক যে মেয়েগুলি সখী সাজিয়া নাচিয়া গাহিয়া সকলকে অবাক করিয়া দিত,—তাহাদেরই সহিত মিশিবার ও আলাপ করিবার এমন সুযোগ পাইয়া কুসুম যেন বর্ত্তাইয়া যাইত। পিতার এইরূপ আস্কারা এবং মাতারও একটা ঔদাস্য বা অবহেলার ভিতর দিয়া যাহার বাল্যজীবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার অসংযত ব্যবহার পল্লী অঞ্চলের কোমলমতি বালিকাদের নির্ম্মল মনগুলির সহিত ঠিক মত খাপ খাইতে পারে না। কাজেই একটি মাস এ বাড়ীতে বাস করিয়াও কুসুম কাহারও মন পায় নাই। সকলেই যেন তাহাকে এড়াইয়া যাইতে চাহিত।

বিশু যে এ বাড়ীর সেরা ছেলে, সকলেই তাহাকে ভালবাসে, তাহার সুখ্যাতি সবার মুখে, ইহার সন্ধান পাইতে কুসুমের বিলম্ব হয় নাই। সেও এই ছেলেটিকে প্রথম দিনেই সুনজরে দেখিয়াছিল এবং মেয়েদের ছাড়িয়া এই স্বাস্থ্যপুষ্ট সুদর্শন ছেলেটির সহিত ভাব করিতে তাহার বিশেষ আগ্রহও দেখা গিয়াছিল। এ অবস্থায় সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ সহজেই জমিয়া উঠিবার কথা; কিন্তু তাহাতে বাধা দিল শোভা। কুসুমকে বিশুদার সহিত ভাব করিতে দেখিয়াই সে সহসা ছুটিয়া আসিয়া তাহার কাণে কাণে বলিয়া দিল,—ওর সঙ্গে মিশো না, বিশুদা, ও খারাপ মেয়ে।

কথাটা বিশুর কাণে কাণে বলিলেও কুসুম উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিয়াছিল এবং তৎক্ষণাৎ শোভার আঁচোলটা টানিয়া কৈফিয়ৎ চাহিল,—কিসে আমি খারাপ মেয়ে তোকে বলতে হবে।

শোভা প্রথমটা থতমত হইয়াছিল, পরক্ষণেই সামলাইয়া কহিল,—সবাই ত বলে।

কুসুম কহিল,—যে যা বলুক, তুই কেন বললি—তাই বল?

শোভার কাছেই তাহার বিশুদা বিদ্যমান, সহরের এই মেয়েটিকে তাহারা মনে মনে একটু ভয়ও করিত, কিন্তু বিশুদার ভরসায় সেও ভরসা করিয়া কহিল,—বলবই ত, তুই খারাপ কথা বলিস, তাই তুই খারাপ মেয়ে।

কুসুম এবার দুইচক্ষু পাকাইয়া কহিল,—মিথ্যাবাদী কোথাকার! ঠাস করে গালে এক থাপড়া বসিয়ে বদনখানি বিগড়ে দেব এখুনি—

কিন্তু শোভা আঁচল ছাড়িয়া থাপড়া তুলিতে না তুলিতেই বিশু খপ করিয়া কুসুমের হাতখানা ধরিয়া কহিল,—ছি! তা বলে তুমি একে মারবে না কি?

কুসুম জোর করিয়া হাতখানা ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিল,—কেন মারব না? তোমার নামে কেউ মিছি মিছি কিছু বললে তুমি চুপ করে থাকতে পার? হাত ছেড়ে দাও বিশুদা!

কুসুমের মুখে এই প্রথম বিশুদা সম্বোধন! বিশু তাহার হাতখানি ছাড়িয়া দিয়া কহিল,—তা যেন ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু তুমি ওকে মারতে পারবে না তা বলে রাখছি। তার চেয়ে দুজনে ভাব ক'রে ফেল, এস, তিনজনে মিলে খেলি।

কুসুম বিশুর সহিত খেলিবে বলিয়াই ভাব করিতে আসিয়াছিল, বিশুর মুখে এ প্রস্তাব শুনিয়া সে আর হাত তুলিল না, বরং প্রসন্নমুখেই কহিল,—আচ্ছা, আমি রাজী।

শোভার মুখে কিন্তু প্রসন্নতার কোনও চিহ্নই ফুটিয়া উঠিল না, সে গম্ভীর ভাবেই মুখখানা ফিরাইয়া লইল।

কুসুম কহিল,—দেখ ত, বিশুদা, শোভা এখনো মুখখানা ভার করে রয়েছে, ও তাহলে খেলবে না; চল, আমরা দুজনেই খেলি।

কিন্তু কুসুম জানিত না যে, খেলায় শোভা যোগ না দিলে বিশু মনোযোগ দিয়া খেলিতে পারিত না এবং খেলাও জমিত না। শোভার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিশু তাহাকে খেলায় আজ নামাইল বটে, কিন্তু খেলিতে খেলিতে সে স্পষ্ট লক্ষ্য করিল যে, শোভার

উৎসাহ মোটেই নাই, সে যেন মনমরা হইয়া খেলিতেছে। এদিকে কুসুম এমনই দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল যে, বিশুকে পর্য্যন্ত বলিতে হইল,—আচ্ছা মেয়ে ত!

বিশু বুঝিয়াছিল, শোভা কুসুমকে পছন্দ করে না; সুতরাং কুসুম তাহাদের খেলায় যোগ দিলে শোভা কিছুতেই খেলিবে না। অগত্যা কুসুমকে ছাড়িয়াই সে পরদিন খেলার ব্যবস্থা করিল; খেলার সময় কুসুম হাসিমুখে আসিয়া যুটিলেই সে পড়ার প্রসঙ্গ তুলিয়া খেলা ভাঙিয়া দিল। এইভাবে দুই চারি দিন লুকোচুরি চলিল।

ইহার পরেই উভয়ের মধ্যে মনোবাদ দেখা দিল। কুসুম দেখিল, দুইজনে কথাবার্ত্তা নাই, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ। এই অবস্থায় কুসুম আসিয়া বিশুকে ধরিল চাঁপাফুল পাড়িয়া দিবার জন্য।

এই ফুল পাড়াটাও ছিল ইহাদের খেলার একটা অঙ্গ। বড়বাড়ীর সন্নিহিত সুবৃহৎ দীঘির পাড়ে যে অতিকায় গাছটির শাখায় শাখায় চাঁপার গুচ্ছ প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ বিতরণ করিত, বিশু অনায়াসে সেখানে উঠিয়া ফুলগুলি চয়ন করিত, আর গাছটির গোড়ায় দাঁড়াইয়া শোভা আঁচল বিছাইয়া সেগুলি সংগ্রহ করিত। কয়েকদিন শোভার অনুপস্থিতিতে ফুলপাড়া হয় নাই এবং কুসুমেরও আজ একান্ত আগ্রহ হইয়াছে,—বিশুদা গাছে উঠিয়া ফুল পাড়ে, আর তলায় থাকিয়া সে ফুলগুলি তাহার আঁচল পাতিয়া ধরে, তাই এই প্রস্তাব।

অন্য দিন হইলে বিশু কি করিত বলা যায় না, কিন্তু আজ কুসুমের মুখে এই অনুরোধ শুনিবামাত্রই সে সায় দিয়া কহিল,—বেশ ত, চল যাই।

গাছে উঠিয়া বিশু একটি একটি করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া নিম্নে কুসুমের প্রসারিত অঞ্চলের উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল সত্য, কিন্তু তাহার মুখে কি তখন অন্যান্য দিনের মত পরিতৃপ্তির স্নিগ্ধ হাসিটুকু দেখা গিয়াছিল?

মাথার খোঁপাটির চারিধারে চাঁপার চক্রব্যূহ রচিয়া হাসিমুখে কুসুম যখন শোভাদের বাড়ীতে গেল, শোভার মা সে সময় শোভার চুল বাঁধিয়া দিতেছিলেন।

কুসুম তাহার পাশটিতে দাঁড়াইয়া মুখের হাসিটুকু চাপিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—এই ভাখ ভুভি, বিশুদা গাছ ঝুড়িয়ে সব ফুল আমাকে পেড়ে দিয়েছে, তুই ত গেলিনি, আমি তোর জন্যেও গোটাকতক এনেছি, এই নে।

কথাটা শেষ করিয়াই সে আঁচল হইতে গোটাকতক ফুল শোভার কোলের উপর ফেলিয়া দিল। এক হাতা জ্বলন্ত অঙ্গার যেন শোভার গায়ে আসিয়া পড়িল,—সে তৎক্ষণাৎ ফুল কয়টা উপেক্ষায় তুলিয়া দুই হাতে ছিঁড়িয়া ডলিয়া কুসুমের মুখের উপর ছুড়িয়া ফেলিল।

কুসুমের মুখখানা সেই মুহূর্ত্তে কালো হইয়া গেল,—পরক্ষণেই তাহা কঠিন করিয়া কহিল,—ভারি তেজ হয়েছে মেয়ের; এতটা কিন্তু ভাল নয়।

শোভার মা হাসিয়া কহিলেন,—কি হল তোদের? বিশুর সঙ্গে ঝগড়া বুঝি এখনো মেটেনি?

শোভার তখন চুল বাঁধা শেষ হইয়াছিল, মায়ের কথায় কোনও উত্তর না দিয়া দুম দুম করিয়া পা ফেলিয়া ঘরের মধ্যে ক্রুদ্ধ বেগে চলিয়া গেল। কুসুমও তৎক্ষণাৎ বিশুর সন্ধানে ছুটিল—এখনকার সংবাদটুকু যে বিশুদাকে না শুনাইলেই নয়।

৮

বিশুর সন্ধানে গিয়া কুসুম শুনিল, এই মাত্র সে মামার বাড়ী গিয়াছে; একদিন পরে ফিরবে।

শোভাকে তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিবার জন্য কুসুম মনে মনে যে তীরগুলি বাছিতে বাছিতে আসিতেছিল, এ খবরে সে সমস্তই গুলাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিশুর উপর তাহার মনে অভিমানও নিবিড় হইয়া উঠিল। ফুল পাড়িবার সময় বিশু তাহাকে বলিয়াছিল বটে, কাল স্কুলের ছুটি। কিন্তু সে যে আজই মামার বাড়ী যাইবে এবং ছুটির দিনটি সেইখানেই কাটাইবে, সে কথা তাহাকে বলে নাই। যদি বলিত, কুসুম কিছুতেই তাহাকে যাইতে দিত না; কেন না, ছুটির দিনটির জন্য সে একটি নূতন ধরণের খেলার পরিকল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল; শোভার আজিকার উদ্ধত আচরণের কথাটা সর্ব্বাগ্রে বিশুকে শুনাইয়া তাহার পরই খেলার কথাটা পাড়িবে, ইহাই ছিল কুসুমের উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশুর অনুপস্থিতিতে সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল।

ছুটির দিনটি মাতুলালয়ে কাটাইয়া এবং

তাহার পরদিন সেখান হইতেই স্কুলের পাঠ সারিয়া বিশু যথাসময়েই বাড়ী ফিরিল। কুসুম জানিত, বিশু স্কুল কামাই করিবার ছেলে নহে, পড়িবার বইগুলি সে যে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, সে খবরও তাহার অবিদিত ছিল না; সুতরাং অপরাহ্নে সে সাজিয়া গুজিয়া প্রস্তুত হইয়াই বিশুর প্রতীক্ষা করিতেছিল। শোভার সম্বন্ধে সে দিনের সংবাদ ত মুলতুবী আছেই, তাহা ভিন্ন এই দুইটি দিনে আরও যে-সব খবর তাহার মনের ভাণ্ডারে জড়ো হইয়াছে, তাহাদের গুরুত্বও কম নহে, সমস্ত শুনিলে বিশু আর কখনই শোভার সহিত মিশিতে চাহিবে না—বরাবরের মত উহাদের মধ্যে আড়ি থাকিয়া যাইবে, ভাব আর হইবে না।

বিশুকে দেখিয়াই কুসুম গম্ভীর মুখে কহিল,—বইটই রেখে জামা কাপড় ছেড়ে শীগগীর এসো বিশুদা, অনেক কথা আছে।

কুসুমকে দেখিয়া বিশুর মুখখানা যে খুব প্রসন্ন হইয়াছে—তাহা মনে হইল না, অথবা অনেক কথা শুনিবার লোভেও তাহার শ্রান্ত মুখে কোনও তীব্র আগ্রহের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতে দেখা গেল না; শুধু সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুসুমের মুখের দিকে চাহিয়া উপেক্ষার সুরে কহিল,—তোর না আর কারুর?

কুসুম কহিল,—শুনলে টের পাবে কার।

বিশু কহিল,—আচ্ছা দাঁড়া, আমি এখুনি আসছি।

কথাটা বলিয়াই সে বাড়ীর দিকে চলিল, কয়েক পা গিয়াই পুনরায় ফিরিয়া কহিল,—আজকেও ত ফুল তোর চাই?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া কুসুম কহিল,—চাই না? আগে ত এসো, ফুলের কথা সব শোনো, তারপর যা করবার হয় ক'রো।

বিশু আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল, কুসুম উঠানে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। বিশুর ফিরিতে বেশী বিলম্ব হইল না। কুসুম তাহার হাতখানি ধরিয়া চাঁপা গাছের উদ্দেশে চলিল এবং যাইতে যাইতে শোভার সে দিনের রূঢ় ব্যবহারের বিষয় বাড়াইয়া সাজাইয়া বিশুকে শুনাইয়া দিল।

কিন্তু কুসুমের অদৃষ্টক্রমে বিশু শোভার উপেক্ষায় উষ্ণ না হইয়া কুসুমের আচরণেই চটিয়া গেল, রুক্ষকণ্ঠে কহিল,—তুই পোড়ারমুখী কেন তাকে সেধে ফুল দিতে গিয়েছিলি? আমি তোকে যেতে বলেছিলুম?

কুসুম মুখখানা আশ্চর্য্য ভাবে ঘুরাইয়া কহিল,—তুমি কেন বলতে যাবে? আমিই মরতে গিয়েছিলুম ভাল ভেবে। ফুল সে ভারী ভালবাসে, তুমি রোজ তাকে যোগান দিতে; অতগুলো ফুল পেয়ে মন কেমন করে উঠল তার জন্যে, তাই না গিয়েছিলুম! ও মা, তাতে যা তা ব'লে গালিয়ে আমাকে একবারে থ করে দিলে, যা নয় তাই মুখে আনলে; মাগো-মা! আমি একেবারে কাঁটা। আর কি খোঁটাটা তোমাকে দিলে! তারপর ফুলগুলোকে নিয়ে ছুটে পা দিয়ে মাড়িয়ে থেঁতলে দুম দুম করে চলে গেলো,—এত তেজ মেয়ের!

বিশু নিবিষ্ট মনে কথাগুলি শুনিল, কিন্তু আর কোনও প্রতিবাদ তুলিল না, উত্তরও দিল না। কুসুমের মনটি তখন হাসিতে ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মুখে তাহার চিহ্নও সে প্রকাশ পাইতে দেয় নাই।

বিশু নিরুত্তরে মালকোঁচা বাঁধিয়াই অবলীলাক্রমে প্রাচীন গাছটির সুদীর্ঘ কাণ্ডদেশ বাহিয়া ঊর্দ্ধতম অংশে উঠিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে কতিপয় শাখাপ্রশাখার সংযোগস্থলে স্থির হইয়া বসিতে দেখিয়া কুসুম কহিল,—আর শুনেছ বিশুদা, শোভি এখন খেলার নতুন সাথী পেয়েছে?

গভীর জলে লোষ্ট্র পড়িলে পরক্ষণেই যেমন বুদ্বুদ উঠে, কুসুমের এ কথায় বিশুর গম্ভীর মুখেও ঠিক সেই ভাবে প্রশ্ন উঠিল,—কে?

কুসুম কহিল,—তুমি ত এখানে ছিলে না, জানবে কি করে বল! কাল দুপুরের গাড়ীতে ওরা সব এসেছে,—ঐ যে গো, শোভির বাবা যাদের চাকরী করে, খুব নাকি বড় লোক, রেঙ্গুনে থাকতো—

বিশু উৎসুক হইয়াই কুসুমের কথা শুনিতেছিল, সে এইখানে হঠাৎ থামিতে বিশু কহিল,—চন্দর কাকার কথা বলছিস?

কুসুম এবার উৎসাহের সুরে কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নামটা ভুলে গিয়েছিলুম। তা তোমার চন্দর কাকা ঠিক যেন চন্দুরে ঘোড়া; বুড়ো হাবড়া হলে কি হবে, গায়ের রং এখনো ধব ধব করছে,—যাকে বলে, দুধটুকু মেরে ক্ষীরটুকু আর কি!

বিশু অসহিষ্ণুভাবে কহিল,—তুই ভারি বাজে বকিস, যেটা বলবি, খপ করে বলে ফেল্ না—

কুসুম সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল,—তাই ত বলছি, তুমি না হয় একটু সবুর করেই শুনলে! হ্যাঁ, যা বলছিলুম, তোমার চন্দর কাকা গুষ্টিশুদ্ধ এখানে এসেছেন জমিদারী দেখতে। গুষ্টির মধ্যে ত বুড়ো বুড়ী আর একটি মাত্র ছেলে; তবে সঙ্গে এসেছে এক পাল লোক,—ঝি, চাকর, দরোয়ান, রাঁধুনি, খানসামা; বাবা! তিনটি লোকের পেছনে পাঁচ পাঁচটা প্রাণী!

বিশু বিরক্তির সুরে কহিল,—কেন হবে না, চন্দ্র কাকা যে সে লোক নাকি? মস্ত উকীল, কত নাম, কত টাকা উপায় করে তা জানিস?

কুসুম বিজ্ঞের মত মুখের ভঙ্গী করিয়া কহিল,—তা আর জানি না, সব ত শুনিছি। কলকেতায় তিন চারখানা বাড়ী করেছে, গাড়ী ঘোড়া আছে; বেশ লোক! কিন্তু ওর ছেলেটা ভারি দেমাকে; বড় লোকের ছেলে আর দেখতে খুব সুন্দর বলে মাটীতে অহঙ্কারে আর পা যেন পড়ে না।

বিশু উৎসুক দৃষ্টি গাছের উপর হইতে নিয়ে কুসুমের দিকে নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—তোর সঙ্গে বুঝি ঐ ছেলেটার ঝগড়া হয়েছে?

মুখখানা ভার করিয়া কুসুম কহিল,—ঝগড়া কেন হবে, শোন না বলি; দুটিতে মুখোমুখী বসে ছবি দেখা হচ্ছিল। আমাকে দেখেই শুভি বইখানা তখুনি মুড়ে ফেললে; ছেলেটা একবার আড়চোখে আমার পানে তাকিয়ে বলে উঠলো—চল্ শোভা, আমরা তেতলার ঘরে যাই। শুভি অমনি ডুগ্‌রে হেসে উঠে তার কথায় সায় দিয়ে বললে—সেই ভালো, অখিল দা, চলো—

বিশু শুষ্ক কণ্ঠে কহিল,—চন্দ্র কাকার ছেলের নাম অখিলই বটে; নামটাই শোনা আছে, দেখা ত আর হয় নি। তার কথা, কত বড় ছেলেটা রে, কুসী?

কুসুম জানাইল,—এই মাথায় ঠিক তোমারই মতন, কিন্তু তোমার চেয়ে তার গায়ের রং ঢের ফরসা, ঠিক যেন দুধে আলতায় গোলা; রেঙ্গুনে থাকে কি না—

বিশু পূর্ব্ববৎ শুষ্ক কণ্ঠে মন্তব্য প্রকাশ করিল,—ভালই ত!

শুভি কি ঠিক করেছে জান, বিশুদা?

কি?

তোমার সঙ্গে আর সে ভাব করবে না, মিশবে না, খেলাও করবে না; অখিল ছেলেটা এখানেই নাকি থাকবে, খেলবেও তার সঙ্গেই—আসতে না আসতেই ত গলাগলি ভাব হয়ে গেছে।

বিশু এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল,—তুই থাম।

মুখখানি বিকৃত করিয়া কুসুম কহিল,—থামব কেন—আমি কি মিছে কথা বলছি? এসোনা দেখবে, দুজনে বসে ছবি দেখবার কি ঘটা! আহ্লাদে মেয়ের স্কুলে পর্য্যন্ত যাওয়া হয় নি! বড় লোকের ছেলের সঙ্গে ভাব হয়েছে, তিনি কত রং বেরংয়ের ছবি এনেছেন, মেয়ে অমনি তাইতে দেমাকে ফেটে মরছেন আর কি! কাউকে দৃকপাত নেই—বুঝলে?

হঠাৎ গাছের একটা ডাল দুলিয়া উঠিল,—পরক্ষণে ধুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। কুসুম দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া দেখিল, ফুল পাড়ার আগ্রহ ত্যাগ করিয়া এবং গাছের দীর্ঘ কাণ্ডটা বাহিয়া নামিবার মত ধৈর্য্যটুকু হারাইয়া তাহাদের বিশুদা একলাফে নিচে উপস্থিত!

বিস্ময়ের সুরে কুসুম কহিল,—মাগো! এ কি তোমার কাণ্ড বিশুদা, এমন করে লাফাতে হয়? যদি হাত পা ভাঙত?

রুক্ষ কণ্ঠে বিশু কহিল,—আমারই লাগতো, তাতে কার কি হত! না হয় আমিই মরতুম—

মুখখানি ম্লান করিয়া কুসুম কহিল,—বালাই! ও কথা বলতে আছে নাকি?

বিশু বিকৃত মুখে কহিল,—থাম্, তোকে আর অমন করে ঢং দেখাতে হবে না।

তুমি যেন কি! তা, নেমে এলে যে বড়? ফুল আজ পাড়বে না?

না।

কেন, কি হল তোমার?

হবে আবার কি—পাড়ব না; আমার খুসী।

দুই চক্ষুর দৃষ্টি ছল ছল করিয়া কুসুম আব্দারের ভঙ্গীতে কহিল—আমি খোঁপায় পরব না? লক্ষ্মীটি! অন্ততঃ গোটাকতক পেড়ে দাও, আমি যে ভেবেছিলুম এক ছড়া মালা গেঁথে গলায় পরে শুভিকে দেখিয়ে বলব—বিশুদা দিয়েছে।

এ অনুরোধও বিশুর মর্ম্মস্পর্শ করিল না, সে মুখখানা কঠিন করিয়াই কহিল,—বয়ে গেছে আমার! আমি আর ফুলও পাড়বো না, তোদের সঙ্গে খেলবও না, আমি ছেলে, ছেলেদের সঙ্গেই খেলব!

কথা কয়টি শেষ করিয়াই বিশু অদূরবর্ত্তী মাঠের দিকে ছুটিল, যেখানে বড়বাড়ীর ও পল্লীর নানা বয়সের ছেলেরা খেলায় মাতিয়াছিল। যে মেয়েটি এতক্ষণ তাহার কাছে ছিল, যাহার তুষ্টিবিধানে সে অবলীলাক্রমে গাছের উচ্চ ডালে ফুল আহরণ করিতে উঠিয়াছিল, তাহার দিকে সে আর ফিরিয়াও চাহিল না, সমস্ত বন্ধনই যেন সেই মুহূর্ত্তে উপেক্ষায় ছিন্ন করিয়া গেল।

কুসুম ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, বিশুর হঠাৎ এরূপ ভাবান্তর হইল কেন? যে উৎসাহটুকু লইয়া সে তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিতে গাছের উপর উঠিয়াছিল, সহসা কেন তাহা ভাঙ্গিয়া গেল এবং মেয়েদের সহিত আর খেলিবে না বলিয়া কেনই বা এরূপ অভিমান করিয়া খেলার মাঠে ছুটিল?

৯

দীর্ঘকাল পরে বড়বাড়ীর ধনাঢ্য সরিক চন্দ্রনাথ বাবুর সপরিবার আবির্ভাবে শোভার পিতা ধরণীধর যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাড়ীর ও পল্লীর সকলেই নবাগতদের কায়দাকানুন দেখিয়া তেমনই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের চাল চলন, আচার ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, পোষাক পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়ার ধারা প্রত্যেকটি কেমন যেন বৈচিত্র্যময়, পল্লীসমাজের সহিত খাপ খাইবার উপযোগী নয়। তথাপি কৃতজ্ঞ ধরণীধর একান্ত অনুগতের মতই সপরিবার প্রতিপালক-স্থানীয় অভ্যাগতদের পরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন; কোনও বিষয়ে যাহাতে এই সম্মানভাজন ব্যক্তিদের অসুবিধা না ঘটে, সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিলেন। ধরণীধরের পত্নী সাবিত্রী দেবী এই ক্ষুদ্র সংসারটি মাথায় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সুব্যবস্থায় ও আদর-আপ্যায়নে চন্দ্রনাথ বাবুর সহধর্ম্মিণী মহামায়া দেবী মুগ্ধই হইয়াছিলেন; ইঁহারা যে কর্ম্মসূত্রে তাঁহাদেরই অনুগ্রহভাজন, এরূপ ধারণাকে মনে স্থান দেন নাই, সুতরাং ইঁহাদের মেলামেশায় অবস্থাগত পার্থক্য কোনরূপ ব্যবধান উপস্থিত করিতে পারে নাই।

শোভা সে দিন স্কুল হইতে ফিরিয়া বিস্ময়ানন্দে দেখিল, বাড়ীতে কতকগুলি নূতন লোক আসিয়াছে বং যে ঘরগুলি প্রায়ই বন্ধ থাকিত, সেগুলি কেমন সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সবচেয়ে বেশী বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল, ইঁহাদের আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর ছেলেটি; একান্ত অপরিচিত হইয়াও শোভাকে দেখিয়াই কেমন হাসিমুখে তাহার কাছটিতে ছুটিয়া আসিল।

মহামায়া দেবী শোভাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া হাসিমুখে কহিলেন,—খাসা মেয়ে ত আপনার, পাড়াগাঁয়ে এমন রূপ যে থাকে, তা ত জানতুম না। পড়াচ্ছেন বুঝি, বেশ করেছেন।

কন্যার রূপের প্রশংসায় সাবিত্রী দেবীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—গাঢ় স্বরে কহিলেন,—পড়ার দিকে ভারি ঝোঁক দিদি। আর শুনেছি, পড়াশুনাতেও নাকি ভালো।

মহামায়া কহিলেন,—আমার খোকাও পড়ার নামে পাগল, বয়েস ত দেখছেন এই; কিন্তু পড়াশুনায় এগিয়েছে অনেক খানি।

খোকা অর্থাৎ অখিল নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল এবং চাহিয়া চাহিয়া ফ্যাল-ফ্যাল্ করে এই মেয়েটিকে বিশেষ করিয়াই দেখিতেছিল। শোভাও দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া পড়াশুনায় অনেকখানি অগ্রসর এই খোকাটির দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু চোখোচোখি হইতেই সে লজ্জারক্ত মুখখানি নত করিল।

মহামায়া কহিলেন,—লজ্জা কিসের মা, এখুনি যে ভাব হয়ে যাবে, দুটিতে খেলবে, পড়বে, গল্প করবে, আমরা যে আপনার জন তোমাদের।

পরক্ষণে অখিলের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—খোকা, তোমার ছবির য়্যালব্যমগুলো সব এনেছ ত?

খোকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—আনিয়াছে।

মা কহিলেন,—খুকী আগে কাপড় চোপড় ছাড়ুক, জলটল খাক, তারপর একে নিয়ে গিয়ে দেখাবে, পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসাবাদ করবে, বুঝলে?

অখিল উৎসাহিত হইয়া শোভার দিকে চাহিয়া কহিল,—আমি তাহলে ছবির বইগুলো নিয়ে আসি।

শোভা নিরুত্তরে ঘাড়টি ঈষৎ হেলাইয়া সম্মতি জানাইল।

দেশবিদেশের নানাবিধ সুরঞ্জিত ছবি অনতিবিলম্বেই এই দুইটি অপরিচিত-অপরিচিতার চিত্তে আনন্দ ও বিস্ময়ের মধ্য দিয়া একটা প্রীতিপূর্ণ ঘনিষ্টতার সৃষ্টি করিয়া দিল।

শোভার মা শোভাকে বলিয়া দিয়াছিলেন,—অখিল তোর দাদা হয়, দাদা বলে ডাকবি।

মায়ের কথায় ঘাড়টি নাড়িয়া সম্মতি দিয়া শোভা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—বিশুদা যে রকম দাদা, নয় মা ?

ছবির বইগুলি লইয়া অখিল সেখানে উপস্থিত ছিল, এই নূতন মেয়েটির মুখে সে এই প্রথম বিশুর নামটি শুনিল। কিন্তু ছবি দেখাইতে বসিয়া শীঘ্রই যখন শোভার সহিত তাহার ভাব হইয়া গেল এবং শোভা তাহার আড়ষ্টভাবটুকু কাটাইয়া ছবিগুলির আলোচনায় যোগ দিবার মত সাহস পাইল, তখন তাহার মুখে কতবারই সে 'বিশুদা' নামক ছেলেটির কথা শুনিল।

একখানা ছবিতে বালক নেপোলিয়ন স্কুলের ছেলেদের সহিত বরফ লইয়া যুদ্ধক্রীড়া করিতেছে, এরূপ অঙ্কিত ছিল। নেপোলিয়নকে দেখিয়াই শোভা হর্ষোৎফুল্ল মুখে কহিয়া উঠিল,—ঠিক যেন আমার বিশুদা! খেলবার সময় সেও ঠিক এমনি করে খেলে, আর সকলকে হারিয়ে দেয়।

শোভার কথায় অখিলের উৎসাহ বাধা পাইল, আড় নয়নে বালিকার উৎসাহদীপ্ত মুখখানির দিকে চাহিয়া, সে নূতন ছবি বাহির করিল। কিন্তু যে ছবিতেও কোনও ছেলের হৃষ্টপুষ্ট চেহারা বা বিক্রম প্রকাশের দ্যোতনা যখনই দেখা যাইত, তৎক্ষণাৎ সে উল্লাসে করতালি দিয়া তাহার উদ্দেশে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মত প্রকাশ করিত,—এও বিশুদা চাই!

আর একখানি বিলাতী ছবিতে দেখা গেল, স্কুলের ছেলেদের মধ্যে খেলার সূত্রে বিষম ঘুসোঘুসি বাধিয়া গিয়াছে; কিন্তু একটি বলবান বালক একাই সকলকে হটাইয়া দিতেছে। ছবির এই বিজয়ী ছেলেটিকে দেখিয়াই শোভার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—সেবার বিশুদাও ঠিক এমনই করে স্কুলের এক পাল ছেলেকে একবারে পাট বিছিয়ে দিয়েছিল।

পরক্ষণে দুই চক্ষু তুলিয়া অখিলের দিকে চাহিয়া কহিল,—তুমি দেখ না ভাল করে, তোমারও মনে হবে—ঠিক বিশুদা।

মুখখানা কঠিন করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে অখিল কহিল,—কে তোমার বিশুদা, আমি কি তাকে দেখেছি যে চেহারা মেলাব।

শোভা এবার নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, অপ্রতিভের মত লজ্জাজড়িতকণ্ঠে কহিল,—বিশুদার সঙ্গে তোমার যে এখনো দেখা হয় নি, আমি সে কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। মামার বাড়ী গেছে, তাদের ইস্কুলের আজ ছুটি কিনা, নইলে এখুনি—

কথাটা আর শেষ হইল না, হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিশুদার সহিত এখনও তাহার ভাব হয় নাই, আড়ি রহিয়াছে; তবে! কিন্তু বিশু যে মামার বাড়ী গিয়াছে, এ সংবাদ শোভার অজ্ঞাত ছিল না।

এমন আশ্চর্য্য ছবি দেখার মধ্যেও এই মেয়েটিকে এক একবার অন্যমনস্ক দেখিয়া এবং ছবি-বিশেষের প্রশংসায় বারবার সে বিশুর প্রসঙ্গ তুলিতে থাকায়, অখিল ক্রমশঃই অধীর ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছিল। ছবিতে ভাল ছেলে দেখিলেই তাহার এই নূতন সঙ্গিনীটি কল আনন্দেই বিশুদার নাম করে, তাহার দুই কাণ দিয়া যেন জ্বালা ঝরিতে থাকে;—কেরে বাপু তোর বিশুদা! মনের এই বিক্ষুব্ধ ভাবটুকু চাপিয়া একবার সে শুষ্ককণ্ঠে কহিয়া ফেলিল,—তুমি ত বেশ মেয়ে দেখছি! ছবির সকলেই যেন তোমার বিশুদা! এত ছবি ত দেখলে, কিন্তু কোনোটাকেই ত বললে না—তাকে দেখতে ঠিক আমার মতন! তোমার বিশুদা কি আমার চেয়েও ভাল ছেলে? আমার চেয়েও সুন্দর? এমন সব দামী দামী ছবির বই তার আছে?

নিমিষে শোভার মুখের ঔজ্জ্বল্য যেন নিবিয়া গেল, বিস্ময়দৃষ্টিতে অখিলের দিকে চাহিয়া সে কহিল,—বিশুদা যে শুধু পড়ার বই পড়ে, এ রকম ছবির বই ত তার নেই, কোথায় পাবে বল না? কিন্তু তার গায়ে খুব জোর, তুমি তাকে দেখনি—

সে তোমার কে হয়?

দাদা। তুমি যেমন দাদা হয়েছ, সেও তাই।

কোথায় সে থাকে?

কেন, এই বড়বাড়ীতেই; ওরাও যে একটা সরিক, তা বুঝি জান না?

সে বুঝি অনেক বড়?

তা কেন, ঠিক তোমারই বয়সী; তবে তোমার মতন এমন ছিপছিপে রোগা নয়, এত সুন্দরও নয়। ছবির কথা বলেছিলে না? যে ছেলেগুলো দস্যিপনা করছে আর ঠ্যাঙাচ্ছে, তারা যে ঠিক বিশুদার মত, আর যারা মার খেয়ে পালাচ্ছে তারা—

আমার মতন বুঝি?

ছবিতে তাদের রোগারোগা চেহারা নয়?

রোগা চেহারা কি খারাপ?

আমি ত ওকথা বলিনি, হলেই বা রোগা, নাই বা মারামারি করলে, বেশত, তুমি ভালছেলে হয়েই থাক না।

আমি মারামারি মোটেই পছন্দ করি না। তোমার বিশুদা বুঝি এসব খুব ভালবাসে ?

দুই চক্ষু সহসা দীপ্ত করিয়া শোভা কহিল,—বিশুদা ? তার কথা আর বল কেন! কেউ যদি একটা কিছু অন্যায় করলে, আর রক্ষে নেই ; ছেলে অমনি মালকোঁচা না বেঁধে তখনি রণমুখী—এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটুকু শেষ করিয়া পরক্ষণেই সে বিশুদার রণরঙ্গের কাহিনীগুলি একটি একটি করিয়া তাহার সঙ্গীকে শুনাইয়া দিল :—কবে কোথায় কি ভাবে কি সূত্রে বিশু লুটবিহারীর দাঁত ভাঙিয়া দিয়াছিল, সাঁতারে সব ছেলেকে হারাইয়া কি প্রকারে মেডেল পাইয়াছিল, স্কুলের ছেলেরা একজোট হইয়া তাহাকে ঘেরাও করিলেও সে একাই কি ভাবে সকলকে কাবু করিয়াছিল এবং সেদিনও স্কুলের পথে কি কাণ্ড সে বাধাইয়াছিল—কিছুই বাদ দিল না, এবং এ কথাও লুকাইল না যে, বিশুদার এই সব কাণ্ড সে অকুস্থলে উপস্থিত থাকিয়া অবাক হইয়াই দেখিয়াছে।

অখিল অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার এই নূতন সঙ্গিনীটির মুখে উক্ত গুণ্ডা-প্রকৃতির ছেলেটির রোমাঞ্চকর কাহিনী আগাগোড়াই শুনিল ও শুনিয়া মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা তীব্র মুখে সে কহিল,—তবুও এই ছেলেটার সঙ্গে তুমি মেশ ? তোমার লজ্জা করে না ? মনে ঘেন্না হয় না ?

শোভার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল, চঞ্চল দুইটি চক্ষুতেও তাহার ছায়া পড়িল ; সপ্রতিভ কণ্ঠে সে উত্তর দিল,—বা-রে ! ঘেন্না কেন হবে, লজ্জাই বা করব কেন ? বিশুদার কাছে দুটি বেলা যখন পড়তে যেতে হয়—

অখিল কণ্ঠের স্বরে কিঞ্চিৎ শ্লেষ দিয়া কহিল,—এই ছেলেটার কাছেই আবার পড়া হয় ? খালি খালি যে মারামারি করে বেড়ায়, পড়ার সে কি ধার ধারে শুনি ?

শোভা বিজ্ঞের মত মুখ ভঙ্গী করিয়া কহিল,—তা বুঝি জান না, পড়া শোনায় বিশুদা খুব ভাল ; পড়াতেও কেউ ওকে হারাতে পারে না !

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া অখিল প্রশ্ন করিল, এখনও ওর কাছেই তা হলে পড়া হয় ?

এ প্রশ্নে শোভার সুন্দর মুখখানির উপর যেন একটি আবরণ পড়িল ; একটি নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদু কণ্ঠে সে উত্তর দিল,—এ হপ্তায় একটি দিনও হয় নি ! বিশুদা ডাকে না, আমিও যাই না—

কেন ?

ঝগড়া হয়েছে, তা বুঝি জান না ? আচ্ছা অখিল দা, তুমিই বল ত, দোষটি কার ! অতঃপর কি সূত্রে তাহাদের এই কলহ, উভয়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা যে এই কয়দিন বন্ধ এবং দুষ্টু মেয়ে কুসীর সঙ্গে মিশিয়া, সোহাগ করিয়া তাহাকে ফুল পাড়িয়া দিয়া ও গোটাকতক ফুল তাহার হাত দিয়া পাঠাইয়া কি ভাবে বিশুদা তাহার অপমান করিয়াছে, প্রত্যুত্তরে ফুল গুলির ছিঁড়ে চটকাইয়া সেও কেমন জবাব দিয়াছে—এ সকল কাহিনীও আত্তকণ্ঠে শোভা তাহার সঙ্গীকে শুনাইতে দ্বিধা করিল না।

এই সময় কুসুম সেইখানে আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—বড় মানুষের ছেলেটিকে একলাই গিলে খাসনি শুভ, আমরাও না হয় ভাব করলুম !

কুসুমের আবির্ভাব ও তাহার মত বয়সের মেয়ের পক্ষে অনুচিত এইরূপ বিশ্রী কথায় শোভা অতিমাত্র সচেতন হইয়া তাহার সঙ্গীকে চুপি চুপি শুনাইয়া দিল,—এই দুষ্টু মেয়েটার কথাই এই মাত্র আমি তোমাকে বলছিলুম, এরই নাম কুসী, বেহায়ার এক শেষ, ভারি লাগানে মেয়ে, এর সঙ্গে কথা বলো না তুমি, অখিল দা !

ইতিমধ্যে কুসুম তাহাদের পার্শ্বেই আসিয়াছিল এবং খোলা অবস্থায় ছবির বইখানি দেখিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ একান্ত আগ্রহে তুলিয়া লইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই।

ছবির কেতাবখানি এভাবে হস্তান্তরিত হইতে দেখিয়াই শোভা ক্ষিপ্তের মত সেখানি সবলে কুসুমের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া কহিল,—তুমি এ বইয়ে হাত দিয়োনা বলছি !

কুসুম ভাবে নাই যে, শোভা এই নূতন ছেলেটির সমক্ষেই এভাবে তাহাকে অপ্রস্তুত করিয়া দিবে। ক্ষণকালের জন্য সে যেন হতভম্ব হইয়া গেল, কিন্তু এই ক্ষণকালের মধ্যেই শোভা অখিলের একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে সজোরে

টান দিয়া কহিল,—চল অখিল-দা, আমরা তে-তলার ঘরে যাই।

কুসুম যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখন তাহারা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া সোপান ভাঙ্গিয়া তেতালার ঘরের উদ্দেশে উঠিতেছিল।

১০

সেদিন অখিলের পীড়াপীড়িতে শোভা স্কুল কামাই করিয়াই বসিল। অখিলের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া শোভার বাবা মা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না। এ দিন অখিল যে সকল গল্পের বই ও নানাবিধ নূতন ধরণের খেলার উপাদান শোভাকে দেখাইল, তাহাতে স্কুলের পড়া অপেক্ষা সেগুলির উপরে শোভার উৎসুক চিত্তটি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহারা বুড়ো খোকন, জীব জন্তু ও রাক্ষস-খোক্কস-সব গল্পের বইগুলি দুজনে কাড়াকাড়ি করিয়া পড়িল। কিন্তু এই খেলা ও পড়ার ভিতরে কত প্রসঙ্গেই বিশুদার কথা তুলিয়া শোভা আমোদ প্রমোদের রস ভঙ্গ করিয়া দিল এবং এই সূত্রে কত বারই অখিলের মুখে বিরক্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল।

অপরাহ্নের দিকে খেলিতে খেলিতে হঠাৎ হাতখানি গুটাইয়া শোভা কহিল,—আর ভাল লাগছে না অখিলদা, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে; বিশুদা কিন্তু থাকলে বেশ হ'ত, তিনজনে তাহলে খেলতুম।

শোভা মেয়েটিকে অখিলের ভারি ভাল লাগিয়াছিল; এখানে আসিয়াই সে যে এমন একটি মনের মত খেলার সঙ্গিনী পাইবে, তাহা বুঝি কল্পনাও করে নাই। যতই সে ইহার সহিত মিশিতেছিল, তাহার মনের মধ্যে একটা প্রীতির ভাব ততই যেন নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তথাপি এই তৃপ্তিটুকু অখিলের চিত্তাকাশে নিরবচ্ছিন্ন হইতে পারিতেছিল না, মধ্যে মধ্যে বিরক্তির মেঘ তুলিতেছিল বিশু নামক দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি ছেলেটির প্রসঙ্গ। সুতরাং হাতের ঘুঁটি ফেলিয়া শোভা এই খেলায় বিশুদার যোগদানের সম্ভাবনা তুলিতেই অখিল এবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল।

সত্যই, যে ধারায় এই গর্ব্বিত ছেলেটির মনোবৃত্তি গঠিত হইবার অবসর পাইয়াছে, তাহাতে কোনও আকাঙ্ক্ষাই এ পর্য্যন্ত তাহার অপূর্ণ থাকে নাই বা বাধা পায় নাই। এক মাত্র বংশধর, বিপুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী, আদরের দুলাল এই বালক,—পিতা মাতাও পুত্রের সকল আব্দার রক্ষা করিতে সদা সচেতন। এখানে আসিয়া যে মেয়েটিকে সে তাহার খেলার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে, সে যে তাহাদেরই এক অনুগ্রহ-ভাজনের কন্যা ও এই কন্যার পিতা মাতা ইহাদের পরিচর্য্যায় বিশেষ আগ্রহান্বিত, যেটুকু উপলব্ধি করিবার মত বুদ্ধি এই ছেলেটির ছিল এবং বুদ্ধিটুকু খেলাইয়া সহজেই সাব্যস্ত করিতে পারিয়াছিল যে, এই মেয়েটির উপরও তাহার অধিকার আছে ও তাহারই ইচ্ছার তালে তালে সে পা ফেলিয়া চলিবে। কিন্তু খেলার সম্বন্ধে শোভা নিজের স্বাধীন ইচ্ছাটুকু এ ভাবে প্রকাশ করায় অখিলের সহিষ্ণুতা ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। কাজেই অপ্রসন্ন মুখে সে আপত্তি তুলিল,—তুমি বলচ ভাল আর হয় না, আমি যদি তাকে নিয়ে না খেলি!

নূতন সঙ্গীর এই অদ্ভুত আপত্তি শোভার নির্ম্মল মনটির উপর কঠিন আঘাত দিল, হাসির যে ক্ষীণ আভাটুকু তাহার মুখখানির উপর পড়িয়াছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, দুইটি আয়ত চক্ষুর দৃষ্টিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সে প্রশ্ন করিল,—বিশুদার মতন ভাল ছেলের সঙ্গেও তুমি খেলবে না?

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অখিল উত্তর দিল,—না; ওকে বুঝি ভাল ছেলে বলে? পাজী—দুষ্টু—ডানপিটে—

চাঁপার কলির মত সুন্দর অঙ্গুলিটি তুলিয়া গম্ভীর মুখে শোভা কহিল,—চুপ। বিশুদা যদি এ কথা শোনে, রক্ষে রাখবে না কিন্তু!

অখিল রীতিমত রুখিয়া কহিল,—কি করবে সে আমার শুনি? আমি তাকে 'কেয়ার' করি না—

শোভা কণ্ঠস্বর অতিশয় স্নিগ্ধ ও কোমল করিয়া কহিল,—তুমি ত এখনো বিশুদাকে দেখ নি, তবে কেন তার ওপর মিছিমিছি রাগ করছ, অখিল দা? সত্যি, সে কারুর সঙ্গে ওপর-পড়া হয়ে ঝগড়া করে না, ইটটি কেউ ছুঁড়লে, তবে সে পাটকেলটি ছুঁড়ে মারে; আমি তোমাকে কিছুতেই ইট ছুঁড়তে দেব না—

অখিল উষ্ণ হইয়া কহিল,—আমার দায় পড়েছে ইট ছোঁড়বার! ময়লার ওপর তাগ করে ইট ফেললেই গায়ে ছিটকে লাগে, সে আমি জান। কিন্তু ঐ ছেলেটার সঙ্গে খেলা হবে না—এ আমি বলে রাখছি।

শোভা মুখখানির এক অভিনব ভঙ্গী করিয়া কহিল, বিশুদাকে ছেটে ফেলে খেলা বুঝি হয়?

অখিল কহিল,—কেন হবে না? আমরা দুজনে খেলব, না হয় আরও ভাল ভাল সঙ্গী বেছে নেব আর ঐ ছেলেটার সঙ্গে ত তোমার আড়ি হয়ে আছে বললে,—তবে?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শোভা উত্তর দিল,—ও অমন হয়! কতবার এমন আড়ি হয়েছে, এক এক দিনের ঝগড়ার কথা শোনো ত অবাক হয়ে যাবে, কিন্তু তার পরেই 'ভাব' বলে আবার গলায় গলায় ভাব।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বালিকার মুখখানি পুনরায় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অখিল এতক্ষণ তাহার দিকেই চাহিয়াছিল, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এইবার কহিল,—তাহলে এবারও ভাব হবে?

শোভার মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠের স্বরও গাঢ় হইয়া আসিল; পরক্ষণে অখিলের দিকে চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—তা কি করে এখন বলি? তবে একথা ঠিক, আমি এবার কিছুতেই সেধে ভাব করছি না। বেশ ত, তুমিই তাকে জিজ্ঞেস করে দেখ না আমার সঙ্গে আড়ি দিয়েছে কেন?

বিস্ময়ের সুরে অখিল কহিল, আমি!

বিস্মিত অখিলের রিষ্ট-ওয়াচ বাঁধা হাতখানি সজোরে টানিয়া শোভা উৎসাহের সহিত কহিল,—চল না বাইরে যাই,—কুণো বেড়ালের মত অষ্টপ্রহর ঘরের কোণে বসে থেকো না—চল না এখানকার খেলার মাঠে তোমাকে নিয়ে যাই, তোমাকে দেখে সবাই অবাক হয়ে যাক, ভাবুক—কোথা থেকে এল—এ কোন্ রাজপুত্তুর!

শোভার শেষের দিকের কথাটা অখিলের খুবই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল, সুতরাং শোভার এই অনুরোধটুকু রক্ষা করিতে সে কোনও আপত্তিই আর তুলিল না।

১১

বড়বাড়ীর সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ হাতায় ছেলেদের হাডু-ডু খেলাটি তখন চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। বিশু যে দলে খেলিতেছিল, সে দলের আর সকলেই 'মোর' হইয়া পরাজয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে, একা বিশুই অবশিষ্ট, কিন্তু সে যেন মরিয়া হইয়াই পণ করিয়াছে—কিছুতেই 'মোর' হইবে না; অথচ এই দুর্দ্ধর্ষ ছেলেটিকে সদলবলে ধরিয়া 'মোর' করিয়া দিয়া জয়টিকা পরিবার জন্য অপর পক্ষের ছেলেদেরও উৎসাহের অন্ত ছিল না।

শোভা যখন অখিলকে লইয়া খেলার সীমানার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই সময় বিশু প্রতিপক্ষের যে কোনও একজনকে 'মোর' করিয়া দিয়া বিনিময়ে নিজপক্ষের কাহাকেও বাঁচাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে 'চড়াই' ছাড়াইয়া অপর পক্ষের কোটের ভিতরে ঢুকিয়া খেলা দিতেছিল। কিন্তু সতর্ক প্রতিপক্ষ হটিবার ছলনা করিয়া সহসা ঘুরিয়া একযোগে সকলেই বিশুর উপরে গিয়া পড়িল। এই অতর্কিত আক্রমণে বিশুও প্রাণপণে দম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আক্রমণকারীদের প্রভাব মুক্ত হইবার জন্য শক্তি প্রয়োগ করিতেছিল। বিশুকে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখিয়াই শোভা সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, যেন অতি অপ্রত্যাশিত কোনও সাংঘাতিক সঙ্কট মুখব্যাদান করিয়া তাহার একান্ত সম্মুখে উপস্থিত; নিদারুণ উত্তেজনায় মুখ ও দুই চক্ষু রাঙা করিয়া স্পন্দিত বক্ষে কম্পিতকণ্ঠে সে তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—আর একটু বিশুদা, আর একটু, চড়াই পেছন, দম যেন ছেড়ো না—

বিশুর 'দম' তখন প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, এতগুলি প্রতিযোগীর প্রভাব কাটাইয়া আর সে সীমানার দিকে ফিরিতে পারিতেছিল না, কিন্তু এই সঙ্কট সময় শোভার মুখের এই উৎসাহপূর্ণ কয়টি কথা যেন কোন্ দুর্লভ সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত তাহার মনে অমৃত সেচন করিয়া দিল, শিথিল ইন্দ্রিয়গুলির ভিতর দিয়া যেন দুর্ব্বার শক্তির একটা তীব্র প্রবাহ সবেগে নিঃসৃত হইল, তাহারই প্রভাবে একটা প্রচণ্ড ঝটকায় আততায়ীদের বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া সে শেষ দমটুকু লইয়া নিজের কোটে ফিরিয়া গেল। বিশুর

দলের যাহারা 'চোর' হইয়া বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; শোভাও উল্লাসে করতালি দিয়া কহিল,—বাহোবা, বিশুদা বাহোবা!

উৎসাহের উদ্দীপনায় এতক্ষণ এই মেয়েটি সবই ভুলিয়াছিল, শুধুই তাহার চক্ষুর উপর ভাসিতেছিল—বিশুদার সঙ্কটাপন্ন মূর্ত্তি! সঙ্কটের অবসান হইলে সহসা তাহার মনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল—পিছনের কথা; বিশুদার সহিত তাহার ভাবের অভাব, অখিল দা'ও মুখখানা ভার করিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। এ অবস্থায় দুই পা পিছাইয়া অখিলের একান্ত কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে সে কহিল,—দেখলে ত, বিশুদার গায়ে কি রকম জোর! একলা সবাইকে হারিয়ে দিলে কেমন!

অখিল বক্র দৃষ্টিতে এতক্ষণ বিশুকেই দেখিতেছিল। শোভার কথা তাহার কাণে বাজিল বটে, কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর এদিনের মত খেলা ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু খেলা ভাঙ্গিলেও শোভার এই নূতন সঙ্গীটিকে লইয়া ছেলেদের মধ্যে কাণাঘুষা আরম্ভ হইয়া গেল। এই আগন্তুকটির কথা সকলে শুনিলেও দেখিবার সুযোগ তাহাদের এই প্রথম ঘটিল; দামী জামা কাপড় পরা এই সুন্দর ছেলেটির সহিত ভাব করিতে অনেক ছেলেই আগ্রহান্বিত হইল।

বিশু এই সময় মালকোঁচা খুলিয়া হাত পায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আড় নয়নে পাশাপাশি দণ্ডায়মান শোভা ও অখিলের দিকে একবার তাকাইল, পরক্ষণেই মুখখানা অস্বাভাবিক রকম ভার করিয়া তাহাদের পাশ কাটাইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

অন্যান্য ছেলেরা তখন অখিলের সহিত আলাপ করিতে ব্যস্ত, শোভার সমস্ত মনটুকুই তখন বিশুর দিকে ঝুঁকিয়াছে, খেলায় এমনভাবে জিতিয়াও সে যে মুখখানি অন্ধকার করিয়া চলিয়াছে, এ দৃশ্য তাহার পক্ষে অসহ্য, বিশুর প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার ছোট বুকখানির উপর হাতুড়ির ঘা পড়িতেছিল; সে আর স্থির থাকিতে পারিল না, মনের সমস্ত অভিমান সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে বিশুর কাছটিতে ছুটিয়া গেল, পিছন হইতে তাহার হাতখানি ধরিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে কহিল, তুমি ত বেশ ছেলে বিশুদা, আমরা তোমার সঙ্গে ভাব করতে এলুম, আর তুমি অমনি পালাচ্ছ? এসো—

কথা শেষ করিয়াই শোভা বিশুর হাতখানি একটু জোর দিয়াই টানিল। কিন্তু বিশুর মনে মনে তখন কুসুমের কথাগুলি কাঁটার মতই বিঁধিয়া খচ খচ করিতেছিল, শোভার কোমল হাতের পরশ পাইয়াও তাহা প্রশমিত হইল না, বরং তাহার স্বভাবসিদ্ধ হঠকারিতা এমনই উগ্র হইয়া উঠিল যে, কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়াই সহসা ধৃত হাতখানি সবলে টানিয়া লইল এবং এই আকর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শোভা মুখ থুবড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। হঠাৎ যে এমন হইবে, বিশু তাহা ভাবে নাই, সে স্তব্ধ হইয়া গেল, ছেলেরা সকলেই অবাক হইয়া চাহিল, কেবল অখিল ঘুসী পাকাইয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তর্জ্জন তুলিল,—ইতর, জানোয়ার, রাস্কেল কোথাকার—

কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার এই তর্জ্জন, সে তখন ক্ষিপ্রহস্তে শোভাকে তুলিয়াছে ও শোভার কপালের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে! পতনকালে একখণ্ড খোলায় বিঁধিয়া শোভার কপালের একস্থান কাটিয়া যায়, আহত স্থান হইতে ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে, সেই রক্ত গড়াইয়া মুখখানা ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে!

শোভার অবস্থা দেখিয়া ছেলেরা বিভিন্ন সুরেই তাহাদের তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, অখিলের ইংরেজী, বাঙ্গালা ও হিন্দী মিশ্রিত নানারূপ তর্জ্জনও চলিয়াছিল। কিন্তু বিশু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কোঁচার খুঁটটি দিয়া শোভার মুখের রক্তধারা মুছিয়া দিল, কপালের রক্তে শোভার সুন্দর মুখখানি রঞ্জিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে চক্ষুর অশ্রু মিশিয়াছে, এরূপ কোনও নিদর্শন পাওয়া গেল না; শুধু একটিবার দুই চক্ষু মেলিয়া বিশুর দিকে চাহিয়া সে কহিল,—ছেড়ে দাও!

অখিলও এই সময় ব্যগ্রভাবে শোভার একখানি হাত ধরিয়া উগ্রকণ্ঠে কহিল,—বাড়ী চল শোভা, আমি বাবাকে বলে এখুনি এর বিহিত করছি।

এই ছেলেটির যে রূঢ় কথাগুলি এতক্ষণ বিশু গ্রাহ্য করে নাই, এখন সেগুলি পর্য্যন্ত ইহার সঙ্গে একত্র যোগ দিয়া যেন তাহার পীঠে চাবুকের আঘাত দিল! একেই তাহার মন বিষাইয়াছিল, এবার তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল অখিলের

হুমকি ; শোভাকে ছাড়িয়া সে বাঘের মত অখিলের সম্মুখে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাহার রিষ্টওয়াচ-বাঁধা হাতের কব্জিটা চাপিয়া ধরিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিল,—কি বিহিত করবি, এখনি কর—

হাত ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কম্পিত কণ্ঠে অখিল কহিল,—হাত ছেড়েদে বলছি পাড়াগেঁয়ে ভূত, নইলে এখুনি গুর্খা দিয়ে জুতিয়ে দেব—

ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ যে কাণ্ড বিশু বাধাইয়া বসিল, তাহা শুধু তাহার পক্ষেই সম্ভব ; কিন্তু ফল হইল তাহার অতি সাংঘাতিক।

বিশুর একখানি হাতের কঠিন চাপে অখিলের হাতের দামী ঘড়িটির কাচখানি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং অপর হাতের উপর্য্যুপরি মুষ্টির প্রহারে তাহার ওষ্ঠ কাটিয়া রক্ত ছুটিল।

শোভা বাকশক্তি হারাইয়া ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল, আর অখিল পিছু হটিয়া তাহাদের অনুচর কয়টির নাম ধরিয়া তারস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল।

চন্দ্রনাথ বাবু এই সময় পল্লীভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহিরে আসিতেছিলেন, দরোয়ান মহাবীর সিং পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রভুর অনুসরণ করিতেছিল, তাহার মাথায় গুর্খাই টুপী, কোমরে কুকরী; খোকাবাবুর আর্ত্তনাদ ও আক্রান্ত অবস্থা প্রভু ভৃত্য উভয়কেই স্তম্ভিত করিয়া দিল। কর্ত্তা হুকুম দিলেন, —উস্কো পাকড়ো।

মহাবীর দ্রুতবেগে মাঠে ছুটিল, কর্ত্তাও পুত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন। মহাবীর কাছে আসিয়াই বিশুর একখানা হাত ধরিল, কিন্তু বিশু তৎক্ষণাৎ অপর হাতখানি বাড়াইয়া মহাবীরের কোমরে বাঁধা চামড়ার খাপ হইতে খপ করিয়া কুকরীখানি টানিয়া লইল। হাতিয়ার অপরের হস্তগত হইয়াছে দেখিয়া মহাবীরের বীরত্ব দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে বিশুর হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার গণ্ডদেশে সজোরে এক চপেটাঘাত করিল। সে বোধ হয় ভাবিয়াছিল, তাহার হাতের একটি থাপ্পর এই বাঙালী ছেলেটির গালে পড়িলেই কুকরী তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু গুর্খা প্রহরীর হিসাবে ভুল হইল, বিশু থাপ্পর খাইয়াই আততায়ীর উদ্যত হাতটি লক্ষ্য করিয়া তাহার হাতের কুকরী চালাইয়া দিল, আঘাত অব্যর্থ হইয়া মহাবীরের হাতের কব্জী কাটিয়া হাত পর্য্যন্ত স্পর্শ করিল। পরক্ষণেই সে অপর হাতে আহত হাতখানি চাপিয়া একটা তীব্র আর্ত্তনাদের সহিত মাটীর উপর বসিয়া পড়িল।

চন্দ্রনাথ বাবু এ দৃশ্যে ধৈর্য্য হারাইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন,—খুনে ছেলে, খুন করেছে ; ধরো ওকে —ধরো !

১২

রাস্তার ধারেই রহিমদের বাড়ী। বাড়ীর বাহিরে দহ্লিজখানার সম্মুখে একখণ্ড খোলা জমি; তাহাতে তরি-তরকারী ও মরশুমী ফুলের গাছ; চারিধারে বাঁশ ও বাখারীর বেড়া বাঁধিয়া স্থানটাকে সুরক্ষিত করা হইয়াছে। ইহারই মধ্যাংশে ছেঁচা বাঁশের মজবুত আগড় দ্বারের অভাব মোচন করিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এখানটায় ছিল কদর্য্য জঙ্গল, এখন মনোহর উদ্যান গড়িয়া উঠিতেছে। পুরাতন অকর্ম্মণ্য গাছ বা আগাছাগুলির চিহ্নও নাই, কেবল একটা সুবৃহৎ জামরুল গাছ একাংশে অধিকার করিয়া অতীতের সাক্ষীর মত এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

শুধুই যে দাঁড়াইয়া আছে, ইহা বলা চলে না। পারিপার্শ্বিক আগাছাগুলির আবেষ্টন মুক্ত হইয়া এবার ইহার শাখা-প্রশাখাগুলি সুপ্রচুর ফলে ভরিয়া গিয়াছে, সুতরাং শোভা ও সৌন্দর্য্যের একটা দীপ্তি অস্তমিত সূর্য্যের শেষ আভাটুকুর সহিত মিশিয়া ফলকর গাছটিকে যেন কতই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

রহিম গাছে উঠিয়া জামরুল পাড়িতেছিল, তলায় থাকিয়া পরি ও হাজি সেগুলি কুড়াইবার জন্য কাড়াকাড়ি কাণ্ড বাধাইয়াছিল। এ ব্যাপারে হাজির তৎপরতাই যে অধিক, তাহার কোঁচড়ের পুরন্ত অবস্থা সে-পরিচয় দিতেছিল। সুপক্ক ফলগুলি বাছিয়া বাছিয়া রহিম যেমন নীচে ফেলিতেছিল, হাজি তৎক্ষণাৎ বায়ুর গতিতে পরিকে অতিক্রম করিয়া অধিকাংশ ফলই নিজের কোঁচড়ে তুলিয়া সাফল্যের উল্লাসে পুনঃ পুনঃ কহিতেছিল,—খোদার কিরে, মোর হক।

ক্রমে পরির স্বাভাবিক হাসিমাখা মুখখানিতেও বিরক্তির ছায়া পড়িল, হাজির কথার প্যাঁচে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল,—অমন করে চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন।

হাজির আজ উৎসাহ অসীম, কিছুমাত্র না দমিয়াই উত্তর দিল,—মোর খুসী।

পরি মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—'আমার' বলতে কি হয়েছে? ফের যদি কথায় কথায় 'মোর' 'মুই' 'মোকে' এ সব বলবি, তোর সঙ্গে আমরা কথা বন্ধ করে দেব।

হাজির উৎসাহ পলকে নিবিয়া গেল। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি লোভনীয় ফল নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে দেখিয়াও সেগুলি সংগ্রহ করিবার আগ্রহ তাহার আর দেখা গেল না। মুখখানা ভার করিয়া সে কহিল,—খালি খালি তুই মোকে দিক্ করিস্, পরি!

পরি কহিল,—খালি খালি কি মিছে বলি? তোর কথা শুনে বাবু পাড়ার মেয়েরা হাসাহাসি করে, তবু তোর আক্কেল হবে না?

হাজি মনে মনে কি ভাবিয়া কহিল,—আমি যে ভুলে যাই।

পরি উৎসাহের সুরে কহিল—এই ত কেমন বললি—আমি। 'মুই' বলতেও যতক্ষণ সময় লাগে, 'আমি' বলতেও তো তাই, তবে? কথা বলবার সময় একটু হুঁস থাকলে, এ ভুল দুদিনেই শুধরে যাবে।

এই সময় একটি পরিপক্ক ফল হাজির ঠিক মাথাটির উপর আসিয়া পড়িল। হাজি তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ তুলিল,—মাগো!

পরি হাসিয়া কহিল,—কি হল?

হাজি গাছের দিকে কোপ-কটাক্ষে চাহিয়া কহিল,—মারলে, দেখলে না?

গাছের উপর হইতে রহিম কহিল,—মারব কেন? তুই এখ্‌খুনি 'আমি' বললি কিনা, তাই তোকে গাছের সব চেয়ে সেরা জামরুলটা বখশিস্ করলুম।

রহিমের কথা শুনিয়াই পরি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পরির মুখের হাসি হাজিকে খুসী করিল, অথবা রাগাইয়া দিল, বুঝিতে পারা গেল না। সে তখন দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়াছিল এবং বেড়ার কিনারা ঘেঁসিয়া যে-ছেলেটি হন্ হন্ করিয়া রাস্তার উপর দিয়া ছুটিয়াছিল, পরির উচ্ছ্বসিত হাসি সহসা তাহাকে চমকিত করিয়া দিয়াছে দেখিয়া, সকৌতুকে সেইদিকে একটি অঙ্গুলি হেলাইয়া দিল।

হাজির নির্দ্দেশ ব্যর্থ হইল না, পরি রাস্তার দিকে চাহিবামাত্রই বিস্ময়াতঙ্কে দেখিল,—সে দিনের পরিচিত ছেলেটি তাহাদেরই বাগানের বেড়ার পাশ দিয়া চলিয়াছে; আজ আর তাহার সে চেহারা নাই, খালি গা, ধুলায় মলিন, মাথার চুলগুলি এলোমেলো, আধময়লা যে কাপড়খানা পরিয়াছে, তাহার দুই তিন স্থানে তাজা রক্তের দাগ, হাত দুখানাও তাহার নিদর্শন স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বোধহয় সে ছুটিতে ছুটিতে পরির সরব হাসিতে আকৃষ্ট হইয়া বাগানের ধারটিতে মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু ইহাদিগকে দেখিয়াই আবার ছুট দিয়াছে।

পরি শিহরিয়া উঠিল, ছেলেটি যে কোনও বিপদ বাধাইয়া বসিয়াছে, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। পরক্ষণেই সে উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিল,—দাদা! তোমাদের ইস্কুলের সেই বিশু ছেলেটা—

তাহাকে আর বলিতে হইল না, গাছের ডালে বসিয়া রহিম তাহাকে প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছিল এবং ক্ষিপ্রগতিতে নীচে নামিতেছিল। নিকটে আসিয়া রহিম কহিল,—দেখতে পেয়েই নেমে এসেছি, জানতে হচ্ছে—ব্যাপার কি!

কথার সঙ্গে সঙ্গেই রহিম আগড় ঠেলিয়া ছুটিয়া পথে আসিয়া পড়িল, হাত তুলিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—বিশু!

বোধ হয় বিশুকে রহিমের এই প্রথম আহ্বান, সমবেদনার সুরে এই সর্ব্বপ্রথম সম্বোধন।

বিশু থামিল; চাহিয়া দেখিল, তাহার পরম প্রতিদ্বন্দ্বী তফাতে থাকিয়া হাতের সঙ্কেতে তাহাকে ফিরিতে আহ্বান করিতেছে। তাহার পিছনে সেদিনের সেই ফাজিল মেয়েটিকেও দেখা যাইতেছে,—যে এই মাত্র তাহাকে দেখিয়াই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল!

কিন্তু তথাপি বিশুকে দাঁড়াইতে হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই মনে মনে সে ভাবিয়া লইল, এ পর্য্যন্ত সে অবাধে এত দূর ছুটিয়া আসিয়াছে, কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। বাধাও কাহারও নিকট সে পায় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে যাহাদের সম্মুখে তাহাকে পড়িতে হইয়াছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেও তাহার নিষ্কৃতি নাই, ইহারা সমস্তই প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা আহ্বান শুনাই ভাল, বিশেষতঃ যখন গায়ে পড়িয়াই এই ছেলেটা তাহাকে এ ভাবে ডাকিতেছে।

রহিম কাছে আসিয়া অতিশয় কোমলকণ্ঠে

সহানুভূতির ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল,—একি কাণ্ড! কি হয়েছে, ভাই?

বিশু স্তব্ধ! সে ভাবিয়াছিল, তাহার প্রতি অতি বিদ্বেষী এই ছেলেটি তাহাদের বাড়ীর কাছে তাহাকে পাইয়া হয়ত কত বড়া কথা বলিবে, কিংবা অপমান করিবে। কিন্তু তাহার মুখে হঠাৎ এরূপ প্রশ্ন শুনিয়া বিশুর দুই চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল, কণ্ঠ গাঢ় হইয়া আসিল, ব্যাকুলভাবে সে কহিল—দেখতেই তো পাচ্ছ, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিয়ে ফেলেছি, আমাকে ধরতে লোক ছুটেছে, আমি পালাচ্ছি।

বিশু ভাবিয়াছিল, রহিম এ কথা শুনিয়াই ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে এবং তাহার সংস্রব এড়াইতে চাহিবে। কিন্তু রহিম মনের সংশয় ও বিস্ময় সংগে দমন করিয়াই কহিল,—তুমি ভাই যে রকম হাঁপাচ্ছ, তাতে তো বেশী দূর যেতে পারবে না, তার চেয়ে আমাদের বাড়ীতেই কেন চল না, কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না।

বিশু ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিল, তাহার পর কহিল,—আমার সঙ্গে ঝগড়াই চলে আসছে বরাবর, তোমাকে দেখেই আমার কি মনে হয়েছিল জান? বুঝি এবার ধরা পড়লুম! কিন্তু তুমি কিছু না শুনেই, শুধু আমি বিপদে পড়েছি জেনেই, তোমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইছ! তোমার কথা শুনে আমার গলা দিয়ে কান্না যেন ঠেলে আসছে।

পিছন হইতে পরি সহসা কহিয়া উঠিল,—কিন্তু পথের মাঝে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদাটা কি ভাল? তাতে লোক হাসবে। ঐ ত আমাদের বাড়ী, দেরী করছ কেন, চল না।

বিশু দুই চক্ষু মেলিয়া মেয়েটির দিকে চাহিল, এ অবস্থাতেও সে-দিনের কথা তাহার স্মৃতিপথে বিদ্যুতের মত একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক দিয়া গেল। একটু পূর্ব্বের সরব হাসির উচ্ছ্বাসটিও সহসা ভাসিয়া আসিয়া তাহার বুকে বাজিল। দৃষ্টি রহিমের দিকে ফিরাইয়া কহিল,—আমি কি করেছি তা ত জান না; একটা লোকের হাতের কব্জিখানা এক রকম কেটে ফেলেছি; আমার পেছনে তারা পুলিস লেলিয়ে দিয়েছে; এখন যদি তোমাদের বাড়ীতে লুকুই, তাতে তোমরা পর্য্যন্ত বিপদে পড়বে; তার চেয়ে আমাকে পালাতে দাও, আমি যাই—যে দিকে দুচক্ষু যায়।

পরি কহিল,—তা কি হয়? আমাদের চোখে যখন পড়ে গেছ, আমরাই বা ছাড়ব কেন? বাবা যদি এসে একথা শোনেন, তিন দিন আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, জান?

রহিম কহিল,—সত্যি ভাই, আমার বাবার এদিকে ভারি দপদপা; তিনি বলেন, অতি বড় দুষমণও যদি বিপদে প'ড়ে তোমার বাড়ীর দ্বারে আসে, প্রাণ দিয়েও তাকে রক্ষা করবে। বেশ ত, তুমি আমাদের বাড়ীর অন্দরে যেতে না চাও, বাহরে দর্জ্জীখানাতেই চলো. জানত, আজ হাটবার, দলিজ বন্ধ; কেউ সেখানে নেই। চল,—সেখানে বসে জিরিয়ে সব কথা বলবে, তার পর কি করা যায় ভাবা যাবে।

অতি পরিচিত অন্তরঙ্গের মতই এই পরম প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটির হাতখানি ধরিয়া রহিম অকৃত্রিম স্নেহের প্রেরণায় যে টান দিল, বিশু তাহারই আবর্ত্তে আত্মসমর্পণ না করিয়া পারিল না।

১৩

বাহিরে দালানের প্রত্যন্ত অংশে প্রধান ওস্তাগরের নিভৃত কামরাখানির ভিতর বিশুকে অতি সন্তর্পণে আনিয়া পরি ও হাজির সহায়তায় রহিম তাহার হাত মুখ ধুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিল এবং সদ্যঃক্রীত ধোয়াসুতার একখানা ধুতি আনিয়া অনুরোধ করিল,—ও কাপড়খানা ভাই ছেড়ে ফেলো।

পরের বাড়ীতে এ ভাবে আসিয়া ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিকট এরূপ অপ্রত্যাশিত পরিচর্য্যা পাইয়া বিশুর কুণ্ঠা ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। প্রথমেই তাহার জন্য ঘরের কোণে ছোট রোয়াকটির উপর জলপূর্ণ বালতি ও একটি বদনা আসিয়াছিল। তাহার পরে, আসিল একখানা তাজা কাপড় এবং সেই সঙ্গে তাহা পরিবার জন্য অনুরোধ। বিশু কহিল, জল এনেছ, তাই যথেষ্ট, আমি হাতখানা ধুয়ে ফেলছি এখুনি। কিন্তু কাপড় ছাড়বার তো কোনো দরকার নেই।

আপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা গম্ভীর করিয়া পরি যুক্তি দিল,—দরকার আছে বই কি, নইলে কি মিছে এনেছি? হাতের রক্ত জলে ধুলে যেন সাফ হয়ে গেল, কিন্তু কাপড়ের রক্ত কি এত সহজে

উঠবে ভেবেছ? হাত মুখ ধুয়েই কাপড়খানা ছেড়ে ফেল, আমরা ওখানা লুকিয়ে ফেলি, তাহলে আর কোন চিহ্নই থাকবে না।

রহিম হাসিমুখে কহিল,—পরি লুকিয়ে লুকিয়ে কেবলই দারোগার দপ্তর পড়ে, তাই ও-সব ব্যাপারে ওর মাথা এত সাফ। যাক্, তুমি ভাই আর দেরী ক'র না, ওঠ—

বিশুকে অগত্যা উঠিতে হইল। রহিমের নির্দেশ মত ঘরের প্রান্তদেশে বাঁধানো স্থানটিতে হাত মুখ ধুইতে গেল। রহিম বদনা ভরিয়া জল বিশুর হাতে ঢালিয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পরি একখানি নূতন তোয়ালে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছিল। রহিমের সহায়তায় হাতের রক্তের দাগটুকু সমস্ত উঠিয়া গেলে, পরি তোয়ালেখানি বিশুর হাতে দিল। হাত মুখ মুছিয়া অতঃপর তাহাকে বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের কাজটুকু শেষ করিতে হইল। কাপড় ছাড়া হইবামাত্রই বাড়ীর ভিতর হইতে ইহাদের বালক-ভৃত্যটি সহসা উপস্থিত হইয়া সেখানা তুলিয়া দলা পাকাইয়া অন্দরের পথে পুকুরের দিকে ছুটিল।

পরি বিশুর দিকে চাহিয়া আশ্বাসের সুরে কহিল,—ভাবনা এবার কেটে গেলো, পুকুরের পাঁকে কাপড়খানা পুতে ফেলতে বলেছি।

ঘরের প্রান্তভাগে একখানা তক্তপোষ, তাহার উপর সতরঞ্চি বিছানো। বিশু সে দিকে অগ্রসর হইয়াই দেখিল, তাহারই পার্শ্বে একখানা টুল ধুইয়া মুছিয়া কলাপাতা বিছাইয়া রাখা হইয়াছে কতকগুলি সুপক্ক জামরুল, কালো জাম, লিচু ও কয়েকটি আম; আর একখানি টুলের উপর রহিয়াছে দুইটি ডাব, পাশে একখানি কাটারী।

বিশু সবিস্ময়ে কহিল,—এ সব আবার কি?

পরি কহিল,—সবের মধ্যে তো গোটা কতক ফল-ফুলুরি, আমাদের ঘরের খাবার তো তুমি খাবে না; কিন্তু যখন এসেছ এখানে, কিছু মুখে দিতেই হবে।

বিপন্নের মত মুখভঙ্গী করিয়া বিশু কহিল,—কিন্তু আমার তো এখন খাবার ইচ্ছে মোটেই নেই, আজ এ সব থাক্, আর একদিন এসে খেয়ে যাবো।

রহিম কহিল,—সে কি হয়, আজ যখন এসে পড়েছ, এগুলো খেতেই হবে, নইলে আমরা মনে করবো, তুমি এখনো আমাদের বিশ্বাস করতে পারো নি।

পরি কহিল,—আর তুমিও ত মনে মনে বুঝতে পারছো, আমরা তোমার ঐ কাটাকুটির কাণ্ডটি শোনবার জন্যে কি রকম উস্‌খুস্ করছি; কিন্তু তুমি কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা না হলে, কি করে স্থির হয়ে সে সব শুনবো বল? না, আর দেরী ক'র না ব'স—

রহিম কহিল,—তুমি ত দেখলে ঐ যে ছেলেটা তোমার কাপড় নিয়ে গেলো, ও হিন্দু; আমাদের কাছে কাজ করে, চাষবাস দেখে; ফলটলগুলো ওকে দিয়েই ধুয়ে ছাড়িয়ে রাখা হয়েছে, খেলে তোমার কোনও দোষ হবে না।

বিশু কহিল,—তোমার সঙ্গে আজ যখন ভাব হয়ে গেল, তোমার দেওয়া ফল খাব তাতে আবার দোষ কি? তুমি নিজের হাতে দিলেই বা কি হয়েছে? কিন্তু আমার মনের অবস্থা তো বুঝছ?

রহিম কহিল,—কতকটা অবশ্য বুঝছি, কিন্তু সব না শুনলে ঠিক বুঝতে পারবো কেন? এখন তুমি তাড়াতাড়ি এগুলো খেয়ে ফেলো, তারপর সব শুনবো।

পরি সঙ্গে সঙ্গে কহিল,—কিন্তু তুমি এ সব না খেলে তোমার কথাও শুনবো না, আর তোমার সঙ্গে কথাও বলবো না, তা মনে রেখো।

আর কোনও প্রতিবাদ বা আপত্তি না তুলিয়া বিশু তক্তপোষটার কিনারায় বসিয়া ফলগুলির সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইল

বালক-ভৃত্যটিও যথাসময় আসিয়া ডাব কাটিয়া দিল, হাত ধুইবার জল আনিল; গুটিকতক ছোট ও বড় এলাচিও মুখ-শুদ্ধির জন্য উপস্থিত করিল।

অতঃপর বিশু খেলার মাঠের অপ্রীতিকর ব্যাপারটি আগোগোড়া রহিম ও পরিকে শুনাইয়া দিল। বর্ণনার শেষের দিকে তাহার মুখে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল; আরক্তমুখে কম্পিত কণ্ঠে সে কহিল,—উনি আমার যখন কাকা, বাপের মত, আমিও ওঁর ছেলের সামিল। ওঁর উচিত ছিল, জিজ্ঞাসা করা—কি হয়েছে, দোষটা কার? কিন্তু তিনি সে দিক দিয়ে না গিয়ে দরোয়ান লেলিয়ে দিলেন—সে ছুটে এসে আমার হাত ধরলো, গালে চড় মারলো—আমিও ত মানুষ, রক্ত-মাংসের শরীর আমার, সইব কেন, হাতে হাতে শোধ দিলুম—

রহিম উৎসাহের সুরে কহিল,—আমি তোমাকে প্রথম দিনেই চিনেছিলুম। আমার

বাবা বলেন,—প্রত্যেক মানুষের উচিত, নিজের ইজ্জত বাঁচিয়ে চলা, ইজ্জতে ঘা পড়লে যে রুখে দাঁড়ায়, সেই তো মানুষ। কিন্তু হাজারের ভেতর এমন মানুষ দু একটির বেশী নজরে পড়ে না। তুমি তাই এই মানুষ। তুমি ইজ্জতের জন্যে যা করেছ, ঠিক করেছ।

রহিমের এই সমর্থনসূচক কথায় বিশুর দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কণ্ঠের স্বরেও আবেগের আভাস পাওয়া গেল। সে বলিতে লাগিল,—আমার হাতখানা জোর করে আগে চেপে ধরেছিল বলেই আমি তার খাপ থেকে কুকরীখানা টেনে নিয়েছিলুম, কিন্তু সে যদি আমার গায়ে হাত না তুলতো, আমি তার হাতে কখনই তা'রই হাতের কুক্‌রী চালিয়ে দিতুম না। তারপর, সে যেই বসে পড়লো, আমার কাকাবাবু তখনই আমাকে ধরবার জন্যে হাঁক-ডাক জুড়ে দিলেন। কিন্তু এখনো আমি ভেবে ঠিক করতে পারছি না, সঙ্গে সঙ্গে এক পাল পুলিসের লোক কি করে তখনই এসে পড়লো?

রহিম প্রশ্ন করিল,—তুমি বুঝি পুলিস দেখেই ছুট দিলে?

বিশু কহিল,—আমি তখন কুকরীখানা বাগিয়ে ধরে মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, কাকা যতই বলেন ওকে ধরো, কেউ কাছে এগোয় না; ঠিক সেই সময় পাড়ার ছেলেরা হল্লা করে উঠলো—পুলিস আসছে, পুলিস। প্রথমে আমি ভেবেছিলুম আমাকে ভয় দেখাচ্ছে; কিন্তু রাস্তার দিকে চাইতেই দেখলুম, লাল পাগড়ী মাথায় পরা লম্বা লাঠি কাঁধে এক পাল পাহারাওয়ালা, তাদের সঙ্গে সাহেবের মতও যেন দু'এক জন রয়েছে। কাকাও তখুনি ইংরাজী বুলি ধ'রে তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে এগুলেন, আমি কুকরী হাতে করে দে ছুট।

রহিম কহিল,—কুকরীখানা কি করলে?

বিশু কহিল,—তোমাদের পাড়ায় ঢুকেই সে বোদা পুকুরটার ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

পরি উৎফুল্ল হইয়া কহিল,—বেশ করেছো, আপদ তো তা হলে চুকেই গেছে।

বিশু কহিল,—সবাই পুলিস দেখতে ছুটলো, কিন্তু আসামী যে ভাগলো, সেটা ভাবে নি। তবে কাকার যে রকম রাগ আর রোখ, তিনি আমাকে না ধরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন না। পুলিস নিয়ে এখনো যে এদিকে ধাওয়া করেন নি কেন, তাই ভাবছি।

পরি প্রশ্ন তুলিল,—পথে কেউ তোমাকে দেখেছে?

বিশু উত্তর দিল,—ঈশ্বর ঐখানেই আমাকে রক্ষা করেছেন, কারুর সঙ্গে দেখা হয় নি পথে।

রহিম কহিল,—আজ যে হাটবার, সবাই হাটে গেছে, সন্ধ্যার আগে কেউ ফিরবে না। আর, ওরা তোমার সন্ধানে যদি আসে, হাটের দিকেই যাবে; এ পথে আসবে কেন?

বিশু কহিল,—মোড়ের কাছে এসেই আমি ভাবলুম কোন্ পথ ধরি? ঐখান থেকেই হাটের হট্টগোল শুনে মনটা দমে গেল, হাটের রাস্তা ছেড়ে এই রাস্তাই ধরলুম।

পরি পরিহাসের সুরে কহিল,—ঠিক রাস্তাই ধরেছিলে, আমরাও তিনজনে ঠিক সময়টিতে আমরুল পাড়া সুরু করেছিলুম। এখন তা'হলে তোমাকে বলি, আমার হাসি শুনেই তুমি থমকে দাঁড়িয়েছিলে, মনে মনে হয়ত ভেবেছিলে—যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যে হয়! কিন্তু খোদার দোহাই, তোমাকে সেইভাবে দেখে আমি হাসিনি, হেসেছিলুম দাদার কথায়।

বিশু কহিল,—সত্যিই, প্রথমটা আমি খুব দমেই গিয়েছিলুম, কিন্তু এখন ভাবছি, তোমরা আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার আপনার জন ছিলে।

ছোট ঘরখানির দ্বার রুদ্ধ ও অর্গল রুদ্ধ করিয়াই তিনটি বালকবালিকা এই সব আলোচনা করিতেছিল, ভিতরের দিকের দ্বারটি খোলাই ছিল এবং এই পথে ভৃত্য মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। হাজি বিশুর মুখে আখ্যানটি শুনিয়া ইতিমধ্যেই বাড়ীতে ছুটিয়াছিল, এমন মুখরোচক কথাগুলি অধিকক্ষণ চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

সহসা বাহিরের দিকে দ্বারে আঘাত পড়িল। তিনটি প্রাণীই এক সঙ্গে চমকিত হইয়া উঠিল। পরি বয়সে সকলের ছোট হইলেও তাহার উপস্থিত-বুদ্ধি অসীম। দ্বার না খুলিয়া সে তৎক্ষণাৎ ক্ষিপ্র গতিতে জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আস্তে আস্তে তাহার ফিরকিটি খুলিয়া কপাটের ছোট পাটিখানি কিঞ্চিৎ ফাঁক করিয়া বাহিরের অবস্থাটা দেখিয়া লইল। পরক্ষণে ম্লান মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া কহিল,—ভয় নেই, কাকু।

বিশু চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া রহিমের দিকে চাহিতেই রহিম হাসিয়া কহিল,—হাজির বাবা আমার বাবার বন্ধু, এখানে উনি আমাদের অভিভাবক। সম্পর্কে উনি হন আমাদের চাচা—

পরি কক্ষের দ্বার খুলিতে খুলিতে কহিল,—কিন্তু আমরা ওঁকে 'কাকু' বলে ডাকি। তোমরা যেমন কাকাবাবু বল!

ওয়ারিস আলি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই সে হাসিয়া কহিল,—দেখুন কাকু, আমাদের বাড়ীতে কে এসেছে!

ওয়ারিস আলি প্রসন্ন ভাবে কহিলেন,—হাজির মুখে সব শুনেছি মা, যেমন তোমার বাপ, তেমনি তুমি তার বেটি। তাঁর মুখ রেখেছ, এ গেরামের ইজ্জতও বজায় করেছ।

বিশুর খাওয়া তখন শেষ হইয়াছিল, হাত মুখ মুছিয়া একটা এলাচি মুখে দিয়া সে মনে মনে একটা অনাস্বাদিত তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। দীর্ঘদেহ শ্মশ্রুমান প্রসন্নমূর্তি এই প্রবীণ ওস্তাগর সাহেবকে সে অনেকবার দেখিয়াছে, কথাও কহিয়াছে। কিন্তু এভাবে তাঁহার সংস্পর্শে কোন দিন আসে নাই। আজ সে তাঁহাকে কক্ষমধ্যে দেখিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া সেলাম করিল।

ওয়ারিস আলিও সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলিয়া কহিলেন—খোদা তোমার মুস্কিল আসান করুন, এই ভিক্ষা তাঁর কাছে চাইছি, বাবাজী! ব্যাপারটা ভারি বেয়াড়া হয়ে পড়েছে! এ সব হচ্ছে নসীবের ফের, কখন যে কি হয়—ঠাহর পাওয়া যায় না।

রহিম কহিল,—আপনি সব শুনেছেন তাহলে, কাকু?

ওয়ারিস আলি জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তোমাদের আগেই হাটে সব শুনে এসেছি। চন্দর বাবু হালফিল এখানে এসেই কাজটা ভাল করেন নি, একথা সবাই বলাবলি করছে। তিনি এই বলে এত্তেলা দিয়েছেন, বাবাজী কুসঙ্গে পড়ে বিগড়ে গেছেন, বয়েস কাঁচা হলে কি হবে, গুণ্ডামীতে একবারে পাকা, নইলে তাঁর গুর্খা সেপায়ের হাত থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তাকে চোট লাগায়! হাটময় এই কথা ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিসের লোক হাট তোলপাড় করে এনার তল্লাস করতে থাকে, কিন্তু পাবে কি করে? খোদা বাবাজীকে দিব্যি সরিয়ে এনেছেন এখানে। বাড়ীতে ফিরে হাজির মুখে ব্যাওরা সব শুনে মোর তো আক্কেল গুড়ুম হবার যো। তাই না হন্তদন্ত হয়ে এসেছি।

পরি ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল,—তা হলে কি হবে, কাকু?

ওয়ারিস আলি কহিলেন—খোদার যা মর্জ্জী তাই হবে, বেটি। কিন্তু ওর কি খেলাটা দেখ। আনন্দপুরের গঞ্জে নবীন পোদ্দারের গদীতে তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে কোলকেতার পুলিস এসেছিল, এখানকার পুলিসও সঙ্গে ছিল। সেখানে নাকি বহুৎ টাকার জেবর-জহরৎ চুরি হয়, আর চোরাই মাল নবীন পোদ্দার কিনেছে—এই কথাই নাকি গোয়েন্দারা লাগিয়েছিল। তাই এখানকার আর কোলকেতার পুলিস মিলে গঞ্জে যায়, পুলিস-সাহেবও সাথে ছিল। ওখানকার কাজ সেরে তারাই যখন ফিরছিল, সেই সময়েই এই হাঙ্গামা বাধে। চন্দর বাবুর তখন পোয়া বারো আর কি। তাঁরই বংশের ভাতিজাকে জব্দ করতে দিলেন তখনি পুলিস লেলিয়ে। চোদ্দো-বছরের একটা ছাবাল জঙ্গী গুর্খার হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে কোপ লাগিয়েছে, এ কথা শুনে আর সামনেই তার নজীর দেখে পুলিস-সাহেব অমনি নেচে উঠলো। তুমি কিন্তু বাহাদুর ছেলে, তাই সরে পড়েছিলে।

রহিম প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা কাকু, হাটে বিশুকে না পেয়ে পুলিস কি করলে? চলে গেছে নিশ্চয়ই?

জিহ্বার সাহায্যে মুখের একটা বিচিত্র শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া ওয়ারিস আলি কহিলেন,—সেই পাত্রই ওরা বটে! একে বাঙালীর ছেলে, তাতে আবার ইস্কুলে পড়ে, সে হাতিয়ার চালিয়েছে—রীতিমত জখমও করেছে, সাহেব নিজের চোখে চোট-খাওয়া চাকরটাকে দেখেছে; কাজেই তার মাথায়ও রোখ, চেপে বসেছে, ছেলেটাকে গেরেফতার করতেই হবে। চন্দর বাবু মস্ত লোক, সাহেবকে খাতির করে থাকবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছেন; ইস্কুলের বাড়ীতে সাহেব লোকজন নিয়ে উঠেছেন। যারা তল্লাসে বেরিয়েছিল, দারোগার সঙ্গে তারাও খুব সম্ভব সেখানে আড্ডা নিয়েছে।

এ কথায় সকলেরই মুখ ম্লান হইয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিশুই প্রথমে কহিল,—দেখুন

ওস্তাগর সাহেব, এ অবস্থায় আমার কিছুতেই এখানে থাকা উচিত নয়।

কথাটা প্রত্যেকের মনে আঘাত দিল। ওয়ারিস ওস্তাগর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কেন?

বিশু কহিল,—জানেন ত, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, ওরা আমাকে ধরবেই। সন্ধান আমার পাবেই। তাতে আপনারা পর্য্যন্ত হয় তো বিপদে পড়বেন। তার চেয়ে আমি ইস্কুলে গিয়ে সাহেবকে ধরা দিই।

ওস্তাগর সাহেবের মুখের উপর কে যেন একটা তীব্র আলোকরশ্মি নিক্ষেপ করিল,—সমগ্র মুখখানায় অপূর্ব্ব দৃঢ়তার আভা ফুটাইয়া তিনি দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—তা হয় না, বাবাজী। ওয়ারিস ওস্তাগরকে তোমার বাবা চিনেছিল, তুমি ছেলেমানুষ, চিনতে পারনি, তাই একথা বলছ। বিপদ যে এসেছে, একথা মিছে নয়, কিন্তু এ বিপদ এখন আর শুধু তোমার নয়, মোদের সবারই। তুমি যেতে পাবে না, থাক এইখানে; দেখি কে তোমাকে ধরে।

কাকুর কথায় রহিম ও পরির দুইখানি মুখই যুগপৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিল, এই তো ঠিক মানুষের মত কথা, তাহাদের বাবা এখানে থাকিলে, তিনিও ঠিক এই কথাই বলিতেন।

বিশুর মুখেও দৃঢ়তা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সে অবিচলিত কণ্ঠে কহিল,—আমার জন্যে আপনারাও কষ্ট পান, এ আমি চাই না। আপনারা যা করেছেন, তার ঋণ আমি কোনো দিন শুধতে পারবো না, এখন আমাকে দয়া করে যেতে দিন।

ওয়ারিস সাহেব ক্ষণকাল বিশুর মুখের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন,—যদি বলি আমিই তোমাদের কাছে ঋণী হয়ে আছি, তাই আজ শোধ দিতে কোমর বেঁধেছি?

সকলেই সবিস্ময়ে ওস্তাগর সাহেবের প্রশান্ত মুখখানির দিকে চাহিল।

ওস্তাগর সাহেব কহিলেন,—হাঁ, সত্যই; তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুবই ভাব ছিল। শুধুই মুখের ভাব নয়, জমিজেরাৎ সম্বন্ধে তিনি অনেক সুবিধে আমাকে দিয়ে সে ভাব পাকা করে গিয়েছেন। অনেক দায়-দফায় তিনি আমাকে দেখেছেন, মোদের দলিজ তো তুমি দেখেছ, সেখানে কতদিন এসে বসেছেন; এত ভালবাসাবাসি মোদের মধ্যে ছিল। তেনার ছেলে তুমি, আজ মুস্কিলে পড়েছ, খোদাই তোমাকে টেনে এনেছেন এখানে, আমি তোমাকে ছাড়তে পারি না, ছেড়ে দেব না কিছুতেই; তুমি এখানে থাকো, আমি নিজেই যাচ্ছি তোমাদের পাড়ায়, চন্দরবাবুর সঙ্গে আগেই বোঝা পড়া করতে চাই; যদি দরকার বুঝি, খোদ পুলিস সাহেবের সঙ্গেও মুলাকাৎ করতে পেছপাও হব না; তুমি কিচ্ছু ভেবনা, জেনো—সবই খোদার মর্জ্জী!

১৪

স্কুলের পথে ও খেলার মাঠে পাড়ার ছেলেদের সহিত বিশুর কত ঝগড়াঝাটি হইয়াছে, সময় বিশেষে মারামারিও কতবার বাধিয়াছে, রক্তপাতও যে তাহাতে না হইয়াছে, এমন নহে; কিন্তু সে সব ব্যাপারে পাড়ার মধ্যে কখনও গোলযোগ বাধে নাই এবং অভিভাবক বা অভিভাবিকাগণকে ছেলেদের পক্ষ লইয়া ঐ সূত্রে কোমর বাঁধিতেও দেখা যায় নাই; তাহার জের বড় জোর প্রধান শিক্ষকের এজলাস পর্য্যন্ত গড়াইয়া একটা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে।

এদিনও কলহসূত্রে যে কাণ্ড বাধিয়াছিল, তাহারও একটা নিষ্পত্তি যথাযথভাবেই হয়ত হইয়া যাইত। কিন্তু হঠাৎ অস্ত্রের আবির্ভাব ও প্রভাবে এবার তাহা হইল না, বরং ঘটনার স্রোত একটা অপ্রত্যাশিত কদর্য্য পথে ঘুরিয়া গেল। এ ব্যাপারে চন্দ্রনাথ বাবুর রাগের বেগ যতখানি ছিল, রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকের দৃশ্য বিশেষের মত অকুস্থলে অকস্মাৎ পুলিসের আবির্ভাব তাহার গুরুত্ব আরও বাড়াইয়া দিল।

পুলিস একটা তদন্ত করিয়া এই পথ অতিক্রম করিতেছিল। হঠাৎ চন্দ্রনাথ বাবুর উত্তেজিত কণ্ঠের 'ধরো—ধরো' ধ্বনি পুলিসের কর্ত্তাটির কাণে বিপদজ্ঞাপক হুইসেলের মতই বাজিয়াছিল। ইহাতে পুলিসের লোকের গায়ের রক্ত উত্তপ্ত ও কর্ণ কণ্টকিত হইবারই কথা। যথাস্থানে যতদূর সম্ভব দ্রুত আসিয়া পঁহুছাইতেই দেখা গেল, হাত কাটা গুর্খা দারোয়ানটা মাটীতে পড়িয়া কাতরাইতেছে; আঙ্খিলের মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, তাহার জামা কাপড় তাহাতে ভিজিয়া গিয়াছে এবং সকলের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন। কেবল আঘাতকারী

আসামীর কোনও নিদর্শন নাই। সাহেবের প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রনাথ বাবু ভবিষ্যতের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক সমস্যার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া যে ভাবে ঘটনাটি প্রকাশ করিলেন, তাহাতে পুলিস সাহেবও বুঝিলেন যে, অভিযোক্তা কেউ-কেটা নহেন। আর যাহারা স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখিয়াছিল, তাহারাও অবাক হইয়া মনে মনে ভাবিল, তিলকে যেভাবে তাল করিয়া ফেলা হইল, তাহাতে বিশুর আর নিস্তার নাই!

বহু শরিক পরিবেষ্টিত এই পুরাতন পৈতৃক ভদ্রাসনে পদার্পণ করিয়াই চন্দ্রনাথ বাবু মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব নানাসূত্রে প্রকাশ করিয়া সরিকদিগকে অভিভূত ও স্তব্ধ করিয়া দিবেন। তাহা হইলে প্রকারান্তরে সকলেই তাঁহাকে ভয় করিবে, তাঁহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িবে, মাথা তুলিতে বা দল পাকাইতে কেহ আর সাহস পাইবে না। এই চিন্তাই যে সময় তাঁহার মস্তিষ্কে নানারূপ সূত্রের সংস্থান করিতেছিল, তখনই প্রাণাধিক পুত্রের দুর্দশা তাঁহাকে অতিরিক্ত ভাবেই উত্তেজিত করিয়া তুলিল। অমনই হারাইয়া ফেলিলেন—তাঁহার বয়স ও বুদ্ধির উপযুক্ত ধৈর্য্য, ভুলিয়া গেলেন—সহজধারায় এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করিবার উপায়; ছেলেটিকে পাকড়াও করিবার জন্য দারোয়ানের উপর কড়া হুকুম দিয়া ফেলিলেন। কিন্তু ছেলেটি দরোয়ানজীর হাতে ধরা না দিয়া তাহাকেই যখন কাবু করিয়া ফেলিল, সে সময় চন্দ্রনাথ বাবুর মস্তিষ্কে চক্রান্তের যে সূত্রগুলি তালগোল পাকাইয়াছিল, সেগুলিও বুঝি তৎক্ষণাৎ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; নতুবা তিনি অতটা চঞ্চল হইয়া উঠিবেন কেন?

কিন্তু ঠিক এই সময় কাকতালীয়বৎ পুলিসের আবির্ভাব হওয়ায়, চন্দ্রনাথ বাবুর ব্যক্তিত্বের প্রণষ্ট-প্রায় প্রভাবটুকু সহসা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এক্ষেত্রে এই সুবিধাবাদী মানুষটি আত্ম-মর্য্যাদা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার এমন সুযোগটি ত্যাগ করিবেন কেন! তাঁহার মস্তিষ্কের ছিন্ন সূত্রগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নাগ-পাশের মত যেমন এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনের উপাদান হইয়া দাঁড়াইল, এত বড় আইনবিদ জমিদারটির প্রতি পুলিসের এই ফিরিঙ্গী সাহেটির শ্রদ্ধাও তেমনই সমবেত সকলের সমক্ষেই প্রকাশ করিয়া দিল—তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব কতখানি।

বিশুর হাতের কুকরী খর্ব্বা প্রহরীর কব্জির কতিপয় শিরা কাটিয়া হাড় পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছাইয়াছিল। সময়োচিত উপদেশ সহ পুলিস সাহেব দুইজন পাহারাওয়ালার তত্ত্বাবধানে তাহাকে আলিপুরের সরকারী হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন! ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চন্দ্রনাথ বাবুও এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। অতঃপর মহাসমারোহে আসামীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল। চারিদিকে পুলিস ছুটিল, কিন্তু আসামীর সন্ধান মিলিল না। চন্দ্রনাথ বাবু আসামীর যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সদরে ফিরিয়া যাওয়া সাহেব সমীচীন মনে করিলেন না। চন্দ্রনাথ বাবুরও সেই ইচ্ছা। তৎক্ষণাৎ আতিথ্য-গ্রহণের জন্য সাহেবকে চন্দ্রনাথ বাবু সাদর আমন্ত্রণ করিলেন এবং ধন্যবাদ সহকারে সাহেবও তাহাতে সম্মতি দিলেন।

বিশুর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে শোভা ও অখিল উভয়েই সরিয়া পড়িয়াছিল। যে মেয়েটি এই কাণ্ডের সহিত সংস্পৃষ্ট, চন্দ্রনাথ বাবু পুলিস-সাহেবের নিকট ঘটনাটা ব্যক্ত করিবার সময় ইহাদের প্রসঙ্গও তুলেন নাই। সেই জন্যই অখিল বা শোভার আর ডাক পড়ে নাই। কিন্তু বাহিরে ডাক না পড়িলেও বাহিরের ব্যাপারটি সম্বন্ধে বাড়ীর ভিতরের উঠানে মেয়েরা যখন শোভাকে ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন করিতেছিল, তখন শোভার এক একবার ইচ্ছা হইতেছিল সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। সে যে কি উত্তর দিবে, কাহাকে দোষী করিবে, কাহার পক্ষ লইয়া কথা কহিবে, কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পারিতেছিল না। ঘটনাস্থলের শোণিতময় দৃশ্যটা নিরবচ্ছিন্নভাবেই যেন তাহার চোখের উপর জল জল করিয়া ভাসিতেছিল!

এক বর্ষীয়সী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন,—আ মর ছুঁড়ি, কুলকোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে শুধু; কি হয়েছে বলনা?

শোভা আর্ত্ত কণ্ঠে উত্তর দিল,—আমি জানি না।

কথা কয়টি বলিয়াই সে এক রকম ছুটিয়া উঠান হইতে তাহাদের ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই বিশুর মা হেমাঙ্গিনী দেবী উপর হইতে উঠি-পড়ি অবস্থায় নামিয়া আসিয়া

ব্যাকুল-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁগা, কি হয়েছে, কি সব শুনছি, বিশু কি করেছে?

উত্তর দিল, তৎক্ষণাৎ কুসুম; বাহিরের শেষ খবরটুকু পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া সে তখন ফিরিতেছিল। দিব্য সপ্রতিভভাবেই সে কহিল,—যা হয়েছে, আমার কাছেই শোনো না; এই জন্যই তো হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছি, মাসীমা?

এই বাচাল মেয়েটির প্রকৃতি এ বাড়ীর সকল বয়সের মেয়েদের মনে যেমন বিরক্তির সঞ্চার করিত, তাহার মুখের কথাগুলিও তেমনই প্রত্যেকের কাণে যেন সূচের মত বিঁধিত। কিন্তু আজ এ অবস্থায় তাহার মুখেই বাহিরের খবর শুনিতে মহিলাদের কি আগ্রহ! হেমাঙ্গিনী দেবী ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন,—শীগ্‌গির বল্‌ত মা কি হয়েছে?

কুসুম মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিল,—তোমার ছেলে মানুষ খুন করে ফেরার হয়েছে গো!

বিস্ময়াতঙ্কে অন্নপূর্ণা দেবী কহিয়া উঠিলেন,—কি বললি? বিশু মানুষ খুন করেছে?

কুসুম কহিল,—ঠিক খুন না হলেও নিমখুন তো বটেই, অখিলের বাবা বললে, সাত বছরের মত শ্রীঘর বাস!

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে অন্নপূর্ণা দেবী কহিলেন,—কোথায় বিশু, আমি বাইরে গিয়ে দেখি—কি হয়েছে, কি সে করেছে।

বাধা দিবার ভঙ্গীতে কুসুম কহিল,—ছেলে কি তোমার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যে, চলেছ মাসীমা! সে ত' পালিয়েছে, তোমাকে দেখলেই জানতে চাইবে ছেলে কোথায়? পুলিস সেখানে গিসগিস করছে; কি হয়েছে তবে বলি শোনো—

কুসুমের মুখে ঘটনার কথা শুনিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। হেমাঙ্গিনী দেবী মুখখানা কঠিন করিয়া কহিলেন,—এই কাণ্ড! এর জন্যে বিশু খুনী সাব্যস্ত হয়েছে! কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, কাকা হয়ে জ্ঞাতি হয়ে বিদ্বান হয়ে চন্দর ঠাকুরপো কি করে এ কাজ করলেন—ছেলেটার হাতে দড়ি দেবার জন্যে পুলিস লেলিয়ে দিলেন!

একজন কহিলেন,—দেবে না? জ্ঞাতি শত্তুর যে! বাগে পেয়েছে, ছোবলাবে না?

আর একজন মন্তব্য করিলেন,—জাত সাপ আর জ্ঞাতি শত্তুর, এদের বিশ্বাস নেই, এরা সব পারে।

কেহ কেহ যুক্তি দিলেন,—যা হবার হয়েছে দিদি মা, এখন অখিলের বাবাকে গিয়ে ধরো—যাতে ক্ষমা-ঘেন্না করে মিটিয়ে নেয়। কিছু খরচ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে; এমন কত কাণ্ডই ত' রফা হয়েছে দেখেছি।

হেমাঙ্গিনী দেবী কহিলেন—ঘুস কখনো কাউকে দিই নি, কারুর কাছ থেকে ঘুস বলে কিছু নিইনি ত' কোনদিন। বিশুর মুখে না শুনে আমি কিছু করবো না, কাউকে ধরবো না; আগে সে আসুক।

কুসুম কহিল,—শোন কথা, সে ত' পালিয়েছে; পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, দেখলেই বেঁধে চালান দেবে।

হেমাঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—এতো আর মগের মুল্লুক নয় যে পুলিস যা ইচ্ছে তাই করবে। বিশুও জমিদার, তার মান আছে, ইজ্জত আছে, পয়সা আছে। তাকে বেঁধে চালান দেওয়া মুখের কথা নয়।

কুসুম কহিল,—তবে যে অখিলের বাবা বলছে, বিশুদার আর রেহাই নেই।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে হেমাঙ্গিনী দেবী কহিলেন,—রেখে দে তোর অখিলের বাবা, সে ত' আর হাকিম নয়, আর পুলিস-সাহেবও বিচারকর্ত্তা নয়, বিচার হবে আদালতে, তখন দেখা যাবে। চন্দর ঠাকুরপো বোধ হয় ভুলে গেছেন—বিশুকে যে পেটে ধরেছে, সে এখনো বেঁচে আছে।

ছেলের এত বড় বিপদে মায়ের মুখে এমন তেজের কথা শুনিয়া সমবেত পুরমহিলারা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী দেবী চলিয়া গেলে কেহ কেহ কহিলেন,—একেই বলে, আসন্ন কালে বিপরীত বুদ্ধি।

১৫

চন্দ্রনাথবাবু টাকা উপায় করতে যেমন পটু ছিলেন, জাঁকজমকের ভিতর দিয়া নিজের দপদপা দশজনকে দেখাইতে তেমনই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। সাধারণের সামিল যে তিনি নহেন, তাঁহার স্থান অনেক উঁচুতে, এই সত্যটি তিনি আদপ-কায়দায় প্রকাশ করিতে চাহিতেন।

বড়বাড়ীর বাহির মহল্লায় যে দুইখানি ঘর

চন্দ্রনাথবাবুর অংশে পড়িয়াছিল, ধরণীধর সেখানে তহশীলের সেরেস্তা পাতিয়া বসিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথবাবু আসিয়াই তাহার একখানি ঘর কেতা-দুরস্তভাবে সাজাইয়া তাঁহার খাস-কামরার ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সংস্কার হইয়া গেল, যোড়া তক্তাপোষের উপর ফরাস পড়িল, পুরাতন সোফাগুলি আস্তরণ করিয়া নূতন শ্রী ধরিল, টেবল আসিল, কেদারা, আরাম-কেদারা, যথাযথভাবে স্থান পাইল। দেয়ালগিরি, বেলোয়ারি ঝাড়, দ্বারে, গবাক্ষে পরদা—কোনও কিছুরই ত্রুটি রহিল না।

কিন্তু সেদিন সায়াহ্নে বড়বাড়ীর অনেকেই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এ সবের কিছুই প্রয়োজন ছিল না, খেলার মাঠে যে দপদপা তিনি দেখাইয়াছেন তাঁহারই বংশের একটা ছেলেকে জব্দ করিতে, তাহাই যথেষ্ট।

সন্ধ্যার দিকে স্কুলবাড়ীতে ধরণীধরের তত্ত্বাবধানে পুলিস সাহেবের খানাপিনার যে আয়োজন চলিয়াছিল, তাহা পরিদর্শন করিয়া ও আলাপ-আলোচনায় পরিতুষ্ট সাহেবের ধন্যবাদটুকু লইয়া চন্দ্রনাথবাবু যখন বড়বাড়ীর বাহির মহলে তাঁহার খাস-কামরায় ফিরিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে।

মহাবীর হাসপাতালে প্রেরিত হওয়ায় খানসামা বাহাদুর তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত প্রভুর শরীর রক্ষা করিতেছিল। তাঁহাকে আরাম-কেদারায় আশ্রয় লইতে দেখিয়া সে বুদ্ধিমানের মত প্রভুর পরবর্ত্তী পরিচর্য্যার উদ্দেশ্যে কক্ষান্তরে গিয়াছিল। এই অবসরে রক্ষীশূন্য দ্বারের পরদা ঠেলিয়া বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করিল কুসুম।

আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢালিয়া চন্দ্রনাথবাবু সবেমাত্র আইনের একখানা কেতাবের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি সংযোগ করিয়াছিলেন; তাহার উপর অন্যের ছায়া পড়িতেই সচকিতভাবে দ্বারদেশে চাহিলেন। দেখিলেন, এক কিশোরী অকুতোভয়ে তাঁহার দিকে আসিতেছে, তাহার মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রনাথবাবু সোজা হইয়া বসিলেন এবং বালিকাকে কোনও প্রশ্ন না করিয়া সজোরে ডাকিলেন, বাহাদুর!

এভাবে ডাকিবার অর্থ কুসুম বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে সপ্রতিভ কণ্ঠে কহিল,—আপনার বাহাদুর যে কল্কে হাতে করে ওদিকে গেল মামাবাবু, বোধ হয় আগুনের সন্ধানে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে চন্দ্রনাথবাবু প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কে?

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কুসুম উত্তর দিল,—ওমা, আমাকে চিনতে পারেন নি মামাবাবু! আমি যে কুসুম, তবে সবাই আমাকে কুসি বলে ডাকে। রমানাথবাবু যে আমার দাদু হন, মা'র বাবা; সে হিসেবে আপনি হন মামাবাবু।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন—ও! তুমি রমানাথদা'র নাতনী,—তোমার বাবার নাম ত' পতিতপাবন, বড় গাঁয়িয়ে?

কুসুম হাসিয়া কহিল,—হ্যাঁ, এখন গলা হারিয়ে দাদুর গলগ্রহ হয়ে আছেন। ওঠবার ত' শক্তি নেই, যে এসে আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন।

মেয়েটির কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া চন্দ্রনাথবাবু অপ্রসন্নই হইলেন। কিন্তু মুখের গাম্ভীর্য্যটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—তারপর আমার কাছে কি দরকার?

কুসুম আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসির দমকটুকু থামিলে কহিল,—দরকার না থাকলে বুঝি আপনার লোকের কাছে আসতে নেই, মামাবাবু! আপনি কত বড় লোক, রাজা বললেই হয়; আর কেউ আপনার কাছে ঘেঁসতে ভরসা না করুক, কিন্তু আমার যে জোর আছে, তাই এসেছি।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—বেশ করেছ; আসবে বই কি। তুমি পড়াশোনা করছ ত'?

কুসুম এবার মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—এখানে পড়াশোনার কি আছে মামাবাবু, যে পড়বো? যা কিছু শিক্ষা হয়েছে, সে কোলকাতায়। এখানে ত' পাঠশালাই ভরসা। তা আমার সে সব পাঠ হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—বটে! তা ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হওনি কেন?

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কুসুম কহিল,—ওরে বাবা! তবেই হয়েছে। আপনি ত' দুদিন এসেছেন মামাবাবু, এখানকার কিছুই এখনো দেখেন নি! এখানকার লোক আবার মেয়েকে ইংরিজী শেখাতে ইস্কুলে পাঠাবে? দু-পাতা বেশী পড়েছি বলে, এই নিয়ে কত কথা।

কুসুমের কথায় মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—বল কি?

কুসুম এবার উত্তেজিতকণ্ঠে কহিল,—এখানকার সবাই এখনো একশো বছর পেছিয়ে

আছে মামাবাবু! মাগো! এদেশে আবার মানুষ থাকে।

চন্দ্রনাথবাবু খুসী হইয়া কুসুমের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। ইহার কথাগুলি তাঁহার ভালই লাগিতেছিল। কুসুমের সাহসটুকুও বাড়িতেছিল, সুযোগ বুঝিয়া সে কহিল—এই দেখুন না, আপনাকে নিয়ে কি ঘোঁটই সবাই পাকাচ্ছে; যেন কত বড় অন্যায়ই আপনি করেছেন।

মুখের প্রসন্নতাটুকু তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন করিয়া চন্দ্রনাথবাবু রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কি রকম?

কুসুম কহিল,—রকম আর কি! যা হয়ে থাকে পাড়াগাঁয়ে তাই। বিশুদার পেছনে পুলিস লেলিয়ে দিয়েছেন বলে, তার মা কি গালাগালটাই আপনাকে দিলে, কত শাপমণ্যি, মাগো মা, শুনে আমি একেবারে কাঠ! মাগী যেন কি!

চন্দ্রনাথবাবুর সুন্দর মুখখানার উপর কে যেন আবির ঢালিয়া দিল। গম্ভীর মুখখানার ভিতর দিয়া একটি শুধু স্বর বাহির হইল,—হুঁ!

কুসুম কহিল,—আমি তাঁর পা দুখানি ধরে বললুম—জ্যাঠাইমা, মামাবাবুকে ধর, যাতে তিনি ক্ষমা-ঘেন্না করেন। ওমা, অমনি কি না বাজখাই গলায় আমায় বললেন—যা, যা! ঢের অমন উকীল দেখিছি, এলোই বা পুলিস, করবে কি শুনি? বিশুও জমিদার আর আমার পেটে সে জন্মেছে, শেষে মজা টের পাবে চন্দর ঠাকুরপো। তাই ছুটে আপনার কাছে আসছি মামাবাবু!

চন্দ্রনাথবাবু এই অল্পবয়স্কা বালিকার মুখের কথাগুলি শুনিয়া তাহার সমক্ষেই ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিলেন। ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—মায়ের আস্কারাতেই ছেলে গোল্লায় যায়; ছেলে থেকেই বুঝিছি, ওর মা'ও কত বড় পাজী। আজ দিচ্ছে গালাগাল, দিক; এর পর ঐ গলা চোঁচির হয়ে যাবে কান্নায়।

কুসুম কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নরম করিয়া কহিল, আপনি কিন্তু বাড়ীর ভেতর সাবধানে আসা-যাওয়া করবেন মামাবাবু।

এ কয়টি কথাও চন্দ্রনাথবাবুকে সচেতন করিয়া দিল। যে লোক পরের কথায় সহজেই তাতিয়া উঠে এবং নিজের দেহরক্ষার ভার পরের উপর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, দেহের দিক দিয়া কোনওরূপ অহিত ঘটিবার সম্ভাবনা তাহাকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। চন্দ্রনাথবাবু কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই কহিলেন,—কেন বল ত'। বিশুর মা কি কোনো রকম—

কথাটা শেষ হইল না বটে, কিন্তু তাহার অর্থটুকু বুঝিতে কুসুমের মত মেয়ের বিলম্ব হইল না। সে চন্দ্রনাথবাবুর দিকে আরও দুই পা আগাইয়া আসিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল,—ও মাগী খাণ্ডাণ্ডনী, সব পারে মামাবাবু। ছেলের কাণ্ড ত' দেখেছেন, মাকেও বিশ্বাস করবেন না। কথায় বলে—সাবধানের মার নেই।

একটা অপ্রত্যাশিত আতঙ্ক ও তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় চন্দ্রনাথবাবুর মস্তিষ্কে আর একটা নূতন চিন্তার খোরাক যোগাইয়া দিল। এই সময় খানসামা বাহাদুর পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল। বাহাদুরের কটিদেশে চামড়ার খাপে আঁটা কুক্রীখানি চন্দ্রনাথবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার কতকটা আসান করিল।

বাহাদুর তাহার হাতের কলিকাটি সুবৃহৎ গড়গড়ার চূড়ায় রাখিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল যে, এক আদমী হুজুরের সহিত মুলাকাত করিবার মতলবে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

আদমীর কথা শুনিয়াই চন্দ্রনাথবাবু মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোন্ আদমী?

বাহাদুর বিনীতকণ্ঠে উত্তর দিল,—মেরা মালুম নেহি হুজুর!

কিন্তু যে আদমীকে উদ্দেশ করিয়া প্রভু-ভৃত্যের এই প্রশ্নোত্তর, তিনি কক্ষের বাহিরে বাহাদুরকে খবর দিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া কক্ষদ্বারে দোদুল্যমান সুদৃশ্য পরদাটির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হুজুরের প্রশ্ন ও ভৃত্যের উত্তর শুনিয়া তিনি নিজেই পরদা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—সেলাম হুজুর! গরীব বান্দার কসুর মাপ করতে হুকুম হোক। বহুৎ জরুরী কামে মোরে আসতি হয়েছে হুজুরের সাথি মুলাকাত করতি।

স্তব্ধ বিস্মিত চন্দ্রনাথবাবু বদ্ধদৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখিলেন, তাঁহার মুখের অশুদ্ধ কথাগুলিও শুনিলেন। সংশয় ও আতঙ্ক তখনও তাঁহার চিত্তে যুগপৎ দোলা দিতেছিল। বার্দ্ধক্যের নানা নিদর্শন নানা দিক দিয়া এই মানুষটির আকৃতির উপর পড়িলেও অটুট স্বাস্থ্য তাঁহার দীর্ঘ-সরল দেহযষ্টিকে

কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। আগন্তুকের নাভি পর্য্যন্ত দাড়ি এবং বাবরীর আকারে মাথার চুলে বৈশিষ্ট্য থাকিলেও, জামা-কাপড়ে কোনও বৈচিত্র্য ছিল না,—পরনে ছিল একখানা আড়ময়লা কাপড় এবং গায়ে একটা সাধারণ পিরাণ। মাথায় টুপী বা পায়ে পাদুকার কোনও বালাই নাই।

এই লোকটি যে আততায়ী হইয়া আসে নাই, তাহা বুঝিয়া চন্দ্রনাথবাবু প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কে?

আগন্তুক পুনরায় সেলাম করিয়া কহিলেন,—মোর নাম হুজুরের মালুম থাকবারই কথা; হুজুরের সরকারে বছর সালিয়ানা মোরে আটাবো গণ্ডা টাক খাজনা দিতি হয়। ওয়ারিস ওস্তাগর মোর নাম!

আগন্তুকের পরিচয় চন্দ্রনাথবাবুকে যেমন আশ্বস্ত করিল, পক্ষান্তরে সাধারণ এক প্রজার এত সহজে খোদ জমিদারের দর্শন প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধও হইল। মুখখানি অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন,—এমন অসময়ে কি দরকারে তুমি এয়েছ?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—হুজুরের কাছে এক জরুরী আর্জ্জি নিয়ে আসতে হয়েছে।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—আর্জ্জি শোনবার অবসর আমার নেই,—আমার ম্যানেজার ধরণীবাবুর সেরেস্তায় এসে কাল পেশ করতে পারো।

ওয়ারিস সাহেব কণ্ঠের স্বর দৃঢ় করিয়া কহিলেন,—ম্যানেজারবাবুকে দিয়ে সে হবে না, হুজুরকেই, শুনতে হবে। বিশুবাবুকে নিয়েই যে মোর আর্জ্জি হুজুর।

বিশুর নাম শুনিয়া চন্দ্রনাথবাবুর দুই চক্ষু দৃপ্ত হইয়া উঠিল। পলাতক আসামীর সম্বন্ধে যে লোক কথা কহিতে আসিয়াছে, তাহাকে যে উপেক্ষা করা চলে না এবং এই সূত্রে অবস্থা অন্যরূপ হইবার সম্ভাবনা, চন্দ্রনাথবাবুর মত বিচক্ষণ ব্যবহারজীবীর তাহা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। আগন্তুকের উপস্থিতির এই সুযোগটুকু কাজে লাগাইবার অভিপ্রায়ে তৎক্ষণাৎ তিনি একটা চাল চালিয়া বসিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী টেবল হইতে একটা শ্লিপ লইয়া কয়েক ছত্র কি লিখিলেন। বাহাদুর তাঁহার ঠিক পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। শ্লিপটি তাহার হাতে দিয়া মৃদুস্বরে যে আদেশ করিলেন, তাহা কাহারও কর্ণগোচর হইল না। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল, বাহাদুর পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে একখানা টুল আনিয়া ওয়ারিস সাহেবের কাছে রাখিল এবং চন্দ্রনাথবাবুর দিকে অর্থপূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াই পরদার অন্তরালে চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথবাবু ওয়ারিস সাহেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—বসো।

ওয়ারিস সাহেব শ্রদ্ধাভাজন ভূস্বামীকে পুনরায় সেলাম দিলেন এবং একান্ত কুণ্ঠিতভাবেই টুলখানির উপর বসিলেন।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন—কি তোমার আর্জ্জি, বলতে পারো।

পাঁচ পনেরো মিনিট ধরিয়া নানা কথার ভিতর দিয়া এবং একই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পাঁচবার বলিয়া ওয়ারিস সাহেব চন্দ্রনাথবাবুকে যে আর্জ্জি শুনাইয়া দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে,—চন্দ্রনাথবাবু বহুকাল পরে তাঁহার বাসভূমে আসায় প্রজারা যেমন আনন্দিত হইয়াছে, তেমনি ব্যথা পাইয়াছে তাঁহারই বংশের একটা 'ছাবালের' উপর তাঁহার আক্রোশ দেখিয়া। দোষ ঘাট যদি তাহার কিছু হইয়া থাকে, তিনি নিজেই ত' তাহার বিচার করিতে পারিতেন, এজন্য পুলিস ডাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? পুলিস যদি আনন্দপুরের বড়-বাড়ীর কোনো জমিদার-সন্তানের হাতে হাতকড়ি দিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, তাহাতে কি তাঁহার মুখোজ্জ্বল হইবে? অতএব তাঁহার তালুকের সমস্ত প্রজার আর্জ্জি এই যে, তিনি বিশুবাবুকে নিজের ছেলে মনে করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলুন।

বাঙ্গালা দেশের জমিদারদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি চন্দ্রনাথবাবুর অবিদিত ছিল না। যে দেশে তিনি ওকালতি করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছেন, সেখানেও লক্ষ্য করিয়াছেন, জমির মালিকের ক্ষমতা কিরূপ অপ্রতিহত। অথচ, দীর্ঘকাল পরে নিজ বাসভূমে আসিয়া আজ তাঁহাকেই স্তব্ধবিস্ময়ে আর্জ্জিসূত্রে সাধারণ এক প্রজার নির্দ্দেশ শুনিতে হইতেছে!

ক্রোধ ও বিস্ময় দমন করিয়া চন্দ্রনাথবাবু শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশু কোথায়?

ওয়ারিস সাহেব উত্তর দিলেন,—ধরে নিন্ না কেন সে হুজুরের বাড়ীতেই আছে। হুজুর আর্জ্জিতে সায় দিলেই সে হাজীর হবে।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—এতে আমার ত' হাত

কিছু নেই। পুলিস-সাহেব নিজেই যখন তদারক করছেন, আমি কি করিতে পারি?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—হুজুর মনে করলে সবই পারেন। বিশুবাবুকে যদি ধরে নিয়ে যায়, হুজুরের মাথা কি তাতে হেঁট হবে না?

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—না। দোষ করলে শাস্তি তাকে নিতেই হবে, তাতে মাথা হেঁট হবে কেন?

ওয়ারিস সাহেব ক্ষণকাল চন্দ্রনাথবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—তাহার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, হুজুরের এ কথার ওপর মোদের কথা আর কি থাক্‌তি পাবে! তবে মোদের কাছে হুজুরও যে চীজ, বিশুবাবুও তাই। মোদের তালুকের জমিদারকে পুলিস-সাহেব ধরে নিয়ে যাবে, মোরা কিছুতেই না বরদাস্ত করতে পারবুনি।

চন্দ্রনাথবাবু রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করিলেন,—কি করবে তা হলে শুনি?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—শুনলি ত' কোনো কাম হবে না হুজুর, যা করবার মোরা দেখিয়ে দেব কামে।

চন্দ্রনাথবাবু কহিলেন,—বটে!

এই সময় কক্ষদ্বারে প্রসারিত পরদার অপর প্রান্ত হইতে ইংরাজীতে প্রশ্ন হইল,—ভেতরে যেতে পারি আমরা?

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই চন্দ্রনাথবাবু উল্লাসের সুরে আগন্তুককে ভিতরে আসিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইলেন।

পরক্ষণেই কক্ষমধ্যে পুলিস-সাহেবের প্রবেশ. সঙ্গে দুইজন পুলিস প্রহরী।

সাহেবকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিবাই ওয়ারিস সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং চন্দ্রনাথবাবুর দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—মুই তাহলে চল্লুম হুজুর, সেলাম।

সাহেবকে দেখিয়া চন্দ্রনাথবাবুও উঠিয়াছিলেন। এখন তর্জ্জনের সুরে চন্দ্রনাথবাবুও কহিলেন,—দাঁড়াও তুমি।

তাহার পর সাহেবের দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে কহিলেন,—এই লোক আসামীর সাহায্যকারী, তাকে লুকিয়ে রেখেছে; একে গ্রেপ্তার করুন।

সাহেব ওয়ারিস সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন,—টুমি আসামীর টরফে কি কহিটে চাহে?

ওয়ারিস সাহেব নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন,—কিছু না।

চন্দ্রনাথবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—মিথ্যাবাদী! সাহেবের সঙ্গে চালাকী হচ্ছে?

ওয়ারিস সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন,—মুখ সামলে বাত বলবেন হুজুর? খোদার মালুম আছে, চালাকী করল কে?

চন্দ্রনাথবাবু দুই চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন,—চোপরাও বেয়াদপ।

সাহেব ইংরাজীতে চন্দ্রনাথবাবুকে চুপ করিতে অনুরোধ করিয়া ওয়ারিস সাহেবকে তীক্ষ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—আসামীকে গোপন করিয়া রাখিলে টাহার কি শাস্তি টুমি জানে?

ওয়ারিস সাহেব উত্তর দিলেন,—মোর কাম ছ্যাল ওনার সাথে, তোমার কাছে ত মুই আসিনি সাহেব, মোরে কেন ওসব পুছছো?

চন্দ্রনাথবাবু ওয়ারিস সাহেবের স্পর্দ্ধার কথাটা ইংরাজী করিয়া সাহেবকে শুনাইয়া দিলেন। সাহেব এবার উষ্ণ হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—হামারে এ ওনার আছে টোমাকে ক্রশ করিটে, টুমি বাধ্য আছে হামার বটার জবাব ডিটে।

ওয়ারিস সাহেব কঠিন ভাবে কহিলেন,—মোর কাছে কোনো জবাব তুমি পাবে না সাহেব, জেনে দিয়ো ওনা।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, আসামী কোঠায় আছে?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—মোরে মিছামিছি পুছছো সাহেব।

চন্দ্রনাথবাবু ইংরাজীতে কহিলেন,—ও বলবে না।

সাহেব রাগিয়া কহিলেন,—হামি টোমাকে চালান দেবে, টোমার মোকাম সার্চ্চ করবে, টোমার ভারি সাজা হবে। জলডি জবাব ডেও।

ওয়ারিস সাহেব তথাপি নিরুত্তর, শ্মশ্রুময় মুখে ব্যঙ্গের হাসি, তাঁহার মনের দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছিল।

সাহেব এবার বজ্রকণ্ঠে তাঁহার প্রহরীদ্বয়ের উদ্দেশে কহিলেন,—ইস্কো পাকড়ো।

কিন্তু সাহেবের স্বরের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের পরদা ঠেলিয়া বিশু কক্ষমধ্যে সবেগে প্রবেশ করিয়া কহিল,—খবরদার সাহেব। পাকড়াতে হয় আমাকে পাকড়াও; আমিই বিশু।

১৬

ওয়ারিস সাহেব যখন বিশুর সকল আপত্তি বাতিল করিয়া তাহাকে রাত্রিটুকু সেইখানে কাটাইতে বাধ্য করেন এবং তাহার পর রহিমকে একান্তে ডাকিয়া চুপি চুপি দুই চারিটি কথা বলিয়াই বাহির হইয়া পড়েন, বিশুর মনের ভিতরটা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। একটা নূতন উদ্বেগ সেখানে তাল গোল পাকাইতেছিল।

রহিম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—রাত্তিরে তুমি কি খাও বিশু ভাই?

বিশু কহিল,—ভাত খাই। কিন্তু আজ আমি আর কিছু খাব না।

রহিম প্রশ্ন করিল,—কেন?

বিশু উত্তর দিল,—ক্ষিধে মোটেই নেই, তাই।

পরি হঠাৎ কখন ভিতরে গিয়াছিল, এই সময় পুনরায় ঘরটির মধ্যে ঢুকিয়াই কহিল,—খাবার এখন ঢের দেরী, রাত ন'টার আগে ত' নয়, ক্ষিদে ততক্ষণে খুব হবে।

বিশু মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, পরির হাতে একখানা মোটা রকমের বাঁধানো বই। তাহার দুই চক্ষুর ম্লান দৃষ্টি সহসা উজ্জ্বল হইয়া বইখানির দিকে পড়িল।

পরি মুচকি হাসিয়া কহিল,—তা হলে যেন মনের ভেতর এখন থেকেই ঠিক দিয়ে রেখোনা বিশুদা, যে আমরা ভাত খাইয়ে তোমার জাত মেরে দেব। খাবার ব্যবস্থা আলাদা রকমই হবে, যাতে তোমার মনে খুঁৎ না ওঠে।

বিশুর দৃষ্টি তখনও বাঁধানো সুদৃশ্য বইখানির দিকে। খাবার সম্বন্ধে কোন কথা না কহিয়া সে ইহারই কথা তুলিল; জিজ্ঞাসা করিল,—ওখানা কি বই?

পরি বইখানা বিশুর হাতের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল—গেল বছরের 'প্রদীপ'; বারো মাসে বারোখানা বই ভালো করে বাঁধাতে এরকম হয়েছে। বাবা এর গ্রাহক কিনা। খুলে দেখনা, কত রকমের কত ছবি, দেশ-বিদেশের কত কথা, কেমন সব মজার মজার গল্প। আমার ভারি ভালো লাগে পড়তে; তুমি পড় না।

বইখানি হাতে পড়িতেই বিশু তাহা খুলিয়াছিল; এতক্ষণ যে উদ্বেগ তাহার মনের ভিতর উসখুস করিতেছিল, কোথায় তাহা সরিয়া গেল।

এই অবসরে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে চোখে চোখে কি একটা কথা হইল এবং পরক্ষণেই রহিম বইয়ের-পাতায়-নিবিষ্টচিত্ত-বিশুর উদ্দেশে কহিল,—তুমি ভাই তাহলে বইখানা পড়তে থাক, আমরা ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

বিশু বয়ের পাতা হইতে তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষু তুলিয়া কহিল,—আমাকে নিয়ে তোমরা নিজেদের কথাই ভুলে গেছ, এ কিন্তু ভাই ভারী অন্যায়।

পরি সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিল,—অন্যায়টা কিসে?

বিশু কহিল,—নয় বা কিসে? আমাকে বাড়ীতে এনে খাওয়ালে, কত রকমে খাতির করলে, যেন আমি কোথাকার কোন পীর-পয়গম্বর! অথচ, নিজেরা এখনো মুখে জল পর্য্যন্ত দাও নি।

পরি কহিল,—তাতে কি হয়েছে; তুমি যে আমাদের অতিথি, পীর-পয়গম্বরের চেয়েও তুমি কম নাকি?

বিশু শিহরিয়া উঠিয়া কহিল,—অমন কথা ব'ল না, তাতে পাপ হবে।

পরি কহিল, হক কথা বললে পাপ হয় না। অতিথিকে তোমরাও ত' বল ভগবান? আমার বাবা বলেন, ভগবান আলাদা নন; মানুষের ভেতরেই থাকেন। মানুষকে ভালবাসলে, তাঁকে ভালবাসা হয়।

রহিম হাসিয়া কহিল—পরির সঙ্গে কথায় তুমি পারবে না বিশু ভাই! আমার বাবার অনেক কথাই ও মুখস্থ করে রেখেছে, সময় বুঝে সেইগুলো বলে তাকে লাগিয়ে দেয়।

বিশু কহিল,—কথাগুলো সত্যই মুখস্থ করে রাখবারই মত। এইসব কথা শুনতে আমি বড় ভালবাসি। তোমাদের বাবা এবার যখন আসবেন, আমি শুনলেই কিন্তু ছুটে আসবো—একথা বলে রাখছি।

রহিম তাহার কথায় জোর দিয়া কহিল,—নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে পরিও হাসিমুখে কহিল,—সেদিন তাহলে তোমার নেমন্তন্ন বিশুদা, এখন থেকেই জানিয়ে রাখছি।

বিশু মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল,—আমি কিন্তু ভাবছি, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই।

ভাই-বোন দুজনেই একসঙ্গে বিশুর বিমর্ষ মুখখানির দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিল। পরক্ষণে

পরির কণ্ঠ দিয়া প্রশ্নটা ঠেলিয়া বাহির হইল,—কেন?

বিশু কহিল,—সে সময় হয়ত আমাকে আলিপুরের জেলখানায় গিয়ে নেমন্তন্ন খেতে হবে।

বিশুর কথাটা উভয়ের মনেই আঘাত দিল। পরির বড় বড় দুটি চক্ষু ছলছল হইল; রহিম মুখখানা শক্ত করিয়া কহিল,—পাগল! কেন তুমি এখন থেকেই ওসব ভাবছ বিশু ভাই! ওস্তাগর কাকু যখন বেরিয়েছেন, একটা কিছু না করে ফিরবেন না; মিটমাট হয়ে যাবেই।

পরিও এই সময় আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল,—তাই ত'; অত ঝগড়া-ঝাটির পর দাদার সঙ্গে তোমার যখন হঠাৎ আজ এমন করে ভাব হয়ে গেল, তখন কি আর ছাড়াছাড়ি হতে পারে। খোদা যে হিসেব করেই কাজ করেন, তাঁর হিসেবে ভুলচুক হয় না। আমি বলছি বিশুদা, তোমার কিচ্ছুই হবে না।

পরিজনসুলভ সান্ত্বনার এই পরিচিত সুর বিশুর উদ্বেলিত চিত্তটি কিছুক্ষণের জন্য যেন স্থির ও নিথর করিয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতা বাষ্পের আকার ধরিয়া এই অভিভূত বালকটির দুই চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কে যেন তাহাকে সহসা সচেতন করিয়া দিল; তাহার মনে পড়িয়া গেল রহিমের কথা, এখনো তাহার হাত-মুখ ধোয়া হয় নাই—হয়ত মুখেও কিছু দেয় নাই। ব্যগ্রকণ্ঠে বিশু কহিয়া উঠিল,—আমি কি স্বার্থপর দেখ, তোমরা ভেতরে যাচ্ছিলে—আমি কথার ফের দিয়ে তোমাদের আটকে রেখেছি; তোমরা যাও; আমি ততক্ষণ বইখানা দেখি।

রহিম কহিল,—তাই দেখ, পরি ঐ বইখানা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে; ওর ভেতরে যে কবিতা-গুলো আছে, ও সব মুখস্থ করে ফেলেছে।

পরি বেশ সপ্রতিভকণ্ঠে কহিল,—ভাল কবিতা পড়লে কার না মুখস্থ করবার ইচ্ছে হয় বল? বিশুদাও কি ছাড়বে নাকি? আর তুমি? তা বুঝি জান না বিশুদ', দাদা ঐ সব কবিতা প'ড়ে নিজে নিজে কত সব কবিত বাঁধে; তোমাকে সেগুলো শুনিয়ে দেব আজ।

রহিম তর্জ্জন করিয়া উঠিল,—ই থাম্।

পরি কহিল,—কেন, মিছেকথা ত' বলিনি, আর মিছেকথা বলবার মেয়েও আমি নই। কবিতা তুমি লেখ না?

বিশু প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে রহিমের দিকে চাহিয়া কহিল,—তোমার ত' তাহলে অনেক গুণ রহিম ভাই?

রহিম কহিল,—পরির কথা শোন কেন, ও একটা আমার খেলা।

পরি হাসিয়া কহিল,—এখন এসো, এই বেলা আমরা ওদিককার কাজ সেরে আসি। বিশুদা কতক্ষণ একলা থাকবে?

রহিম বিশুর দিকে চাহিয়া কহিল,—বেশীক্ষণ আমাদের দেরী হবে না, এখনি আসছি বিশু ভাই।

কথাগুলি বলিতে বলিতেই রহিম ভিতরে চলিয়া গেল। পরি কহিল,—একখানা খাতা আর পেনসিল পাঠিয়ে দিচ্ছি বিশুদা; ওর মধ্যে যে কবিতাটি তোমার ভাল লাগবে টুকে নিয়ো; তাতে মুখস্থ করবার সুবিধা হবে।

পরি বাড়ীর ভিতরে গিয়াই তাহাদের বালক চাকরটিকে দিয়া একখানা একসারসাইজ খাতা ও একটা পেনসিল পাঠাইয়া দিল। বিশু তখন পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিল। চাকরটি তাহার মনো-যোগ আকর্ষণ করিয়া তাহার কাছেই সেই দুইটি বস্তু রাখিয়া চলিয়া গেল।

এই হিন্দু চাকরটিকে আনন্দপুরের বাজারে পাঠাইয়া বিশুর জন্য বাহিরে খাবারের ব্যবস্থা করিতেই ভ্রাতা ও ভগিনী ভিতরে গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ফিরিবার পূর্ব্বেই 'পদীপের' একটা লেখা বিশুর অন্তরের অন্তস্তলে যেন পদীপ্ত শিখার উত্তপ্ত পরশ দিল। বিশু তৎক্ষণাৎ শিহরিয়া সোজা হইয়া বসিল, বইখানি আপনা আপনিই মুড়িয়া গেল। তাহার চিত্তমধ্যে তখন অসহ্য জ্বালা ধরিয়াছে। সত্যই ত', সে কি পাগল হইয়াছে? ইহারা না-হয় গৃহীর কর্ত্তব্য করিতেছে, আশ্রিতকে রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে; ওস্তাগর সাহেব তাহাকে রক্ষা করিতে কোমর বাঁধিয়া ছুটিয়াছেন। বইয়ের ঐ গল্পটার বৃদ্ধটির মত হয়ত এই সূত্রে তিনি অতি বড় বিপদে জড়াইয়া পড়িবেন এবং হাসিমুখেই তাহা সহিবেন। কিন্তু তাহার কি উচিত, এই সুযোগটুকু লইয়া এইভাবে নিজেকে রক্ষা করা? গল্পের ঐ বিপন্ন মানুষটি চুপ করিয়াই বসিয়াছিল, তাহাকে বাঁচাইতে অপরিচিত বৃদ্ধটির মৃত্যুবরণ শেষ পর্য্যন্তই সে দেখিয়াছিল! কিন্তু সেও কি তাহাই করিবে? না, সে ঐ গল্পের মোড় ফিরাইয়া দিবে। সত্য সে

গোপন করিবে না, তাহার জন্য আর একজন নিরপরাধকে সে বিপদগ্রস্ত হইতে দিবে না। সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র উত্তেজনা বিশুকে অস্থির করিয়া তুলিল। তাহার নিজের মনই যেন কঠিন হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—কেন সে ভীরুর মত মাঠ হইতে পলাইয়া আসিল? কেমন করিয়া এখানে সে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে? তাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই সদাশয় ওস্তাগর সাহেব যদি শাস্তি পান, সে কি খুসী হইবে?

বিশু সবেগে উঠিয়া পড়িল, আপন মনেই মাথা নাড়িয়া কহিল,—না না না, আমি থাকতে পারব না এখানে লুকিয়ে—কিছুতেই না।

হঠাৎ চঞ্চল দৃষ্টি তাহার পড়িল তক্তপোষের উপর একসাবসাইজ খাতা ও পেনসিলটির উপর। সেই দুইটি বস্তুই যেন তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিষ্কৃতির একটা যুক্তি তাহার অস্থির মস্তিষ্কের ভিতর সঞ্চার করিয়া দিল। খাতাখানা খুলিয়াই সে তাহার প্রথম পৃষ্ঠায় পেনসিল দিয়া লিখিয়া ফেলিল—

ভাই রহিম,

তোমাদের আদর-যত্ন আমাকে আর সমস্তই ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোমরা সকলেই মহত্তের মতই কাজ করেছ, কিন্তু আমি করেছি ঠিক তার উল্টো। এই বয়ের একটা গল্প থেকেই আমার ভুলটুক বুঝতে পেরেছি, তাই নেহাৎ কাপুরুষের মত এখানে লুকিয়ে না থেকে ধরা দেবার জন্য আবার এখান থেকে পালাচ্ছি। না বলে যাওয়ার জন্য আমাকে ভাই ক্ষমা ক'র তোমরা। তোমাদের কথা কখনো ভুলতে পারব না।

তোমাদের—বিশু।

খাতার লেখার অংশটা খুলিয়া রাখিয়া ও তাহার উপর বাঁধানো বইখানার কিয়দংশ চাপা দিয়া বিশু সতর্ক পদে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই পরি তাহার দাদার লেখা একখানা কবিতার খাতা হাতে করিয়া কলহাস্যের সহিত ঘরে ঢুকিল। কিন্তু যে অতিথিটিকে চমৎকৃত করিয়া দিবার জন্য বিজয়িনীর মত পরির আবির্ভাব, পরিচিত তক্তপোষটির উপর তাহার অভাব এক-নিমিষে সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিল। সহসা বন্ধ হইয়া গেল কলহাসির ঝঙ্কার, দুই চক্ষুর দৃষ্টি পড়িল বাঁধানো কেতাবখানির একাংশ চাপা খাতাখানির উপর। তাড়াতাড়ি সেখানা টানিয়া লইয়া সে বিশুর চিঠিখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

পরক্ষণেই রহিম আসিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—অমন করে পড়ছিস্ কি? বিশু কোথায়?

পরি মৃদুকণ্ঠে কহিল,—পাখী তোমার উড়ে গেছে!

তীক্ষ্ণকণ্ঠে রহিম কহিল,—সব সময় জেঁপমী ভাল লাগে না; হ'ল কি?

পরি খাতাখানা রহিমের হাতে দিয়া কহিল,—যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। পড়ে দেখ না।

বিশুর চিঠি পড়িতে পড়িতে রহিমের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। পড়া শেষ হইতেই একটা নিশ্বাস জোরে ফেলিয়া সে কহিল,—এখন ভাবছি, ওকে একলা ফেলে আমাদের যাওয়াটা ঠিক হয় নি।

পরি কহিল,—ছেলেটা ভারী আহাম্মুখ নয় দাদা?

রহিম কোন উত্তর দিল না, বিশুর হাতের লেখা অক্ষরগুলি এই ছেলেটির মনের ভিতরেও বুঝি অবিরত মক্স হইতেছিল। বিশু যেন তাহারই মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়া খাতার এই কাগজখানায় দাগিয়া দিয়াছে—কাপুরুষের মত লুকিয়ে না থেকে ধরা দেবার জন্য এখান থেকে পালাচ্ছি।

দাদার মনের কথা যেন তাহার এই নীরবতার ভিতর দিয়াই ধরিয়া ফেলিয়া সহসা কহিল,—আচ্ছা দাদা, তুমি বিশুদার অবস্থায় পড়লে কি করতে?

রহিমের মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গলায় জোর দিয়া সে কহিল,—আমিও ঠিক এমনি করেই পালাতুম পরি।

পরির মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা দিল,—কহিল, সত্যি? তাই বুঝি তোমার বন্ধুকে ধরতে ছোটনি, স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, আর মনে মনে তার তারিফ করছ?

রহিম কহিল,—তারিফ করবার কাজ ত' সে করে গেল।

পরি এবার দাদার কথায় সায় দিয়া কহিল,—যা বলেছ দাদা, যদিও ওর জন্যে মনে আমাদের কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু না বলে পারছি না—ঠিক রাস্তাই এবার ও ধরেছে, আর এর জন্যে ওকে আমি এই প্রথম সেলাম করছি।

ইহার ঘণ্টা দুই পরেই ওয়ারিস সাহেব ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরখানিতে ভ্রাতা ও ভগিনী দুইটি প্রাণী তাঁহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

ওয়ারিস সাহেবকে দেখিয়াই উচ্ছ্বসিত স্বরে পরি প্রশ্ন করিল,—কি হল কাকু? বিশুদার সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?

ওয়ারিস সাহেব সমস্ত কথাই স্পষ্ট করিয়া ভ্রাতা-ভগিনীকে শুনাইয়া দিলেন, যাহা যাহা সেখানে ঘটিয়াছিল, জমিদার চন্দ্রনাথ বাবুর নির্দ্দেশে পুলিস সাহেব তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হাতকড়ি বাহির করিলে কেমন করিয়া ঠিক সেই সময় বিশু সেখানে উপস্থিত হইয়া ধরা দিয়াছিল।

রহিম জিজ্ঞাসা করিল,—সেই হাতকড়ি বুঝি বিশুর হাতেই পড়ল?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—পড়তই ত, তাজ্জব ছাবাল, কিছুতেই ডয়ডর নেই। সাহেব যেই বললে, তুমি বিশু ত, তোমাকে আমি বাঁধবো। অমনি সে দুখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—বাঁধো?

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া পরি কহিল,—বাঁধলে?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—খোদার মর্জ্জী কে নয় করে? হঠাৎ অমনি বিশু বাবুর মা সেখানে এসে হাজীর হলেন। চোখ পাকিয়ে কইলেন,—মুই জামীন, মোর ছাবালরে তুমি রেহাই দাও সাহেব।

রহিম কহিল,—বিশুর মা বললেন এ কথা? বা! বা! তারপর, সাহেব কি বললে?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—সাহেবকে কি চন্দর বাবু কথা বলতে দেয়,—কত আইন বাতলায়, ইংরাজীতে বলে, বুঝতে ত পারিনে বাপু। হাঁ, তবে সাহেব হলে কি হয়, মেয়ে লোকের মান ইজ্জৎ বোঝে, চন্দর বাবুকে এক ধমকানি দিয়ে থামিয়ে দিলে। তারপর বিশুবাবুর মাকে বুঝিয়ে বললে, জামীন দেবার মালিক ত মুই নই মায়ী; সে হচ্ছে মেজেষ্টর হাকিমের হাত। তা আপনার ছাবালের হাতে মুই হাতকড়ি দোব না, অমনি অমনি আদালতে নিয়ে যাব কাল সকালে। আজ রাতটা সে তোমার কাছেই থাকবে মায়ী, মুই খুব ভোরেই হাজীর হব এখানে। চন্দর বাবু তাতে না করলে, কত কি ইংরাজীতে সাহেবকে বোঝালে, কিন্তু সাহেব তেনার কথায় কান না দিয়ে বিশু বাবুর মায়ীকে ছেলাম দিয়ে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেল। চন্দর বাবু হাঁ করে বসে রইলেন।

পরি কহিল,—ভাগ্যিস বিশুদা গিয়েছিল!

রহিম জিজ্ঞাসা করিল,—আসবার সময় চন্দর বাবু তোমাকে কিছু বললে কাকু?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—আমি তাঁকে যা বলবার বলে এলুম, তিনি রাটি কাড়লেন না।

পরি জিজ্ঞাসা করিল,—কি বলে এলে কাকু?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—বললুম, বিশুবাবু রায়-আনন্দপুরের তামাম লোকের বুকের কলজে, ওনার তরে মোদের সবার জান কবুল; তোমার যা ক্ষ্যামতা হয় কর।

রহিম ও পরি উভয়েরই মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। পরক্ষণে রহিম কহিল,—বেশ বলেছ কাকু!

১৭

ঘরের বাহিরে দালান ও উঠানে বাড়ীর প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন। এমন সঙ্গীন ব্যাপারটির কি রকম নিষ্পত্তি হয়, তাহা জানিতে ইঁহাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে পারেন নাই কিম্বা বিশুর পক্ষ লইয়া কোনো কথা কহিতে কাহাকেও আগ্রহশীল দেখা যায় নাই।

বিশুর হাতখানি ধরিয়া হেমাঙ্গিনী দেবী যখন ইঁহাদের ভিতর দিয়া নিজের প্রকোষ্ঠের দিকে চলিলেন, তখন অনেককেই সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখা গেল। বাড়ীর এক প্রবীণা অগ্রসর হইয়া অযাচিত ভাবেই কহিল,—কি ভরসা তোমার মা?

আর এক প্রবীণা তৎক্ষণাৎ কথাটার সায় দিয়া কহিল,—ভরসা না হলে বাঘের মুখ থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে আনতে পারে?

কিন্তু হেমাঙ্গিনী দেবী এ সকল কথায় কাণ না দিয়া বা কাহারও দিকে ভ্রূক্ষেপটুকুও না করিয়া ছেলের সহিত নিজের মহলার দিকে হন হন করিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন মা ও ছেলেকে কেন্দ্র করিয়া আর এক দফা আলোচনা আরম্ভ হইল। যে দুই প্রবীণা

এইমাত্র আশু বাড়াইয়া মায়ের প্রশংসা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারাই পুনরায় মায়ের অসাক্ষাতে বিচিত্র ভঙ্গীতে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

প্রথম প্রবীণা কহিল,—মাগীর তেজ দেখলে যেন লড়াই কত্তে করে চলেছেন, তাঁহাকে মাটীতে আর পা পড়ে না।

অপর প্রবীণা কহিল,—মাগো মা। দিনে দিনে এ সব হচ্ছে কি। না হয় হাতে দু'পয়সা আছে, তাই বলে ঝিদীর মত সদরের ঘরে সবার সামনে বেরুতে হবে! সায়েব-গোরা—তার সামনে দাঁড়িয়ে তকরার। কি ঘেন্না মা, কি ঘেন্না!

কুসুমের মা নবতারাও এই দলে ছিল। বুড়ীদের কথা তাহার কাণে বুঝি বিঁধিতেছিল। সে এই সময় মুখ টিপিয়া হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, কিন্তু তোমরাই দুজনে ত ওপর-পড়া হয়ে মেজ বৌদির সুখ্যেত করলে পিসীমা। এখন আবার উল্টো গাইছ যে।

ঝঙ্কার দিয়া প্রথম প্রবীণা তৎক্ষণাৎ জোরগলায় কহিল,—তুই থাম্ ছুঁড়ি! মুখের ওপর কথা ক'স নি।

অপর প্রবীণাও সঙ্গে সঙ্গে মারমুখী হইয়া কহিল,—ওর গায়ে যে লেগেছে, তাই টিলটি ছুঁড়ে টস্ দেখালে। ওর মেয়েও যে ও-ঘরে ছেল, বিশুর মার পিছু পিছু গেল দেখনি।

সত্যই কুসুম শেষ পর্য্যন্তই বাহিরের ঘরে থাকিয়া ঘটনাটার নিষ্পত্তি দেখিয়াছিল এবং বিশুর হাত ধরিয়া তাহার মা বাহির হইবামাত্রই সেও মনে মনে কি একটা মতলব আঁটিয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল।

কুসুমের মা নবতারার প্রকৃতি আর যাহাই হউক, স্পষ্ট কথা বলিতে সে কোন ক্ষেত্রেই দৃকপাত করিত না, এখানেও করিল না। খপ করিয়া কহিল,—মেজ-বৌদি যদি বাইরের ঘরে এসে সায়েবের সঙ্গে কথা কইতে পারে, আমার মেয়ের তাতে ও-ঘরে যাওয়াটা কি এমন দোষের হয়েছে?

মুখ ঝাপটা দিয়া এক প্রবীণা কহিল,—হয়নি দোষ? মেয়ে কি তোর কচি খুকিটি এখনো আছে নাকি! এসব ভাল নয়।

নবতারা পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—দোষ যদি হয়েছে, তাহলে মেজ বৌ-দিকে দেখেই ছুটে গিয়ে অত সুখ্যেত করলে কেন? আর যেই সে চোখের আড়ালে গেছে, অমনি সুর পাল্টাচ্ছই বা কেন?

নবতারার এই জেরার উত্তর দেওয়া যেমন কঠিন, এই শ্রেণীর নারীদের জিহ্বার গতি রুদ্ধ করাও ততোধিক কঠিন। অন্যের দোষগুলি ইহাদের যে তীক্ষ্ণ চক্ষুর উপর সর্ব্বদাই কিলবিল করিতে থাকে, নিজেদের কোন দোষের ছায়াটুকুও তাহাতে পড়ে না, কেহ এ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ দিলে ইহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সুতরাং নবতারা হাসিমুখে যে প্রশ্ন করিল, ইহারা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া অন্য দিক দিয়া নবতারাকে নির্ম্মম আঘাত দিল। কহিল, তবু যদি সোয়ামীর মুরদ থাকত। বাপের বাড়ী গুষ্টিশুদ্ধ পড়ে লাথি ঝাঁটা খায়া খেতে পারে, তাদের মুখ ত অমনি আলগাই হবে।

কোন্ কথা হইতে কোন্ কথা আসিল। কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি নবতারার অবিদিত ছিল না। সে কিছুমাত্র ভাবিল না, পূর্ব্ববৎ হাসিমুখেই কহিল,—বাপ বেঁচে থাকলে তাতেও সুখ আছে পিসীমা, যা তা একটা সুবাদ ধরে পরের দোর আঁকড়ে পড়ে থাকার চেয়ে বাপের বাড়ীর লাথি ঝাঁটাও ভাল।

নবতারার কথাটায় যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িল। উক্ত দুই প্রবীণাই বড়বাড়ীর কোন দুই সরিকের গলগ্রহরূপেই জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, পতি ও পিতৃকুলে ইহাঁদের বাতি দিতে কেহ নাই, মাতৃকুল সম্পর্কে দূরতম কোন প্রশাখা অবলম্বন করিয়া এখানে কায়েমীভাবে বাসা পাতিয়াছেন।

বিতর্কের নিষ্পত্তি হয়ত এখানেই হইত না, কিন্তু এই সময় দেহরক্ষী বাহাদুরের সহিত চন্দ্রনাথ বাবুকে সেই পথে আসিতে দেখিয়া—হঠাৎ একটা দমকা বাতাস বহিলে তুলার স্তূপ যে ভাবে চারিধারে উড়িয়া ছড়াইয়া পড়ে—দালান ও উঠানে সমবেত মহিলারাও ঠিক সেই ভাবে কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

কোন কোন সংসারে, এমন প্রকৃতির মেয়েও দেখা যায় যে, অন্যায় তাহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না এবং কাহারো অন্যায় কথা কাণে বাজিলে নীরবে সহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। অথচ, ইহাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, যে সব কাজ নিজের একান্ত অবাঞ্ছিত, নিজের প্রিয়জনরা তাহাতেই ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। নিজের ঘরের জঞ্জাল সাফ করিতে ইহারা যে পরিমাণ উদাসীন, পরের বাড়ীর আবর্জ্জনা দেখিয়া

নাক নাড়িতে সেই পরিমাণেই আগ্রহশীল। নবতারা ঠিক এই শ্রেণীরই মেয়ে। স্বামীকে সে বিপথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই এবং তাহার মেয়ে কুসুমও এই বয়সেই—বয়সের অনুপাতে যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, সে পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। মেয়েকেও শাসন করিবার মত শক্তি নবতারার নিশ্চয়ই নাই। সুতরাং তাহার প্রকৃতিগত হ্যায়নিষ্ঠা ও অন্তের উদ্দেশে উচিত কথার কি সার্থকতা থাকিতে পারে?

যাহারা বিশুর মায়ের অনুগ্রহপ্রত্যাশী, তাহারা এ অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করিতে তাঁহাদের প্রকোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকেই অনেক কথা কহিল, সে সকল কথায় অপর পক্ষের উপর নিন্দা ও আক্রমণ যে পরিমাণ ছিল, হেমাজিনী দেবীর সাহস ও আক্কেল বিবেচনা সম্বন্ধে ততোধিক প্রশংসাও ছিল। কিন্তু হেমাজিনী দেবীকে কাহারও কথায় কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতে দেখা গেল না, তাঁহার মুখের একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বর্ম্মের মতই যেন বহু কণ্ঠের নিন্দা স্তুতি সমস্তই প্রতিহত করিয়া দিল। তখন একে একে আর সকলেই আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল, রহিল শুধু একা কুসুম। সহসা সে মুখখানা মচকাইয়া ও চোখ দুইটি ঘুরাইয়া হেমাজিনী দেবীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—ছেলে যেন তোমার কি মামীমা। ছিলেন আমার কাছে, ফুল পাড়ছিলেন, অমনি চাপলো মাথায় রোখ, এক লাফে গাছের ডাল থেকে মাটীতে না নেমেই এক ছুটে একবারে মাঠ। বারণ কি কাণে নিলে তখন! না গেলে ত এ সব কিছু হ'ত না।

বিশু রুক্ষ কণ্ঠে কহিল,—তুই থাম্।

কুসুম কহিল,—থেমেই ত গোল বাধিয়েছি। যদি তখন জোর করে কেংাতুম, এ ভোগান্তি তাহলে হ'ত? তোমার কি বল না, দুচক্ষু যেথানে নিয়ে গেল ছুটলে, এদিকে মামীমার মুখখানা যদি দেখতে। বা ত।

ছেলের সঙ্গে মায়ের অনেক কথাই ছিল। কিন্তু কুসুমের উপস্থিতি তাহাতে বাধা দিতেছিল। অথচ এমন আন্তরিকতার সহিত এই মেয়েটি কথাগুলি বলিতেছিল যে, মুখ ফুটিয়া তাহাকে চলিয়া যাইবার কথা বলিতে বাধিতেছিল।

কুসুম পুনরায় কহিল,—এখন তোমাকে বলি মামীমা, তোমার কথা শুনে মনটার ভেতর কি রকম যেন করে উঠল, তাই নিজেই ছুটেছিলুম বুড়োর ঘরে, বললুম—কাজটা কি তোমার ভাল করছে মাম-বাবু? ছেলের ছেলের না ঝগড়াই হয়েছে, এমন ত কতই হয়, তা বলে তুমি বুড়ো মিনসে—গুর্থা লেলিয়ে দিলে কি হিসেবে?

মনের এমন বিপ্রিয় অবস্থাতেও কুসুমের কথায় হেমাজিনী দেবীর মুখে ঈষৎ হাসির সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন,—তুই ত দেখছি আচ্ছা মেয়ে?

উৎসাহের সুরে কুসুম কহিল,—আগে কথাগুলো সব শোনো? বুড়ো চোখমুখ পাকিয়ে বললে—ও কি ছেলে? একটা খুদে ডাকাত, আমি ওকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়ব। আমারও মামীমা মাথায় রোখ চেপে গেল, বিশুদার বাতাস ত গায়ে লেগেছে। বললুম অমনি বুড়োর মুখের ওপর—এটা কিন্তু মগের মুল্লুক নয় মামাবাবু যে, যা ইচ্ছে তাই করবে? বিশুদার মাকে ত তুমি জান না, তোমাকে এক হাটে বেচে আর এক হাটে কিনতে পারে।

হেমাজিনী দেবী শেষের কথায় কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণু হইয়াই কহিলেন—কি দরকার ছিল বাবু ও সব কথায়। তুই এখন ঘরে যা মা, রাত হয়েছে।

কুসুম কহিল,—যাচ্ছি গো! জালা কি শুধু তোমার একলার? হাঁ, একটা কথা তোমাকে বলে যাচ্ছি মামীমা, বুড়ো উকীল হলে কি হবে, নিজেই গোল করে মরেছে।

হেমাজিনী দেবী প্রশ্ন করিলেন,—কেন?

কুসুম কহিল,—আচ্ছা, ঝগড়া ত বেধেছিল ঐ মাজামুলো অখিল ছোঁড়াটাকে নিয়ে, তারও গোড়াতে ছিলেন আমাদের রাইকিশোরী শুভি; মামলা হলে এদের দুটিকে ত ডাকতে হবে উকীল বুড়ো কিন্তু ওদের দুজনের কথা একদম যে চেপে গেছে, তা বুঝি জান না?

হেমাজিনী কহিলেন,—তাই নাকি?

কুসুম কহিল,—আমি যে সুরু থেকেই ছিলুম গো। সব দেখিছি চোখে, আর শুনিছিও কাণে, তবে ধরা-ছোঁয়া দিইনি মামীমা। উকীল বুড়ো ওদের দুটিকে ছাড়ান দিয়েছে কেন, তাও আমি বুঝিছি।

এই মেয়েটির মুখে এই ধরণের অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া হেমাজিনী দেবী অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে প্রশ্নও প্রকট হইতেছিল, বিস্ময়েরও অন্ত ছিল না।

কুসুম স্নিগ্ধ সপ্রতিভকণ্ঠেই কহিল,—কেন তা

শুনতে চাও মামীমা? তবে বলি শোনো, পাছে নিজের রাঙামুলো ছেলেটিকে নিয়ে আদালতে টানা হেঁচড়া চলে—তাই! তাহলে যে ওঁর মানে ঘা লাগ্‌বে গো! কিন্তু আমি তোমাকে বলে রাখছি মামীমা, মামলা যখন হবে, আমাকে সাক্ষী মেনো, আমি হাকিমের সামনে দাঁড়িয়ে সব ফাঁস করে দেব।

কথা। বলিয়াই কুসুম হন হন করিয়া চলিয়া গেল, কথাটার কোন উত্তর প্রত্যাশা করিল না বা পিছনের দিকে একটিবারও ফিরিয়া চাহিল না।

— —

১৮

শোভাই প্রথমে বাড়ীর ভিতরে আসিয়াছিল। কপালের ক্ষতটা হাত দিয়া ঢাকিবার যত চেষ্টাই সে করুক, কচি কচি আঙুলগুলির ফাঁক দিয়া তখনও রক্তের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এ সব ঘটনা পল্লীপরিবারে নূতন নহে, প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সাবিত্রী দেবী মেয়ের দিকে চাহিয়া মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—পড়ে মরেছিস্, বুঝি, না মারামারি করে এলি কারুর সঙ্গে?

শোভা কোনও উত্তর না দিয়াই নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিল। মা খপ করিয়া মেয়ের হাতখানা ধরিয়া কহিলেন,—কই, দেখি।

মেয়ে দেখাইতে চাহে না, হাতখানা ছাড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিল,—কিছু হয় নি, ছেড়ে দাও।

মা কণ্ঠে জোর দিয়া কহিলেন,—কিছু নয় কি! কপালখানা ত ফাটিয়ে এসেছিস্ দেখছি; হাত দিয়ে ঢাকা দিলেই কি রক্ত থামানো যায় পোড়ারমুখী! এম্‌নি করে কোন্ দিন খুন হবি, না হয় কোনো একটা অঙ্গ খুইয়ে আসবি। আর দেখি—

বলিয়াই মা জোর করিয়া মেয়ের শুশ্রূষায় মনোযোগ দিলেন। ব্যথার সুরে কহিলেন,—ইস্! এখানটা যে একেবারে তোবোর হয়ে গেছে রে! কোথায় পড়েছিলি! ইস্—মাগো!

মর্ম্মবাণীর সঙ্গে সঙ্গে আহত স্থানটি ধুইয়া মুছিয়া তাহাতে চুণ ও হলুদের পুলটিশ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মহামায়া দেবী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরের গোলযোগ শুনিয়াই সম্ভবতঃ ছাদের উপর হইতে তিনি ক্ষিপ্রপদে নামিয়া আসিয়াছেন, তখনও ঘন ঘন শ্বাস পড়িতেছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল শোভার কপালের ক্ষত, অবশ্য তখন তাহাতে রক্তের সংস্রব বিশেষ ছিল না। কিন্তু ইহা দেখিয়াই তিনি অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—ওরে বাবা! কি হয়েছে কপালে ওর? আপনি এখনো মুখ বুজে রয়েছেন? কি দিচ্ছেন? চুণ হলুদ? না—না,—ওতে কি হবে, টিঞ্চার আয়ডিন্ দিন তুলোয় করে, দাঁড়ান, আমি আনাচ্ছি, ওঁর ব্যাগে আছে।—

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলিয়াই তিনি একেবারে হাঁফাইয়া উঠিলেন। একটু দম লইয়া বোধ হয় তাঁহার দাসীকে ডাকিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহাতে মুখের স্বর মুখের ভিতরেই আবদ্ধ রহিল, দুই চক্ষু যেন কপালের দিকে ঠেলিয়া উঠিল, দেহের সমস্ত সম্বিৎটুকু কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ কে যেন তাঁহাকে ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করিয়া দিল।

দ্রুত পদশব্দ ও তৎসহ একটা চাপা কণ্ঠের আওয়াজ শুনিয়া সাবিত্রী দেবী দ্বারের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, সে আর কেহ নয়, অখিল। কিন্তু এ কি মূর্ত্তি তাহার! ঠোঁট দুইটি ফুলিয়া পটলের আকার ধরিয়াছে। কোঁচার খুঁটটি হইতে জামার হাতা দুইটি রক্তে মাখামাখি হইয়াছে। কি হইয়াছে জানিবার জন্য যেমন তিনি ঠোঁট দুখানি নাড়িয়াছেন, অমনি তাঁহাকে অবাক করিয়া দিয়া মহামায়া দেবী চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—ওগো, এ কি সর্ব্বনাশ হল আমার। বাবারে!

বিশাল অন্দরমহলে যে যেখানে ছিল, হাতের কাজ ফেলিয়া সবাই আসিল এইখানে ছুটিয়া। সাবিত্রী দেবী নির্ব্বাক, শোভা হ্যাবাচাকা হইয়া চাহিয়া রহিল,—এমন তুচ্ছ ঘটনায় এত উচ্চ গ্রামের আর্ত্তনাদ আর কখনও সে শুনে নাই। সে ভাবিয়া পাইল না, কি করিবে।

চারিদিক হইতে ছেলে মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া যেন থ হইয়া গেল। বুক চাপড়াইয়া কপালে হাতের তালির ঘা দিয়া মহামায়া দেবীর কি আর্ত্তনাদ!—ওরে খোকোনরে! বাবা আমার— এমন করে কোন্ কালনিমে তোকে খুন করলে রে!

সাবিত্রী দেবী তৎক্ষণাৎ মেয়েকে ছাড়িয়া

অখিলকে লইয়া পড়িলেন। ক্ষতস্থান ধোওয়া মুছা, পরিচর্য্যা—কিছুরই ত্রুটি হইল না। মহামায়া দেবীর মুখে শেষ পর্য্যন্ত হা-হুতাশ ও উচ্ছ্বাস যে শুনা গেল, শুশ্রূষার কোন নির্দ্দেশ সে অনুপাতে কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না।

সাবিত্রীদেবী কহিলেন,—ছেলের ছেলের হয়েছে হয়ত কিছু, এ এমন হয়েই থাকে ; এই নিয়ে কি অমন করে চেঁচাতে আছে দিদি! কোথায় আইডিন্ আছে আনতে বলুন, লাগিয়ে দিই।

কিন্তু বলিবেন কাহাকে, আর শুনিবেই বা কে? যেমন কর্ত্রী, তেমনই তাঁহার দাসী। খোকাবাবুর ঠোঁট ফোলা, জামার কাপড়ে রক্তের দাগ, এসব দেখিয়া কেমন করিয়া সে স্থির থাকিবে? তাহার আর্ত্তস্বর তখন সুর সংযোগে সপ্তমে চড়িয়াছে,—ওগো কত্তা বাবু গো। এ যমের দেশে খোকাবাবুকে কেন এনেছিলে গো!

বড়বাড়ীর সকলে হতভম্ব হইয়া ভাবিতেছিল, একটু কিছু হলেই বুঝি বড় লোকদের এমনি ঘটা করে কান্নাকাটি করতে হয়!

যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত সাবিত্রীদেবীর তৎপরতায় সমস্তই সুসম্পন্ন হইয়া গেল। হঠাৎ কোনও দুর্ঘটনা হইলে, যে সকল ঔষধপত্র ও তোড়জোড়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সে সমস্তই ঝি-চাকরের জিম্মায় ছিল, সাবিত্রী দেবীর তাগিদে সে সমস্তই আনিয়া দিয়াছিল। নিপুণ নার্সের মত ক্ষিপ্রহস্তে সাবিত্রী দেবী অখিলের মুখের আহত স্থানটি রীতিমত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। মহামায়া দেবীর সর্ব্বাঙ্গ শেষ পর্য্যন্ত ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, তিনি কিছুতেই হাত লাগাইতে পারেন নাই।

অখিলের মুখে পটি পড়িতে, এত দুঃখেও শোভার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল, কি কষ্টেই যে তাহাকে সে হাসি চাপিতে হইয়াছিল তাহা সেই জানে। এই সময় মহামায়াদেবী অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—ভাগ্যিস্, আপনি ওপরপড়া হয়ে এসব করলেন! দেখলেন ত, সবই আছে ; কিন্তু এমনই আমার ভীতু মন, একটু কিছু হলে আর হাত পা ওঠে না, একবারে এলিয়ে পড়ি।

সাবিত্রীদেবী কহিলেন,—পাড়াগাঁয়ে এ রকম আকছারই হয়ে থাকে দিদি! আজ এ পড়লো হোঁচট খেয়ে, কাল ভাঙলো মাথা, তারপর ছেলের ছেলের মারামারি—

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে অখিল ইতিমধ্যেই মারামারির কাহিনীটুকু প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং মারামারির কথাটা মহামায়াদেবীর কাণে বাজিবামাত্রই তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—ছোটলোকের ছেলেরাই এ রকম করে মারধর করে বেড়ায়, মগের মুলুকে ত এতকাল ছিলুম, কই, এ রকম কাণ্ড ত কখনো দেখিনি চোখে!

শোভা এই সময় পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িবার পথ খুঁজিতেছিল। মহামায়াদেবী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—মেয়েটির কপালখানাও ত দেখছি গর্ত্ত করে দিয়েছে হতচ্ছাড়া দস্যি ছেলে! কই, ওখানে ত আইডিন দিলেন না! শীগ্‌গীর দিন। নইলে এখুনি সেফ্‌টীক হবে—

ইচ্ছা না থাকলেও সাবিত্রীদেবীকে আইডিনের শিশি ও কিঞ্চিৎ তুলা লইয়া মেয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হইল। কিন্তু মেয়ে অমনই বাঁকিয়া বসিল, মুখখানা ভার করিয়া কহিল,—আমি ও ওষুধ দেব না, এ আপনি সেরে যাবে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ত্রস্তা হরিণ শিশুটির মত সেখান হইতে ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়া গেল

মহামায়াদেবী কহিলেন,—মেয়ে ত আপনার ভারি অবাধ্য দেখছি!

সাবিত্রীদেবী কোন উত্তর দিলেন না। শোভার এভাবে স্থানত্যাগ অখিলের আহত মনে পুনরায় আঘাত দিল, মুখে বিরক্তির ভাবটুকু ফুটাইয়া সে কহিল,—ঐ বিশে ছোঁড়াটার পাল্লায় পড়ে ও বিগড়ে যাচ্ছে।

ছেলের কথায় মহামায়াদেবী তাঁহার গম্ভীর মুখখানি ঘুরাইয়া এইবার তীক্ষ্ণকণ্ঠে নির্দ্দেশ দিলেন,—ফিরুন উনি আগে, এর বিহিত তখন হবে।

কিন্তু এই বাড়ীরই এক প্রত্যক্ষদর্শী এই সময় এখানে আসিয়া বাহিরের দুর্ঘটনার পরবর্ত্তী অংশটুকু সালঙ্কারে সকলকে শুনাইয়া স্তব্ধ করিয়া দিল।

১৯

এই অতি অপ্রত্যাশিত ঘটনাটির সঙ্গে সঙ্গেই বড়বাড়ীর বাসিন্দাদের মধ্যে দুইটি দল প্রকাশ্যভাবে গড়িয়া উঠিল এবং আর একটি দল নিরপেক্ষতার

ভাগ করিয়া অপ্রকাশ্যভাবে দুই দলের সহিতই ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিল।

ইহাতে নূতনত্ব নাই, বিস্ময়েরও কিছু নাই। পল্লী অঞ্চলের এইরূপ বহু পরিবারসমন্বিত বনেদী বংশের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, এই দলাদলির রহস্য তাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট। হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অনৈক্য—জাতিগত যত কিছু অনাচার—সবগুলিই যেন এই শ্রেণীর পুরাতন বাড়ী ও প্রাচীন বংশকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের ভিত্তি পর্য্যন্ত দূষিত করিয়া দেয়।

ঘরোয়া কলহের কথা ছাড়িয়া দিলেও বাহিরের কাহারও সহিত এই বংশের কেহ যদি কলহে রত হয়, তখন একই বংশজাত কত বিভীষণই অসঙ্কোচে বাহিরের দলে যোগ দিয়া ঘরের পতন ঘটাইতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। অথচ, চক্ষুর উপরেই ইহারা এরূপ ঘটনার বিপরীত আদর্শ প্রায়শঃই দেখিয়া থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী বাহির-আনন্দপুরের মুসলমান বাসীন্দারা শিক্ষায় সভ্যতায় ও অর্থে যতই তাহারা দুর্ব্বল হৌক না কেন, রক্তের সম্বন্ধমাত্র নাই এমন কোন স্বধর্ম্মী প্রতিবাসী যদি বাহিরের কোন বিশেষ ক্ষমতাশালী কর্ত্তৃক কোনসূত্রে আক্রান্ত হয়, তখনই সমস্ত গ্রাম সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিবেই। কিন্তু পুরুষানুক্রমে কৌলিক অনৈক্যকে ইহারা এমনই অন্ধভাবে প্রশ্রয় দিয়াছে যে, প্রতিবেশী সঙ্ঘবদ্ধ জাতির এত বড় দুর্লভ গুণটি উপলব্ধি করিবারও অবসর কখনও পায় নাই।

স্বামীর প্রতীক্ষায় মহামায়াদেবী উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কত কথাই তিনি শুনিয়াছেন, নানা সূত্রে কত আশঙ্কাই তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া এইখানেই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির যবনিকা ফেলিতে তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না।

চন্দ্রনাথ বাবু বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—তোমার পায়ে পড়ি, যা হবার হয়েছে, আর ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়ে ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ো না—কালই এখান থেকে ফিরে চলো।

চন্দ্রনাথবাবুর মনটা প্রসন্ন ছিল না; বিশুর মায়ের দৃঢ়তা এবং তাহাতে পুলিস সাহেবের পোষকতা তাঁহার সম্ভ্রমে যে আঘাত দিয়াছিল, তাহার জ্বালা তিনি তখনও মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। ইহার প্রতিবিধানের কত উপায়ই পিনাল কোডের ধারাগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে পল্লবিত হইতেছিল। এ অবস্থায় স্ত্রীর এই মর্ম্মোচ্ছ্বাস তাঁহাকে বিচলিত ও বিরক্ত করিয়া তুলিল। বক্রদৃষ্টিতে ক্ষণকাল স্ত্রীর বিবর্ণ মুখখানার দিকে চাহিয়া তিনি শ্লেষের সুরে কহিলেন,—হ'ল কি তোমার, বিশুর মা এসে বুঝি উঠে যাবার নোটিস্ দিয়ে গেছে?

মহামায়াদেবী কহিলেন,—নোটিশ নাই দিক, কিন্তু বিশুর মা যে মোচনমান লেলিয়ে দিয়েছে, তাকি তুমি টের পাওনি?

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—তা আর পাইনি! তবে এখনো যে ভয়ে জমাট বেঁধে যাইনি কেন, তাই ভাবছি! এতকাল বর্ম্মার মগ চরিয়ে এলুম, আজ একটা দজ্জাল মাগী আর জনকতক দর্জ্জীর হুমকী দেখে নিজের দেশভুঁই ছেড়ে না পালালে ইজ্জত থাকে কই?

স্বামীর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া মহামায়াদেবী অভিমানভরে কহিলেন, তোমার দেশভুঁই, তোমার ঘরবাড়ী হলেও তুমি এদের কাউকে আজো চেনো নি। যদি চিনতে, তাহলে ও কথা বলতে না।

চন্দ্রনাথ বাবু কথা আর না বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে আলোচনার মোড় ফিরাইয়া দিলেন। দিব্য সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—খোকা কোথায়? ঘুমিয়েছে?

মহামায়াদেবী কহিলেন,—এই ত এতক্ষণ জেগে ছিল, ঘুমোতে কি পারে বাছা! মুখখানা ফুলে যেন জয়ঢাক হয়ে উঠেছে! সাধ করে কি আর বলেছি—এখানে থেকে কাজ নেই, ফিরে চলো।

চন্দ্রনাথ বাবুর সহজ কণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে সতেজ হইয়া উঠিল, তর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—এই জন্য আমিও পণ করেছি—ঐ বজ্জাত বিচ্ছুটাকে জেল খাটিয়ে তবে ছাড়বো।

কক্ষান্তরে রাত্রিভোজনের আয়োজন চলিয়াছিল এবং সাবিত্রীদেবী ইঁহাদের পাচিকা পরিচারিকাকে লইয়া সেই ব্যবস্থায় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক সাহেবীও নয়, অথচ ইঁহাদের পরিচিত ধারার সহিত খাপ খায় না—এমন এক খিচুড়ী ধরণের ভোজে সাবিত্রীদেবীর মত সুগৃহিণীকেও তালিম দিতে বুঝি হিমসিম খাইতে হইয়াছে। কোনও রকমে আয়োজন সমাধা করিয়া ঠিক এই

সময়ই তিনি অবগুণ্ঠনবতী বধূটির মত মহামায়া দেবীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন,—খাবার দেওয়া হয়েছে।

কাজেই স্বামিস্ত্রীর আলাপ আলোচনা এইখানেই বন্ধ হইল।

অখিল ঘুমাইতেছিল বটে, কিন্তু শোভা এ পর্য্যন্ত চক্ষু দুইটির পাতা একটিবারও বুজাইতে পারে নাই। পাশাপাশি কয়েকখানি ঘরের পর তাহার নিজের ক্ষুদ্র কুঠরীটির ভিতর একহারা একখানা তক্তপোষে পাতা বিছানায় পড়িয়া সে বুঝি এতক্ষণ আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছিল! সেই যে কুরঙ্গ শিশুটির মত ক্ষিপ্রপদে ছুটিয়া আসিয়া শয্যায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহার পর আর উঠে নাই। মা অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও তাহাকে কিছুই খাওয়াতে পারেন নাই। এক কথায় সে মায়ের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছে—বড্ডো মাথা ধরেছে, কিছুই ক্ষিধে নেই, খাব না মা। আমি ঘুমাব।

কিন্তু সে কি ঘুমাইয়াছে? যখনই এই ঘটনা লইয়া কক্ষান্তরে কথা হইয়াছে, সকল চিন্তাকে ঠেলিয়া তখনই প্রতি শব্দটি সংগ্রহ করিতে তাহার কি আগ্রহ! আবার যখনই কথোপকথনে বিশুর কথা উঠিয়াছে, তখন ধৈর্য্য ধরিয়া সে শয্যার উপরও পড়িয়া থাকিতে পারে নাই, আস্তে আস্তে উঠিয়া পা দুখানি টিপিয়া টিপিয়া দরজার দিকে গিয়াছে, কপাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া বিশুর তত্ত্ব আহরণ করিয়াছে। এমন কতবার যে তাহাকে বিছানা হইতে উঠা নামা করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

চন্দ্রনাথ বাবুর গলার স্বর শুনিয়াই সে ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। ইহারই প্রতীক্ষা কত আগ্রহে সে করিতেছিল। এবারও সে পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার পাশটিতে গিয়া স্বামিস্ত্রীর কথা শুনিতেছিল। কিন্তু যখন চন্দ্রনাথ বাবুর মুখের চরম হুমকিতে জেলের কথা ব্যক্ত হইল, তখন বুঝি সেই ঘরের ছাদ হইতে একখানা টালি ভাঙ্গিয়া তাহার মাথার উপর পড়িল! টলিতে টলিতে বিছানায় ফিরিয়া বালিশের উপর মুখখানি গুঁজিয়া দিল, তাহার অজ্ঞাতে অবিরল অশ্রুর ভিতর দিয়া শুধু একটি আর্ত্তস্বর বাহির হইল,—মাগো!

কক্ষান্তরে অনেকক্ষণ ধরিয়াই ভোজন পর্ব্ব চলিল, তাহার সাড়া শব্দ এ ঘরেও আসিতেছিল; কিন্তু শোভার চক্ষুতে ঘুম নাই; ঘরের ভিতরে আলোক ছিল না, ইচ্ছা করিয়া সে দীপটি নিবাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু সেই আঁধারের মধ্যে তাহার চক্ষুর উপর একটি একটি করিয়া যে সকল চিত্র ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেগুলি চিনিবার জন্য কোন আলোরই প্রয়োজন তাহার পক্ষে ছিল না। এ বয়সের স্মৃতিটুকু যতদূর অতীতের দিকে পৌঁছিতে পারে, সে বুঝি একটা ঢেলার মতই তাহাকে জোর করিয়া শেষ সীমানা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াছিল, তাহাতে কি সে লক্ষ্য করিয়াছে, কোন্ কাম্য বস্তুটি সর্ব্বক্ষণই তাহার দৃষ্টির উপর নানাভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাহার আকর্ষণ তাহার জীবন রথে দান দিয়াছে,—সে কে! সে কে! প্রতিবারই বালিকা স্পষ্ট দেখিয়াছে, সে আর কেহ নহে, সে তাহার—বিশুদা! খেলা ধূলা, পড়া শুনা, ঝগড়া ঝাঁটি, ভাব আড়ি, মারামারি—যাহাই মনে জাগিয়া উঠে, তাহাতেই ভাসিয়া উঠে—বিশুদার মূর্ত্তি।

সেই বিশুদা তাহার জেল খাটিবে? ভাবিতে ভাবিতে কতবার নিজের উপরেই তাহার রাগ ও অভিমান জাগিয়াছে; কেন সে অখিলের সহিত ভাব করিয়াছিল। ভাবই না হয় করিল, কিন্তু কেন তাহাকে খেলার মাঠে লইয়া গিয়াছিল? অখিলদা ত যাইতে চাহে নাই, কেন সে তাহাকে জোর করিয়া সেখানে লইয়া গিয়াছিল? সমস্ত গোলের জন্য সেই দায়ী। যদি বিশুদার জেল হয়, সে ত তাহারই দোষে। কিন্তু বিশুদা যদি সত্যিই জেলে যায়, সে কেমন করিয়া লোকের কাছে মুখ দেখাইবে? যারা পাজী, বদমাস, চোর ডাকাত, তারাই ত জেলে যায়, বিশুদাও কি তাই?

এ কথার উত্তর কে তাহাকে দিবে। সকল চিন্তা তালগোল পাকাইয়া এইখানে আসিয়াই শুরু হয়। বালিকার চক্ষুদুটি অমনি ছলছলিয়া উঠে, মনকে আর দমন করিতে পারে না, অশ্রুও আর শাসন মানিতে চাহে না, বালিশের উপর মুখখানা চাপিয়া এইবার সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠে, সেই বিপুল অশ্রুর আবর্ত্তে সে যেন দেখিতে পায়—কয়েদীর পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাহার বিশুদা;—হাতে হাত কড়ি, পায়ে বেড়ি,—উঃ কি ভয়ঙ্কর! বিলাতী ছবির বই হইতে এমনই একটা কয়েদীর ছবি আজিই না অখিলদা

তাহাকে দেখাইয়াছে,—সে ছবির চেহারাটা এখনও যে তাহার চক্ষুর উপর জল্ জল্ করিতেছে। কেন সে মরিতে অখিলদার ঐ ছবির বইখানি দেখিয়াছিল, তাহার বিশুদাও কি ছবিটার মত জেলের কয়েদী হইবে।

২০

একটা কদর্য্য স্বপ্ন শোভার স্বল্পক্ষণের ঘুমটুকু ভাজিয়া দেল।

বিছানায় শুইয়া শুইয়া যে সব কথা সে ভাবিয়াছে, বিশুদার সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা একটার পর একটা উঠিয়া তাহার কোমল মনটাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে,—অথচ কোনটারই সমাধান হইয়া উঠে নাই; ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িলেও, সেই সব ভাবনা ও সমস্যা তাহাকে রেহাই ত দেয় নাই, বরং আরও নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে।

বিশুদার সহিত ভাব ও মনোবাদ সম্বন্ধে কত স্বপ্নই ত সে দেখিয়াছে; খেলা, পড়া, ছুটাছুটী, ফুল পাড়া, মালা গাঁথা, দীঘির জলে মাতামাতি যে সব নিত্যই ঘটিত, রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে তাহাদের প্রকৃত ও বিকৃত কতরূপ ছবিই ত সে স্বপ্নের ভিতর দিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার কোনটিই ত কোন দিন গভীর হইয়া মনের পটে আঁচড় কাটে নাই, ঘুম ভাজিবামাত্রই কোথায় যেন সে সব কুয়াসার মত মিলাইয়া যাইত—কোনরূপ বিধাই মনে জাগিত না।

কিন্তু আজ কেন এমন হইল! আর এমন বিদঘুটে কদর্য্য স্বপ্নই বা সে দেখিল কেন! যে স্বল্প সময়টুকু সে ঘুমাইয়াছে, কেবল দুইটি মানুষকে লইয়া তাহার স্বপ্ন চলিয়াছে। তাহাদের একটী বিশুদা, অন্যটি নবাগত আত্মীয় অখিল। এই দুইটী ছেলের পাল্লায় পড়িয়া স্বপ্নের ভিতর দিয়া কি ভোগান্তিই না তাহার গিয়াছে; কত হাসি, কত কান্না, কত রকমের ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে সহিতে হইয়াছে; স্বপ্নের সে সব ঘটনা যদিও ঘুম ভাজিবার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির রাস্তা ছাড়িয়া এলোমেলো-ভাবে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু শেষের ঘটনাটা যেন সুস্পষ্ট হইয়া রাস্তা যুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘুমাইবার পূর্ব্বে জেল হইবার সম্ভাবনায় বিশুদার হাতে হাত কড়ি, পায়ে বেড়ি ও কোমরে দড়ি বাঁধার কথা মনে উঠিতেই ছবির বইয়ে দেখা কয়েদীর ঐরূপ যে ছবিটি তাহার চক্ষুর উপর ফুটিয়া উঠিয়াছিল, স্বপ্নে দেখিল, তাহারই সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। মস্ত একখানা গাড়ী, তাহার ঘোড়া দুইটা যেমন বড়, তেমনই মিসমিসে কালো; সেই গাড়ীখানার ভিতরে সে বসিয়া আছে, হাত দুইখানি তাহার দড়ি দিয়া বাঁধা, পাশে বসিয়া অখিল; দুইহাতে সে শোভার মুখখানি চাপিয়া ধরিয়াছে, চেঁচাইবার জন্য তাহার কি চেষ্টা, কিন্তু কিছুতেই মুখ দিয়া কথা ফুটিতেছে না। একে অখিলের হাতের চাপুনী ও চোখ রাঙানি, তাহার উপর আবার তাহাদের সামনের ছেলেটির শাসানী; সে ছেলেটির চোখ দুটি যেন জলন্ত আজরা, আর তাহার হাতে একখানা কি প্রকাণ্ড ছোরা! সে রকম চেহারার ছেলে সে কখনও দেখে নাই। গাড়ী ছুটিয়াছে, হঠাৎ সে দেখিতে পাইল, চলন্ত গাড়ীখানার পিছু পিছু বিশুদা ছুটিয়া আসিতেছে। অমনই বুকখানা তাহার আশা উল্লাসে দুলিয়া উঠিল, কিন্তু যেমন সে অখিলের হাত ছাড়াইয়া উঠিতে যাইবে, অমনই সামনের ছেলেটি ছোরাখানা তাহার বুকে দিল বসাইয়া! ইহার পরও ঘুমের ঘোর কি আর থাকিতে পারে?

ধড়মড় করিয়া যখন সে উঠিয়া বসিল, তখন ঘামে তাহার সর্ব্বাজ ভিজিয়া গিয়াছে; ঠক ঠক করিয়া তখনও তাহার কি কাঁপুনি! দুই হাতে চোখ দুইটি রগড়াইয়া সে চারিদিকে চাহিতেই বুঝিল, স্বপ্ন দেখিয়াছে; কিন্তু একি বিশ্রী স্বপ্ন! উঃ—কি ভয়ানক!

তখন ভোর হইয়াছে, কিন্তু বড়বাড়ীর অনেকেরই ঘুম তখনও ভাজে নাই। শোভা কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে পূজার দালানটার উদ্দেশে চলিল।

বড়বাড়ীর অতিকায় দেউড়ী ও তৎসংলগ্ন দালান-যুক্ত বাহিরের ঘরগুলির পরেই বিশাল পূজার দালানটি এখানকার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিবার জন্য এখনও জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সারিবন্দী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খিলানগুলির অপূর্ব্ব কারুকার্য্যের অধিকাংশই যদিও কালের প্রচণ্ড আঘাতে ও অযোগ্য বংশধরদের অবহেলায় বিলয় পাইয়াছে, তথাপি এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই ইহার অতীত প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সুউচ্চ সুবিস্তীর্ণ বিশাল দালান, মধ্যস্থলে দেবী-প্রতিমার অধিষ্ঠান হইলেও দুই পার্শ্বের আয়তন এত বৃহৎ যে, পুজার প্রচুর উপচারাদি রাখিয়াও দুই তিন শত পুরমহিলার অবস্থিতি অনায়াসেই সম্ভবপর। ইহার সম্মুখেই দরদালান; দেওয়ালে কালোপযোগী কারুকার্য্যের নিদর্শন। দরদালানের নিম্নেই সোপানশ্রেণী প্রাঙ্গণে আসিয়া নামিয়াছে। প্রাঙ্গণটিও দালানের উপযুক্ত বিশাল ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন,—দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে এখনও এ বাড়ীর বারোমাসে তেরো পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া, প্রাঙ্গণটি এ পর্য্যন্ত ভাগীদারদের বণ্টনরজ্জুর বন্ধন পরে নাই। এই সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের প্রায় চারিধারেই চক মিলানো ত্রিতল হর্ম্ম্যশ্রেণী, পুজার দালান ও প্রাঙ্গণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই মহল্লাটি যে ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক সৌন্দর্য্যপ্রিয় দর্শককে মুক্তকণ্ঠেই নির্ম্মাতাদের রুচি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রশংসা করিতে হইবে।

এই পূজার দালান ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণটি এ পর্য্যন্ত বড়বাড়ীর অসংখ্য সরিকদের সমক্ষে বুঝি সমানাধিকারবাদের প্রতীকরূপেই খাড়া হইয়া আছে। সুতরাং সরিকানি মনোবিবাদ এখানে কোনও প্রকার বাধার বৃতি রচনা করিতে পারে নাই। পরস্পরের মধ্যে যাহাদের সম্প্রীতি আছে, তাহারাও যেমন অসংকোচে এখানে আসে, বসে, গল্প গুজব করে,—পক্ষান্তরে পরস্পরের মধ্যে মুখদেখাদেখি পর্য্যন্ত যাহাদের নাই, তাহারাও অধিকার সূত্রে এখানে আসিয়া থাকে এবং মুখ ঘুরাইয়া বসিয়া সকল আলোচনায় যোগ দেয় বা কথা প্রসঙ্গে প্রতিযোগিদের উপর ঠেস দিয়া কথার শব্দভেদী বাণ চালাইয়া গায়ের জ্বালা মিটায়।

শোভা আস্তে আস্তে আসিয়া যখন পূজার দালানে উঠিয়া উপরের সিঁড়িটিতে পীঠ দিয়া বসিল, তাহার ত্রিসীমায় তখন কেহ ছিল না। কোনও খারাপ স্বপ্ন দেখিলে, তুলসী-মঞ্চের নিকট দাঁড়াইয়া বাসিমুখেই স্বপ্নের কথা শুনাইতে হয়, এই তথ্যটুকু তাহার জানা ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই সে বাহিরে আসিয়াছিল। কিন্তু স্বপ্নে দেখা মূর্ত্তিগুলি তাহার মনটির ভিতর তখনও এমনই নাড়াচাড়া দিতেছিল যে, আসল উদ্দেশ্যটুকুই সে ভুলিয়া গেল এবং স্বপ্নের বিষয়-বস্তুটিই তাহার একমাত্র আলোচ্য হইয়া উঠিতেছিল,—আচ্ছা, ছোরা হাতে ঐ লোকটা কে? বিশুদার মত ত নয়ই, অখিলদার মতও তাহার চেহারা নয়, ওদের চেয়েও বড় নিশ্চয়ই, কিন্তু বড় হলেও গোঁফ ত নেই, দাড়ীও নেই, মাথায় মাথায় এদেরই মত, কিন্তু চোখ দুটো যেন কি, আর মুখখানাও কি রকম চ্যাপ্‌টা। হাতে আবার ছোরা, সেটা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিলে ঐ দস্যিটা—মাগো। বিশুদা যেন দেখতে পেয়ে ছুটে ছুটে আসছিল, কিন্তু আসবার আগেই ঐ মুখপোড়াটা—

শোভার চিন্তা এইখানে সহসা ভাঙিয়া গেল অখিলের কথায়।

—এই যে, রাজকন্যের ঘুম ভেঙেছে দেখছি, তবু ভালো।

শোভা চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, উঠানের এক পার্শ্বে বাড়ীর ভিতরে যাইবার গলিটির মুখে দাঁড়াইয়া অখিল, মুখখানি তাহার অতিশয় গম্ভীর; অথচ এই গম্ভীর মুখ দিয়াই তাহার উদ্দেশ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের মর্ম্মভেদী স্বর বাহির হইয়াছে। অন্য সময় হইলে শোভার মত অভিমানিনী মেয়ে কখনই ইহা সহ্য করিত না, সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিত অথবা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু আজ তাহার মনের ভিতর যে সমস্যা বিষম ঝঞ্ঝা তুলিতেছিল, তাহাতে অখিলের উক্তি বুঝি সেখানে স্থান পাইল না, তাই সে অখিলের কথাগুলি যেন উড়াইয়া দিয়াই চিন্তা-বিষণ্ণ মুখখানাকে কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল করিয়া কহিল,—আচ্ছা অখিল দা, তুমি বলতে পার, স্বপ্ন কি কখনো সত্যি হয়?

অখিল তাহার কথার উত্তরে হঠাৎ এরূপ একটা কঠিন প্রশ্ন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। শোভার কল্যকার আচরণে সে ক্ষুব্ধ হইয়া ছিল। তাহার আহত মুখখানায় ব্যাণ্ডেজ পড়িল, কিন্তু শোভা তাহার ক্ষতস্থানে আইডিনের প্রলেপ দিবার প্রয়াস উপেক্ষা করিয়া যখন এক রকম ছুটিয়া চলিয়া গেল, তখন হইতেই অখিলের মনে একটা ঈর্ষা জাগিয়াছিল, প্রথম দর্শনে তাহারই রেশটুকু সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিল। কিন্তু শোভা তাহা গায়ে না মাখিয়া এই প্রশ্ন করায় অখিলের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হইবারই কথা। ক্ষণকাল মনে মনে কি ভাবিয়া শোভার প্রশ্নটার সে উত্তরই দিল; কহিল,—কেন, বইয়ে ত লেখা আছে—স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র; পড়নি?

শোভা কহিল,—তাহলে আমি কাল রাত্তিরে যে সব স্বপ্ন দেখিছি, সব মিথ্যে ?

অখিল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শোভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—কি স্বপ্নটা দেখেছ, বলই না শুনি।

কথাগুলি শোভার মনে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, সে সহসা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—ঐ যাঃ, আসলেই ভুল করে মরিছি।

অখিল জিজ্ঞাসা করিল,—কি হল ?

শোভা কহিল,—খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাসিমুখে তুলসী গাছকে শোনাতে হয়। বিছানা ছেড়েই তাই না সোজা এসেছিলুম পুজোর দালানে, তার পর আর হুঁস্ নেই।

অখিল মুখে উপহাসের ভঙ্গী আনিয়া কহিল,—গাছ বুঝি মানুষের কথা শোনে ?

শোভা ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পশ্চাতে তৃতীয় কণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসি তাহাতে বাধা দিল। মুখ ফিরাইয়া সবিস্ময়ে সে দেখিল, কুসুম তাহার ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া ঐ রকম করিয়া হাসিতেছে। তাহার কথাটাকে উপলক্ষ করিয়াই যে এই হাসি, তাহা বুঝতে শোভার বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত্তে তাহার মুখখানা রীতিমত ভার হইয়া উঠিল।

কুসুম বুঝিল, তাহার হাসিটা এবং এখানে আসাটা শোভার ভাল লাগে নাই। কিন্তু শোভাকে আঘাত দিবার এ সুযোগটুকু সে ছাড়িতে পারিল না, অখিলের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সে কহিল,—নতুন এখানে এসেছ তুমি, নতুন কথাই শোন না—গাছ কথা শোনে, এর পরে হয় ত শুনবে, মানুষের মতই ওরা চলে হেঁটে বেড়ায়।

অখিল হাসিল, কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু শোভার মুখখানা হঠাৎ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া কুসুমের দিকে চাহিয়া কহিল,—তুই খামকা গায়ে পড়ে কথা কচ্ছিস কেন্ লা ?

আবার পূর্ব্ববৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া কুসুম কহিল, শুনলে ত অখিল-দা মেয়ের কথা, পাড়াগেঁয়ে স্বভাব যাবে কোথায়, এখনো 'লা' ছাড়া কথা নেই; দূর দূর।

শোভার রাগ তখন সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কণ্ঠের স্বর আরও কঠোর করিয়া সে কহিল,—আমার খুসী, তোর সঙ্গে আমি সেধে কথা কইতে যাই নি,—তুই আমার কথার ঠোকর দেবার কে, —তারি আমার সহুরে মেয়ে এসেছেন ?

কুসুম এবার মারমুখী হইয়া একেবারে শোভার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া হুমকী দিল,—বিশুদা কাল তোর কপালখানা ছেঁচে দিয়েছে, আমি আজ জীবখানা তোর ভোঁতা করে দেব।—

কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবেগে আগাইয়া গিয়া শোভার গলাটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

বিপুল ক্রোধে বুঝি শোভার শক্তি আজ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, সে একটা ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সোপান শ্রেণীর দিকে ছুটিল। ইচ্ছা, উঠানে নামিয়া অখিলের কাছে যাইবে। কিন্তু সে অবসর কুসুম তাহাকে দিল না। সিঁড়ীর তৃতীয় ধাপটিতে পা দিতেই কুসুম ক্ষিপ্রহস্তে শোভার পীঠের এলায়িত চুলগুলি ধরিয়া সজোরে দালানের দিকে টানিল। সেই অবস্থায় শোভার কণ্ঠ দিয়া আর্ত্তস্বর উচ্ছ্বসিয়া উঠিল,—মাগো!

অখিল স্তব্ধ, মুখে তাহার কথা নাই। পূর্ব্বদিনের দুর্ঘটনায় স্ফীত ঠোঁট দুইটি যদিও আজ স্বাভাবিক অবস্থা পাইয়াছে, কিন্তু ব্যথা একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। আজ আবার আর এক কাণ্ড উপস্থিত! পূর্ব্বদিনের অবস্থার স্মৃতি বুঝি তাহাকে স্তব্ধ করিয়া দিল,—সুতরাং ইহাতে যোগদান করিতে কোনওরূপ উৎসাহ তাহার দেখা গেল না।

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই চতুর্থ প্রাণীর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব উপস্থিত তিনটি প্রাণীকেই যেমন যুগপৎ স্তম্ভিত করিয়া দিল, ঘটনার স্রোতও তেমনি তাহাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

যাহাকে আজ পূজার দালানের ত্রিসীমাতেও দেখা যায় নাই বা যাহার আবির্ভাব কেহ কল্পনাও করে নাই, সেই অবাঞ্ছিত বালকটি যেন বাঘের মত দুই বালিকার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কুসুমের আকর্ষণে শোভার অবস্থা এমন সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, আততায়ীর হস্তচ্যুত হইলেও সাত আটটা সিঁড়ি টপকাইয়া তাহাকে উঠানের উপর ঠিকরাইয়া পড়িতে হয়। বিশু এ অবস্থাটুকু লক্ষ্য করিয়াই যেন দুইজনের মাঝখানে পড়িয়া দুইহাতে দুইজনকেই ধরিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত তফাৎ করিয়া দিল। তাহার এই সতর্কতার জন্য শোভাও ঠিকরাইয়া নীচে পড়িল

না, কুসুমও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে ইচ্ছানুরূপ কাবু করিবার আর ফুরসৎ পাইল না।

শোভার হাতখানি ধরিয়া বিশু তাহাকে আস্তে আস্তে সোপানপথে উঠানের দিকে ঠেলিয়া দিল এবং যাহাতে কুসুম পুনরায় তাহাকে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য যেন দৃঢ় হইয়া মধ্যপথে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই কিন্তু তিনটি বালক-বালিকার বদ্ধদৃষ্টি বিশুর দিক হইতে ফিরিল না।

কুসুমই প্রথমে কথা কহিল। মুখখানা বিকৃত করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—তুমি কি ভেবেছ শুনি?

বিশু উত্তর দিল,—কি আবার ভাবব?

কুসুম কহিল,—কাল মা দাদা করে জেলের দিকে পা বাড়িয়েছ, আজ কোন্ মুখে ফের মারামারি করতে এলে তুমি?

বিশু কহিল,—আমি কি মারামারি করতে এসেছি?

কুসুম ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—কি করতে এখানে এসেছ শুনি? কে তোমাকে ডেকেছিল আসতে?

বিশু কহিল,—একটা পুঁয়ে পাওয়া মেয়েকে তুমি পিটুছিলে, সেটাকে বাঁচাবার জন্তেই আমাকে আসতে হয়েছে।

কথাটা শুনিবামাত্রই কুসুম খিল্ খিল্ করিয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে অখিলকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—বুঝতে পারলে বিশুদার কথা, তোমার সঙ্গে শুভির ভাব হয়েছে কিনা, তাই বললে—ওটাকে পুঁয়ে পেয়েছে। কথার শেষে আবার তাহার সেই হাসি।

শোভা এতক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, বিশু তাহাকে উঠানের দিকে ঠেলিয়া দিলেও সে সেদিকে পা দুখানি চালনা করে নাই, মুখখানি ফিরাইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া তাহার বিশুদার দিকে চাহিয়াছিল, তাহার দৃষ্টিতে শুধু প্রশংসার প্রকাশ ছিল না, গত রাত্রের স্বপ্নও তাহাতে সংশয় বাধাইয়াছিল, সে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছিল না—স্বপ্নে বিশুদার ঠিক এই চেহারাই দেখিয়াছিল কি না?

এমন সময় তাহার সম্বন্ধে বিশুদার মুখের নির্ঘাত নির্দেশ তাহার বুকে যেন হাতুড়ীর ঘা দিল। সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের তীক্ষ্ণ হাসি ও অখিলকে লক্ষ্য করিয়া কয়টি কঠোর উক্তি ঠিক যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটায় মত জ্বালা ধরাইয়া দিল। রাগে, অপমানে ও অভিমানে তাহার মুখখানা এক নিমেষে লাল হইয়া উঠিল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কুসুম ও বিশুর দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা ফিরাইয়া লইতেই অখিলের সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল, ঠিক এই সময় অখিল তাহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল।

মনে মনে তখনই কি একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া লইয়া শোভা এক রকম ছুটিয়া অখিলের কাছে গেল এবং তাহার একখানা হাত জোর করিয়া ধরিয়া কহিল,—চল অখিল দা, আমরা যাই; গুয়ে-পেত্নীর খপ্পরে পড়ার চেয়ে পুঁয়ে পাওয়া ঢের ভাল।

অখিলও সরিয়া পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মুহূর্তেই উভয়ে অন্দর মহলের পথে অদৃশ্য হইল।

কুসুম ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসির ঝিলিক তুলিয়া বিশুর দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ পূর্বে বিশুর কথা কয়টি শোভার ক্ষুদ্র বুকটির উপর যেমন হাতুড়ীর ঘা দিয়াছিল, এখন শোভার অভিব্যক্তি ও কুসুমের হাসি তাহার সর্বাঙ্গে জল-বিছুটির জ্বালা ধরাইয়া দিল কি?

২১

গল্পে আছে, একদা এক পর্বতের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। পর্বত ত গর্জন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করিয়া দিল; দেব দানব যক্ষ নর যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া আসিল; সকলেই ভাবিয়া আকুল, না জানি পর্বত কি বিরাট আকারের সন্তান প্রসব করে? কিন্তু অবশেষে আকাশভেদী গর্জনের পর পর্বত প্রসব করিল একটি ক্ষুদ্র মূষিক!

বিশুকে লইয়া বড়বাড়ীতে যে হাঙ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল, চন্দ্রনাথ বাবু সেটিকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া এত বড় ও ভয়াবহ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সমস্ত অঞ্চলটা ব্যাপিয়া একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, সবাই বিপুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, কি হয় কি হয় রণে জয় পরাজয়!

কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর বিবিধ জোড়জোড়, প্রচুর প্রয়াস, যথেষ্ট অর্থব্যয় ও বিপুল তদ্বির সত্ত্বেও ক্ষুটি তিনেক শুনানীর পর এত বড় সঙ্গীন মামলাটির

যে ভাবে নিষ্পত্তি হইল, তাহাতে পর্ব্বতের প্রসব-বেদনা ও তৎপরে একটি ক্ষুদ্রকায় মূষিক প্রসবের সহিত অনায়াসেই ইহার উপমা দেওয়া চলে।

আনন্দপুর গ্রামখানি আলিপুর মহকুমার এলাকাধীন, সুতরাং আলিপুরের পুলিস কোর্টেই মামলাটি দায়ের হইয়াছিল। বিচারক ছিলেন জনৈক প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

উভয় পক্ষই আদালতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহির-আনন্দপুরের প্রাপ্তবয়স্ক প্রায় সকল মুসলমান পূর্ব্ব হইতেই আদালতের সুবিস্তীর্ণ হাতায় সমবেত হইয়াছে। আসামী বিশু ও তাহার পক্ষভুক্তগণকে দেখিবামাত্রই তাহারা এমন আন্তরিকতার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিল যে, কে বলিবে এই ছেলেটি ইহাদেরই অতি আপনার জন নহে, ইহার সহিত এতগুলি প্রাণীর প্রাণের যোগসূত্র দৃঢ়ভাবেই রচিত হয় নাই। পুলিস যখন বিশুকে আসামীর কাঠগড়ায় হাজীর করিবার জন্য লইতে আসিল, ডাক পড়িল এবং বিশু ধীরে ধীরে বিচারক হাকিমের এজলাসের দিকে চলিল, তখন তাহারই চারিপার্শ্বে সমবেত প্রায় তিন শত দরদীর খোদার উদ্দেশে কি আকুলি ব্যাকুলি প্রার্থনা। ওয়ারিস ওস্তাগর বরাবর বিশুর কাছেই ছিলেন, তিনি এই সময় তাহার চিবুকটি ধরিয়া স্নেহের সুরে কহিলেন,—তিন ওক্ত নামাজে খোদার কাছে তোমার জন্মে দোওয়া মেগেছি বাবজান, সটান চলে যাও, কুচপরোয়া নেই।

আদালতে আসিবার সময় আনন্দপুরের ষ্টেশনে রহিম আসিয়া বিশুর সহিত দেখা করিয়াছিল, কত ভরসা, কত সাহস, কত আশ্বাসই সে দিয়াছিল। শেষে যে কথাটি বিশুকে সে শুনাইয়া গেল, তাহাতে বিশুকে স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে হইয়াছিল, এরা আমার জন্মে করছে কি?

রহিমের শেষের আশ্বাসটুকু এই যে, পরি চিঠিতে সব কথা লিখিয়া তাহাদের পিতার নিকট কলিকাতায় লোক দিয়া পাঠাইয়াছে। তিনি কখনই চুপ করিয়া থাকিবেন না, নিশ্চয়ই আদালতে বিশুর সহিত দেখা করিবেন।

আদালত বসিতেই প্রথমে বিশুর মামলা উঠিয়াছিল; আদালতের সহিত বিশুর এক দিনের মাত্র পরিচয়, একবার আলিপুরের পশুশালা দেখিয়া সে ফৌজদারী মামলার বিচার দেখিতে এক হাকিমের এজলাসে আসিয়াছিল। সে দিন এক খুনী আসামীর বিচার তখন চলিতেছিল, বিশুর সমক্ষেই সেদিন তাহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হয়। তখন সে স্তব্ধ হইয়াই আপন মনে বলিয়াছিল,—কত পাপ করলে তবে ঐখানে গিয়ে মানুষকে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু সে দিন কি সে ভুলিয়াও ভাবিতে পারিয়াছিল—একদিন ঐ কাঠগড়ায় তাহাকেও দাঁড়াইতে হইবে?

বিচারক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব্ব আসামীর আপাদ মস্তক দেখিয়া [illegible]কুঞ্চিত করিয়া কোর্ট-ইন্সপেক্টরের দিকে চাহিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু ইতিমধ্যেই সরকারী উকীলকে তালিম দিয়া মামলার গতিপথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ ভূমিকার সহিত আসামীর অনুষ্ঠিত অপরাধের এক বিবৃতি দিলেন। যদিও আসামী বালক, কিন্তু এই শ্রেণীর বালকদের ঝাঁঝটুকু ধানি-লঙ্কার মত, বিবিধ দৃষ্টান্তসহ তাহাও তিনি ব্যক্ত করিলেন।

আসামীর তরফে দুইজন বিচক্ষণ মোক্তার দাঁড়াইয়াছিলেন। চার্জ্জ গঠন সম্বন্ধে তাহাদের সহিত বিতর্ক উঠিলেও, চন্দ্রনাথ বাবুর অভিপ্রায়ই সিদ্ধ হইল। আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে দুইটি মারাত্মক চার্জ্জ গঠিত হইয়া গেল। অতঃপর ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দীর জন্য পরবর্ত্তী দিন ধার্য্য হইলে আসামীর জামীন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিল। ফরিয়াদী পক্ষ হইতে জামীনের বিরুদ্ধে তুমুল আপত্তি উঠিলে বিচারকও বিচলিত হইলেন। চন্দ্রনাথ বাবু জামীনের প্রতিকূলে এমন সব সমীচীন নজীর যোগান দিতেছিলেন যে, এরূপ অবস্থায় জামীন দেওয়া সম্বন্ধে দ্বিধা স্বাভাবিক। কিন্তু ঠিক এই সময় এই আদালতে হাইকোর্টের স্বনামখ্যাত কৌঁসলী দাস সাহেবের উপস্থিতি সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। আইন-জগতের দিকপাল স্বরূপ এই অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষটির এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাবে একটা চাঞ্চল্য উঠিবারই কথা। কিন্তু তিনি বরাবর হাকিমের এজলাসের দিকে অগ্রসর হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—যে আসামীর বিচার চলছে, তারই পক্ষ সমর্থন করতে আমি এই আদালতে এসেছি।

ব্যারিষ্টার দাস সাহেবের নাম তখন বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার পরিচিত, তাঁহার সম্বন্ধে কত প্রবচনই সৃষ্ট হইয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছিল। বিশুও এই বিখ্যাত নামটির সহিত অপরিচিত নহে,

কাঠগড়া হইতেই পেস্কার ও উকীলদের মুখে এই নাম শুনিয়াই সে আগন্তুকের দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই যখন সে শুনিল, এই বিখ্যাত লোকটি এই মামলাটির সংস্রবেই এখানে উপস্থিত, তখন সে অতি বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে আসামীর পক্ষসমর্থন সম্পর্কে আসামী-পক্ষের উকিলদের সহিত দাস সাহেবের অল্প আলোচনার অবসরে বিস্মিত বিশু তাঁহাদের নিকট ওয়ারিস ওস্তাগর এবং আর একজন সৌম্যমূর্তি সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে দেখিয়াই বুঝিল, এ যোগাযোগের মূলে কে ? যদিও উক্ত সৌম্যমূর্তি মানুষটির মুখে ওয়ারিস সাহেবের মত সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ছিল না, কিন্তু তাঁহার মাথায় তুরস্কদেশীয় মূল্যবান টুপীটি দেখিয়াই মনে মনে সে সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিল, তিনিই রহমন সাহেব, রহিম ও পরির স্নেহময় পিতা। কন্যার চিঠি পাইয়াই তিনি ব্যারিষ্টার দাস সাহেবকে লইয়া আদালতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। আনন্দের আবেগে বিশুর দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইল, ষ্টেশনে রহিমের আশ্বাসবাণী তাহার দুই কর্ণে যেন শঙ্খধ্বনির মত বাজিয়া উঠিল। একদিনের ঘনিষ্ঠতায় এমন অকৃত্রিম ইহাদের স্নেহ !

আসামীর জামীনের বিরুদ্ধে ফরিয়াদীপক্ষের সকল আপত্তি একটি একটি করিয়া খণ্ডন করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নজীর দেখাইয়া ব্যারিষ্টার দাস কহিলেন,—কলিকাতার একজন সরকারজানিত ব্যবসায়ী এই আসামীর জামীন হতে এসেছেন। তিনি আমার মক্কেল এবং বন্ধু, সুতরাং এই আসামীর সম্বন্ধে যে কোন দায়িত্ব নিতে আমিও প্রস্তুত।

বিচারক তৎক্ষণাৎ আসামীর জামীন মঞ্জুর করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, এই আদালতের বিশ্বাসযোগ্য যে কোন জামীনই যথেষ্ট। সুতরাং যে দুইজন মোক্তার আসামীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বিশুর অনুকূলে জামীন-নামায় দস্তখত করিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়াছিলেন, কিছুতেই এ দিন তিনি বিশুকে জামীনে মুক্ত হইতে দিবেন না, অন্তত একটি রাতও তাহাকে হাজতে বাস করাইয়া ছাড়িবেন। এ সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া নানাবিধ যোগাড়যন্ত্রই তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যারিষ্টার দাস সাহেবের আকস্মিক উপস্থিতি তাঁহার এত বড় সাধে বাদ সাধিল। তাঁহারও মনে তখন এই প্রশ্ন জাগিতেছিল, এই যোগাযোগ ঘটাইল কে ? কিন্তু হঠাৎ ওয়ারিস সাহেবের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার দুই চক্ষু যেন বিস্ফারিত হইয়া গেল।

উভয় পক্ষ বাহিরে আসিলে রহমন সাহেব ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন,—আমাদের আসামী কই ?

বিশু পিছনে পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি এই শ্রদ্ধাভাজন মানুষটির সম্মুখে গিয়া শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন জানাইল।

রহমান সাহেব তাহাকে একেবারে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া কহিলেন,—সাবাস্। তুমি যখন রহিমের বন্ধু, আমার ছেলেরই সামীল মনে করি তোমাকে। পরি আমাকে পাঁচপাতা চিঠিতে তোমার সব কথাই লিখে জানিয়েছে। কিছু তোমার ভয় নেই, তুমি বেকসুর খালাস পাবেই।

বিশু কহিল,—আমার জন্য আপনারা কত কষ্ট পেলেন, কত খরচ পত্তর আপনার হয়ে গেল।

ওয়ারিস সাহেব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—কথা শোন বাচ্চার।

রহমন সাহেব কহিলেন,—তবে আমার কথা শুনলে কি ? বললুম না, রহিমের বন্ধু, তাই তাতে আর তোমাতে ভেদ নেই। তার জন্যে যা করা উচিত, তোমার জন্যও সেই রকম যদি কিছু করি, তাতে কষ্ট হবে কেন ?

বিশু মুখখানি নীচু করিয়া কহিল,—আমি ভুল করেছি, আমাকে মাপ করবেন। আমার বাবা নেই, আজ থেকে মনে করব—তাঁরই মতন মাথার ওপর আপনি আছেন, আর আছেন ঐ স্নেহময় কাকু।

হাসিমুখে রহমান সাহেব কহিলেন,—কাকু ? বাঃ, তাহলে তোমার সঙ্গেও ঠিক সম্পর্ক পাতিয়েছে আমার এই ছেলেটি, কি বল ওস্তাগর ?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—বেসক্! মোর পরি মায়ী সব কথাই ত তোমাকে লিকেছে দোস্ত !

এই সময় দেখা গেল, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার পক্ষদের সহিত সেই স্থান অতিক্রম করিতেছেন। ওয়ারিস সাহেব চুপি চুপি এই সময় রহমন সাহেবকে কি বলিলেন। পরক্ষণেই দেখা গেল, রহমন সাহেব দ্রুতপদে চন্দ্রনাথ বাবুর অভিমুখে ছুটিয়াছেন।

ওয়ারিস সাহেবও ক্ষিপ্রপদে বন্ধুর অনুসরণ করিলেন। বিশু একটু তফাতেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রহমন সাহেব একেবারে চন্দ্রনাথ বাবুর সম্মুখে

গিয়া তাঁহার গতিরোধের উদ্দেশে হাতখানা ললাটের দিকে তুলিয়া কহিলেন,—সেলাম !

চন্দ্রনাথ বাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রহমন সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুখে তাঁহার বাণী না ফুটিলেও চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি বুঝি তাঁহার প্রশ্নটা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া দিল।

এই সময় ওয়ারিস সাহেব উভয়ের সান্নিধ্যে আসিয়া এই নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া দিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশে সসম্ভ্রমে সেলাম জানাইয়া বিনয়ের সুরে কহিলেন,—হুজুর, সেলাম।

ওয়ারিস সাহেবকে দেখিবামাত্রই হুজুর জলিয়া উঠিলেন। এই লোকটিকে লইয়া গত রাত্রির ঘটনা এত শীঘ্র ভুলিবার কথা নয়। বিশেষতঃ বর্ত্তমান মামলায় ব্যাপারে মুসলমানদের এতটা ঘনিষ্ঠতার সহিত এই বর্ষীয়ান অশিক্ষিত ওস্তাগরটির সংস্রব যে বিশেষ ভাবে বিদ্যমান, চন্দ্রনাথ বাবু ইতিপূর্ব্বেই তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং ওয়ারিস সাহেবের প্রতি তাঁহার চিত্ত বিরুদ্ধ হইয়াই ছিল। মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া রূক্ষকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—তোমার কি খবর ?

ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—খবর মোর নয় হুজুর, এনার। নাম হয় ত হুজুরের শোনা থাকতি পারে, ভারী নামী কারবারী, রইস আদমী,—হুজুরেরই তালুকে তিন বনদ বাইশ বিঘের চরটা আরজান মোল্লার কাছ থেকে প্রজাই সত্ত্ব কিনে বাগান ইমারত বানিয়েছেন—

ইতিমধ্যেই চন্দ্রনাথ বাবুর পিছু পিছু বড় বাড়ীর যে কয়টি উমেদার তাঁহার পরিষদস্থানীয় হইয়া ফিরিতেছিল, তাহাদেরই একজন ওয়ারিস সাহেবের কথা সম্পর্কে তাঁহার কাণে কাণে এমন কতিপয় কথা শুনাইয়া দিল যে, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া তিনি হঠাৎ কহিয়া উঠিলেন,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে এসেই আমি সে খবর পেয়েছি ; একটা বাকিদার প্রজার জোত-সত্ত্ব কিনে আমারই তালুকে আবু হোসেনের বাদসাহী চলেছে, আর আমাদেরই গোটা কতক চুনোপুঁটি সরিকের যোগ-সাজসে এ কাজ হয়েছে। কিন্তু এ আমি বলে দিচ্ছি, ওরা যাই করুক, আমি কিন্তু একটুও টলছি না—আমার সেয়ারের খারিজ আমি কিছুতেই দিচ্ছি না—লাখ টাকা দিলেও নয়।

শেষের কথাগুলি চন্দ্রনাথ বাবু রহমন সাহেবের দিকে চাহিয়া তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন।

ওয়ারিস ওস্তাগর অবাক ও অপ্রস্তুত হইয়া রহমন সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। কিন্তু রহমান সাহেব কিছুমাত্র উষ্ণ না হইয়া ঈষৎ হাসিয়া অতিশয় কোমল কণ্ঠেই কহিলেন,—মিছে আপনি জমির কথা তুলছেন ; আমার কেনা জমির খারিজের কথা বলবার জন্ত আমি এখানে আপনাকে সেলাম করে থামাই নি।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—তবে ?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আমার অন্ত কথা আছে।

উদ্ধত ভাবে চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে জমিদার কোন প্রজার কথা শোনে না, তা সে প্রজা যেই হোক।

এ আঘাতও উপেক্ষা করিয়া রহমন সাহেব পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিলেন,—এখানে ত জমিদারের সঙ্গে প্রজার কথা হচ্ছে না ; তাহলে নিশ্চয়ই একটা নজরানার ব্যবস্থা করা হত। এই মাত্র যে মকদ্দমাটার মুলতুবী হল, আমি সেই সম্বন্ধেই আপনার সঙ্গে দুচারটে কথার আলোচনা করতে চাই—আপনিও মানুষ, এই সম্পর্ক নিয়ে ; শুনবেন ?

চন্দ্রনাথ বাবু অবজ্ঞার ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন, —আলোচনাটা কি ?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আলোচনাটা এই যে, মামলাটা যাতে মিটে যায়, তারই একটা ব্যবস্থা করা। আপনারই ঘরের ছেলে, ওকে জেলে দেবার জন্তে আপনার কি এমন করে কোমর বাঁধা ঠিক হচ্ছে ? ঈশ্বর না করুন, যদি কোনো ক্ষতিই ওর হয়, আপনার গায়ে লাগবে না ? যদি ছেলেটা শাস্তি কিছু পায়—তাতে ও দাগী হয়ে থাকবে না, ওর আখের তাতে নষ্ট করা হবে না ? আপনি ওর বাপের মতই ত, এটা মিটিয়ে নিয়ে সবারই মুখ রাখুন।

চন্দ্রনাথ বাবু বক্রদৃষ্টিতে রহমন সাহেবের দিকে চাহিয়া বিদ্রূপের সুরে কহিলেন,—সব ত শুনলুম, কিন্তু স্বার্থটা কি, সেইটুকুই ত শোনা হল না।

রহমন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন,—আমার ? শুনতে চান ?—পরক্ষণেই তিনি পকেট হইতে একখানি খোলা চিঠি বাহির করিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর হাতে এক রকম গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন,—এই

চিঠিখানা পড়ুন আগে, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

বাহিরে অনিচ্ছা ও বিরক্তির ভাব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াই চন্দ্রনাথ বাবু চিঠির উপর দুই চক্ষুর কৌতূহলোদ্দীপক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

মিনিট কয়েক পরেই চিঠিখানি রহমান সাহেবের হাতে ফিরাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে চন্দ্রনাথ বাবু প্রশ্ন করিলেন,—পরিটি কে?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আমারই মেয়ে।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—এই মেয়েটি তার বাবার কাছে যে আবদার করেছে, আমাকেও সেটা মেটাতে হবে নাকি?

রহমন সাহেব কহিলেন,—তাই যদি হয়, সেটা কি ভাল নয়?

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—ভালমন্দ বোঝবার শক্তি আমার নিজেরই যথেষ্ট আছে।

রহমন সাহেব কহিলেন,—সেটা সকলেরই থাকা উচিত।

হঠাৎ কি ভাবিয়া চন্দ্রনাথ বাবু এই সময় কহিলেন,—তাহ'লে কি ব্যারিষ্টার দাস জমির সম্পর্কে যে মার্চেন্টের কথা বলছিলেন—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি আর একবার রহমন সাহেবের মুখখানির উপর সন্দেহের দৃষ্টিতে চাহিলেন।

রহমন সাহেব কহিলেন,—তিনি আমার বাল্যবন্ধু; পাঠশালা থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ পর্য্যন্ত আমরা এক সঙ্গে পড়েছি; তারপর তিনি যান বারে, আমি ঢুকি কারবারে।

চন্দ্রনাথ বাবুর নাসাপথে নিশ্বাস-বায়ু একটু অস্বাভাবিক গতিতে সবেগে নির্গত হইল এবং সেই সঙ্গে কণ্ঠের ভিতর দিয়া হুজুরী হুমকীর মতই একটা স্বর খসিয়া আসিল,—হুঁ।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব। সহসা চন্দ্রনাথ বাবুই সে নীরবতা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুর সতর্ক-তীক্ষ্নদৃষ্টি চারিদিকে ঘুরাইয়া হঠাৎ সার্চ্চলাইটের মত তাহা রহমন সাহেবের মুখের উপর ফেলিয়া তিনি কহিলেন,—কথা আছে।

সংক্ষিপ্ত দুটি কথাতেই রহমন সাহেব বক্তার উদ্দেশ্য বুঝিলেন। উভয়ের চক্ষুর উপরেই অদূরবর্ত্তী অতিকায় গাছটির ছায়াচ্ছন্ন তলদেশ প্রকাশ পাইল, কর্পোরেশনের কতকগুলি যন্ত্রপাতি সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকায় কেহ সেদিকে ঘেঁসে নাই। উভয়েই একযোগে এই নির্জ্জন অংশে উপনীত হইলেন।

চন্দ্রনাথ বাবুই এক্ষেত্রে আহ্বানকারী; সুতরাং রহমন সাহেব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এই দাম্ভিক ভূস্বামীটির দিকে চাহিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু গম্ভীর ভাবেই কহিলেন,—আমার একটা স্বভাব এই, যেটা ধরি তা আর ছাড়তে পারি না; এ জেদটুকু এ পর্য্যন্ত ঠিক বজায় আছে।

রহমান সাহেব কহিলেন,—দুনিয়ার দরবারে যাঁরা মাথা তুলে বড় হবার দাবী রাখেন, এটা তাঁদের স্বভাব।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—এখানে এসেই ঐ ছেলেটার সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধে গেছে। এর গোড়ায় আছে একটা সর্ব্বনাশী চক্রান্ত,—ছেলেটাকে নাচাচ্ছে ওর মা। মাগী বজ্জাতের ধাড়ী—

রহমন সাহেবের অটল ধৈর্য্যে এইখানে চাঞ্চল্য দেখা গেল। একটা শিক্ষিত বর্ষীয়ান ব্যক্তি বাহিরের এক অপরিচিত ও নিতান্ত পরের সম্বন্ধে এভাবে যে নিজের বংশের শুদ্ধান্তের কোন মহিলার সম্বন্ধে রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা তাঁহার জানা ছিল না। কিন্তু তাঁহার কোন প্রতিবাদের পূর্ব্বেই চন্দ্রনাথ বাবু নিজেই এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়' আসল বক্তব্য কথাটাই তাড়াতাড়ি পাড়িয়া ফেলিলেন,—যাক্ সে কথ', এখন আমি যা চাই, আর দু'পক্ষেরই লাভ, সেইটিই বলছি।—আমার এই জেদ, ছেলেটা যাতে একটু শিক্ষা পায়। এটা খুব সহজেই সম্ভব হতে পারে যদি ব্যারিষ্টার দাস এতে হাত না দেয় আর মুসলমানরা সবাই সরে দাঁড়ায়।

রহমন সাহেব মনের বিস্ময় ও বিক্ষোভ অতিকষ্টে দমন করিয়া ঈষৎ বিকৃত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—এমন সম্ভাবনার হদীস আপনি কিছু পেয়েছেন?

চন্দ্রনাথ বাবু বলিলেন,—সেইটি হচ্ছে আসল কথা। ঐ যে বাইশ বিঘে জমির কথা একটু আগে হল না? ওর সিকি অংশের মালিকান সত্ত্ব আমার। এ পর্য্যন্ত আমার সেরেস্তায় ও জমির ব্যাপারে নামখারিজ হয় নি। সেটা কালই নিখরচায় হতে পারে, যদি—কথাটা আরো খুলে বলতে হবে কি?

রহমন সাহেব এবার স্বাভাবিক সহজকণ্ঠেই

কহিলেন,—বলা ত আপনার সবই হয়ে গেছে! কারবার করে যখন খাই, এমন বোকা নই যে, আসল কথাটা আপনার ধরতে পারিনি। কিন্তু বড় দুঃখেই বলতে হচ্ছে, বিঘে কতক জমির নাম-খারিজের লোভটুকু আমাকে দেখিয়ে আপনি নিজেকেই ভারি ছোট করে ফেলেছেন।

ঝুনো উকীল ও ঝানু হিসিবী লোক হইয়াও চন্দ্রনাথ বাবু আজ অজ্ঞ বালকের মত হিসাব ভুল করিয়া বসিলেন। তিনি রহমন সাহেবের কথায় মনে মনে শাব্যস্ত করিলেন, গরজ বুঝিয়া লোকটা আরও কিছু উঁচু রকমের দাঁও কসিতেছে। মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—আঁচটা কি রকম শুনি?

রহমন সাহেব কহিলেন,—আপনার তালুকটা লিখে দিতে পারবেন?

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু রহমন সাহেবের মুখের দিকে চাহিলেন। একি রহস্য? কিন্তু পরক্ষণেই মন বিরোধী হইয়া জানাইয়া দিল— এ লোকটা ত তাঁহার বয়স্য নহে। তবে?

রহমন সাহেব নিজেই সমস্যাটার সমাধান করিয়া দিলেন। আস্তে আস্তে কহিলেন,— দেখুন, আপনি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন বলেই আমি ও ভাবে তালুকের কথাটি তুলিছি। আসলে ওটা ভুয়ো। এখন শক্ত হয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে, সত্যিই যদি তালুকটা আপনি লিখে দেবার লোভ দেখান, তবুও মনে মনে যে সম্ভাবনা আপনি ঠিক দিয়ে রেখেছেন, তা হবে না। আপনার যেমন জেদ বিশুবাবুকে জব্দ করবেন, আমাদেরও তেমনই রোখ,—যেমন করেই হোক তাকে বেকসুর খালাস করতে হবে। এর ভেতরে আর কোন কথা নেই।

চন্দ্রনাথ বাবুও আর কোন কথা কহিলেন না। অদূরবর্ত্তী প্রাঙ্গণের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত মুসলমান দর্জ্জীদিগকে এই সময় এই দিকেই আসিতে দেখা গেল। চন্দ্রনাথ বাবু বক্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া এবং রহমন সাহেবের মুখের উপর একটা অর্থপূর্ণ সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি নিজের দলে গিয়া মিশিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর এ দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে রহমন সাহেবের কষ্ট হয় নাই। কিন্তু মনে মনে হাসিয়া তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে কহিলেন,—তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে।

ওয়ারিস সাহেব নিকটে আসিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—ব্যাওরা কি?

রহমন সাহেব কহিলেন,—জমির কথা তুলে তুমিই ত জমিদারের জেদ বাড়িয়ে দিলে, এখন ম্যাও ধর?

ওয়ারিস সাহেব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,— ওনার কি রায়?

রহমন সাহেব কহিলেন,—তোমাদের সবাইকে ইনাম দিতে চান, কিন্তু বিশু বাবুর দলে কেউ তোমরা থাকতে পাবে না—এই কড়ারে। রাজী আছ?

সুদীর্ঘ দাড়ী সবেগে দুই দিকে দুলাইয়া এবং দুই চক্ষুর দৃষ্টি উজ্জ্বল করিয়া ওয়ারিস সাহেব কহিলেন,—না—না। কিছুতেই না।

রহমন সাহেব কহিলেন,—তাহলে খানার ফরমায়েস কর, লড়তে যখন হবে, পুরিমিঠাই পেটে পুরে দেহগুলোকে ত জুত করা চাই। পরি চিঠিতে লিখেছে, দোকান থেকে সেদিন খাবার আনিয়েও বিশুকে খাওয়ানো হয় নি, যেটা বাকি আছে, এখানেই সেটা ভাল করে শেষ করতে হবে। তাছাড়া গাঁ থেকে যারা এসেছে, কেউ যেন বাদ না পড়ে।—

এ দলের কেহই সেদিন বাদ পড়ে নাই। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আলিপুর কোর্টের খাবারের দোকানগুলির যাবতীয় সঞ্চয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর এই মামলার যে কয়টি শুনানী হইয়াছিল, প্রত্যেকটিতেই চন্দ্রনাথ বাবু নিজের জেদটুকু রক্ষা করিতে বৈধ অবৈধ সকল রকম তদ্বিরের পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই শেষ রক্ষা হইল না। ব্যারিষ্টার দাস সাহেবের মারাত্মক জেরায় তাঁহার সংগৃহীত সাক্ষীরা প্রত্যেকেই ঘাবড়াইয়া গিয়া অনুচিত এমন অনেক কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল, এবং আহত গুর্খা দারোয়ানটি পর্য্যন্ত যে সকল কথা কহিল, আসামীর বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ ও ফরিয়াদীপক্ষের সযত্নরচিত বিবৃতির সহিত তাহার ঐক্য বা সামঞ্জস্য দেখা গেল না। জেরায় গুর্খা মহাবীর স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, সেই-ই প্রথমে আসামীর গণ্ডে সজোরে চপেটাঘাত করিয়াছিল এবং যদি আসামী তাহার কুকুরীটি খাপ হইতে টানিয়া না লইয়া তাহার গালেই পাল্টা থাপ্পর দিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই

রুখিয়া ও অতিশয় রুষ্ট হইয়া নিজেই আসামীর উদ্দেশে কুকরী চালাইত। স্বাভাবিক চিত্তে উত্তেজনা আনিবার ইহা যথেষ্ট কারণ।

ফরিয়াদী পক্ষের উকীল অবশ্য সাক্ষীদের উক্তির উপর নানারূপ আবরণ দিয়া আসামীর শাস্তির অনুকূলে অনেক কথাই সওয়াল জবাবে বলিলেন। কিন্তু আসামী পক্ষ হইতে ব্যারিষ্টার দাস স্বল্প কথায় যে নির্দ্দেশ দিলেন, তাহাই হইল এই পরিস্থিতির আকাশভেদী গর্জ্জনের পর পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মত হাস্যকর!

বিচারক রায়ে শুধু যে, এই অপূর্ব্ব আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন, তাহা নহে ; ইহার সাহস, দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া তাহার মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিলেন। আসামী অনায়াসেই আঘাত করিবার কথা অস্বীকার করিতে পারিত, অকুস্থলে উপস্থিত পুলিস-কর্ম্মচারীও ত তাহাকে স্বচক্ষে আঘাত করিতে দেখেন নাই। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ দাস তাঁহার সওয়াল জবাবে বলিয়াছেন যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরীক্ষার ছলে আসামীকে আঘাতের কথাটা অস্বীকার করিতে একাধিকবার বলিয়াছিলেন, কিন্তু সে দৃঢ়তার সহিত প্রতিবারই বলিয়াছে, যে কার্য্য আমি করিয়াছি নিশ্চয়ই স্বীকার করিব, আমাকে মিথ্যা বলিতে অনুরোধ করিবেন না। আমি কখনও মিথ্যা বলি নাই। অপরাধ সম্বন্ধে আদালতের প্রশ্নেও আসামী বলিয়াছে, আমি কোন অপরাধ করি নাই। একজন নিঃসম্পর্কীয় লোক আমার ইজ্জত আঘাত করে, মানুষ মাত্রেরই উচিত নিজের ইজ্জত রক্ষা করা। গুর্খাটার আচরণ আমাকে কুকরী চালাইতে বাধ্য করিয়াছে। বিষয়টি অতি তুচ্ছ, কিন্তু বাবু চন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ইহাকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মত প্রবীণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি অনায়াসেই ঘটনাটির স্রোত অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই এবং তাঁহারই অসঙ্গত ও অসহিষ্ণু আচরণকেই যদি এই দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা কিছুতেই অন্যায় হইতে পারে না! ফরিয়াদি পক্ষ অভিযোগের বর্ণনায় উল্লেখ না করিলেও, আসামীর বিবৃতি ও আসামী পক্ষের বিচক্ষণ কৌঁসলীর জেরায় ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের উক্তি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, চন্দ্র বাবুর পুত্র অখিলনাথের সহিত আসামীর কলহ বাধে, তাহারও মূলে একটি বালিকা, নাম তাহার শোভা। উক্ত অখিলনাথই আসামীর প্রতিযোগী ও এই মামলার প্রকৃত ফরিয়াদী। কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু পুত্রকে সন্তর্পণে সরাইয়া দিয়া নিজেই তাহার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ফৌজদারী আইনের দূষিত বাতাসে পাছে তাঁহার বালক পুত্রের দেহ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, এই জন্যই এরূপ সতর্কতায় তিনি তৎপর হইয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহারই বংশের এই ছেলেটিকে জেলে পাঠাইয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনটা ব্যর্থ ও বিষময় করিয়া দিতে ইনি কোনও রূপ চেষ্টারই ত্রুটি করেন নাই। এইরূপ নীচ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষগুলিই ভারতীয় সমাজ, সভ্যতা ও মানবতার ভয়ঙ্কর শত্রু। এই সকল কারণ পরম্পরায় এবং গুর্খা মহাবীরকে কুকরী দ্বারা আঘাত করা সম্পর্কে এই অল্পবয়স্ক আসামীর উচ্চ মনোবৃত্তির দিক দিয়া উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল বিবেচনা করিয়া, তাহাকে বেকসুর খালাস দেওয়া গেল।

২১

আলিপুর হইতে আনন্দপুরে রেলে যাতায়াত চলে,—দুই ঘণ্টার পথ। মামলা নিষ্পত্তির পর অপরাহ্ণের ট্রেণে সেকেণ্ড ক্লাসের ছোট কামরাটি অধিকার করিয়া সপার্ষদ চন্দ্রনাথ বাবু অধিষ্ঠিত,— মুখখানি তাঁহার শুষ্ক ও বিবর্ণ। পারিষদবর্গও নিজ নিজ মুখের উপর বুঝি জোর করিয়াই বিষাদের আবরণ টানিতেছিল।

কুসুম নামে ফাজিল মেয়েটির মাতামহ বৃদ্ধ রমানাথ মুখুজ্যেও এই মামলায় চন্দ্রনাথ বাবুর দলে যোগ দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি বংশের জ্যেষ্ঠ বলিয়া চন্দ্রনাথ বাবুর নির্দ্দেশ মত তাঁহার স্ত্রী মহামায়া দেবী একখানি মোহর এবং ব্রহ্মদেশীয় এক প্রস্থ রেশমী বস্ত্র দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। সেই সূত্রে চন্দ্রনাথ বাবু ও তাঁহার সুবিবেচক পরিবারবর্গের নামে অতঃপর বৃদ্ধের মুখ দিয়া লালা ঝরিতে থাকে, সুখ্যাতি আর ধরে না। চন্দ্রনাথ বাবুর অনুরোধে সাক্ষীদিগকে তালিম দিবার জন্য এই বয়সে আদালতে উপস্থিত হইতেও দ্বিধা করেন নাই। প্রত্যেক শুনানীর দিনই ফিরিবার সময় ট্রেণের কামরায় বসিয়া দৃঢ়স্বরে ইনি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন,—কি তুমি দাস সাহেবের

কথা বলছ চন্দর, স্বয়ং জ্যাকসন কিম্বা ডক্রিট সি ষাঁড়ুব্যে নেমে এসে দাঁড়ালেও ওর নিষ্কৃতি নেই,—নির্ঘাত জেল, এ তুমি দেখে নিয়ো।

এদিনও টেপের কামরায় ইনি উপস্থিত ছিলেন এবং সর্ব্বপ্রথম ইনিই উৎসাহের সুরে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন,—তুমি অমন করে মনমরা হয়ে থেক না চন্দর, এবারও তোমার জিত হয়েছে; হ্যাঁ, একেই বলে জেদ। তবে কি জান, খেলা, মামলা, পাওনা-বাজনা, এ সব হাওয়ার তালে চলে; উলটো হাওয়া বই বইলো, অমনি ফাঁস! কিন্তু কুচ পরোয়া নেই, আপীলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আদিনাথ, নষ্টনাথ, ভূতনাথ প্রভৃতি বড়বাড়ীর অন্যান্য কতিপয় নিষ্কর্ম্মা সরিক যাঁহারা গোড়া হইতেই চন্দ্রনাথ বাবুর দলভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বয়োবৃদ্ধ রমানাথের কথায় সায় দিয়া প্রায় সমস্বরেই কহিলেন, দাদা ঠিক বলেছেন, আপীলেই মামলা ঘুরে যাবে।

কিন্তু ইহাতেও চন্দ্রনাথ বাবুর মুখে আশার আলো ফুটিল না, তিনি বিমর্ষভাবেই মৃদুস্বরে কহিলেন,—গোড়াতেই আমার গলদ হয়েছিল, আপীলেও সুবিধা হবে না। তা ছাড়া, এ ছুঁচোর বিষ্ঠা আর পর্ব্বতে তোলবার ইচ্ছা আমার নেই। অন্য রাস্তা ধরে আমি এর শোধ নিতে চাই।

প্রত্যেকেই চক্ষুর উপর প্রশ্ন ভরিয়া সাগ্রহে চন্দ্রনাথ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু এবার মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—কিন্তু এ রাস্তাতেও আপনারা এমন করে হাত পা বেঁধে পড়ে আছেন যে, একলাই আমাকে তাড়্‌ড়াতড়ে এগুতে হবে।

বক্তার উক্ত শ্রোতাদের চক্ষুর দৃষ্টি অধিকতর বিস্ফারিত করিয়া দিল। কথাটার অর্থ কাহারও উপলব্ধি হইল না।

রমানাথ বাবু অসঙ্কোচে প্রশ্ন করিলেন,—খুলেই বল না কথাটা, যাতে সকলে বুঝতে পারি।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—এতে না বোঝবার কি আছে? গোটা কতক টাকা হাতে পেয়ে আপনারা সবাই এক ধার থেকে রহমন মিঞাকে প্রজা স্বীকার করে নিয়েছেন, সাবেক প্রজার নাম বাতিল করে এই লোকটার নাম নিজেদের সেরেস্তায় পত্তন করে নিয়েছেন! নেন নি?

এ প্রশ্নে প্রত্যেক সরিকের মুখ শুখাইয়া গেল। রমানাথই শুধু সাহস করিয়া কহিলেন,—হ্যাঁ, তা নিয়েছি বটে, আর না নিয়ে উপায়ও ছিল না।

কেন?

সে অনেক কথা। সাবেক প্রজা আরজান মোল্লা ফেল হবার যো হয়, খাজনা এক পয়সাও দিত না, দেবার শক্তিও তার ছিল না; নালীশ করেও আদায় উসুলের উপায় কিছু পাওয়া যায় নি। কাজেই যখন জানা গেল, একজন পয়সাওয়ালা বিদেশী লোক বাস করবার জন্য ঐ জমির জোতসত্ব কিনেছে, পাই পয়সা বকেয়া খাজনা আর নাম খারীজের জন্যে মোটা টাকা দিতে রাজী, তখন তাতে সায় না দিয়ে পারিনি!

আমিও ত সেই কথাই বলেছি—গোটাকতক টাকার লোভে হাত পা বেঁধে সব বসে আছেন। আপনারা যদি আরজান মোল্লার জোত সত্ব স্বীকার না করে মামলা করতেন, ঐ লোকটা তা হলে পাত্তা পেত?

সেধোকে যেই জিজ্ঞাসা করা—ভাত খাবি? অমনি সে ধড়মড়িয়ে উঠে জানতে চাইলে—বসব কোথায়? এটাও হয়েছিল ঠিক তাই। তুমি ত এখানে থাকতে না, সরিকদের চাল চাল কি বুঝবে বল? যেই ওয়ারিস ওস্তাগর কথাটা পাড়লে, অমনি সরিকদের চুলবুলনি দেখে কে! যেখানে ওদেরই সাধাসাধি করবার কথা, সেখানে এরাই বাড়ীপড়া হয়ে তাড়াতাড়ি যাতে ন্যাটা চুকে যায় তার জন্যে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলেন,—কেউ কেউ ঐ পাওনা দেখিয়ে পাওনাদারদের পর্য্যন্ত পীঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন।

বলেন কি?

বলছি বই কি, হক কথা বলব, তাতে আবার ভয় ডর কি! এই ত সামনেই বসে রয়েছে ভূতো, ওকেই জিজ্ঞাসা কর না—পা টিপে টিপে কবার ওয়ারিস ওস্তাগরের দলিজে ধন্না দিতে গিয়াছিল?

এ কথায় ভূতনাথের মুখখানা ভূতের মতই বুঝি ভয়াবহ হইয়া উঠিল, দুই চক্ষু পাকাইয়া বৃদ্ধ রমানাথের দিকে এক ঝলক অগ্নি বৃষ্টি করিয়াই যেন কহিল,—কি বল্লে খুড়ো, আমি গিয়েছিলুম ধন্না দিতে মোচনমানের দলিজে? তুমি দেখেছ?

রমানাথ দমিলেন না, বরং আরও তীব্র হইয়া দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—যাসনি তুই? আবার তকরার? শুধু যাওয়া, পাঁচটা আগাম টাকা

আর পাঁচ গণ্ডা হাঁসের আণ্ডা বাগিয়ে মুখুজ্যে বাড়ীর সবাইকে লুকিয়ে চুপি চুপি বাড়ী ঢুকেছিল কে?

মুখখানার ভঙ্গী অদ্ভুত রকম করিয়া ভূতনাথ কহিল,—মুখ সামলে কথা বল বলছি, নইলে আমি কিন্তু এই নিয়ে থানা পুলিস করব বলে রাখছি।

রমানাথ এবার রীতিমত দাবড়ী দিয়া কহিলেন, তবেরে হারামজাদা, পথ ময়লা করে আবার চোখ রাঙিয়ে কথা—গাড়ী থামুক ত সন্তোষপুর ষ্টেসনে, ওয়ারিস ওস্তাগর ত এই গাড়ীতেই আছে, তাকে ডেকে এনে যদি না ভজিয়ে দিতে পারি—

চন্দ্রনাথ এই সময় বাধা দিয়া কহিলেন—থাক্ থাক্, এ নিয়ে আর ভজাভজি করে দরকার নেই, তাতে নিজেদের মুখেই চুণকালি পড়বে। কিন্তু আপনাকেও বলছি দাদা, ওরা যাই করুক না কেন, আপনি কেন ওতে সায় দিতে গেলেন?

রমানাথ বাবু কহিলেন,—বাঃ! ওরা সবাই মিলে শাঁসটুকু শুষে নিক, আর আমি তফাতে থেকে তাই দেখি আর ছোবড়াগুলো জড়ো করে তোমার মতন বোকা সাজি?

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু প্রশ্ন করিলেন,—এ কথার মানে? আমাকে এর ভেতরে আনবার কারণ? আমার সেরেস্তায় রহমন মিঞার নাম পত্তন হয়েছে বলতে পারেন?

রমানাথ বাবু মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—নাম পত্তন ঠিক না হলেও, আরজান মোল্লার বাকিবকেয়া খাজনা ঐ রহমন মিঞার মারফত বলে নেওয়া ত হয়েছে, দাখিলাও ঐ বলে দেওয়া ত হয়েছে, থোকায়ও অবশ্য ও নাম বকলমায় উঠেছে, তবে আর বাকি রইল কি?

চন্দ্রনাথ বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন এবং পরক্ষণেই পার্শ্ববর্ত্তী বেঞ্চিখানির এক প্রান্তে উপবিষ্ট ও এই সকল আলোচনায় নির্লিপ্ত ধরণীধর বাবুকে আহ্বান করিয়া প্রশ্ন করিলেন,—হ্যাঁ, চক্রবর্ত্তী মশাই বাইশ বিঘে বন্দর জমা কি নামে দাখিলা কেটে আসছেন?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় শুষ্ক কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—সাবেক প্রজা আরজান মোল্লার নামেই দাখিলা বরাবর দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রনাথ বাবু রমানাথের দিকে চাহিতেই তিনি রুক্ষকণ্ঠে ধরণীধরকে জেরা করিলেন,—সে ত দেওয়া হয়েছে জানি, কিন্তু তলায় মাঃ রহমন মিঞা বলে জিগির দেওয়া হয়ে আসছে কিনা—সেইটিই বল না?

ধরণীধর আমতা আমতা করিয়া উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, তা হয়েছে বটে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে তর্জ্জনের সুরে চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—কেন হয়েছে শুনি? কে আপনাকে ওর মারফত বলে জিগির দেবার হুকুম দিয়াছিল?

ধীরকণ্ঠে ধরণীধর কহিলেন,—এই দস্তুর।

মুখ ও মুখের স্বর বিকৃত করিয়া চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—দস্তুর! আপনি আমাকে কানুন শেখাচ্ছেন? জানেন, কি সর্ব্বনাশ আপনি করেছেন, মামলায় পথে কত বড় একটা বাধা পড়েছে—দাখিলায় ওর মারফতে টাকা পেয়েছেন এই কটা কথা লেখায়?

ধরণীধর কহিলেন,—টাকা নিতে হলে ওটা লিখতে হয়, নইলে টাকা ওরা দিত না। আপনাকেও এটা জানান হয়েছিল, কিন্তু নাম-খারিজ দিতেই আপনার বারণ ছিল, টাকা নিতে নয়।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—আমি কি তখন জেনেছিলুম, যে আপনি ওর মারফতেই টাকা নেবেন, আর নিলেও নামটা পর্য্যন্ত দাখিলায় বসিয়ে দেবেন? কত বড় অন্যায় করেছেন বলুন ত?

ধরণীধর উত্তর দিলেন,—আমি এটাকে অন্যায় মনে করি নি। আর, একথাও বলছি, যদি এই মামলা না বাধত, আপনি এই নিয়ে এতটা চঞ্চল হতেন না, সদ্ভাবেই সব মিটমাট হয়ে যেত।

এই সময় ট্রেণের গতি মন্থর হইয়া আসিলে, এই অপ্রীতিকর আলোচনাও এই স্থানে হঠাৎ রুদ্ধ হইল—ষ্টেসনের পোর্টারের চীৎকারে দেখা গেল, ট্রেণ আনন্দপুর ষ্টেসনে উপস্থিত।

সঙ্গে সঙ্গেই যখন প্লাটফরমে লোকের ভিড় জমিয়া উঠিল, তখন একটা প্রকাণ্ড কোলাহল ট্রেণের কাম্রার আস্ফালনকেও অতিক্রম করিয়া আরোহীদিগকে চমকিত করিয়া দিল।

ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত চন্দ্রনাথ বাবু সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াই ষ্টেসন-মাষ্টার ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া কহিলেন,—আপনি এখন ষ্টেসনের বাইরে যাবেন না সার, আমার আফিসের ভেতরে শীগ্‌গীর আসুন!

চন্দ্রনাথ বাবু অপ্রসন্নভাবে প্রশ্ন করিলেন,—ব্যাপার কি?

ষ্টেসন-মাষ্টার বাহিরের দিকে চন্দ্রনাথ বাবুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিলেন,—দেখতে পাচ্ছেন না, শুনচেন না হল্লা, আমাদের ত কাণে তালা ধরে গেছে! আপনাদের মামলা নিয়েই এই ব্যাপার,—পাঁচহাজার মুসলমান জমায়েত হয়েছে সার,—আর দাঁড়াবেন না, আসুন।

চন্দ্রনাথ বাবুর বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না,—তিনি ক্ষণিকের জন্ম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, ষ্টেসনের সন্নিহিত দুইটি বড় বড় ময়দান, মধ্যবর্ত্তী রাজপথ, সমস্তই মুসলমান জনতায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর সেই বিপুল জনসমুদ্র মথিত করিয়া ঘন ঘন সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি উঠিতেছে—আল্লা হো আকবর! বিশু বাবু কি জয়!

ভয়টা গভীরভাবে শুধু চন্দ্রনাথ বাবুকেই অভিভূত করিল না, রমানাথ, ভূতনাথ, নটনাথ প্রভৃতি সকলেরই সমান অবস্থা। সুতরাং পদক্ষেপ দীর্ঘ ও ক্ষিপ্রতর করিয়া ষ্টেসন-মাষ্টারের পিছু পিছু তাঁহারা অফিসের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতেই গবাক্ষপথে প্রমত্ত জনতার কার্য্য-কলাপ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

২৩

বারান্দায় রেলিংটির উপর দেহটি হেলাইয়া দিয়া শোভা অদূরবর্ত্তী অপর একটি বারান্দার দিকে ব্যাকুলদৃষ্টিতে তাকাইয়া সেখানকার উৎসব দেখিতেছিল। দেখিতেছিল, একই বাড়ীতে একই সময়ে হর্ষ ও বিষাদের কি আশ্চর্য্য সমাবেশ। এ বাড়ী আজ বিমর্ষ, ম্রিয়মান, আলোর দীপ্তি নাই, লোকের মুখে হাসি নাই, চারিদিক যেন থম থম করিতেছে অথচ ওদিকে সুবৃহৎ উঠানটির ওপারে অপর মহলটি আলোয় ঝুরঝুরি, হর্ষ আর হাসি ওখানে যেন ছুটিতে হাত ধরাধরি করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; শঙ্খধ্বনি, হরিলুটের হুল্লোড়, কত লোকের পরিচিত ও অপরিচিত স্বর হাওয়ায় হাওয়ায় এ বাড়ীতে ভাসিয়া আসিতেছে, কত লোক আসা-যাওয়া করিতেছে কিন্তু শোভার আজ ওদিকে ভাল করিয়া চাহিবারও বুঝি অধিকার নাই। অথচ ঐ বাড়ীটাকে ঘিরিয়া শোভার এই বাল্যজীবনের কত স্মৃতিই জড়াইয়া রহিয়াছে। ওখানকার প্রতি ঘরের প্রত্যেক জিনিষটির সহিত কি নিবিড় পরিচয়ই তাহার ছিল; একটি বেলা ওদিকে না গেলে ডাকের উপর ডাক আসিত। তাহার দেহটি এ বাড়ীতে থাকিলেও মনটি বুঝি ও-বাড়ীর সহিত মিশিয়া থাকিত। কিন্তু প্রায় তিনটী মাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আর ও বাড়ীর চৌকাঠটিও সে মাড়ায় নাই, দুই বাড়ীর মধ্যে যে গভীর যোগসূত্র ছিল, তাহা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাই না আজ ওবাড়ীতে অমন উৎসব, অত ধুম-ধাম, অথচ সেখানে আজ আর কেহ তাহাকে ডাকে নাই, কাহারও ডাকিবার জো নাই।

বারান্দায় আলো ছিল না, অন্ধকার আশ্রয় করিয়াই বালিকা ও-বাড়ীর উৎসব দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে ও-বাড়ীর হর্ষ এবং এ-বাড়ীর বিষাদ বুঝি পর পর তাহার অন্তরটির ভিতর ঢুকিয়া তাহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছিল—হর্ষ যেন তাহার পীঠটি চাপড়াইয়া জোর গলায় বলিতেছিল,—যে ভয়ে তুমি কাঁটাসার হয়েছিলে, সে ত ঘুচে গেল, আর ত কেউ বলতে পারবে না—বিশুদা তোমার জেলে যাবে; সে জয়ী হয়েই ত ফিরেছে। আনন্দ কর, আনন্দ কর!—আবার পরক্ষণেই বালিকার আনন্দোচ্ছ্বাস চিত্তটি অন্ধকার করিয়া বিষাদ আসিয়া কহিল,—সব ত হ'ল, বিশুদা তোমার হাসি মুখে ফিরে এল, কিন্তু তোমাকে ত খুঁজলে না? তোমার মুখে ও হাসি কেন? তার সঙ্গে ত তোমার চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়েছে,—তবে?

বালিকার দুই চক্ষু অশ্রুভারে স্ফীত হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র দেহটিও তাহার আড়ষ্ট হইতে থাকে। কিন্তু আবার কোথা হইতে হর্ষ ছুটিয়া আসিয়া আশ্বাস দেয়,—তা কেন? হলোই বা আড়ি, এমন কতবার ত হয়েছে, তারপর কি ভাব আর হয় নি? নাই বা হল ভাব, বিশুদা ত আর জেলে যাবে না, বাড়ীতেই থাকবে,—তবে?

হর্ষ-বিষাদের এই দ্বন্দ্বে বালিকার কোমল হৃদয়টি যখন মথিত হইতেছিল, সেই সময় অখিল আস্তে আস্তে পা দুটি টিপিয়া টিপিয়া তাহার ঠিক পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। শোভার মন তখন সম্মুখের দিকে অদূরবর্ত্তী আলোক-উজ্জ্বল উৎসব-মুখর সুপরিচিত ঘরগুলির ভিতর গিয়াছে, চক্ষু কর্ণ—এই দুইটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ও মনের অনুসরণ করিয়াছে; কাজেই কেমন করিয়া জানিবে যে,

তাহার পিছনে চুপিসাড়ে আর একটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জানিতে পারিল এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকিয়া উঠিল, যখন সেই ছেলেটির সুকোমল হাত দুইখানি তাহার উপর পড়িল।

এই আকস্মিক স্পর্শে শোভার কণ্ঠ দিয়া ভয়ার্ত স্বর বাহির হইল,—মাগো!

ঠিক পার্শ্বে বারান্দার দিকে আসিয়া অখিল কহিল,—ইস্, ভয়ে যে ডুগরে উঠলি রে?

—মাগো, তুমি যেন কি! এমন করে বুঝি ভয় দেখায়? যা ভয় আমার হয়েছিল!

—যার প্রাণে এত ভয়, কোন্ ভরসায় এই নিরিবিলি বারান্দায় সে এসে দাঁড়ায়! কি দেখা হচ্ছিল?

—কি আবার দেখব?

—তবু?

—তোমার মাথা।

—আমার মাথা ত আর ওদিকে নেই যে অমন করে চোরের মতন চুপিসাড়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবি! আমি যেন কিছু জানতে পারি নি?

—কি জেনেছ তুমি?

—ঐ বংশে ডাকাতটা খালাস পেয়েছে, তাই চোখে মুখে আর হাসি ধরে না!

—আ-হা! তোমাকে বলেছিনুম!

—ব'লবি কেন, আমি কি কাণা, কিছু দেখতে পাই না, না, বুঝতে পারি না?

—কি বুঝেছ?

তিনটি মাস মেয়ের মুখে হাসি ছিল না, ভাল করে কারুর সঙ্গে কথা কওয়া হত না, সন্ধ্যে হতে না হতেই বিছানায় পড়ে ঘুমের কি ঘটা,—আজ সে সবই পালটে গেছে। এইত হাতেনাতেই ধরলুম—বেহুঁস হয়ে ঐ ইতরদের পেজমী দেখা হচ্ছিল!

—ওরা ইতর?

—ইতর নয় ত কি? শুধু কি তা,—ওরা পাজী, নচ্ছার, বজ্জাত। জিত হয়েছে বলে আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে ঐ সব করছে। তোর লজ্জা নেই, তাই ঐদিকে চেয়ে দেখছিস?

ও পক্ষের উদ্দেশ্যে এইরূপ অভদ্র মন্তব্য শোভার ভাল লাগে নাই। মন্তব্যটির শেষ ভাগে অখিল তাহার প্রসঙ্গ তুলিতেই সে অমনি সাপের মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিল,—আমার খুশী।

মুখ ভ্যাঙাইয়া অখিল শোভার উক্তিটাই বিকৃত করিয়া কহিল,—আমার খুসী! আচ্ছা আর দুদিন পরে দেখা যাবে, এ খুসী কোথায় থাকে! বাবা বলেছেন, কালই এখানে পাঁচীল তুলে দেবার জন্যে মিস্ত্রী লাগাবেন।

শোভা মুখখানি ম্লান করিয়া কহিল,—পাঁচীল তোলা হবে এখানে? কেন?

অখিল কহিল,—তোরই জন্যে, যাতে ও-বাড়ীর দিকে আর তাকাতে না পারিস। শুধু এখানেই নয়, যেখানে-যেখানে ওদের বাড়ী যাবার রাস্তা আছে, সে সমস্তই বন্ধ করে দেওয়া হবে।

শোভা শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—তাতে কি লাভ?

অখিল কহিল,—ওদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে, এইটুকুই লাভ। তোর ভারি কষ্ট হবে, না? প্রাণের বিশুদার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কথা কইতে পাবি নি, ভাব আর কোন দিন হবে না—

শোভার কণ্ঠ দিয়া আশু রোদনের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস বুঝি ঠেলিয়া আসিতেছিল, অতি কষ্টে বালিকা তাহা সম্বরণ করিয়া কহিল,—তিন মাস ত হয়ে গেল, কথা আমি তার সঙ্গে কয়েছি? একটিবার ওদিকে গিয়েছি কোন দিন? দেখেছ তুমি?

অখিল কহিল,—তবে লুকিয়ে লুকিয়ে ওদিকে চেয়ে এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

শোভা কহিল,—আমি জানি না।

অখিল কহিল,—হ্যাঁ জানিস, তোকে বলতে হবে।

শোভা কহিল,—আমি বলব না।

অখিল এবার রুখিয়া কহিল,—না বললে আমি সকলকে বলে দেব—তুই একলা এখানে দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ও-বাড়ীর দিকে চেয়েছিলি।

শোভা কহিল—আর যদি বলি?

অখিল কহিল—তাহলে কাউকে আর বলব না।

শোভা দুই চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি অখিলের মুখের উপর তুলিয়া কহিল,—সত্যি?

অখিল শোভার অপূর্ব্ব দুইটি চক্ষুর শান্ত দৃষ্টির সহিত নিজের দুই চক্ষুর প্রখর দৃষ্টির সংযোগ করিয়া কহিল,—তোর দিব্যি!

শোভা এবার মুখখানি নীচু করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—তবে সত্যি কথাই বলি—বিশুদাকে

খুঁজছিলুম; আজ বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে তার সঙ্গে আবার ভাব করতে। কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রাঙা রাঙা দুইটি ওষ্ঠ স্ফীত ও উদগত অশ্রুভারে দুই চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিল; পরক্ষণে মুখখানি তুলিয়া সম্মুখবর্তী মহলটির দিকে তাকাইতেই সে যেন বিস্ময়ানন্দে স্তব্ধ হইয়া গেল!

অখিলও শোভার শেষের কথার সঙ্গে সঙ্গে দুই চক্ষু পাকাইয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল এবং পরক্ষণে বারান্দার দিকে তাহারও দুইটি বিস্মিত চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল। উভয়েই দেখিল, বারান্দার রেলিংটির উপর রীতিমত ঝুঁকিয়া একটি ছেলে এ দিকের বারান্দার দিকে চাহিয়া আছে, সে আর কেহ নহে—বিশু।

ক্ষণকাল পূর্ব্বে শোভার যে কণ্ঠ ঠেলিয়া কান্নার উৎস নির্গত হইতে চাহিতেছিল, সে সবলে তাহাকে রুখিয়াছিল; এবার সেখান হইতে যে স্বরটি স্নেহসিক্ত হইয়া খসিয়া উঠিতেছিল, শোভা তাহাকে রুখিতে পারিল না, বুঝি রুখিবার চেষ্টাও সে করিল না, পার্শ্বে দণ্ডায়মান বিস্ময়াহত অখিলকে অধিকতর আঘাত দিয়া সে স্বর সম্মুখের বারান্দার দিকে ছুটিল,—বিশুদা!

পরক্ষণেই প্রত্যুত্তর আসিল—শোভা!

অখিল ঠিক এই সময় উন্মত্তের মত শোভার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুইহাতে সবলে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া কহিল,—চুপ।

শোভা সবেগে মাথার একটা ঝাঁকুনি দিয়া নিজেকে অখিলের হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল,—পাঁচীল তুলে রাস্তা বন্ধ করে, আমাকে ধরে বেঁধে বিশুদার কাছ থেকে তফাত করতে পারবে তোমরা?

অখিল কহিল,—খুব পারব; বাবা বলেছেন, এ-বাড়ীর যে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে, কথা কইবে, বাবা তাদের ছেঁটে ফেলে দেবেন।

শোভা মুখখানা তুলিয়া গলার স্বরে জোর দিয়া কহিল,—আমাকে কি করবেন, আমি যদি কথা কই, যদি সম্পর্ক রাখি?

অখিল কহিল,—কথা কইলে তোর মাকে দিয়ে মুখে গোবর গুঁজে দেবেন, ফের ওমুখো হলে ঘরে পুরে চাবিতালা বন্ধ করে রাখবেন।

শোভা কহিল,—মানুষের মনকে কেউ বুঝি ধরে বেঁধে ঢিট করতে পারে? কত গল্পই ত শুনেছি, তা হয় না।

অখিল বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিল;—তুই কি করতে চাস তাহলে?

শোভা মুখখানা কঠিন করিয়া উত্তর দিল,—আমার দেহটাকে তোমরা ধরে বেঁধে রেখে যা ইচ্ছে তাই কর না কেন, আমার মন এখানে থাকবে না কিছুতেই। তাকে কি করে ধরে রাখবে?

অখিল কহিল,—তোর মন কোথায় থাকবে?

শোভা কহিল,—আমার মন কি আমার কাছে থাকে? এই ত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছি, কিন্তু মন কি এখানে আছে?

অখিল প্রশ্ন করিল,—তবে?

শোভা কহিল,—পাঁচিলই তোল, আর আমাকে ধরে বেঁধেই রাখ, আমি থাকব এদিকে, আর মন থাকবে ওদিকে; কেউ রুখতে পারবে না তাকে।

অখিল বিবৃতকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন করিল,—এ কথার মানে?

ঠিক এই সময় পিছন হইতে খিল খিল করিয়া হাসিয়া কুসুম কথাটার উত্তর দিল,—কি অবুঝ তুমি অখিল দা, কথাটা এখনো বুঝতে পারলে না? এর মানে, বিশুদার শ্রীচরণে উনি করেছেন আত্মসমর্পণ।

২৪

ইতিমধ্যে পরি ও হাস্তির সহিত শোভার সদ্ভাব ও সম্প্রীতি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। যদিও শোভা বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী, কিন্তু বিদ্যালয়ের কোনও বালিকার সহিত তাহার বিশেষ মাখামাখি কোনও দিন দেখা যায় নাই। তাহার সঙ্গী সাথী বা সখী সব কিছুই ছিল একাধারে বিশুদা। তাহার সহিত যে খেলিয়া সুখ, মেলামেশায় সুখ, ঝগড়া-ঝাটির ভিতরেও বুঝি সুখ ছিল। তাই সে আর কাহারও দিকে ঝুঁকিত না। কিন্তু বিশুদার সহিত ছাড়াছাড়ির পর মনের যে দিকটা তাহার খালি হইয়া গিয়াছিল, অখিল সেটা ভরাইবার যত চেষ্টাই করুক, শোভা বেশ বুঝিত, সেটা খালিই আছে। কিন্তু কয়টি সপ্তাহের মধ্যে পরি যে ধীরে ধীরে তাহার কতকটা জুড়িয়া বসিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। যে দিন জানিতে পারিল, পরির সহিতও সেদিন তাহার ছাড়াছাড়ির সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

এক সঙ্গে তিনটি মেয়েকে ছুটির পর রাস্তা

ধরিয়া আসিতে দেখা যায়। পরি ও শোভা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া কত কথা কত আলোচনাই করে, হাজি তাহাদের পিছু পিছু কথাগুলি শুনিতে শুনিতে যায়, কখনও বা নিজেও গায়ে পড়িয়া দুই একটা কথা কয়। পরির সংস্পর্শে ইতিমধ্যে হাজির আড়ষ্টভাব ও কথার জড়তা অনেকটা কাটিয়াছে।

শোভাও এই পরিহাস-প্রিয় সদাহাস্যমুখী সুচতুর মেয়েটির সাহচর্য্য পাইয়া বিশেষ সপ্রতিভ হইয়া উঠিয়াছে। অনেক নূতন কথা এবং কহিবার অনেক কায়দাও সে পরির নিকট শিখিয়াছে। বিশুর অভাবে পরিই যেন তাহার মুরুব্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরির প্রতি শোভার এতখানি শ্রদ্ধার আর একটি কারণ এই যে, পরির নিকটেই সে বিশুদার সম্বন্ধে সেদিনকার সকল কথাই শুনিয়াছে এবং বিশুদার প্রতি পরির অতি যত্নের পরিচয় পাইয়া তাহার মনটি একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। তাই মন খুলিয়া শুধু এই মেয়েটির কাছেই তাহার সকল গোপন কথাই বলিয়া নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে। পরিও বিনিময়ে এদিককার সকল খবর, যায়—আদালতের মামলার প্রতি দিনটির আগাগোড় বিবরণটি পর্য্যন্ত শোভাকে শুনাইয়াছে; পরি না শুনাইলে এ খবর সঠিকভাবে শুনিবার কোনও সম্ভাবনাই তাহার পক্ষে ছিল না। এখনও সে প্রত্যহ এ বাড়ীর সকল কথা পরিকে শুনায় এবং তাহার নিকট নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ লয়। এই সকল কারণেই ইহাদের মধ্যে এতটা ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে।

আজ বিদ্যালয়ে টিফিনের ছুটির সময় শোভা পরিকে ডাকিয়া গত রাত্রির সকল কথাই একটি একটি করিয়া শুনাইয়া দিল।

পরি কহিল,—সত্যিই পাঁচীল তুলে দেবে?

শোভা মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল,—দেবে কি, দিচ্ছে। ইস্কুলে আসবার সময় দেখে এসেছি, উঠানে এক গাড়ী ইট এসেছে, মিস্ত্রীও লেগেছে। গিয়ে হয়ত দেখবো—পাঁচীল উঠে গেছে।

পরি কহিল,—তোর জন্যেই তাহলে পাঁচীল উঠলো বল্—যাতে বিশুদার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি আর না হয়?

শোভা কহিল,—তা নয় ত কি। অখিলদা ত স্পষ্টই বললে ও কথা; আর কথাটা তার মিছেও ত নয়, কাল যে কথা বলেছিল, তাই ত হচ্ছে, তাই?

পরি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়া কহিল,—তুলুক গে পাঁচীল, ঐ একটা জায়গা বই ত নয়; না হয় ওখান দিয়ে আর দেখাশোনা হবে না, কিন্তু তাতেই কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে মনে করিস্?

শোভা হতাশের সুরে কহিল,—অখিলদা তাই বলেছে, ও বাড়ী যাবার যেখানে যত রাস্তা আছে সব বন্ধ করে দেবে।

পরি কহিল,—না হয় দিলে; কিন্তু তাতেও কি মুখ দেখাদেখি বন্ধ হতে পারে? ইস্কুলের রাস্তায় দেখা হবে, খেলার মাঠে দেখা হবে; ওখানে ত আর পাঁচীল তুলতে পারবে না।

শোভা আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—তখন বলবে, খবরদার ওর সঙ্গে মিশো না, কথা কয়ো না, চোখটি তুলে চেও না,—ও ছেলে ডাকাত। সেই থেকে ওরা ত বিশুদার নামই রেখেছে বিশে ডাকাত।

পরি একটু হাসিয়া কহিল,—তা ভাই নামটা ওরা বেছে বেছে ঠিকই রেখেছে; এইটুকু ছেলে, এই বয়সে কম কাণ্ডটা করলে! আর ডাকাত হওয়াটা ত সোজা কথা নয়। গায়ে জোর চাই, মনে সাহস চাই, মাথায় বুদ্ধি চাই—

শোভা মুখ ঝাপটা দিয়া কহিল,—তুই থাম; তোকে আর ডাকাতের ব্যাখ্যানা করতে হবে না।

পরি হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই, তোর বিশুদা তা বলে সত্যি সত্যিই ডাকাতি করবে না।

শোভা মুখখানার এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া কহিল—ও ছেলে সব পারে।

পরি কহিল,—তবে ওদের কথায় তুই রেগে মরছিস্ কেন? না হয় তোর বিশুদাকে বিশে ডাকাতই বলেছে, তাতে তোর অত ঝাল কেন, শুনি?

শোভা মুখে বিস্ময়ের ভঙ্গী আনিয়া কহিল,—খা-রে! আমি বুঝি ঐ জন্যে রেগেছি।

পরি কহিল,—যত রাগ তোর পাঁচাল তোলার জন্যে তা বুঝেছি। কিন্তু তারও জবাব ত তুই দিয়েছিস, দিব্যি জবাব, তার জন্যে সত্যি-সত্যিই, শোভা, তোকে ভাই তারিফ করছি আমি।

—কি আমি বলেছি যে ঠাট্টা হচ্ছে?

—ঠাট্টা কোথায়, তারিফ। তুইই বল, তোর সে কথাটা কি বাহোবা দেবার মতন নয়?

—কোন্ কথা?

—সেই যে, তোর অখিলদার মুখের উপর যে কথাগুলো বলেছিলি—পাঁচীলই তোলো, আর

আমাকে ধরে বেঁধেই রাখো, আমি থাকবো এদিকে আর মন থাকবে ওদিকে—

শোভার মুখখানা হঠাৎ রাঙা হইয়া উঠিল। মনে মনে কি ভাবিয়া সে কহিল,—সত্যি ভাই, এখন আমার লজ্জা করছে, কি করে তখন এ-কথা বলেছিলুম। হাঁ, ভাই, ওকথাগুলো ত আর আমার নিজের নয়, তোর কাছেই ত শেখা—

পরি জোর গলায় কহিল,—কি রকম?

শোভা কহিল—মনে নেই, লয়লা-মজনুর গল্প যেদিন শুনিয়েছিলি, লয়লা ত ঐ কথাগুলোই ঠিক বলেছিল আমার মনে ভাই কথাগুলো বেশ লেগেছিল; রাগের মাথায় সেইগুলোই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল,—সেই থেকে মরছি লজ্জায়।

পরি কহিল, লজ্জা কিসের? কথাগুলো ত আর মিছে নয়, তোর মনের কথাই ত বলেছিস্ ভাই। শুধু লয়লা কেন, তার মতন যে সব মেয়েদের ওপর ঐ রকম পীড়ন আর বাঁধাধরা চলে, তাদের বুকের ভেতর দিয়ে ঠিক ঐ কথাগুলি ফুটে বেরোয় যে।

পরির কথাটা শোভার মনে বুঝি কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিল; পরক্ষণেই এই সম্পর্কে আর একটা কথা খপ করিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, একথাটা পরিকে শুনাইতে সে ভুলিয়াছিল। তাড়তাড়ি কহিল,—ওদের আর একটা অন্যায় কথা তোকে বলতেই ভুলে গেছি। অখিলদা চোখ মুখ পাকিয়ে বললে কিনা—বিশুদার সঙ্গে ফের যদি কথা বলবি ত, মাকে দিয়ে মুখে গোবর গুঁজে দোবো; আর, ও-মুখো হলে, ঘরের ভেতর পুরে চাবি-তালা বন্ধ করে রাখবো। সাধে কি আমার ও রকম রাগ হয়েছিল, ভাই?

পরি কহিল,—জবাব কিন্তু তোর খাসা হয়েছে, তোর অখিলদাও হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যখন তোদের ঝগড়া হচ্ছিল, বিশুদাও ত তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিল?

শোভা কহিল,—তাকে আর ত দেখিনি; যেই আমি 'বিশুদা' বলে ডেকেছি, অখিলদা অমনি যেন বাঘের মত এসে আমার গলাটা চেপে ধরলে। তাই দেখেই বিশুদা মুখখানা কি রকম করে সরে গেলো।

—তার পরেই বুঝি কুসুম এসে আত্মসমর্পণের কথা বললে?

—হ্যাঁ ভাই,—ঐ এক হতচ্ছাড়া মেয়ে এসে জুটেছে। এসে অবধি আমাকে যেন জালিয়ে পুড়িয়ে মারলে। আচ্ছা ভাই, আত্মসমর্পণ মানে কি? কুসি ত খপ করে কথাটা বললে, শুনে অখিলদা চোখ দুটো কটমট করে আমার পানে তাকালে, আমি কথাটার মানে ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করেই চলে গেলুম। ওর মানেটা আমাকে বুঝিয়ে দিবি?

পরি মুচকি হাসিয়া কহিল,—মানেটা কি সত্যই তুই বুঝতে পারিস নি? আমার ত ভাই, তা' মনে হয় না।

শোভা মুখখানা ভার করিয়া কহিল,—যাও। আর যদি কখখনো তোমাকে কোনো কথা বলি? তোমাকে আর মানে বোঝাতে হবে না।

পরির মুখখানি তৎক্ষণাৎ হাসিতে ভরিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—অমনি মেয়ের রাগ হয়ে গেল! ভালো, তা হলে কথাটার মানে ভালো করেই বুঝিয়ে দিচ্ছি শোনো, রাগ এখ্খুনি পড়ে যাবে।—আত্মসমর্পণের দুটো মানে হয়, বুঝলে? একটা মানে হচ্ছে—যুদ্ধ করতে করতে এক দলের রাজা অথবা সেনাপতি যখন দেখে আর জেতবার আশা নেই, নিজের দলের সকলকে নিয়ে বিপক্ষের কাছে যদি ধরা দেয়, তা হলেই সেটা হয় আত্মসমর্পণ। এর মানে আর একটা হচ্ছে এই—আপনাকে দান করা অর্থাৎ নিজেকে কারুর হাতে সঁপে দেওয়া। যেমন লয়লী দিয়েছিল মজনুকে, সুভদ্রা দিয়েছিল অর্জুনকে, শৈবলিনী দিয়েছিল প্রতাপকে। এই তিনটি মেয়ের আত্মসমর্পণের গল্পও ত তোমাকে আগেই শুনিয়েছি। চারেরটি শুনিয়ে দিয়েছে কাল গাভিয়ে কুসুম আর সেটা আরো ভালো করে শোনাবার ইচ্ছাটি তোমার হয়েছে বলেই, আমাকে—

শোভার মুখখানি পুনরায় লাল হইয়া উঠিল; অপাঙ্গে পরির দিকে চাহিয়া ও তাহার মুখখানি তাড়াতাড়ি চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি দিয়া চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—চুপ কর, পোড়ারমুখী!

পরি শোভার শিথিল আঙুলগুলির ফাঁক দিয়াই হাসির ঝিলিক তুলিয়া কহিল,—মুখে চাপা দিলে কি মনের কথা চেপে রাখা যায়? নিজের মুখেই ত তুই বলেছিস্ ভাই, পাঁচীল তুললেও মনকে আড়াল করা চলে না।

শোভা পরির মুখ হইতে হাতখানি সরাইয়া লইয়া কহিল,—আচ্ছা, তুই আজ আমার সঙ্গে এমন করে লাগছিস কেন, শুনি? আমি তোর কি করেছি?

পরি হাসিয়া কহিল,—বলবো? তুই আমাদের বিশুদাকে বিবাগী হবার যো করেছিস। বেচারীর মুখখানা দেখলেই আমার কষ্ট হয়। সে হাসি নেই, কথায় কথায় সে রাগও আর দেখি না, যেন কেমন মনমরা হয়ে গেছে। এর গোড়া ত তুই।

পরির কথায় শোভার চক্ষু দুইটি ছল ছল হইল, গলাটিও সহসা যেন ধরিয়া আসিল, গাঢ়স্বরে সে কহিল,—দোষ বুঝি আমার! কে আগে ঝগড়া বাধিয়েছিল, তোর বিশুদাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখিস্ না।

পরি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ক্লাসে যাইবার ঘণ্টা বাজায় তাহার আর বলা হইল না; তাড়াতাড়িই দুইজনে নিজ নিজ ক্লাসের দিকে ছুটিল।

ছুটির পর টিফিনের সময়ের কথাটা পথে চাপা পড়িয়া গেল হাজীর কথায়। হাজী সহসা পরির কাণের কাছে মুখখানি রাখিয়া চুপি চুপি কহিল,—হাঁ৷ ভাই, নতুন বাড়ীতে বিশু ভাইকে নিয়ে মজলিসের কথা ত ওকে কইলি নি?

পরি অমনি মুখখানি ঘুরাইয়া কহিল,—ঐ যা! কি ভুলো মন আমার; তখন অত কথা হল, অথচ, আসল কথাটাই তোকে বলতে ভুলে গেছি শোভা।

শোভার মনটি এ সময় ভালো ছিল না; তথাপি পরির কথাটা তাহার বিমর্ষ মনে বিশেষ কৌতূহলের সঞ্চার করিল। দুই চক্ষুতে প্রশ্নের চিহ্ন ফুটাইয়া সে পরির দিকে চাহিল।

পরি কহিল,—বিশুদাকে নিয়ে ভারি একটা মজার কাণ্ড করা হচ্ছে যে।

আবার বিশুদা? টিফিনের পর শোভা ক্লাসে বসিয়া মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিল, বিশুদাকে লইয়া কোন কথাই আর সে তাহার সহিত বলাবলি করিবে না! কেন,—কিসের জন্য তাহার এত গরজ? এই এতদিন বিশুদার সহিত তাহার আর মেলামেশা নাই, কথাবার্তা বন্ধ, তবু কি তাহার দিন কাটিতেছে না? কিন্তু ছুটির পথে পরির মুখে বিশুদার নামটি উঠিতেই শোভার অজ্ঞাতেই যেন তাহার মুখ দিয়া একটা সংক্ষিপ্ত স্বর বাহির হইয়া আসিল,—কি?

পরি কহিল,—বিশুদার অপবাদ ঘুচিয়ে মান বাড়াবার জন্যে আমরা যে সম্বর্দ্ধনা-সভা করছি।

দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া শোভা বিস্ময়ের সুরে কহিল,—সে আবার কি?

পরি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—তুই ভারি নেকী। কেন, শুনিস নি, দেশের জন্যে কাজ করে কারুর জেল হলে, দেশের লোকে সভা করে তাকে বাহাবা দেয়, কত কি উপহার দেয়, কত তারিফ করে - বিশুদাকে নিয়েও আমরা সেই রকম একটা কিছু করছি।

শোভা কহিল,—দূর! ওর কি জেল হয়েছে যে ওসব করবি?

পরি কহিল,—জেলে না যাক, আসামী ত হয়েছিল। এই নিয়ে ওদের ইস্কুলের ছেলেরা নাকি কত কি বলেছে। সেই জন্যই দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা এই কাণ্ড বাধিয়ে বসেছি। বাবাকেও কথাটা বলেছি, তিনি খুব খুসী হয়ে মত দিয়েছেন।

শোভা কহিল,—তাতে কি হবে?

পরি জানাইল,—এ অঞ্চলে যতগুলো ইস্কুল আছে, সমস্ত ইস্কুলের ছেলেদের নেমন্তন্ন করা হবে, ইস্কুলের মাষ্টারদের বলা হবে; তারা সকলে সভায় আসবে। সকলের সামনে বিশুদার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হবে, কত কি উপহার দেওয়া হবে, মাষ্টারেরা সকলেই তার প্রশংসা করবে।

একটা অপ্রত্যাশিত উল্লাস শোভার বুকটির ভিতর দিয়া বুঝি কণ্ঠ পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল, মুখ ও দুই চক্ষুতেও তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইল। একটা কি কথা সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় হাজীর কথা তাহাতে বাধা দিল। পিছন হইতে সে সহসা ছুটিয়া আসিয়া শোভার একখানা হাতে টান দিয়া সহর্ষে কহিল, —আর শুনেছিস, পরি কেমন ছড়া বেঁধেছে; —সত্যি কি সোন্দোর ভাই—

পরি দুই চক্ষু পাকাইয়া হাজীর দিকে চাহিয়া কহিল,—'সোন্দোর' বললি যে বড়? বল্— সুন্দর।

পরির এই কঠোর শাসনে প্রফুল্ল মুখখানা নিমেষে ম্লান হইয়া গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে কহিল, —ছেরকাল করে এনু—

পরি শিক্ষয়িত্রীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—আবার! একটা ভুল চাপা দিতে আর

একটা ভুল? 'ছেরকাল' কেন বলছি শুনি? ওটা হবে—চিরকাল। তা চিরকালই কি ভুল করে মরবি? এই যে চিরকাল তোদের বাড়ীর সবাই মূর্খ থেকেই গেছে, তবে তুই লেখাপড়া শিখ্‌ছিস কেন?

শোভা কহিল—মাষ্টার মশায় থামুন, ঢের হয়েছে।

পরি কহিল,—এমনি করে ওর প্রত্যেক কথাটি ধরে না দিলে ওকে মানুষ করতে পারব না ভাই, অন্ধ হয়েই থাকবে।

হাজী মুখখানা ভার করিয়া গৌভরে আপন-মনেই অগ্রসর হইল। পরি কহিল,—দেখছিস আবার মেয়ের রাগ!

শোভা কহিল,—ওরকম করে বললে রাগ হয় না বুঝি। আয় ভাই হাজী, আমরা দুজনে হাত ধরাধরি করে যাই—

শোভা একটু দ্রুত গিয়া হাজীর একখানি হাত ধরিল। হাজী কহিল,—তুমি ছাড়ো, কাল থেকে আমি আর যদি 'নিকৃতি' আসি!

পরি পুনরায় ধমক দিয়া কহিল,—ফের বলে 'নিকৃতি!' কেন, 'লিখ্‌তে' বলতে কি হয়েছিল?

হাজী প্রতিবাদের ভঙ্গীতে এবার কহিল,—কেন, ওরা ত সবাই কয়!

পরি কহিল,—ওরা ত সবাই দর্জিতে বসে কল চালায়, সেলাই করে, তুই কেন করিস না? সবাই যা বলবে, তোকেও তাই বলতে হবে নাকি?

শোভা কহিল,—না বাপু, তোর পণ্ডিতগিরির জ্বালায় আর পারি না! কবিতার কথাটা চাপাই পড়ে গেল।

পরি কহিল,—তোমার মনটি যে ঐ দিকেই পড়ে আছে, তা কি আর আমি জানি না? ভাবনা নেই, বলছি।

শোভা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—থাক্, আর তোমার বলে কাজ নেই; আমিও হাজীর দলে ভর্তি হলুম,—চল্ আমরা যাই।

পরি কহিল,—বটে! আমাকে এক-ঘরে করতে চাও ছুটিতে মিলে? তা হচ্ছে না; এতখানি পথ আমি কিছুতেই মুখ বুজিয়ে যেতে পারবো না—হাঁফিয়ে মরবো। তার চেয়ে আমি না হয় আত্মসমর্পণই করছি তোমাদের কাছে—আমাকে মাপ করো।

পরির কথায় হাজী হাসিয়া উঠিল, শোভা দুই চক্ষুর কোণে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—বুঝিছি, কথাটা নিয়ে আমাকেই খোঁটা দেওয়া হ'ল!

পরি কহিল,—না হয় এর জন্তে আর এক দফা মাপ চাইছি।

শোভা হাসিয়া কহিল,—আমরা দুজনেই খুসী হয়েছি, তোর সাত খুন মাপ—

পরি কহিল,—তবে এবার কবিতার কথাই বলি শোন্। ঐ যে সভার কথা বললুম না, দাদা সেই সভায় বিশুদার গুণের কথাগুলো নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখছে, আর আমাকে বলেছে—একটা কবিতা লিখতে।

শোভা বিস্মিত হইয়া কহিল,—কি করে তুই কবিতা লিখিস, ভাই, আমি ত ভেবে পাই না।

পরি কহিল,—ও একটা অভ্যেস; দাঁড়ানা, দিন কতক পরে তোকে দিয়েও কবিতা বাঁধিয়ে তবে ছাড়বো।

শোভা কহিল,—ওরে বাবা—আমি? বলে, একখানা চিঠি লিখতে বসলেই বুক টিপ টিপ করে, হাত কাঁপে।

পরি কহিল,—তা বললে ত হবে না, লিখতেই হবে।

শোভা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল,—কি লিখব?

পরি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—কেন, বিশুদার কথা। তার সম্বন্ধে তোর চেয়ে বেশী কথা আর কে জানে বল?

শোভা কহিল,—আমি পারব না, ভাই!

পরি তাহার কথায় জোর দিয়া কহিল,—পারতেই হবে, পারা চাই। কেন পারবি নি?

শোভা কহিল,—কি লিখতে হয়, কি রকম করে কথা বেঁধে বেঁধে লোকে লেখে, আমি কি তার কিছু জানি?

পরি কহিল,—আমি জানিয়ে দেব। তোর কাছে ত আমার বাঁধানো 'প্রদীপ' আছে। তাতে একটা লেখা আছে, সেটার নাম 'লাঞ্ছিতের সম্মান'। সুরেন বাঁড়ুয্যে, তিলক, কাব্যবিশারদ, লাজপত রায়, লিয়াকৎ হোসেন—এই রকম সব নামী লোকের ছবি আর সম্মানের কথা তাতে আছে। বাড়ীতে গিয়ে সেগুলো পড়বি খুব ভাল করে, তারপর ভাববি বিশুদার কথা, তখন

দেখবি লেখবার ভাব আপনি আপনিই আসবে। নিজে যা পারবি লিখবি, তার পর ইস্কুলে কাল আমাকে দেখাবি, আমি দাদাকে দিয়ে ঠিক করে দেব।

শোভা কহিল,—তা যেন হল, কিন্তু ভাই আমার বড় লজ্জা করে।

পরি মুখখানি মচকাইয়া কহিল,—আহাহা খুকী। লজ্জা করে লিখতে। আর মুখ দিয়ে সে কথা বলতে লজ্জা করল না—পাঁচীলের এদিকে আমি আর ওদিকে আমার মন?

শোভা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—ঝকমারি করেছি, ঐ কথাটা তোমাকে বলে; আর যদি কখনো কোন কথা বলি—

পরি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল,—কথা আর বলতে হবে না তোমাকে, এখন থেকে লেখাটাই সুরু করো!

শোভা কহিল,—বয়ে গেছে আমার!

পরি সহজকণ্ঠে কহিল,—বেশ, তাহলে কুসুমকেই অগত্যা ধরবো; তাকেই বলবো—তুমি ভাই 'আত্মসমর্পণ' নাম দিয়ে একটা কিছু বিশুর সম্বন্ধে লিখে দাও ত!

পরির কথাটা যেন তীরের ফলার মত শোভার বুকে বিঁধিল। মুখখানা শক্ত করিয়া সে কহিল,—বাবা! তুমি ধন্যি মেয়ে, সব পার তুমি।

পরি কহিল,—কি করি বল? কেউ না কিছু পড়লে সভা জমবে কেন? দাদা পড়বে গল্প, আমি পড়বো পদ্য, তার পরেরটা পড়বার লোক ত এক-জন চাই। তোমাকে যদি একান্তই না পাই, কুসুমই সই।

শোভা কহিল,—না হয় লিখলুম, কিন্তু তারপর? আমাকে বুঝি সেখানে যেতে দেবে ওরা?

পরি কহিল,--বেশ ত, নাই বা গেলে; লেখাটা আমার কাছে দেবে, আমি পড়বো।

শোভার মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটিল; কহিল,—তা যদি হয়, না হয় চেষ্টা করে দেখি; কিন্তু ভাই, আমি হিজিবিজি যা লিখে আনব, তোমাকে ঠিক করে দিতে হবে।

পরি সম্মতি জানাইয়া কহিল,—তাই হবে। তুইত আগে একটা কিছু লিখে আন।

ইতিমধ্যেই তাহারা বড়বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। শোভা ঘাড়টি দুলাইয়া হাসিমুখে কহিল,—তাহলে ভাই আসি, কাল আবার দেখা হবে।

পরি কহিল,—কিন্তু লেখা আনতে যেন ভুল না হয়।

২৫

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুইয়া ও স্কুলের কাপড় ছাড়িয়াই শোভা পরির দেওয়া বইখানি লইয়া পড়িল।

মা কহিলেন,—এসেই মেয়ে বই মুখে দিয়ে বসলেন, মুখে কিছু দিতে হবে না?

শোভা কহিল,—আমার এখন ক্ষিদে নেই, একটু পরে খাবো।

মা কহিলেন,—রান্না-ঘরে খাবার ঢাকা আছে; আমি গা ধুতে চললুম।

শোভার মন তখন প্রকাণ্ড বাঁধানো বইখানার পাতায় নিবদ্ধ। 'লাঞ্ছিতের সম্মান' নামক লেখাটি খুঁজিয়া বাহির করিতে সে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া চলিল। তাহার দুর্ভাগ্যক্রমে বইখানার গোড়ার দিকে সূচী পৃষ্ঠাটি ছিল না।

ইতিমধ্যে অখিল শোভার সন্ধানে আসিয়াছিল। বাহির হইতে উঁকি দিয়া সে দেখিল তাহার খেলার সাথীটি স্কুল হইতে ফিরিয়াই আবার বই লইয়া বসিয়াছে। পা টিপিয়া টিপিয়া চুপি চুপি সে ঘরের ভিতরে ঢুকিল এবং তাহার ঠিক পিছনটিতে দাঁড়াইয়া এই নূতন ধরণের পড়ার কায়দাটা দেখিতে লাগিল।

শতাধিক পৃষ্ঠার শিরোনামা ইতিমধ্যে দেখা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'লাঞ্ছিতের সম্মান' এ পর্য্যন্ত দেখা দেয় নাই। এত বড় বইখানার ভিতর কোথায় সেটি আছে, কে জানে? যেখানেই থাকুক, শোভার জিদ, খুঁজিয়া তাহাকে বাহির করিবেই।

কিন্তু হঠাৎ এখানেই তাহার উৎসাহে বাধা দিল অখিলের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর,—ঢের হয়েছে, আর কেন; এত বিদ্যে রাখবি কোথায়?

শোভা তাড়াতাড়ি বইখানা চাপা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল; অখিল বইখানার দিকেই হাত বাড়াইয়া কহিল,—কি বই দেখি?

শোভা বইখানা একটু তফাতে সরাইয়া ও

তাহার উপর আঁচোলটি ভাল করিয়া চাপা দিয়া কহিল,—এ বই আমার নয়।

—কার যে?

—আমার এক বন্ধুর।

—ও-বাবা! তোর আবার বন্ধু জুটেছে নাকি? বন্ধুটি কে শুনি?

—যেই হোক না, তাতে তোমার খোঁজে দরকার?

—বটে! ভারি কথা যে আজকাল শিখিছিস দেখছি।

—আমি ত তোমার সঙ্গে কথা কইতে যাই নি, বসে বসে বই পড়ছিলুম, তুমি কেন মিছিমিছি ঝগড়া করতে এলে?

—ও! বই পড়ছিলেন। তবু যদি না দেখতুম পড়ার ঘটা! খালি পাতাগুলো উল্‌টিয়ে জানান হচ্ছিল উনি কত বড় পড়িয়ে!

শোভা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—বেশ! আমার খুসী। তোমাকে ত ডাকি নি আমার পড়ার বাখ্যানা করতে!

এ পর্য্যন্ত শোভার মুখ দিয়া এরূপ রূঢ় কথা অখিল কোন দিন শুনে নাই। কথাগুলি শুনিয়া কিছুক্ষণ সে গুম হইয়া রহিল। গত রাত্রেও এই মেয়েটি এমন কতকগুলি কথা তাহাকে শুনাইয়া দিয়াছে, যাহা তাহার নিকট মোটেই প্রীতিকর হয় নাই এবং সেই কথাগুলির সম্বন্ধে বোঝাপড়াও এ পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিয়াছে। এখনকার কথাগুলির ঝাঁঝ আরও কড়া, সুর আরও চড়া; ইহার স্পর্দ্ধা যেন ক্রমশঃই মাত্রা ছাড়াইয়া চলিয়াছে। অথচ, সে তাহাদেরই একজন গোমস্তার মেয়ে বইত নয়—তাহাদেরই দয়ায় টিকিয়া আছে।

কিন্তু অখিল মনের রাগ মনের ভিতরেই চাপিয়া রাখিল এবং কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর অস্বাভাবিক সুরে কহিল,—আমার ঘাট হয়েছে, তবে বাইরের ঘরে বাবা আপনাকে ডাকছেন, তাই হুকুম না নিয়েই আপনার ঘরে ঢুকেছিলুম। এর জন্যে মাপ চাচ্ছি।

অখিলের মুখখানা দেখিয়া ও মুখের কথা শুনিয়া শোভার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। গত রাত্রেও অখিলের সহিত তাহার যে কথা কাটাকাটি হয়, তাহাতেই সে লজ্জায় সমস্ত সকালটাই অতি সন্তর্পণেই অখিলকে এড়াইয়া গিয়াছে। এ বেলায় পরির কথায় লেখার নেশায় অখিলের কথা ভাবিবারও সে সময় পায় নাই। তাহার পর সেই অখিলের সহিত এমন অবস্থায় সহসা দেখা হইল এবং সেও এমন খোঁচা দিল, গত রাত্রের কথাগুলি মনে স্থান না দিয়াই শোভা আজ যেন বেপরোয়া হইয়াই তাহাতে পাল্টা আঘাত দিয়াছিল। কিন্তু একটু পরেই হুঁস হইতে সে বুঝিল, কত বড় দুঃসাহসের কাজই সে করিয়া ফেলিয়াছে।

অখিলের কথার উত্তরে শোভা কণ্ঠের স্বর যতদূর সম্ভব কোমল করিয়া কহিল,—রাগ করলে, অখিলদা!

অখিল কহিল,—আমার রাগে আপনার ক্ষতি?

শোভা কহিল,—তোমার দুটি পায়ে পড়ছি, অখিলদা, আমাকে মাপ করো, আমার কথা যেন তুমি ধরো না—রাগ ক'র না,—লক্ষ্মীটি! বল, রাগ তোমার নেই?

অখিল কহিল,—তাহলে আগে বল, তোর বন্ধুটি কে?

শোভার বুকের ভিতরটা আবার ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল; কহিল,—আমাদের ইস্কুলের একটা মেয়ে।

—নামটিও শুনি না।

—তার নাম—পরি।

অখিলের মুখখানা আবার অন্ধকার হইয়া গেল। শোভার মুখে কথায় কথায় পরির পরিচয় সে আগেই পাইয়াছে। যদিও ইদানীং শোভা খুবই সতর্ক হইয়া এই ছেলেটির সহিত কথাবার্ত্তা কহিত এবং পরির প্রসঙ্গ একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু গোড়ার দিকে বিশুদার সহিত রহিম নামক ছেলেটির ঝগড়া ও তাহার বোন পরির সহিত একদিনেই তাহার ভাব হইবার যে আখ্যান সে শুনাইয়াছিল, তাহাতে পরির নামটি অখিলের পক্ষে ভুলিবার কথা নহে, বরং মামলার সম্পর্কে নানা সূত্রে ইহাকেও সে বিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

মুখ দেখিয়া মনের ভাবটুকু ধরিবার মত অভিজ্ঞতা শোভা তাহার বিশুদার কল্যাণেই সঞ্চয় করিয়াছিল, সুতরাং অখিলের স্তব্ধ মুখটির ভিতর দিয়াই সে তাহার মনের ক্ষোভটুকু বুঝিতে পারিল এবং সেটা চাপা দিবার অভিপ্রায়েই তাড়াতাড়ি কহিল,—বইখানা কাল সকালেই তোমার পড়বার ঘরে দিয়ে আসব, অখিলদা।

অখিল উপেক্ষার সুরে কহিল,—দরকার নেই, বই তোমাকে দিয়ে আসতে হবে না।

মনে ব্যথা পাইয়া শোভা জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

অখিল কণ্ঠের স্বর রুক্ষ করিয়া প্রশ্নটার উত্তর দিল,—মোচলমানের বই আমি ছুঁইনা, আমি বামুনের ছেলে।

কথাটা শোভার ভাল লাগিল না এবং ইহার উত্তর দিতেও তাহার কিছুমাত্র বাধিল না। মুখখানা শক্ত করিয়াই কহিল,—আমাদের পড়ার বইয়ে আছে, বইগুলো সমস্তই দপ্তরীরা বাঁধে, তারা বুঝি সবাই বামুন?

অখিল পুনরায় সুর পাল্‌টাইয়া কহিল,—আপনার সঙ্গে তর্কে আমি পারব না, বললুম না—বাবা ডেকেছেন, যেতে ইচ্ছে হয় আসুন।

শোভা নিরুত্তরে অখিলের মুখের দিকে একবার প্রখর দৃষ্টিতে চাহিল; তাহার পর বইখানা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া বিরক্তির ভাবেই কহিল,—চল।

ঘরের বাহিরের বারান্দাটির উপর উভয়ে আসিবামাত্রই অখিল হঠাৎ মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া শোভার দিকে চাহিয়া হাসিল।

শোভাও মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—এই ছেলের অত রাগ, আর এখুনি মুখে হাসি।

অখিল উঠানটির দিকে হাতের একটি অঙ্গুলি হেলাইয়া কহিল, হাসি এল ঐটে দেখে। কেমন হচ্ছে?

শোভা দুই পা অগ্রসর হইয়া বারান্দাটির রেলিংএ ভর দিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বুকের ভিতরটি তাহার ছ্যাত করিয়া উঠিল; আড়ষ্ট হইয়াই সে দেখিল, উঠানের প্রান্তভাগে তাহাদের সীমানাটির উপর ইতিমধ্যেই প্রাচীর হাত দুই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রাচীরের অপর প্রান্তে বিশুদের মুক্ত বারান্দাটির দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিল—আজ তাহা এখান হইতে লক্ষ্য হইতেছে, কিন্তু ইহার পর?

অখিলই ইহার উত্তর দিল। হাসিমুখেই কহিল,—আজ দেখছিস ঐটুকু উঠেছে, কাল ইস্কুল থেকে এসে দেখবি মাথায় মাথায়, তারপর পরশু দিন একবারে জেলখানা। বিশে ডাকাতদের বাড়ীর ত্রিসীমাও আর চোখে পড়বে না,—কি মজা!

শোভা কোন উত্তর না দিয়াই অখিলের পাশ কাটাইয়া নীচের দিকে চলিল।

অখিল শোভার অনুসরণ করিয়া কহিল,—আর একটা মজার খবর তোকে দেওয়া হয় নি, শোভা!

শোভা কোনও কথা কহিল না বা মজার খবরটি শুনিবার জন্য তাহাকে পিছনে ফিরিয়া চাহিতেও দেখা গেল না।

অখিল কহিল,—সেই মংচুর কথা তোকে বলেছিলুম, মনে আছে ত? রেঙ্গুণে আমাকে পড়াতো, সে আজ দুপুরের গাড়ীতে এখানে এসেছে। এখানেই সে থাকবে, আর তোকে আমাকে পড়াবে।

সিঁড়ি পার হইয়া তখন তাহারা উঠানে নামিয়াছে। শোভার মুখ দিয়া এই সময় একটা মৃদু স্বর বাহির হইল,—কে?

অখিল কহিল,—তবে শুনলি কি? বললুম না—মংচু! চমৎকার ছেলে। বয়সে যদিও আমার চেয়ে বড়, কিন্তু দেখতে ঠিক আমারই মতন মাথায় মাথায়; কিন্তু তা বললে কি হয়—এই বয়েসেই মংচু এফ.-এ পড়ছে; বাবা বলেছেন, মংচু আমাদের পড়াবে আর আমাদের বাড়ীতে থেকেই নিজেও পড়বে।

শোভা নীরবেই শুনিল, কিন্তু মংচুর সম্বন্ধে কোনও রূপ আগ্রহই তাহার দেখা গেল না বা কোনও প্রশ্নও সে অখিলকে করিল না।

অখিলের সকল কথা তখনও শেষ হয় নাই। একটু থামিয়াই সে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল,—হ্যাঁরে, মংচুর প্যাচের কথা কি তখন তোকে বলেছিলুম? সেই যে—জিজিৎসুর প্যাচ—

শোভা এবার কহিল,—কই না ত! সে আবার কি?

অখিল কহিল,—সে একটা ভারি মজার কায়দা; এই ত তুই দাঁড়িয়ে আছিস, মংচু হঠাৎ তোর কাঁধটা ধরে একটু টিপলে, ব্যস—অমনি তুই একবারে চিৎপটান। যত বড়ই জোয়ান হোক না কেন, মংচুর পাল্লায় পড়লেই একবারে কুপোকাৎ। এইবার বিশে ডাকাতের যম এসেছে—জানলি?

শোভার বুকখানা এবার যেন দুলিয়া উঠিল। যতই তাহার অল্প বয়স হউক না কেন, এভাবে অখিলের মংচু নামক মানুষটির বাখ্যানা করিবার আসল কারণটুকু সে এতক্ষণে বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝিতে পারিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও আর বাহির হইল না। সঙ্গিনীটিকে নীরব দেখিয়াও অখিলের উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস

পাইল না, মংচুর সম্বন্ধে নানারূপ উচ্ছ্বাস ও তাহার সাহায্যে বিশে ডাকাতকে জব্দ করিবার বিবিধ আভাস প্রকাশ করিয়াই সে বাহিরের ঘরের দিকে চলিল।

আরাম-কেদারায় অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় আলবোলার নলটি মুখে দিয়া চন্দ্রনাথ বাবু যে ছেলেটির সহিত গল্প করিতেছিলেন, হঠাৎ তাহাকে দেখিলে বুঝিবার উপায় ছিল না যে, ছেলেটি বাঙ্গালী নহে—ব্রহ্মবাসী। বাঙ্গালীর মতই তাহার বেশভূষা, এমন কি মাথায় চুলের টেরীটি পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর রুচি অনুযায়ী কাটা। বাঙ্গালা কথাও তাহার ঠিক বাঙ্গালীর মত, যদিও উচ্চারণে একটু টান দেখা যায়, কিন্তু সে রকম টান বাঙ্গালার সুদূর পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের উচ্চারণেও থাকে। ছেলেটির আকৃতি বয়সের অনুপাতে যথেষ্ট খর্ব্ব, কিন্তু তাহা হইলেও প্রত্যেক অঙ্গটি তাহার নিটোল ও সুদৃঢ়। বৈষম্য তাহার চ্যাপটা মুখখানিতেই দেখা দিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহাতে সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না। মুখের তুলনায় চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র হইলেও, এত অধিক তীক্ষ্ণ যে, কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না। দৃষ্টি যেন চর্ম্মভেদ করিয়া মর্ম্মের ভিতর জোর করিয়া প্রবেশ করিতে ব্যগ্র। গায়ের রং ছেলেটির এত সুন্দর যে, অখিলের মত পরম সুন্দর ছেলেও তাহার পাশটিতে দাঁড়াইলে মনে হইবে যে, গায়ের রংয়ের দিক দিয়া অখিলই একমাত্র আদর্শ নহে—তাহার অনেক উপরেই মংচুর স্থান।

অখিল ঘরের ভিতর ঢুকিয়াই কহিল,- শোভা এসেছে।

চন্দ্রনাথ বাবু দ্বারের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন,—কইরে শোভা, আয়—এদিকে।

মংচু ঘরের দরজাটির দিকেই মুখ করিয়া বসিয়াছিল। শোভা ধীরে ধীরে লজ্জিত ভাবেই ঘরের ভিতর ঢুকিতেছিল। পরদার পাশ দিয়া চৌকাঠটি পার হইতেই সর্ব্বাগ্রে মংচুর সহিতই তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল এবং তাহার ফলে একটা ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়া সকলকেই বিচলিত করিয়া দিল।

মংচুর মুখখানার উপর শোভার দুইটি উৎসুক চক্ষুর পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়িবামাত্রই তাহার সমস্ত দেহখানা মোচড় দিয়া একটা ভয়াবহ স্মৃতি তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কের ভিতর ফুটিয়া উঠিল; পরক্ষণেই মংচুর দুই চক্ষুর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিও যেন সুস্পষ্ট ও সুপরিচিতের মত শোভাকে এক নিমেষে স্তব্ধ করিয়া দিল। এ মুখ, এ চেহারা, এই দৃষ্টি আর এই ভয়ঙ্কর মানুষটি ত তাহার অপরিচিত নহে, শোভা যে ইহাকে দেখিয়াছে—সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার রাত্রে স্বপ্নের ভিতরে এবং তাহার পর আরও কত রাত্রেই গভীর নিদ্রার ঘোরে এই মুখখানাই তাহার অন্তরে শিহরণ তুলিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তেই শোভার চক্ষুর উপর যেন ভাসিয়া উঠিল—সেই কালো ঘোড়ার গাড়ী, ভিতরে বন্দিনী অবস্থায় সে বসিয়া আছে, পার্শ্বে অখিল এবং সম্মুখে যে লোকটা ছোরা উঁচাইয়া বসিয়াছিল এবং শোভা চীৎকার করিতেই ছোরাখানা তাহার বুকে বসাইয়া দিয়াছিল, সেই লোকটা—ঐ—ঐ—ঘরের ভিতর চেয়ারখানির উপরে বসিয়া!

অমনই শোভার মাথাটা ঘুরিয়া গেল, একটা আর্ত্তস্বর কণ্ঠের ভিতর দিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা আর বাহির হইল না। সটান সম্মুখের দিকে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহখানা হেলিয়া পড়িল।

মংচু এই সময়টুকু বদ্ধ দৃষ্টিতেই এই অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে যে হঠাৎ বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে, মংচুই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল; সুতরাং সেই মুহূর্ত্তেই সে সবেগে আসিয়া শোভার পতনোন্মুখ দেহখানা দুই হাতে ধরিয়া ফেলিল এবং যে চেয়ারখানিতে সে বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহার উপরেই তাহাকে রাখিয়া অখিলের দিকে চাহিয়া কহিল,—পানি, জল্দি।

পিতা পুত্র উভয়েই তখন বিস্ময়ে অবাক! ঘরের ভিতরেই কোণের দিকে একটা কুজা ছিল, তাহার মাথায় একটা গেলাসও ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে দেখা গেল। অখিল সেইদিকে ছুটিল।

চন্দ্রনাথ বাবু গড়গড়ার নলটা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলেন,—হল কি? ফিট নাকি! ওর কি তাহলে ফিট হয়?

জোরে হাঁকিলেন,—বাহাদুর!

পাশের ঘরেই বাহাদুর ছিল; ছুটিয়া আসিয়া কহিল,—জী, হুজুর!

চন্দ্রনাথ বাবু হুকুম দিলেন,—পাখা করো জলদী!

কাছেই একখানা অতিকায় পাখা রাখা ছিল, সময়বিশেষে প্রভুর পরিচর্য্যায় বাহাদুরই ইহা ব্যবহার করিত। হুকুম পাইবামাত্রই বাহাদুর

দুইহাতে সজোরে সুবৃহৎ পাখাখানা হাঁকরাইতে আরম্ভ করিল।

মংচু অখিলের হাত হইতে জলের গেলাসটি লইয়া নিজেই শোভার চোখে ও মুখে আস্তে আস্তে জলের ছিটা দিল, কপালের শিরাগুলি সুকৌশলে দলিয়া দিয়া তাহার চৈতন্য সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ বাবু শোভার বাবাকে ডাকিয়া আনাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় শোভা দুই চক্ষু মেলিয়া চাহিল। পরক্ষণেই সে সোজা হইয়া বসিল এবং হাত দিয়া মংচুর হাতখানা তাহার মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিল।

চন্দ্রনাথ বাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—বাঁচা গেল।

তাহার পর শোভার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছিল রে? তোর বুঝি ফিটের ব্যায়রাম আছে?

শোভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না।

চন্দ্রনাথ বাবু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—তবে এ রকম হল কেন?

শোভা কহিল,—মাথাটা কেমন হঠাৎ ঘুরে গেল। আমি বাড়ীর ভেতর যাই—

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—না, এখন যেতে হবে না; চুপ করে বসে থাক্। বাহাদুর হাওয়া করুক খানিকক্ষণ।

মংচু এই সময় প্রশ্ন করিল,—এরই নাম বুঝি শোভা?

অখিল এই প্রশ্নটির উত্তর দিল; কহিল,—হাঁ।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—একেই তোমায় পড়াতে হবে, মংচু। স্কুল থেকে ওর নাম কাটিয়ে দেব। কিচ্ছু পড়াশোনা সেখানে হয় না, শুধু ডেঁপোমী শেখে।

শোভা নির্জ্জীবের মত চেয়ারখানির উপর বসিয়া কথাগুলি শুধু শুনিয়া যাইতে লাগিল। শরীরের এই অবস্থাতেও তাহার এই চিন্তাটি তালগোল পাকাইতেছিল যে, ইহাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদার সঙ্গে সম্পর্ক উঠিয়া গিয়াছে, এবার মংচু আসাতে পরির সঙ্গেও বুঝি দেখা সাক্ষাতের পাট উঠে।

এই সময় দরজার পরদাটি এক পাশে ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে সপ্রতিভভাবে প্রবেশ করিল রহিম। তাহার হাতে একখানি চিঠি। চিঠি শুদ্ধ হাতখানি তুলিয়া সে সসম্ভ্রমে চন্দ্রনাথ বাবুর উদ্দেশে অভিবাদন জানাইল।

চন্দ্রনাথ বাবু রহিমের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন, পরক্ষণেই রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কি খবর?

রহিম নিরুত্তরে অগ্রসর হইয়া চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিল। ইতিমধ্যেই অখিল পিতার চেয়ারখানির ঠিক পাশটিতে গিয়া তাঁহার কাণের কাছটিতে মুখখানি রাখিয়া চুপি চুপি জানাইয়া দিল,—এই ছেলেটার নাম রহিম, বিশুর বন্ধু।

চন্দ্রনাথ বাবু চিঠি হইতে চক্ষুর দৃষ্টিটুকু তুলিয়া আরও তীক্ষ্ণ করিয়া আর একবার পত্রবাহক ছেলেটির দিকে চাহিলেন। সে দৃষ্টির অর্থটুকু অদূরে চেয়ারখানায় আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া শোভা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিল।

চিঠি পড়িতে পড়িতে তাঁহার সুন্দর মুখখানা যেন একেবারে বদলাইয়া গেল। হাতের লেখা একখানা সাধারণ চিঠি, কিন্তু তাহাতে বিবৃত বিষয়টি অসাধারণ। চিঠিতে যথাবিহিত সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন করা হইয়াছে যে, আদর্শ বিদ্যালয়ের আদর্শ ছাত্র শ্রীমান বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সম্প্রতি যে লাঞ্ছনা করা হইয়াছে, তাহার ক্ষালনের জন্য আগামী রবিবার অপরাহ্নে আদর্শ বিদ্যালয়ে এক সভায় তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে। উক্ত বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, সেই সভায় মাননীয় ভূস্বামী শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বাবু যোগদান করিলে অনুষ্ঠাতৃগণ যার পর নাই আনন্দিত হইবে। অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে যে কয়টি নাম লেখা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে রহিম আলি চৌধুরীর নামটিও অন্যতম।

চন্দ্রনাথ বাবু অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া রহিমের দিকে পুনরায় চাহিলেন। দেখিলেন, ছেলেটির মুখে ভয় বা সঙ্কোচের চিহ্ন মাত্রও নাই। প্রায় ধমকাইবার ভাবেই তিনি উদ্ধত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কারা এ সব করছে?

রহিম বিনীত ভাবে উত্তর দিল,—আজ্ঞে আমরাই।

—কে করতে বলেছে?

—আমাদের বিবেক, স্যার।

এই উত্তর শুনিয়াই চন্দ্রনাথ বাবু যেন জ্বলিয়া উঠিলেন। একটা কি কঠোর কথাই বলিতে

যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা হঠাৎ চাপিয়া পরক্ষণেই কহিলেন,—তাহলে বিবেককে বুঝিয়ে দাও—এ সব হবে না।

—কেন, স্যার?

—আমার ইচ্ছা, আমার হুকুম।

রহিম স্যারের নির্দ্দেশটুকু শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া ধীর অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল,—কিন্তু বিবেক যে বাধা মানে না, স্যার!

চন্দ্রনাথ বাবু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন,—কি বল্‌লে?

রহিম কহিল,—আমি বলছি, স্যার, অন্যায় যদি হয়, বুঝিয়ে দিলে বিবেক শোনে; কিন্তু যেটা অন্যায় নয় ঠিক, হাজার বাধা দিলেও বিবেক তা গ্রাহ্য করে না; যা ধরে, তা করেই।

চন্দ্রনাথ বাবু স্তব্ধ হইয়া পুনরায় পূর্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিলেন এবং সে দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক যেন তন্ন তন্ন করিয়াই দেখিয়া লইলেন। তাঁহার মত রাসভারি লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারই ছেলের বয়সী এই ছোকরা এইরূপ স্পর্দ্ধার কথা কহিতে সাহস পায়;—তাহার মুখে ভয় বা ভাবনার চিহ্ন মাত্রও নাই। আদালতের প্রাঙ্গণে কিছুদিন পূর্ব্বে এই ছেলেটির পিতার প্রতিভাদৃপ্ত মুখখানা ও সেই মুখের স্পষ্ট কথা চন্দ্রনাথ বাবুর স্মৃতিপথে সহসা ভাসিয়া উঠিল;—পিতাপুত্রে কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

এ চিন্তা ক্ষণিকের, ইহার পরেই যেন বোমা ফাটিয়া গেল। কণ্ঠের স্বর উচ্চ পরদায় চড়াইয়া তিনি এবার তর্জ্জনের ভঙ্গীতেই কহিলেন,—চোপরাও বেয়াদপ; ভারি যে মুখের দৌড় দেখছি।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবুর তর্জ্জনে রহিমের ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিল এবং অবিচলিত কণ্ঠেই সে কহিল, আপনি আমার বাবার বয়সী, স্যার, বাপ যদি ধমকায়, ছেলের তাতে রাগ করা উচিত নয়। কিন্তু যেটা অন্যায় নয়, হাজার ধমকালেও ছেলেরা তা থেকে পেছোয় না। ছেলেদের মন নিয়ে ছেলেদের কথা বিচার করতে হয়, স্যার, আপনিও একদিন ছেলে ছিলেন।

চন্দ্রনাথ বাবু কহিলেন,—ছিলুম কিন্তু আমরা ছেলেই ছিলুম, এ রকম এঁচোড়ে পাকিনি। আমরা ছেলে বয়েসে এই ধরণের কথা বলা ত পরের কথা, ভাবতেও পারিনি।

রহিম ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—কিন্তু স্যার, পঞ্চাশ বছর আগে দেশের যে অবস্থা ছিল, এখনও কি তাই আছে, স্যার? সভা আমাদের হবেই, তবে আপনার পায়ের ধুলো সেখানে পড়লে ছেলেদের উৎসাহ আরো বাড়বে। তা ছাড়া আপনি হচ্ছেন জমিদার, আপনাকে না জানিয়ে কিছু করা উচিত নয়, সেই জন্যই আসা। তাহলে আসি, স্যার।

যে ভাবে আসিয়াই সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইয়াছিল, পুনরায় সেইরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ বাবু অভিভূতের মতই কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। ছেলেটির আকৃতি, আশ্চর্য্যরকম ধীরতার সহিত কথা বলিবার ভঙ্গী এবং প্রতি কথার ভিতর অকাট্য যুক্তি—সত্যই কি তাঁহার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল? অতীত পঞ্চাশ বৎসরের স্মৃতি ত নানা দিক দিয়াই তাঁহার চক্ষুর উপর জল জল করিতেছে। কত পরিবর্ত্তন, কত সংস্কার প্রগতির পথে কত অঘটনই ঘটাইয়াছে;—কিন্তু পিছনে যাহা ফেলিয়া আসিয়াছেন, আজও কি সেই অবস্থায়ই তাহারা রহিয়াছে! প্রগতির গতি কি শুধু বহির্জ্জগতে, অন্তর্জ্জগতেও কি তাহার দোলা লাগে নাই?

২৬

পরদিন আর শোভার স্কুলে যাওয়া হইল না। স্কুলে যাইবে বলিয়াই সে যথা সময় খাওয়ার পাট সারিয়া লইল; কিন্তু তাহার পরই হঠাৎ সে মাথা ধরাইয়া বসিল। মাকে কহিল,—মাথাটা কি রকম করছে মা, আজ আর ইস্কুলে যাব না।

বাহিরের ঘরে আগের দিন মেয়ে যে কাণ্ড বাধাইয়াছিল, তাহার ভাবনা মায়ের মন হইতে এখনও মুছে নাই; সর্ব্বদাই ভয় হইতেছিল, পাছে ইহা হইতে ফিটের ব্যামো দেখা দেয়। আজ মেয়ের মুখে পুনরায় মাথা কেমন করিতেছে শুনিয়া তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ মেয়ের কথায় সায় দিয়া কহিলেন,—কাজ নেই গিয়ে, চুপটি করে ঘরে শুয়ে থাকো, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

শোভা কহিল,—তাই যাচ্ছি মা। আমাকে যেন ডেকো না।

নিজের ঘরে গিয়াই শোভা দরজা বন্ধ করিল,

ভিতর হইতে খিলটিও আঁটিয়া দিল। তাহার পর বাঁধানো বইখানা পড়িয়া মাথার কাজ আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব হইতেই সে মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিয়াছিল, আজ স্কুল কামাই করিয়া পরিয় করমাগুলি সে শেষ করিয়া ফেলিবে। কালই সেটি লইয়া তাহার হাতে দিবে।

ঘণ্টা খানেক পরে অখিল আসিল শোভাকে ডাকিতে। সে শুনিয়াছিল, শোভা আজ স্কুল কামাই করিয়াছে। শোভার মা অখিলকে দেখিয়াই কহিলেন,—তার ভারি মাথা ধরেছে, বাবা, তাই ঘুমুচ্ছে; এখন আর তুলো না। আমি ত ভেবেই সারা হচ্ছি—এ থেকে না আর কিছু হয়।

অখিল বিমর্ষ ভাবেই ফিরিয়া গেল। অনেকগুলি নূতন খবর সংগ্রহ করিয়াই সে আসিয়াছিল, তাহা আর তাহাকে শুনানো হইল না।

প্রায় ছয়ঘণ্টা খাটিয়া একখানা পুরা খাতার কাগজগুলি নষ্ট করিয়া অবশেষে শোভা বিশুদাকে অভিনন্দন দিবার একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। ইহার ফল আর কিছু না হউক, একটি দিনের এই সাধনায় পাঠস্পৃহাটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। স্কুলের বই ছাড়াও যে পড়িবার মত বই আছে এবং সেই সকল বইয়ের ভিতর কত রহস্যই লুকানো আছে, এই দিন হইতে সে বুঝি তাহার সন্ধান পাইল।

বৈকালে সে যখন খিল খুলিয়া বাহির হইল, মা কহিলেন,—মুখখানা যে একেবারে শুখিয়ে গেছে রে! কেমন আছিস্ এখন?

শোভা কহিল,—মাথা ছেড়ে গেছে, মা, বড্ড খিদে পেয়েছে এখন।

মা কহিলেন,—পাবে না আর! কোন্ সকালে দুটি হাতে মুখে করেছিস,—আয়।

খানিক পরেই অখিল আসিয়া উপস্থিত। কহিল,—ছাদের ওপর চল, অনেক কথা আছে।

যে কথাগুলি খুব আড়ম্বর করিয়া অখিল শোভাকে শুনাইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহার বাবা কিছুতেই সভা করিতে দিবেন না। স্কুলের মাষ্টারকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে ধমকাইয়া দিবেন, তিনি যাহাতে মাথা না দেন। আর মংচুকে বলিয়া দিয়াছেন যে, বিশে ডাকাত একটু বাড়াবাড়ি করিলেই যেন তাহাকে সায়েস্তা করিয়া দেয়। শোভাকেও শীঘ্রই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আনা হইবে। মংচুই তাহাকে পড়াইবে।

শোভা চুপ করিয়া অখিলের খবরগুলি শুনিল। আর কোনও বিষয়ে সে কোন কথাই কহিল না, কিন্তু মংচুর কাছে তাহার পড়িবার কথা শুনিবামাত্রই সে ফোঁস করিয়া উঠিল। তীব্র আপত্তির ভঙ্গীতে কহিল,—বয়ে গেছে আমার ওর কাছে পড়তে।

অখিল মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—পড়্‌ব না বললেই হল আর কি। বাবা বলেছেন—পড়তে হবে।

শোভা কহিল,—পড়তে হয় আমি নিজে নিজেই পড়বো, তা বলে তোমার কচু-ঘেঁচুর কাছে গিয়ে পড়বো না, এ আমি বলে রাখছি।

অখিল কহিল,—বাবার কথাও তাহলে শুনবিনি বল?

আমি জানি না—বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। হঠাৎ উঠানটির দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, প্রাচীরটা আরও হাত দুই উঁচু হইয়া উঠিয়াছে দেখা গেল। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটা চাপা নিশ্বাস এতক্ষণে সশব্দে নির্গত হইয়া গেল। ইহার পরেই ম্লান মুখখানা তুলিয়া সোজাসুজি সম্মুখের দিকে চাহিতেই সে চমকিয়া উঠিল! ওকি,—তাহার বিশুদা যে ঠিক সেই জায়গাটিতে সেই দিনের মত দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আজ তাহার মুখ ও চক্ষু দিয়া সেদিনের মত উৎসাহ ত ফুটিয়া উঠে নাই, তবে কি উঠানের পাঁচীলটা তাহারও মুখের হাসি, মনের উৎসাহ সমস্তই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে! আজ যেন মনে হইতেছে একটা নিষ্প্রাণ পুতুল ওপারের খোলা বারান্দাটির উপর শুধু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

অখিলের তীক্ষ্ণস্বরে তাহার মনের এই চিন্তাটুকু সহসা ভাঙ্গিয়া গেল।

—চুলেয় দশাই সমান; কিন্তু আর দুটো দিন, তার পরই জেলখানা।

মুখখানা সবেগে ঘুরাইয়া সে অখিলের দিকে চাহিল; অখিলের মনে হইল, শোভার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুনের কণা ঠিকরাইয়া আসিতেছে।

সে হাসিয়া কহিল,—বাপরে—যেন আকাশের ষ্টার।

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল্ ষ্টার,
হাউ আই ওয়াণ্ডার হোয়াট্'ইউ আর।

শোভা মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিল,—সঙ!

অখিল পূর্ব্ববৎ হাসিয়া কহিল,—ঐ ভাখ, আমার আবৃত্তি শুনেই বিশে ডাকাত ভেগেছে।

শোভা চাহিয়া দেখিল, সত্যই সম্মুখের বারান্দা শূন্য, চিহ্নও সেখানে নাই।

পরদিন বিদ্যালয়ে দেখা হইতেই পরি জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছিল রে তোর? দাদার মুখে শুনলুম, তুই রুগীর মত একখানা চেয়ারে পড়েছিলি। অসুখ করেছিল?

শোভা তাহাকে সব কথাই খুলিয়া বলিল, মংচুর কথাও বাদ পড়িল না। পূর্ব্বেই সে স্বপ্নের কথা তাহার প্রিয় সখীটির নিকট একদিন আর্দ্রকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিল; আজ তাহাকে শুনাইয়া দিল— স্বপ্নের দেখা সেই দস্যি ছেলেটাই ঐ মংচু। মাগো! তাহাকে দেখিয়াই যে তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

পরি কহিল,—দাদাও তাকে দেখে এসেছে। যতক্ষণ দাদা সেখানে ছিল, তোর অখিলদা তাকে ফিস্ ফিস্ করে কি বলে, তার পরই দাদার দিকে তোর ঐ মংচুর কি কটমট করে চাউনি। দাদা বললে, ছেলেটা পাজী। তুই কিন্তু ওর সঙ্গে মিশিসনি, খুব সাবধানে থাকিস্।

শোভার বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি কহিল,—তবে বলি শোন্ ভাই, অখিলদা সব কথা ঐ লোকটার সম্বন্ধে বলেছে।

অতঃপর শোভা মংচুর সম্বন্ধে অখিলের নিকট এ পর্য্যন্ত যাহা শুনিয়াছিল, একটি একটি করিয়া সমস্তই বলি। ফেলিল।

পরি হাসিয়া কহিল,—বুঝিছি, অখিলের বাবা ঐ মংচুটাকে আনিয়েছে ছেলের বডি গার্ড করে রাখতে। লোকে যেমন দরোয়ান রাখে, ডালকুত্তা পোষে, এও তাই।

শোভা কহিল,—এবার ওরা আমাকে নিয়ে পড়েছে, ভাই। বলাবলি আরম্ভ করেছে, স্কুলে গিয়ে আর কাজ নেই, মংচু বাড়ীতেই পড়াবে। আমি বলিছি, কিছুতেই ওর কাছে পড়বো না।

পরি কহিল,—সত্যি, এতে রাগ হবারই কথা। কিন্তু রাগ করেই বা করবি কি বল?

শোভার দুই চক্ষু ছল ছল হইয়া আসিল। কাঁদিবার মত হইয়াই সে কহিল,—বিশুদার সঙ্গে মেলামেশার পথে ওরা কাঁটা দিয়েছে, এর পর তোর সঙ্গেও যাতে আর দেখা না হয়, তাই এ রাস্তাও বন্ধ করে দিচ্ছে। কি করে আমি থাকবো ভাই?

পরি কহিল,—সবই ঈশ্বরের হাত, ভাই! তাঁকে ডাক; উপায় তিনিই করে দেবেন।

টিফিনের ছুটির সময় আবার সাক্ষাৎ হইলে পরি প্রথমেই লেখার কথা পাড়িয়া কহিল,— কি হল, এনেছিস লিখে?

শোভা তাহার হাতের বড় বড় আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা কাগজ কখানা পরির হাতে দিয়া কহিল,—লিখিছি, কিন্তু ছাই হয়েছে।

পরি এক নিঃশ্বাসে লেখাটি পড়িয়া কহিল,— ছাই হবে কেন, খাসা হয়েছে; বাঃ! এখন মনে হচ্ছে, কুসুমও এমন করে প্রাণের কথা লিখতে পারত না।

শোভা কহিল,—বুঝিছি, ঠাট্টা হচ্ছে।

পরি কহিল,—ও বদ অভ্যেস আমার নেই, ভাই! আমার বাবা বলেন, কারুর কাজে কখনো ঠাট্টা করতে নেই; ক্ষমতা থাকে উৎসাহ দিয়ো, শুধরে দিও, কিন্তু উপহাস করে কখনো দমিয়ে দিয়ো না।

শোভা কহিল,—তাহলে বাঁচলুম ভাই, যা করবার তুই করিস।

পরি কহিল,—এটা আমার কাছে আজ থাক। দেখে শুনে কাল তোকে ফিরিয়ে দেব। তারপর তুই ভালো করে লিখে শনিবারের ভেতরে আমাকে ফিরিয়ে দিবি।

শোভা কহিল,—সভা তাহলে ঐ দিনই হচ্ছে?

পরি কহিল,—হবে না? দাদা যে এর মধ্যেই সব ঠিক ঠাক করে ফেলেছে, কেন, তুই ত সবই শুনছিস্।

শোভা কহিল,—কিন্তু ভাই কাল অখিলদা আমাকে ডেকে বলছিল যে, ওর বাবা কিছুতেই এ সভা করতে দেবে না। মাষ্টারকেও নাকি ডেকে মানা করে দেবে।

পরি কহিল,—দেবে কি, দিয়েছিল। কিন্তু মাষ্টার তাতে কাণ দেয় নি। সভা বন্ধ করবার অনেক চেষ্টাই উনি করেছেন, আর এখনও করছেন, কিন্তু মাষ্টার মশায়েরও রোখ চেপে গেছে; তিনি বলেছেন, সভা হবেই।

সত্যই, এই সভাটি বন্ধ করিবার জন্য চন্দ্রনাথ বাবু নানাপ্রকার চেষ্টা ও উদ্যোগ আয়োজন

করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার যাবতীয় প্রয়াসই ব্যর্থ হইয়া গেল।

প্রধান শিক্ষককে ডাকাইয়া, তিনি হাকিমী মেজাজে হুমকী দিয়াছিলেন। কিন্তু শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে সেবার বিদ্যালয়ে পুলিসের ঘাঁটী বসাইয়া যে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উক্ত বিদ্যালয়ে এই সভা বসাইবার প্রয়োজন হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বাবু ইহার প্রতিবাদে আইনের দিক দিয়া নানাবিধ ভীতিজনক নির্দ্দেশ দিলেন, আয়ের পথ রুদ্ধ করিবার আভাস জানাইলেন, এমন কি বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া দিবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত দেখাইলেন, কিন্তু প্রধান শিক্ষক শেষ পর্য্যন্ত অটল রহিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ বাবুকে দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিলেন,—আদালতের আবহাওয়া আপনার মনোবৃত্তিকে বিকৃত ও দূষিত করেছে বলেই আপনি আইনের সাহায্য নিয়ে শিক্ষায়তনের ওপর আপনার কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করতে ব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বর্ত্তমানের রুচি ও আদর্শ-বিরোধী কর্ত্তৃত্ব প্রকাশের চেষ্টা না করে, এই আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির সংস্রব ত্যাগ করে আপনার পক্ষে আইনের ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করাই উচিত।

পত্র পুষ্পে সুশোভিত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে নির্দ্দিষ্ট দিনেই সভার অধিবেশন হইল। বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই ছাত্রসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, বাহির-আনন্দপুরের মুসলমানগণও হাতে খড়ি দিয়া এই বিদ্যালয়ে নাম লিখাইয়াছে। বিশুর সম্বর্দ্ধনা-উৎসবে ইহাদের উৎসাহই বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য।

বিশুকে উপহার দিবার জন্য পূর্ব্বেই বাহির-আনন্দপুরের মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে চুপি চুপি এক আলোচনা-বৈঠক বসে এবং তাহাতে সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, এ অঞ্চলের প্রত্যেক পড়ুয়া সভার দিন বিশুকে কিছু না কিছু উপহার দিবে।

সভার প্রাক্কালে সকলেই দেখিল, বিবিধ উপহার-দ্রব্যে সভাপতির সম্মুখের টেবিলখানি ভরিয়া গিয়াছে। নানা রকমের জামা, রুমাল, কত প্রকার বই, সুন্দর সুন্দর মসীপাত্র, কলমদানী, ঘড়ি প্রভৃতি উপহার-সামগ্রীর পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে রহমান আলি এমন কতকগুলি মূল্যবান অথচ ছাত্র জীবনে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠাইয়াছিলেন, এ অঞ্চলে যাহা এ পর্য্যন্ত পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই।

রহিম এই অনুষ্ঠানটির নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, আরও কতিপয় ছাত্র তাহাকেই সাহচর্য্য করিতেছিল। সম্বর্দ্ধনা বিশুর, সুতরাং তাহাকে এ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। আনন্দপুর ও বাহির-আনন্দপুরের প্রত্যেক অভিভাবক-স্থানীয় ব্যক্তিকেই সভায় যোগ দিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, সন্নিহিত গ্রামগুলির বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আহূত হইয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণে এইটুকু বৈশিষ্ট্য ছিল যে, নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপানো হয় নাই, ছেলেরাই হাতে লিখিয়া বিলি করিয়াছিল। ফলতঃ এই অনুষ্ঠানটিকে উপলক্ষ করিয়া এই অঞ্চলে রীতিমত চাঞ্চল্যই উপস্থিত হইয়াছিল।

কিন্তু যে নিয়মে সাধারণ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, এক্ষেত্রে সেরূপ কিছু হইল না। প্রধান শিক্ষক মহাশয় জানাইলেন,—বাহ্যাড়ম্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, যে জন্য এই অনুষ্ঠান, তাহাই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা চাই। সুতরাং সভাপতি নির্ব্বাচন, একজনের প্রস্তাব ও সেই সূত্রে তাঁহার বক্তৃতা, আর একজনের তাহা সমর্থন করিতে উঠিয়া তাঁহারও কতকগুলি কথা শুনাইয়া দেওয়া—সভায় এ সকল কিছুই হইল না। এমন কি, পরির যে কবিতা পড়িবার কথা ছিল এবং শোভার লিখিত বাণীটি পড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, শিক্ষক মহাশয় সে সমস্তই বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়া দিলেন, এ সকলের কিছুই প্রয়োজন নাই। ছেলেদের স্কুলের সভায় কোনও মেয়ের যোগ না দেওয়াই উচিত। তাহাতে লোকে আলোচনার হেতু পাইবে। মনে মনে সহানুভূতি থাকিলেই হইল, সভায় আসিয়া তাহা জানাইবার কি দরকার। বিশেষতঃ যখন একটা বিরোধী দল রহিয়াছে।

প্রধান শিক্ষকের কথাটা কাহারও কাহারও মনে লাগে নাই, কিন্তু তাঁহার কথা উপেক্ষা করিবার সাহস কাহারও ছিল না। শেষে ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, পরির লেখা কবিতাটি রহিমই আবৃত্তি করিবে। কিন্তু পরি সভায় আসিতে পারিবে না।

সভা আরম্ভ হইতেই প্রধান শিক্ষক মহাশয় উঠিয়া যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটি দিলেন, তাহাতেই সভার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবেই সিদ্ধ ও সার্থক হইল।

তিনি বিশুর মামলার বিবরণটি তুলিয়া এবং উক্ত মামলার বিচারকের সুদীর্ঘ রায়টি বিশ্লেষণ করিয়া এমনভাবে তাহার সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, সাহস ও দৃঢ়তা সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, সমবেত ব্যক্তিরা সমস্বরেই তাহাতে বিপুল হর্ষ প্রকাশ না করিয়া পারিল না। ইহার পরেই তিনি তুলিলেন, রহিমের কথা; একদিন এই দুইটি ছেলে পরস্পর কিরূপ প্রতিযোগী ছিল, আবার বিশুর বিপদের সময় অতীতের সমস্ত কথা ভুলিয়া কিরূপ আন্তরিকতার সহিত এই ভিন্ন জাতীয় ছেলেটি বিশুকে আপনার ভাইটির মত পার্শ্বে টানিয়া লইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি সমবেত হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদিগকে কহিলেন, তোমরাও এই সদ্ভাব ও ঐক্যের আদর্শ গ্রহণ কর। বিশুর পাশে রহিম দাঁড়াইয়াছিল বলিয়াই বিশুর শত্রু পক্ষ শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে কাবু করিতে পারে নাই। তোমরাও যদি বিশু-রহিমের মত একতায় বদ্ধ হতে পার, একের বিপদে নিজেকেও বিপন্ন মনে করে তার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পার, কেউ কখনো তোমাদের হারাতে পারবে না।

সকলে করতালি দিয়া প্রধান শিক্ষকের কথাগুলির সমর্থন করিল।

ইহার পর রহিম পরির লেখা ছোট একটি কবিতা পড়িল। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের মিলনের সুর যেন কবিতাটির প্রতি ছত্রেই ঝঙ্কার দিল। কবিতাটি প্রত্যেক শ্রোতার প্রাণস্পর্শ করিল।

কবিতাটি পড়িবার পর প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের আদেশে রহিম অল্প কথায় বিশুর সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলিল। তাহার কথাগুলি যেন স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়া দিল, সত্যই সে বিশুকে কত ভালবাসে এবং জাতি ও ধর্ম্মের দিক দিয়া ভিন্ন হইলেও সহপাঠী, প্রতিবেশী ও মানবতার দিক দিয়া তাহাদের সম্প্রীতি কত নিবিড়। সত্যকার স্নেহ, প্রাণের দরদ, মনের ইচ্ছা দিয়া যাহাকে ভালবাসা যায়, সে ভালবাসা কি কেহ ভাঙ্গিতে পারে?

আর কতিপয় ছাত্র আদর্শ বিদ্যালয়ের এই দুইটি আদর্শ ছাত্রের গুণকীর্ত্তন করিয়া কিছু কিছু বলিল। বাহিরের দুই চারিজনও এই অনুষ্ঠানটির সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিলেন।

অবশেষে প্রধান শিক্ষক বিশুকে প্রদত্ত উপহার-সামগ্রীগুলি প্রেরকের নাম উল্লেখ করিয়া তাহাকে অর্পণ করিলেন।

শত কণ্ঠে আবার হর্ষধ্বনি উঠিল, বিপুল করতালির শব্দে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইল।

সভা ভঙ্গের পর ছেলের দল মিছিল করিয়া বিশুকে বড় রাস্তার উপর দিয়া বাহির আনন্দপুরে লইয়া চলিল। কলকণ্ঠের বিপুল উচ্ছ্বাসে সারা পথে আনন্দের প্রবাহ বহিল।

রহিমদের বহির্ব্বাটী ও তাহার সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণটি পত্র-পতাকায় সুশোভিত হইয়াছিল। ওয়ারিস ওস্তাগর ছেলেদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। নানাপ্রকারে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করা হইল।

ওয়ারিস ওস্তাগর অতঃপর ছেলেদিগকে লক্ষ্য করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে যে কথাগুলি বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, রহিমের বাবা কাজের ভীড়ে আজ এখানে হাজির হতে পারেন নি, তবে এই গরীবের ওপর তিনি একটা ভার চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা এই যে, তাঁর দর্জ্জিখানায় আজ যখন স্কুলের ছেলেরা সকলেই এসেছে, যাবার সময় সবাইকে তাঁরই দর্জ্জিখানা থেকে তৈরী জামা গায়ে দিয়ে বেরুতে হবে; তাহলেই তিনি খুসী হবেন, আমিও সুখী হব।

দর্জ্জিখানার উপর নূতন প্রস্তুত বিভিন্ন মাপের প্রচুর পরিমাণ জামা প্রস্তুত ছিল। দর্জ্জীরাও সকলে ওয়ারিস ওস্তাগরের আদেশে মোতায়েন ছিল। অতঃপর প্রত্যেক ছেলেকে সাদরে আহ্বান করিয়া জামা পরানো ব্যাপার সুরু হইয়া গেল। ছোট ছোট ছেলেগুলির পরমানন্দে নির্ব্বাচন-সূত্রে কোলাহল এবং ওস্তাগরের তুষ্টি বিধানে তৎপরতা, সে এক হুলস্থুল কাণ্ড।

এই অবসরে রহিম বিশুকে লইয়া তাহাদের পড়িবার ঘরখানির ভিতর ঢুকিল। সেখানে পরি তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার হাতে একখানা লেখা কাগজ।

বিশু কহিল,—আমার বোন নেই, কিন্তু রহিমকে পেয়ে তার দৌলতে আমার বোনের অভাব মিটেছে।

পরি হাসিমুখে কহিল,—তাই বুঝি তোমার আছে, বিশুদা?

বিশু কহিল,—নেই? দেখতে পাচ্ছ না?

পরি কহিল,—তাহলে আমারই ভুল হয়েছে।

তোমার কথাটার ভুল ধরতে গিয়ে নিজেই ভুল করেছি।

বিশু কহিল,—তাই যে আমি আগেই পেয়েছি, তাই বোনের কথাই বলেছি। কিন্তু বোন হলে কি এমনি বোঝাই চাপাতে হয়? কি করে এ সব শোধ দেব তা ত ভেবে পাইনে।

রহিম কহিল,—পরির বিয়ের সময় ঠিক ভাইটির মত এসেই খেটে দিও, তাহলে সব রোক শোধ হবে।

পরি কহিল,—তার অনেক দেরী আছে, নিজের কথাটাই ত বললে পারতে। যাক, এখন এ সব কথা থাক, যে জন্তে তোমাকে ডেকে আনা হয়েছে, তাই বলছি শোনো। আজ তোমাকে অনেকেই অনেক রকম উপহার দিয়েছে বিশুদা, কিন্তু আর একটি মেয়ে আমার হাত দিয়ে যে উপহারটি তোমাকে দেবার জন্তে পাঠিয়েছে, আমার বিবেচনায় সেটিই সবার সেরা, তার দাম হয় না; দেখ্‌লে তোমাকেও এই কথা মানতে হবে।

বিশু একটু বিস্মিত হইয়াই কহিল,—কে?

পরি হাসিমুখে কহিল,—হাতে পাঁজী মঙ্গলবার কেন,—পড়েই দেখনা—কে?

বলিয়াই কাগজখানি পরি বিশুর হাতে অতি সন্তর্পণে অর্পণ করিল।

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিশু পড়িল,—

"বিশুদা।

দুই পক্ষে যুদ্ধ হতে হতে এক পক্ষ যখন হেরে যায়, তখন তার শেষ রক্ষার একমাত্র উপায় আত্মসমর্পণ। তোমার সঙ্গে যে ঝগড়া আমার হয়েছিল, আমি সব দিক দিয়েই হেরে গেছি; আজ গ্রামশুদ্ধ সকলেই তোমার সম্বর্দ্ধনা করছে, কত জনে কত রকম উপহার দিচ্ছে। আমি আজ বন্দিনী—আমাদের সামনে মানুষের গড়া পাঁচীল উঠেছে। শুনিছি আত্মাকে কেউ ধরে রাখিতে পারে না। তোমার এই জয়ের দিনে—হে বিজয়ী, তোমার পরাজিত সখী সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার চরণে আত্মসমর্পণ করছে।"

পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুর আবর্ত্তে বিশুর মুখখানি ভাসিয়া গেল। তাহার মনে হইল—বাড়ীর মধ্যে দুই মহলের মধ্যে উচ্চ পাচীর কিন্তু তাহাতে মিলনের পথ বন্ধ হয় নাই—পাচীরের উপর মুখোমুখী পাশ দুটি ছায়া-মূর্ত্তি—একটি শিশু, অস্ফুটি শোভা।

ভাই-বোন

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাই-বোন

১

একটু অসময়ে সেদিন অপরাহ্ণের দিকে প্রফেসর সেনের বাংলোর সামনে একখানি নতুন মোটর এসে দাঁড়াতেই উর্দীপরা সোফার নিজেই তাড়াতাড়ি তার স্থান থেকে নেমে এসে গাড়ীর দরোজা খুলে দিল। গাড়ীর মালিক স্বয়ং প্রফেসর সুব্রত সেন অত্যন্ত উৎফুল্ল মুখে মোটর থেকে নামলেন।

সোফার সেলাম করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো তাঁর মুখের দিকে। সহাস্যে প্রফেসর সেন বললেন: মেয়েদের একটু ঘুরিয়ে আনতে হবে—তারপর তোমার ছুটি।

মাথা নীচু করে সোফার সেলাম করে তার সম্মতি জানালো; প্রফেসরও অত্যধিক উল্লাসে এক রকম ছুটতে ছুটতেই সামনের লন দিয়ে বাংলোর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

তখনো চারটে বাজেনি। অন্যান্য দিন সাড়ে চারটে আন্দাজ প্রফেসর ভাড়াটে টাঙায় সাধারণতঃ কলেজ থেকে বাড়ী ফেরেন; সঙ্গে থাকে তাঁর অনূঢ়া ভগিনী তরুণী অলকা। সেও কলেজের ছাত্রী; দাদার সঙ্গে কলেজে যায় এবং ছুটির পর এক সঙ্গেই বাড়ী ফেরে। কাশী সহরে ভেলুপুরা অঞ্চলে প্রফেসরের এই বাংলো; এখান থেকে নাগোয়া হিন্দু ইউনিভারসিটির দূরত্ব প্রায় তিন মাইলের কাছাকাছি। কাজেই দুই বেলা ভাই-বোন ভাড়াটে টাঙায় যাতায়াত করেন।

কি একটা পরিবর্ত্তনের জন্য এদিন অলকাদের ক্লাস বন্ধ থাকায়, প্রফেসর একাই গিয়েছিলেন ভাড়াটে টাঙায়, কিন্তু ফিরে এলেন সদ্যঃ ক্রীত একখানা আনকোরা নতুন বিলিতী মোটরে। পল্লীর যে অঞ্চলে প্রফেসরের এই বাংলোখানি, সে স্থানটি জনবিরল, নিকটে কোন বসতি নেই, কাজেই এই অভিনব ব্যাপারটি প্রতিবাসীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করল না।

প্রফেসর-গৃহিণী সুনন্দা নিশ্চিন্ত মনেই গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। এই মাত্র ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেছেন চারটে বাজতে এখনো মিনিট দশেক প্রায় বাকী; সুতরাং স্বামীর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করবার এখনো সময় হয় নি। সংসারের যাবতীয় কাজ, এমন কি দু-বেলার রান্না-বান্না ও জলখাবার পর্য্যন্ত সবই সুনন্দাকে সম্পন্ন করিতে হয়। অবিশ্যি, এজন্যে তাঁকে যে বাধ্য করা হয়েছে—এ কথাও বলা যায় না; সুনন্দাই বরং সাধ করে হাসিমুখে ও প্রসন্নচিত্তে সংসারটি শৃঙ্খলার সঙ্গে চালাবার ভার মাথায় করে নিয়েছেন। একটি ঠিকে ঝি দু-বেলা এসে বাসন মাজা, কয়লা ভাঙা, কাপড় চোপড় কেচে দেওয়া—এমনি নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কাজ করে দিয়ে যায়। আর সব কাজ তিনি নিজের হাতেই করেন এবং যখনই স্বামী রান্নার জন্যে একজন পাচক কিম্বা সর্ব্বক্ষণের জন্যে মাইনে করা বাঁধা চাকরের কথা তোলেন, সুনন্দা অমনি মুখখানা ভার করে প্রতিবাদের সুরে জিজ্ঞাসা করেন: তোমাদের ভাই-বোনের সেবা পরিচর্য্যার কোন অসুবিধা হোচ্ছে বলতে পার?

প্রফেসর অপ্রস্তুতের মত হয়ে বলেন: না, না, সে কথা কি বলছি আমি! তোমার ব্যবস্থায় এমন কোন ফাঁক বা খুঁত কোথাও কখনো দেখিছি বলে ত মনে হয় না—যেন কলের মত সব চালিয়ে যাও। সেই জন্যেই ত তোমার কষ্ট লাঘবের জন্যে লোক রাখবার কথা বলি।

সুনন্দাও সঙ্গে সঙ্গে বলেন: তাহলে আর লোক রাখবার কথা ব'ল না কোনদিন। যেদিন দেখবে অসুবিধা হয়েছে, আমি আর পারছিনে, তখন যত ইচ্ছে হয় লোক রেখ। তিনটি প্রাণী নিয়ে যে সংসার, আরও যেখানে ওজন করে মাপা, বাড়ীর গিন্নী সেখানে কি করবে বল ত? তোমরা ত ভাই-বোনে সর্ব্বক্ষণ বই নিয়ে থাক, আমি কি নিয়ে থাকব? বিদ্যে নেই যে বই পড়ি; আর বই পড়লেও, এ সংসারের কাজ আবার গায়ে লাগে নাকি? ফের যদি লোক

রাখবার কথা বলবে, তাহলে ঠিকে ঝি মাগীকে পর্যন্ত সরিয়ে দেব, তা বলে রাখছি।

এর পর প্রফেসর স্বামী আর কি বলেন? সত্যই ভাই-বোনে তাঁরা যে রকম বে-হিসিবি মানুষ, তাতে সুনন্দার মত হিসিবি মেয়ের হাতে সংসার না থাকলে মাসিক দুশো টাকা বাঁধা আয়ে পারতেন তিনি এমনি করে সচ্ছল ভাবে সংসার চালাতে? নিজেই ত তিনি রীতিমত খোস মেজাজী, খোস পোষাকী এবং ভোজন-বিলাসী: বাইরে মেজাজ দেখাবার জন্তে অহেতুকী ব্যয়ও যে কত, তার ঠিক-ঠিকানা নেই; সবার ওপর ভগিনী অলকা—তার কথা বলতে গেলে সেই সাবেক ছড়া মনে পড়ে যায়; 'রাজার ভগিনী প্যারী যা করেন তা শোভা পায়!' সত্যিই, তার বইএর খরচ, পড়ায় খরচ, সাজ-পোষাকের খরচ, বাবুয়ানীর খরচ প্রভৃতির হিসেব নিলে চমকে উঠতে হয়। আর সুনন্দাকে আট-ঘাট বেঁধে ভাই বোনের মর্যাদা বজায় রেখে মুখ বুজিয়ে যে ভাবে সবদিক মানিয়ে চলতে হয়—সে যেন একটা সাধনা। অতি বড় মানসিক দৃঢ়তা, সহনশীলতা ও সাংসারিক ব্যাপারে নিখুঁত অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন্ মেয়ের পক্ষে অদ্ভুত প্রকৃতির এই দুটি মাত্র প্রাণীর মন বুঝিয়ে সংসার চালানো সম্ভব নয়।

কলেজ থেকে বাংলোয় ফিরে এসেই অলকা গা ধুতে যায় বাথ-রুমে। আর প্রফেসর কলেজের পোষাক ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে সেই যে ড্রয়িং-রুমে কেতাব নিয়ে বসেন, নৈশ ভোজের আগে আর ঘরের বাইরে বড় একটা বার হন না। ওদিকে বাথ-রুম থেকে বেরিয়ে বৈকালী সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে অলকাও এ ঘরে এসে বসলেই, সুনন্দা চা ও জলখাবার নিয়ে হাজির হন। খেতে খেতে ভাই-বোনের মধ্যে যে সব আলোচনা চলে, সাধারণতঃ তার বেশীর ভাগই শিক্ষা ও গ্রন্থ সম্পর্কে। অলকা বি এ পড়ছে; কিন্তু তার কমবিনেসনের বইগুলি ছাড়াও দাদার দৌলতে এরই মধ্যে এত সব বই পড়ে ফেলেছে যে, অনেক এম-এ পাশ করা ছেলেও সে সব বই চোখেও দেখতে পায়না। প্রফেসরের ড্রয়িংরুমটির চারিদিকেই বড় বড় আলমারী, আর তাদের তাকগুলি নানা শ্রেণীর গ্রন্থে ভরা—এমন অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সমাবেশও দেখা যায়, যাদের চাহিদার অন্ত নেই, কিন্তু সংগ্রহ করাই কঠিন ব্যাপার।

এখানে জলযোগ সেরেই অলকা একাই বেরিয়ে পড়ে খানিকটা বেড়াবার উদ্দেশ্তে। প্রফেসরের এ সখ নেই—বই পড়ার চেয়ে কোন বড় প্রলোভন তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে না। কিন্তু ভগিনীকে তিনি এ স্বাধীনতা দিয়েছেন তার রুচি ও স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে। সুনন্দা অবিশ্যি খিট্ খিট্ করতেন প্রথম প্রথম, এত বড় সোমত্ত মেয়ের একলা পার্কে বেড়াতে যাওয়া তাঁর পছন্দ নয় বলে; কিন্তু প্রফেসর হেসে বলতেন: তোমাদের দিন চলে গেছে সুনন্দা, এরা হচ্ছে স্বাধীন দেশের স্বাধীন মেয়ে; কলেজে পড়েছে, উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, নিজের মর্যাদার দামও বুঝেছে; এখনো যদি পুরুষ অভিভাবক বা দারোয়ান সঙ্গে করে এদের পথে বেরুতে হয়, তার চেয়ে বড় লজ্জা আর কিছু নেই।

অলকাও হাসতে হাসতে কথার পীঠে বলে: বৌদি নিজের মতন সকলকে ভাবেন কিনা, তাই আমাকে একলা বেরুতে দেখে ভয় পান। ওঁকে ত জানি, গঙ্গাস্নান করতে বা মন্দিরে যদি কোন দিন যান, সঙ্গে পাহারাওয়ালা একজন থাকা চাইই।

সুনন্দার রক্ষণশীল নীতির বিরুদ্ধে ভাই-বোনকে প্রায়ই এভাবে বক্রোক্তি করতে শোনা যায়। সুনন্দা অধিকাংশ সময় চুপ করে শুনে যান, আর যখন একান্তই অসৈরণ মনে হয়, ছোট কথায় এমন মিঠে কড়া জবাব দেন—যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ার মত কাণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। তখন কিন্তু ভাই-বোনের অসংখ্য বই-পড়া মগজ থেকে সে কথার ঠিক মত জবাব বেরিয়ে আসে না—পরস্পর তাঁরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করেই থেমে যান।

একলা বেড়াতে যাবার কথায় সুনন্দা বলেন: দেশ স্বাধীন হোলেও, দেশের মানুষ সব তেমনিই আছে। চোখের চামড়া কারুর বদলেছে বলে ত মনে হয় না। বোনকে নিয়ে দু-বেলা কলেজে ত যাও, পথে কত লোকই নজরে পড়ে—তাদের চোখের পানে তাকিয়ে দেখেছ কোন দিন? বেরোতে ইচ্ছে হয় ত নিজেই সঙ্গে নিয়ে বেরোও না, তাতে ত আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না!

সুনন্দার সঙ্গে এই ভাবে মাঝে মাঝে বাদানুবাদ ছাড়া ক্ষুদ্র সংসারটির আর সব দিকেই শান্তির ভাবই দেখা যায়। অলকাকে সুখী করবার জন্তে প্রফেসর সেনের প্রচেষ্টা যে, সময় সময় তাঁর অবস্থা এবং সামর্থ্যকেও অতিক্রম করে থাকে, এ দিনের ঘটনাটিই তার একটি বিস্ময়কর নিদর্শন।

২

অসময়ে স্বামীর ব্যগ্র কণ্ঠের ঘন ঘন আহ্বানে সুনন্দা হাতের কাজ ফেলে বারাণ্ডায় ছুটে এলেন। প্রফেসর সেন তখন উপরে উঠে বার বার ডাকছিলেন: অলকা, অলকা, অলকা—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে? অমন করে ডাকছ যে ঠাকুরঝিকে?

প্রফেসর সেন হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায় সে?

সুনন্দাকে আর উত্তর দিতে হলো না—বাথ-রুমে পা ধুতে ধুতে অলকা তখন কলের জলের তালে তালে গান ধরেছে। সুর মৃদু হোলেও গানের শব্দগুলি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে:

মনে মনে মন কত কথা কয়।
মন ত জানেনা, বুঝেও বোঝেনা—
আশার ছলনা যাতনাময়॥

নীরবে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে তারপর সহাস্তে প্রফেসর সেন বললেন: ও!......আচ্ছা, ও-ঘরে চলো; সব বলছি।

ড্রয়িং-রুমে আরাম কেদারায় প্রফেসর বসলেন, সুনন্দাও হেঁট হয়ে সামনে বসে তাঁর জুতার ফিতা খুলতে লাগলেন। দুবেলা প্রফেসরের বেরুবার ও ফিরবার সময় এ কাজটি সুনন্দাই বরাবর সানন্দে করে এবং এটি তার নিত্যকার অভ্যাস।

খোলা জুতা বাইরে রাখবার জন্য সুনন্দা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই প্রফেসর বললেন: মুখখানা বাড়িয়ে একবার গেটের সামনে চেয়ে দেখনা!

ঘরের সামনেই ঝুল-বারাণ্ডা। সেখানে দাঁড়ালে বাইরের দরজার সামনে রাস্তার খানিকটা দেখা যায়। স্বামীর এ কথা শুনে মনে কৌতুহলের উদ্রেক স্বাভাবিক; সুনন্দা ঝুল-বারাণ্ডায় দাঁড়াতেই দেখতে পেলেন—গেটের সামনেই একখানা নতুন মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর উর্দীপরা সোফার পালকের একটা ঝাড়ন দিয়ে গাড়ীর গায়ের ধূলা ঝাড়ছে।

মোটরখানা দেখেই এবং সেই সঙ্গে স্বামীর অস্বাভাবিক আনন্দ ও প্রসন্ন মুখের প্রশ্ন থেকেই সুনন্দার বুকটা ছাৎ করে উঠলো; সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় করে স্বামীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপার শুনি? ওটা সত্যিই কেনা হলো নাকি?

প্রফেসর সেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চেয়ে হাসলেন মাত্র। সে হাসির অর্থ সুনন্দার অপরিচিত নয়। ব্যাপারটি তিনি সবই বুঝলেন; তাই স্বামীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন: এই জন্যেই তাড়াহুড়ো করে সকাল সকাল বেরুনো হয়েছিল—আর ফেরাও হয়েছে অন্য দিনের চেয়ে অনেক আগে? ও! কলেজ কামাই করে এই সওদা নিয়েই বাড়ী ফেরা হয়েছে, তাই আহ্লাদে আট-খান হোয়ে বোনকে ডাকা হোচ্ছে!

প্রফেসর সেন মুখখানা সহসা ম্লান করে বললেন: সওদার কথা শুনেই তুমি যে চটবে, সে আমি জানতুম। আর সত্যিই চটবার কথা—আমার মত ছশো টাকা মাইনের এক প্রফেসরের পক্ষে একখানা মোটর কেনা—ধারে হাতী কেনার মতনই লজ্জাপ্রদ ব্যাপার! কিন্তু তুমিও ত জানো সুনন্দা, এই বাংলোখানা যেদিন ভাড়া করি, গ্যারেজ দেখেই অলকা বলেছিল—যদি আমাদের একখানা গাড়ী থাকত, তাহলে আর গ্যারেজের জন্যে ভাবতে হোত না! আগে যাঁরা এই বাংলোয় থাকতেন, তাঁদের নিশ্চয়ই গাড়ী ছিল! অলকার সেদিনের সে কথাগুলো আমি ভুলতে পারিনি। অলকার বড় সাধ—ওর একখানা গাড়ী হয়, নিজের গাড়ীতে ও কলেজ যায়, পাঁচটা ক্লাসমেটের... তাই—

স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে সুনন্দা বললেন: সাধ অনেকের মনে অনেক কিছুই হয়, তা বলে অবস্থায় না কুলোলেও সে সাধ মেটাবার জন্যে অসাধ্য সাধন যারা করতে চায়, তাদের বুদ্ধির কেউ প্রশংসা করে না। তোমার কথাই ধরো—এই সেদিন এক রাশ দামী বই কেনা হলো আলমারীর তাকগুলো ভরাবার জন্যে—তার দেনা শোধ করতে এক বছর লাগবে। এর ওপরে দুম করে একবারে মোটা দেনা ঘাড়ে চাপালে! কিন্তু এর পরে কি করে সামলাবে তা ভেবেছ?

তেমনি ম্লান মুখে প্রফেসর সেন বললেন: আমি বুঝতে পারছি সুনন্দা, তুমি কিছুই অন্যায় বলছ না। কিন্তু আমিও তোমাকে বলছি—অলকার হাসিখুসি মুখখানার কথা ভাবলে আমি

সব ভুলে যাই। জানো, আমি সারা পথ ভাবতে ভাবতে আসছি, গাড়ীখানা দেখে অলকার মুখখানা আহ্লাদে কি রকম ভরে ওঠে—কতক্ষণে সেটা দেখতে পাব! এখন তোমাকেও এই অনুরোধ করছি আমি সুনন্দা, তুমি যেন এই গাড়ী কেনা নিয়ে ওর সামনে অপ্রিয় কিছু ব'ল না, তাহলে সব আনন্দ আমাদের—

সুনন্দা তখন সহানুভূতির সুরেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল: তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। অলকা আমার বোন না হোলেও, আমি তাকে নিজের বোনের চেয়েও কম ভালবাসি না; আর যদিও আমি বাড়াবাড়ি কিছু ভালোবাসি না, তা হোলেও তুমি জেনো—ওর প্রতি আমার ভালবাসাও তোমার চেয়ে কম নয়।

ঠিক এই সময়ে কাপড় চোপড় পরে প্রসাধন সেরে বেড়াতে যাবার মত চক্ষু-চমৎকারী সাজে সজ্জিতা হয়ে অলকা ড্রয়িংরুমে ঢুকে দাদাকে দেখেই চমকে উঠল; পরক্ষণে বিস্ময়ের সুরে বলল: দাদা! এরই মধ্যে এসে গেছ? বৌদি তুমি ত আমাকে কিছু বলনি?

বৌদি বললেন: এসে অবধিই ত তোমাকে ডাকছেন, তুমি গানে মগ্ন ছিলে—তাই ওঁর ডাক শুনতে পাও নি।

মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে অলকা বলল: তুমি যেন কি বৌদি। আমাকে ত ডেকে দিতে পারতে? বাথ রুমে ঢুকলেই গান আমাকে পেয়ে বসে—সে ত তোমরা জান। এসেই ডাকছিলে কেন দাদা? আর আজ যে আধ ঘণ্টা আগেই ফিরলে?

প্রফেসর সেন ভগিনীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তার কথাগুলি শুনছিলেন, আর মনে মনে কৌতুক বোধ করছিলেন। তার কথা শেষ হতেই হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন: ঐ বারাণ্ডায় গিয়ে দেখ ত, দরজার সামনে কে একটা দাঁড়িয়ে আছে!

অলকা একটু আশ্চর্য হয়েই দাদার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। তারপরই বৌদির দিকে দেখল। চোখোচোখী হতেই তিনি বললেন: দেখই না বারাণ্ডায় গিয়ে।

অলকা বুঝল যে, একটা কিছু হয়েছে এবং দাদা বৌদি দুজনেরই মুখে একই ধরণের কথা শুনে চমকে উঠবার একটা কারণও আছে। যে কথায় বলে—চোরের মন পুঁই আঁদাড়ে! যাই হোক, মনের থমথমে ভাবটি নিয়ে সে অগত্যা ঝুল-বারাণ্ডায় গিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকতেই দরজার সামনে দাঁড়ানো বস্তুটি তার নজরে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ চোখ বিস্ফারিত করে ঘরের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল: মোটর গাড়ী। আনকোরা নতুন যে। কার গাড়ী দাদা?

ভিতর থেকে সুনন্দা সহজ কণ্ঠেই জানালেন: তোমাকে প্রেজেণ্ট করবার জন্যে তোমার দাদা কিনে এনেছেন—এই জন্যেই তোমাকে ডাকছিলেন।

সুনন্দার মুখে এ-কথা শুনে অলকার মুখের উপর পরমোল্লাসের যে অপূর্ব্ব আলো পড়লো—চোখে ঠোঁটে যে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটে উঠলো, প্রফেসর সেনের দর্শনেচ্ছু চিত্ত তাতেই ভরে গেল—ভগিনীর মুখে এই পরমানন্দের ভাবটুকু দেখবার প্রত্যাশাতেই তিনি এত উদ্‌গ্রীব ভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন।

অলকার মুখের সেই বিচিত্র ভাবটি এর পর কথায় মূর্ত্ত হলো, উচ্ছ্বসিত উল্লাসে করতালি দিয়ে সে বলে উঠল: সত্যি? আমাদের গাড়ী? কিন্তু তুমি যে কিছু বলছ না দাদা? আমার জন্যে তুমি গাড়ী কিনে এনেছ? আমাদের গাড়ী হলো? দাদা!!

আনন্দে দাদার গলাও ধরে এলো, চোখ দুটিও বাষ্পাচ্ছন্ন হোয়ে উঠলো! এমন আনন্দ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ ভাবে সাফল্য লাভের সংবাদেও বুঝি পাননি প্রফেসর। গাঢ় স্বরে এখন তাঁকে বলতে হলো: হ্যাঁ বোন, তোমার জন্যেই এই গাড়ী কিনেছি। আজ তুমি ঐ গাড়ী চড়েই বেড়িয়ে এসো। এই জন্যেই কোম্পানীর ঐ সোফারকে সাত দিনের জন্যে লোন নিয়েছি; এরই মধ্যে একজন ড্রাইভার খুঁজে নেব।

আনন্দে বিভোর হোয়ে অলকা নিজের অজ্ঞাতেই যেন ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল, মুখের কথা তার আনন্দের প্রাচুর্য্যে বন্ধ হয়ে গেছে; দাদার মুখের দিকে বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে রইল শুধু। দাদাও তখন নিজের বিহ্বল ভাব সবলে কাটিয়ে গলায় জোর দিয়ে বললেন: কি ভাবছ! যাও, বেড়িয়ে এসো। সোফারকে বলা আছে—সমস্ত সহরটা ঘুরে এসো তুমি।

অলকার মুখে এবার কথা ফুটল এবং তেমনি উচ্ছ্বসিত উল্লাসে ছুটে গিয়ে সুনন্দাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল: বৌদি ভাই, তুমিও চলো… পরক্ষণে কি ভেবে দাদার দিকে ফিরে তেমনি আগ্রহের সুরে বলল: না, না, শুধু আমরা কেন—তুমিও চল দাদা, তিন জনেই আমরা ঘুরে আসি।

দাদার আগেই বৌদি বললেন: গাড়ী যখন হয়েছে, বেড়াব বৈকি, সে ত আর পালাচ্ছে না; তবে আজ তুমি একলাই বেড়িয়ে এসো, পারত তোমার দাদাকে বরং নিয়ে যাও।

বিপন্নের মত মুখভঙ্গি করে দাদা অলকার বলার আগেই বলে উঠলেন: তুমি ত জানো অলকা, এ ঘরে এসে বসলে আর আমার ওঠবার এক্তিয়ার থাকে না। আমি ত গাড়ী চড়েই এসেছি—এখন তুমিই বেড়িয়ে এসো।

অলকার আর বিলম্ব সইছিল না, এরপর আর কিছু বলবারও নেই। কাজেই, নীরবে এক রকম ছুটতে ছুটতেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রফেসর সেন স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন: সত্যিই আনন্দে বুকখানা আমার ভরে গেল সুনন্দা!

৩

কুইন্স পার্কের সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াল। অলকা সোফারকে গাড়ী নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে পার্কের মধ্যে প্রবেশ করল। দিকে দিকে নানা শ্রেণীর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্থানে স্থানে মজলিশও বসেছে—কত আলোচনাই চলেছে। অলকার কোন দিকে লক্ষ্য নেই—পার্কের শেষের দিকে ঝিলটি যেখানে ঘুরে কতকগুলো গাছের পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে গেছে, সেই নির্জন স্থানটির দিকে হন হন করে চলেছে সে। এদিকে লোকজন বড় আসে না, বসবার কোন বেঞ্চিও নেই; শাখা-প্রশাখাযুক্ত কতকগুলো বুনো গাছ, তলায় মাটির ঢিপি; রাজ্যের যত পাখী এসে গাছগুলিতে আশ্রয় নিয়ে অনর্গল কূজনে নির্জন স্থানটিকে মুখরিত করে তুলেছে। কিন্তু অসংখ্য পাখীর কলরবের উপর ভেসে উঠছে ক্লারিওনেটের শ্রুতিমধুর সুর। গাছের তলায় ঢিপির উপর বসে নিবিষ্ট মনে বাঁশী বাজাচ্ছে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক প্রিয়দর্শন তরুণ। লম্বা ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুলগুলি ব্রাস দিয়ে পিছন দিকে উলটানো; বেশভূষার বিশেষ পারিপাট্য নেই—গায়ে একটা আড়-ময়লা পাঞ্জাবী, পরণের কাপড়খানা পাতলা এবং এমন কায়দা করে লম্বা কোঁচাটা পিছন দিকে উলটে পরেছে যে, পায়ের দিকের কাপড় ঠিক পাজামার মত দেখাচ্ছে। হাতে একটা রিষ্টওয়াচ। ছেলেটির গায়ের রং ময়লা হলেও প্রাঞ্জল চোখে লাগে; টিকালো নাক, চেহারার দিক দিয়ে সব চেয়ে বৈশিষ্ট্য তার বড় বড় ভাবালু দুটি চোখ—এরকম চোখ এই বয়সের কাজার ছেলের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় কিনা সন্দেহ। এই চোখের সৌন্দর্য্যেই এই পরেশ ছেলেটি অলকার মত চঞ্চলা প্রগলভা বাক্‌পটীয়সী দুঃসাহসিক ছাত্রীকে এমনি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয়েছে যে, কলেজের পর বাড়ী ফিরেই তার সমস্ত মনটি উসখুস করতে থাকে কতক্ষণে সে পার্কের এই নির্জন স্থানটিতে এসে ঘণ্টা দুই সময় এর সংস্পর্শে কাটিয়ে দেবে।

এদের দুজনের সম্প্রীতির ইতিহাসটিও রহস্যময় এবং অত্যন্ত গোপনীয়। কলেজের কোন উৎসবে অলকার উপরে তিনখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ভার থাকে। এ সম্বন্ধে তার খ্যাতিও প্রচুর। কিন্তু সে দিনের উৎসবে গানের সঙ্গে যার ক্লারিওনেট বাঁশী বাজাবার কথা—তার অনুপস্থিতি একটা উদ্বেগের সৃষ্টি করে এবং ঠিক সেই সময়ে এই পরেশ নামে ছেলেটিকে নিয়ে কলেজের এক অধ্যাপক অনুষ্ঠাতাদের সামনে এসে জানালেন যে, একে দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া লোক—খাসা বাঁশী বাজাতে পারে ছেলেটি। অলকা তখন মঞ্চে অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তখন তার বিচার-বিবেচনার সময় ছিল না—অলকা মঞ্চে গিয়ে গান আরম্ভ করে দিল। তার আশঙ্কা হচ্ছিল, হয়ত বাঁশীর জন্যে সব বিগড়ে যাবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল সে, বাঁশীর সুর যেন আগে থেকেই তৈরী হয়ে তার কণ্ঠের গানকে টেনে নিয়ে চলেছে। গানখানি সে দিন আশ্চর্য্য ভাবে উৎরে গেল, আর অলকাই বুঝল যে, এই সাফল্যের মূলে বাঁশীওয়ালার কৃতিত্বও কম নয়।

ফিরে এসে ধন্যবাদ দিতে গিয়েই ছেলেটির চোখের দৃষ্টির সঙ্গে অলকার চোখের দৃষ্টি যেন জড়িয়ে গেল; অলকার মনে হলো যে, এই অপরিচিত ছেলেটির দুটি চোখ চুম্বকের মত ক্রমাগতই যেন তাকে তারই দিকে আকর্ষণ করছে। সেই

স্মরণীয় ক্ষণটি দুটি তরুণ-তরুণীর মনের মধ্যে এমনি এক প্রীতিবন্ধন দৃঢ় করে দিল যে, প্রায় তিনটি মাস ধরে তাঁরগ্রন্থী অব্যাহত হয়েই আছে। পার্কের এই স্থানটি হয়েছে এদের মিলন-পীঠ। পরেশ প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসেই এখানে অলকার প্রতীক্ষায় বসে বসে বাঁশী বাজায়, আর অলকা বাগানে ঢুকেই উৎকর্ণ হয়ে শুনতে পায় নানা পরিবেশের মধ্যেও তার আকর্ষণকারী সুর। এই ক'মাসে অলকাও তার পাশে বসে তারই শিক্ষায় বাঁশী বাজানো বিদ্যাটি আয়ত্ত করে ফেলেছে এমন কি, সে স্থির করে রেখেছে, দাদাকে বলে ঠিক এমনি একটা ক্লারিওনেট কিনে ফেলবে, তারপর দুজনেই পাশাপাশি বসে একই সঙ্গে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করবে। কিন্তু দাদাকে, বইএর কথা বলা যত সহজ, বাঁশীর ব্যাপার ঠিক সে রকম নয় বলেই এ পর্য্যন্ত তার সে সাধ অপূর্ণ আছে। তার আশঙ্কা, পাছে তার এই গোপন প্রেমের কথা এই সূত্রে জানাজানি হয়ে পড়ে। এই জন্যেই বাড়ীতে দাদার মুখে হঠাৎ—'দেখত, দরজার সামনে কি একটা দাঁড়িয়ে আছে।' শুনেই সে চমকে ওঠে আজই বিকেলে। অমনি ছাৎ ক'রে পরেশের কথাটাই জেগে উঠেছিল মনে—সেই-ই এসেছে নাকি?

অলকাকে দেখেই বাঁশী বন্ধ করে গম্ভীর মুখে পরেশ বলল: আজও চারটে থেকে তোমার আশায় বসে আছি।

অলকা আস্তে আস্তে পরেশের পাশেই তার বসবার স্থানটি ঠিক করে নিয়ে বলে উঠল: কেন, হাজারবার ত তোমাকে বলেছি পরেশ, কলেজের ছুটি হলেই এখানে আসবার জন্যে মনটি আমার উসখুস করতে থাকে; কিন্তু বাড়ীতে ফিরে, দাদার কাছে কিছুক্ষণ না বসে আমার আসবার জো নেই। তুমি জানো না, দাদা আমাকে কি ভালই বাসেন।

কথাটা শুনে মুখখানা অভিমানে ভার করে পরেশ বলল: দাদা ছাড়া তোমার মুখে ত আর কথাই নেই। দাদা যেন আর কারুর হয় না।

অলকা বলল: সত্যই, আমার মতন দাদা কারুর হয় না। জানো তুমি, আমার ইচ্ছাটুকুও দাদা বুঝতে পারেন। গাড়ীর আমার বড় সাধ ছিল, নিজের গাড়ীতে কলেজ যাবো, বেড়িয়ে বেড়াব—এমনি কত ইচ্ছাই হোত। শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে, দাদা আমার সে সাধ আজ মিটিয়েছেন,—আমার জন্যে একখানা আনকোরা নতুন মোটর গাড়ী আজ কিনে এনেছেন।

বিস্ময়ের সুরে পরেশ জিজ্ঞাসা করল: তোমার জন্যে দাদা মোটর কিনেছেন? সত্যি?

অলকা এক গাল হেসে উত্তর দিল: সেই গাড়ী চড়েই আজ এসেছি, সেই জন্যেই ত তোমাকে ডাকতে এসেছি—চলো আমরা দুজনে আজ সারা সহরটা পাড়ি দিয়ে বেড়াই।

এর পর এখানে আর কথা জমল না—অলকা জোর করে পরেশের হাত ধরে তুলল; পরেশও আপত্তি করল না, সহজে লোকের চোখে না পড়ে এমন ভাবে পার্কের কিনারার দিকের রেলিংএর পাশ দিয়ে তারা বাগানের ফটকের দিকে চলল।

গাড়ী ছুটল সিক্রোলের দিকে। গাড়ীতে বসে পরেশ বলল: একটা কথা?

পরেশের চোখের দিকে আকৃষ্ট দুটি চোখ রেখে অলকা বলল: সঙ্কোচ করবার মত ত কিছু দেখছিনে—বলেই ফেল কথাটা।

একটু থেমে মনে মনে একটু ভেবে পরেশ বলল: তোমার দাদা যখন অন্তর্যামী, তোমার ইচ্ছা বুঝতে পারেন, তাহলে গাড়ী ছাড়া আর কোন ইচ্ছা কি তোমার মনে উঠত না?

কথাটার অর্থ বুঝতে অলকার বাধল না, পরেশের হাতখানা তার হাতেই ছিল, সেই হাতে জোরে একটু চাপ দিয়ে সে বলল: তুমি যে ইচ্ছার কথা বলছ পরেশ, সত্যিই দাদার সামনে আমার মনে ওঠেনি, আমি উঠতে দিই নি।

পরেশ বিস্ময়ের সুরে বলল: সে কি! তুমি যে অবাক করে দিলে! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না অলকা!

অলকা একটু গম্ভীর হোয়ে বলল: আমার কথা ত দুর্বোধ্য নয় পরেশ; কত বারই ত তোমাকে বলেছি—দাদার সুগভীর স্নেহ আমাকে এমনি আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, আমাদের ভালবাসা সেখানে শরতের মেঘের মতই ভেসে বেড়ায়; তাই তার রূপ ফুটতে পারে না।

পরেশ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল: না, অলকা—এ-কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। আমি বলব—আমাদের ভালবাসা নিবিড়, নির্মল, নির্দোষ।

অলকা জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল: কিন্তু আমি যে মুখ তুলে এ-কথা বলতে পারি না

পরেশ। যখনই ভাবি, দাদা তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনা আর কল্পনা দিয়ে আমাকে একটা আদর্শ করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন—আর আমি তোমাকে অনায়াসে ভালবেসে চুপি চুপি তাঁর সেই বিশ্বাসের তলায় মাটি সরিয়ে দিচ্ছি, তখন আর আমি নিজেকে সামলাতে পারিনে, আপনিই ছোট হয়ে যাই।

পরেশ তার আয়ত দুটি চোখের অদ্ভুত দৃষ্টি অলকার মুখের উপরে ফেলে আস্তে আস্তে বলল: আমিও তাই বলছিলাম, অবস্থাটা তাঁকে খুলে বলতে; অবিশ্যি, এতে মনের জোর আর সাহসের রীতিমত দরকার, কিন্তু সে জোর ও সাহস যখন তোমার আছে, আর এ ভাবে ঢাক ঢাক গুড় গুড় ঠিক নয়—স্পষ্ট করে দাদাকে সব জানানো উচিত।

অলকা এ কথায় ভেঙে পড়বার মত হোয়ে বলল: আমার মুখে সব কথা শুনে তুমি শেষে এই সাব্যস্ত করলে পরেশ? আমার মনের মধ্যে কি দ্বন্দ্ব চলছে, তা বোঝবারও চেষ্টা করলে না? আমি বেশ বুঝতে পারছি, দাদা যদি শোনেন, তাঁর বড় আশার বোন অলকা সাধারণ মেয়েদের মতনই লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসতে শিখেছে, আর তাকেই নারীজীবনের সর্বস্ব ভেবে স্বীকার করে নিয়েছে, তাহলে তিনি তখনি পাগল হয়ে যাবেন—পৃথিবীর নারীজাতির ওপরে তাঁর আর শ্রদ্ধা থাকবে না। যাক্—আজ আর ভাবতে পারছি না, চলো তোমাকে লক্ষার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যাই। লক্ষার রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে পরেশ আশ্রয় নিয়েছে; সেখানে সে সেবাদলের কাজকর্ম দেখা শোনা করে এবং আশ্রম থেকেই তার ভরণ-পোষণ নির্বাহ হয়।

৪

বাড়ীর গাড়ীতে প্রফেসর সেন অলকাকে নিয়ে কলেজে যান, এবং এক সঙ্গেই ফেরেন বাড়ীতে। তারপর জলযোগের পর অলকা পুনরায় গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নিয়মিত ভাবে পার্কের সামনে গাড়ী দাঁড়ায়, অলকা গাছের তলায় মাটির ঢিপিতে পরেশের পাশে বসে বাঁশীর নতুন নতুন তৈরী গৎ শোনে, নিজেও বাজায়; ভুলচুক হলে পরেশ শুধরে দেয়। তারপর দুজনে গাড়ীতে এসে বসে; গাড়ীর মধ্যে তাদের মিলন ও ভালবাসা নিয়ে আলোচনা চলে। তারপর লক্ষার মোড়ে মিশন থেকে কিছুটা দূরে পরেশকে নিরালায় নামিয়ে দিয়ে বাংলোয় ফিরে যায় অলকা।

সেদিন তারা পার্কে মেলামেশার পর সারনাথের দিকে পাড়ি দেয়। এই কদিন পরেশ অলকার কঠিন মনটিকে কিছুটা নরম করে এনেছে। এদিনের এই দীর্ঘ পাড়ির মধ্যে পরেশের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত অলকা গ্রহণ করতে বাধ্যও হয়েছে। সে কথা দিয়েছে পরেশকে, যা থাকে অদৃষ্টে—আজ বাংলোয় ফিরে গিয়ে দাদার কাছে সব কথাই খুলে বলবে, তাঁর বিচারের সামনে সমর্পণ করবে নিজেকে।

রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হয়ে গেছে—তখনও অলকা ফিরে আসে নি। প্রফেসর সেন পাঠাগারে অধ্যয়নে নিমগ্ন, কিন্তু সুনন্দার মনে শান্তি নেই; রান্না করতে করতেই কানদুটি বুঝি বাইরের দিকে পেতে রেখেছেন—কখন গাড়ীর হর্ণ বেজে ওঠে। ক্রমে তাঁর ধৈর্য্য ভেঙে পড়ে—এত রাত ত কোনদিন সে করে না! রাগে সুনন্দার সর্বশরীর জলতে থাকে। জলন্ত উনান থেকে পাত্রটি নামিয়ে রেখে তিনি ড্রয়িং-রুমে ছুটে যান; দেখেন —বাড়ীর কর্তা নির্বিকারচিত্তে বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে ঠায় বসে আছেন! সুনন্দার তর্জনে চমকে ওঠেন প্রফেসর সেন।

—বেশ মানুষ তুমি যা হোক্! রাত ন'টা বাজে—এখনো পর্যন্ত তাঁর ফেরবার নাম নেই! পই পই করে বলি, সোমত্ত মেয়ে—অমন করে একটা অচেনা ড্রাইভারের সঙ্গে ছেড়ে দিওনা, তা তুমি কি সে কথায় কাণ দাও! কেন, নিজেই ত বোনটিকে নিয়ে ঘুরিয়ে আনতে পার! বই ছাড়া আর কোন দিকে কি তোমার নজর দিতে নেই?

সুনন্দার কথা শুনে প্রফেসর সেনের মাথা গরম হয়ে উঠল; ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন: আঃ! সুনন্দা, থামো! যার তার কথা তুলে তুমি অলকাকে ছোট করতে যেও না। তুমি ত জেনেছ—অলকাকে দিয়েই আমি প্রতিপন্ন করব যে, নারী তার নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে—পুরুষকে অবলম্বন না করেও স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করতে পারে! ফিরতে দেরী হয়েছে বলে এত উতলা হবার কি আছে? ধর, অলকা যদি আমার বোন না হোয়ে ভাই হোত, তাহলে তার

ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে রান্না ফেলে এমন করে ছুটে আসতে কি ?

সুনন্দা ক্রুদ্ধা হোয়েই বললেন : বুদ্ধি শুদ্ধি তোমার দিনকের দিন লোপ পাচ্ছে, তাই একথা বলতে পারলে ! সত্যিই ত, ও তোমার বোন বলেই এত ভয় ভাবনা, শেষ পর্য্যন্ত যে আমাকেই জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে ! বোনটি যে খুকী নয়—বিয়ে হোলে ন্যাদিন ছেলের মা হোত, সে কথা ত একটিবার ভাব না ! চিরকাল ত আর এভাবে খিজীপনা করে ওর কাটবে না, বিয়ে হবে, সংসার-ধর্ম করতে হবে ; কিন্তু ওকে যা করে তুলছ, এর পর কেউ এ মেয়েকে বিয়ে করতে চাইবে ?

প্রফেসর সেন চীৎকার করে উঠলেন ; বিয়ে বিয়ে, বিয়ে ! তোমাদের মুখে ত আর কোন কথা নেই, মেয়ে হোলেই ভেবে রেখেছ—কি করে তাকে পার করতে হবে। যেন বিয়ে ছাড়া মেয়েদের আর কোন গতিই নেই। দেখ সুনন্দা, আমি তোমাকে মিনতি করছি—এর পর তুমি আর অলকার সম্বন্ধে ওর বিয়ের কথা, ঘর-সংসারের কথা তুলে আমার স্বপ্ন ভেঙে দিও না ; যে আদর্শে আমি অলকাকে গড়ে তুলেছি, তাতে ওর শিক্ষিত মনে ঐ বিয়ে, প্রেম, ভালবাসা, এসব আগাছা কিছুতেই শিকড় ফেলতে পারবে না—একথা তুমি জেনে রেখো।

দৃঢ়স্বরে প্রফেসর সেন যখন এই মন্তব্য করলেন অলকার সম্পর্কে—অলকা তার কিছুটা আগেই পা টিপে টিপে পাশের ঘরে এসে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দাদা-বৌদির সংলাপ শুনছিল নিঃশব্দে ও নিস্তব্ধ হোয়ে। প্রফেসর সেনের কথার উত্তরে সুনন্দাও মুখখানা কঠিন করে বললেন : থাক্—আর বেশী, বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই, যা রয় হয় আর সয়—তাই ভালো। চিরকাল ধরে যা চলে আসছে—

প্রফেসর সেন ব্যঙ্গের সুরে বললেন : চিরকাল ধরে চলে আসছে শুধু মেয়েদের উপরে অত্যাচার, আর নত মস্তকে মেয়েদের তাই স্বীকার করে আত্মসমর্পণ। এই মাত্র এক ঋষিবাক্য পড়ছিলুম। তিনি বলছেন—প্রীতিবিশেষো বিশিষ্ট লাভার্থং কামিনী বিষয়ে পাপং ন ভবতি। এর মানে হোচ্ছে—কোন নারীর প্রতি লোভ হোলে তাকে মিথ্যাচারে ভুলিয়ে ভালিয়ে আয়ত্ত করা কাজটি পুরুষের বিধিদত্ত অধিকার এবং এতে কোন পাপ নেই। তোমাদের মত মেয়েরা চিরকাল ধরেই শাস্ত্রকারদের এই ধাপ্পাবাজি মেনে আসছে। কিন্তু আমি বলছি লিখে রাখো—অলকার মত মেয়ে এ কখনো সহ্য করবে না, সে এর প্রতিবাদ করবেই। আমার বোন অলকা কখনই সাধারণ স্তরের মেয়েদের মত বিয়ে, প্রেম, ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

অন্তরাল থেকে দাদার কথা শুনতে শুনতে অলকার সারা মুখ প্রদীপ্ত হতে থাকে। পথের পরিকল্পনা যুক্তি সঙ্কল্প সবই নস্যাৎ করে উত্তেজিত ভাবে সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দাদার পায়ের কাছে বসে পড়ে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল : হ্যাঁ দাদা, আমি তোমার স্বপ্ন সফল করব ; বিয়ে আমি করব না—প্রেম ভালবাসার মোহে আমি কখনো আদর্শ হারাব না।

দু-হাতে অলকাকে তুলে উল্লাসের সুরে প্রফেসর সেন বললেন : শুনছ সুনন্দা, শুনছ—অলকার কথা ! শোন, ভালো করে শোন।

সুনন্দা কিন্তু কথাটাতে কোন রকম গুরুত্ব না দিয়ে শ্লেষের সুরেই উত্তর করলেন : ঢের শুনিছি ; কিন্তু আমিও বলে রাখছি—মেয়েরা চিরদিনই মেয়ে, বয়সের ধর্মের কাছে হার না মেনে সংসারে কেউ ভুয়ো জেদ নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। তোমরাও ভাই-বোনে একথা মনে রেখো।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই সুনন্দা ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

৫

পরদিন বিকেলে পার্কের সেই মাটির ঢিপির উপরে বসে পরেশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল অলকার। কালকের কথা মত অলকা তার দাদাকে সব কথা বলে তার অন্তরের প্রার্থনা জানাবে—তার ফলে স্নেহ যে জয়ী হবে, সে সম্বন্ধে পরেশ নিঃসন্দেহ। আজ বাঁশীতেও তার মন লিপ্ত হতে চাইছে না, আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে—কখন আসে অলকা, শুনিয়ে দেয় তার সাফল্যের কথা।

কিন্তু দূর থেকে অলকার চেহারা দেখেই চমকে উঠল পরেশ। একি চেহারা দেখছে অলকার ? কে বলবে এ সেই হাস্যমুখী প্রাণচঞ্চলা আনন্দময়ী

মেয়েটি! আজ যেন সে নিরতিশয় গম্ভীর হয়ে আগের আকৃতি খোলসের মত ত্যাগ করেছে—এ যেন গম্ভীরমূর্তি কোন শিক্ষয়িত্রী: নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পরেশ, অলকার প্রতি পদক্ষেপ যেন তার অন্তরের দ্বারে সশব্দে আঘাত করতে লাগল।

ধীরে ধীরে পরেশের পাশে এসে বসল অলকা অন্যান্য দিনের মতই। কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। অলকাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল: না, আমি পারলুম না পরেশ, তুমি আমাকে মুক্তি দাও। কাল আমি দাদার এক অপূর্ব রূপ দেখিছি। সেই সঙ্গে শুনিছি—আমার সম্বন্ধে যে কল্পনাকে তিনি সত্যের মত আঁকড়ে ধরে আছেন, তাকে বাস্তব করাই হবে আমার সাধনা। আমাদের প্রেম এখানে ব্যর্থ।....এই পর্যন্ত বলেই সে বৌদির সঙ্গে দ'দার বিতর্কের সব কথা খুলে বলল। পরেশ স্থির হয়েই সব শুনল, কোন প্রতিবাদ করল না, একটি কথাও বলল না। অলকা পুনরায় বলতে লাগল: এখন বুঝতে পারছ দাদার স্বপ্নের প্রতিবন্ধক তুমি। সে স্বপ্নকে কখনই সফল করতে পারব না, তুমি যদি কাছে থাক। মনে কর, অলকা মরে গেছে। তুমি আর আমার সামনে এস না পরেশ—আমাকে ভুলে যাও। পরেশ তথাপি নীরব, তার মুখে একটিও কথা নেই। অলকা দেখল, পরেশের সেই অপূর্ব দুটি চোখ শিশির-সিক্ত স্থলপদ্মের মত অপরূপ হয়ে উঠেছে। গাঢ় স্বরে অলকা জিজ্ঞাসা করল: তুমি চুপ করে আছ কেন পরেশ? কিছু বলে না ত! কথা কও! বলো—আমাকে তুমি মুক্তি দিলে? বলো—দাদার স্বপ্নকে সত্য করতে আমাকে আর মোহের মধ্যে টানবে না?

পরেশ তবুও নীরব। একই ভাবে শুধু চেয়ে রইল অলকার দিকে, নিস্তেজ ভাবহীন দৃষ্টি, যেন প্রাণহীন কোন প্রতিমূর্তির চোখ। একটু পরেই তার নিথর দেহখানি হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল; তারপর ধীরে ধীরে পা দুটি ফেলতে ফেলতে মাথাটি নীচু করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল পরেশ।

অলকার অন্তরটি যেন হাহাকার করে উঠল; চোখ দুটোও সেই সঙ্গে ছলছলিয়ে এলো; আর্তকণ্ঠে সে বলল: পরেশ, তুমি অমনি অমনি চলে যাচ্ছ? আমাকে কিছু বলবে না?

একটু থেমে, আর একবার অলকার দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে পরেশ আস্তে আস্তে বলল: কি আর বলব অলকা, চেষ্টা করব তোমাকে ভুলে যেতে। কিন্তু যদি না পারি, আমাকে ক্ষমা কোর তুমি।

প্রিয়তমের এই স্বল্প ক'টি কথা অলকাকে তৃপ্তি দিল না, সে যেন আরো অভিভূত হয়ে পড়ল। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়ল—দাদার পদতলে বসে তার সেই স্বীকৃতি। অলকার শিক্ষাদীপ্ত চিত্ত অমনি দৃঢ় হয়ে উঠল, সেও নিজেকে শক্ত করে শুধু একটিবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে পরেশের দিকে তাকাল। পরেশ তখন টলতে টলতে পরিচিত পথ ধরে চলেছে। অলকার ইচ্ছা হলো আর একবার তাকে ডাকে, কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে সামনের গাছটাকে আঁকড়ে ধরল।

* * * *

ভাই বোনের খাওয়া হয়ে গেছে। অলকা কলেজে যাবার জন্যে তার বই খাতা গুছাচ্ছে। এদিকে সুনন্দা স্বামীর পায়ের কাছে হেঁট হয়ে বসে জুতার ফিতে বেঁধে দিচ্ছেন। প্রফেসর সেন হাসতে হাসতে বললেন: তোমার এ অভ্যেস গেল না দেখছি। আচ্ছা আমি ত কোন দিন তোমাকে ডাকিনি, বলিনি যে আমার জুতোর ফিতে বেঁধে দাও। কিন্তু তুমি যেন ঘড়ির কাঁটাটির মতন এগিয়ে আস।

সুনন্দা হাতের কাজ করতে করতেই বললেন: সত্যই ঘড়ির কাঁটার মতন চলবার শিক্ষাই আমরা পেয়েছিলুম মা ঠাকুমা'দের কাছে। আমরা কি শিখিছি শুনবে? সংসারের কাজ করা; স্বামীর সেবা পরিচর্যায় এগিয়ে যাওয়া—এ সব হোচ্ছে মেয়েদের ধর্ম। দুঃখ এই, তোমরা ভাবো, এ সব হোচ্ছে দাসীপনার মত নীচ কাজ—বিয়ের পর বৌ হয়ে স্বামীর সংসারে সেঁধুনো মানেই জেলখানায় ঢুকে চিরজীবনের মতন বন্দিনী হওয়া! কিন্তু আমরা এ সব কথা শুনে মনে মনে হাসি আর ভাবি—দাসী বলান দেবী বলে গর্ব করবার যদি কিছু থাকে, সে আমাদেরই মধ্যে এক দিকে আমরা বিনি মাইনের দাসী, আর এক দিকে মহীয়সী দেবী।

এমনি সময় অলকা তার বইএর বোঝা নিয়ে ঘরে ঢুকল বইগুলো টেবিলের উপর রেখে সে বাহারী ঝাউ পাতায় বাঁধা গোলাপ ফুলের একটি স্তবক নিয়ে এগিয়ে এলো দাদার কাছে; তার পর সেটি তাঁর কোটের বোতামের গর্তে পরিয়ে দিল।

প্রফেসর সেন অমনি মৃদু হেসে বলে উঠলেন:

এই দেখ সুনন্দা, তুমিও মেয়ে—অলকাও মেয়ে, কিন্তু তুমি আমার জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়ে নিজেকে ছোট করছ; আর অলকা আমার বটন-হোলে টাটকা ফুলের গুচি বেঁধে দিয়ে কেমন আনন্দ দিলে।

সুনন্দা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সহজ কণ্ঠেই কথাটার উত্তর দিলেন: আমার এ সব ছোট খাটো নীচু কাজ নিয়ে তুমিই বা মাথা ঘামাচ্ছ কেন? তোমাদের ত অনেক বড় বড় কাজ আছে, তাই নিয়েই ভাবো। বিয়ে করতে যাবার সময় মায়ের কাছে বলে গিয়েছিলে মনে নেই—দাসী আনতে চলেছ; সেই কথা মনে ভেবে চুপ করে থাক দেখি।

অলকা মুচকে হেসে বলল: বৌদির সঙ্গে ও সব কথা নিয়ে কিছুতেই পেরে উঠবে না দাদা, সংসারের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৌদি আমাদের রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলারসিপ পেয়েছেন জেনো।

প্রফেসর সেন হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন: কলেজের সময় হোয়ে এসেছে অলকা—গাড়ীতে গিয়ে বোস।

বইগুলি টেবিল থেকে নিয়ে অলকা গট গট করে বেরিয়ে গেটের কাছে এসে দেখল, মোটর দাঁড়িয়ে আছে। অলকাকে দেখে সোফার তার স্থান থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। অলকা চেয়ে দেখল, আগের প্রৌঢ় সোফারের স্থলে এক তরুণ যুবককে বাহাল করা হয়েছে। লোকটির পরিচ্ছদ অনেকটা পাঞ্জাবীদের মত—ঢিলা পায়জামা, পাঞ্জাবীর উপরে জহর কোট, মাথায় পাগড়ি। চোখে নীল চশমা, বয়স দুর্বোধ্য হোলেও যুবক বলে মনে হয়। মাথা অনেকখানি নীচু করে সে গাড়ীর দরজা খুলে দিয়েই তার সিটে গিয়ে বসল। কিন্তু তার বসবার ভঙ্গিটি দেখেই অলকার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠল, চোখ দুটো বিস্ফারিত করে অলকা সামনের দিকে এগিয়ে গেল, লোকটিও সেই সময় পাশের দিকে তাকাতেই সব রহস্য প্রকাশ হয়ে গেল। অলকা চমকে উঠে চাপা গলায় বলল: পরেশ? তুমি?

তেমনি মাথা নীচু করেই পরেশ বলল: তোমাকে ভুলতে পারলুম না অলকা, আমাকে ক্ষমা কর।

অলকার মুখের কথা বন্ধ হোয়ে গেল, কি বলবে ভেবে স্থির করতে পারল না—বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইল এই অদ্ভুত ছেলেটির দিকে। এমনি সময় প্রফেসর সেন পিছন থেকে বললেন: ও! তোমাকে বলা হয়নি অলকা, কোম্পানীর সেই ড্রাইভারকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তার জায়গায় এই প্রেম সিংকে বাহাল করা হয়েছে। ছেলেটি খুব স্মার্ট, আর বিহেভিয়ারও খুব ভালো।

অলকা আবার চমকে উঠলো এবং প্রেম সিংহের দিকে চোখ রেখে দাদার পিছনে পিছনে গাড়ীতে গিয়ে বসল। পরেশ ওরকে প্রেম সিং গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ীর মধ্যে বসে অলকা ভাবতে লাগল শুধু পরেশের কথা, এই আশ্চর্য্য প্রেমিক পুরুষটির কথা। সে যে মোটর চালানো বিদ্যাতেও অভ্যস্ত, তাই প্রেমের পথে পাড়ি দেবার উদ্দেশ্যে ড্রাইভারের বৃত্তি ও ছদ্মনাম ধারণ করেছে, এবং এ পথে কি সার্থকতা সে লাভ করবে—গাড়ীতে দাদার পাশে বসে এই সব কথাই ভাবতে লাগল অলকা।

সহসা তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল প্রফেসর সেনের কথায়। আজ বেরুবার সময় সুনন্দার চোখাচোখা কথাগুলো বোধ হয় বিদ্বান প্রফেসরের জ্ঞানগর্ভ মনে কিছুটা আঘাতও করেছিলো; এতক্ষণ তিনি মনে মনে তারই একটা সমাধান করছিলেন হয়ত—কিন্তু তাতে কৃতকার্য না হোয়ে হঠাৎ পার্শ্বোপবিষ্টা অলকাকেই জিজ্ঞাসা করলেন: সুনন্দার কথা শুনে তোমার কি মনে হয় অলকা? সংসারে জড়িয়ে পড়ে কেনা দাসীর মত স্বামী ও পরিজনদের পরিচর্যাটাই কি নারী-জীবনের চরম সার্থকতা?

অলকা প্রশ্নটা শুনেই চমকে উঠল; তার কারণ, সামনের সিটেই এমন একটি লোক বসে আছে, এই কথাটার সঙ্গে তার স্বার্থ-সম্বন্ধও নিবিড় হয়ে আছে; কাজেই সেও অলকার মুখে এ কথার উত্তর শোনবার জন্যে নিশ্চয়ই কান দুটো খাড়া করে রেখেছে। অগত্যা, অলকা এখানে পরস্মৈপদী নীতি গ্রহণ করে মৃদু স্বরে জানালো: বৌদির তাই ধারণা।

কিন্তু অলকার দুর্ভাগ্য, প্রফেসর সেন তার এই উত্তর শুনে খুশী হতে পারলেন না, বেশ একটা আগ্রহের সুরেই বললেন: তোমার কি ধারণা তাই জানতে চাইছি, তুমিই বল—সংসার-ধর্ম মানেই বিবাহ করে সর্বতোভাবে স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করা? এই সুনন্দা যা করছে?

দেখছ ত' চাকরের অভাব গায়ে মাখে না, নিজেই এগিয়ে এসে নীচ কাজেও হাত লাগাতে তার লজ্জা বা ঘৃণা নেই। এটা কি তুমি সমর্থন কর? তুমিও কি বিয়ে করে সুনন্দার মত সুখ চাও? এভাবে জীবনযাত্রার সমর্থন কর? জবাব দাও অলকা।

প্রশ্ন শুনেই অলকার মাথা ঘুরে যায়, কি জবাব দেবে সে? চোখের দৃষ্টি প্রখর করে সামনের দিকে চাইতেই বুঝতে পারে, ছদ্মবেশী পরেশ উৎকর্ণ হয়ে আছে তার জবাব শোনবার জন্যে—দাদার আদর্শের দিকে চেয়ে কালই যাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ সেই দাদাই জিজ্ঞাসা করছেন—অলকার কি ধারণা বিবাহ সম্বন্ধে, সে কি চায়? পারে কি অলকা এই পরম সঙ্কট-স্থলে তার চরম জবাব দিতে?

অলকাকে নীরব দেখে প্রফেসর সেন অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন: চুপ করে রইলে কেন অলকা, বল। জবাব দাও—কোনটা শ্রেয়ঃ? নিজের দিকে চেয়ে নিজের শিক্ষিত মন আর সংস্কার-মুক্ত প্রবৃত্তিকে উপলব্ধি করেই তুমিই বল অলকা—তুমি কি পছন্দ কর? সেই গতানুগতিক ধারায় একজন পুরুষকে বিবাহ করে তাকে সুখী করবার উদ্দেশ্যে নিজের সুখ স্বাধীনতা সচ্ছন্দতা স্বাতন্ত্র্য ইচ্ছা সব আত্মসাৎ করে সুনন্দার মত নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কি তুমি……

প্রফেসর সেনের জটিল প্রশ্নটি এমনি স্থানে এসে পড়েছে যে, তার কি উত্তর দেবে, অলকা ভেবেই পায় না; তার মাথার ভিতরটা যেন দপ দপ করতে থাকে; সে তখন আর নিজেকে সামলাতে না পেরে ভেঙে পড়ার মত হয়ে আর্তস্বরে বলে ওঠে উঃ! দাদা—

কথার সঙ্গে সঙ্গে পিছনের গদীর উপর এলিয়ে পড়ল অলকা। গাড়ীও ঠিক এই সময় কলেজের সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে একটা শব্দ তুলে থেমে গেল। প্রফেসর সেন চমকে উঠে বললেন: কি হলো? কি হলো? তোমার কি শরীর খারাপ মনে হচ্ছে অলকা?

অলকা ধীরে ধীরে চোখ দুটো মেলে দাদার পানে চেয়ে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল: হ্যাঁ, হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে গেল; ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করছি দাদা।

প্রফেসর সেন বললেন: তাহলে তোমার আর ক্লাসে গিয়ে কাজ নেই, তুমি বাড়ী ফিরে যাও।

অলকা কোন কথা বলল না, চুপ করে রইল। প্রফেসর সেন গাড়ী থেকে নেমে অলকার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নতুন সোফারকে বললেন: খুব আস্তে আস্তে গাড়ী চালিয়ে এঁকে বাংলোয় নিয়ে যাও, যেন ঝাঁকি না লাগে।

অলকার দিকে চেয়ে বললেন: বাড়ীতে গিয়েই শুয়ে পড়বে, পড়াশোনা আজ সব বন্ধ।

পরেশ গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ীর দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর সেন গেটের ভিতরে গেলেন।

ধীরে ধীরে গাড়ী চলেছে। সামনের সিট থেকে সেই অবস্থায় ভিতরের দিকে চেয়ে পরেশ জিজ্ঞাসা করল: বাড়ীতে নিয়ে যাব, না একটু ঘুরে……

উত্তেজিত কণ্ঠে অলকা উত্তর করল: যেখানে তোমার খুশী, তুমি নিয়ে যাও। আমার ইচ্ছার কোন দাম নেই; চালাও—জোরে চালাও, খুব জোরে, ফুল ফোর্সে—যেখানে তোমার ইচ্ছে।

* * *

প্রফেসর সেন সেদিন একটা পিরিয়ড আগেই কলেজ থেকে বেরিয়ে এলেন এবং একখানা টাঙ্গায় বাংলোয় ফিরলেন। অসময়ে তাঁকে একলা টাঙ্গায় ফিরতে দেখে সুনন্দা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: টাঙ্গায় এলে যে? অলকা কোথায়? গাড়ী কি হলো?

পত্নীর প্রশ্ন শুনে প্রফেসর সেন আকাশ থেকে পড়লেন। নিজের মাথাটিও সত্য সত্যই ঘুরে যাওয়ায় পড়ে যাচ্ছিলেন, সুনন্দা তীরের বেগে ছুটে এসে দুহাতে তাঁকে ধরে আরাম-কেদারায় শুইয়ে দিলেন। বুদ্ধিমতী সুনন্দা কোন প্রশ্ন এ সময় না তুলে স্বামীর মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে, পাখার বাতাস করতে লাগলেন।

খানিক পরে সুনন্দা সবই শুনলেন। কিন্তু তিনিও সেই শ্রেণীর মেয়ে নন যে, নিজের সুচিন্তিত অকল্যাণ আজ সত্য সত্যই আকস্মিক ভাবে এসে গেছে বলে, এই চরম সঙ্কটের সময় স্বামীকে আঘাত দেবেন, বা অলকার উদ্দেশে প্রখর বাক্য-বাণ নিক্ষেপ করবেন। তিনিই স্বামীকে যুক্তি দিলেন; জেলপুরাথানার ইনেসপেক্টর যখন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু, তাঁকেই সব কথা বলে অলকার সন্ধানের

ব্যবস্থা কর। নিজে মাথা গরম করে ছুটোছুটিতে কোন ফল হবে না।

প্রফেসর সেন সেই যুক্তিই নিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও অবশিষ্ট দিনটুকুর মধ্যে প্রফেসর সেনের গাড়ী বা অলকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বিকেলের দিকে তিনিও স্থির থাকতে পারেননি, সুনন্দার নিষেধ অগ্রাহ্য করে সম্ভব মত স্থানে বৃথাই ঘোরাঘুরি করলেন। সে রাত্রিতে রান্নার পাট বন্ধই রইল—সুনন্দা স্বামীকে বৈকালে চাটুকুও পান করাতে পারেননি বহু চেষ্টা করেও। সারারাত্রি স্বামিস্ত্রী অভুক্ত রইলেন, নিদ্রাও তাঁদের চক্ষু স্পর্শ করতে পারল না।

প্রত্যুষে সুনন্দার চীৎকারে প্রফেসর সেন শয্যায় উঠে বসলেন। ভোরের দিকে সবে মাত্র তাঁর চোখ দুটির পাতা তন্দ্রায় জড়িয়ে এসেছিল। সুনন্দা বললেন। ওগো, গ্যারেজে মোটরখানা রয়েছে দেখে এলুম।

উঠি পড়ি অবস্থায় রাত্রিবাস পরেই প্রফেসর সেন সিঁড়ি ভেঙে নীচের গ্যারেজে ছুটলেন, সুনন্দাও সতর্ক দৃষ্টি স্বামীর দিকে নিবদ্ধ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছিলেন। হ্যাঁ, সত্যিই ত— গ্যারেজে মোটরখানা যথাযথ ভাবেই রয়েছে। প্রফেসর সেনের সমস্ত দেহটা মথিত করে একটা আর্তস্বর খসিয়ে উঠল: জানো সুনন্দা, কালও কলেজের সামনে মোটরখানার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে অলকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি! সেই আমার অলকা-উঃ!

কথাটা শেষ করে মোটরের সেই স্থানটির দিকে—যেখানে অলকা এলিয়ে পড়েছিল— তাকাতেই প্রফেসর সেনের চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকমে প্রখর হয়ে উঠল; সেই দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন তিনি—খামে ভরা একখানা চিঠি সেখানে সেফটিপিন দিয়ে আসনের ঝালরের সঙ্গে আটকানো রয়েছে। কম্পিত হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন তিনি চিঠিখানা তুলে নিতে। পিছন থেকে সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল: চিঠি?

প্রফেসর সেন বিকৃতস্বরে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ। খামের উপরে অলকার হাতে লেখা আমার নাম।

তখনো প্রফেসর সেনের হাত কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। সেই অবস্থায় খাম ছিঁড়ে কণ্ঠে রীতিমত জোর দিয়ে দিয়ে তিনি চিঠি পড়তে লাগলেন:

বাবা,

আজ বুঝতে পেরেছি—বৌদির কথাই ঠিক: বয়সের ধর্মকে উপেক্ষা করে তুমি আমাকে গড়তে গিয়ে যে ভুল করেছিলে, আমাকেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। পরেশ নামে একটি ছেলেকে এই বয়সের ধর্মেই ভালবেসেও তোমার মুখ চেয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছিলুম; কিন্তু সেই ছেলেটিই এর পর ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে 'প্রেম সিং' হোয়ে মোটর ড্রাইভ করতে আসে। অগত্যা নিরুপায় হোয়ে তাকেই আশ্রয় করে আমাকে পাড়ী দিতে হলো ভাবী জীবনের অনিশ্চিত পথে—পাথেয় এখানে বয়সের ধর্ম। বৌদিকে বোল—যদি কূল পাই, তাঁকেই আদর্শ করে নীড় বাঁধব। অভাগিনী বোনটিকে তুমি ভুল না বুঝে মনে মনে ক্ষমা কোর দাদা।

তোমাদের—অলকা

চিঠিখানা পড়েই সজোরে দলা পাকিয়ে দুমড়ে মুড়ে দূরে নিক্ষেপ করে প্রফেসর সেন পাগলের মত হো হো করে হেসে উঠলেন। পরক্ষণে গ্যারেজটি মুখরিত হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরে:

"Awake! Awake!
Ring the alarm bell murder and treason-
Banquo and Donalbain!—Awake!

প্রফেসর সেন কি পাগল হোয়ে গেলেন? সুনন্দা ছুটে এসে দু'হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বললেন: চুপ করো, ঘরে চলো।

প্রফেসর উদ্‌ভ্রান্তের মত চঞ্চল দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চেয়ে পুনরায় হেসে উঠলেন হো হো করে। তার পরেই বিকৃত কণ্ঠে বললেন: বয়সের ধর্ম সুনন্দা—বয়সের ধর্ম। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

জয়-পরাজয়

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়-পরাজয়

১

ক্লাসের মধ্যে ভালো ছেলে বলিয়া আমার যেমন একটা অসামান্য খ্যাতি ছিল, নির্ভীক ও গোঁয়ার হইয়া গোবিন্দও তেমনই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

লেখাপড়ার দিক দিয়া যদিও সে ছিল আমার অনেক নীচে, কিন্তু শক্তি, সাহস ও গোঁয়ার্তুমির পথে সে আমাকে ও আমাদের ক্লাসের ছেলেদের পিছাইয়া দিয়া এত উপরে গিয়া উঠিয়াছিল যে, আমরা তাহার নাগালই পাইতাম না;—অবাক্ হইয়া তাহার ডাকপিটেপনা দেখিতাম ও নানাপ্রকার সমালোচনা করিতাম। আমরা যাহার বিষয় ভাবিতেও ভয় পাইতাম, গোবিন্দ আমাদের ভাবনার অতীত সেই ভয়াবহ বিষয়-বস্তুটিকে আয়ত্ত করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত।

রেউড়ীতলার রাস্তার উপর দিয়া আমরা দল বাঁধিয়া স্কুলে যাই। রাস্তার এক ধারে মুসলমানদের গোরস্থান। সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ ছোট বড় নানা আকারের নানাবিধ কবর; অন্যদিকে খানিক পতিত জমী। রামাপুরার তাঁতিরা তাহাদের কাপড়ের সূতা-রেশমের টানা দেয় এইখানে। সময় সময় সঙ্কীর্ণ পথটিরও অধিকাংশ তাহারা অধিকার করিয়া, খোঁটা গাড়িয়া সূতার ফেরা বাঁধে,—যে সামান্য পথটুকু পড়িয়া থাকে, নিরীহ পথিকদের পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত হইলেও, ক্রীড়াশীল চঞ্চলচিত্ত ছেলেদের পক্ষে তাহা প্রতিপদে বাধাপ্রদ, একটু এদিক ওদিক হইলেই টানার সূতার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, আর সেই সূত্রে দলবদ্ধ তাঁতিদের তিরস্কার ও তর্জ্জন ছেলেদিগকে ভড়কাইয়া দেয়। কাজেই রাগ-দুঃখ মনে মনে চাপিয়া অতি সন্তর্পণেই এই পথটুকু আমাদের পার হইতে হয়। কিন্তু তাঁতিদের এই অত্যাচার আমরা সহিয়া গেলেও, গোবিন্দ তাহা বরদাস্ত করিবে না বলিল। আমরা ভাবিয়া আকুল, গোঁয়ার গোবিন্দ হঠাৎ কোনও হাঙ্গামা বাধাইয়া আমাদিগকেও পাছে তাহাতে জড়াইয়া ফেলে। অতি সন্তর্পণে তাহার সঙ্গ এড়াইয়া আমরা নিরীহ ছেলের দল এই পথে চলিতে থাকি।

সে দিন আমরা আগে আগে চলিয়াছি, হঠাৎ পশ্চাতে দেখি, গোবিন্দও আসিতেছে। তাহার গলায় গাঁদাফুলের একছড়া মোটা মালা, আর সেই মালার দিকে লোলুপ দৃষ্টি রাখিয়া একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় তাহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। গোবিন্দের যেন সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ষাঁড় দেখিয়া আমরা একবারে দে-ছুট। আমাদিগকে ছুটিতে দেখিয়া গোবিন্দও ছুটিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়ের গতিও দ্রুততর হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে এদিন তাঁতিরা রেউড়ীতলার পথটির পাশে যেন সূতার ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। আমরা অতি সন্তর্পণে সূতা বাঁচাইয়া ছুটিয়া চলিলাম। গোবিন্দের গলায় গাঁদার মালা ও সেই মালার লোভে ষাঁড়ের দুর্বার গতি দেখিয়া তাঁতিরা হাঁকিয়া উঠিল,—"মালা ফেলে দে,—গলা থেকে মালা খুলে ফেলে দে।" গোবিন্দও যেন ভয়ে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গলার মালাছড়টা তাড়াতাড়ি খুলিয়া তাঁতিদের সূতার ব্যূহের ভিতরই ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ষণ্ডরাজও সূতার বেড়া ভাঙিয়া মালার সহিত সূতার গুচ্ছ গ্রাস করিয়া নিমেষে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল। তাহারা তখন ষাঁড়কে রুখিবে, না গোবিন্দের বই-সিলেট কাড়িবে, ঠিক করিতে পারিল না;—গোবিন্দ ততক্ষণে পগারপার। পরে আমরা গোবিন্দর মুখেই শুনিয়াছিলাম, পাঁড়েহাবলীর ঐ বেপরোয়া ষাঁড়টিকে মালার টোপ দেখাইয়া সে রেউড়ীতলার গোরস্থানে টানিয়া আনিয়াছিল—তাঁতিদের বেয়াদপি দুরস্ত করিতে। এই ঘটনার পর হইতেই সত্য সত্যই তাহারা ঢিট্ হইয়া যায়, রাস্তা জুড়িয়া আর টানার বেড়া বাঁধে নাই।

এ সময় আমরা পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। উঁচু ক্লাসের ছেলেদের আমরা সসম্ভ্রমে পাশ কাটাইয়া চলি। তাহাদের সঙ্গে মেলা-মেশায় ও খেলাধূলায়

আমাদের ব্যবধান ছিল সব রকমেই,—বিদ্যার দিক দিয়াও বটে, এবং শক্তি-সামর্থ্য ও বয়সের অনুপাতেও। কিন্তু গোঁয়ার গোবিন্দের গতি এ দিকেও ছিল অবাধ। নাইন্থ-টেন্থএর ছেলেদের দলে ভিড়িয়া সে সব রকম খেলাই খেলিত। তাহাদের মধ্যে যখন পলিটিক্স লইয়া তর্ক বাধিত, গোবিন্দ তাহাতে মওড়া লইত, এই সূত্রে হাতাহাতির সূত্রপাত হইলেও সে পিছু হটিত না। আমরা এই গোঁয়ারের কাণ্ড দেখিয়া ভয়ে হিম হইয়া যাইতাম।

সত্যনারায়ণ নামে এক পাণ-ব্যবসায়ীর পুত্র আমাদের সহপাঠী ছিল। ক্লাসের বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত তাহার বনিবনাও হইত না। তাহার বাবা বোম্বায়ে বসিয়া পাণ বেচিত, আর সে কাশীতে থাকিয়া পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে পাণের চালান পাঠাইত। তাহার গলায় তুলসীর মালা, মাথায় লম্বা শিখা, টিকিটাও তাহার এতটা বাড়িয়া গিয়াছিল যে, আমিষভোজী বাঙ্গালী সহপাঠীদের প্রতি তাহার ঘৃণার অন্ত ছিল না। বাঙ্গালী ছেলেরা 'মছলি' খায়, সুতরাং নাসিকা তাহার বাঙ্গালীর নামেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিত। অথচ, তাহার মা যে বাঙ্গালীটোলার বাড়ী বাড়ী পাণের যোগান দিয়া ছাতুর সংস্থান করিত, সে তথ্য আমাদের কাহারও অবিদিত ছিল না। আমরা মাছ খাই, মাংস খাই সুতরাং আমরা অপাংক্তেয়,—এই লইয়া সে যখন বাঙ্গালীর নিন্দায় মুক্তকণ্ঠ হইত, আমরা মুখ চুপ করিয়া গায়ের ঝাল গায়ে মাখিলেও, গোবিন্দের তরফ হইতে তাহার জবাব আসিত। যে কিষণজীর সে একান্ত ভক্ত, তিনিও যে কত বড় আমিষভোজী ছিলেন, কত রকমের মাছ, মাংস, মায় শিক্-কাবাব পর্য্যন্ত তিনি পরম তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেন, 'হরিবংশ' কোট্ করিয়া গোবিন্দ তাহার ফতোয়া দিত। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া সে জানাইয়া দিত—মাছ-মাংস দেবতাদেরও কত বড় প্রিয় খাদ্য!

আমরা তখন গোঁয়ার গোবিন্দের এ সব বিষয়ে 'এলেম' দেখিয়া যেমন অবাক্ হইতাম, সত্যনারায়ণও তেমনই রাগে দুই চক্ষু পাকাইয়া গোবিন্দের দিকে চাহিয়া নিষ্ফল গর্জ্জন করিত। কিন্তু তবুও সে তাহার 'নিত্যকর্ম্ম' অর্থাৎ ক্লাসে বসিয়া সহপাঠী বাঙ্গালী ছেলেদের কুৎসা কোন দিনই পরিহার করিত না।

সত্যনারায়ণ প্রত্যহই তাহার কেতাবের বাক্সের সহিত এলুমিনিয়মের একটা বড় ডিপা লইয়া আসিত। এই ডিপার ভিতর পোয়া-ভোর ছাতু ও কয়েক ঢেলা আখের গুড় থাকিত। টিফিনের ছুটীর সময় জলখাবারের ঘরে বসিয়া—অতি সাবধানে বাঙ্গালী ছেলেদের সংস্পর্শ এড়াইয়া এগুলির সে সদ্ব্যবহার করিত। পাছে তাহার এই বিশুদ্ধ আহার্য্য মছলি-ভোজী বাঙ্গালী সহপাঠীদের অশুদ্ধ স্পর্শে দূষিত হয়, এই আশঙ্কায় সে ক্লাসে আসিয়াই খাবারের ডিপাটি একটা উঁচু তাকের উপর রাখিয়া দিত। সেই তাকটির দিকে আমরা তাকাইতেও ভয় পাইতাম, তাহাতে হাত দেওয়া ত দূরের কথা!

সে দিন টিফিনের ছুটীর সময় জলখাবার ঘরে খাবারের ডিপাটি খুলিয়াই সত্যনারায়ণ তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। আমরা চমকিত হইয়া তাহার দিকে ছুটিয়া গেলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে সচকিত ছাত্রদল তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া সবিস্ময়ে দেখিল,—তাহার কৌটার ভিতর ছাতু ও কয়েক ঢেলা গুড়ের সহিত ইলিশমাছের একখানা ভর্জ্জিত পেটি ও দিব্য পরিপাটি করিয়া বাঁধা চুলের একটি সূক্ষ্ম আটি! জলখাবার ঘরখানি সঙ্গে সঙ্গে সরগরম হইয়া উঠিল। সত্যনারায়ণজীর মুখখানা তখন একবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া সে নিজের মাথায় হাত দিয়া কি যেন খুঁজিল, তাহার পর লাফাইয়া উঠিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কোলের উপর হইতে কৌটার সহিত ছাতু, গুড় ও মাছের পেটিখানা মেঝের উপর গড়াইয়া পড়িল। আমরা সকলে স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখিলাম, সত্যনারায়ণের মাথায় সেই সুদীর্ঘ শিখাটি নাই,—সেইটিই সকল চক্ষুর অন্তরালে অতর্কিতভাবে তাহারই খাবারের কৌটার ভিতরে মাছের পেটির সহিত আশ্রয় লইয়াছিল।

কিন্তু কোন্ অদ্ভুতকর্ম্মা এ কর্ম্ম করিল? আমরা সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলাম মাত্র। গোবিন্দকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সে দিন সে সেকেণ্ড পিরিয়ডের পরেই পেটের ব্যথার অজুহাত দেখাইয়া ছুটী লইয়া বাড়ী গিয়াছে। মুখ ফুটিয়া না বলিলেও, বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না, এ কর্ম্মের কর্ত্তা কে। কিন্তু কাজটা যতই গর্হিত হউক, এই স্মরণীয় ঘটনাটির পর হইতেই সত্যনারায়ণ যেন একবারে

বদলাইয়া গিয়াছিল,—তাহার মুখে আর কোন দিন আমরা বাঙ্গালী বিদ্বেষের কথা শুনি নাই।

২

পড়াশুনা যে গোবিন্দ মোটেই করিত না, বা ক্লাসে নিত্যকার পাঠ একবারেই দিতে পারিত না, তাহা নয়। বরং এ সম্বন্ধে এ কথা বলাই সঙ্গত যে, এদিকে তাহার তত মনোযোগ দেখা যাইত না, যতটা মনোযোগ সে দিত বাহিরের নানাবিধ বাজে বই পড়ায় ও বাজে চর্চ্চায়। কিন্তু সময় সময় ইহাতেই সে এমনভাবে প্রশংসা অর্জ্জন করিত, আমরা যাহার হেতু নির্ণয় করিতে পারিতাম না।

একবার ইন্‌স্পেক্টর আসিয়াছেন স্কুল দেখিতে। অন্যান্য ইন্‌স্পেক্টরদের মত ইনি ক্লাসে ক্লাসে দেখা দিয়া তাঁহার কাজ বাজাইলেন না,—স্কুলের হল-ঘরে সকল ক্লাসের ছেলেদের একসঙ্গে জড় করাইয়া তিনি এমন সব বেয়াড়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, আমাদের পাঠ্য পুস্তকে আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই পড়ি নাই। তাঁহার কাছে যেন মুড়ি-মিছরির একই দর, স্কুল শুদ্ধ ছেলেদের উদ্দেশে একই প্রশ্ন। অঙ্ক সম্বন্ধে দুই একটা প্রশ্নের পর তিনি হঠাৎ একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া বলিলেন,—"এমন একজন বড়লোকের নাম তোমরা বলতে পার, যিনি ছেলেবেলায় ছিলেন খুব সাধারণ, কিন্তু নিজের চেষ্টায় বড় হয়ে ওঠেন, আর বড় হয়ে ছেলেবেলার অবস্থা ভোলেন নি?'

প্রশ্ন শুনিয়াই আমরা অবাক্। কয়েক জন এক একটা নাম বলিল, আমিও বলিলাম। কিন্তু দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিলাম না কেহই। গোবিন্দ উত্তর দিল,—"ইটালীর মুসোলিনি, স্যর!"

ইন্‌স্পেক্টর সস্মিতমুখে গোবিন্দের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—"তাঁর জীবনের কোন একটা ঘটনা থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পার?"

গোবিন্দ উত্তর দিল, "পারি, স্যর!—মুসোলিনি এক গরীব কামারের ছেলে, তাঁর বাপ লোহা পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটে রুটির সংস্থান করিতেন, মুসোলিনি স্কুল থেকে ফিরে তাঁর বাবাকে সাহায্য করতেন। তার পর বড় হ'য়ে যখন তিনি ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা, তখন হঠাৎ এক দিন কি একটা কাজে তাঁকে মফস্বল যেতে হয়। এত তাড়াতাড়ি তাঁকে বেরুতে হয় যে, সঙ্গে কোন লোক নেওয়া পর্য্যন্ত হয়নি, নিজেই মোটর চালিয়ে একা বেরিয়ে পড়েন। একটা গ্রামে এসে তাঁর মোটর বিগড়ে গেল। কাছেই একটা কামারশালা ছিল, কিন্তু সে দিন কি একটা পর্ব্ব থাকায় কামার কাজ করতে রাজি হ'ল না। মুসোলিনি তাকে রাজি করিয়ে নিজেই কাজে লেগে গেলেন। লোহার একটা শিক পুড়িয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটে, মোটরের যথাস্থানে লাগিয়ে দিলেন। মোটর ঠিক হয়ে যেতেই তিনি সেই কামারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—জান তুমি, আমি কে?—কামার এতক্ষণ অবাক্ হয়ে তাঁর কাজ দেখছিল। সে হাঁ ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মুসোলিনি তখন নিজের পরিচয় দিতেই সে ভয়ে বিস্ময়ে তাঁর সামনে হাঁটুগেড়ে ব'সে পড়ল। মুসোলিনি বললেন,—"আমার বাবাও ছিলেন ঠিক তোমারই মত এক বৃদ্ধ কর্ম্মকার,—আমি তাঁর সঙ্গে দুটি বেলা এই কাজ করেছি, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, বড় হয়েও আমি আমার ছেলেবেলার কাজ ভুলিনি।"

ইন্‌স্পেক্টর গোবিন্দের উদ্দেশে এমন ক'রে ধন্যবাদ দিলেন যে, আমরা একেবারে স্তব্ধ। শুধু কি তাই? গোবিন্দকে নিকটে ডাকিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কত বাহবা দিলেন;—হেড মাষ্টারের দিকে চাহিয়া তাহার সম্বন্ধে কতই প্রশংসা করিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, আমরা তখন মুসোলিনি নামে কোন মানুষ যে পৃথিবীতে আছে, তাহা জানিতাম না;—এ সব কথা যে বইয়ে লেখা আছে, তাহা সে সময় পড়িও নাই কোন দিন।

ক্রমে ক্রমে আমরা টেন্‌থ ক্লাসে উঠিলাম। আমি আমার স্থানটি বরাবরই কায়েমী করিয়া রাখিয়াছিলাম, অর্থাৎ আগেই ছিল আমার স্থান। গোবিন্দ কোন রকমে পাশ করিয়া ক্লাসে উঠিত, ভাল স্থান কোন বৎসরই সে অধিকার করিতে পারিত না এবং এজন্য তাহার মনে কোনরূপ সঙ্কোচ বা লজ্জার আভাস পাওয়া যাইত না। প্রথম স্থানটি আয়ত্ত করিয়া আমি যখন তাহার দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতাম, সে তখন তাহার ব্যায়ামপুষ্ট চওড়া বুকখানা ফুলাইয়া, লোহার মত শক্ত হাত দুইখানা প্রসারিত করিয়া আমার দিকে রুখিয়া আসিত, মুখের ব্যঙ্গ হাসিটুকু

তখনই আমার মুখেই মিলাইয়া যাইত,—ছুটিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতাম।

কি জানি কেন, গোড়া হইতেই আমার মনে গোবিন্দের উপর একটা অহেতুকী বিদ্বেষ ও ঈর্ষার সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্লাসের পড়ায় সে আমার সমকক্ষ না হইলেও, বাহিরের নানা বিষয়ে তাহার অসাধারণ পটুতা তাহাকে যেন অনেক উপরে তুলিয়া আমার মনে একটা বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। যত রকমের খেলা আছে, গোবিন্দর নাম সকলের আগে। যত কিছু দুঃসাহসের কাজ, গোবিন্দ তাহার মূলে। সুইমিং কম্পিটিসনে গোবিন্দই বরাবর মওড়া লয়, পলিটিক্যাল ডিমনেষ্ট্রেশনে ছাত্র-পাণ্ডা গোবিন্দ, স্থানীয় স্বাস্থ্য-পরিষদের আসরেও এই বয়সেই তাহার কত কদর। বুকের উপর পাথর তুলিয়া সকলকে অবাক করিয়া দেয়, দুই চক্ষু বাঁধিয়া তীর ছুড়িয়া লক্ষ্যভেদ করে। চেষ্টা করিয়া পড়াশুনায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে অতিক্রম করা হয় ত কঠিন নয়, কিন্তু পড়াশুনার বাহিরে এই সব ব্যাপারে আমার গোবিন্দর মত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করা দূরের কথা, তাহার কাছেও ঘেঁসা যে, ইহ-জীবনে আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারি এবং সম্ভবতঃ এই জন্যই গোবিন্দের উপর আমার এই নিষ্ফল আক্রোশ।

এই আক্রোশ আরও কঠোর করিয়া দিলেন—আমাদের নবাগত হেডমাষ্টার ভবতোষ ভাদুড়ী মহাশয়। কাশীতে প্রতিষ্ঠা আমাদের বহুদিনের। কয়েকখানি বাড়ীভাড়ার আয় ও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ ছিল আমাদের উপায়। হেডমাষ্টার ভবতোষ বাবু কাশীতে আসিয়া আমাদেরই একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন। সুতরাং এই সূত্রে স্কুলের বাহিরে অন্যদিক দিয়া আমি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। ছুটি বেলাই তাঁহার বাসায় যাইতাম। বাসাতে তাঁহার লোকজন বেশী ছিল না। বাড়ীর গৃহিনী ছিলেন তাঁহারই এক বিধবা পিসী, এবং কন্যা শক্তি ছিল মাষ্টার মহাশয়ের একমাত্র অবলম্বন। শক্তির বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর, সেই সময় সে মাতৃহীনা হয় এবং এই মাতৃহারা মেয়েটির মুখ চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় আর দ্বিতীয় সংসার পাতেন নাই।

শক্তি মাষ্টার মহাশয়ের অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়ে। এমন চৌখস মেয়ে আমি বুঝি পূর্ব্বে আর দেখি নাই। আমি যখন তাহার সংস্পর্শে প্রথম আসি, তখন তাহার বয়স তেরো বৎসর মাত্র। কিন্তু সেই বয়সেই সে লেখাপড়ায় এতটা আগাইয়া পড়িয়াছিল যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রথম যে দিন আমি মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাহাকে দেখি, সে তখন সে দিনের 'অমৃতবাজার' পড়িয়া মাষ্টার মহাশয়কে শুনাইতেছিল। ইংরাজী খবরের কাগজ পড়িবার কায়দা ও উচ্চারণভঙ্গী আমাকে একবারে অবাক্ করিয়া দেয়। ক্রমে তাহার সহিত পরিচয়সূত্রে জানিতে পারিলাম, সে পৃথিবীর সমস্ত দেশের খবর রাখে, রাজনীতির চর্চ্চা করে, বিভিন্ন সমাজের সভ্যতার সন্ধান লইতে চেষ্টা পায়। আর,—দেশাত্মবোধ যেন সহজাত সংস্কারের মত এই মেয়েটির মনে একটা স্বাভাবিক অনুভূতির প্রেরণা দিয়াছিল।

রূপের দিক দিয়া শক্তি যে অসাধারণ সুন্দরী ছিল, তাহা নয়। কিন্তু তাহার সুশ্রী মুখখানিতে এমন একটা আশ্চর্য্যজনক দীপ্তি ছিল ও বড় বড় উজ্জ্বল দুইটি চক্ষুতে এমন কিছু বিশেষত্ব দেখা যাইত যে, হাজারের মধ্যে এমন আর একটি মেয়ে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন ছিল।

আমাদের বাড়ীতে তাহারা ভাড়াটে ও স্কুলের মধ্যে আমি সব চেয়ে ভাল ছেলে; সুতরাং এ বাড়ীতে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শক্তির সহিত মিশিবারও সুযোগ অতি সহজেই আমার পক্ষে ঘটিয়া গিয়াছিল। লেখাপড়া লইয়া শক্তির সঙ্গে যখন আলোচনা চলিত, তখন আমার উৎসাহ যেমন বাড়িয়া যাইত, পক্ষান্তরে, দেশ-বিদেশের রাজনীতি লইয়া শক্তি যখন অনধিকারচর্চ্চা আরম্ভ করিত, তখন ঐ মেয়েটির অকালপক্কতা আমাকে যেন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, আমার মুখখানা তখন ছাইয়ের মত বিবর্ণ হইয়া যাইত। কারণ, নিজের লেখাপড়া ছাড়া বাহিরের আর কোন বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিবার স্পৃহাও যেমন আমার মনে খোঁচা দিত না, সুযোগও তেমনই ঘটিয়া উঠিত না,—বাহিরের ব্যাপারে আমি একবারে অজ্ঞই ছিলাম।

মাষ্টার মহাশয় শুধু যে ছেলে পড়াতেন ও হেডমাষ্টারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া যাইতেন, তাহা নয়; স্কুলের বাহিরেও তাঁহার কাজের অন্ত ছিল না। বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন, রাজনীতি-সংক্রান্ত কয়েকখানা কেতাবও তিনি

ছাপিয়া বাহির করিয়াছিলেন, স্বদেশী সভা-সমিতি-গুলিতে তিনি অবাধে মিশিতেন ও বক্তৃতা দিতেন। এই সব কারণে অতি শীঘ্রই তিনি কাশীতে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সুতরাং এমন নামজাদা হেড মাষ্টারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ঘটায়, সহপাঠীদের নিকট আমি একটু গর্ব্বিত হইয়াই উঠিয়াছিলাম, এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষতঃ তাঁহার কন্যা শক্তির সম্বন্ধে অনেক কথাই অতিরঞ্জিত করিয়া সকলকে শুনাইয়া চমকিত করিয়া দিতাম। কিন্তু হঠাৎ এক দিনের ব্যাপারে আমার এই অহঙ্কারটুকুও চূর্ণ হইয়া গেল এবং গোবিন্দ এ দিকেও তাহার হঠকারিতার প্রবাহে আমাকে টপকাইয়া হেড মাষ্টার মহাশয়ের একান্ত অন্তরঙ্গ হইয়া গেল। যদিও ব্যাপারটি অতি সাধারণ, কিন্তু আমার পক্ষে যেন অসাধারণ হইয়াই উঠিল।

সেদিন হেড পণ্ডিত মহাশয় ক্লাসে অনুপস্থিত থাকায় হেডমাষ্টার স্বয়ং ক্লাসে আসিয়া বসিলেন। কহিলেন,—"তোমরা কে কেমন রচনা করতে পার, আমি তার পরীক্ষা নেব।"

তাহার পরই বোর্ডে খড়ি দিয়া লিখিলেন,—"সাপের সঙ্গে অন্য কোন জন্তুর তুলনা দিয়া তাহার বর্ণনা খুব সংক্ষেপে মুখে প্রকাশ কর।"

এমনভাবে রচনার পরীক্ষা আমরা কোন দিনই দিই নাই। তবুও একে একে সকলকেই উঠিতে হইল। সাপের সম্বন্ধে দুই চারি কথা কেহ কেহ বলিল,—অনেকের কথা আটকাইয়া গেল, উপমা দিতে গিয়া হাসির সৃষ্টিও করিল কেহ কেহ। আমার মুখের দিকে সকলের দৃষ্টি; আমি কহিলাম,—সাপ বাঘের মত ভয়ঙ্কর, সুতরাং বাঘের সহিত তাহার তুলনা করা যায়। সাপ কামড়াইলেই মানুষ মরিয়া যায়। সাপের অনেক নাম, যথা—

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন,—থাক, তার পর, তুমি?

আমার পাশের ছেলেটি বার দুই গলা ঝাড়িয়া লইয়া সাহস করিয়া উত্তর দিল,—সাপ ঠিক লতার মত। মানুষের এমন শত্রু আর নাই।

শেষে গোবিন্দের পালা আসিলে সে দাঁড়াইয়া কহিল,—"সাপের সঙ্গে শুধু হিংসুটে মানুষের তুলনা করা যায়। হিংসুটে যেমন ভাল মানুষের শত্রু, সাপও তেমনই মানুষের সাক্ষাৎ শত্রু।

আমরা সকলেই গোবিন্দর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। পরক্ষণেই তাহার সম্বন্ধে মাষ্টার মহাশয়ের কি মনোভাব, তাহা পরীক্ষা করিতে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম, মাষ্টার মহাশয় তর্জ্জনী সঙ্কেতে তাহাকে কাছে আহ্বান করিতেছেন।

গোবিন্দের রচনা শুনিয়া আমরা যত না অবাক হইলাম, এই রচনা সূত্রে গোবিন্দর প্রতি মাষ্টার মহাশয়ের একটা অপরিসীম অনুরাগের আভাস পাইয়া ততোধিক চমৎকৃত হইলাম। শুধু কি এই অনুরাগ এই স্থানেই সমাপ্ত হইয়াছিল।—কয়েক দিনের মধ্যেই গোবিন্দ মাষ্টার মহাশয়ের পরিজনদেরও এমন প্রিয়জন হইয়া উঠিল যে, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসার-শকটটির চাকাগুলি যেন এত দিন মরিচা ধরিয়া অচল হইয়া পড়িয়াছিল, গোবিন্দ আসিবামাত্রই তাহার সংস্পর্শে সহসা গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে।

৩

অন্যান্য বিষয়ে যতই পাকা হউক না কেন, আঁকে শক্তি ছিল অত্যন্ত কাঁচা, আর এই বিষয়টিতে আমার নৈপুণ্য ছিল অসামান্য। তাই শক্তির এ দিকের এই ত্রুটিটুকু সংশোধনের ভার পড়িয়াছিল আমার উপর। প্রত্যহ বৈকালে আমি তাহাকে অঙ্ক শিখাইতাম। যতক্ষণ আমি তাহার কাছে একা থাকিতাম, সে আঁকেই মন নিবিষ্ট করিয়া রাখিত, কিন্তু গোবিন্দ আসিলেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিত, আঁকের দিকে আর তাহার মনোযোগ থাকিত না—খেলিবার জন্য সে তখন কোমর বাঁধিয়া উঠিয়া পড়িত।

প্রাচীর ঘেরা ছোট একটু ফাঁকা যায়গার ভিতর খেলিবারও নানাবিধ ব্যবস্থা ছিল। খেলার বিষয়-বস্তুগুলি অঙ্কের মত আমার নিকট অবশ্যই সুখবোধ্য ছিল না। প্রত্যেক খেলাটাই ছিল জটিল ও একান্ত সজীব রকমের। আমাকে যেন একবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। ছোরা খেলার নানারূপ কৌশল, লক্ষ্যভেদ, লাঠি ঘোরান—এই সব ছিল ইহাদের খেলার অঙ্গ। গোবিন্দ যে এ সব খেলায় কতটা ওস্তাদ, তাহা আমাদের অবিদিত ছিল না, কিন্তু মাষ্টার মহাশয় তাঁহার এই মেয়েটিকেও যে এই সকল বেয়াড়া রকম শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন,

তাহা জানিতাম না। কাজেই শক্তিকে আঁক শিখাইতেছি বলিয়া আমার মনে যে গর্ব্বটুকুর সঞ্চার হইত, গোঁয়ারতুমির অদ্ভুত অদ্ভুত কসরৎ দেখাইয়া—শক্তির মুখের দীপ্তিটুকু আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, সে গর্ব্ব আমার গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ভাঙিয়া দিত।

একদিন একটা শক্ত অঙ্ক শক্তিকে বুঝাইয়া দিতেছি, এমন সময় পিসীমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ঐ—যাঃ! সেমিজটা তোর বাঁদরে নিয়ে গেল রে, শক্তি—"

শক্তি লাফাইয়া উঠিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া কহিল,—"তুলসীদা, ঐ দেখ—গোদা বাঁদরটা আমার নতুন সেমিজটি নিয়ে নিমগাছে উঠছে!"

বিরক্ত হইয়া আমাকেও উঠিতে হইল। দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড বাঁদর শক্তির সুন্দর সেমিজটি দুই হাতে নিবিষ্টমনে দেখিতেছে। আমি কহিলাম,—"ওর আশাটি ছেড়ে দাও, এখনই ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে।"

শক্তি কহিল,—"না, তার আগে ওটিকে উদ্ধার করতে হবে।"

আমি কহিলাম,—"তা হ'লে এক কাজ কর, একটা কিছু ফল কি তরি-তরকারি ওকে দেখিয়ে উঠানের উপর ফেলে দাও, তা হ'লে সেমিজটা ছাড়তেও পারে—"

ঠিক এই সময় গোবিন্দ আসিয়া গোঁয়ারের মত কহিল,—"অমন কাজও ক'র না শক্তি, ঘুস দিয়ে কাজ উদ্ধার করলে ঘুসখোরদের আস্পর্দ্ধা আরও বেড়ে যায়,—তার চেয়ে ঘুসীই বরং ভাল—"

রাগে জলিয়া উঠিয়া কহিলাম,—"বেশ ত, তোমার বন্ধুটির সঙ্গে একবার ঘুসোঘুসী ক'রে বীরত্বটা দেখাও না।

গোবিন্দ কোনও জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমি শক্তির মুখের দিকে চাহিয়া কহিলাম,—"আমার কথা শোন, একটা কিছু খাবার জিনিস এনে উঠোনে ফেলে দাও—"

কিন্তু সে কোন উত্তরও দিল না, নড়িলও না। আমি তখন কয়েকটা ঢেলা লইয়া বাঁদরটার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িলাম, কিন্তু কোনটিই তাহার নিকটে পৌছাইল না, বাঁদরটা আমার দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র না করিয়া সেমিজটি মুখের দিকে তুলিয়া ধরিল। পিসীমা আর্ত্তস্বরে কহিলেন,—"এই রে, এবার পোড়ারমুখো দাঁত দিয়ে ওটা কুটোকুটি ক'রে—"

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সেই দুর্দ্ধর্ষ জীবটি একটা তীব্র আর্ত্তনাদ তুলিয়া গাছের সর্ব্বোচ্চ শাখাটির উপর লাফাইয়া উঠিল এবং সেই সঙ্গে তাহার মুখভ্রষ্ট হইয়া সেমিজটা নীচে পড়িয়া গেল। আমরা সবিস্ময়ে দেখিলাম,—গোবিন্দ নিমগাছটার কাণ্ডের ঠিক উপরিভাগে একটা মোটা শাখার উপর বসিয়া হাসিতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সকলের অলক্ষ্যে এই স্থানটিতে উঠিয়া সে বানরটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলটী ছুড়িয়াছিল এবং তাহারই অব্যর্থ আঘাতে সে আহত হইয়া সেমিজটি ফেলিয়া নিরাপদ স্থানে আত্মগোপন করিয়াছে।

মনে হইল, গোবিন্দের হাতের গুলটী আমারও হৃৎপিণ্ডটি ভাঙিয়া দিয়াছে।

শক্তি হাসিয়া কহিল,—"ভাগ্যিস্ তুলসীদার কথা শুনে বাঁদরটাকে ঘুষ খাওয়াই নি! গোবিন্দ-দা কিন্তু ভারি সত্যি কথা বলেছে,—ঘুস খাইয়েই ত আমরা এই জাতীয় জীবদের আস্পর্দ্ধা আরও বাড়িয়ে দিই।"

মুখখানা নীচু করিয়া আমি শক্তির কথা শুনিলাম, কোনও উত্তর আমার মুখ হইতে বাহির হইল না।

—

৪

টেষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা পরীক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। শক্তিও আমাদের সহিত পরীক্ষা দিবে,—তবে প্রাইভেটে। এ পর্য্যন্ত কোনও স্কুলের খাতায় শক্তির নাম উঠে নাই, বরাবর সে বাড়ীতেই পড়িয়া আসিতেছে।

গোবিন্দও আসে, আমিও আসি। মাষ্টার মহাশয় আমাদের দুজনকেই যত্ন করিয়া পড়ান, প্রয়োজনীয় নোটগুলি লিখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, শক্তিও আমাদের সঙ্গে বসিয়া সব শোনে, নোট্ লেখে।

সদর-দরজার দুই পাশে দুইখানি ঘর। একখানিতে আমরা সকলে পড়াশুনা করি, অন্যখানি মাষ্টার মহাশয়ের লাইব্রেরী, মাঝে একখানা গোল টেবল, চারিপাশে আলমারীভরা নানাবিধ বই।

ঘর দুখানার পরেই সরু একটা দালান, তাহার পরেই ছোট একটু অঙ্গন; তাহার এক দিকে প্রাচীর ঘেরা বাগানটিতে যাইবার রাস্তা, অন্যদিকে পাকের ঘর, আরও কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর। উপরে বড় বড় তিনখানা ঘর,—একটি মাষ্টার মহাশয়ের নিজস্ব, একখানি শক্তির, অন্যখানি পিসীমার ব্যবহার্য্য। উপরের ঘরে আমি বা গোবিন্দ কেহই যাইতাম না, যাইবার প্রয়োজনও হইত না। কিন্তু ইদানীং পড়াশুনার পর মাষ্টার মহাশয় গোবিন্দকে তাঁহার ঘরে ডাকিতেন। গোবিন্দ যখন উপরে যাইত, শক্তি তখন আঁকের খাতা লইয়া তাহার কাজ গুছাইতে বসিত। যদিও গোবিন্দর উপরে যাওয়া ব্যাপারটি আমার মনের উপর একটা কালো দাগ কাটিয়া দিত, কিন্তু শক্তি সম্মুখে থাকায় সে দাগটুকু গভীর হইয়া ফুটিবার অবকাশ পাইত না। পরে শক্তির কাছেই শুনিলাম, মাষ্টার মহাশয় কি একখানা বই তর্জ্জমা করিতেছেন। তিনি বলেন, গোবিন্দ লেখে। কথাটা শুনিয়া, অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। মাষ্টার মহাশয় যে আমাকে লুকাইয়া গোবিন্দকে লেখা-পড়া সম্বন্ধে কোনও বিশেষ তালিম দিতেছেন না—ইহাই ছিল আমার সান্ত্বনার বিষয়।

সেদিনও যথারীতি পড়াশুনার পর মাষ্টার মহাশয় উপরে চলিয়া গেলেন। মিনিটকতক পরেই গোবিন্দর ডাক পড়িল। সে তাহার বই ও খাতা গুছাইয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেল। আমরাও অঙ্ক লইয়া পড়িলাম।

কয়েকটা অঙ্ক করিবার পর, কি একখানা খাতার সন্ধানে শক্তি লাইব্রেরী-ঘরে গিয়াছিল। হঠাৎ দেখি, সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সদরের রুদ্ধ দরজা সশব্দে খুলিয়া বাহিরের দিকে ঝুকিয়াছে। তাহার গতির ক্ষিপ্রতা ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্য আমাকে চমকিত করিয়া তুলিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া তাহার পাশটীতে গিয়াই প্রশ্ন করিলাম,—"হয়েছে কি?"

শক্তি তখন রাগে ফুলিতেছিল। বাহিরের রাস্তার দিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া কহিল,—"সেই ইতরটা আজ বাড়ী বয়ে আমাকে অপমান করতে এসেছে, তুলসীদা! জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে দূরবীণ কষছিল,—ঐ দেখ, ওদিকে স'রে গিয়ে ইতরের মত কি রকম হাসছে! ওকে ধরত তুলসীদা—"

সর্ব্বাঙ্গ আমার শিহরিয়া উঠিল,—মুহূর্ত্তমধ্যেই বুঝিলাম, ব্যাপার কি এবং ইহার মূলে কে!—এই বাড়ীর অনতিদূরেই প্রাসাদোপম একখানি সুবৃহৎ ত্রিতল বাড়ী বহুদিন তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়িয়াছিল। কয়েক দিন হইল, তাহার বন্ধন ঘুচিয়াছে এবং গীতে, বাদ্যে ও কলকণ্ঠে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। বিহারের এক তরুণ জমীদার এই বাড়ীর মালিক;—তিনি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য কাশীভ্রমণে আসিয়াছেন এবং এই শান্তশ্রীমণ্ডিত মহল্লাটিকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার নানা অনাচারের কথা ইতি-মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িয়াছে, তন্মধ্যে অপরাহ্নে উচ্চ ছাদে উঠিয়া দূরবীণ-সংলগ্ন-নয়নে দিগ্‌দর্শনচ্ছলে সন্নিহিত আবাসভবনগুলির উপর দৃষ্টিসঞ্চারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শক্তিই প্রথম এ কথা প্রকাশ করে। আমি কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা গায়ে মাখিয়া ঐ জমীদারের এক পার্শ্বচরকে ডাকিয়া গোবিন্দ বেশ দু'কথা শুনাইয়া দেয়। পার্শ্বচর তাহার ধনাঢ্য প্রভুর প্রভুত্বের ফক্কোয়া তুলিলে, গোবিন্দও তাহার স্বভাবসিদ্ধ রূঢ়স্বরে জানায়,—পুনরায় যদি এইভাবে ছাদে উঠিয়া দূরবীণ কষা হয়, তাহা হইলে তাহার দুই চক্ষুর দফা সে রফা করিয়া দিবে।

শক্তির কথায় এ-কথা মনে পড়িয়া গেল; বুঝিলাম, সেই শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ জমীদার গোঁয়ার গোবিন্দের কথার উত্তর দিতে আজ বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্পন্দিতবক্ষে সভয়ে মুখখানি বাহিরের দিকে বাড়াইয়া দেখিলাম,—সত্যই তাহাই। দূরবীণ হস্তে জমীদার নিজে উপস্থিত, সঙ্গে দুই জন পার্শ্বচর।

শক্তির কথা শুনিয়া এবং আমাকে তাহার পাশ দিয়া উঁকি দিতে দেখিয়া সে বুকখানা ফুলাইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল। আমি শশব্যস্ত হইয়া শক্তিকে সবলে ভিতরে টানিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। শক্তি বোধ হয় ইহা প্রত্যাশা করে নাই,—সে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—"তুলসীদা!"

দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছে,—ঠোঁট দুইখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে! দরজার অর্গলটির উপর সবেমাত্র হাতখানি রাখিয়াছি,—সে সজোরে আমার হাত সরাইয়া দিয়ে উত্তেজিতকণ্ঠে ডাকিল,—"গোবিন্দদা!"

স্কন্ধে একটা প্রবল ঝাঁকুনির স্পর্শ অনুভব

করিয়া ফিরিয়া দেখিলাম,—গোবিন্দ আমাকে সরাইয়া দিয়া দরজা খুলিতেছে।

একটা আসন্ন সংঘাত কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। মাষ্টার মহাশয়ও গোবিন্দর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারদেশে পদার্পণের পূর্ব্বেই গোবিন্দ তখন রুখিয়া বাহিরে গিয়া মহড়া লইয়াছে।

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, গোবিন্দর প্রথম আক্রমণেই তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া সপারিষদ জমীদার পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন, কিন্তু গোবিন্দ তখন মোরিয়া হইয়া তাহাদের পিছু পিছু ছুটিয়াছে। মাষ্টার মহাশয় তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু গোঁয়ারের ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমরাও তাহাদের অনুগমনে বাধ্য হইলাম। জমীদারের বাড়ীর দেউড়ীর নিকট গিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম,—ভিতরে তখন একটা তীব্র আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে এবং গোবিন্দ ছুটিয়া বাহিরে আসিতেছে। তাহার হাত দুইখানি রক্তাক্ত,—গায়ের পাঞ্জাবীটাও ছিন্নভিন্ন ও রক্তরঞ্জিত।

মাষ্টার মহাশয় তাহাকে সেই অবস্থায় বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেলেন। আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইল। শক্তি দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিল।—সে তখন গোবিন্দর সেবায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আঘাত গোবিন্দ অল্পই পাইয়াছিল, কিন্তু সে যে কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া পড়িলাম।—সংঘর্ষে জমীদারের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে ও তাহার একটি চক্ষু একবারে গলিয়া গিয়াছে; পার্শ্বচর দুই জনের অবস্থাও শোচনীয়।

এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হইয়া থাকে, তাহার কোনও অসদ্ভাব ঘটিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই মহল্লা সরগরম হইয়া পড়িল,—পুলিসের আগমন, এজেহার গ্রহণ,—আহতদের হাঁসপাতালে প্রেরণ, কিছুরই অপ্রতুল হইল না। মাষ্টার মহাশয়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও বিশেষ প্রয়াসে যদিও গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ধৃত হইয়া হাজতে আবদ্ধ হইল না, কিন্তু জমীদারের পক্ষ হইতে সে সম্বন্ধে প্রবল তদ্বিরের অভাব দেখা গেল না।

অপরাহ্ণে মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া দেখিলাম, শক্তি ও গোবিন্দ মুখোমুখি বসিয়া কি যেন আলোচনা করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহারা আলোচনা বন্ধ করিল। গোবিন্দের একটা ব্যঙ্গ কটাক্ষ যেন আমার বুকে তীরফলের হুল ফুটাইয়া দিল। শক্তি হঠাৎ কহিল,—"এবার থেকে ঘোমটা দিয়ে এখানে এসো, তুলসীদা,—ছেলে ব'লে আর পরিচয় দিও না।"

গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গের সুরে কহিল,—"অমন কথা ব'ল না ওকে,—স্কুলের ফার্ষ্ট বয়,—সব চেয়ে ভাল ছেলে।"

শক্তি তীক্ষ্ণস্বরে কহিল,—"লেখাপড়া শিখে অমন ভাল ছেলে হওয়ার চেয়ে, লেখাপড়া না শিখে দস্যি ছেলে হওয়া ঢের ভাল। মনে তোমার একটুও বোধ নেই, তুলসীদা।—ইতরের ইতরামী দেখে একেবারে ভয়ে এতটুকু?—ঘরে ঢুকে দরজায় খিল্ দিতে লজ্জা হ'ল না?"

আমার মনে হইল, পায়ের তলা হইতে পৃথিবীর পিঠখান বুঝি সরিয়া যাইতেছে। আমারই বাড়ীতে বসিয়া এত বড় অপমান আমাকে করিতে শক্তি সাহস পায়? কে উহাকে এ সাহস দিয়াছে?—যাহার চাল নাই, মামার বাড়ীতে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, মামারা দয়া করিয়া প্রতিপালন করিতেছে, সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই,—সেই বওয়াটে গোঁয়ার গোবিন্দই আজ শক্তির নিকট এত প্রিয়,—তাহার সহিত মিশিয়া আমাকে এভাবে লাঞ্ছিত করিতে বাধে না!

ভাল ছেলেও আজ শক্তির বাক্যবাণে বিগড়াইয়া গেল এবং যত কিছু রাগ সমস্তই গিয়া পড়িল গোবিন্দর উপর। ঈর্ষা যখন মানুষকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে, তখন অতি দুর্ব্বল-প্রকৃতির ভাল মানুষও দুর্ব্বার হইয়া অসাধ্যসাধন করিয়া বসে।

মাষ্টার মহাশয়ের বাসা হইতে সরাসরি জমীদারবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাহিরের বৈঠকখানা তখন গুলজার,—সহরের নামজাদা উকীল-মোক্তার সকলেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন।—আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া জমীদার-পক্ষ আমাকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন।

ভাল ছেলে হইলেও, এ খবরটুকু ভালভাবেই জানা ছিল যে, এই মামলায় আমার প্রয়োজন কতখানি এবং আমার সাক্ষ্য কতটা মূল্যবান্। তবে বুদ্ধিমানের মত আমি আট-ঘাট বাঁধিয়াই বৈর-নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইলাম।

গোবিন্দ-যে জমীদারের বাড়ী চড়াও হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইতে বিলম্ব হইল না। আমি যদিও গোবিন্দের

পক্ষে হইতে সাক্ষ্য দিয়াছিলাম, এবং জবানবন্দীতে প্রকৃত কথাই বলিয়াছিলাম, কিন্তু জেরায় গোবিন্দর গোঁয়ারতুমীর নানা কথা এবং আলোচ্য ঘটনা এমন বেফাঁসভাবে বলিয়া ফেলিলাম যে, গোবিন্দর তরফের উকীল হায় হায় করিয়া উঠিলেন।

মাষ্টার মহাশয় এলাহাবাদ হইতে আইনজ্ঞ ব্যারিষ্টার আনাইয়া গোবিন্দকে মুক্ত করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। গোবিন্দ তিনটি বৎসরের জন্ত শ্রীঘরবাসে আদিষ্ট হইল।

অনেকে গোবিন্দর এই শাস্তিতে ব্যথা পাইল, অনেকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—গোঁয়ারের পরিণাম এমনই হয়। স্তব্ধ হইয়া গোবিন্দর শাস্তির কথা শুনিলাম। কে যেন মনের দ্বারে আঘাত করিয়া প্রশ্ন করিল,—এর জন্ত দায়ী কে?

কিন্তু পরক্ষণে মনে হইল,—আজ আমি নিষ্কণ্টক। কথায় কথায় গোবিন্দর খোঁটা আর সহিতে হইবে না,—আমি ছাড়া শক্তিরও আর দ্বিতীয় সহচর নাই। কিন্তু সে-দিন শক্তির সহিত দেখা করিতে মন সরিল না, পা উঠিল না।

পরীক্ষা হইয়া গেল। গোবিন্দ জেলে গিয়া পরীক্ষার দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছে। কিন্তু শক্তি কেন-যে প্রস্তুত হইয়াও পরীক্ষা দিল না, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। শক্তিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে একান্ত উদাস ভাবে উত্তর দিল,—"ইচ্ছা হ'ল না, দিলুম না; কি হবে পরীক্ষা দিয়ে!"

গোবিন্দর অভাবে এই সংসারটির উপর যে একটা বিরাগের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিলে মনে হয়, তাঁহার বয়স যেন সহসা দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

পরীক্ষার ফল বাহির হইল। আমি যতটা আশা করিয়াছিলাম, তাহা হইল না। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছি শুনিয়া মনটা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। আত্মীয়স্বজন সকলেরই ধারণা ছিল যে, আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ত হইবই, বৃত্তিও পাইব।

অতঃপর স্থির হইল, আমি এলাহাবাদে থাকিয়া আই-এ পড়িব। যাইবার আগের দিন মাষ্টার মহাশয়ের সহিত দেখা করিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। তিনি প্রসন্নমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শক্তি হাসিয়া কহিল,—"আমাদের যেন ভুলে যেও না তুলসীদা, কাশীতে এলে দেখা ক'রো।"

৫

তিন বৎসরের পরের কথা। এখন বি-এ পড়িতেছি। এলাহাবাদে থাকিলেও গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটীতে কাশী আসিয়া থাকি। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় বা শক্তির সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে-সময় আসি, তখন তাঁহারাও ছুটী পাইয়া কাশী ছাড়িয়া বাহিরে যান। কাজেই দেখা-সাক্ষাতের আর সুযোগ ঘটে নাই। বাড়ীতে একটা কাজ ছিল, সেই উপলক্ষে দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া অসময়েই আমাকে কাশী আসিতে হইয়াছে।

বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মাষ্টার মহাশয় এখানেই আছেন এবং আমাদের সেই বাড়ীতেই একাদিক্রমে বাস করিতেছেন। সন্ধ্যার পরেই মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। শক্তি তখন লাইব্রেরী-ঘরে ছিল। তাহার দৃষ্টির সহিত আমার দৃষ্টি মিলিত হইতেই উভয়েই বোধ হয় চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। যে-শক্তিকে তিন বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছিলাম, আজ আর সে-শক্তি নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ যৌবনের লাবণ্য তাহার সেই স্বাস্থ্য-পুষ্ট কমনীয় দেহখানিকে সর্ব্বশ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আগেকার সুন্দর চক্ষু দুইটি যেন অধিকতর আয়ত ও দৃষ্টির প্রভা যেন আরও চমক-প্রদ হইয়াছে। মুগ্ধভাবে আমি শক্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম।

শক্তি তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল,—"তুলসীদা! তুমি? কি সৌভাগ্য! ও ঘরে বসবে চল—"

অপর দিকের সেই চিরপরিচিত ঘরটির ভিতর আসিয়া বসিতেই গোবিন্দের স্মৃতি যেন সহসা মনে জাগিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলাম,—"সৌভাগ্য বরং আমার বলতে পার শক্তি,—কেন না, যতবারই আমি এসেছি এখানে, তোমাদের দর্শন পাইনি। আজ আসবা-মাত্র তোমাকে দেখেই বুঝেছি, আমার ভাগ্য আজ ভালই!"

শক্তি কহিল,—"সে আমি শুনেছি। তোমার খবর আমরাও রাখি তুলসীদা, তুমি না জানালেও। পাস করেছ খবর পেয়েছি, কায়স্থ কলেজে পড়ছো—তাও জানি।"

আশ্চর্য্য! শক্তি তাহা হইলে আমার সংবাদ রাখে! তবে শক্তি আমাকে আজও মনে রাখিয়াছে!—আনন্দে, উৎসাহে এবং সেই সঙ্গে একটা আশার হিল্লোলে সারা মন যেন দুলিয়া উঠিল।

অনেক কথাই হইল। মাষ্টার মহাশয় সেই হেডমাষ্টারীই করিতেছেন। খানকতক বইও তাঁহার বাহির হইয়াছে। আয়ও কিছু বাড়িয়াছে। শক্তি আর পরীক্ষা দেয় নাই, তবে পড়াশুনা ছাড়ে নাই। আশ্চর্য্য এইটুকু যে, গোবিন্দ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিল না, শক্তির মুখে যত কথা শুনিলাম, তাহার মধ্যে গোবিন্দর নামটুকুও সে তুলে নাই। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

শক্তির অনুরোধে একটু জলযোগও করিতে হইল। দীর্ঘকাল পরে শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া যে আনন্দ আজ পাইলাম, এমন বুঝি আর কখনও পাই নাই,—কিম্বা হয় ত, তিন বৎসর পূর্ব্বে এ বাড়ীতে গোবিন্দর শুভাগমনের পূর্ব্বে কতকটা পাইয়াছিলাম। কিন্তু আজ? যাহার দিকে চাহিলে চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া যায় না, সমস্ত রাত্রি অনিদ্রভাবে যাহার সহিত কথোপকথন করিয়াও কিছুমাত্র ক্লান্তি আসিতে পারে না,—এমন কামনার নিধি আমার সম্মুখে বসিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আমার সহিত আলাপ করিতেছে, একটুও কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই, দ্বিধা নাই,—আমার মত ভাগ্যবান্ কে! এইমাত্র অনুশোচনা,—গোবিন্দ আমার এই সৌভাগ্য দেখিতে পাইল না। এই শক্তির হৃদয়দুর্গ এক দিন যে প্রায় আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, আজ-সে জেলের কয়েদী, সভ্য-সমাজে তাহার স্থান নাই, প্রবেশাধিকার নাই,—তাই গোবিন্দর নামটুকুও আর শক্তির মুখে প্রসঙ্গক্রমেও উঠিবার অবকাশ পায় না।—কোথায় গেল গোবিন্দর সেই গোঁয়ারতুমীর গর্ব্ব! বিদ্যা এবং অর্থের প্রভাব আজ শক্তির চিত্তকেও অভিভূত করে নাই কি?

জলযোগ শেষ হইতেই শক্তি কহিল,—"আমাকে আজ একজিবিসন দেখিয়ে আনবে, তুলসীদা? আমি একদিনও যাইনি। বাবার ওসব ভাল লাগে না। আমিও ত যার তার সঙ্গে যেতে পারি না।"

আনন্দে একেই মন দুলিতেছিল, এবার নাচিয়া উঠিল। শক্তি আমার সহিত একজিবিসনে যাইতে চায়,—যাহার তাহার সহিত যাইতে সে নারাজ! ওঃ! শক্তি তাহা হইলে আমাকে এত আপনার ভাবিয়াছে,—এতটা নির্ভর—

তখনই সানন্দে সম্মতি জানাইলাম। শক্তি সোল্লাসে কহিল,—"তুমি তা হ'লে একটু ব'স, তুলসীদা। আমি কাপড়খানা ছেড়ে আসি,—দশ মিনিটের বেশী দেরী হবে না।"

দশ মিনিট! হায় শক্তি! তুমি কি বুঝিবে, তোমার প্রতীক্ষায় আমি কত শত মিনিট—কত দীর্ঘ মাস বসিয়া থাকিতে পারি!—বসিয়া বসিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম, কাল প্রত্যূষেই কিম্বা আজই একজিবিসন দেখিয়া ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট প্রস্তাবটা করিয়া ফেলিব। আমি ত কোন অংশেই অযোগ্য নহি। বংশমর্য্যাদা, সমাজে প্রতিষ্ঠা, ঘরবাড়ী, সম্পদ, বিদ্যা—কিসে আমি শক্তির অনুপযুক্ত?

মিশরিপোখড়ার প্রকাণ্ড ময়দানটিকে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে পরিণত করিয়া বিরাট একজিবিসন বসিয়াছে। নেত্রবিভ্রম ও চিত্তবিনোদনের সকল উপাদানই সন্নিবেশিত হইয়াছে। দোকানগুলি দেখিয়া, কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ক্রীড়া উপভোগ করিয়া আমরা ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, তখন সহসা শুনিলাম, এইবার একটা অদ্ভুত রকমের শক্তির কসরৎ দেখান হইবে, এবং আজই এই ভয়ঙ্কর খেলার উদ্বোধন। শক্তি শুনিয়াই সচকিত হইয়া উঠিল। শোনা গেল, ৮০ ফুট উচ্চ একটা মইএর উপর হইতে এক পাঞ্জাবী শক্তিধর অগ্নিপ্রজ্বলিত-দেহ নিম্নে জলপূর্ণ ট্যাঙ্কে লম্ফপ্রদান করিবে। শত শত দর্শক—বহু ভদ্রমহিলা এই ভয়াবহ ব্যাপার দেখিবার জন্তই উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অবিলম্বে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল,—দীর্ঘদেহ এক শিখ যুবক বাজের তালে তালে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি যখন মঞ্চে উঠিতে আরম্ভ করিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বিদায় দিয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিলেন,—"এ পর্য্যন্ত ভারতের কোনও জাতি—অন্ত কোনও ভারতবাসী এমন অসমসাহসের কাজে অগ্রসর হ'তে পারেনি,—ইনিই

প্রথম ভারতবাসী এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্ছেন।"

পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে আমি ও শক্তি বসিয়াছিলাম। আমার মনে তখন অন্য কোন আনন্দ স্থান পায় নাই;—শক্তির সঙ্গ ও অপ্রত্যাশিত ব্যবহার আমার মনে তখন তুফান তুলিতেছিল। হঠাৎ ঠিক এই সময় মনের আবেগে বলিয়া ফেলিলাম,—"জুলিয়স্ সিজর একদিন বলেছিল, 'এলুম, দেখলুম, আর জয় করলুম।' এ আমারও বুঝি তাই হয়েছে, আমিও আজ এ কথা বলতে পারি।"

শক্তি মুখ ফিরাইয়াছিল, সহসা আমার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিল। দুই চক্ষু যেন জ্বলিতেছে। সহসা তাহার এ উত্তেজনা কেন? মনে কোনও অস্বাভাবিক উত্তেজনা না আসিলে চক্ষুর দৃষ্টি ত' এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। তবে কি আমার সঙ্গ শক্তির সতৃষ্ণ চিত্তেও এই উত্তেজনার হিল্লোল তুলিয়াছে?

শক্তি প্রশ্ন করিল,—"এ কথা বলবার মানে?"—স্বর শুনিয়া বুঝিলাম, তাহার কণ্ঠও যেন কাঁপিতেছে।

উত্তর দিলাম,—"মানে বুঝতে পারছ না, শক্তি? যে আশা তিনটি বৎসর মনের ভিতর লুকিয়েছিল, আজ তা চরিতার্থ হয়েছে। তিন বৎসর পরে এসেই, প্রথম সাক্ষাতেই-যে তোমার হৃদয় এমন করে জয় করতে পারব—"

অস্বাভাবিক স্বরে শক্তি কহিল,—"ওঃ, তুমি বুঝি এতক্ষণ এই স্বপ্নই দেখছিলে, তুলসীদা? আর আমার সারামন বিষিয়ে উঠেছে—ওদের ঐ গর্ব্বের কথা শুনে! আশ্চর্য্য এইটুকু, একটা বাঙ্গালীও ও-কথার প্রতিবাদ করলে না,—ও কথা, মিথ্যে প্রতিপন্ন করতে মুখ তুলে দাঁড়ালে না কেউ?"

আমি ত' একবারে অবাক্। কোন্ কথার কি উত্তর! বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম,—"কি বলছ?"

শক্তি তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল,—"আমার কথা বোঝবার শক্তি তোমার নেই, তুলসীদা,—তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল, আমি আর এখানে তিষ্ঠুতে পারছি না—"

সবেগে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি বাধা দিয়া কহিলাম,—"ওর ঝাঁপ দেওয়াটা দেখবে না?"

উত্তেজিতভাবে মাথা নাড়িয়া দৃপ্তস্বরে শক্তি কহিল,—"না-না না, আমি দেখতে চাই না। এর আগেও আমি এই রকম ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি—এর চেয়েও ঢের উঁচু মঞ্চ থেকে,—কিন্তু সে ছিল—বাঙ্গালী! যদিও সে আর ওঠেনি, তবুও তাতে আমার গর্ব্ব! অতগুলো বাঙ্গালী এখানে এসে জড় হয়েছে, একজনও যদি এগিয়ে যেতো—ওঃ! আমার মাথা ঘুরছে, তুলসীদা, আমি পালাই এখান থেকে—"

কাজেই আমাকেও তাহার অনুসরণ করিতে হইল। পথে সে বরাবর গম্ভীর হইয়াই চলিল, কোন কথা মুখে নাই; যন্ত্র-চালিত পুতুলের মত যেন কোনরকমে সে পথ বাহিয়া চলিয়াছে। আমি দুই একবার কথা পাড়িলাম, কিন্তু কোনও সাড়াই পাইলাম না।

বাড়ীতে ফিরিয়া শক্তি যেন সহসা সে ভাবটা জোর করিয়া কাটাইয়া লইল। আমাকে দরজা হইতেই বিদায় না দিয়া বাহিরের ঘরটিতে বসাইয়া কহিল,—"একটু অপেক্ষা কর, তুলসীদা, আমি আসছি এখনই।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসিল। মুখের ভাব এখন সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। চক্ষুর দৃষ্টিতে সে ভাবনার চিহ্নও নাই। সহসা কহিল,—"হাঁ তুলসীদা, তুমি নেপোলিয়নের লাইফ পড়েছ?"

উত্তর দিলাম,—"তা আর পড়িনি?"

"আচ্ছা, অষ্টারলীজের যুদ্ধের ব্যাপারটা তোমার মনে আছে? অর্থাৎ ঐ যুদ্ধের সবচেয়ে কৌতুককর ব্যাপার যেটুকু?"

মুখ সহসা শুকাইয়া গেল। নেপোলিয়নের কাহিনীটুকু মোটামুটি মনে আছে, এ আবার কি প্রশ্ন? উত্তর দিলাম,—"কৈ, তা ত' মনে হচ্ছে না!"

শক্তি হাসিয়া কহিল,—"আমি সম্প্রতি পড়েছি কি না, তাই মনে আছে। বললে হয়ত' তোমারও মনে পড়বে।—অষ্টারলীজের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয়, তখন সবাই ভেবেছিল, নেপোলিয়ন হারবেন। কেন না, শত্রুদের তুলনায় তাঁর সৈন্যবল অনেক কম। যুদ্ধ আরম্ভ হবার ঘণ্টা-কতকের মধ্যেই ফরাসীরা পেছুতে লাগল, অষ্ট্রীয় সেনাপতি দূরবীণ কসে দেখলেন, হতাবশিষ্ট ফরাসীরা পালাচ্ছে। তিনি তাদের সমূলে ধ্বংস করবার হুকুম দিয়ে নিজের শিবিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি যুদ্ধের রিপোর্ট লিখতে বসলেন। রাজাকে জানালেন,—ঘণ্টা-

কতকের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হতে বসেছে, ফরাসী সৈন্য সমূলে ধ্বংস, নেপোলিয়ন পলাতক। এরই একটু পরেই নেপোলিয়ন তাঁর ইম্পিরিয়াল গার্ড লেলিয়ে দিয়ে অষ্ট্রীয় সেনাপতির স্বপ্ন চুরমার ক'রে দিলেন। য়ুরোপের রাজারা নেপোলিয়নের পরাজয় শুনে যখন নৃত্য করছিলেন, তখন সহসা বিপরীত সংবাদ শুনে তাঁরা কেঁপে উঠলেন!—আচ্ছা, বল ত', মানুষ অত বড় হয়েও এমন আহাম্মুক হয়?"

চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সহসা এ গল্প আমাকে শক্তি শুনাইল কেন? একদিন বিজন গাউনে আমি তাহাকে ভলিয়াস সিজারের কথা কোট করিয়া যাহা শুনাইয়াছি, ইহা কি তাহারই প্রত্যুত্তর? তবে কি আমি সত্যই ভুল করিয়াছি?

শক্তি উঠিয়া কহিল,—"অনেক রাত হয়েছে, তুলসীদা, এসো না হ'লে—"

নীরবে নিজের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। শক্তি সশব্দে সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

৬

পরদিন সকালে মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় আসিয়া বাহিরের সেই ঘরখানির ভিতর প্রবেশ করতেই চমকিয়া উঠিলাম। আশ্চর্য্য!—শক্তি ও গোবিন্দ উভয়ে মুখোমুখি বসিয়া কথার স্রোত তুলিয়াছে,—তিন বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে তাহাদিগকে বসিতে দেখিয়াছিলাম ও যাহা দেখিয়া আমার ঈর্ষা তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল!

আমাকে দেখিবামাত্র গোবিন্দ লাফাইয়া উঠিল, সবেগে আমার হাতখানি টানিয়া ঝাঁকুনি দিয়া কহিল,—"কেমন আছিস তুলসী? চিনতে পেরেছিস ত'?"

দেখিলাম, জেল খাটিয়াও গোবিন্দর চেহারার কোনও অবনতি হয় নাই, বরং দেহের গঠন যেন আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ঝাঁকুনি খাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া গেল। মুখে হর্ষের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু যতদূর সম্ভব, সে ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া কহিলাম,—"কবে এসেছ? খবর কি?"

শক্তি উত্তর দিল,—"এসেছে রাত বারটার ট্রেণে। বাবা নিজে গিয়েছিলেন আনতে, মির্জ্জাপুরের জেলে ছিল কি না! সেই জন্যই কাল বাবাকে দেখতে পাওনি।"

মুহূর্ত্তে সারা মন যেন তিক্ত হইয়া গেল। কাল ত' আমাকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই শক্তি বলে নাই। গোবিন্দর কথা সম্পূর্ণে বাদ দিয়া আমার সঙ্গে কথা কওয়া,—এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল?

গোবিন্দর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলাম,—"জেলে গিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎটাই নষ্ট ক'রে ফেললে; লেখাপড়া গোল্লায় গেল, ভদ্রসমাজে মেশবারও পথ রইল না!"

শক্তি হাসিয়া কহিল,—"লেখা-পড়ার কোনও ক্ষতি হয় নি দাদা, তুলসী!—বাবা সে ব্যবস্থা ভাল রকমেই করেছিলেন! আর ভদ্রসমাজে মেশবার কথা বলছ ত,—সেটা নেহাৎ ভুল। সাহিত্য-বাবের মিশবার চান, তারা ইউনিভারসিটির সার্টিফিকেটের পরোয়া রাখে না, আর সাহিত্যবাবের ভদ্র যারা হ'তে চান—তারা যেচে বাবার সঙ্গে মিশতে যান। হ্যাঁ, ভাল কথা,—তোমাকে একটা সুসংবাদ দিই, জেলফেরত এই দাগী ছেলেটিই একজিবিসনের সেই হাই-জাম্পে পাঞ্জাবী চ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

নিজের অজ্ঞাতেই আমার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্টভাবে একটা স্বর নির্গত হইল—"হ্যাঁ!"

শক্তি মুখখানি রীতিমত শক্ত করিয়া কহিল,—"হ্যাঁ, ইনি বলেছেন—চলার পথে বাঙ্গালী চিরদিনই এগিয়ে গিয়েছে, আর এগিয়ে থাকবে, তার স্থান আগেই।"

স্তব্ধভাবেই কথাটি শুনিলাম মাত্র!

এই সময় মাষ্টার মহাশয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি সসম্ভ্রমে তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিলাম,—"কাল এসেছিলাম, দেখা পাই নি।"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—শক্তির কাছে সে কথা শুনেছি, বাবা! আমি গিয়েছিলুম মির্জ্জাপুরে—গোবিন্দকে আনতে। আমিও তোমাদের বাড়ীতেই যাব বলেই বেরিয়েছি,—চল একসঙ্গেই যাই।"

প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে মাষ্টার মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি হাসিয়া কহিলেন,—"চলেছি তোমার বাবাকে জানাতে যে, আসছে বুধবার শক্তির বে।"

আমার সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়া উঠিল, পা দুইখানা বুঝি

থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। কম্পের বেগ কণ্ঠের স্বরকেও স্পর্শ করিয়াছিল, কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম,—"শঙ্করের বে! বলেন কি? কার—কার সঙ্গে?"

মাষ্টার মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,—"বুঝতে পারনি এখনও? ঐ যে—পাত্র তোমার সামনেই ব'সে হে!"

দেখিলাম,—শঙ্করের সেই প্রতিভাদীপ্ত অপূর্ব্ব মুখখানি আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে,—আর গোবিন্দ তাহার পরিপুষ্ট প্রশস্ত মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া ধরিয়াছে—হাসির দীপ্তিতে তাহার মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত।

আর আমার কথা কি বলিব,—হঠাৎ পিছন হইতে পিঠের উপর চাবুকের আঘাত দিলে বিস্ময় ও বেদনাবোধের যে ভাবটুকু মুখে ফুটিয়া উঠে, তাহাই বুঝি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

কবির মানস-প্রতিমা

উষসী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কবির মানস-প্রতিমা

উষসী

১

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীর ভিতরের দিকে বারান্দার কোন বিশেষ কোণে পাঁচ-ছয় বৎসরের দিব্যকান্তি এক শিশুর অপরূপ পাঠশালা বসিয়াছে। যেমন অদ্ভুত মাষ্টার, ততোধিক অদ্ভুত এই পাঠশালার ছাত্রদল এবং তাহাদের শিশু-শিক্ষকটির শাসনের প্রচণ্ড প্রতাপ।

ছোট একখানি চৌকিতে মাষ্টার বসিয়াছেন, হাতে তাঁর লাঠির মত একগাছি মোটা বেত, মাষ্টার মহাশয়ের মুখখানা বর্ষার বর্ষণোন্মুখ আকাশের মত গম্ভীর। তাঁর সামনের দিকে ছাত্রদের সারি—বারান্দার একই আকারবিশিষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট কতকগুলি রেলিং! কিন্তু তাহাতে কি হইয়াছে, অদ্ভুত শিক্ষকের প্রাণবন্ত কল্পনা এই দারুময় নিৰ্জ্জীব বস্তুগুলিকেই ছাত্রদলের সামিল করিয়া লইয়া ইহাদের প্রকৃতি পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রেণীবদ্ধ ছাত্ররূপী রেলিংগুলির শ্রীর পার্থক্য আমাদের এই শিশুশিক্ষকটির দৃষ্টিপথে এরূপ সুস্পষ্ট যে, ইহাদের মধ্যে কোন্‌গুলি বুদ্ধিমান, কাহারা বোকা, কোন্‌টি খুব ভাল মানুষ, আর কে কে অত্যন্ত খারাপ বা দুষ্ট—ইহা নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র বেগ তাঁহাকে পাইতে হয় না।

বুদ্ধিমান ছেলেদের প্রতি শিক্ষক মহাশয়রা চিরদিনই সদয় ও প্রসন্ন থাকেন, যাহারা ভাল মানুষ ছেলের দলে—পড়াশুনায় তেমন ভালো না হইলেও, শিষ্টতার অনুরোধে তাহাদিগকেও রেহাই পাইতে দেখা যায়; কিন্তু খারাপ বা মন্দ ছেলেদের দুর্গতির আর অন্ত থাকে না। আমাদের এই শিশুশিক্ষক মহাশয়টির ক্লাসেও এই সনাতন নীতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পড়ানো অপেক্ষা পীড়নটাকেই ইনি বেশীমাত্রায় প্রশ্রয় দিতে সচেষ্ট; ফলে চিহ্নিত মন্দ ছেলেগুলির উপর ক্রমাগত তাঁহার হাতের লাঠি পড়িয়া পড়িয়া এমনই তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটাত যে, বাকশক্তি এবং প্রাণশক্তি থাকিলে তাহারা চীৎকার তুলিয়া বাড়ী মাথায় করিত, আর প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিত।

একদিনও অপরাহ্ণে শিক্ষক মহাশয় সনাতন ব্যবস্থায় দুষ্ট ছেলে কয়টির উপর অতিশয় নির্দ্দয়ভাবে লাঠি চালাইতেছিলেন। আজ যেন তাঁহার মাথায় খুন চাপিয়া বসিয়াছে। লাঠির চোটে দুর্গতদের দেহের বিকৃতি যতই ঘটিতেছে, ততই তাহাদের উপর শিক্ষক মহাশয়ের রাগ ভীষণভাবে বাড়িয়া উঠিতেছে; কি করিলে তাহাদের যে যথেষ্ট শাস্তি হইতে পারে, তাহা যেন ভাবিয়া ভাবিয়া কুলাইতে পারিতেছেন না।

পীড়ন যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন ছোট একটি বালিকা অকুস্থলে উপস্থিত হইয়া সকৌতুকে কহিল: এ আবার কি খেলার ঢং? কাঠের রেলিংগুলোকে অমন ক'রে ঠেঙ্গাচ্ছো কেন?

শিক্ষক মহাশয় অবিচলিত কণ্ঠে জানাইলেন: দেখতে পাচ্ছ না, ইস্কুল করে বসেছি। এগুলো হচ্ছে তারি পাজি ছেলে, তাই শাসন করছি।

কলহাস্যে বালিকা কহিল: বা-রে, ওরা ত' গরাদে, ছেলে হতে যাবে কেন?

শিক্ষক উত্তর দিলেন: আমিও ত' ছোট্ট ছেলে, মাষ্টারী করছি কেন? আমাদের ইস্কুলে যা হয় দেখি, তাই করছি! এতগুলো জ্যান্ত ছেলে কোথায় পাব বল, তাই বারান্দার রেলিংগুলোকেই ছেলে করে নিয়েছি। আমাদের ইস্কুলেও এমনি হয়।

দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল: এমনি করে বেদম ঠেঙ্গায়?

শিক্ষক কহিলেন: শুধু তাই? আরও অনেক শাস্তি দেয়। পড়া বলতে না পারলে

বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দুহাতে দুগাদা শ্লেট দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নাড়ুগোপাল ক'রে রাখে। এর উপর যারা দুষ্টুমি করে, তাদের পিঠে পড়ে সপাসপ বেত— আমি যেমন করে পিটেছিলোম।

বালিকা ক ভাবিয়া প্রশ্ন করিল: তোমাকেও মারে ত'?

মুখখানা গম্ভীর করিয়া শিক্ষক উত্তর দিলেন: আমি ত' দুষ্টুমি করি না, মারবে কেন? এই ছেলেটির মত আমি যে একধারে চুপটি ক'রে বসে থাকি। আমি কি এটাকে চাবুক পেটা কোনদিন করেছি?—বলিয়াই হাতের ছড়িটি দিয়া শিক্ষক মহাশয় তাঁহার ক্লাসের নির্দিষ্ট স্থান মানুষ রেলিং-ছাকটিকে নির্দেশ করিলেন।

ঠোঁট দুটি উল্টাইয়া কোমল মুখখানির এক অপরূপ ভঙ্গি করিয়া বালিকা কহিল: হ্যাৎ! ছাই খেলা! তার চেয়ে চলো না ওদিকে যাই, সব দেখি।

—কোথায়? কি সব দেখবো শুনি?

—রাজার বাড়ী গো? সেখানে কত কি!

মুখখানি ম্লান করিয়া বালক বলিলেন: জান ত', বাইরে বেরবার যো নেই. আমার যাওয়া হবে না।

বালিকা সহাস্যে জানাইল: বাইরে কেন, রাজার বাড়ী যে এই বাড়ীর ভেতরেই। চল না যাই।

বালকের মন ও দৃষ্টি তাঁহার ছাত্রদের দিকেই নিবদ্ধ, সমবয়স্কা খেলার সঙ্গিনীর একান্ত অনুরোধেও বিক্ষিপ্ত হইল না। অভিমানে বালিকা রাজার বাড়ীর তল্লাসে চলিয়া গেল।

এই শিশু-শিক্ষক জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবংশের দুলাল—রবীন্দ্রনাথ। ভাবী কবির শৈশবের এই আখ্যায়িকাটি অবলম্বন করিয়া আমরা কথা আরম্ভ করিতেছি।

২

কথার পূর্বে ঠাকুরবংশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অপরিহার্য্য। বংশের দুলালকে চিনিতে হইলে, বংশলতাটির গতিধারার সন্ধানটুকুও জানা আবশ্যক। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং রাজধানী কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর-পরিবারের ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত হয়। বর্ত্তমান গড়ের মাঠে এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সান্নিধ্যে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান আমীন জয়রাম ঠাকুরের আমীরোচিত বিশাল বাসভবন তাঁহার সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। জয়রামের মৃত্যুর পর ফোর্ট উইলিয়ামের কলেবর বৃদ্ধির প্রয়োজন হওয়ায় কোম্পানী তাঁহার দুই পুত্র নীলমণি ও দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্যে উদ্যান-সম্বলিত উক্ত অট্টালিকা ক্রয় করেন। অতঃপর ইঁহারা পাথুরেঘাটায় সপরিবারে বসবাস করিতে থাকেন। ১৭৮৪ অব্দে কলিকাতার এই বিশিষ্ট ঠাকুরবংশটি দ্বিধাবিভক্ত হয়। জয়রামের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমণি ঠাকুর জোড়াসাঁকোয় বহু ব্যয়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কনিষ্ঠ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের গোষ্ঠী পাথুরিয়াঘাটার পুরাতন প্রাসাদেই বসবাস করিতে থাকেন। মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন, রাজা স্যার সৌরীন্দ্র-মোহন প্রভৃতি এই গোষ্ঠীর বংশধর। আর স্বনামখ্যাত প্রিন্স দ্বারকানাথ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জোড়াসাঁকো ঠাকুর গোষ্ঠীর মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তান।

শেষোক্ত গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিপুল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। যেন—এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়! দ্বারকানাথের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল সম্মান, অসামান্য ব্যক্তিত্ব এদেশ ও বিদেশের রাজপুরুষ এবং অভিজাতবর্গকে চমৎকৃত করিয়া তুলে। তৎকালে এমন কোন জনহিতকর অনুষ্ঠান ছিল না, দ্বারকানাথের অর্থে যাহা পুষ্ট হইবার সুযোগ না পাইয়াছে। তাঁহারই উদ্যোগে জমিদার-সভা (Landholder's Society), ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি স্থাপিত হয়। রাজ-পুরুষগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি সম্পর্কে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। তখনকার গভর্ণর-জেনারেল প্রায়ই জোড়াসাঁকোর প্রাসাদে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। বিদেশেও দ্বারকানাথের সম্মান-প্রতিষ্ঠার অন্ত ছিল না। রোমে মহামান্য পোপের নিকট তিনি সমাদৃত হন, ইটালীর রাজা, ফ্রান্সের সম্রাট লুই ফিলিপ এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া দ্বারকানাথের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন;

এমন কি, বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে সাম্রাজ্ঞীর সহিত ভোজন করিবার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে রাজার মত বিলাস আড়ম্বরে ও বিপুল জাঁকজমকে থাকিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'প্রিন্স' বলিয়া সম্মানিত করিতেন। সেই সূত্রেই তিনি 'প্রিন্স দ্বারকানাথ' নামেই পরিচিত।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ। স্বনামখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনধারা আধ্যাত্মিক পথ অবলম্বন করে এবং তাহাতেই তিনি 'মহর্ষি' আখ্যা লাভ করেন। পিতামহীর অন্ত্যেষ্টিকালে দেবেন্দ্রনাথের মনে প্রথম বৈরাগ্যভাবের সঞ্চার হয়। তখন তিনি নবীন যুবা, বয়স অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র। এই বয়সেই সত্যতত্ত্ব জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ দুর্বার হইয়া ওঠে। তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহারই উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ, ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ, উপনিষদের অনুবাদ রচনা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দেয়। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। জীবনের শেষ ভাগে অধিকাংশ কালই তিনি উত্তর-ভারতে হিমালয় অঞ্চলে থাকিয়া যোগসাধনা করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহধর্মিণী সারদা দেবী যথার্থই রত্নগর্ভা ছিলেন। তাঁহার গর্ভজাত পনেরোটি পুত্রকন্যার মধ্যে অধিকাংশই কৃতী, বিখ্যাত এবং বংশ ও জাতির গৌরবস্বরূপ। জ্যেষ্ঠ ঋষিকল্প সুধী দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় ভারতের প্রথম সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ, আর এক পুত্র স্বনামধন্য সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কন্যা সুপ্রসিদ্ধা স্বর্ণকুমারী প্রভৃতি।

যে-শিশুটির কাহিনী আমরা সূচনায় উল্লেখ করিয়াছি, তিনি মহর্ষির সপ্তম পুত্র। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৭ মে, ১৮৬১) ঠাকুরবংশের সহিত জাতির মুখ উজ্জ্বল করিতে শুভক্ষণে জোড়াসাঁকোর ভবনে অবতীর্ণ হন। তাহার পর এই কয়টি বৎসর বিরূপ ধরা-বাঁধা ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শিশুর জীবনযাত্রা চালিয়াছে, নিজের মনেই তাহার চর্চা করিয়া শিশু তুষ্ট থাকেন, এক এক সময় তাঁহার সমবয়স্কা সঙ্গিনীটির কাছে এ সম্বন্ধে এক-আধটি কথা ব্যক্ত করেন, এই পর্য্যন্ত।

জ্ঞান হইয়া অবধি শিশু দেখিয়া আসিতেছেন, কোন বিষয়েই তাঁহার স্বাধীনতা নাই, সদাসর্ব্বদাই তাঁহাকে চাকরদের শাসনের অধীনে থাকিতে হয়; তাহারাও আবার এ সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, নিজেদের কর্ত্তব্যকে স্মরণ করিবার জন্য তাহারা এ বাড়ীর শিশুদের নড়াচড়া পর্য্যন্ত এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শ্যাম নামে এক চাকরের প্রতাপ ও প্রভাব এতই কড়া যে, শিশু রবিকে সে ঘরের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া তাঁহার চারিদিকে গণ্ডী কাটিয়া দিত। আর সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর মুখে তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত—'খবরদার! গণ্ডীর বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ।' কথাটা শুনিয়া শিশুর মনে বড়ো রকমের একটা আশঙ্কা জাগে; কেন না, এই বয়সেই তিনি রামায়ণের আখ্যায়িকায় লক্ষ্মণের গণ্ডী পার হইয়া সীতার সর্ব্বনাশের কাহিনীটি শুনিয়াছেন। কাজেই গণ্ডী পার হইতে মনে তাঁর আশঙ্কা জাগিত যদি কোন সর্ব্বনাশই আসিয়া পড়ে।

কিন্তু শিশু-রবির দৃষ্টিকে ত আর গণ্ডিবন্ধনের বন্দী করিয়া রাখা সম্ভবপর ছিল না, ডাগর ডাগর দুটি চক্ষুর অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ঘরের জানালার মুক্ত গরাদের ভিতর দিয়া সন্নিহিত পুকুরটিকে একখানা ছবির বহির মত করিয়া নিবিষ্টভাবে পড়িয়া যাইতেন। তাহাতে কত-কিছুই সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতিপটে রেখা টানিয়া দিত। নানা আকার ও প্রকৃতির যে সব পুরুষ নারী নানা দিক হইতে বহু বিচিত্র ভঙ্গীতে পুকুরের জলে নামিয়া অবগাহন করে, তাহাদের মধ্যে কাহার স্নান করিবার ধারায় কিরূপ বৈচিত্র্য, স্নানের সঙ্গে সঙ্গে কে কিরূপ স্তব মন্ত্র আওড়াইয়া থাকে—শিশুর দৃষ্টিতে কিছুই এড়াইত না, স্থায়িভাবে দাগ টানিয়া দিত। শুধু কি এইভাবে নিরবচ্ছিন্ন দেখিয়া শুনিয়াই চলিত? দেখিতে দেখিতে মনে হইত শিশুর—ঐ পুকুর, তার ওপারে জল, গাছের বাগান, মাটি, গাছপালা, দূরের আকাশ, প্রত্যেকেই যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে, আলাপ করিতেছে কত কি বলিতেছে, ইহারা যেন ঘরের ভিতরে গণ্ডিবন্ধনে-আবদ্ধ শিশুর মনটিকে কিছুতেই উদাসীন থাকিতে দিবে না, জগৎ ও জীবন এই দুটির মধ্যে কি রহস্যময় সম্বন্ধ—ইহারা যেন জোর করিয়াই শিশুর মনে তাহার জট পাকাইয়া দিতে ব্যস্ত।

শিশুর নড়-চড়-সম্বন্ধে ত' এরূপ শাসন, খাওয়া পরার ব্যাপারটিও অতিশয় সাদাসিদা এবং সাধারণ। আহারে সৌখীনতার নামগন্ধও নাই, কাপড়চোপড়ও এতই যৎসামান্য যে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বংশধরের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। অথচ চাকরদের ব্যবস্থা সব দিক দিয়াই সকল রকমে এতই স্বতন্ত্র ছিল যে, শিশু তাহার আভাসই পান মাত্র, নাগাল পান না। এক-কথায় শিশুর পক্ষে বাঞ্ছিত কোন জিনিসই সহজে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ আবেষ্টনে শিশু-রবি মানুষ হইতেছিলেন তাঁহার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আর দুইটি বালকের সঙ্গে। তাঁহাদের একজন শিশুর 'জ্যোতিদাদা' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অন্যটি ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশ। ইঁহাদের তুলনায় শিশু-রবির বয়স অনেক অল্প, তথাপি এই বয়সেই পাঠ্যপুস্তক লইয়া ইঁহাদের সহিত গৃহশিক্ষকের নিকট পড়িতে বসেন, তিনি সুর করিয়া পাঠ দিলেন—জল পড়ে, পাতা নড়ে। শিক্ষকের মুখে সুরের এই প্রথম ঝঙ্কার শিশুর কানে যেন অমিয় বর্ষণ করে, কে যেন তাঁহাকে চুপিচুপি বলিয়া দেয়—আদি কবির ইহাই প্রথম কাব্য। আনন্দে শিশু-মন নাচিয়া ওঠে, মধুর স্বরে বার বার পড়িতে থাকেন সুর করিয়া—জল পড়ে, পাতা নড়ে। পাঠের গতি ক্রমশঃ অগ্রগামী হইতে থাকে, পরবর্ত্তী পাঠে আনন্দ যেন ছাপাইয়া ওঠে, শিশু সুর করিয়া পড়েন—বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান। শিশুর মানস-নদও পুলকের বানে ভাসিয়া যায়।

এই অবস্থায় একদা শিশু-রবি শুনিলেন, তাঁর দুই বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গী বাড়ীর পড়া শেষ করিয়া ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারীতে ভর্ত্তি হইবেন। শিশুর তখন কি বিক্ষোভ, দুর্জ্জয় জিদ—এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন না কিছুতেই, তিনিও ভর্ত্তি হইবেন। গৃহশিক্ষক বুঝাইলেন, বাধা দিলেন, পিঠে চপেটাঘাত করিলেন, কিন্তু শিশুর জিদ ও দারুণ রোদন সব ব্যর্থ করিয়া দিল। অগত্যা তিনিও ঐ সঙ্গে ভর্ত্তি হইবার অধিকার পাইলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের সংস্রবে গিয়া শিশু শিক্ষকমহাশয়দের শাসনপ্রণালীর যে নিদর্শন পান, ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া বারান্দার একটি বিশেষ কোণে বিরূপ উৎসাহে তাহার অনুকরণ করেন—প্রথমেই তাহার চিত্র আমরা অঙ্কিত করিয়াছি।

৩

এত অল্পবয়সে কোন ছেলেই বড়ো স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতে যায় না। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর শিক্ষক মহাশয়গণ সম্ভবত শিশু-রবির প্রতি তাদৃশ মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের এই শিশু-ছাত্রটি যে ছুটির পর বাড়ী গিয়া খেলাধুলার ছলে তাঁহাদেরই অনুষ্ঠিত শাসন-পদ্ধতির অভিনয় করিয়া থাকে, এ সংবাদ সম্ভবত তৎকালে কেহই তাঁহাদের কানে তুলিবার সুযোগ পান নাই। এদিকে শিশুর উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়িল; এই বিদ্যালয়টি তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে পারিল না। শিশু-রবি এবার নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

কিন্তু এখানেও গোল বাধিল এবং কতিপয় পদ্ধতি শিশুর মনে প্রচণ্ড দোলা দিল। শিশু দেখেন, ক্লাস বসিবার আগেই স্কুলের ছেলেরা একত্র সারিবদ্ধ হইয়া স্তোত্রের মত করিয়া একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করে। কি যে পড়ে, কেহই তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারে না, কোনরূপ অর্থবোধও কেহ করে না, শিক্ষকমহাশয়রাও অর্থটা বুঝাইয়া দেন না। শিশুর মন ইহাতে বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। কিন্তু মনের ক্ষোভ মনে চাপিয়া তিনি পাঠাভ্যাসে রত হইলেন।

কিন্তু এখানেও বিঘ্ন উপস্থিত করিল সহপাঠীদের অশিষ্ট ও অসঙ্গত আচরণ এবং একটা ব্যবধান রচিয়া উঠিল—ক্লাসের কোন শিক্ষকের মুখে কদর্য্য ও কুৎসিত ভাষার উচ্চারণে। অশিষ্ট ব্যবহার ও অভদ্র ভাষার প্রতি শিশুর বিদ্বেষ ও বিরাগ এমনই নিবিড় হইয়া উঠিল যে, তিনি সহপাঠীদের সহিত মিশিতেও পারিলেন না এবং অভদ্র সেই শিক্ষকটির সহিতও সহযোগিতা করিলেন না।

শিশু-রবির বয়স এ সময় সাত-আট বৎসর, অনুভব-শক্তি অতিশয় প্রবল, সতর্ক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিদ্যালয়ের কত রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়; কিন্তু মুখে তাঁহার কোন কথাই কেহ শুনিতে পায় না, ক্লাসে সবার শেষে তিনি নীরবে বসিয়া থাকেন। বিশেষতঃ, তাঁহার বিদ্বিষ্ট শিক্ষকটি ক্লাসে বসিলে তাঁহাকে একেবারে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে দেখা যায়। শত চেষ্টা করিয়াও এই শিক্ষক নির্ব্বাক ছাত্রটির মৌনব্রত ভঙ্গ করিতে পারেন না। অগত্যা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে রীতিমত একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। ইহার পিরিয়ডে শিশু

নির্ব্বাক থাকিলেও ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে তাঁহার উদাস মন। কত তরল সমস্যা, কত উদ্ভট আবিষ্কারের চিন্তা। শিশুর মনোরাজ্য তোলাপাড় করে। মনে ভাবের আবর্ত্ত ওঠে—আচ্ছা, আমি ত' নিরস্ত্র, হাতে কিছু নেই, এ অবস্থায় অসংখ্য শত্রু এসে যদি আমাকে আক্রমণ করে, কি উপায়ে আমি তাদের হারাতে পারি? পৃথিবীতে কত রকমের লড়াইয়ের কথা ত' শুনি, আচ্ছা—যদি সিংহ, বাঘ, কুকুর, ভাল্লুক, এদের সব শিখিয়ে ব্যূহের প্রথম লাইনে সাজানো হয়, তারপর লড়াই শুরু হতেই শত্রুর উপর এই সব শিকারী জন্তুগুলোকে লেলিয়ে দেওয়া হয়—তাতে ফল লাভ হবে না? জন্তুগুলোর পরে যোদ্ধারা এগিয়ে যাবে—শত্রুরা তখন কি নাবালেই পড়ে। ক্লাসে যখন পড়া চলিতে থাকে, শিশু তাহাতে নির্লিপ্ত ও উদাসীন থাকিয়া এই সব সমস্যার সমাধান করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে ছাত্রদের উদ্দেশে শিক্ষকমহাশয়ের রূঢ় অভদ্র বাণী শিশুর ভাবধারা ভাঙ্গিয়া দেয়, তপ্ত কাঞ্চনের মত সুন্দর মুখখানি তাঁর লজ্জায় ও উত্তেজনায় রাঙ্গা হইয়া ওঠে।

এই বিদ্রোহী ছাত্রটির সম্বন্ধে শিক্ষকমহাশয়ের মনের মধ্যেও বিদ্বেষ সঞ্চিত হইতেছিল। তিনি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ইহাকে রীতিমত শিক্ষা দিবেন। কিন্তু পরীক্ষার ফল হইল বিপরীত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় ছেলেদের পরীক্ষা করেন, সেই পরীক্ষায় এই অমনোযোগী ভাবপ্রবণ ছাত্রটিই সকল ছেলের চেয়ে বেশী নম্বর পাইলেন। শিক্ষক-মহাশয় ত' অবাক! যে ছেলে ক্লাসের একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সে পাইল কি-না সকলের চেয়ে বেশী নম্বর। অমনি কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি জানাইলেন; 'বাচস্পতি মহাশয় ঠাকুরবাড়ীর এই ছেলেটির প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছেন, এ ছেলে পড়াশুনা কিছুই করে না, এত বেশী নম্বর ত' এর পাবার কথা নয়।' এ অবস্থায় পুনরায় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইল, এবার স্বয়ং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পরীক্ষকের পাশে চৌকি লইয়া বসিলেন। কিন্তু শিক্ষকের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শিশু-রবির ভাগ্যদেবতা এবারও তাঁহার গলায় সাফল্যের জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন।

৪

আর যাই হউক না কেন, বাহিরের মুক্ত বাতাস পাইয়া বালক রবির মনের জড়তা ধীরে ধীরে কাটিতেছিল, বয়সের অনুপাতে দেহযষ্টিও বৃদ্ধির দিকে উঠিতেছিল। বালকের অপর দুই বয়োজ্যেষ্ঠ সাথী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সত্যপ্রকাশ বয়স ও বিদ্যার পথে অনেকটা অগ্রবর্ত্তী হইলেও, তাঁহাদের এই অল্পবয়স্ক সাথীটিকে উপেক্ষা না করিয়া অনেক বিষয়ে উৎসাহ দিতে থাকেন। ইহাতে বালকের অন্তরে আনন্দ আর ধরে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটি ছেলে ভৃত্যদের এলাকা পার হইয়া এখন অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছেন, সেই সঙ্গে চিত্তবৃত্তিকে অনেকটা সঙ্কোচমুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বালক-রবির এ সম্বন্ধে দুর্বলতাটুকু উভয়ের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে এবং এই লাজুক ছেলেটির সঙ্কোচ কাটাইবার জন্য ইঁহারা সর্ব্বদা পরীক্ষা করিতে থাকেন।

সেদিন বাহির-বাড়ীর প্রাঙ্গণে একটি জিন্-আঁটা সজ্জিত ঘোড়া সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। ঘোড়াটি আয়তনে ছোট, টাট, শান্তশীল, কিন্তু অশান্ত তেজী। আমাদের বালক-রবিও নিকটে দাঁড়াইয়া সুশ্রী জন্তুটির গ্রীবাদেশের বঙ্কিম ভঙ্গী দেখিতেছিলেন। সহসা কোথা হইতে কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিয়া একান্ত অতর্কিত অবস্থায় বালক-রবিকে সেই তেজস্বী বাহনটির পিঠের উপর চড়াইয়া দিয়া জোর গলায় বলিলেন: হুঁসিয়ার রবি, কোসে লাগামটা চেপে ধর, ঘোড়া এবার ছুটবে।

বালক ইহার পূর্ব্বে কোনদিন ঘোড়ার পিঠে উঠে নাই; এই সুন্দর জীবটিকে তিনি মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার জ্যোতিদাদা যে এভাবে তাঁহাকে জবরদস্তি করিয়া ঘোড়াটির পিঠে চড়াইয়া দিবেন, ইহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। দাদার কাণ্ড দেখিয়া সভয়ে তিনি বলিয়া উঠিলেন: নামিয়ে দাও আমাকে, ঘোড়ার পিঠে আমি চড়বো না—

কিন্তু দাদা তাঁর কথা শুনিবার পাত্রই বটে, ঘোড়ার পিঠে চাবুক লাগাইয়া তিনি তাহাকে তখন দৌড় করাইয়া দিয়াছেন। বালক-রবিকে অগত্যা শক্ত হইয়া ধাবমান ঘোড়ার বাগ চাপিয়া ধরিতে হইল, মনে সাহস জাগিল, পিছনে চাহিয়া

দেখেন—বিপুল উৎসাহে দাদাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া আসিতেছেন! খানিকটা ছুটাছুটির পর দাদা স্নেহের ভাইটিকে সাদরে ঘোড়ার পিঠ হইতে নামাইয়া পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন: কেমন, ভয় সঙ্কোচ তো কেটে গেলো! এর পর নিজেব মনেই সখ হবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটতে।

এই ঘটনাটি বালক-রবির অন্তরটির উপর নূতন এক আলোকপাত করিল; তিনি বুঝিলেন যে, প্রথম দৃষ্টিতে যাহা কঠিন বলিয়া ভয় হয়—সাহস করিয়া একবার তাহাতে লাগিয়া পড়িলে ভয় তখন ক টিয়া যায়, সহজ মনে হয়।

লেখাপড়ার সঙ্গে এ বাড়ীর ছেলেদের গান-বাজনা শিখিবারও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বালক-রবি স্বভাবতঃই লাজুক বলিয়া সাহস করিয়া গানের দিকে ঝুঁকিতেন না—যদিও অন্তরে তাঁহার ঔৎসুক্যবোধ প্রবল হইয়া উঠিত। দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে অনুজের এ দুর্ব্বলতা-টুকুও ধরা পড়িয়া যায় এবং একদা তিনি ভাইটিকে তাঁহার পিয়ানোর কাছে বসাইয়া হুকুম করিলেন: আমি সুর দিচ্ছি, তুই গান ধর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সিদ্ধ হাতে পিয়ানোর মধুঢালা সুর গান গাহিবার সঙ্কোচ হইতেও বালকের চিত্তকে মুক্ত করিয়া দিল। এইদিন হইতে কিশোর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোর সুর দিতেন, বালক-রবি সেই সুরের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া মধুবর্ষণ করিতেন। শুধু সুরের ও গানের শিক্ষা নয়, সাহিত্যের শিক্ষার ভাবের চর্চ্চায় এই সময় হইতেই জ্যোতিদাদা বালক-রবির প্রধান সহায় হইয়া ওঠেন, ছোট ভাইটিকে বালক ভাবিয়া ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনা করিতে কোনদিনই কুণ্ঠিত হইতেন না।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃতবিদ্য দৌহিত্র জ্যোতিঃপ্রকাশ এই সময় এ বাড়ীতে থাকিয়া ইংরাজী কাব্যের চর্চ্চা করিতেছিলেন। বয়সে তিনি বালক-রবির অপেক্ষা অনেক বেশী বড় হইলেও সহসা কিসের আকর্ষণে কে জানে, অল্পবয়স্ক মাতুলটিকে দিয়া কবিতা লেখাইবার উৎসাহ তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। একদিন অসময়ে সহসা তিনি বালক-রবিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গেলেন এবং নীল রঙ্গের একখান খাতা ও পেনসিল বালকের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন: তোমাকে ধরে এনেছি কেন জান, এখানে ব'সে পদ্য লিখবে ব'লে।

এই অদ্ভুত আবদার শুনিয়া বালক ত' আকাশ হইতে পড়িলেন। ছাপার অক্ষরেই তিনি এ পর্য্যন্ত কবিতা দেখিয়াছেন, তাহা যে পেনসিল দিয়া খাতায় লেখা যায়—ইহা যে কল্পনারও অতীত। কুণ্ঠিত বালক জানাইলেন: কি সর্ব্বনাশ, আমি লিখবো? তুমি কি বলছো?

জ্যোতিঃপ্রকাশ গম্ভীরভাবে বলিলেন: কেন, পদ্য লেখা কি এমন হাতী-ঘোড়া? অভ্যাস করলেই পারবে।—বলিয়াই তিনি বালক-মাতুলকে পয়ার ছন্দে চোদ্দ অক্ষর মিলাইয়া কবিতা রচনার রীতি-পদ্ধতি বুঝাইয়া দিলেন।

কে যেন চোখের পলকে বালকের চোখের উপর হইতে একটা পরদা সরাইয়া দিল, তাঁহার সহজাত সংস্কারের আলোটি তৎক্ষণাৎ উদ্ভাসিত হইয়া কাব্যকাননের প্রবেশ-পথটি সহসা চোখের সামনে তুলিয়া ধরিল। বিপুল উৎসাহে বালক-খাতার উপর পেনসিল ঘসিতে লাগিলেন, গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়া-তাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্য রচনার মহিমা সম্বন্ধে বালকের মনে মোহ আর টিকিল না। একদিনেই বালক একটি পয়ার রচনা করিয়া ফেলিলেন, তখন তাঁহার কি উৎসাহ! আর ভয় যখন একবার ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আর বালক-কবিকে ঠেকাইয়া রাখে কাহার সাধ্য!

এখন হইতে আমাদের বালক-কবির প্রধান কাজ হইল নির্জ্জন ঘরে বসিয়া জ্যোতিঃপ্রকাশের দেওয়া নীল খাতাখানির পাতায় আঁকা-বাঁকা অক্ষরে পয়ার ছন্দে কবিতা লেখা। যাহা লেখেন কবি, নিজেই মনের আনন্দে সুর করিয়া পড়েন, আনন্দে দেহমন নৃত্য করিতে থাকে।

ভিতরের দিকের বারান্দার সেই বিশেষ অংশটি—যেখানে আমাদের শিশু-রবির বিচিত্র পাঠশালা বসিত, এখন সে পাট উঠিয়া গিয়াছে, বালক এখন সেখানে কবির ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া পদ্যের কথা ভাবেন। ঘরের ভিতরে একদা গণ্ডি-বন্ধনের মধ্যে বসিয়া জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়া কবির দৃষ্টি পুকুর পাড়, মাটি, গাছ, আকাশ প্রভৃতির সহিত মিশিয়া যাইত, বালকের কানে তাহাদের কথার সুর ঝঙ্কার দিত, এখন কবির মানসপটে সেগুলি কেতাবের পাতার মত স্পষ্ট হইয়া ওঠে, বালক-কবি

ভাবের আবেগে তাহাতে লেখার কত উপাদান দেখতে পান।

বালকের কলমে যেদিন প্রথম কবিতাটি রূপ পরিগ্রহ করিল, তখন কি অপরিসীম উল্লাস তাঁহার মনে। একবার, দুইবার, তিনবার উপর্য্যুপরি পড়িয়াও সাধ মিটে না, এ আনন্দ এতদিন কোথায় প্রচ্ছন্ন ছিল?

বালক-কবি যখন এইভাবে অভিভূত, সেই সময় খেলার সঙ্গিনী সেই বালিকাটি আসিয়া বলিল: কি করছ একলাটি এখানে বসে, রাজার বাড়ী খুঁজে পেয়েছি, দেখবে ত' চল।

ভাবাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে বালিকার পানে চাহিয়া কবি বলিলেন: রাজার বাড়ী তুমি খুঁজে পেয়েছ, আর আমি পেয়েছি এক নতুন রাজ্য।

চোখ দুটি বড় করিয়া বালক-সাথীর দিকে চাহিয়া বালিকা বলিল: রাজার বাড়ী পেয়েছি, গিয়েছিলাম আজ, কিন্তু রাজাকে পাই নি, রাজা কোথায় কে জানে!

বালক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: আমার নতুন রাজ্যটি দেখবে? সে কিন্তু দেখাবার নয়, শোনাবার। শুনবে?—বলিয়াই বালক-কবি তাঁহার নবরচিত প্রথম কবিতাটি সুর করিয়া পড়িতে শুরু করেন—

> রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
> বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।
> মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে
> এখন তাহারা সুখে জল-ক্রীড়া করে।

বালিকার চিত্ত বোধ হয় অন্য কোন তত্ত্বানুসন্ধানে নিবিষ্ট ছিল, তাই বাল্যসাথীর মুখে পদ্যটি শুনিয়া নৈরাশ্যের সুরে বলিয়া ফেলিল: কই, এতে তো রাজা নেই!

কথাটা বোধ হয় বালক-কবির চিত্তে আঘাত দিল, ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিলেন: না, রাজা এখনো আসেনি, তবে পরে হয়তো আসতে পারে।

বালিকা বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলল: সবাই ত' তাই বলে, রাজা আসবে। কিন্তু তুমি রাজার বাড়ী দেখবে না? আমি দেখে এসেছি। এসো না আমার সঙ্গে, তোমাকেও দেখিয়ে আনি।

কবির চিত্ত তখন পরবর্ত্তী রচনায় নিবিষ্ট হইয়াছে, বালিকার আগ্রহ তাঁহার মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত করে না, গম্ভীর মুখে বলিলেন: আমার সময় নেই, দেখছো না পদ্য লিখছি।

অভিমানে মুখখানি ফুলাইয়া বালিকা চলিয়া গেল। এইভাবে এক এক সময় বালক-কবিসকাশে দলের সবাসের মত এই রহস্যময়ীর আবির্ভাব হয়, তার মুখে শুধু রাজবাড়ী আর রাজার কথা। কিন্তু রাজা যে কে—সে কথা বালক কোনদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই, তাহার সঙ্গ ধরিয়া রাজার বাড়ী দেখিতে যাওয়াও ঘটিয়া ওঠে নাই, কবি তখন নবাবিষ্কৃত রাজ্যের চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকেন, অবসর কোথায়?

—

৫

বালক-রবির মনোরাজ্যে যখন এইভাবে কবিতারাণীর আবাহন চলিয়াছে, সেই সময় ডেঙ্গুজ্বরের প্রচণ্ড প্রতাপ শহরবাসীকে ত্রস্ত ও বিচলিত করিয়া তুলিল। এ অবস্থায় জোড়াসাঁকোর বাড়ীর সকলকেই কিছুদিনের জন্য শহরোপকণ্ঠবর্ত্তী পানিহাটির (পেনেটি) এক বাগানবাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইল। বালক-কবিও ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

শহরের আবেষ্টন হইতে কবি এই প্রথম বহির্জগতে পদার্পণ করিলেন। সহরের সহস্র অট্টালিকা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাজপথ, সুসজ্জিত বিপণি, বিপুল জনস্রোত, বিভিন্নশ্রেণীর যানবাহনাদি দর্শনে চির-অভ্যস্ত ভাবুক বালকের দৃষ্টিপথে এই সর্ব্বপ্রথম প্রতিভাত হইল পল্লীশ্রীর সুষমা। শহরের লোক পল্লীদর্শনে সাধারণত প্রথম প্রথম তৃপ্তিলাভই করেন, পল্লীর দিগন্তবিসারী প্রান্তর, বিভিন্ন বৃক্ষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, নদীর শোভা তাঁহাদিগকে অভিভূত করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের বালক-কবির চিত্তপটে বাঙ্গালার এই পল্লীশ্রী এক স্বপ্নাতুর আলেখ্য রূপায়িত করিয়া তুলিল।

বালক-কবির মনে আনন্দ যেন আর ধরে না। বাগান বাড়ীখানির গায়েই গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়াই কবি বাহিরের বারান্দায় গিয়া বসেন, পেয়ারা-গাছগুলির অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া থাকেন, দেখিতে দেখিতে বালক-কবির চিত্তে জাগিয়া উঠে যেন তাঁহার জীবনধারা দূরবর্ত্তী ঐ গঙ্গার ধারার সহিত এক

হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা হয় ঘরের আবেষ্টন ছাড়িয়া এইভাবে অহোরাত্র একভাবে বসিয়া শুধু নদীর ঐ অফুরন্ত শোভা দেখেন ; কিন্তু তাহার তো উপায় নাই, সে স্বাধীনতা কোথায়?

খেলার সাথী বালিকাটিও পানিহাটির বাগান-বাড়ীতে আসিয়াছিল। ভাবাবিহ্বল কবির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—চেয়ে চেয়ে দেখছো কি অমন করে?

কবি একটু হাসিয়া কহিলেন—জিজ্ঞাসা করছো কেন? তুমি দেখতে পাচ্ছ না কিছু?

বালিকা বলিল—কেন দেখবো না, আমি কি কাণা, বোবা, যে চুপ করে ঠায় বসে থাকি? সমস্ত বাগানটা ঘুরে এলাম, খালি গাছ আর গাছ! এত গাছপালা নিয়ে এরা কি করে বল ত'? এত খুঁজলাম, রাজার বাড়ী তো দেখতে পেলাম না এখানে।

কবি বলিলেন :—এ যে গাছপালার রাজ্য, বাগানটাই রাজার বাড়ী।

বালিকা অবজ্ঞার স্বরে বলিল :—ধ্যেৎ! রাজার বাড়ী আমি সেখানে দেখেছি, সে কেমন চমৎকার, কত ভালো—এসব ছাই!

বালিকার কথায় আঘাত পাইয়া কবি বলিলেন :—ওকথা বলতে নেই ; গাছগুলি আমার ভারি ভালো লাগে, আরো ভালো হচ্ছে ঐ নদী।

বালিকা বলিল :—ও তো গঙ্গা! মাগো, ওর দিকে চাইলেই ভয়ে বুকখানা আমার টিপ টিপ করে। জাহাজ একখানা গেলেই যে রকম ফুলে ফুলে ওঠে, আর নৌকাগুলো ডুবুডুবু হয়—

কবি হাসিয়া বলিলেন : কিন্তু ডোবে না! আমি ত' বসে বসে তাই দেখি। ওর চেয়ে আরো ভালো লাগে আকাশ যখন কালো হয়ে আসে, হু-হু করে ঝড় ওঠে, চারিদিক ঝাপসা হয়ে যায়, আর গঙ্গার ঢেউগুলো উলটেপালটে নাচতে থাকে, দেখে তখন কি আনন্দই যে আমার হয়—

বালিকার মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, আর্ত্তস্বরে বলিল : মাগো, তুমি যেন কি! যত সব অনাসৃষ্টির কথা। ভয় করে না তোমার? চল না ওদিকে দুজনে যাই, খুঁজে দেখি এখানে রাজার বাড়ী কোথাও আছে কি না।

কবি বলিলেন : রাজার বাড়ী তোমাকে যেমন ডাকে, আমাকেও তেমনি ডাকে ঐ নদীর জল।

কালো কালো ভুরু দুটি নাচাইয়া বালিকা প্রশ্ন করিল : যত সব আজগুবি কথা তোমার মুখে ; জল আবার মানুষকে ডাকে নাকি? জল বুঝি কথা কয়?

কবি উত্তর দিলেন : আমি জলের ডাক শুনতে পাই, আমার মনে হয় কি জান—সবাই যেন আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। গঙ্গার ঐ জল, গাছের ঐসব পাতা, উপরের ঐ আকাশ, এরা সবাই কথা বলে, আমি শুনি শুধু বসে বসে, কিন্তু বলতে কিছু পারি না, তাই ভাবি।

—তাহলে একলাটি এইখানে বসেই ভাবতে থাকো, আমি দেখি রাজার বাড়ী খুঁজে খুঁজে যদি বার করতে পারি—বলিয়াই বালিকা বাগানের দিকে ছুটিল।

গঙ্গার বুকের উপর এই সময় কতিপয় পাল-তোলা নৌকা বিচিত্র গতিতে গন্তব্যপথে ছুটিতেছিল, বালক-কবির মুগ্ধদৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বালকের মনে হইতেছিল—তিনিও যেন গঙ্গাবক্ষে শ্রেণীবদ্ধভাবে গতিশীল নৌকাগুলির কোনটি আশ্রয় করিয়া বিনা ভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিয়াছেন।

চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে উত্তেজনা আসিল, সবেগে উঠিয়া তিনি নদীর দিকে চলিলেন। সহসা অদূরবর্ত্তী পথের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, শ্রদ্ধাভাজন বয়োজ্যেষ্ঠগণ পল্লীভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কবিও যথাসম্ভব তফাতে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তীদের অনুবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইতেই ধরা পড়িয়া গেলেন। বালকের এতটা দুঃসাহস ও স্বাধীনতাস্পৃহা তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। সুতরাং পল্লীভ্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কবিকে পুনরায় বাসায় ফিরিতে হইল।

বারান্দার কাছেই বালিকার সহিত দেখা ; কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে কবির দিকে চাহিয়া সে কহিল : ফিরিয়ে দিলে তোমাকে—যাওয়া হল না তাহলে?

ম্লানমুখে কবি উত্তর দিলেন :—চাণক্য-পণ্ডিতের শ্লোকটা ভারি সত্যি। তিনি বলেছেন—সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্। বাড়াবাড়িটা কিছুতেই ভাল নয়।

বালিকা প্রশ্ন করিল :—একথা বলবার মানে?

কবি উত্তরে বলিলেন :—গঙ্গায় পাল-তোলা নৌকোগুলো দেখে ভাবছিলুম, আমি যেন বিনা ভাড়ায় ওতে চড়ে বসেছি, কত কি দেখছি। এমন সময় ওঁরা গ্রাম দেখতে চলেছেন দেখে ওঁদের পেছু নিই, কিন্তু যাওয়া হল না। ভাবছি, অবস্থার বদল কিছু হয়নি ; তখনো যেমন, এখনো তেমন।

বালিকা বলিল :—তা কেন, তখন গণ্ডির ভেতরে থাকতে, সেটা ত' উঠে গেছে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কবি বলিলেন : —তা গেছে। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসেছি দাড়ে ; পায়ের শিকল কিন্তু ঠিক আছে, কাটে নি।

সহানুভূতির স্বরে বালিকা বলিল :—সেই জন্যই তো বলি, রাজার বাড়ীতে তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কথা কি তুমি কানে নিলে ?

গাঢ়স্বরে কবি বলিলেন :—আমার রাজবাড়ী ঐ নদীর বুকে ; পায়ের শিকল কেটে দিয়ে ও-ই ত' আমাকে কোলে তুলে নেবে।

বলিতে বলিতে কবি নদীর পাড়ের দিকে চলিলেন, অবাকবিস্ময়ে বালিকা এই অদ্ভুত ছেলেটির পানে চাহিয়া রহিল।

———

৬

নদী, আর নদী।

ইহাই বালক-কবির ধ্যানধারণা ও স্বপ্ন। কোমল অন্তরটি তাঁহার কানায় কানায় যেন ভরিয়া গিয়াছে—চোখে-দেখা নদীটির কূলে কূলে পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত রূপের শোভায়। বালকের দুই চক্ষু সর্ব্বক্ষণই এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের পানে পড়িয়া থাকিতে চায়, পাঠ্যগ্রন্থের পাতাগুলি কিছুতেই সে-দৃষ্টি আকৃষ্ট করে না। বালকের মনে হয়, নদীতে আকাশে একত্র মিলিয়া—রঙ্গে রঙ্গে আলোয় ছায়ায় কোলাকুলি করিয়া যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া মানুষের ভাষায় ডাকিতেছে—আয়, ওরে আয়, কাছে আয়।

এই আকুল আহ্বানই একদিন অভিভাবকদের কঠোর শাসনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিল। উপলক্ষ হইলেন বালকের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ। সবার বড় হইয়াও ইনি যেন বাড়ীর বড়দেরও নাগালের বাহিরে। ভারি ভারি তত্ত্বকথা লইয়া তাঁর কারবার। দর্শনশাস্ত্রের শক্ত শক্ত কথার মীমাংসা এবং গণিতের নানারূপ সমস্যার আবিষ্কারই হইতেছে বড়দাদার বড় রকমের সখ। ইহার ফাঁকে মধ্যে মধ্যে 'স্বপ্নপ্রয়াণ' নামে কাব্যগ্রন্থ লেখেন, কখন বা বিলিতি বাঁশী বাজান, কিন্তু তাঁর বাঁশীর সুরে গানের শব্দ ঝঙ্কার দেয় না—অঙ্ক দিয়া এক এক রাগিণীতে গানের সুর মাপিবার জন্যই তিনি বাঁশীর আশ্রয় লইয়া থাকেন। এমন গম্ভীর প্রকৃতি এবং গভীর প্রবৃত্তির মানুষটির বালকসুলভ দুটি অভ্যাস সবার চোখে পড়ে ও আনন্দ দিয়া থাকে। প্রথম অভ্যাসটি হইতেছে তাঁর গম্ভীর তত্ত্বকথা কিম্বা স্বপ্নপ্রয়াণের লেখা শ্রোতাদের শোনাবার মাঝে আকাশভরা উচ্চহাসির উচ্ছ্বাস। দ্বিতীয় অভ্যাসটি আরও কৌতুকাবহ। স্নানের সময় বাড়ীর পুষ্করিণীতে নামিয়া অবিশ্রান্তভাবে সাঁতার কাটা। খুব কম করিয়া ধরিলেও অন্তত পঞ্চাশ বার তাঁর এপার-ওপার হওয়া চাইই। পেনেটির বাগানবাড়ীতে আসিয়া এ অভ্যাসটিরও ব্যতিক্রম হয় নাই। গঙ্গায় তাঁহার সাঁতার চলিল, নিত্যই এপার-ওপার হন। বালক-রবি তীরে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণ নয়নে নদীর জলে দাদার মাতামাতি দেখেন, তাঁহারও দেহমন উৎসাহে নাচিতে থাকে। পুকুরের জলে বড়দাদাই তাঁহাকে যখন সযত্নে সাঁতার শিখাইতেন, এখন এখানে তাঁহার অনুসরণে কি দোষ? কাহাকেও কিছু না বলিয়া বা জিজ্ঞাসা না করিয়াই একদা তিনি দাদার পিছু পিছু নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বালকের স্বপ্ন সত্য হইল, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ ঘটিল, যেন কোন্ পূর্ব্বজন্মের পরিচয়ে গঙ্গার অতল জল আনন্দে উচ্ছলিয়া বালক-রবিকে কোলে করিয়া লইল। ঢেউগুলির সহিত তালে তালে খেলা করিয়া মনের আনন্দে আলাপ জমাইয়া বালক যেন নবজীবন পাইলেন।

ভাইটিকে গঙ্গায় নামিতে দেখিয়া বড়দাদা আর নিশ্চিন্ত হইয়া অধিক দূরে যাইতে পারেন নাই। খানিকটা তফাতে আসিয়াই তিনি সকৌতুকে এই আনন্দবিহ্বল বালকের জলক্রীড়া দেখিতেছিলেন। বালক-রবির তীরে উঠিবার কোন আগ্রহ নাই, জলের সহিত এরূপ মাতামাতিতে দেহে মনে কিছুমাত্র অবসাদও আসে না, বরং উৎসাহই বাড়িতে থাকে। ওদিকে দাদার মনটিও পড়িয়া রহিয়াছে সাঁতার কাটিয়া ওপারে যাইবার দিকে। অগত্যা তাঁহাকে বালকের জলখেলার উদ্দেশে

বলিতে হয়—আর নয়, উঠে পড়ো রবি, অসুখ করবে।

যে সহৃদয় অভিভাবকের অনুগ্রহে এতখানি স্বাধীনতালাভ সম্ভব হইয়াছে, তাঁহার আদেশ যে কিছুতেই অবহেলা করা চলে না—বালকের কর্তব্য-বুদ্ধি সে সম্বন্ধে পুরামাত্রায় সচেতন; এই নূতন অথচ বহু-আকাঙ্ক্ষিত আনন্দটুকু যেন নদীর জল হইতে নিঙড়াইয়া লইয়া তিনি তীরে উঠিলেন। বালক-কবির স্বাভাবিক বিষণ্ণতা যেন গঙ্গার স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার অমল পরশ-রস অন্তরে পশিয়া সেখানকার অনেক দিনের একটা চাপা বাসনার ঢাকা খুলিয়া দিয়াছে—অমনি ভিতর হইতে এক অপূর্ব্ব ভাবের অরুণিমা হাসির মত বাহির হইয়া বালক-কবির সুন্দর মুখখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

স্নানান্তে প্রসাধন সারিয়া বালক-রবি গঙ্গা-তীরের সুপ্রশস্ত বাঁধানো চাতালটির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় সেই রহস্যময়ী বালিকা টাটকা ফুলের সুবাস ছড়াইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল আজ সে মনের সাধে ফুলের সাজ পরিয়াছে, মাথার চুলে বকুল ফুলের ছড়ি, কমনীয় প্রকোষ্ঠে চামেলির চুড়ি, গলায় চাঁপার মালা, হাতে রক্তকরবীর সদ্যভাঙ্গা একটি মঞ্জরী। মুচকি হাসিয়া বালিকা কহিল—আজ যে হাসি আর ধরে না মুখে! কি হয়েছে?

বালকের মুখের হাসি আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—স্বপ্ন ফলেছে।

দুই চক্ষু বড় করিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—নৌকোয় বুঝি চড়েছিলে?

বালক উত্তর দিলেন—না; নৌকো যার বুকের উপরে নাচে, আমি তারই কোলে উঠে-ছিলুম; কি সে নাচনি আমার—যদি দেখতে!

চক্ষু দুটি কপালের দিকে তুলিয়া বালিকা কহিল—গঙ্গায় নেমেছিলে বুঝি? সাহস ত' বড় কম নয়! না, এবার দেখছি ওরা তোমাকে বেঁধে রাখবে, যেমন আগে রাখত। সেই গণ্ডী-বন্ধন মনে আছে ত'?

বন্ধনের কথা শুনিয়া বালকের মুখের হাসি মুখেই আজ আর মিলাইয়া গেল না, হাসিতে হাসিতেই কহিলেন—মনে আছে, কিন্তু সে বন্ধন মুছে গেছে। সেদিন বলেছিলুম না, দাঁড়ে বসে আছি, পায়ের শিকল কাটেনি; তবে একদিন কাটবে, কেটে দেবে ঐ নদী। সত্যি, তাই হয়েছে। ঐ নদীর জলে সেটা খুলে গেছে।

—আবার যদি পরিয়ে দেয় সেই খোলা শিকলটি, তখন?

—আর পারবে না, নদীর জলের পরশ পেয়ে মনটি যে আমার আকাশের মেঘের মতন হাল্কা হয়ে গেছে, মেঘকে কেউ শিকল দিয়ে বাঁধতে পারে?

বালিকার মুখে বিস্ময়ের রেখাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল, সাথীর বিহসিত মুখখানির পানে কিছুক্ষণ নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—আজ তোমার হ'লো কি? নদী-নদী করে ত' খেপে উঠে-ছিলে, এখন এলেন আবার মেঘ! নদীর জলেও নামা হয়েছে, এবার কি মেঘে উঠে মেঘনাদ হবে?

বালক-কবি হাসিমুখে উত্তর দিলেন—মেঘ থেকেই ত' জল হয়, মেঘ ছেড়ে নদী থাকে না। ঐ চেয়ে দেখ না—নদী যত এগিয়ে যায়, মেঘও যেন নেমে এসে তাকে ধরা দেয়। এই যেমন আমি, এখানে এসেই নদী দেখে একনিমেষে চিনে ফেল্লুম, বুঝলুম—ও আমার অতি আপনার, ওর কোলে আমাকে উঠতেই হবে, আর আমাকে দেখে ওর মনে কি আহ্লাদ, কত রকম ক'রে ডাকে, আমি না গিয়ে কি পারি? মেঘও ঠিক এমনি, আমরা তিনটি যেন একই!

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বালিকা প্রশ্ন করিল—আর, আমি?

পরক্ষণে প্রফুল্লমুখে বালক কহিয়া উঠিলেন—তুমিও। তোমাকে না হ'লে আমার মুখ ত' খোলে না। নদীর কথা, মেঘের কথা, আমার মনের কথা তোমাকেই ত' সব বলি।

বালিকা কহিল—তোমার মুখে নদীর কথা আমার ভারি ভালো লাগে, আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি তোমার মুখের পানে, মনে হয় তোমার কথার সঙ্গে নদীর জলও যেন ছলছল করে সাড়া দিতে থাকে। আচ্ছা, এখানে এসে নদী দেখেই ওর ওপর তোমার এত দরদ কেন জাগলো বলবে? ওর সঙ্গে তোমার কেন এত ভাব?

গাঢ়স্বরে বালক-কবি উত্তর দিলেন—ভাব কেন হবে? যে-ডাঙার উপরে আমরা বাস করি, সে-ডাঙা ত' নড়ে না—চুপটি ক'রে অসাড়ে পড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে। ওর পানে চেয়ে আমি এইটে ভাবি, আর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আলাপ আমাদের জমে উঠে।

—ঐ নদীর সঙ্গে ?

—হ্যাঁ। আর সকলে শুধু দেখে ওর অথৈ জল, অগণিত ঢেউ, তাদের কানে বাজে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। আমার দেখা-শোনা কিন্তু একেবারে আলাদা। আমি ওর পানে চেয়ে কত কি দেখি, ওর ঐ ঢেউগুলি মিষ্টি সুর তুলে কত রকমের গান আমাকে শোনায়, কত সব গল্প বলে, কত কি শেখায় —বই পড়ে ইস্কুলে গিয়েও যার হদিস পাইনি। এই কটা দিনে ওর কাছ থেকে আমি কত কথা জেনেছি, কত শিক্ষা যে আদায় করেছি—তা বলে শেষ করা যায় না। ওরই সংস্পর্শে আমার মনের গতিটাও একেবারে যেন বদলে গেছে। ওই ত আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে—নিজেকে ছোট ভেবে আমার ভেতরের মনটাকেও যেন ছোট ক'রে না ফেলি, তাকে বড়ো বলেই ভাবি।

গম্ভীর মুখে বালিকা কহিল—বড়দাদার কাছে সাঁতার শিখে তোমার গায়েও তাঁর ছোঁয়াচ লেগেছে দেখছি। বাঁধা গরু ছাড়া পেলে ভাবে কি হয়েছি, আর আমায় কে পায়! তোমারও হয়েছে এই দশা। কলকাতায় ফিরে ত চল, আবার সেই অষ্টবন্ধন। আমি কি ভেবে রেখেছি জান ?

—বল।

—রাজার যে ঘরখানি খুঁজে বা'র করেছি, তারই ভেতরে রাজপুত্তুরটিকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজার গল্প শোনাবো।

ভাবার্দ্র কণ্ঠে বালক-কবি কহিলেন—গল্প শোনার সখ মিটিয়ে দিয়েছে ওই নদী, এত গল্প শুনিয়েছে যে, থলি আমার ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তুমি বরং শুনো, পুঁজি অনেক, ফুরাবে না শীগ গীর।

কলকণ্ঠে বালিকা কহিল—বেশ কথা, আমি রাজি। কিন্তু আমার সেই রাজবাড়ীর নিরেলা ঘরখানির ভিতর বসে—

মুখখানি কিঞ্চিৎ শক্ত ও কণ্ঠের স্বর দৃঢ় করিয়া বালক কহিলেন—তা কেন? বাড়ীর কথা শুনলেই মাথায় আমার বাড়ি পড়ে। তোমার মুখে খালি-খালি রাজার বাড়ী—কেন, খোলা আকাশ, জল, গাছপালা—এসব মনে রোচে না?—রাজার বাড়ী এদের কাছে লাগে!

মুখখানি ভার করিয়া বালিকা কহিল,—তুমি আশ্চর্য্য ছেলে, রাজার বাড়ীর মর্ম্ম বুঝলে না!

৭

বালিকার কথাই ফলিয়াছে। পেনেটির বাগান-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আমাদের বালক-কবিকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পূর্ব্বের বাঁধাধরা নিয়মাধীনেই থাকিতে হইয়াছে। ইহার উপর আর এক বিপদ—কলিকাতা শহরটা এখন তাঁহার চক্ষুতে ভারি বিশ্রী ঠেকিতেছে; মনে হয় যেন ইট কাঠের একটা মস্ত জন্তু তাঁহাকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতেছে! কেবলই মনের ভিতরে এবং চক্ষুর উপরে ভাসিয়া ওঠে—নদী ও তাহার তীরবর্ত্তী পল্লীটির শান্তশ্রী। তাহার তুলনায় শহরের শোভা ঐশ্বর্য্য জনতা সমস্তই যেন কৃত্রিম ও শ্রীহীন। তবে স্বল্প কালের পল্লীবাসে, নদীর সঙ্গ ও পল্লীর মধুর পরশে কবির মনোরাজ্যে সমুদ্ভূত ভাবের উৎস তাঁহাকে যে কল্প লোকের সন্ধান দিয়াছে, তাহাতেই তিনি সর্ব্বক্ষণ বিভোর হইয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার একমাত্র শান্তি ও সান্ত্বনা। বালক-কবির লুকানো খাতার পাতাগুলির পৃষ্ঠায় পয়ারের ছন্দে কল্পলোকের কত চিত্রই রূপায়িত হয়। এ-কার্য্যের পথপ্রদর্শক সত্যপ্রকাশের দেওয়া সেই নীল খাতাখানি ত পেনিটির বাগানেই ভরিয়া গিয়াছে, এখন বালক নিজেই সযত্নে এবং অতি সন্তর্পণে নূতন খাতা বাঁধিয়া লইয়াছেন, এখানাও প্রায় ভরিয়া আসিয়াছে। বালকের খেলাধুলা আনন্দ-উৎসব সবই এই খাতায় নিবদ্ধ। অথচ, এতই গোপনে এই ব্যাপারটি চলিতে থাকে যে, বাহিরের কেহ বড় একটা জানিতে পারে না, জানে শুধু সেই রহস্যময়ী বালিকা—বালক-কবি তাঁহার এই দুর্ম্মুখ বাল্যসঙ্গিনীটিকে কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন না, কোন কথাই তাহার কাছে গোপন থাকে না; ঠিক সময়টিতে আসিয়া রহস্যচ্ছলে এমনভাবে এই রহস্যময়ী বালকের অন্তরের বদ্ধ দুয়ারটির উপর অতর্কিতে টোকা দেয় যে, তাহার পরশেই সে দুয়ার আপনি খুলিয়া যায়, গৃহস্বামী তখন এই দুরন্ত অতিথির হাতেই ভাবের ঘরখানি তাঁর সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। পূর্ণ ঘরে তখন ভাবের বন্যা বহে।

সেদিনও নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বালক-কবি বসিয়াছেন তাঁহার খাতাখানি লইয়া। খিড়কির বাঁধা পুকুরের জল, ঘোলাটে আকাশ, আর পুকুর-পাড়ের জামরুল গাছটার রোদে পোড়া পাতাগুলোর পানে চাহিয়াই কবি আলাপ জমাইতে শুরু

করিয়াছেন, এমন সময় চুপি চুপি পা টিপিয়া টিপিয়া সেই রহস্যময়ী বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল ভাব-বিভোর কবির ঠিক পিছনে। আবির্ভাবের সঙ্গেই কবির অন্তর দোলাইয়া দিয়া বহে ভাবের ধারা বিপুল আবেগে। খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমি এসেছি।

দৃষ্টি খাতার পাতায় নিবদ্ধ করিয়া বালক উত্তর দিলেন—জানি।

ঝঙ্কার দিয়া বালিকা কহিল—ছাই জান। ভেবেছিলুম এসেই পিছন থেকে চোখ ছুটো টিপে অন্ধ করবো, কিন্তু পোড়া হাসিই আগে জানিয়ে দিলে।

খাতার পাতাটি চাপা দিয়া বালক কহিলেন—তোমার আসা জানবার জন্মে চোখের দরকার হয় না, আমার মনই জানিয়ে দেয়—তুমি এসেছো।

সুন্দর মুখে এবং ছুটি ডাগর চোখে হাসির ঝিলিক তুলিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—সত্যি?

একটু গম্ভীর হইয়া বালক উত্তর দিলেন—জানো ত আমি মিথ্যা বলি নে, বাড়াবাড়িও পছন্দ করি নে—

বালকের কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি বালিকা কহিল—ভালো কথা, যেটা জানবার জন্তে এসেছি, আগেই বলি, নইলে হয়ত ভুলে যাবো শেষে। বলি, খেলাধুলো কি ছেড়ে দিলে? আর খেলবে না?

উপেক্ষার ভঙ্গিতে বালক কহিলেন—ভালো লাগে না।

সুশ্রী ছুটি ভুরু কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিয়া বালিকা কহিল—উহুঁ, আরো কিছু আছে; আমি ত তোমাকে চিনি, বলো না—কেন খেলো না?

বালক-কবি এবার চিত্তদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। অভিমানের সুরে কহিলেন—কি করে খেলি বলো? বড়োরা কত কি খেলেন, দেখবার জন্তে ভরসা ক'রে কাছে যদি যাই, অমনি বলেন—'ওদিকে যাও, খেলা করগে।'

—ভালো কথাই ত বলেন, এতে রাগ করবার কি আছে?

—সবটা শোনোই আগে, তারপর ভাল-মন্দ বিচার ক'রো। হাঁ, তারপর ওদিকে গিয়ে যেই খেলা শুরু করেছি, গোলমাল কিছু হয়েছে, আর রক্ষা নেই, কি বকুনি, অমনি হুকুম হ'লো—গোল ক'র না, চুপ করো সকলে। আচ্ছা, তুমিই বলো—চুপ ক'রে কখনো খেলা চলে? তাই ওপাট একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

ভারিক্কি ভাবে বালিকা উপদেশ দিল—বড়োরা অমন বলেন, ওঁদের কথা না মেনে উপায় কি বলো?

গম্ভীরমুখে বালক কহিলেন—সবতাতে বাধা করাটাই যখন বড়োদের অভ্যাস, ওসবের ভিতর না যাওয়াই ভালো। তাই ত এই খেলা ধরিছি।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমি কিন্তু আগেই এটা ধরেছিলুম। যাক্, লক্ষ্মী ছেলেটির মতন চুপটি ক'রে একলাটি বসে বসে এতক্ষণ কি খেলেছো শুনি?

বালকের মুখেও হাসি ফুটিল, কহিলেন—বেশ, শোনো।

সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাপাটি খুলিয়া সত্যঃসমাপ্ত কবিতার ছত্র কয়টি সুর করিয়া পড়িলেন—

আমসত্ত দুধে ফেলি তাহাতে কদলী দলি'
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

উল্লাসের সুরে বালিকা কহিয়া উঠিল—ওরে বাবা! এর নাম তোমার খেলা, কালিকলম আর কাগজ নিয়ে! আমি জানি, কার পিণ্ডি চটকানো হয়েছে—বলবো?

—আমি যা জানি, তা কি তোমার অজানা থাকতে পারে? কিন্তু লক্ষ্মীটি, যা জানো, মনের ভিতরে ছিপি এঁটে রাখো। সব কথা বলতে নেই।

—কি হয় বললে?

—অমনি বড়োরা বকুনি দেবেন। এ খেলাও বন্ধ হয়ে যাবে। বড়োদের মানাকে আমার ভারি ভয়।

বড়োদের মত মুখের ভঙ্গি করিয়া বালিকা কহিল—আচ্ছা, আমি তোমাকে অভয় দিলাম, কাউকে বলবো না। তবে একটা কথা আছে কিন্তু।

মৃদু হাসিয়া বালক কহিলেন—বলো!

—রাজার বাড়ীতে এবার যাওয়া চাইই। সেখানে আমরা দুজনে খেলবো, কেউ মানা করবে না, কেউ সেখানে যায় না।

বালকের মুখখানা পুনরায় গম্ভীর হইয়া উঠে, মর্মস্পর্শী গভীর দৃষ্টি সঙ্গিনীর বিহসিতমুখে নিবদ্ধ করিয়া বলেন—বাড়ী, রাজার বাড়ী! ভারি

আশ্চর্য্য ত! আমার মনে বইছে নদী, তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ রাজার বাড়ী। এতে কি মিল হয়? খেলা জমে? আচ্ছা—তুমি ওটা ভুলতে পারো না?

মুখখানা ম্লান করিয়া বালিকা উত্তর দেয়—আচ্ছা, তোমার কথাই সই, ভুলবো; আর ও কথা তুলব না।

বালক-কবির গভীর মুখখানি তরল হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

৮

স্কুলের ছুটির পর ঠাকুর-বাড়ীর কয়টি ছেলেকে লইয়া বাড়ীর গাড়ী দেউড়ীর ভিতরে ঢুকিতেই কবি তাড়াতাড়ি সর্ব্বাগ্রে নামিয়া দুরন্ত হাওয়ার মত বাড়ীর ভিতরে ছুটিলেন। উপরে উঠিবার দীর্ঘ সোপান-শ্রেণীর প্রতি ধাপটি মাড়াইবার আর অবসর নাই, চঞ্চল চরণে কোনটি ডিঙাইয়া—কোনটির উপর অল্প ভর দিয়া—ক্ষিপ্রগতিতে দোতালার বারান্দায় উঠিতে কি আগ্রহ তাঁর! কিন্তু ইতি-মধ্যেই যে তাঁর খেলার সঙ্গিনীটি কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া প্রিয় সাথীর পিছু লইয়াছে, কবি তাহা জানিতে পারেন নাই।

উপরে উঠিতেই কবির পিঠে পড়িল একখানি কোমল করপল্লবের মধুর পরশ, সেই সঙ্গে কানে বাজিল কল-কণ্ঠের কৌতুকভরা প্রশ্ন—এত স্ফূর্ত্তি যে আজ—রাজপুত্তুর যেন হাওয়ার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরীতে ফিরলেন! কি ব্যাপার?

প্রাণখোলা হাসিতে সুন্দর মুখখানা আলো করিয়া পরিহাসের ভঙ্গিতে কবি উত্তর দিলেন—ব্যাপার ভারি মজার, তুমি যা ধরেছ মিছে নয়; মায়াপুরী জয় করেই রাজপুত্তুর বুক ফুলিয়ে ফিরে এসেছে।

হাসির ভারে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া বালিকা কহিল—তা হ'লে রাজকন্যাটিকে কোথায় রেখে এলেন রাজপুত্তুর?

লম্বা পিরাণটির পকেট হইতে ভাঁজ করা এক খণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কবি সহাস্যে কহিলেন—এই যে, সঙ্গে ক'রেই এনেছি। ইনিই যে মায়াপুরীর রাজকন্যে—সবার সামনে আমার গলায় দিয়েছেন মালা পরিয়ে।

হাতের কাগজখানি সঙ্গিনীর বিহসিত দুটি বড় বড় চক্ষুর উপর ধরিয়া কবি হাসিতে লাগিলেন।

মুখখানি ঈষৎ গম্ভীর এবং আয়ত দুটি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বালিকা কহিল—তা হ'লে ইস্কুলে কিছু কাণ্ড বাধিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই? বল না, লক্ষ্মীটি, কি হয়েছে?

খপ করিয়া সঙ্গিনীর হাতখানি ধরিয়া কবি কহিলেন—সে একটা ভারি মজার গল্প, তোমাকে না শুনিয়ে আরাম পাচ্ছিনে। এখানে নয়, বারান্দার দিকে চলো, সব বলবো।

বলিতে বলিতে তিনি সঙ্গিনীকে এক রকম জোর করিয়া টানিতে টানিতেই বারান্দার দিকে চলিলেন। কবি-সঙ্গিনী জানে, ইটকাঠের আবেষ্টন তাহার সঙ্গীটিকে যেন বিপন্ন করিয়া তোলে; মুক্ত আকাশ এবং গাছপালার সবুজ পাতাগুলির দিকে দৃষ্টি না পড়িলে তাহার মনের কথা মুখ দিয়া ফুটিতে চাহে না।

বারান্দায় আসিয়াই কবি উৎসাহের সুরে কহিলেন—মায়াপুরী হচ্ছে আমাদের ইস্কুলটা, আর ক্লাসের ছেলেগুলো প্রত্যেকেই যেন এক একটি মায়াধর! ওদের পেটে এক, মুখে আর; দিব্যি ভাব ক'রে কথা বা'র ক'রে নেয়, আবার একটু পরেই সেই কথাটাকে উল্টে পাল্টে এমনি বকাবো করবে যে, আমার গায়ে জ্বালা ধরে যায়।

সমবেদনার সুরে বালিকা কহিল—সে ত আমি সব জানি গো মশাই! এক দিন আর রাগ বরদাস্ত করতে না পেরে তুমি ত নালিশ পর্য্যন্ত করেছিলে তোমাদের কে গোবিন্দবাবু আছেন—তাঁর ঘরে গিয়ে।

সহর্ষে কবি কহিলেন—তোমার দেখছি মনে আছে সে কথা—

চোখ দুটি বড় করিয়া বালিকা কহিল—তোমার কোন্ কথাটি আমার মনে নেই বল ত? নামতার মতন মুখস্থ বলে যেতে পারি, তা জান? হ্যাঁ, তারপর কি হল?

কবি কহিলেন—সেই যে গোবিন্দবাবুর ঘরে ঢুকে নালিশ করেছিলুম দুষ্টুগুলোর নামে, সব শুনে আর আমার চোখের জল দেখে গোবিন্দবাবু ত সে বার ছেলেগুলোকে ধমকে দেন, সেই থেকে ওদের স্বভাব যেন একেবারে বদলে যায়, আমার সঙ্গে খুব মিশতে থাকে, গল্প করে, কত কি জিজ্ঞাসা

করে; আমিও মন খুলে আলাপ করতে থাকি। সেইটিই শেষে কাল হয়ে দাঁড়ালো—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই কবি সহসা থামিলেন। দেখিলেন—বালিকা নিবিষ্টমনেই তাঁহার কথা শুনিতেছে, তাহার চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে। কবি নীরব হইতেই আগ্রহের সুরে সে কহিল—তার পর ব্যাপারটা কি হ'ল?

একটু ঢোক গিলিয়া এবং গলাটা পরিষ্কার করিয়া কবি কহিলেন—জানাজানি হয়ে গেল যে আমি কবিতা লিখি।

'ক্তের মত কচি মুখখানির এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া বালিকা কহিল—কবিতার খাতাখানাও তা হ'লে ইস্কুলে নিয়ে যাওয়া হ'ত? হুঁ—বুঝিছি, প্রাণ খুলে প্রাণের বন্ধুদের সামনে কবিতাগুলো পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল! ভেবেছিলে, সবাই আমার মতন, শুধু কান পেতে শুনবে, মুখ দিয়ে কথাটি বেরুতে দেবে না—চেপে রাখবে। তারপর?

বিমর্ষভাবে কবি কহিলেন—তারপর ওরা সেদিনের ব্যাপারটার শোধ তুললে। গোবিন্দবাবুর ঘরে গিয়ে বলে দিলে—আমি কবিতা লিখি। শুধু তাই নয়, ক্লাসে বসে নতুন যে কবিতাটি লিখেছিলুম, সেটি পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়ে গোবিন্দবাবুকে দেখিয়ে জানালে যে, শুধু মুখের কথা নয়, তারা দোষীকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে।

সকৌতুকে বালিকা প্রশ্ন করিল—তার পর কি হ'ল?

কবি কহিলেন—তখনি আমার ডাক পড়ল গোবিন্দবাবুর ঘরে। আমি ত ভয়ে একবারে কাঠ, মুখখানা শুখিয়ে গেছে। কাঁপতে কাঁপতে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলুম—কালো চাপকান পরা আবলুস কাঠে তৈরী একটা বেঁটে খাটো মোটাসোটা মূর্ত্তি যেন প্রকাণ্ড চেয়ারখানা জুড়ে বসে আছে—আর চোখের তারা দুটো ভাঁটার মতন ঘুরছে। আমাকে দেখে সেই চোখে কটমট ক'রে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এই কবিতা নাকি তুমি লিখেছ?

বালিকা—তুমি কি জবাব দিলে?

কবি—মিছে কথা ত বলতে শিখিনি, সত্যি কথাই বললুম—'আমিই লিখিছি।' কথাটা শুনে আমার পানে ঠায় কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি। তার পর বললেন, আচ্ছা, 'ছেলেদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটা কবিতা কাল তুমি লিখে এনে আমাকে দেখাবে। যদি না আনতে পারো, তা হ'লে জানবো—তুমি এক নম্বরের একটা মিথ্যাবাদী, তারপর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। ছেলেদের মুখে তখন আর হাসি ধরে না, তারা ভাবলে খুব জিতে গেছে। আমি যে কবিতা লিখতে পারি না, আর কারুর কবিতা বই থেকে টুকে নিয়ে গিয়ে বড়াই করি, এবার খুব জব্দ হব, এই সব ভেবেই তারা আহ্লাদে আটখানা হয়েছিল। কিন্তু আজ ইস্কুলে গিয়ে কবিতাটি গোবিন্দবাবুর হাতে দিতেই তারাও অবাক! ভাবলে, এতটুকু ছেলে সত্যিই তা হ'লে কবিতা লিখতে পারে নাকি! তার পর আরও মজা হ'ল—টিফিনের পর গোবিন্দবাবু ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সামনে ইস্কুলের সমস্ত ছেলেকে দাঁড় করিয়ে যখন আমাকে বললেন—'তোমার লেখা কবিতাটা আবৃত্তি ক'রে সকলকে শুনিয়ে দাও!' আমার স্ফূর্ত্তি তখন দেখে কে, গলা যদিও কাঁপছিল, বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছিল, তবুও গলায় জোর দিয়ে পড়ে ফেললুম কবিতাটি। শিক্ষক মশাইরা পর্য্যন্ত বললেন—বা! আমাকে তখন আর কে পায়! তুমিই বল না—এটা ঠিক রূপকথার রাজপুত্তুরের মায়াপুরী জয় করার মতন নয়?

কবি-মনের পুলকোচ্ছ্বাস তাঁর সঙ্গিনীর মনটিও যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তার পাতলা ঠোঁট দুটি চাপা হাসিতে ফুটি ফুটি হইয়া তাহা যেন ব্যক্ত করিতেছিল। মুখের হাসিটুকু পলকে চঞ্চল দুই চোখে ভরিয়া সে কহিল—এখন মায়াপুরীর রাজকন্তের ঘোমটাটি খুলে মুখখানি ত আমাকে দেখাও রাজপুত্তুর!

হাতের ভাঁজকরা কাগজখানি খুলিয়া কবি সুর করিয়া তাহাতে লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন:

"মা, এবার ব'লে সাহেব হবো,
রাঙ চলে হ্যাট বসিয়ে
পোড়া নেটিভ নাম ঘোচাবো।
সাদা হাতে হাত দিয়ে মা
বাগানে বেড়াতে যাবো,
আবার কালো বদন দেখ্‌লে পরে
ব্লাকী ব'লে মুখ ফেরাব।"

মুখখানি বাঁকাইয়া সুশ্রী দুটি ভুরু মচকাইয়া বালিকা কহিল—বা-রে, এই তোমার রাজকন্তে! এ তো আমার চেনা;—মনে নেই—লিখেই আমাকে শুনিয়েছিলে। ঘোমটাখানি ত আমিই খুলেছিলুম মশাই, তবে?

হাসিতে হাসিতে কবি কহিলেন—কিন্তু ক্লাসের ছেলেরা একেই ত ধরে নিয়ে গিয়ে গোবিন্দবাবুর টেবিলের মায়াপুরীতে কয়েদ ক'রে ফেলেছিল। তা হ'লে ইনিই আমার বন্দিনী রাজকন্তে নন, তুমিই বল না?

সকৌতুকে সাথীর মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা কহিল—বুঝতে পেরেছি, তোমার গোবিন্দবাবু এঁকে আর ছেড়ে দেন নি। তাঁর ফরমাসী কবিতা লিখে তবে রাজকন্যাকে আজ উদ্ধার করে এনেছ। কিন্তু আমার কাছে সেটি চেপে রাখা হয়েছিল, আমাকে না শুনিয়েই—

বালিকার মুখে আর কথা ফুটিল না, অভিমানে প্রফুল্ল মুখখানি যেন সহসা অন্ধকার হইয়া গেল।

কবি যেন নিজেকে বিপন্ন মনে করিলেন। এ পর্য্যন্ত যতগুলি কবিতা তাঁহার খাতার পাতায় রূপায়িত হইয়াছে, এই রহস্যময়ী সঙ্গিনীটির সমক্ষেই তিনি স্বহস্তে তাহাদের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিয়াছেন। আজই প্রথম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু উপস্থিতবুদ্ধি কবিকে এ বিপদে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া দিল; তাড়াতাড়ি কবি কহিলেন—কি ক'রে তোমাকে শোনাবো, হার-জিতের ব্যাপার তখন চলেছে; গোবিন্দবাবুর ফরমাসী কবিতাটি যে বন্দিনী রাজকন্তের হাতের মালা হবে—সেটা ত তখন ভাবিনি। আমার মনে হচ্ছিল কি জানো, গোবিন্দবাবুর ড্রয়ারের চাবিকাটি একটা তৈরী করছি, তাই সরাসরি তাঁর টেবিলেই সেটি দাখিল করেছিলুম:

গম্ভীর মুখেই বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—রাজকন্তে ত তোমার সঙ্গে, মালাগাছটি কোথায়?

কবি উত্তর দিলেন—দাদাদের খপ্পরে, সন্ধ্যের পর বড়োদের দফ্তরে নাকি পেশ হবে।

কণ্ঠের একটা ঝঙ্কার তুলিয়া বালিকা কহিল—হোক গে, বাসি মালায় আমার কাজ নেই, তোমার ও লেখা আমি কখ্খনো শুনব না, শুনব না, শুনব না। ওর বদলে তিনটি নতুন কবিতা সদ্যঃ সদ্যঃ লিখে আমাকে শোনাতে হবে।

মৃদু হাসিয়া কবি কহিলেন—তাই হবে। আমি বাঁচলুম। এখন হয়েছে কি জান, জ্যোতিদার ইচ্ছা ব্যাপারটা ওঁদের জানিয়ে দিয়ে বলবেন—ছোটর মধ্যেও—বড় আছে, সেই বড়ই ছোটর ভিতর থেকে মানুষের মনকে কেবলি ঠেলে দিয়ে জানাচ্ছে—তুমি বড়, মস্ত বড়!—আমি ত ওঁর কথা শুনে অবাক, লজ্জায় মুখখানা কোলের দিকে নেমে গিয়েছিল। তুমিও বল না, ছোটদের এতটা বাড়ানো কি ঠিক?

স্থিরদৃষ্টিতে কবির মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা কহিল—আ-হা! জ্যোতিদা'র কথা শুনে ছেলে এখন একেবারে লজ্জাবতী লতা! নিজের মুখের কথাগুলো তুমি না হয়-ভুলে গেছ, আমি কিন্তু মুখস্থ করে রেখেছি মশাই।

বিস্ময়ের মত মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া কবি কহিলেন—কি কথা?

মুখে তীক্ষ্ণ হাসির একটা ঝিলিক তুলিয়া বালিকা কহিল—তোমার মনের কথা গো। সেই-যে সেদিন বড়দের ওপর অভিমান করে বলা হয়েছিল—সবতাতে মানা করাটাই হচ্ছে বড়দের স্বভাব!—মশাই বোধ হয় ভুলে গেছেন?

বালিকার স্মিত মুখখানির উপর বিস্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কবি কহিলেন—তোমার সঙ্গে কথায় পারি আমার সাধ্য কি!

মধুর হাসিয়া বালিকা কহিল—অমন কথা ব'ল না কবি! তোমার কথাই ত বলি গো, তবে একটু ঘুরিয়ে; আর যে কথাগুলো মনের ভিতরে চাপা থাকে, ফুটি ফুটি ক'রেও ফুটতে চায় না—আমি সেগুলোকে জোর করে টেনে আনি, কথা কিন্তু তোমারই, তোমার নিজের।

কবির বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টি বালিকার বিচিত্র দৃষ্টির সঙ্গে মিশিয়া কোমল কণ্ঠ হইতে একটা স্বর মিষ্ট সুরের মত নির্গত হইল—অদ্ভুত!

কবিকণ্ঠের এই মৃদু শব্দটির প্রতিধ্বনি যেন বালিকার কণ্ঠ হইতে ধ্বনিয়া উঠিল—অদ্ভুত তুমিই!

৯

এই অদ্ভুত বালকটির জীবন-যাত্রা অতঃপর কালচক্রের আবর্ত্তে বিভিন্ন ঘটনা ও কতিপয় বর্ষের ভিতর দিয়া উষসীর সীমাপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইল। কবি এই সময় রহস্যের মধ্যে তলাইয়া দুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন আহরণে ব্যাপৃত আছেন এবং নিজেকেও রহস্যাবরণে আবৃত করিয়া একটা বিস্ময় সৃষ্টির সাধনা করিতেছেন।

কবি-কথার এই অংশ—কবি-জীবনের উষসীর

এই আখ্যান-খণ্ডটি সর্বাধিক কৌতুকপ্রদ এবং বিস্ময়াবহ।

ইতিমধ্যে কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন; তাঁহার সুব্যবস্থায় কবি ও তাঁহার দুই অগ্রজের উপনয়নোৎসব সম্পন্ন হয় এবং তিনি কবিকে তাঁহার হিমালয়-আশ্রমে লইয়া যান। যাত্রা-পথে বোলপুর পড়ে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ এই বোলপুরে জমি ক্রয় করিয়া একখানি একতলা বাড়ী নির্ম্মাণ করান, তাহাই পরে শান্তি-নিকেতন-নামে পরিচিত হয়। হিমালয় যাইবার সময় তিনি এই শান্তি-নিকেতনে কিছুদিন বাস করিতেন। তাঁহার পরিজন ও আত্মীয়স্বজনদের কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনে আসিতেন। হিমালয় যাত্রা-পথে এবারও তিনি রবীন্দ্রনাথকে লইয়া কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। পিতার সহিত কবি যে সময় প্রথম শান্তিনিকেতনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার বয়স এগারো বৎসর মাত্র এবং সময়টা ১২৭৯ সালের ২৫শে মাঘ—ইং ১৮৭৩, ৬ই ফেব্রুয়ারী। শান্তিনিকেতন হইতে সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলিতে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেষে তিনি পিতার সহিত হিমালয় অঞ্চলে ডালহৌসি পাহাড়ে উপস্থিত হন। এখানে পিতার তত্ত্বাবধানে কয়েক মাস অবস্থিতির পর পিতার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সহিত পুনরায় জোড়াসাঁকোর ভবনে ফিরিয়া আসেন।

এই কয়েক মাসেই কবির দেহমনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বের সঙ্কোচ ও আড়ষ্টতা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বিশাল বাড়ীর মধ্যে বালকের অধিকারও প্রশস্ত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদরযত্নের অন্ত নাই। মায়ের ঘরে মেয়েদের যে সভা বসে, কবি সেখানে বড় রকমের একটি আসন পাইয়াছেন। যে-সব দেশ তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন, হিমালয় পর্ব্বতের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে তাঁর যে-সব দুঃসাহসিক অভিযান চলিয়াছিল, সেগুলি কবিকে গল্পের মত গুছাইয়া বলিতে হয়, মাতা এবং তাঁহার অনুগত পুর-মহিলারা অবাক-বিস্ময়ে এই অদ্ভুত ছেলেটির ভ্রমণ-কথা শুনিতে থাকেন। ইতিমধ্যে তাঁর জ্যোতিদাদার নববধূ সমাগমে অন্দরমহল উল্লাস-মুখর হইয়া উঠিয়াছে, বধূও তাঁহার এই অল্পবয়স্ক দেবরটিকে অবকাশের সঙ্গীরূপে সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন বধূর নিকটও এভাবে প্রশ্রয় পাওয়ায় কবির প্রসন্ন অন্তরটিকে এখন আনন্দ-উৎসাহের উৎস বলিলেও চলে। স্বাধীনতার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় কবির মনের মধ্যে গুঞ্জরিয়া ওঠে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।"

অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন কবি—চাকরদের শাসনপাশ অনেক আগে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ডালহৌসির পার্ব্বত্য-বাংলোর মধ্যে গম্ভীর-প্রকৃতি রাশভারি পিতার কয়েক মাসব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য পাইয়া এবং তাঁহার নিকট বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী শিক্ষার নূতন প্রণালী এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রসাস্বাদ করিয়া কবির অন্তর যেমন বিস্তৃত হইয়াছে, স্বাবলম্বনের একটা আকাঙ্ক্ষাও তেমনি তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ধরা-বাঁধা অবস্থায় আর কি তিনি ধরা দিতে পারেন!

পিতার সহিত বাহিরে যাইবার সময় ভ্রাতাদের সহিত কবি 'বেঙ্গল একাডেমি' নামে এক ফিরিঙ্গি স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। সেখানে কি যে পড়িতেছেন, তাহার কিছুই বুঝিতেন না; পড়াশুনার কোন চেষ্টাও করিতেন না, আর না করিলেও সে সম্বন্ধে শিক্ষকদের কোনরূপ লক্ষ্যও দেখা যাইত না। গাড়ী হইতে নামিয়া স্কুল-বাড়ীতে পদার্পণ করিলেই কবির মনে হইত, যেন খাপওয়ালা একটা বড়ো বাক্সের ভিতর তিনি ঢুকিতেছেন; তার দরজা নির্ম্মম, দেয়ালগুলো পাহারাওয়ালার মত, তার মধ্যে বাড়ীর ভাব কিছু নাই, কোথাও কোন সাজসজ্জা নাই, ছেলেদের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে—কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে রুচির কোনরূপ বালাইও নাই।—এমন একটা বিশ্রী পরিবেশের মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশে নিষ্ঠুর অভিভাবকেরা কবিকে পুনরায় পাঠাইতে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়াই কবি এবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন; দৃঢ়স্বরে তিনি আপত্তি জানাইলেন, স্কুল-পালানো বিদ্যার পরিচয় দিয়া বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং বাড়ীর অভিভাবকগণকে তাঁহার সম্বন্ধে হাল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন। অথচ, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুপযুক্ত বয়সে এই বালকই অগ্রজদের সহিত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য দারুণ

জিদ ধরিয়া অভিভাবকগণকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বোলপুর হইতে ডালহৌসি পাহাড় পর্য্যন্ত যতগুলি স্থানের সহিত গত কয় মাস ধরিয়া কবি পরিচিত হইয়াছেন, প্রতি স্থানটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন—মনের সাথে কবিতা কুসুমাঞ্জলি বাণীর চরণে অর্পণ করিয়া। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরিয়া অবধি তাঁহার সাধনা সমান গতিতেই চলিয়াছে, অবশ্য গোপনে। কবির সাধনা এখন আর শুধু লেখায় নয়, নিজের কল্পনার সম্মুখে নিজেকে কবি বলিয়া খাড়া করিবার জন্য প্রচুর চেষ্টাও চলিয়াছে। আর প্রকাশ্যে চালাইতে হইয়াছে—গৃহশিক্ষকদের নিকট পড়াশুনা, জ্যোতিদাদার নিকট সঙ্গীত এবং বউঠাকুরাণীর নিকট বিবিধ কলা-চর্চ্চা।

রহস্যময়ী সঙ্গিনীর সহিত সেদিন কবির এ সম্বন্ধে তুমুল বিতর্ক চলিতেছিল।

প্রবাসে কয়মাসে কবি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া তাঁহার বিরাম-সঙ্গিনীকে প্রত্যেকটি পড়িয়া শুনাইতে হইয়াছে—বোলপুর শান্তিনিকেতনে বাগানের প্রান্তদেশে একটি চারা নারিকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া সযত্নে রচিত 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়' নামে কাব্যখানি পর্য্যন্ত। লেখাগুলি এখন বালিকার আয়ত্তাধীনে রাখিয়া কবিও নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

অভিভাবিকার মত অনুযোগের সুরে কবির বাল্য সঙ্গিনী বলিতেছিল—সেই যে পেনিটি থেকে ফিরে এলে নদীর জলে মাতামাতি করে, সেই থেকেই তুমি বিগড়ে গেছ একেবারে। এবার দেশভ্রমণ ক'রে পাহাড়-পর্ব্বত ডেঙ্গে রাজপুত্তুর ফিরে এলেন যেন দস্যি হয়ে। কাউকে মানবেন না, কারুর কথায় কাণ দেবেন না, নানা ছুতো করে স্কুল পালিয়ে বেড়াবেন, আর আমাকে কথা শুনতে হবে।

বালিকার কথাগুলি সকৌতুকেই কবি শুনিতেছিলেন, চক্ষুর দুটি স্বচ্ছ তারা চক-চক করিতেছিল যেন। মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে কেন কথা শুনতে হচ্ছে?

ঝঙ্কার দিয়া বালিকা কহিল—হবে না। সবাই কি বলে তাত জান না।

—কি বলে?

—কত কি। দাদারা বলেন, ওর কিচ্ছু হবে না। কাল বড়দি বলছিলেন, আমরা ভেবেছিলুম বড় হ'লে রবি মানুষের মতন হবে, কিন্তু আমাদের সেই আশাটাই সব চেয়ে নষ্ট হয়ে গেল। চাকর-বাকররা পর্য্যন্ত বলতে শুরু করেছে, আমাদের হাতের বাইরে গিয়েই ত বিগড়ে গিয়েছে, তখন আমাদের ইসারাতেই ফিরতো। এসব কথা শুনলে কষ্ট হয় না—তুমিই বল না?

কবির মুখে আর হাসি ধরে না, সঙ্গিনীর বিমর্ষ মুখখানির দিকে চাহিয়া কহিলেন—আমার কিন্তু হাসি পায়, আমি কাণ পেতে শুনি, আর খালি মুখ টিপে টিপে হাসি।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বালিকা কহিয়া উঠিল—আ-রে ছেলে, তোমার তা হ'লে পেটে পেটে দুষ্টুমী, সব জেনেও নেকা সাজতে সাধ? ভাববে তবু মচকাবে না, নিজের নিন্দে শুনবে তবু কথা শুনবে না। কর্ত্তা রাজা এসে যখন সুধোবে, কি জবাব তাঁকে দেবে?

কর্ত্তা-রাজার কথা উঠিতেই কবির মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল, ভঙ্গিতে শ্রদ্ধার ভাব পরিস্ফুট হইল। গাঢ়স্বরে কহিলেন—চারটে মাস বাবার সঙ্গ পেয়েই ত মনের ভাব বদলে গেছে; সেটা ত কেউ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া বালিকা জিজ্ঞাসা করিল—কর্ত্তারাজা কি তোমাকে বলে দিয়েছেন যে কারুর কথা শুনো না—স্কুল পালিয়ে বেড়িও?

কবি কহিলেন—তুমি ত তাঁর ত্রিসীমায়ও ঘেঁষতে না, তাই চিনতে পারো নি তাঁকে। লোকে তাঁকে মহর্ষি বলে কেন জান, মহর্ষির মতই মানুষের ভেতরটা তিনি দেখতে পান—তাই। আমি যতদিন তাঁর কাছে ছিলুম, আমার খাওয়া-পরা, পড়া-শোনা, বেড়ানো, গল্প করা, ঘুমানো—সবই একটা নিয়মে তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাই বলে আমাকে পাখীর মতন খাঁচার ভিতরে তিনি আটকে রাখেন নি কোনদিন, আমার স্বাধীনতা যথেষ্ট ছিল। খেলাই বলো, আর জেদই বলো, যার দিকে যখনই আমার মনটি ঝুঁকেছে আর বাবাকে বলিছি, তিনি কখনো 'না' বলেন নি, কিম্বা সেটা তুচ্ছ বলে উপেক্ষা করেন নি—বরং উৎসাহই আমাকে দিয়েছেন কত। বাবা যে আমার সঙ্গে ছোট-খাটো ব্যাপারেও কি রকম বন্ধুর মতন ব্যবহার করতেন, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

আগ্রহের সুরে বালিকা কহিল—লক্ষীটি, বল না; আমার শুনতে ভারি সাধ হচ্ছে।

কবি কহিলেন—তা হ'লে বোলপুরের গল্পটাই আগে বলি শোন: বাবার সঙ্গে সেখানে যখন যাই, তখন সবে বর্ষা নেমেছে। বাবা যেখানে বাড়ী করেছেন, তার চারদিকে খোলা মাঠ ধু ধু করছে; বুঝতেই পারছো, আমার মনটিও তখন গাছের পাখীর মতন কি রকম বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে—হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটোছুটি করবার জন্যে। পেনেটির বাগানবাড়ীতে গিয়েও এমনি একটা আনন্দ পেয়েছিলুম, কিন্তু সেখানে ছিলুম খাঁচার পাখী, মনের সাধ মনেই থেকে যেতো। ওখানে কিন্তু বাবাকে বলতেই দিব্যি খুশী মনেই বললেন—'বেশ ত, এতে আর কথা কি। প্রকৃতির সঙ্গে তোমার ভাব করাই উচিত, সেই জন্যেই ত শহর থেকে তোমাকে সরিয়ে এনেছি প্রকৃতির রাজ্যে।' বাবার কথা শুনে মনে যেমন আহ্লাদ হ'ল, তেমনি তাঁর উপর শ্রদ্ধাটুকু আরও অনেকগুণ বেশী হয়ে উঠলো। আর অমনি আমার কাঁধ দুটিতে কে যেন দুখানি পাখা বেঁধে দিলে; তখনকার ছুটোছুটি যদি দেখতে।

দৃশ্যটি যেন বালিকার চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠিল, কলকণ্ঠে কহিল—আমি যদি সেখানে তখন থাকতুম।

উৎসাহের সুরে কবি উত্তর দিলেন—তা হ'লে সে আমোদটা কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠতো, সেই সঙ্গে তুমিও বাবাকে চিনতে পারতে।

বালিকা কহিল—অদৃষ্টে থাকলে ত। হাঁ, তার পর কি হ'ল তাই বল।

কবি কহিলেন—মাথার উপরে নীল আকাশ, আর সামনে যতদূর নজর পড়ে খোলা মাঠ ধু ধু করছে, মাঝে মাঝে এক একটা ঢিপি। ছুটতে ছুটতে তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে যেতুম রূপকথার রাজপুত্তুরটির মতন। এক একদিন মাঠ পার হয়ে আর একদিকে যেতুম—মেঘের মত দূর থেকে শাল বনের সারি আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতো, কাছে গিয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকতুম গাছগুলির পানে; শালের নামই শুনিছি, মরা গাছের হাড়ের তৈরী কড়ি-বরোগা দোর জানলা গরাদে—এগুলো ত অষ্টপ্রহরই দেখি—কিন্তু এদের জীবন্ত রূপটি দেখলুম সেই বোলপুরের বনে। শালগাছগুলি তখন ফুলে ভ'রে গেছে, কি সুন্দর সোঁধা সোঁধা গন্ধ! তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে মাঠে ফিরে এলুম। এক জায়গায় হঠাৎ চোখে পড়ল—একটা ঢিপির খানিকটা বৃষ্টির জলে ধ্বসে গেছে, আর নানারঙের নানা আকারের পাথরের নুড়ি চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আমার তখন কি আমোদ, আর—আমার আঁচলটি পেতে সেগুলি কুড়োবার কি উৎসাহ! তারপর সেগুলি নিয়ে বাড়ীতে এসে সেই অবস্থাতেই বাবার সন্ধানে ছুটলুম। বাড়ীর দক্ষিণে বাবা কাঁকরভরা-মাটি দিয়ে পাহাড়ের মত একটা উঁচু ঢিপি তৈরী করিয়েছিলেন। সকালে বিকেলে তারই ওপরে তিনি চুড়োয় বসে থাকেন। সেই ঢিপির উপরে উঠে রঙ-বেরঙের নুড়িভরা আমার আঁচলটি তাঁর সামনে ধরে বললুম—'দেখুন, কি সুন্দর পাথর, আমি কুড়িয়ে এনেছি।' এক নজরে সেগুলি দেখে খুশী হয়ে বাবা বললেন—'বা! চমৎকার ত! কোথায় পেলে এ সব?' আমি বললুম—'এমন আরো আছে, অনেক—অনেক; হাজার হাজার। আমি রোজ এনে দিতে পারি।' বাবা হেসে বললেন—'সে হলে ত বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়ে তুমি আমার এই পাহাড়টি সাজিয়ে দাও।' বাবার কথায় আমার উৎসাহ যে কত বাড়লো, আর মনটি আনন্দে কি রকম ভরে গেল, সে ত বুঝতেই পারছ। তখন থেকে এই পাথর কুড়িয়ে আনা আমার একটা বড় রকমের কাজ হয়ে দাঁড়ালো—যে কদিন ছিলুম। এখনো মন কেমন করে তাদের জন্যে।

মৃদুকণ্ঠে বালিকা কহিল—আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকতুম সেখানে।

কবির মুখখানি পুনরায় উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন—তা হ'লে কাজটা আধা-খেঁচড়া হয়ে থাকত না, দুজনে মিলেই বাবার পাহাড়টিকে পাথর দিয়ে সাজিয়ে ফেলতুম। এই পাথর খুঁজতে খুঁজতে আর একদিন একটা জিনিস খুঁজে বার করেছিলুম। দেখলুম, মাটি চুঁইয়ে একটা খুব বড় গর্তে জল জমে আছে, আর সেই জল বালির ভিতর দিয়ে ঝির ঝির করে ঝরণার মত বইছে। বাড়ীতে ফিরেই বাবাকে বললুম—'ভারি সুন্দর জলের ধারা দেখে এসেছি, জল যেন তক্ তক্ করছে। ঐ জল কিন্তু আনালে বেশ হয়।' বাবা বললেন—'বটে, আচ্ছা আমি আজই ঐ জল তুলে আনাচ্ছি।'—তুমি শুনে হয়ত আশ্চর্য্য হবে, বাবা শুধু আমাকে স্তোক দেননি—লোক দিয়ে সেই জলই আনাবার ব্যবস্থা করলেন। খাবার

সময় আমার দিকে চেয়ে বললেন—'চিনতে পারছ ত, তোমার অধিকার করা জলই আমরা পান করছি।' ছোট ছেলের ছেলেখেলাগুলোকে মেনে নিয়ে বাবা কেমন করে আমার মনটিকে বশ ক'রে ফেলেন, আর সেই সঙ্গে আমার কাছ থেকে ষোল আনা শ্রদ্ধাটুকুও আদায় ক'রে নেন, তাঁর ব্যবহার থেকেই বুঝতে পারছ ত?

বালিকা এই সময় সহসা জিজ্ঞাসা করিল—তা হ'লে তোমার সব কাজেই তিনি সায় দিতেন, বকতেন না কোন দিন?

কবি কহিলেন—যে ক'মাস তাঁর কাছে ছিলুম, কিছুই আমাকে চাইতে হয়নি, আমার কি চাই, আমার চেয়েও তিনি সেটা ভালো করেই জানতেন। তাই আমাকেও তাঁর সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকতে হ'ত—তিনি যেগুলো চান না, তাদের ছায়াও যাতে মাড়াতে না হয়। আমার উপর বিশ্বাস করে কত শক্ত শক্ত কাজের ভার বাবা চাপিয়ে দিয়েছিলেন। গীতার যে শ্লোকগুলি তিনি রোজ পড়তেন, সেগুলোর গায়ে একটা করে চিহ্ন দিয়ে বাবা আমাকে একদিন বললেন—'এই শ্লোকগুলি আর নীচের অনুবাদ বেশ স্পষ্ট অক্ষরে কপি করে ফেল, আমার পড়বার সুবিধে হবে।' এত বড় শক্ত কাজের ভার বাড়ীতে কেউ কখন দিয়েছে আমাকে বলতে পার? তার পর পড়াশোনার যে ব্যবস্থা করলেন—তেমনটি আর দেখিনি। শেষ রাত্তিরে উঠে তিনি উপাসনায় বসতেন, আমিও তাঁর সঙ্গে উঠে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' মুখস্ত করতুম। স্কুলে যেটি ছিল চক্ষুঃশূল, বাবার শিক্ষার এমনি গুণ যে, ঐ সময়টিতে বিছানা ছেড়ে ওঠা আর ব্যাকরণ পড়া অভ্যাস হয়ে গেল, এখানে এসেও সে অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। ভোর হতেই বাবার সঙ্গে বেড়াতে যেতে হ'ত। ফিরে এসে কিছু খেয়েই ইংরেজী পড়া চলতো। ভালো ভালো ইংরেজী বইগুলির শক্ত শক্ত শব্দগুলো বাবা যেন গুলে খাইয়ে দিতেন আমাকে, তাঁর কাছে পড়ায় বিরক্তি আসত না—পড়ার আগ্রহ আরো বাড়তো। রাতে আমাকে নিয়ে আকাশের তারা দেখিয়ে জ্যোতিষ শিখাতেন। ইংরেজী জ্যোতিষের বই থেকে বাঙলায় অনুবাদ করবার কৌশলটি দেখিয়ে দিয়ে গদ্য লেখবার পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন।—এর পরে স্কুলের কয়েদখানায় ঢুকে ওদের বাঁধা-ধরা শিক্ষা কি আমার মনে ধরে কখনো? তাই যাইনে, পালিয়ে বেড়াই।

বালিকা এবার হাসিয়া কহিল—তোমার মতলব এতক্ষণ বুঝেছি, স্কুলের পথ আর মাড়াচ্ছ না। কিন্তু শুনেছ ত, আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি। পড়ছি, ছবি আঁকছি, গান শিখছি।

কবিও সহাস্যে উত্তর দিলেন—বেশ ত, তুমি যদি পড়াশোনায় ওস্তাদ হতে পার, আমি না হয়, তোমারই পোড়ো হব, তুমি পড়াবে।

কবির কৌতুকোজ্জ্বল মুখখানির দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বালিকা কহিল—আমার কাছে পড়তে হ'লে বকুনি আছেই, তার ওপরে সপাসপ বেত। এই বারান্দায় রেলিংগুলোকে নিয়ে গুরুমশাইগিরি মনে আছে ত!

চাপা হাসির ঝলকে পলকে দুইখানি মুখই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

১০

সংস্কৃত, বাঙলা ও ইংরেজী সাহিত্যে সমান অধিকার আছে—বাছিয়া বাছিয়া এমন পণ্ডিতকেই ঠাকুরবাড়ীর ছেলেদের শিক্ষকতার জন্য সাদরে বরণ করা হইত। অন্যান্য ছেলেরা গৃহশিক্ষক মহাশয়ের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিয়া লইলেও, বালক রবীন্দ্রনাথের চিত্ত তাহাতে সহজে আকৃষ্ট হইতে চাহে না। বিশেষত, ডালহৌসী পাহাড় হইতে ফিরিবার পর—এই অদ্ভুত বালকের মনোবৃত্তি এবং পাঠে বিতৃষ্ণা অভিভাবকদিগকে সত্য সত্যই চিন্তিত করিয়া তোলে। কোন প্রকারে তাঁহারা জানিতে পারিলেন, বিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা ব্যবস্থা ও মামুলী শিক্ষাপ্রণালী রবির একান্ত অবাঞ্ছিত; যোগ্য গৃহ-শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বরং তাঁহার পড়াশুনা সম্ভব হইতে পারে। ফলে রবির জন্য যে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ মিষ্টভাষী শিক্ষকটি অতঃপর মনোনীত হইলেন—তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যেমন অসামান্য, শিক্ষাদানের নৈপুণ্যও তেমনি প্রশংসিত। ইনিই জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

বাল্যসঙ্গিনীর সহিত পড়াশুনা সম্বন্ধে সংলাপের কয়েক দিন পরেই এই নূতন পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুর-বাড়ীতে আসিয়া রবির অধ্যয়নের চার্জ্জ গ্রহণ করিলেন। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ও এই সময়

রবিকে 'শকুন্তলা' পড়াইতেছিলেন; শকুন্তলার সুন্দর শব্দঝঙ্কার ও রসমাধুর্য্য বালক কবির অন্তর আকৃষ্ট করিলেও, শিক্ষকের ব্যাখ্যায় ছাত্রের অন্তরের ক্ষুধার উপশম হইত না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যে উত্তর পাইতেন, তাহাতেও বালকের আগ্রহ চরিতার্থ হইত না। তিনি তখন নিজেই দুরূহ শ্লোকগুলির মনগড়া সহজ অর্থ খাড়া করিয়া কাব্যের রস উপভোগ করিতে প্রয়াস পাইতেন।

এই অবস্থায় আর একজন বিদ্বান পণ্ডিত ইংরেজী-সাহিত্য পড়াইতে আসিতেছেন শুনিয়া কবি মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। শকুন্তলার পাঠ পড়াইয়া রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় বিদায় লইবার পরেই দেখা দিলেন নূতন পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। ইনি আবার সুবিখ্যাত পণ্ডিত আনন্দ-চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কৃতী পুত্র—সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার পাণ্ডিত্য অসামান্য।

গুরু শিষ্যে চোখোচোখী হইতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিমুখে নূতন ছাত্রকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি নাকি এই বয়সে কবিতা লিখতে শিখেছ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে রবির চোখ দুটি সহসা বড় হইয়া উঠিল; খাঁ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—নর্ম্মাল স্কুলের কথা; গোবিন্দবাবুও একদা তাঁহাকে ঠিক এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন তবে তাঁহার কালো মুখখানির উপর তখন অবিশ্বাসের একটা ছায়া গাঢ় হইয়া ফুটিয়াছিল, আর এই প্রশ্ন-কর্ত্তাটির প্রসন্ন-সুন্দর মুখখানি যেন প্রত্যয়ের আলোক-পাতে ঝলমল করিতেছে। সেদিন বালকের বুকখানি ভয়ে টিপ টিপ করিয়া উঠিয়াছিল, আজ সেখান হইতে সঙ্কোচের আবরণ সরিয়া গিয়াছে, চিত্তের শুচিতা সাহসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে রবি ধীরে ধীরে তাঁহার পুস্তকের দফ্‌তর হইতে বাঁধানো খাতাখানি বাহির করিয়া আগাইয়া দিলেন।

খাতাখানি খুলিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রসন্ন দৃষ্টিপথে সরু সরু সুশ্রী অক্ষরে লেখা যে কবিতাটি বাহির হইয়া পড়িল, তিনি নিজেই তাহা আবৃত্তির ভঙ্গিতে পাঠ করিলেন:

প্রথম আষাঢে রামগিরি হতে বহি বিরহের বাণী
গিয়েছিল দূত নীল ঘন মেঘ সে কথা সবাই জানি।
প্রথম আষাঢে জোড়াসাঁকো হতে মিলনের দূত চলে
পীত-বাস পরা নব রবিকর প্রভাত-গগন তলে।

কবিতাটি পড়িয়াই ভট্টাচার্য্য মহাশয় হর্ষোৎফুল্ল মুখে কহিলেন—বাঃ, চমৎকার হয়েছে ত!

নূতন শিক্ষকের মুখে কবিতার এরূপ সুখ্যাতি শুনিয়া বালক-কবির সুন্দর মুখখানি আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সহাস্যে তিনি কহিয়া উঠিলেন—কবিতার চেয়ে আপনার আবৃত্তি হয়েছে অনেক ভালো, এইজন্যেই কবিতার রূপটিও বদলে গেছে।

শিষ্যের কথা গুরুর মনেও দোলা দিল বোধ হয়; প্রসন্নমুখে তিনি কহিলেন—ন' হে, কবিতা ভাল না হলে আবৃত্তিও ভাল হয় না। ভাল কবিতা যে লিখতে পারে—তার আবৃত্তি আরও ভাল হয়, এটা স্বাভাবিক। বেশ, এবার তুমিই এটা আবৃত্তি কর ত, দেখা যাক—কেমন শোনায়।

খাতাটি লইয়া কবি তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতে নিজেরই পরিকল্পিত সুরে কবিতাটি পড়িলেন। শিক্ষক চমৎকৃত, মুগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—অপূর্ব্ব! আমি কবিতাটি আবৃত্তি করেছি, কিন্তু তুমি যেন একখানি গান গাইলে! আর কেউ হ'লে আমি যে ভাবে পড়েছি—সে তারই নকল করে আমাকে খুশী করতে চাইত, কিন্তু তুমি তার ধার দিয়েও যাওনি। তোমার বয়সের ছেলের পক্ষে এটুকু খুবই প্রশংসার কথা। প্রতিভার এ একটা মস্ত লক্ষণ; যাঁরা প্রতিভাবান, ছেলেবেলা থেকেই তাঁরা নিজের চেষ্টায় নতুন রাস্তা তৈরি করে নেন। তোমার শক্তি আছে, এ শক্তি সহজাত, ইচ্ছা করলে পাওয়া যায় না। এর সঙ্গে শিক্ষার সাধনা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে চলে—কালে তুমি মহাশক্তিধর হবে, প্রতিভার বরপুত্র বলে লোকে তোমার সুখ্যাতি করবে!

ভবিষ্যতের সম্বন্ধে এত বড় আশার কথা শুনিয়া বালকের মনের মধ্যে কি হইতেছিল কে জানে, কিন্তু তাঁহার মুখে উৎসাহের কোন চিহ্ন দেখা গেল না; জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রদ্ধাভাজন এই শিক্ষকটির পানে চাহিয়া তিনি মৃদুস্বরে শুধু কহিলেন—কিন্তু স্কুল ছেড়েছি ব'লে লোকের মুখে এখন আমার নিন্দা আর ধরে না, সকলেই ঠিক করে রেখেছে—আমার কিচ্ছু হবে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—আমি তা জানি, কিন্তু তুমি এজন্যে দুঃখ ক'র না। লোকে তলিয়ে কিছু দেখে না, বাইরেটা দেখেই মনে মনে একটা ধারণা পাকা ক'রে ফেলে। আমি কিন্তু সে লোক নই, এক নজরেই তোমার

ভিতরটা সব দেখে নিয়েছি, তাছাড়া অনেক খবরও আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে তোমাকে ভাল ক'রে চেনবার জন্যে। যাক, তোমার মন আর রুচির দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি তোমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করব।

এই সময় ঠাকুর-বাড়ীর জনৈক পরিচারক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একখানা বাঁধানো বই। সেখানি শিক্ষক মহাশয়ের সুমুখে রাখিয়া সে চলিয়া গেল। বালকের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, নূতন শিক্ষক মহাশয়ের নির্দেশেই বইখানি তাঁহার টেবিলে আসিয়াছে।

সহাস্যে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করিলেন—কি বই এখানি বল ত?

বইয়ের বাঁধানো মলাটেই স্বর্ণাক্ষরে নামটি লেখা ছিল। বালক উত্তর দিলেন—ম্যাকবেথ।

—এর গ্রন্থকারের নাম জান?

—শেক্সপীয়র। বিলাতের একজন মহাকবি।

—তুমি এ বই পড়েছ?

—পড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কারুর সাহায্য পাইনি বলে বুঝতে পারিনি। বুঝিয়ে নিতে গিয়ে বকুনি খেয়েছি। বড়রা বলেন—এ বই পড়বার বয়স এখনও আমার হয়নি।

—বুঝতে এখন ইচ্ছা করে?

—খুব। নিজের বিদ্যেয় যেটুকু বুঝতে পেরেছিলুম, আমার ভারি ভাল লেগেছিল।

ছাত্রের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া শিক্ষক মহাশয় দৃঢ়স্বরে কহিলেন—ভাল কথা। এই বইখানাকেই তা হ'লে তোমার পাঠ্য করা গেল। আর অধ্যাপনা তোমার পিতাঠাকুরের ধারাতেই চলবে, কি বল?

বিস্ময়ানন্দে বালকের মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু এ সম্বন্ধে মনে যে প্রশ্ন জাগিল, মুখ দিয়া তাহা বাহির হইল না। শিক্ষক মহাশয়ের দৃষ্টি বালকের মুখেই নিবদ্ধ ছিল, হাসিয়া তিনি কহিলেন—ভাবছ বুঝি আমি কি করে এ খবর পেয়েছি। আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছে হে! রোগী দেখতে এসে বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন তার হাড়হদ্দ সব জেনে তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, ছাত্রের সম্বন্ধেও শিক্ষককে তেমনি সবজান্তা হতে হয়—বুঝেছ? তার কি প্রয়োজন, কি ভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে উৎসাহ তার বাড়বে—এগুলো শিক্ষকের জানা চাই। তাই শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের উভয়েরই সহযোগিতার দরকার। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার ঝোঁক এখন কবিতা রচনার দিকে। আমি এতে বাধা দেব না, বরং এ ব্যাপারে আমার কাছ থেকে তুমি উৎসাহই পাবে। এমনভাবে আমি তোমাকে ইংরেজী সাহিত্য পড়াবো—যাতে তোমার মনে বিরক্তি আসবে না, বরং আনন্দ আর কৌতূহল তাতে আরও জাগ্রত হবে।

কোন শিক্ষকের মুখে এ পর্য্যন্ত বালক-কবি শিক্ষা সম্বন্ধে এমন সুস্পষ্ট ও উদার নির্দেশ শুনিবার সুযোগ পান নাই। সকলেই গম্ভীর মুখে শক্ত শক্ত উপদেশ দিয়াছেন, পাঠে অবহেলার প্রসঙ্গ তুলিয়া অনুযোগ করিয়াছেন। কিন্তু এমন সরলভাবে মনের কথা কেহ খুলিয়া বলেন নাই—বালকের মনের খবর লইবার কোন চেষ্টাও কেহ করেন নাই। এই অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ ছেলেটি যে প্রচলিত পদ্ধতিকে দুই চক্ষু বুলাইয়া কিছুতেই মানিয়া লইবে না—এই বয়সেই প্রত্যেক জিনিষটি নিজের বুদ্ধি ও বিচারের দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে ইচ্ছুক, শিক্ষকমহাশয়দের পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। বালকের রহস্যময় হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন এই প্রথম জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন—আমি এই ম্যাকবেথ নাটকখানির এক একটি দৃশ্য আবৃত্তি ক'রে তোমাকে বাঙালায় তার অর্থ বুঝিয়ে দেব, তুমি ছন্দে তার অনুবাদ ক'রে খাতায় লিখবে। কেমন, আমার এ যুক্তিটা কি রকম মনে হয়?

উচ্ছ্বসিত উল্লাসে বালক-কবি উত্তর দিলেন—চমৎকার! এতে আমার ভারি উৎসাহ হচ্ছে। আপনি পড়া শুরু করুন, আমি খাতা নিয়ে বসি।

উদাত্ত কণ্ঠে ম্যাকবেথের প্রথম দৃশ্যটি ইংরেজীতে আবৃত্তির পর শিক্ষক মহাশয় সরল বাঙালায় তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিলেন, ছাত্রও সঙ্গে সঙ্গে ছন্দে তাহার অনুবাদ করিয়া শিক্ষকের প্রশংসাভাজন হইলেন।

শিক্ষক মহাশয়ের প্রস্থানের পরেও ছাত্রের পাঠোৎসাহ হ্রাস পায় নাই, দেহে ও মনে কিছুমাত্র ক্লান্তি আসে নাই; অনুবাদের সংশোধিত অংশগুলিকে নূতন উদ্যমে নূতন ভাবে ছন্দোবদ্ধ করিতে গভীরভাবেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সজনীটি মাথার বেণীটি দোলাইয়া

এবং উচ্ছ্বসিত হাসির ধারা অতি কষ্টে চাপিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ঠিক পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষুর কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি কবির খাতায় নিবদ্ধ। শেষ ছন্দটি শেষ করিয়া কবি মুখখানি তুলিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় কলহাস্যে ঘরখানি মুখরিত করিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল—আজ যে ছেলের পড়ায় ভারি চাড় দেখছি, একটা মানুষ যে এসে দাঁড়িয়েছে—সেদিকে হুঁসটি পর্য্যন্ত নেই! হ'ল কি শুনি?

বালক-কবির মুখে এখন আর হাসি ধরে না; সদ্য-সমাপ্ত লেখাটির পৃষ্ঠায় বালিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বরচিত এবং সঙ্গিনীর অতি পরিচিত একটি কবিতা মধুর স্বরে বিচিত্র ভঙ্গিতে পড়িয়া প্রশ্নটির উত্তর দিলেন—

জেনেছি মানুষ কাহারে বলে!
জেনেছি হৃদয় কাহারে বলে!
জেনেছি আজ ভালবাসা পেলে
আঁধার হৃদয়ে কি আলোক জ্বলে।

হাসির গমকে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া বালিকা কহিল—বা-রে ছেলে, তোমার পদ্যের কমলার কথাগুলো বলে আমাকে তাক্ লাগিয়ে দেবে ভেবেছ? আমিও জবাব দিতে জানি, শুনবে—

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল,
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর,
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল,
পারে না পুরিতে তারা বিশাল মানুষ হৃদি
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

কবিতাটি বালক-কবির অনুরূপ ভঙ্গি ও সুরে আবৃত্তি করিয়া হাসিমুখে বালিকা কহিল—কেমন? মানুষকে ত জানলে, কিন্তু মানুষের মন কি চায় সেটি কে জানবে মশাই? কেমন মিলিয়ে দিলুম বল—তোমারই পদ্য চুরি করে। একেই বলে গঙ্গাজলে গঙ্গা পুজো। কেমন লাগল?

মুগ্ধদৃষ্টিতে সঙ্গিনীর পানে চাহিয়া সহাস্যে কবি কহিলেন—ভাল ত লাগলই, মানুষটির মনেও লেগে রইল।

উত্তরটি শুনিয়া বালিকা বোধ হয় খুশীই হইল। পরক্ষণে চঞ্চল দৃষ্টি তাহার খাতাটির উপর মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—পড়তে বসে মেলা পদ্য লিখে ফেলেছ যে! মাষ্টারটি তা হ'লে মনের মতন হয়েছে বল? পড়তে বসে পদ্য লিখিয়ে গেলেন!

বালিকার মুখের চাপা হাসি এবং অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বালকের মনে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল; ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার কৌতুকোজ্জ্বল ভঙ্গিটি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, এর গোড়া হচ্ছ তুমি।

ফিক করিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—গোড়া? গাছের গুঁড়িকে ত' গোড়া বলে, আমি ত মানুষ—খুদে একটি মেয়ে।

—তা হ'লেও তুমি সহজ মেয়ে নও, গাছের গুঁড়ি যত বড়ই হোক, তার বুদ্ধি কতটুকু। আর তুমি যে কত বড় চালাক, তোমার মুখের হাসি আর চোখের চাউনি দেখেই বুঝিছি।

—কি বুঝেছ শুনি?

—সেদিন পড়াশোনার ব্যাপারে বাবার কাছে পড়ার যে সব কথা তোমাকে বলিছি, আজকের এই নতুন পণ্ডিতটিকে তুমি সব বলে দিয়েছ। নইলে তিনি আমার মনের খবর পেলেন কি ক'রে?

—তা হ'লে ওঁর পড়ানো তোমার মনে ধরেছে বল? তাই এখনও ওঠবার নামটি নেই।

—আমার অনুমানটি তা হ'লে সত্যি? পাছে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বওয়াটে হই—বাড়ীশুদ্ধ, সবার নিন্দে কুড়ুই, তাই তুমি—

খপ্ করিয়া সঙ্গীর মুখখানি কোমল করপল্লবে আবৃত করিয়া বালিকা শাসনের ভঙ্গিতে কহিল—চুপ, এ নিয়ে আর কথা নয়। ফল খাওয়া নিয়েই যেখানে মতলব, ভাল ফলটি পেলেই ত ল্যাটা চুকে গেল। কোথা থেকে ফলটি এলো, কোন্ গাছের ফল, কে পাড়লে—এ সব খবরে কি দরকার বাপু! হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনেছ—আজ আমাদের কি দুর্দ্দশা হয়েছিল?

আগ্রহের সুরে বালক প্রশ্ন করিলেন—কি হয়েছিল আবার?

বালিকা উত্তর দিল মুখখান রীতিমত গম্ভীর করিয়া—গাড়ী উল্টে গিয়েছিল, হাত পা মাথা ভেঙ্গে যেত সব; ভাগ্যিস্ ঘোড়াটা ভাল ছিল, তাই রক্ষে! হৈ হৈ করে দুটো পুলিস এলো ছুটে!

মুখে আতঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বিচিত্র স্বরে বালক কহিলেন—হ্যাঁ! পুলিস এসেছিল ছুটে। ধরে নি ত?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমাদের ধরতে নয়, গাড়ীখানাকে ধ'রে তুলতে।

মুখখানা এবার প্রসন্ন করিয়া বালক কহিলেন—বাঁচলুম। আমার দিদিকেও একবার পুলিসে ধরতে এসেছিল।

দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বালিকা কহিল—ওমা, সে কি?

বালক-কবি গল্প বলার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন—তোমার মতন বয়সে আমার দিদিও স্কুলে পড়তে যেতেন। সেদিন দিদি পেশোয়াজ পরে পাল্কী চেপে পড়তে যাচ্ছিলেন। তাঁর গায়ের রঙ ত দেখেছ, পুলিস ভাবলে কোন ইংরেজের মেয়েকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে; অমনি তারা জোর ক'রে পাল্কী থামালে।

সভয়ে বালিকা কহিয়া উঠিল—কি সর্ব্বনাশ! দিদি তখন কি করলেন?

গম্ভীর মুখে কবি কহিলেন—সেইটিই ত ভারি মজার। অন্য মেয়ে হ'লে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠত, কেঁদে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধিয়ে বসত, দিদি কিন্তু ভয় পাবার মেয়েই নয়, মুখখানা তুলে চোখ দুটো বড় ক'রে যেই বললেন—'জানো আমি কে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাত্নী'—তখন পুলিস একেবারে থ, পাল্কী ছেড়ে দিয়ে বাপ চেয়ে দে ছুট!

বালিকার মুখেও হাসি ফুটিল, কহিল—ভাগ্যিস্ দিদির কথা বললে, জানা রইল; এর পর কোন দিন স্কুলের পথে পুলিস যদি আমাদের গাড়ী ধরে, আমি অমনি চোখ দুটো পাকিয়ে বলবো—জানো আমি কোন্ বাড়ীর মেয়ে, আর আমার খেলার সাথী কে? প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাতি—মস্ত বড় কবি।

কথার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মুখেই হাসির লহর ছুটিল। হাসিতে হাসিতে বালিকা কহিল—আজ যখন এত তোমার স্ফূর্ত্তি, মনের মতন মাষ্টার পেয়েছ, তখন একখানা গান শুনিয়ে দাও না।

সহাস্যে বালক কহিল—গাড়ী উলটাবার পর গান ভাল লাগবে? আচ্ছা তা হ'লে গান একটা ধরি, শোনো—

বালক-কবি মেঘের সুরে সকৌতুকে গান ধরিলেন :

হায়রে হায়—সা রে গা মা পা ধা নি সা!
(আবার) গাড়ীর হ'লো উল্টো মতি
কোথায় হবে আমার গতি—
খুঁজে আমি পাই না দিশা।
সারে গামা পাধা নিসা।

গানের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের উচ্ছ্বসিত হাসির গমকে পাঠাগারটি মুখরিত হইয়া উঠিল।

১১

আরও কয়েক মাস অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই বালক কবির 'ম্যাকবেথ' পড়া এবং ছন্দে তাহার অনুবাদ সারা হইয়া গিয়াছে। ম্যাকবেথের পর আরও কয়েকখানি ইংরেজী সাহিত্যের বই বালক এইভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন আর ইংরেজী বই পড়িতে বালকের বাধে না, বিরক্তিও লাগে না। বিদেশী ভাষার সাহায্যেও যে বিচিত্র রস-আস্বাদন করিতে পারা যায়, বালক-কবি এখন ভালভাবেই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সময় কবি-বালকের মনের উপর আরও দুইটি জিনিস আশ্চর্য্য রকমের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহাদের একটি হইতেছে 'বঙ্গদর্শন' নামে মাসিকপত্র পড়া, অন্যটি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মত কবিতা লিখিয়া লোকের প্রশংসালাভ করা। 'বঙ্গদর্শন' বাহির হইয়া বাড়ীতে আসিলে তখন কাড়াকাড়ি কাণ্ড পড়িয়া যায়, ছোট-বড় সবারই লক্ষ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসের দিকে। বিপুল আগ্রহে প্রত্যেকেই কাগজখানির প্রতীক্ষা করিতে থাকে। বাড়ীর মেয়ে-মহলেও 'বঙ্গদর্শনে'র আদরের অন্ত নাই। বালক-কবি মেয়েদের এই আগ্রহটিকেই সুযোগ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এক সঙ্গে অন্তঃপুরিকাদের আগ্রহ চরিতার্থ করিতে বালকের উপরই ভার পড়িয়াছে 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়া সকলকে শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিবার। বালকের আবৃত্তির প্রশংসা সকলের মুখে, সুতরাং পাঠকরূপে 'বঙ্গদর্শন' পাঠের অবাধ সুযোগটি অপ্রত্যাশিতভাবেই ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটিতে রীতিমত এক অন্তরায় দেখা দিয়াছে এবং তাহাতে বালক-কবির ভবিষ্যতে বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর মত বড় কবি হইবার আশা ভাঙিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। যেহেতু, জ্যোতি দাদার স্ত্রী বালকের বৌঠাকুরাণীর মনোরঞ্জনের জন্য যাবতীয় ফাই-ফরমাস খাটিয়াও কবিতার ব্যাপারে কিছুতেই

তাঁহার প্রশংসাটুকু আদায় করিতে পারেন নাই। বালক-কবির যে সকল কবিতা পড়িয়া একবাক্যে সকলেই সুখ্যাতি করিয়া থাকেন, বৌঠাকুরাণীর কানে তাহার কোনটিই ভাল লাগে নাই; অধিকন্তর যত্নসহকারে যতবারই কবি নূতন নূতন কবিতা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মুখখানি বিকৃত করিয়া উপেক্ষার ভঙ্গিতে বলিয়াছেন—যত চেষ্টাই কর না কেন, কস্মিন্ কালেও তুমি বিহারীবাবুর মতন কবিতা লিখতে পারবে না।

বৌঠাকুরাণীর এই কথাগুলি বালকের বুকে যেন তীরের ফলার মত বিঁধিয়াছে; মনের কষ্ট মনে চাপিয়া, অভিমানে সুন্দর মুখখানি অন্ধকার করিয়া বালক বৌঠাকুরাণীর সহিত আড়ি দিয়াছেন। এদিন আর তেতালায় বৌঠাকুরাণীর মহলের ত্রিসীমানায় যান নাই, দোতালায় সেই রেলিং-দেওয়া বারান্দাটিতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। এই নির্জ্জন স্থানটিতে দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে সঙ্গিনীটি সেখানে আসিয়া তাঁহাকে পাকড়াও করিল, ভ্রূভঙ্গি করিয়া ধমক দিয়া কহিল—আচ্ছা ছেলে ত তুমি, এখানে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছ, আর তোমাকে খুঁজে খুঁজে সারা বাড়ী মাত করে বেড়াচ্ছি আমি! অ-মা, মুখখানা যে বর্ষার আকাশের মতন কালো হয়ে উঠেছে, দুঃখুটা কিসের শুনি?

বালিকার আবির্ভাবেই কবি-বালকের মুখের উপরের আবরণটি যেন পলকে অদৃশ্য হইয়া গেল। চোখ দুটি বড় এবং কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া কবি কহিলেন—তেতালায় আর যাব না, আমার এই বারান্দাই ভাল।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আবার কেঁচে গণ্ডুষ করবার সাধ হয়েছে নাকি। গরাদে-গুলোকে নিয়ে গুরুমশাইগিরি শুরু হবে?

সঙ্গিনীর কথাগুলি বুঝি বালকের মনে সাড়া দিল না, তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিমান এবার গুমরিয়া উঠিল। মনের কথা অবাধে ব্যক্ত করিবার এবং বিপুল উচ্ছ্বাস সাগ্রহে উপভোগ করিবার এমন সহনশীলা পাত্রী ত আর ঠাকুরবাড়ীতে দুটি নাই, কাজেই ভাবের আবেগে বালক তাঁহার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন:

বৌঠাকুরাণীর কথাগুলো তুমিও ত শুনেছ, বলতে পার—কোন দিন তিনি আমার কোন লেখাকে ভাল বলেছেন? যত যত্ন করেই লিখি—আর যত আশা নিয়ে তাঁকে পড়ে শুনাই, তাঁর মুখে সেই এক কথা—কিছু হয় নি, কবি তুমি কোন দিন হতে পারবে না। তুমিই বল—এতে কষ্ট হয় না?

মৃদুস্বরে বালিকা কহিল—নাই বা তিনি ভাল বললেন, তাতে কি হয়েছে; তাঁর নিন্দে তুমি গায়ে না মাখলেই ত পার।

মুখখানি ম্লান করিয়া বালক বলিলেন—তা কি কখন পারা যায়? ম্যাকবেথের ব্যাখ্যা শুনে কবিতায় তার যে অনুবাদ করেছিলুম, পণ্ডিত মশাই পড়ে কত সুখ্যাতি করলেন। নিজেই খুশী হয়ে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে। কত বড় পণ্ডিত তিনি জান ত, তাঁরই লেখা প্রথম ভাগে—জল পড়ে, পাতা নড়ে—প'ড়ে আমরা ভাষা শিখিছি। তিনি আমার অনুবাদ পড়ে আর হস্তাক্ষর দেখে পিঠ চাপড়ে কত সুখ্যাতি করলেন, কত আশীর্ব্বাদ করলেন, আশার কথা শুনিয়ে—আদর ক'রে খাবার খাইয়ে বিদায় দিলেন। আর—

বালকের মুখের কথা এখানে সহসা রুদ্ধ হইয়া গেল, বাণী আর বাহির হইল না। সাথীর ব্যথার কারণটি বুঝিয়া বালিকাই রুদ্ধ পথটি খুলিয়া দিল, কহিল—আর বৌঠান ঐ খাতা দেখে কি বললেন?

মুখখানা ভার করিয়া বালক উত্তর দিলেন—বরাবর যা ব'লে এসেছেন, তাই;—কিছু হয়নি, ছেলেমানুষ দেখে বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি চুমকুড়ি দিয়েছেন—পোষা পাখীর মুখে কথা শুনলে আমরা যেমন ক'রে তাকে চুমকুড়ি দিই। বল ত, এতে কষ্ট হয় না?

বালিকা কহিল—তবে নাকি বৌঠাকুরাণী তোমার হাতের লেখাটার সুখ্যাতি করেছেন?

বালক উত্তর দিল—সেটাও মন খুলে করেন নি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার হস্তাক্ষরের সুখ্যাতি করেছেন শুনে বললেন—'হ্যাঁ, এটা আমি মানি। তবে এ সুখ্যাতির বেশীর ভাগটুকু আমারই পাওনা। কেন না, কটুকী জাঁতিতে সরু সরু করে সুপুরি কাটতে আমি শিখিয়েছিলুম বলেই তোমার হাত দিয়ে এমন সরু সরু লেখা বেরিয়েছে।'—সুখ্যাতির বহরটা শুনলে ত?

সদাহাস্যময়ী বালিকাটি এতক্ষণ জোর করিয়া তাহার মুখের হাসি চাপিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না; বালকের কথাগুলি ফুরাইতেই তাহার চোখ মুখ দিয়া যেন হাসির ধারা ফোয়ারার মত সবেগে

উছলিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের মুখখানি বিরক্তির ভারে বিকৃত হইয়া পড়িল। ব্যথাহতের মত বালক সঙ্গিনীর মুখের পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন—আমি ভেবেছিলুম, আমার মনের কষ্ট তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছ, তোমার প্রাণেও বেজেছে। কিন্তু এখন বুঝেছি—আমার ধারণা ভুল, তাই হেসে ফেটে পড়ছ।

তথাপি বালিকার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল না; হাস্যোজ্জ্বলমুখেই সে সকৌতুকে কহিল—ভুল তুমি গোড়া থেকেই ক'রে আসছ। কবিতায় তোমার কমলা, নীরোদ, বিজয়, এদের মনের কথা লিখেছ, আর সদা সর্ব্বদা যাকে চোখে দেখ—সেই বৌঠাকুরাণীর মনের কথা তুমি মোটেই ধরতে পারনি, তাই মনে মনে কষ্ট দেখে আমি নিজে বৌঠাকুরুণকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—দেওরটির উপর এ আপনার কোন্ দেশী টান বলুন ত? বেচারীর কোন লেখাটি আপনি একটি বারও ভাল বললেন না? তার মুখখানা দেখে আপনার কষ্ট হয় না?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বালক কহিলেন—আমার জন্যে এমন ক'রে তুমি তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলে?

মুখখানা শক্ত করিয়া বালিকা কহিল—কেন চাইব না? আমার মনে কষ্ট হয় নি বুঝি? কিন্তু বৌঠাকরুণ আমার কথা শুনে যা বললেন, তাতেই মুখখানা আমার নীচু হয়ে গেল; বুঝলুম—তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, আর সেটা কেন চেপে রেখেছেন তাঁর মনের ভিতরে।

বালক-কবি দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গিনীর মুখখানি যেন আনন্দে উদ্ভাসিত; বুঝিলেন, যাহাকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরে দুর্ব্বার অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাহা নিরর্থক; বালিকা তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে বালিকার দিকে তিনি শুধু গভীরভাবে চাহিয়া রহিলেন।

বালিকা কহিল—বৌঠাকুরাণী আমার কথার উত্তরে ছোট একটি গল্প বলেছেন, সেটি তোমারও শোনা উচিত, তা হ'লে তোমার কষ্ট মুছে যাবে, আর এমন ক'রে মন-মরা হয়ে থাকতে হবে না। গল্পটি বলছি শোন:

কাশীতে এক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর খুব নাম-ডাক। তাঁর ছেলে আবার তাঁর চেয়েও বড় পণ্ডিত হয়। কাশীর রাজা বেছে বেছে তাকেই সভাপণ্ডিত করেন। লোকের মুখে তার সুখ্যাতি আর ধরে না। কিন্তু এমনি সেই ছেলের অদৃষ্ট যে, বাড়ীতে বাপের কাছে একটি দিনও সে কোন ভাল ব্যবহার পেত না। সে যে কাশীর সেরা পণ্ডিত—রাজা পর্য্যন্ত তাকে মানেন, একথা তার বাবা কিছুতেই মানতে চাইতেন না। ছেলের কথা উঠলেই তিনি তাকে মূর্খ বলে উপেক্ষা করতেন। ছেলের কাজে একটু কিছু খুঁত পেলেই মুখ বেঁকিয়ে বলতেন—মূর্খের অশেষ দোষ, গলদ ত হবেই। ছেলের সামনে তিনি স্পষ্ট করেই জানাতে চাইতেন—তাঁর ছেলে একটি গণ্ডমূর্খ। ক্রমে হ'ল কি, ছেলের মন একেবারে বিষিয়ে উঠল। একদিন ছেলের বন্ধুদের সামনেই তিনি কথায় কথায় ছেলেকে মূর্খ বলে ধমক দিলেন; ছেলের বন্ধুরা মুখ টিপে হাসতে লাগল। পণ্ডিত-ছেলের ধৈর্য্যও সেদিন ভেঙে গেল। সে ঠিক করল—এরকম দুর্ম্মুখ বাপকে সে খুন করে গায়ের জ্বালা মেটাবে। গভীর রাতে একখানা অস্ত্র হাতে ক'রে সে বাপের ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে রইল চোরের মতন—বাপ ঘর থেকে বেরুলেই তাঁকে খুন করবে। একটু পরেই সে শুনতে পেলে—মা বলছেন তার বাবাকে—'বাইরে চেয়ে দেখ, চতুর্দশীর চাঁদের আলোতে চারদিক যেন হাসছে।' কথাটার উত্তরে তার বাপ বললেন—'কি দরকার বাইরে চাইবার, আমাদের বাড়ীতে যে চাঁদ আছে, দিনরাত সে আলো ছড়াচ্ছে।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন—'কার কথা বলছ? আমাদের বাড়ীতে আবার চাঁদ এল কোথা থেকে?'

বাপ উত্তর দিলেন—'কেন, আমাদের ছেলে; সারা দেশের ভিতরে এত বড় চাঁদ আর আছে?'

মা বললেন—'বল কি, কিন্তু ছেলের সুখ্যাতি ত তোমার মুখে কোন দিন শুনিনি, তুমি ত তার নামই রেখেছ মূর্খ। তবে?'

বাপ উত্তরে বললেন—'দেশশুদ্ধ সবাই জানে আমার ছেলে মস্ত বিদ্বান, তার অনেক গুণ, তাই তারা প্রাণ খুলে তার সুখ্যাতি করে; তাতেই আমার বুকখানা ভরে যায় আনন্দে। তুমি কি বলতে চাও—বাপ হয়ে আমি তার সুখ্যাতি করব বাইরের লোকের মতন? তা হ'লে বাইরের লোক মুখ টিপে হাসবে, আর আমার ছেলে তাতে লজ্জা পাবে। আমি যে তাকে সবার সামনে মূর্খ বলি—আর ছেলে মুখটি বুজে তাই

শোনে, এতে লোকের শ্রদ্ধাই বাড়ে তার ওপরে—খ্যাতির রাস্তাটি তার আরও বেড়ে যায় বুঝলে ?'

ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে ছেলে বাপের কথাগুলি সব কান পেতে শুনল—তার উপর বাপের সত্যিকার কি দরদ সেটি বুঝে সে তখন সুড় সুড় করে নিজের ঘরে ফিরে গেল ; তারপর হাতের অস্ত্রখানি ফেলে দিয়ে হাত দুখানি জোড় করে বাপের উদ্দেশে বলল —'সত্যই আমি মূর্খ আর অজ্ঞান, আজ পেয়েছি জ্ঞানের আলো, আমাকে ক্ষমা করুন বাবা।'

নি বিষ্ট মনে কবি-বালক গল্পটি শুনিতেছিলেন ; শেষ হইলে বালিকার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৌঠাকরুণ এই গল্পটি তোমাকে বলেছেন, সত্যি ?

মুখে এক ঝলক হাসি আনিয়া বালিকা কহিল, —বা-রে, আমি কি তোমার মতন কবি যে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বাঁধবো। তা ছাড়া, তুমি কি মনে কর—বৌঠাকরুণের নাম ক'রে আমি তোমাকে মিছে কথা বলব ? বেশ ত, জিজ্ঞাসা ক'রে এস না তাঁকে।

মনের সমস্ত বিক্ষোভ ও অভিমান নিমেষের মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়া কবি কহিলেন—না, আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না, আমি বুঝিছি। তাঁর গল্পের ঐ বিদ্বান-মূর্খ ছেলেটির মতন আমিও জোড়হাত ক'রে বলছি—'বৌঠাকরুণ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে বুঝতে পারিনি।'

বালিকার মুখখানিও সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভরিয়া গেল ; বিজ্ঞের মত মুখখানির এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া সে কহিল—দেখলে ত বৌঠাকরুণের কেমন বুদ্ধি! তুমি যে তাঁর কথায় মানে বসেছ, সেটা বুঝতে পেরে একটা গল্প শুনিয়ে তোমার মানটি কেমন এক লহমায় ভেঙ্গে দিলেন! সত্যি বলছি, বৌঠান মুখে নিন্দা করলেও তোমার লেখা তিনি যত্ন করে পড়েন, তোমার লেখা পড়তে ভাল বাসেন।

সহাস্যে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি করে জানলে ?

বালিকা উত্তর দিল—তাঁর গল্প থেকেই ত জানা গেছে। তা ছাড়া, দাদাবাবুর নাটকে তুমি নাকি একখানি গান বেঁধে দিয়েছ ; বৌঠান দাদাবাবুর কাছে তার যে কত সুখ্যাতি করলেন যদি শুনতে!

কবির মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন—ভারি আশ্চর্য্য ত! তা হ'লে আসল ব্যাপারটা বলি শোন—সেদিন সন্ধ্যের পর রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিত মহাশয় আমাকে 'শকুন্তলা' পড়াচ্ছিলেন, আমার মন কিন্তু তখন পাশের ঘরে গিয়েছে, কেন না জ্যোতিদাদা তাঁর নতুন লেখা 'সরোজিনী' নাটকখানা পড়ে তাঁর বন্ধুদের শোনাচ্ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের শকুন্তলার চেয়ে সরোজিনীই আমার মনকে আবিষ্ট করেছিল। একটা জায়গায় হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা খটকা লাগল, সামনে যে পণ্ডিত মশাই বসে আছেন আর শকুন্তলার শ্লোক পড়ছেন—সেকথা ভুলে গিয়ে সটান চলে গেলাম দাদার ঘরে। জানি ত জ্যোতিদাদার কাছে কোন সঙ্কোচই আমার নেই, স্পষ্ট ক'রে বললুম—'দাদা, ও জায়গাটায় গান একখানা না দিলে কিছুতেই জোর হবে না।' কথাটা জ্যোতি-দাদার মনে লাগল, বললেন—'সত্যি, গান এখানে একটা বসালে ভালই হয় বটে, কিন্তু আর ত সময় নেই ?' আমার মনটা অমনি দুলে উঠল, যখনই গানের কথা মনে জাগে—সঙ্গে সঙ্গে একটা গানও মনের ভেতর রচে উঠেছিল, জোর গলায় দাদাকে বললুম—'গান আমি বেঁধে দিচ্ছি দাদা।' বলেই দাদার সামনে বসে তখনই সেই গানখানা বেঁধে দিলুম। দাদার নাটকে চিতায় ঝাঁপ দেবার আগে রাজপুতমেয়েদের গদ্যে যে লম্বা উচ্ছ্বাস একটা ছিল, সেখানে আমার বাঁধা গানখানা তাদের মুখ দিয়ে বেরুল—'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ।' দাদার তখন কি আহ্লাদ, আমার পীঠ চাপড়ে বললেন—খাসা হয়েছে। অমনি হারমনিয়ম নিয়ে গানের সুর করতে বসে গেলেন, আমাকে সেই সুরে গাইতে হ'ল। দাদার বন্ধুরা পর্য্যন্ত বাহবা দিলেন। কিন্তু বৌঠান গানের কথা শুনে বললেন —আরে ছি! এ কি গান হয়েছে! নাটকখানা একেবারে মাটি হয়ে গেছে।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া বালিকা কহিল—আমি কিন্তু নিজের কানে শুনিছি, বৌঠান দাদাকে বলেছেন—'রবির গানখানার জন্যে তোমার নাটকখানার শ্রী ফুটে উঠেছে।'

কবি হাত দুখানি জোড় করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন—সত্যিই আমি তাঁকে বুঝতে পারিনি, আমরা লোকের বাইরেটা দেখি, ভিতরটার দিকে চাইতে ভুলে যাই। তুমি আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়েছ, নতুন শিক্ষা একটা পেয়েছি ; এখান থেকেই তাই বৌঠানকে নমস্কার করছি।

১২

বৌঠাকুরাণীর ব্যবহারে কবির মনে যে অভিমান সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; উপরন্তু তাঁহারই ব্যবস্থায় তখনকার জনপ্রিয় নামী কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটায় বৌঠাকুরাণীর প্রতি কবির শ্রদ্ধাও নিবিড়তম হইয়া উঠিয়াছে। তিনি নিজে যেমন ভাল রাঁধিতে পারিতেন, নিজের হাতের তৈয়ারী আহার্য্য প্রীতিভাজনদিগকে খাওয়াইতেও তেমনি ভালবাসিতেন। সুতরাং বালক-কবির অদৃষ্টে বৌঠাকুরাণীর আপন হাতের প্রস্তুত প্রসাদের আস্বাদ লইবার সুযোগ প্রায় প্রত্যহই ঘটিত। যে বিখ্যাত কবিকে বৌঠাকুরাণী বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং যাঁহার প্রসঙ্গ তুলিয়া প্রায়ই স্নেহভাজন দেবর-কবিকে খোঁটা দিয়া বলিতেন—'কস্মিন কালেও তুমি বিহারীবাবুর মত কবিতা লিখতে পারবে না'—তিনিই একদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান কবির সহিত স্নেহভাজন বালক কবিকে পরিচিত করিয়া দিলেন। প্রবীণ কবির সহিত এই প্রথম পরিচয়-প্রসঙ্গে বালক-কবির রচিত একখানি কাব্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল।

কবি বিহারীলাল সেদিন ঠাকুরবাড়ীতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। প্রীতিভোজনে কবির বিশেষ নিষ্ঠা, ভোজন-বিলাসী বলিয়া তাঁহার খ্যাতিও প্রচুর; কাজেই বৌঠাকুরাণী সযত্নে বিবিধ আহার্য্য স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় অভ্যাগত কবির পার্শ্বেই ঠাকুরবাড়ীর উদীয়মান কবিটির বসিবার আসন পড়িয়াছে। পাশাপাশি উভয়কে বসাইয়া বৌঠাকুরাণী সহসা মুখটিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—কবি-ভোজনের আগেই কিন্তু কিঞ্চিৎ কাব্যালোচনা করতে চাই।

কবি বিহারীলাল হাসিমুখে উত্তর দিলেন—এ ত জানা কথা; সরস্বতীর প্রসাদ পেতে হলে কাব্য-পরিচর্য্যা অপরিহার্য্য; অন্যথায় ভোজ্য লাভ নৈব চ, নৈব চ।

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—পূজার মন্ত্র কিন্তু আজ আলাদা, একেবারে নতুন। তা ছাড়া—আপনি শ্রোতা হয়ে শুনবেন, মন্ত্র পড়ব আমি।

একটু গম্ভীর হইয়া বিহারীলাল কহিলেন—ব্যাপার কি? দেবী কি নিজেই তা হ'লে মন্ত্র রচেছেন?

বৌঠাকুরাণী হাসিমুখে উত্তর দিলেন—মন্ত্র দেবীর নয়, আর এক কবির। সেইজন্যেই ত বলছিলুম মন্ত্র আজ আলাদা আর আপনি শুধু শ্রোতা। যদি খুশী মনে অনুমতি করেন, তবে পাঠের ব্যবস্থা করি।

প্রসন্নমুখে কবি কহিলেন—দেবীর যখন এত আগ্রহ, মন্ত্র তা হ'লে নিশ্চয়ই তেজোময়, প্রচুর আনন্দ পাওয়া যাবে, আর প্রসাদটিও আজ পরিতোষজনক হবে। তা হ'লে পূজা সুরু হোক।

আমাদের বালক-কবি এতক্ষণ সকৌতুকে শ্রদ্ধেয়া বৌঠাকুরাণী এবং শ্রদ্ধাভাজন বর্ষীয়ান কবি-চূড়ামণির কথোপকথন শুনিতেছিলেন। কথা-প্রসঙ্গে নূতন আর এক কবির কথা উঠিতে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যেন দুলিয়া উঠিল; কিন্তু ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না—নূতন কবিটি কে?

পরক্ষণে বৌঠাকুরাণী দেরাজ হইতে যে সুশ্রী খাতাখানি বাহির করিয়া ধীরে ধীরে নিজের আসনে ফিরিয়া আসিলেন, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বালক-কবির উভয় চক্ষুর কালো কালো স্বচ্ছ তারা দুটি কপালের দিকে বুঝি ঠেলিয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, ঐ খাতাখানি যে বালকের নিজস্ব; আর ইহার পরিচিত পাতাগুলি তিনিই যে অতি সন্তর্পণে সমান আয়তনের সরু সরু অক্ষরে আগাগোড়া ভরাইয়া রাখিয়াছেন স্বরচিত 'কবি-কাহিনী' নামক নূতনতম কাব্যের কথাগুলি গাঁথিয়া! খাতাখানি রহস্যময়ী সঙ্গিনীর হাতেই কবি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু তাহা বৌঠাকুরাণীর দেরাজের ভিতর হইতে এ সময় কেমন করিয়া বাহির হইয়া আসিল?

চিন্তায় আঘাত দিল বৌঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর—এমনি আমার ভুলো মন, এই ছেলেটির সঙ্গে এখনো আপনার পরিচয় করে দিইনি—অথচ ডেকে এনে একে আপনার পাশেই বসিয়েছি। বোধ হয় চেনেন না শ্রীমানটিকে?

বিহারীলালের মুখখানি প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল; পার্শ্বে উপবিষ্ট গম্ভীরপ্রকৃতি নির্ব্বাক ছেলেটির পানে অপাঙ্গে চাহিয়া কহিলেন—কবিদের যাচাই করবার শক্তি কষ্টিপাথরের চেয়ে বেশী বই কম নয়। এক নজরে চেয়েই আমরা মানুষ চিনতে পারি, কস্‌বার দরকার হয় না।

বৌঠাকুরাণী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—তা হলে' শুধু চেয়ে দেখেই এ ছেলেটিকে চিনে ফেলেছেন

আপনি ? ভারি আশ্চর্য্য ত! কিন্তু চিনলেন কিসে, আর কি চিনেছেন—দয়া করে বলুন না ?

পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বিহারীবাবু কহিলেন—কেন, এতে আশ্চর্য্য হবার মত ত কিছু নেই। এর ছিপ্‌ছিপে লম্বা চেহারা আর গায়ের রঙটায় জেল্লা জানিয়ে দিচ্ছে—এ ছেলে ঠাকুরবাড়ীর সোনারচাঁদ না হয়ে যায় না। এই বয়সেই প্রতিভায় ওর মুখখানা যেন জল্‌জল্ করেছে। জ্যোতিবাবুর অনুজ নিশ্চয়ই, আর আপনার 'দেবর লক্ষণ'—নয় কি ?

স্মিতমুখে বৌঠাকুরাণী কহিলেন—'দেবর লক্ষণ' তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিভার কথা যা বললেন, আমি ত তার কিছুই খুঁজে পাইনে ওর মুখের পানে চেয়ে। গুণের মধ্যে দেখতে পাই, মেয়েলী সুরে বেশ মিষ্টি ক'রে কবিতা পড়তে পারে। সেই-জন্যেই ত আদর ক'রে ডেকে এনে আপনার ঠিক পাশেই বসিয়ে রেখেছি কবিতা পড়বার জন্যে।

বিহারীবাবু সহাস্যে কহিলেন—বেশ ত, কাজ শুরু হোক; বেশী গৌরচন্দ্রিকার কি দরকার।

বৌঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ খাতাখানি বিস্ময়বিহ্বল দেবরের হাতখানির উপর রাখিয়া এবং তীক্ষ্ণ হাসির ঝলকে তাহাকে বিব্রত করিয়া কহিলেন—আর দেরী নয়, চটপট পড়ে ফেল; পড়তে ভাল পার বলেই কাব্যখানি পড়বার ভারটি দেওয়া হয়েছে তোমাকে। ফেল করলেই মুস্কিল, আর পাস্ করলেই রীতিমত ফলার।

বালক-কবি প্রথমে একটু জড়সড় হইয়া পড়িলেন, পরক্ষণে অল্প একটু হাসিয়া বৌঠাকুরাণীর মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন—ও, আমি বুঝেছি।

বালকের মৃদু কথা কয়টি চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বৌঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—কবিতাটির নাম হচ্ছে 'কবি-কাহিনী'; ছেলেবেলা থেকে শুরু করে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত একটি মানুষের জীবন-কথাই এর বিষয়-বস্তু; আর ঐ মানুষটি কোন রাজা-উজীর বা রাজপুত্র নন, যোদ্ধা যাদুকর বা অদ্ভুত রকমের কোন বাহাদুর পুরুষও নন; তিনি হচ্ছেন অতি নিরীহপ্রকৃতির এক কবি-মানুষ। এঁরই মনের ছবি কবি এঁকেছেন এই কাব্যে।

বিহারীবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—বটে, তা হ'লে শোনবার আগেই না-বলে পারছিনে, মানুষের মন নিয়ে যিনি কারবার করতে সাহস পেয়েছেন, তিনি বাহাদুর। আচ্ছা, পড় ত খোকা—

দেশের শ্রেষ্ঠ কবির কথাগুলি বুঝি বালক-কবির মনের সমস্ত সঙ্কোচ কাটাইয়া দিল, তাঁহার অন্তরে যে উৎসাহের আলোক জ্বলিয়া উঠিল, কণ্ঠেও তাহার আভা পড়িল। বালক-কবি আবেগের সুরে তাঁহার সযত্ন-রচিত এবং স্বহস্তে লিখিত ১১৮৫ লাইনের ক্ষুদ্র কাব্যখানি কবিচূড়ামণি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে পড়িয়া শেষ করিলেন।

পড়ার পরেও ঘরখানির ভিতরে কাব্যের শেষ মর্ম্মবাণীর রেশ যেন সুগন্ধস্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহে সঞ্চারিত হইতেছিল :

"প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে।
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু এক দিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।"

বৌঠাকুরাণী হাসিয়া কহিলেন—কাব্য ত শুনলেন, এখন বিচার করুন। আপনার অভিমতটি আবার কবিকে জানাতে হবে। তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

বিহারীবাবু উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কহিলেন—কবি যদি এখানে উপস্থিত থাকতেন, আমি তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে তাঁকে অভিনন্দিত ক'রে জিজ্ঞাসা করতুম, দৃষ্টিভঙ্গির এমন কঠোর সাধনা তিনি কতকাল ধরে চালিয়েছেন ?

মুখের হাসি সযত্নে চাপিয়া বৌঠাকুরাণী প্রশ্ন করিলেন—আপনার বিচারে তা হ'লে এই কবিটির দৃষ্টিভঙ্গি আশ্চর্য্য রকমের, আর অনেক কিছু দেখে-শুনেই তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন ?

কণ্ঠে জোর দিয়া বিহারীবাবু উত্তর করিলেন—নিশ্চয়ই। এই কবির দৃষ্টি শুধু পরিচিত ক্ষুদ্র গণ্ডীটির ভিতরেই আবদ্ধ নয়, তিনি সমস্ত জগতের দিকে চেয়ে বিশ্বমানবের সত্যকার রূপটি দেখবার চেষ্টা করেছেন; মাত্র একটি বালিকার প্রেম নয়, বিশ্ব-প্রেমের একটা অস্পষ্ট আলোর আভাও তাঁর কাব্যের উপর পড়েছে।

বিস্ময়ের সুরে বৌঠাকুরাণী বলিলেন—তাই নাকি, কিন্তু কবিতাটি পড়ে আমি ত মোটামুটি এইটুকুই বুঝিছি, কবির ছেলেবেলার ছেলেখেলা, আর তার প্রেমিকা বালিকাটির কথাতেই কাব্যের বেশী ভাগ ভ'রে আছে। বাকিটুকু হচ্ছে—প্রিয়ার

মৃত্যুতে কবির শোকোচ্ছ্বাস, ক্রমে শান্তি লাভ, পরে বৃদ্ধ বয়সের কতকগুলো এলো-মেলো চিন্তার উচ্ছ্বাস। এইখানেই কাব্যখানি শেষ হয়েছে।

বিহারীবাবু চুপ করিয়া বৌঠাকুরাণীর সমালোচনা শুনিতেছিলেন; আর কাব্যখানির প্রকৃত কবির কোমল অন্তরটি তখন আবেগ ও উত্তেজনায় বুঝি তোলপাড় করিতেছিল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড একটা আগ্রহ তাহার চোখের তারা দুটিকে মজলিসের সর্বাধিক সম্মানভাজন মানুষটির মুখে নিবদ্ধ করিয়া তাঁহার মন্তব্যটুকু শুনিবার প্রতীক্ষায় ছিল।

বিহারীবাবু হাসিমুখে ঘাড়টি একটু নাড়িয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—কিন্তু কবি বেচারীর প্রতি যে অবিচার করা হ'ল বৌ-মা, লেখার কথা আমি ধরচিনে, হয় ত খুঁত থাকতে পারে—সংস্কারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমার চোখের উপরে কাব্যের কবিটির মূর্তিখানি যেন আগাগোড়া স্পষ্ট ফুটে উঠেছে, আর তার মুখ থেকে এমন একটা সুরের ঝঙ্কার উঠে কানে বাজছে, যাতে বেশ নতুনত্ব আছে, মোটেই একঘেয়ে নয়।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বৌঠাকুরাণী কহিলেন—আপনি নিজেই কবি মানুষ কি-না তাই কাব্যের কবিটির চেহারাখানিও আপনার চোখে ধরা পড়েছে, সেই সঙ্গে কাব্যের সুরটুকুও কানে ঝঙ্কার দিচ্ছে। আমরা কিন্তু কিছুই ধরতে পারিনি। যাই হোক, সমালোচনাটি আপনিই করুন, শুনে জ্ঞান সঞ্চয় করি।

একটু গম্ভীর হইয়া বিহারীবাবু কহিলেন—সমালোচনা আমি করব না, আর ও-কাজে আমার আস্থাও তেমন নেই। আমি শুধু কাব্যের কবি-নায়ককে আপনাদের চোখে সামনে তুলে ধরেছি কাব্যের লেখক-কবির রচনা থেকেই—বলিয়াই তিনি পার্শ্বোপবিষ্ট রবির দিকে হাতখানি বাড়াইয়া কহিলেন—খাতাখানি দাও ত বাবা—

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বালক-কবি শ্রদ্ধাভাজন কবির করকমলে 'কবি-কাহিনী'র পাণ্ডুলিপিখানি সসম্ভ্রমে সমর্পণ করিলেন।

বিহারীবাবু প্রথম পৃষ্ঠাটি খুলিয়াই বলিলেন—এই কাব্যের কবি তাঁর নায়ককে শৈশব থেকেই কবিসুলভ মনোবৃত্তি দিয়েই গড়ে তুলেছেন। সে নিজের মনেই প্রকৃতির কোলে খেলা করে বেড়ায়:

> জননীর কোল হ'তে পালাত ছুটিয়া,
> প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা।
> ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
> বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
> ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।

এর পরেই দেখি, শিশু, শৈশবের গণ্ডী পার হয়েছে, গতিও তার বেড়েছে, কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন হয় নি; গৃহের ক্ষুদ্র আবেষ্টন এখন আর তাকে ধরে রাখতে পারে না, বৃহত্তর প্রকৃতির দিগন্তবিসারী কোলে অবাধে খেলা করে বেড়াচ্ছে:

> যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,
> তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
> দেখিত ধান্যের শীষ দুলিছে পবনে।
> দেখিত একাকী বসি' গাছের তলায়,
> স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে,
> উঠিছেন ঊষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।

যৌবনে পড়েও নায়ক-কবি প্রকৃতির সঙ্গে যোগসূত্রটি একইভাবে বজায় রেখেছেন দেখতে পাই:

> প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মতো।
> নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
> কহিত প্রকৃতিদেবী তার কানে কানে,
> প্রভাতের সমীরণ যথা চুপি চুপি
> কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।

কিন্তু প্রকৃতিকে সঙ্গিনীর মত পেয়েও কবির আশা মেটেনি। তিনি আরও নিবিড়ভাবে তার সঙ্গে পরিচিত হতে চান, এই বিরাট রহস্যময়ীর জ্ঞাত অজ্ঞাত দুটো দিকের সকল অংশগুলি নিখুঁতভাবে দেখে ঠিক মত তাকে জানবার—উপলব্ধি করবার একটা আকাঙ্ক্ষা তাঁকে আকুল করে তোলে। তাই রাত্রির আঁধারে সমস্ত জগত যখন ঘুমিয়ে পড়ে, নির্ভীক কবি তখন একা পর্বত-শিখরে উঠে সবার অলক্ষ্যে তার সাধনা শুরু করেন, ঘুমন্ত প্রকৃতিকে লক্ষ্য করে বলেন:

> শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
> কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
> ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্ব-চরাচরে।
> কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
> অনন্ত আকাশে থাকি' হে আদি জননী,
> শাবকের মতো এই অসংখ্য জগৎ
> তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের প্রত্যেকটি কবির স্বচক্ষে দেখা; প্রত্যেক রূপটি অন্তরে দোলা দিয়েছে, তাকে মুগ্ধ করেছে। প্রলয় রূপ দেখে কবি বলছেন :

যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বত-চূড়া করেছে কম্পিত,
সুগভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মতো
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব।
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হ'তে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা-দেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।

রাত্রির রূপে মুগ্ধ কবি বলছেন আবেগের সুরে :

অমা-নিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি দেখিয়াছি চৌদিক চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার-গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।

উষার রূপে তন্ময় হয়ে কবি স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রকৃতির উদ্দেশে বলছেন :

কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষার—
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মতো
আধ-ঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি।

কিন্তু প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের বিপুল সৌন্দর্য্যও ক্রমে একঘেয়ে হয়ে দাঁড়াল, কবির মনে এল অরুচি। শুধু প্রকৃতির সুষমা এখন আর কবিকে তৃপ্তি দেয় না, কবি উপলব্ধি করেন একটা অভাব, যেন তাঁর বুকের ভিতরটি খালি; মন আবার দুলে উঠল সেই শূন্য অংশটি পূর্ণ করবার চিন্তায় :

এখনো বুকের মাঝে রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পুরিবে না আর ?
মনের মন্দির-মাঝে প্রতিমা নাহিক যেন,
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া।

ভেবে ভেবে কবি অনুভব করলেন—প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ মানুষের মন মুগ্ধ করতে পারে, আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু মানুষের বিশাল অন্তরটি তাতে ভরে না, এখানে প্রয়োজন—মানুষের মন। তাই কবি উপলব্ধি করলেন এতদিনে :

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।

এই মনটির সন্ধানে কবি এবার বন-ভ্রমণে বেরুলেন। তাঁর বিশ্বাস, বনের মধ্যেই মানুষের মনটির সন্ধান পাবেন। একদা সারাদিন ভ্রমণের পর কবি শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের তলায় অবসন্ন হয়ে শুয়ে পড়েছেন :

হেন কালে ধীরি ধীরি শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল এক জন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে কহিল করুণ স্বরে—
কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক ?
অধরে বিষাদ যেন পেতেছে আসন তার,
নয়নে বহিছে যেন শোকের কাহিনী!
তরুণ হৃদয় কেন অমন বিষাদময়
কি দুঃখে উদাস হয়ে করিছ ভ্রমণ ?

নির্জ্জন বনের মধ্যে এভাবে সহসা মানুষের মুখে মনের কথা শুনে কবি আনন্দে অভিভূত হলেন, মনে হ'ল—এতদিনে বনদেবী বুঝি বালিকার মূর্ত্তি ধরে মানুষের মনের সন্ধান দিতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর হৃদয়ের দুয়ারটি তখনি তার কাছে খুলে দিলেন। বালিকাও খুশী হয়ে অন্তর দিয়ে কবিকে আহ্বান করল—ঐ যে বিজন বন দেখছ, ওখানে আমার পর্ণকুটীর, আমার সাথে তুমি চল। আরও বলল :

আমার বীণাটি ল'য়ে গান শুনাইব কত,
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া।

বালিকার অনুরোধ কবি উপেক্ষা করতে পারলেন না, তার পর্ণকুটীরে গিয়ে উঠলেন। বালিকার ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করল; তিনি দেখলেন, বালিকাও তাঁর মত প্রকৃতির ভক্ত; তার সঙ্গে মিলে মিশে বনের পশু-পক্ষীর সাথেও দিব্যি ভাব করে ফেলেছে সে। কবি ক্রমে বালিকার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হয়ে উঠল। উভয়েই উভয়কে ভালবেসেছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তাদের মিলন হয়ে গেল। বনবালা তার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা উজোড় করে কবির উপরে ঢেলে দিল, কিন্তু কবির মন তাতে ভরল না; উন্মত্তের মতন কবি প্রিয়াকে বলেন :

—আরো দাও ভালবাসা,
আরো ঢালো ভালবাসা হৃদয়ে আমা"।
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা,
নহিলে গো পুরিবে না প্রাণের শূন্যতা।

প্রিয়তমের আকুলতা প্রিয়তমাকে অবাক করে দেয়, সে ভেবে পায় না—একথার কি অর্থ।

সে ত সর্ব্বান্তঃকরণে কবিকে ভালবেসেছে, সর্ব্বস্বই ত সে কবির পায়ে উৎসর্গ করেছে, তবে? বালিকার মনের কথা বুঝি কবির মনের তারে ঝঙ্কার দিয়েছিল; তাই একদিন অর্থটা তিনিই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেন—কবিদের মন কি অল্পে তুষ্ট হয় দেবী? হৃদয় তাদের এতবড় যে অল্পে ভরতে চায় না। আরো বললেন:

স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী,
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম আছে যাহাদের মন,
তাহাদের তরে দেবী, নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন আকাশে উড়িতে যায়,
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিয়ে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙেচুরে যায় মন,
জগৎ পুরায় তারা আকুল বিলাপে।

বালিকার বুকটি বুঝি কেঁপে উঠল একটা অজানা আতঙ্কে, সুন্দর মুখখানি তুলে গাঢ়স্বরে উত্তর করল:

যা ছিল আমার কবি, দিয়াছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমার প্রেমে দিছি বিসর্জ্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে ইচ্ছা মিশায়েছি মোর,
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।

কিন্তু কবির আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। যা কোথাও পাওয়া যায় না, কবি তাকেই আয়ত্ত করতে চান। একদিন তিনি প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মেশাতে চেয়েছিলেন একাত্ম হয়ে; এখন তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—প্রিয়ার হৃদয়ের সাথে এমন করে নিজের হৃদয়টি মেশাবেন, দেহের আড়াল যাতে ঘুচে যায়। নিজের মনেই প্রশ্ন ওঠে:

ওই হৃদয়ের সাথে মিশাতে চাই এ হৃদি,
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?

ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে কবির আশা মেটে না, কিসে এ ভালবাসা সার্থক করতে পারেন—তাও ভেবে পান না। নিজের মনেই আক্ষেপ করেন:

আঁধার সমুদ্রতলে কি যেন বেড়াই খুঁজে,
কি যেন পাইতেছি না, চাহিতেছি যাহা।

অজানা অপরিচিত পদার্থটি না পেয়ে, আর সেটির মধ্যেই জীবনের পরিতৃপ্তি ভেবেই কবি একদিন তারই সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। দেশের পর দেশ ঘুরলেন, কিন্তু কোথাও পেলেন না সেই অজানা পদার্থটির সন্ধান। দুর্গম যাত্রাপথে তাঁর কানে বাজে কুটীরবাসিনী বনবালার মর্ম্মবাণী:

কেন ভালবাসিলে আমায়?
কিছুই নাহিক গুণ, কিছু জানি না আমি,
কি আছে? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয়?

কবির অন্তর বুঝি আকুল হয়ে উঠল এই মর্ম্মবাণীর আকর্ষণে। অবশেষে নিস্ফল পর্য্যটনের পর ক্লান্ত কবি এক দিন ফিরে এলেন সেই পূর্ব্বপরিচিত গহন বনে—বনবালার পর্ণ-কুটীরে। দেখলেন, আগেকার মতই আর সব ঠিক আছে, বাহ্য প্রকৃতির কোন পরিবর্ত্তনই হয়নি; পাখী তেমনি গান গাইছে, বায়ু তেমনি ঝর ঝর করেই বইছে; কিন্তু তাঁর প্রিয় জীবন-পুষ্পটিই শুধু শুখিয়ে পড়েছে। তার সঙ্গে আর কবির মিলন হ'ল না। কবি দেখলেন:

শীতল তুষার 'পরে
বালিকা ঘুমায়ে আছে ম্লান মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধ-নিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে কবি অনুভব করলেন এতদিন পরে—মানুষ নিকটের পদার্থকে অবহেলা করে অজানার সন্ধানে যখন দূরে চলে যায়, তার ফল কিন্তু বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। সে তখন নিকটের জানা ব্যক্তিটিকে হারায়, দূরের অজানাটিকেও খুঁজে পায় না। প্রিয়ার মৃত্যুর পর কবি শোকে অভিভূত হলেন। সেই শোকার্ত্ত অবস্থাতেই তাঁর মনে একটা শক্ত প্রশ্ন জেগে উঠল—মৃত্যুর পরে আর কি কিছু থাকে না? মানুষ কি তবে:

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিশায়ে তাহাতে।
এই ভালবাসা যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সাথে
মুহূর্ত্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?

জগতের পানে, প্রকৃতির পানে তাকাতেই তাদের গতি যেন কবির চোখের সামনে ভেসে উঠে; তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—কালের স্রোত একই ভাবে বয়ে চলেছে অনন্ত কালের বুকে। প্রকৃতি সেইভাবেই বিভিন্ন রূপের বিকাশ ক'রে

মানুষের মনে দোলা দিচ্ছে। সবাই কাজে ব্যস্ত, নীরবে কেউ বসে নেই :

সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীর মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া।

কালের কাণ্ড দেখে কবিও শোকতাপ ভুলে গেলেন, কালের তরঙ্গে তিনিও ভেসে চললেন চিন্তাকে সাথী ক'রে।

কবির জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে আমরা দেখছি—সারা যৌবন ও প্রৌঢ়কাল চিন্তার সাধনা করে তিনি এখন বৃদ্ধ, মাথার চুলগুলি শনের মত সাদা হয়ে গেছে—জট ধরেছে; মুখশ্রী শান্ত, গম্ভীর। হিমালয়ের গগনভেদী তুষারশুভ্র শিরোদেশের শোভা দেখতে দেখতে কবির মনে জেগে উঠল বিশ্বমানবের দুর্গতি, মানব-সভ্যতার নামে চরম অনাচার, স্বাধীনতাহীন মানবের হীনতার নিকট আত্মবিক্রয়। কবি যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখছেন :

দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার ক'রে
মাথায় বহন করে পরপ্রত্যাশীরা।
যে-পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন,
যে হাত মাতারে তার পরায় শৃঙ্খল
সেই হাত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন—সে স্বাধীনেরে পুজিবারে শুধু!
সবল—সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্ব্বল—বলের পদে আত্ম-বিসর্জ্জিতে।

মানব-সভ্যতার নামে চরম বর্ব্বরতা কবির প্রাণে নিদারুণ ব্যথা দিয়েছে; তাই কবির কণ্ঠ থেকে আবেগ-কম্পিত স্বরের ঝঙ্কার উঠছে:

সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া।
তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার।

জ্বালার পর শান্তি; কবির অন্তরও ক্রমে শান্ত হ'য়ে এল। মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবার প্রাক্কালে দূর ভবিষ্যতের পানে চেয়ে কল্পনার দৃষ্টিতে যে মনোরম ছবিখানি কবি দেখতে পেলেন, তাতেই তাঁর অন্তর ভ'রে গেল, সারাজীবনের চিন্তার সাধনা সার্থক হ'ল, সত্য বুঝি বিশ্বপ্রেমের আলেখ্যখানি তুলে ধরল তাঁর সম্মুখে, কবি দেখলেন :

এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিয়াছে কোটি কোটি মানব-হৃদয়।
নাহিক দরিদ্র ধনী অধিপতি প্রজা;
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস।

বিশ্বমানবের এই মহামিলনী দেখতে দেখতে কবির চোখের তারা দুটি দীপ্ত হয়ে চিরদিনের মতন নিবে গেল।

হাতের খাতাখানি নিকটের আধারটির উপর রাখিয়া শ্রান্তকণ্ঠে কবি বিহারীলাল কহিলেন—আলোচনাটা বোধ হয় একটু বেশী লম্বা হয়ে গেল—নয়?

বৌঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন—তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি, আমাদের আনন্দটুকু ঐ অনুপাতে লম্বা হ'য়ে গেছে। একে নতুন কাব্য, তায় আপনার মতন বিখ্যাত কবির মুখে তার আলোচনা—

বিহারীবাবু কহিলেন—কিন্তু আমার আলোচনা হচ্ছে এখানে গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কাব্য; কাজেই প্রশংসার বেশীটুকু পাওয়া উচিত কাব্য কর্ত্তা কবির—যিনি লিখেছেন।

একটু গম্ভীর হইয়া বৌঠাকুরাণী এই সময় জিজ্ঞাসা করিলেন কবিকে—কাব্যখানি সত্যিই তাহলে আপনার ভাল লেগেছে?

বিহারীবাবু সহজকণ্ঠে উত্তর দিলেন—ভাল না লাগলে এতখানি সময় আমি কি শুধু শুধু ক্ষুধা বাড়াবার জন্যে অপচয় করেছি, বউমা? সত্যই, কবির পরিকল্পনাটি আমার সমস্ত মনটা নেড়ে দিয়েছে। সাধারণ দুটি প্রাণীর ছবি আঁকতে আঁকতে কবি বিশ্ব-মানবের মিলনের যে ছবিখানি এঁকে ফেলেছেন, সেটি সত্যই অদ্ভুত, আমি মুগ্ধ হয়েছি।

বৌঠাকুরাণী হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন—কিন্তু এই কাব্যের কবিটিকে যদি আপনি দেখেন, এমনি অপ্রস্তুত হবেন যে, আমোদের সঙ্গে হয়ত এর পর কথাই বলবেন না আর।

সকৌতুকে বিহারীবাবু কহিলেন—তাই নাকি! কিন্তু তা হ'লে ত অন্ধকারের মধ্যে আনাড়ী মানুষটিকে ফেলে রাখাও আর উচিত হচ্ছে না, বউমা! অপ্রকাশকে এখনি প্রকাশ ক'রে সংশয়টি ভঞ্জন করা হোক।

মুখের হাসি আরও তীক্ষ্ণ করিয়া বৌঠাকুরাণী কহিলেন—আমি কিন্তু জানতুম, কবি মানুষেরা দিব্যদৃষ্টিতে অনেক কিছুই দেখতে পান—

বিহারীবাবু সহাস্যে কথাটার উত্তরে কহিলেন—আর প্রদীপের নীচেই অন্ধকার—একথাটাও যে কবিরাই তৈরী করেছেন, সেটা ভুলে যাবেন না, বৌমা।

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—এখানে কিন্তু বিকল্পে ব্যতিক্রম হয়েছে;—নীচে নয়, আপনার ঠিক পাশেই যে!

আমাদের বালক-কবি এ সময় সুবৃহৎ সোফাটির ভিতরে জড়সড় ভাবে বসিয়া ঘামিতেছিলেন। কাব্য-আলোচনার সময় তাঁহার অন্তরটিও বুঝি পাখা মেলিয়া বিজন বনে—হিমাদ্রির শিখরে চিন্তাকুল কবির সাথে সাথে ছুটিতেছিল, এখন আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে, এমন সময় বৌঠাকুরাণীর ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলি তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল, সুন্দর মুখখানি লজ্জায় সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু সমালোচক কবির মুখের প্রশস্তি তাঁহার মনের সমস্ত সঙ্কোচ নিশ্চিহ্ন করিয়া দিল। পার্শ্বের আসনখানির দিকে ঝুঁকিয়া সঙ্কুচিত কবি-বালককে সবলে তাঁহার বিপুল দেহের দিকে টানিয়া বর্ষীয়ান কবি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—আরে ছোকরা, ডিঙি বেয়ে কিস্তি যেয়ে ব'সে আছ এই বয়সে। সরাসরি একবারে সমুদ্দুরের বুকে পাড়ি? এখন তোরে নিয়ে কি করি বল্—কোলে করে নাচবো, না দেশশুদ্ধ সবাইকে ডেকে তোর কাব্য শোনাব?

কবির আনন্দোচ্ছ্বাস দেখিয়া বৌঠাকুরাণী মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন, এইবার সুযোগ বুঝিয়া ঈষৎ পরিহাসের ভঙ্গিতে কহিলেন—সর্ব্বনাশ! কর্‌চেন কি আপনি? এর পর আপনার ছোকরা-কবির পা দুটি কি আর মাটিতে পড়বে ভেবেছেন? এই ভয়ে আমি যে ওকে বরাবর খাটো করেই রেখেছিলুম।

বিহারীবাবু সহাস্যে কহিলেন—কিন্তু কবির কাব্য-ভাণ্ডারের চাবিটি আপনিই ত নিজের হাতে খুলে দিয়েছেন মা-লক্ষ্মী?

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—তখন কি ভেবেছিলুম যে খেলা-ঘরের ভাঁড়ার দেখে আপনিও মশগুল হবেন—অত সুখ্যাতি তার করবেন? ওর মনের সাধ কি জানেন—আপনার 'সারদামঙ্গল' এর মতন কবিতা লিখবে। আমার কাছে ও কথা তুললেই আমি বলতুম—কস্মিনকালেও তুমি কবি হতে পারবে না, বরং, সর্ব্বদা ভাববে—'মন্দঃ কবিযশঃ-প্রার্থী' আমি 'গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।' একথা শুনে কবিযশপ্রার্থীর মুখখানি কি রকম রাঙা হয়ে উঠত—তা যদি দেখতেন!

বিহারীবাবু কহিলেন—তা হ'লে আপনি সত্যই কবির প্রতি অবিচার করতেন। আমি জোর গলায় বলচি, আমাদের বালক-কবি ভেলায় চড়েই সমুদ্দুর পার হয়েছেন। বড় হয়ে আমাদের কবি মালোয়ারী জাহাজ চালিয়ে সাত সমুদ্দুর তের নদী তোলপাড় করবে দেখবেন। কি বল কবি, বাড়িয়ে বলেছি কি?

বালক-কবি এবার মৃদু হাসিয়া কহিলেন—বৌঠানের কথাই ঠিক—'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী—গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।'

বৌঠাকুরাণী কহিলেন—এট' হচ্ছে অভিমান। কবিমানুষের মন খুঁজেই অস্থির, আমি কবি-মনের খবর রাখি।

বিহারীবাবু কহিলেন—সে কথা মিছে নয়। আপনি খবর না রাখলে এত শীগ্‌গীর কি কবিকে আমরা খুঁজে পেতুম। যাই হোক, আজ থেকে আমিও একটি নতুন বন্ধু পেলুম। আলোচনা আমাদের জমবে ভালো। মনে কোন সঙ্কোচ রেখো না কবি, আমার বাড়ীতে এখন থেকে নিত্যই যাওয়া চাই—বুঝলে?

বালক-কবি হাসিয়া কহিলেন—নিশ্চয় যাব; দেখবেন—কালই গিয়ে হাজির হয়েচি।

বালকের পিঠটি চাপড়াইয়া বিহারীবাবু কহিলেন—লজ্জা তা হ'লে ভেঙেছে, বেশ, এই ত চাই। কিন্তু দেখো বাবাজী, আমার বাড়ীর তেতলার নিরেলা ছোট ঘরখানির মেঝের উপরে উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কবিতা বাঁধছি দেখে লজ্জায় যেন পিছিয়ে এসো না—বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বৌঠাকুরাণীও সেই হাসিতে যোগ দিয়া কহিলেন—পেছবার ছেলে ও নয়, দেখবেন তখন—আপনার পাশেই জেঁকে বসেছে। যাক্, অনেক ত খেটেছেন, খাবার ব্যবস্থা এবার করি?

সহাস্যে বিহারীবাবু কহিলেন—নিশ্চয়ই, খাটুনীর মজুরী ভাগাভাগি করেই নেবো—দুই কবি পাশাপাশি বসে; কি বল হে মিতে?

হাসিতে হাসিতে বৌঠাকুরাণী কহিলেন—আগে থেকেই ভেবে-চিন্তে তাই ত কবিকে পাশাপাশিই বসিয়েছিলুম।

কবি 'বিহারী'লালের সহিত আমাদের বালক-কবির ঘনিষ্ঠতা এখন গভীর হইয়া উঠিয়াছে। কবি এখন দিনে দুপুরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে যান। সেখানে তেতালার ছোট ঘরখানির ভিতরে পঙ্খের কাজ-করা মসৃণ মেঝেটির উপরে বসিয়া উভয়ের মধ্যে কবিতা ও সঙ্গীতের চর্চ্চা হয়। প্রবীণ ও নবীনে প্রাণ-খোলা আলাপে ঘরখানি মুখরিত হইয়া ওঠে।

বালক কবির প্রতিভার রশ্মিটুকু ঠাকুরবাড়ীর মধ্যে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার দিকে সকলেরই সপ্রশংস দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু কবির সমবয়সী একটি ছেলেকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে। এই ছেলেটির নাম প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—ঠাকুরবাড়ীর পরিজনের কেহ না হইলেও, এবাড়ীতে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও কবির সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে। কিন্তু কবির কোন কবিতাকেই তাঁহার এই সমবয়সী বন্ধুটি কোন দিনই ভাল বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাঁহার ধারণা—এসব বালক কবির পাগলামী বা ছেলেখেলা মাত্র। এমন কি, নামী কবি বিহারীলালের প্রশংসাও তিনি প্রসন্নমনে স্বীকার করিয়া লন নাই, মুখ বাঁকাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন—এর নাম ব্যাজস্তুতি। ছেলেমানুষের কবিতা শুনে 'যাচ্ছে তাই' না ব'লে 'বেড়ে হয়েছে' বলেছেন।

বন্ধুর কথাটা কবির মনে ভারি আঘাত দিয়াছে। পড়িবার ঘরে বসিয়া কথাটা ভাবিতেছেন, এমন সময়, পা দুটি টিপিয়া টিপিয়া কবির সেই রহস্যময়ী সঙ্গিনীটি চিন্তামগ্ন কবির পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর কবিকে সহসা চমকিত করিয়া কহিল—আমি জানি তোমার কি হয়েছে।

চমকিত কবির বেদনাতুর মুখখানি সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সচকিত দুটি চোখের তারাও বুঝি হাসিতে ভরিয়া গেল; হাসিমুখে কহিলেন—তুমি কি সর্ব্বদর্শী, আমার মনের ভিতরটাও দেখতে পাও?

হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া বালিকা উত্তর করিল—কেন মশাই, তুমিই ত বলেছ—আমি তোমার মানসী; নইলে এমন ক'রে মনের কথা বলতে পারি? কবি কাহিনীর কবির কথা কি ভুলে গিয়েছ? তুমিই ত বলেছ—মানুষের মন চায় মানুষেরই মন।

কবিও হাসিয়া কহিলেন—তুমি এলেই আমার মুখ যেন বন্ধ হয়, আর মনের দরজাটি খুলে যায়।

ফিক করিয়া হাসিয়া বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল—তা ত যাবেই, আমি যে—মানসী। তোমার মনের কথা আমার মুখ দিয়ে ফুটে বা'র হয়—এই ত তুমি চাও। এখন কথা শোন—তোমার ঐ বাচাল বন্ধুটিকে আচ্ছা করে জব্দ করা চাই, বুঝলে?

বিস্ময়ের সুরে কবি কহিলেন—সর্ব্বনাশ, তুমি ত দেখছি ভাঁহাবাজ মেয়ে—

সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কহিল—নইলে ডাকাতি ক'রে মনের কথাটি টেনে বার করতে পারি? কিন্তু যা বললুম, করা চাই।

বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে চাহিয়া কবি প্রশ্ন করিলেন—কি করে জব্দ করব? সে কি সোজা ছেলে ভেবেছ!

তেমনি হাসিয়া বালিকা কহিল—তোমার চেয়েও শক্ত নাকি? বেশ ছেলে যাহোক, খালি খালি নিজেকে খাটো করছ? ভাবো না, জব্দ করবার উপায় ঠিক খুঁজে পাবে। ঐ যে মাষ্টার মশাই আসছেন, আমি পালাই।

বলিতে বলিতেই বালিকা পাশের দরজাটি দিয়া এক ছুটে ভিতরে চলিয়া গেল। কবির মনের তারে তাহার কথাগুলি যেন ঝঙ্কার দিতে লাগিল—ভাবো না, উপায় ঠিক খুঁজে পাবে।

প্রত্যহ এই সময় পণ্ডিত জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কবিকে পড়াইতে আসেন। এদেশের ও বিদেশের প্রাচীন কবিদের কবিতাবলী তিনি এই অদ্ভুত মেধাবী ছাত্রকে বুঝাইয়া দেন, আবার ছাত্রের মুখে তাহাদের ব্যাখ্যা শুনেন। তাঁহাদের কবিতার অনুকরণে ছাত্র-কবিকেও নিজের ভাষায় কবিতা লিখিতে হয়। একদিন কথায় কথায় অনুকরণের কথা উঠিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—যাদের প্রতিভা থাকে, মৌলিক রচনার শক্তি থাকে, তাঁদের পক্ষেই বিখ্যাত লেখকের রচনার অনুকরণ করা সম্ভব। সে রচনায় একটা নতুন রূপ প্রকাশ হয়ে ওঠে, পাঠকেরা পড়ে আনন্দ পান। কিন্তু অক্ষম লেখকদের হাতেই এই অনুকরণ 'হনুকরণ' বা অপহরণ হয়ে দাঁড়ায়, আর সেগুলো হয় সাহিত্যের আবর্জ্জনা। বিলাতে তোমারি বয়সী একটি ছেলে—নাম হচ্ছে তার চ্যাটার্টন—

বড় বড় ইংরেজ কবিদের রচনার নকল ক'রে এমন চমৎকার ক'রে লিখতেন যে, অনেকেই প্রথমে তা ধরতে পারেননি। হ্যারিস, পেটে, ব্রাউনিং দম্পতির কবিতাও ত তুমি পড়েছ, এঁরাও ইটালীর আধুনিক কবিদের কাব্যের অনুকরণে কবিতা লিখে খুব খ্যাতি পান।

শিক্ষকের কথায় আনন্দ ও উৎসাহের আলোকে বালক-কবির মুখখানি যেন ঝলমল করিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সঙ্কোচের যে আঁচটুকু ছিল, এইবার বুঝি পলকের মধ্যে মিলিয়ে গেল। শিক্ষকের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কবি কহিলেন—দেখুন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে আমার ভারি ভাল লাগে ব'লে তারই অনুকরণে আমিও কতকগুলো কবিতা লিখেছি, আপনাকে লজ্জায় দেখাইনি; কিন্তু আজ আপনার কথায় মনে সাহস হচ্ছে—পড়ে আপনাকে শুনাতে। যদি বলেন—

সাগ্রহে শিক্ষক মহাশয় কহিলেন—বলোবাল কি, আরো আগে তোমার দেখানো উচিত ছিল আমাকে। দেখ, কোন কাজে আর সঙ্কোচ কোরো না বাবা, কিন্তু এ দুটোকে কাটাতে হবে। যাক, তোমার কবিতা বা'র কর আমি শুনব।

পদাবলীর অনুকরণে লেখা কবিতাগুলি কবির মন ভরিয়া ছিল, বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। প্রায় একটি ঘণ্ট ধরিয়া কবিতাগুলি শুনিবার পর পণ্ডিত মহাশয় ছাত্রের উদ্দেশে প্রশস্তি বাচন করিলেন—একেই বলা চলে সত্যকার অনুকরণ; এমন অনেক সমঝদার আমাদের সমাজে আছেন, যাঁরা শুধু বাইরেটা এক নজরে দেখতেই অভ্যস্ত, ভিতরে সেঁধুতে চান না—তাঁদের কাছে তোমার কবিতাগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের লেখা পদাবলী বলেই চালিয়ে দেওয়া যায়। আমি দেখছি, তোমার প্রতিভা একটা দিকেই নয়—চারদিক দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে। অনুকরণেও তুমি ওস্তাদ।

শিক্ষকের উচ্চ প্রশংসায় বালক-কবির নেত্রমণিদুটি যেন জ্বলিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে মনের মণিকোঠা হইতে তাঁর সেই মানসীর বাণী যেন কর্ণপটাহে সশব্দে ঝঙ্কার তুলিল—ভাবো না, উপায় ঠিক খুঁজে পাবে।—পরক্ষণে কবির কোমল মুখটি সত্যসত্যই যেন ইস্পাতের মতন শক্ত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার দিকে বন্ধু প্রবোধচন্দ্র আসিলেন কবির সহিত গল্প জমাইতে। এই সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহাশয়েরা প্রাচীন কবিদের "কাব্য সংগ্রহ" ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্যে বেশ চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়াছে। ইহাদের সংগৃহীত এবং সযত্নে প্রকাশিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' পড়িতে বা সংগ্রহ করিতে অনেকেই আগ্রহান্বিত। প্রবোধচন্দ্রের কথার মাত্রাই এখন হইয়াছে প্রাচীন পদাবলীর অতি পরিচিত দুই-চারিটি ব্রজবুলি। বালক রবিকে অপ্রস্তুত করিতে তাহাই সদাসর্বদা শুনাইয়া দেন, আত্মমাত্রায় গম্ভীর হইয়া বলেন—হ্যাঁ, একেই বলে আসল কাব্য, কানে ঢুকলেই প্রাণ একেবারে ভর'—আজ দুপুরে বিদ্যাপতির পদাবলী পড়ছিলুম, এখনো যেন কানে বাজছে—

"বড় বড় জন রসিক কহয়ে
রসিক কেহত নয়।
তরতম করি বিচার করিলে
কোটীকে গোটিক হয়।"

আহাহা—কি সুন্দর রচনা, রস যেন পদে পদে ঝরে পড়ছে।

মুখখানি তুলে মৃদুস্বরে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—পদাবলীটি কার বললে?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কবির সুকোমল মুখখানি বিদ্ধ করিয়া প্রবোধচন্দ্র উত্তর করিলেন—বলেছি ত আগেই, শোননি! আর কার—বিদ্যাপতির। আজ দুপুরে তাঁকে নিয়েই পড়েছিলুম। তুমি ত ওসব ছোঁবে না, তা ছাড়া বোঝাও শক্ত, বিদ্যে চাই, বুঝলে!

মুচকি হাসিয়া কবি কহিলেন—রসের কথা তুলে বিদ্যে বে রসিকের এতম গোড়াতেই যে গলদ করে বসলে!

চোখ দুটি কপালের দিকে তুলিয়া বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কথার মানে?

হাসিমুখে কবি কহিলেন—মানে হচ্ছে পদটির রচয়িতা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি নন।

মুখখানা বাঁকাইয়া বন্ধু প্রতিবাদ করিলেন—বিদ্যাপতি নন, বললেই হ'ল অমনি, আমি নিজের চোখে দেখিছি।

ধীর কণ্ঠে কবি কহিলেন—তর্কে দরকার কি, চণ্ডীদাস আনাচ্ছি, পদটা তাতেই জ্বল্ জ্বল্ করছে দেখতে পাবে।

বন্ধু এবার নরম হইয়া সুর পাল্টাইলেন,

দীর্ঘ জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত; আর, এমনি করেই সকলকে হারিয়ে দেবে।

দুই চক্ষুতে বিস্ময় ভরিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিলেন—কিসে বুঝলে বলত?

সহাস্যে বালিকা উত্তর দিল—ভাবলেই বুঝতে পারবে।

কবিও হাসিয়া কহিলেন—তাহলে বলছি, দেখ, আমি হয়েছি মস্ত কবি।

সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরাইয়া বালিকা কলহাস্যের সহিত কহিয়া উঠিল: আর—আমি হয়েছি তোমার মানসী। *

* কবি বলতেন যে, শৈশবে এক বালিকা, কৈশোরে কিশোরী, যৌবনে যুবতী যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া কবির সহিত আলাপ করিতেন, তাঁহার কাব্য সাধনায় প্রেরণা যোগাইতেন। কবি তাঁহাকে 'মানসী' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। কবির সেই কথা অবলম্বনে এই কাহিনী।—লেখক।

সমাপ্ত